

সূচী ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অজবিলাপ ...	৪০২
অনন্ততা ...	৩৪৭
অনাহত ...	৫৪২
অনুস্মার ও বিসর্গ ...	৮১
অবস্থা ও ব্যবস্থা ...	২৭২
অভয় ...	৩৪১
অংল্যবাহিষের পোণাপুত্র ...	৫২১
✓ অক্ষয়কুমার দত্তের কথা ...	২২২
অক্ষর ...	৩১১
আগমন ...	২৬৭
আশ্বেষগিরি ...	৩৪৫
আত্মগৃহ ...	২৪০
আমাদের ধর্মশাস্ত্র ...	১১২
আট কাহাকে বলে ? ...	২৫৭
ইংসিং ...	১০৬
ইলেট্টুন্ ...	৫৫০
ঈশ্বর ও পূর্বসন্ধ্যা ...	৪১৩
উপাদিত্ত্ব ...	৪৫২
উৎসব ...	৪৮১
উপনয়ন ...	৩৪৪
উপাধিব্যাধি ...	১৩৪
একটি কুণ্ডের প্রতি ...	৪৮৭
কাকদাস ...	৩৬৩
কুমারসম্ভব ...	১২৩, ২১৪
কোচিন ...	৩১৩, ৩৮৫
গহেলী ও যজ্ঞদ্বার ...	১৬৭

বিষয় ।	পাতা ।
গোয়ালিখন্ড ...	৮৭
ঘাটের পল ...	১২৯
ছাত্রদের প্রতি সম্বোধন ...	১২
হিন্দুস্তানবাদ এবং অমৌলিক শক্তি-পিপাসা ...	৫৪৫
জাপান ও হিন্দু-অশির সাধনা ...	৩২৪
ঐতিহাসিক কয়েকটি কথা ...	৫২৬
ভাষার কথা ...	৬১৬
তীর্থযাত্রী ...	৪১২
তুলার চাষ ...	৪৮৯
ভাণ্ড ...	৩৮৪
ব্রহ্মকুর ...	৩৭, ৭৭, ১২৩, ১৮০, ২৩৪
মিবরুর ও ডেপুটিন ...	২৬৪
দান ...	৩২৪
দীনবন্ধু মিত্র ...	৩৯৬
ডঃ খন্ড ...	৮৮৮
দুর্গোৎসব ...	৩৬৯
দুর্ভাগ্য ...	২৭৮
প্রতিকর্ষিত ভারতে ...	৪৩৭, ৩৭৬, ৫৫৫, ৫৮৭
দেশের রাজ্য ...	১৪৭
দেশের মাটি ...	২৩৮
দোলা ...	৫৪৯
দিবা ...	৩৪১
ধর্মপদং ...	৯১
নবজীবন ...	৪২৪
নবজীবনের আদর্শ ...	১২৮
নূতন গুরুমহাশয় ...	৩৯৯
নৌকাডুবি (উপন্যাস) ...	১, ৫১, ৯৯
পান্‌কী-বেহারার গান ...	৫২৫
পুরাণ-প্রসঙ্গ ...	২৪১
পৃথিবী ও সূর্যের তাপ ...	১০৯
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ...	১৫৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
প্রত্যাবর্তন ...	৫৫৩
প্রলয় ...	৩৪৫
প্রাচীন রচনা ও পাণিনির আদর্শ ...	১৪৪
প্রাচ্য সভ্যতা ...	৪০
প্রাচ্য-প্রতীচ্যের একটি বৈপরীত্য ...	১৬৪
প্রেমের কামনা ...	২৯৬
প্রেমের স্বরূপ ...	৪৫৮
বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা ...	২৯৯
বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা ... (অগ্রহাণ)	৩৪৯ ক
বঙ্গবিভাগে ...	৩৪৩
বঙ্গলক্ষীর প্রত্যক্ষতা ...	৪৪৫
বালিকা বধু ...	৫০৫
বিক্ষয়সম্মিলন ...	৩৪৯
বিজ্ঞান এবং জ্ঞান ...	৪৫৯, ৫১৩
ব্রত ...	৩৪৩
ব্রতধারণ ...	২২৮
ভট্টাচার্য্যমহাশয় ...	১০
ভারতবর্ষীয় জীবনজাল ...	৫৩৩
ভিখারী ...	৩৪৩
ভীম চুলুং ...	৫০৭
মর্শচ্ছেদ ...	৩৩২
মহেশ্বর ...	১৮২
মায়াবাদ ...	৩৫৬
মুক্তিপাশ ...	৪৪৩
মৃগলক্ষ্য ...	৭১
মৃগলমূর্তি ...	১৪৬
মৃথ ...	৩৪৮
মৃগবংশ ...	৩৫
মৃগবংশ ও পদ্মপুরাণ ...	৩১
রাধি-বন্ধনের উৎসব ...	৩৪১
রাজপ্রসাদ ...	৩৪৩

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

রাজা ও প্রজা	২৭০
রামায়ণের রচনাকাল	৬১, ২০১, ২৪৮, ৪০২
রায়গৃহিণী	২০৮
রূপান্তর	৬১৫
সীলা	৫৩২
উভক্ষণ	৩৮৩
শেষ খেয়া	১৪২
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	৫১২
সম্রাটের অন্তঃস্বয়ং	৫১৯
সংগ	৫৩২
সাহিত্য ও ব্যাকরণ	১৭১
সোনার বাংলা	৫৬৯
সোনার বাংলা (কবিতা)	২৪৭
স্বদেশ	৩৪২
স্বদেশী বা পেট্রি মটিজম	৫৯৬
স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়...	৩৮৯
স্বদেশী ছাত্র	৩৮০

বঙ্গদর্শন ।

নৌকাডুবি ।

৬২

মিনী নলিনাক্ষের সহিত বিবাহে সম্মতি
লকে বুঝাইতে লাগিল, ‘আমার পক্ষে
গোয় বিষয় হইয়াছে।’ মনে মনে
করিয়া বলিল, “আমার পুরাতন
হয় হইয়া গেছে—আমার জীবনের
পক্ষে বেঠন করিয়া যে বড়ের মেঘ
উঠিয়াছিল, তাহা একেবারে কাটিয়া
এখন আমি স্বাধীন, আমার অতীত-
অবিশ্রাম আক্রমণ হইতে নিশ্চুক্ত।”
কথা বারংবার বলিয়া সে একটা বৃহৎ
স্মরণ-আনন্দ অনুভব করিল। আশানে
ভোর পর এই একান্ত সংসার তাহা
ভার পরিহার করিয়া যখন খেলার মত
দেখা দেয়, তখন কিছুকালের মত মন
লব্ধ হইয়া যায়—হেমনলিনীর ঠিক
অবস্থা হইল—সে নিজের জীবনের
শর নিঃশেষ-অবসান-অমিত শান্তি
পাইল।

কীতে কিরিয়া-আসিয়া হেমনলিনী
“মা যদি থাকিতেন, তবে তাঁহাকে
আমার এই আনন্দের কথা বলিয়া
ত করিতাম—বাবাকে কেমল করিয়া
বলিব।”

শরীর দুর্বল বলিয়া আজ অন্নদাবাবু
যখন সকাল-সকাল শুইতে গেলেন—তখন
হেমনলিনী একখানি খাতা বাহির করিয়া
রাখে তাহার নির্জন শয়নগৃহে টেবিলের
উপর লিখিতে লাগিল—“আমি মৃত্যুজালে
জড়াইয়া-পড়িয়া সমস্ত সংসার হইতে বিমুক্ত
হইয়াছিলাম। তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া
দেখর আবার যে একদিন আমাকে নূতন
জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহা
আমি মনেও করিতে পারিতাম না। আজ
তাঁহার চরণে সহস্রবার প্রণাম করিয়া নূতন
কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশের জন্ত প্রস্তুত হইলাম।
আমি কোনোমতেই যে সোভাগ্যের
উপবৃত্ত নই, তাহাই লাভ করিতেছি। দেখর
আমাকে তাহাই চিরজীবন রক্ষা করিবার
জন্ত বলদান করুন। বাঁহার জীবনের সঙ্গে
আমার এই ক্ষুদ্রজীবন মিলিত হইতে চলিল,
তিনি আমাকে সর্বাত্মে পরিপূর্ণতা দিবেন,
তাহা আমি নিশ্চয় জানি; সেই পরিপূর্ণতার
সমস্ত ঐশ্বর্য আমি যেন সম্পূর্ণভাবে তাঁহাকেই
প্রত্যর্পণ করিতে পারি, এই আমার একমাত্র
প্রার্থনা।”

তাঁহার পরে খাতা বন্ধ করিয়া হেম-
নলিনী সেই নকলখচিত অক্ষরকে নিভৃত

অন্নদাবাবু কহিলেন—“নলিনাকের মার ওখানে আমার আর হেমের নিমন্ত্রণ আছে। যোগেন্দ্র, তোমার তা হইলে এখানেই আহারের—”

যোগেন্দ্র কহিল—“না না! আমার জন্তে স্বস্ত হবার দরকার নাই। আমি রমেশকে সঙ্গে লইয়া এখানকার কোনো হোটেলে খাওয়াবোঁ করিয়া উঠিব। সন্ধ্যার মধ্যে তোমরা কিরিত ত? খনি আমরা আসিব।”

অন্নদাবাবু কোনোমতেই রমেশের প্রতি কোনোপ্রকার শিষ্টসম্ভাষণ করিতে পারিণেন না। তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করাও তাঁহার পক্ষে হুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। রমেশও এতক্ষণ নীরবে থাকিয়া যাইবার সময় অন্নদাবাবুকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

৬৩

কেমকরী কমলাকে গিয়া কহিলেন—“না, কাল হেমকে আর তার বাপকে দুপুরবেলায় এখানে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করা গেছে। কিরকম আয়োজনটা করা যায় বল দেখি? বেরাইকে এমন করিয়া খাওয়ান দরকার যে, তিনি যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন যে, এখানে তাঁহার মেয়েটির খাওয়ার কষ্ট হইবে না। কি বল না? তা, তোমার বেরকম রান্নার হুঁত, অথবা হইবে না, তা জানি। আমার ছেলে আশ পৰ্যন্ত কোনো রান্না খাইয়া কোনোদিন ভালমন্দ কিছুই বলে নাই—কাল তোমার রান্নার প্রশংসা তাহার মুখে ধরেন না না! কিন্তু তোমার মুখখানি আশ কক জব্বনে দেখাইতেছে যে? শরীর কি ভাল নাই?”

মলিন মুখে একটুখানি হাসি আনিয়া কমলা কহিল—“বেশ আছি না।”

কেমকরী মাথা নাড়িয়া কহিলেন—“না না, বোধ করি তোমার মন কেমন করি তেছে। তা ত করিতেই পারে, সেক্ষেত্রে লজ্জা কিঁসের! আমাকে পর ভাবিয়ে না না! আমি তোমাকে আপন মেয়ের মতই দেখি—এখানে যদি তোমার কোনো অসুবিধা হয়, বা তুমি আপনার লোক কাহারো দেখিতে চাও ত আমাকে না বলিলে চলিবে কেন?”

কমলা ব্যগ্র হইয়া কহিল—“না না, তোমার সেবা করিতে পারিলে আমি আকিছুই চাই না।”

কেমকরী সে কথার কান না দিয়া কহিলেন—“না হয় কিছুদিনের জন্য তোমার খুড়ার বাড়ীতে গিয়া থাক, তার পরে যখন ইচ্ছা হয়, আবার আসিবে।”

কমলা অস্থির হইয়া উঠিল, কহিল, “না, আমি যতক্ষণ তোমার কাছে আছি, সন্সারে কাহারো জন্য তাবি না। আমি যদি কখনো তোমার পায়ে অপরাধ করি, আমাকে তু যেমন খুলি শাস্তি দিও, কিন্তু একদিনে—অন্তও দূরে পাঠাইয়ো না।”

কেমকরী কমলার দক্ষিণ কপোলকে দক্ষিণ হস্ত বুঝাইয়া কহিলেন, “তাই ত বা না, আর কখন তুমি আমাকে না ছিড়ে নহিলে দেখিবারাজ এমন বড় কি করি হই। তা বাও না, সকালসকাল তুমি বাও! সমস্তদিব ত একদণ্ড কমিয়া থাকিবে না।”

কমলা তাঁহার পরমর্গে গিয়া বার

ছিন্না দীপ নিবাইরা অন্ধকারে মাটির উপরে
সেঁরা রহিল। অনেকক্ষণ বসিয়া, অনেকক্ষণ
বিজ্ঞা, এই কথা সে মনে বুঝিল, “কপালেয়
যে বাঁহার উপরে আমার অধিকার হারাই-
ছি, তাঁহাকে আমি আগুলাইরা বসিয়া
কিৰ, এ কেমন করিয়া হয়! সবুজই ছাড়ি-
র কত মনকে প্রভুত করিতে হইবে—
যে সেবা করিবার স্বেচ্ছাটুকু, যেমন
যিরা হোক, প্রাপ্যপথে বাঁচাইরা চলিব।
বান্ ককম, সেটুকু বেন হাসিমুখে করিতে
রি—তাহার বেশি আর কিছুতে বেন দৃষ্টি
কিই। অনেক হুঃখে যেটুকু পাইয়াছি,
টুকুও যদি প্রিয়মনে মা মইতে পারি,
ত মুখ ভরি করি; তবে সবসুখই হারাইতে
বে।”

এই বুঝিয়া একাএকমনে ব্যুৎসার করিয়া
সকল করিতে লাগিল, “আমি কাল হইতে
ন কোনো হুঃখে মনে স্থান মা দিই, বেন
কমুহুত মুখ বিরস না করি, যাঁহা আশার
ভীত তাহার ভক্ত বেন কোনো কামনা
নর মধ্যে না থাকে! কেবল সেবা করিব,
চলিল জীবন আছে কেবল সেবা করিব,
রি কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাহিব না।”

আহার পরে কমলা শুইতে গেল।
প্রাণ-ওপাশ করিতে করিতে ঘুমাইরা
ড়ল। রক্তে হইতিমকার সুক ভাঙিয়া
ল। ভাঙিয়ামাঝেই সে ব্যস্ত মত
ভাঙাইতে লাগিল, “আমি কিছুই চাহিব
, চাহিব না, চাহিব না।” ভোরের বেলায়
বিহারা হইতে উঠিয়াই বোড়হাত
রয়া বসিল, এবং সমস্ত চিত্ত প্রয়োগ করিয়া
হিল—“আমি আত্মসমর্পণ ভোক্তা সেবা

করিব, আর কিছু চাহিব না, চাহিব না,
চাহিব না।”

এই বলিয়া তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইরা,
বাসি কাগড় ছাড়িয়া, নলিনাকের সেই ক্ষুদ্র
উপাননাথরের মধ্যে গেল; নিজের আঁচলটি
দিয়া সমস্ত ঘর মুছিয়া পরিষ্কার করিল
এবং বখাছামে আসনটি বিছাইরা-মাখিয়া
ক্রতপদে গঙ্গানান্দ-দ্বিগে গেল। আজকাল
নলিনাকের ঐ ঐ অল্পরোধে ক্ষেমকরী
স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে ঘাস করিতে বাওরা
পরিভ্যাগ করিয়াছেন। তাই উমেশকেই
এই হুঃসহ শীতের ভোরের কমলার সহিত ঘাসে
বাইতে হইল।

ঘাস হইতে কিরিয়া-আসিয়া কমলা
ক্ষেমকরীকে প্রহুস্রমুখে প্রশাস করিল।
তিনি তখন ঘাসে বাহির হইবার উপক্রম
করিতেছিলেন। কমলাকে কহিলেন, “এত
ভোরের কেন নাহিতে গেলে? আমার সঙ্গে
গেলেই ত হইত।”

কমলা কহিল, “আজ যে কাজ আছে মা।
কাল সন্ধ্যাবেলায় যে তবুকারি আনানো
হইয়াছে, তাহাই কুটিরা রাখি—আর বা-কিছু
বাজার করা বাকি আছে, উমেশ সকাল-
সকাল সারিয়া আনুক।”

ক্ষেমকরী কহিলেন—“বেশ বুদ্ধি ঠাওরাই-
য়াছ মা। বেয়াই যেমনি আসিবেন, অমনি
খাবার প্রস্তুত পাইবেন।”

এমন-সমন নলিনাক বাহির হইয়া
আনিবামাত্র কমলা তিজা চুনের উপর তাড়া-
তাড়ি বোমটা ঝিনিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।
নলিনাক কহিল—“মা, আজই তুমি ঘাস
করিতে চলিলে? সব কাল একটু ভাল ছিলে।”

কেম্‌করী কহিলেন—“নলিন, তোর ডাক্তারি রাখ! সুকালবেলায় গঙ্গারান না করিলেও লোকে অমর হয় না। তুই এখন বাহির হইতেছিস্ বুঝি? একটু সকাল-সকাল কিরিস্।”

নলিনাক জিজ্ঞাসা করিল—“কেন মা?”

কেম্‌করী। কাল তোকে বলিতে তুলিয়া গিয়াছিলাম—আজ অন্নদাবাবু তোকে আশীর্বাদ করিতে আসিবেন।”

নলিনাক। আশীর্বাদ করিতে আসিবেন? কেন, হঠাৎ আমার উপরে এত বিশেষভাবে প্রসন্ন হইলেন বৈ? তাঁর সঙ্গে ত রোজই আমার দেখা হয়।

কেম্‌করী। আমি যে কাল হেমনলিনীকে একল্লোড়া বালা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিলাম—এখন অন্নদাবাবু তোকে না করিলে চলিবে কেন? যা হোক, কিরিতে মেরি করিস্ নে—তাঁরা এখানেই থাকিবেন।

এই বলিয়া কেম্‌করী ন্নান করিতে গেলেন। নলিনাক মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে ভাবিতে রাত্তা দিয়া চলিয়া গেল।

৬৪

হেমনলিনী রমেশের নিকট হইতে ক্রতবেগে পলায়ন করিয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। প্রথম আবেগটা শান্ত হইবামাত্র একটা লজ্জা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।—“কেন আমি রমেশবাবুর সঙ্গে সহজভাবে দেখা করিতে পারিলাম না? কেন শিষ্টাচারের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া এমন অদ্ভুত দুর্কলভা দেখাইলাম? নিজের শক্তির উপরে কোনো-কালেই কি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিব

না? বাহা আশা করি না, তাহাই হঠাৎ কেন আমার মধ্য হইতে এমন অশোভন-ভাবে দেখা দেয়? রমেশবাবুর সঙ্গে ত আমার এখন কোনো সম্বন্ধ নাই, তবে কেন তাঁহার সাক্ষাৎকার জন্মি শাস্তভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না? বিশ্বাস নাই, কিছুই বিশ্বাস নাই। এমন করিয়া টলমল করিতে আর পারি না।”

এই বলিয়া সে জোর করিয়া উঠিয়া পড়িয়া দরজা খুলিয়া দিল, বাহির হইয়া আসিল—মনে মনে কহিল, “আমি পলায়ন করিব না, আমি জয় করিব।” পুনর্বার রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। হঠাৎ কি মনে পড়িল। আবাত্ত সে ঘরের মধ্যে গেল। তোরঙ্গ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে কেম্‌করীর প্রদত্ত বালাল্লোড়া বাহির করিয়া পরিল—এবং অস্ত্র পরিয়া যুদ্ধে বাইবার মত সে আপনাকে দৃঢ় করিয়া মাথা তুলিয়া বাগানের দিকে চলিল।

অন্নদাবাবু আসিয়া কহিলেন—“হেম, তুমি কোথায় চলিয়াছ?”

হেমনলিনী কহিল—“রমেশবাবু নাই—দাদা নাই?”

অন্নদা। না, তাঁহারা চলিয়া গেছেন।

আগু আত্মপরীক্ষাসম্ভাবনা হইতে নিফুতি তা পাইয়া হেমনলিনী আরামবোধ করিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন—“এখন তাঁকে—”

হেমনলিনী কহিল—“হা বাবা, আমি চলিলাম—আমার জ্ঞান করিয়া আসিতে দেখি হইবে না, তুমি পাড়ি ডাকিতে বলিও না।”

এইরূপে হেমনলিনী নিমন্ত্রণে বাইয়া

জন্ম হঠাৎ তাহার স্বভাববিরুদ্ধ অভ্যাস উৎসাহ প্রকাশ করিল। এই উৎসাহের আভিষেক অন্নদাবাবু তুলিলেন না, তাঁহার মন আরো উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সজ্জিত হইয়া আসিয়া কহিল—“বাবা, গাড়ি আসিয়াছে কি?”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “না, এখনো আসে নাই।”

ততক্ষণ হেমনলিনী বাগানের রাস্তার পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্নদাবাবু বারান্দায় বসিয়া মাথার হাত বুলাইতে লক্ষ্য করিলেন।

অন্নদাবাবু যখন নলিনাক্ষের বাড়ী গিয়া পৌঁছিলেন, বেলা তখন সাড়ে দশটার অধিক হইবে না। তখনো নলিনাক্ষ কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই। কাজেই অন্নদাবাবুর অভ্যর্থনাভার ক্ষেমকরীকেই লইতে হইল।

ক্ষেমকরী অন্নদাবাবুর শরীর ও সংসারের নানা কথা লইয়া প্রশ্ন ও আলোচনা উত্থাপিত করিলেন—মাঝে মাঝে হেমনলিনীর মুখের দিকে তাঁহার কটাক্ষ ধাবিত হইল। সে মুখে কোনো উৎসাহের লক্ষণ নাই কেন? আসন্ন শুভঘটনার সম্ভাবনা স্তব্ধোদয়ের পূর্বে অরুণরশ্মিচ্ছটার মত তাহার মুখে দীপ্তি-বিশেষ করে নাই ত। বরঞ্চ হেমনলিনীর অন্তমনস্ক দৃষ্টির মধ্য হইতে একটা ভাবনার অন্ধকার বেন দেখা যাইতেছিল।

অম্নেই ক্ষেমকরীকে আধাত করে। হেমনলিনীর এইরূপ স্নানভাবলক্ষ্য করিয়া তাঁহার মন দমিয়া গেল। “নলিনের সঙ্গে বিবাহের

সম্বন্ধ যে-কোনো মেয়ের পক্ষেই সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এই শিক্ষামদমতা মেয়েটি আমার নলিনকে কি তাঁহার বোগ্য বলিয়াই মনে করিতেছেন না? এত চিন্তা, এত বিবাহ বা বিবাহের সম্বন্ধ? আমারই দোষ। বুড়া হইয়া গেলাম, তবু ধৈর্য ধরিতে পারিলাম না। যেমনি ইচ্ছা হইল, অমনি আর সবুর সহিল না। বড় বয়সের মেয়ের সঙ্গে নলিনের বিবাহ স্থির করিলাম, অথচ তাহাকে ভাল করিয়া চিনিবার চেষ্টাও করিলাম না। হায় হায়, চিনিয়া দেখিবার মত সময় যে হাতে নাই—এখন সংসারের সব কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া যাইবার জন্য উৎসাহ আসিয়াছে।”

অন্নদাবাবুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ক্ষেমকরীর মনের ভিতরে ভিতরে এই সমস্ত চিন্তা ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কথাবার্তা কহা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি অন্নদাবাবুকে কহিলেন,—“দেখুন, বিবাহের সম্বন্ধে বেশি তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ নাই। এঁদের দুজনেরই বয়স হইয়াছে, এখন এঁরা নিজেরাই বিচার করিয়া কাজ করিবেন, আমাদের তাগিদ দেওয়াটা ভাল হইতেছে না। হেমের মনের ভাব আমি অবশ্য বুঝি না—কিন্তু আমি নলিনের কথা বলিতে পারি, সে এখনো মন স্থির করিতে পারে নাই।”

এ কথাটা ক্ষেমকরী হেমনলিনীকে বিশেষ করিয়া শুনাইবার জন্যই বলিলেন। হেমনলিনী অপ্রসন্নমনে চিন্তা করিতেছে, আর তাঁর ছেলেই যে বিবাহের প্রস্তাবে একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছে, এ ধারণা তিনি অপরাধ পক্ষের মনে জন্মিতে দিতে পারেন না।

হেমনলিনী আজ এখানে আসিবার সময় বুঝ একটা চেষ্টাকৃত উৎসাহ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিল—সেইজন্য তাহার বিপরীত কল হইল। কণিক উদ্ভেজনা একটা গভীর অবসাদের মধ্যে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। যখন ক্ষেমকরীর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন হঠাৎ তাহার মনকে একটা আশঙ্কা আক্রমণ করিয়া ধরিল,—যে নূতন জীবন-বাড়ার পথে সে পদক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা তাহার সম্মুখে অতিদূর-বিসর্পিত দুর্গম শৈলপথের মত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সে মনে করিতে লাগিল, “এত-বড় একটা নূতন আরম্ভের উপবৃত্ত আমার বল কোথায়, সাহস কোথায়—নিজের উপরে বাহার আস্থা নাই, সে এত-বড় দুর্লভ তার গ্রহণ করিতে উদ্ভত হইয়াছে কি ভরসার? আমি জানি, আমার ইহাতে লাভ আছে, বৈরূপ আশ্রয়ের আমার প্রয়োজন, তাহা আমি এখানে পাইব। কিন্তু আমি কি কেবল লাভ করিতেই আসিয়াছি, আমাকে কিছু দিতে হইবে না? দিবার মত সমূল আমার কি আছে?”

সমস্ত শিষ্টালাপের মধ্যে নিজের প্রতি অবিশ্বাস হেমনলিনীর মনকে আজ ভিতরে ভিতরে ব্যথিত করিতে লাগিল।

এই অবস্থায় যখন ক্ষেমকরী বিবাহের প্রস্তাবটাকে কতকটা প্রত্যাখ্যান করিয়া লইলেন, তখন হেমনলিনীর মনে দুই বিপরীত-ভাবে উদয় হইল। বিবাহবন্ধনের মধ্যে শীতল দিয়া নিজের সংশয়দোলায়িত দুর্বল অবস্থা হইতে শীতল নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা তাহার থাকিতে, প্রস্তাবটাকে সে অনতিবিলম্বে

পাকা করিয়া কেদিতে চায়—অথচ প্রস্তাবটা চাপা পড়িবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া উপহিতমত সে একটা আরামও পাইল।

ক্ষেমকরী কথাটা বলিয়াই হেমনলিনীর মুখের ভাব কটাকপাতেই বারাক্ষয় করিয়া লইলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন একজন-পরে হেমনলিনীর মুখের উপরে একটা শান্তির স্নিগ্ধতা স্বেতীর্ণ হইল। তাহাতে তাঁহার মনটা তৎক্ষণাৎ হেমনলিনীর প্রতি বিমুগ্ধ হইয়া-উঠিল। তিনি মনে মনে কহিলেন, “আমার নলিনকে আমি এত সন্তান বিলাইয়া দিতে বসিয়াছিলাম!”—নলিনাক্ষ আজ যে আসিতে দেরি করিতেছে, ইহাতে তিনি খুশি হইলেন। হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—“দেখেছ নলিনের আঁকল! তোমরা আজ এখানে আসিবে সে জানে, তবু তাহার দেখা নাই! আজ না হয় কাজ কিছু কমই করিত। এই ত আমার একটু ব্যামো হলেই সে কাজকর্ম বন্ধ করিয়া বাড়ীতেই থাকে—তাহাতে এতই কি লোকসান হয়!”

এই বলিয়া আহারের আয়োজন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিবার উপলক্ষ্যে কিছুক্ষণের ছুটি লইয়া ক্ষেমকরী উঠিয়া আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, হেমনলিনীকে তিনি কমলার উপর ভিড়াইয়া-দিয়া নিরীহ বৃদ্ধটিকে লইয়াই কথাবার্তা কহিবেন।

তিনি দেখিলেন, প্রস্তুত অন্ন মুহূর্ত আশ্রয়ের আঁচ-বসাইয়া রাখিয়া কমলা রান্নাঘরের এককোণে চুপটি করিয়া এমন গভীরভাবে কি-একটা ভাবিতেছিল যে, ক্ষেমকরীর হঠাৎ আবির্ভাবে সে একেবারে চমকিয়া উঠিল।

পরক্ষণেই লজ্জিত হইয়া স্নিতসুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেমকরী কহিলেন—“ওমা, আমি বলি, তুমি বুঝি রাজার কাছে তারি ব্যস্ত হইয়া আছ।”

কমলা কহিল, “রান্না সমস্ত সারা হইয়া গেছে মা।”

ক্ষেমকরী কহিলেন—“তা, এখানে চূপ করিয়া বসিয়া আছ কেন মা? অন্নদাবাবু বুড়োমানুষ, তাঁর সামনে বাহির হইতে লজ্জা কি? হেম আসিয়াছেন, তাহাকে তোমার ঘরে ডাকিয়া লইয়া একটু গল্পগল্প কর'সে। আমি বুড়োমানুষ, আমার কাছে বসাইয়া রাখিরা তাহাকে দুঃখ দিব কেন?”

হেমললিনীর নিকট হইতে প্রত্যাহত হইয়া কমলার প্রতি ক্ষেমকরীর স্নেহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

কমলা সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, “মা, আমি তাঁর সঙ্গে কি গল্প করিব! তিনি কত লেখাপড়া জানেন, আমি কিছুই জানি না।”

ক্ষেমকরী কহিলেন—“সে কি কথা! তুমি কাহারো চেয়ে কম নও মা! লেখাপড়া শিখিয়া যিনি আপনাকে বত বড়ই মনে করুন, তোমার চেয়ে বেশি আদর পাইবার যোগ্য করজন আছে? বই পড়িলে সকলেই বিদ্বান্ হইতে পারে, কিন্তু তোমার মত অমন লক্ষীটি হওয়া কি সকলের সাধ্য? এস মা, এস! কিন্তু তোমার এ বেশে চলিবে না। তোমার উপযুক্ত সাজে তোমাকে আজ সাজাইব।”

সকল দিকেই ক্ষেমকরী আজ হেমললিনীর গর্ভাট করিতে উদ্ভত হইয়াছেন। রূপেও তিনি তাহাকে এই, অল্পশিক্ষিতা

মেরেটির কাছে স্নান করিতে চান। কমলা আপত্তি করিবার অবকাশ পাইল না। তাহাকে ক্ষেমকরী নিপুণহস্তে মনের মত করিয়া সাজাইয়া দিলেন, কিরোজারঙের রেশমি শাড়ী পরাইলেন, নূতন ফ্যাশানের খোঁপা রচনা করিলেন—বারবার কমলার মুখ এদিকে ফিরাইয়া ওদিকে ফিরাইয়া দেখিলেন এবং মুগ্ধচিত্তে তাহার কপোল চূষন করিয়া কহিলেন—“আহা, এ রূপ রাজার ঘরে মানাইত!”

কমলা মাঝে মাঝে কহিল—“মা, উঁহারা একলা বসিয়া আছেন—দেরি হইয়া বাই-তেছে!”

ক্ষেমকরী কহিলেন—“তা, হোক দেরি! আজ আমি তোমাকে না সাজাইয়া রাখিব না।”

সাজ সারা হইলে তিনি কমলাকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন—“এস এস মা—লজ্জা করিয়ে না! তোমাকে দেখিয়া কালেজ-পড়া বিদ্বদী রূপসীরা লজ্জা পাইবেন, তুমি সকলের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পার।”

এই বলিয়া যে ঘরে অন্নদাবাবুরা বসিয়া ছিলেন, সেই ঘরে ক্ষেমকরী জোর করিয়া কমলাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন, নলিনাক্ষ তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। কমলা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া বাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু ক্ষেমকরী তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন—কহিলেন, “লজ্জা কি মা, লজ্জা কিসের! সব আপনাত্ন লোক!”

কমলার রূপে এবং সজ্জায় ক্ষেমকরী নিজের মনে একটা গর্ব অহতব করিতে ছিলেন—তাহাকে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত

হউক, এই তাঁহার ইচ্ছা। পূজাভিমানিনী জননী তাঁহার নগিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর অবজ্ঞা করনা করিয়া আজ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, আজ নগিনাক্ষের কাছেও হেমনলিনীকে ধরু করিতে পারিলে তিনি খুসি হন।

সন্ধ্যাকে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। হেমনলিনী ঐশ্বর্যময় বধন তাহার পরিচর-লাভ করিয়াছিল, তখন কমলার সাজসজ্জা কিছুই ছিল না—সে মলিনভাবে সজ্জিত হইয়া একধারে বসিয়া ছিল, তাও বেশিক্ষণ ছিল না। তাহাকে সেদিন ভাল করিয়া দেখাই হয় নাই! আজ সুহৃৎকাল সে বিস্মিত হইয়া রহিল, তাহার পরে উঠিয়া-বাড়াইয়া লজ্জিতা কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে আপনার পাশে বসাইল।

কেশবদ্বারী বুঝিলেন, তিনি জয়লাভ করিয়াছেন—উপস্থিতসভায় সকলকেই মনে মনে স্বীকার করিতে হইয়াছে, এমন রূপ দৈবপ্রসাদেই দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তিনি কমলাকে কহিলেন—“বাওঁত মা, তুমি হেমকে তোমার ঘরে লইয়া গল্পসল্প কর'গে বাওঁ। আমি ততক্ষণ খাবার জায়গা করিগে।”

কমলার মনের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, “হেম-নলিনীর আমাকে কেমন লাগিবে কে জানে!”

এই হেমনলিনী একদিন এই ঘরের বধু হইয়া আসিবে, কর্তা হইয়া উঠিবে—ইহার স্মৃতিতে কমলা উপেক্ষা করিতে পারে না।

এ বাড়ীর গৃহিণীপদ তাহারই ছিল, কিন্তু সে কথা সে মনেও আনিতে চায় না—ঈর্ষাকে

সে কোনোমতেই অন্তরে স্থান দিবে না—তাঁহার কোনো দাবী নাই। তাই হেমনলিনীর সঙ্গে বাইবার সময় তাঁহার পা কাঁপিয়া বাইতে লাগিল।

হেমনলিনী আন্তে আন্তে কমলাকে কহিল, “তোমার সব কথা আমি মা'র কাছে শুনিয়াছি। শুনিয়া বড় কষ্ট হইল। তুমি আমাকে তোমার বোনের মত দেখিয়ে ভাই। তোমার কি বোন্ কেহ আছে?”

কমলা হেমনলিনীর স্নেহে সক্রমণ কর্তব্যের আশ্রয় হইয়া কহিল—“আমার আপন বোন্ কেহ নাই, আমার একটি খুড়তুতো বোন্ আছে।”

হেমনলিনী কহিল, “ভাই, আমার বোন্ কেহ নাই। আমি বধন ছোট ছিলাম, তখন আমার মা মারা গেছেন। কতবার কত দুঃখ-দুঃখের সময় ভাবিয়াছি, ‘মা ত নাই, তবু যদি আমার একটি বোন্ থাকিত!’ ছেলেবেলা হইতে সব কথা কেবল মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে, শেষকালে এমন অভ্যাস হইয়া গেছে যে, আজ মন খুলিয়া কোনে কথা বলিতেই পারি না। লোকে মনে করে, আমার ভারি দেমাক—কিন্তু তুমি ভাই এমন কথা কখনো মনে করিও না! আমার মন যে বোবা হইয়া গেছে!”

কমলার মন হইতে সমস্ত বাধা কাটিয়া গেল—সে কহিল—“দাদি, আমাকে কি তোমার ভাল লাগিবে? আমাকে ত তুমি জান না, আমি ভারি মূর্থ!”

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল—“আমাকে বধন তুমি ভাল করিয়া জানিবে, দেখিবে, আমিও বোর মূর্থ! আমি কেবল গোটা কতক

বই পড়িয়া যুগ্ম করিয়াছি, আর কিছুই জানি না। তাই আমি তোমাকে বলি, যদি আমার এ-বাড়ীতে আসি হর, তুমি আমাকে কখনো ছাড়িয়ে না ভাই। কোনোদিন সংসারের ভার আমার একলার হাতে পড়ি-রাছে মনে করিলে আমার ভয় হয়।”

কমলা শিশুর মত সরলচিত্তে কহিল—
“ভার তুমি সমস্ত আমার উপর দিয়ে। আমি ছেলেবেলা হইতে কাজ করিয়া আসিয়াছি, আমি কোনো ভার লইতে ভয় করি না। আমরা ছইবোনে মিলিয়া সংসার চালাইব,—তুমি তাঁহাকে সুখে রাখিবে, আমি তোমাদের সেবা করিব।”

হেমনলিনী কহিল—“আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামীকে ত তুমি ভাল করিয়া দেখ নাই, তাঁহাকে তোমার মনে পড়ে?”

কমলা কথার স্পষ্ট উত্তর না দিয়া কহিল—
“স্বামীকে যে মনে করিতে হয়, তাহা আমি জানিতাম না দিদি। খুড়ার বাড়ীতে যখন আসিলাম, তখন আমার খুড়ততো-বান্ শৈল-দিদির সঙ্গে আমার ভাল করিয়া পরিচয় হইল। তিনি তাঁহার স্বামীকে যেরকম করিয়া সেবা করেন, তাহা চক্ষে দেখিয়া আমার প্রথম চৈতন্য জন্মিল। আমি স্ব-স্বামীকে কখনো দেখি নাই বলিলেই হয়, আমার সমস্ত মনের ভক্তি তাঁহার উদ্দেশে যে কেন্দ্র করিয়া গেল, তাহা আমি বলিতে পারি না। ভগবান্ আমার সেই পূজার কল দিয়াছেন—এখন আমার স্বামী আমার মনের স্পষ্ট করিয়া আসিয়া উঠিয়াছেন—তিনি আমাকে গ্রহণ না-ই করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে এখন পাইয়াছি।”

কমলার এই ভক্তিসিক্ত কথাকয়টি শুনিয়া হেমনলিনীর অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া গেল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—“তোমার কথা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অমনি করিয়া পাওয়াই পাওয়া। আর সমস্ত পাওয়া লোভের পাওয়া—তাহা নষ্ট হইয়া যায়, বিকৃত হইয়া যায়। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি যেরকম যথার্থভাবে পাইয়াছ, অমনি করিয়া মাহুবকে পাওয়া ভগবান্কেই পাওয়া। আগে আমি এ সমস্ত কিছুই বুঝিতাম না, তখন মন বড় সূক্ষ্ম ছিল। এখন আমার গুরুর কাছ হইতে শিখিয়াছি এবং অন্তরের মধ্যেও নানা-রূপে জানিয়াছি, পৃথিবীতে বাহ্য-কিছু ঠিক-মত করিয়া পাইব, তাহাতে তাঁহাকেই পাইব।”

কমলা এ কথা সম্পূর্ণ বুঝিল কি না, বলা যায় না;—সে হেমনলিনীর দিকে চাঞ্চিয়া রহিল,—খানিক বাদে কহিল—“তুমি বাহ্য বলিতেছ দিদি, তা সত্যই হইবে। আমি মনে কোনো হুঃখ আসিতে দিই না—আমি ভালই আছি ভাই। আমি যেটুকু পাইয়াছি, তাই আমার লাভ।”

হেমনলিনী কমলার হাত নিজের হাতে তুলিয়া-লইয়া কহিল—“যখন ভ্যাগ এবং লাভ একেবারে সমান হইয়া যায়, তখনই তুমি যথার্থ লাভ, এই কথা আমার গুরু বলেন। তখন আর ভয় নাই, হুঃখ নাই, ভীষা নাই। এ কথা আমি মনে ধারণা করিবার চেষ্টা করি—তোমাকে দেখিয়া আমার এই ধারণা বেন আজ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল,—সুন্দর হইয়া উঠিল। সত্য-বলিতেছি বোন, তোমার মত

অমনি সমস্ত নিবেদন করিয়া-দিয়া যে সার্থকতা, তাহাই যদি আমার ঘটে, তবে আমি ধন্ত হইব।”

কমলা কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল—“কেন দিদি, তুমি ত সবই পাইবে, তোমার ত কোনো অভাবই থাকিবে না।”

হেমলিনী কহিল—“ষেটুকু পাইবার মত পাওয়া, সেটুকু পাইয়াই যেন সুখী হইতে পারি—তার চেয়ে বেশি যতটুকুই পাওয়া যায়, তার অনেক ভার, অনেক দুঃখ। আমার

মুখে এ সব কথা তোমার আশ্চর্য লাগিবে—আমার নিজেরও আশ্চর্য লাগে—কিন্তু এ সব কথা জীবন আমাকে তাবাইতেছেন। জান না বোন, আজ আমার মনে কি ভার চাপিয়া ছিল—তোমাকে পাইয়া আমার হৃদয় হালকা হইল—আমি বল পাইলাম—তাই আমি এত বকিতেছি। আমি কখনো কথা কহিতে পারি না—তুমি কেমন করিয়া আমার সব কথা টানিয়া লইতেছ তাই?”

ক্রমশঃ।

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ।*

অন্ত বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-দিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ এই সভা আহ্বান করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে সর্বপ্রথমে সম্ভাষণ করিবার ভার আমার উপরে পড়িয়াছে।

ছাত্রদের সহিত বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের কোন্‌খানে যোগ, সে কথা হয়, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আরো একটি প্রশ্ন তাঁহাদের মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নহে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি—তাঁহারা বলিতে পারেন, আমার মত উপাধিবিহীন লোকের উপরেই বা সম্ভাষণের ভার পড়ে কেন?

আজকালি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে যে স্থানটি বোঝায়, সেখানে কোনো-

দিন আমার কোনো গতিবিধি ছিল না। জননী বোণাপাণির পদ্মবনটির প্রতি শিশুকাল হইতেই আমার লোভ ছিল, তোমরা লোক-মুখে তাহা শুনিয়া থাকিবে; কিন্তু তাঁহার কমলসরোবরের তীরে গুরুশর-অধিরাজিত যে বেজবনটা কণ্টকিত হইয়া আছে, সেটাকে আমি অত্যন্ত বেশি ডরাইতাম। কি উপারে, তীরস্থ না হইয়াও, একেবারে মাতার মধুগন্ধ পদ্মকেশরের মধ্যে মনের সাথে লুটাইয়া আসিতে পারি, সেই আমার একমাত্র চিন্তা ছিল। এইরূপে গুরুশরকে এবং নিজেকে আমি কীকি দিয়াছি। সে সকল লজ্জার কথা বিস্তারিত করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি না।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে সহজে যে

অর্থ বোঝার, তাহার দোহাই দিয়া আমি কিঞ্চিৎ উন্নতি পাইতে পারি। সেই key-book-সহায়বল্লিত মহাবিদ্যালয়ে আমি সাধারণতঃ কাকি দিই নাই। অন্ততঃ সেই বিদ্যালয়ে পড়িবার অবকাশ তোমাদের চেয়ে আমি বেশি পাইরাছি। কারণ, জ্ঞান কিছু না হউক, তোমাদের চেয়ে আমার বয়স বেশি, সে কথা তোমাদিগকে বিনা দোষার স্বীকার করিতে হইবে। বিধাতার কৃপায়, বয়সে বড় হইবার জন্য বিশেষ কোনো সাধনার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তবু বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চেয়ে চল্লিশ উত্তীর্ণ হইতে কম-চতুর্ধের জল ফেলিতে হয় না এবং ইচ্ছা করি আর না করি, শিক্ষা বর্ধে লাভ করিতে হয়। সেই বয়ো-জ্যেষ্ঠতার স্পর্ধায় আমি নববিদ্যালয়ের গৌরবে দীপ্যমান তোমাদিগকে সম্ভাষণ করিতে সাহসী হইরাছি।

এখন আর একটা কথা, ছাত্রদের সহিত বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের যোগ কোথায়?—যোগ আছে। সেই যোগ অল্পতব করা ও ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলাই অধ্যাকার এই সভার একটি উদ্দেশ্য।

তোমরা সকলেই জান, আকাশে যে ছায়াপথ দেখা যায়, তাহার স্থানে স্থানে ডেল পুঞ্জীভূত হইয়া নক্ষত্র-আকার ধারণ করিতেছে এক অপর অংশে জ্যোতির্বাণ অসংহতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে—কিন্তু অসংহত অসংহত সমস্তটা লইয়াই এই ছায়াপথ। আমাদের বাংলাদেশেও যে জ্যোতির্ঘর আরম্ভ ছায়াপথ রচিত হইরাছে, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎকে তাহারই একটি কেন্দ্রবিন্দু

সংহত অংশ বলা বাইতে পারে, ছাত্রমণ্ডলী তাহার চতুর্দিকে জ্যোতির্বাণের মত বিকীর্ণ অবস্থায় আছে। এই ঘন অংশের সঙ্গে বিকীর্ণ অংশের যখন জাতিগত ঐক্য আছে, তখন সে ঐক্য সচেতনভাবে অনুভব করা চাই, তখন এই হই আত্মীয় অংশের মধ্যে আদানপ্রদানের যোগস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক।

যে ঐক্যের কথা আজ আমি বলিতেছি, পঞ্চাশবছর পূর্বে তাহা সুখে আনিবার জো ছিল না। তখন ইংরেজশিক্ষামতে উন্মত্ত ছাত্রগণ মাতৃভাষার দৈন্তকে পরিহাস করিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং উপবাসী দেশীয়সাহিত্যকে একমুষ্টি অন্ন না দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

আমাদের বাল্যকালেও দেশের সাহিত্য-সমাজ ও দেশের শিক্ষিতসমাজের মাঝখান-কার ব্যবধানের দীর্ঘ অনেকটা স্পষ্ট ছিল। তখনো ইংরেজিচিন্তা ও ইংরেজিবক্তার খ্যাতিলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছাত্রদের মনে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। এমন কি, বাহার বাংলাসাহিত্যের প্রতি কুপাদৃষ্টিপাত করিতেন, তাহার ইংরেজিমাচার উপরে চড়ির ভাবে সেটুকু প্রশ্নের বিতরণ করিতে পারিতেন। সেইজন্য তখনকার দিনে মধুসূদনকে মধুসূদন, হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্র, বঙ্কিমকে বঙ্কিম জানিয়া অস্বীকার তৃপ্তি ছিল না, তখন কেহ বা বাংলার মিলটন, কেহ বা বাংলার বার্নস, কেহ বা বাংলার হুই বলিয়া পরিচিত ছিলেন,—এমন কি, বাংলার অভিনেতাকে সম্মানিত করিতে হইলে তাঁহাকে বাংলার গ্যাব্রিক বুলিলে

আমাদের আশ মিটিত, অথচ পারিষেকের সহিত কাহারো সাদৃশ্যনির্ণয় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না ; কারণ, গ্যারিক্ বখন নট-লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, তখন আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় সাজ্যের দলের মধ্যে জন্মান্তর বাপন করিতেছিল ।

কিন্তু প্রথম অবস্থার চেয়ে এই দ্বিতীয় অবস্থাটা আমাদের পক্ষে আশাজনক । কারণ, বাংলায় বার বৃন্দ-স্বচকের সুদূর সাদৃশ্য যে মিলিতে পারে, একথা ইংরেজি-ওরালার পক্ষে স্বীকার করা তখনকার দিনের একটা সুলক্ষণ বলিতে হইবে । *

এখনকার তৃতীয় অবস্থার ঐ ইংরেজি-উপাধিগুলার কুরাশা কাটিয়া-গিয়া বাংলা-সাহিত্য আর কাহারো সহিত তুলনার আশ্রয় না লইয়া নিজস্বত্বিতে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিতেছে । আমাদের সাহিত্যের প্রতি দেশের লোকের বর্থাৎ সম্মান ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে ।

ইহার কারণ, বাংলাসাহিত্য ক্রমশ আপনায় মধ্যে একটা স্বাধীনতার ভেজি অনুভব করিতেছে । ইহাতে প্রমাণ হয়, আমাদের মনটা ইংরেজি গুরুদশারের অপরিমিত শাসন হইতে অল্পে অল্পে মুক্ত হইয়া আসিতেছে । একদিন গেছে, বখন আমাদের শিক্ষিতলোকেরা ইংরেজিপুঁথির প্রত্যেক বঁধাই বেদবাক্য বলিয়া জ্ঞান করিত । ইংরেজিপ্রভুতা এতদূর পর্যন্ত সাংখ্যাতিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইংরেজি ক্রিয়বিধানের সহিত কোনোপ্রকারে মিলাইতে না পারিয়া আমাইবকী কিরাইয়া দিয়াছে এবং আমোদ করিয়া বাক্যের গারে আবির্-

লেননকে চরিত্রের একটা চিরস্থায়ী কলঙ্ক বলিয়া গণ্য করিয়াছে,—এত-বড় শিক্ষিত-মুখতার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি ।

এরোগের সমস্ত উপসর্গ যে একেবারে কাটিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে । আজকাল আমরা ইংরেজি ছাপাখানার দ্বারে ধরা না দিয়া নিজে স্বদ্বার্ন করিতে, নিজে বাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমন কি, পুঁথির প্রতিবাদ করিতেও সাহস হয় ।

* নিজের মধ্যে এই যে একটা স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি, যে অনুভূতি না থাকিলে শক্তির যথার্থ ক্ষুতি হইতে পারিত, ইহা কোনো-একটা দিকে আরম্ভ হইলে ক্রমে সকলদিকেই আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে । ধর্ম, কর্ম, সমাজে, সর্বত্র আমরা ইহার পরিচয় পাইতেছি । কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশের শাস্ত্র এবং শাসন সমস্তই আমরা খুঁটান পাদুরির চোখে দেখিতাম—পাদুরির কষ্টি-পাথরে কোন্টাতে কিরকম দাগ পড়িতেছে, ইহাই আলোচনা করিয়া দেশের সমস্ত জিনিষকে বিচার করিতে হইত ।

প্রথম-প্রথম সে বিচারে দেশের কোনো জিনিষেরই মূল্য ছিল না । তার পরে মাঝে আর একটু ভাল লক্ষণ দেখা দিল । তখন আমরা বলিতি গুরুকে বলিতে লাগিলাম, তোমাদের দেশে বা-কিছু গৌরবের বিষয় আছে, আমাদের দেশেও তা সমস্তই ছিল ;—আমাদের দেশে রেলগাড়ি এবং বেলুন ছিল, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে এবং এবিরা জানিতেন স্বর্বাংলোকে গাছপালা অস্ত্রিজেন-নিবাস পরিভাষা করে, সেইজন্যই প্রাচ্য-

কালে পুজার পুস্পচরনের বিধান হইরাছে। এ কথা বলিবার সাহস ছিল না যে, রেলগাড়ি-বেলুন না থাকিলেও গৌরবের কারণ থাকিতে পারে এবং কীকি দিয়া অগ্নিভেদন-গ্রহণ করানোর চেয়ে নির্মল প্রত্নতত্ত্ব সর্বকর্ম্মারম্ভে স্মরণভাবে দেবতার সেবার লোকের মনকে নিযুক্ত করিবার মাহাত্ম্য অধিক।

এখনো এ ভাবটা আমরা যে সম্পূর্ণ ভাগ করিতে পারিয়াছি, তা নয়। এ কথা এখনো সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই যে, পাদ্রির কষ্টি-পাথরে বাহা উজ্জল দাগ দেয়, তাহা মূল্যবান হইতে পারে, কিন্তু জগতে সোনাই ত একমাত্র মূল্যবান পদার্থ নয়;—পাথরে কিছুমাত্র দাগ টানে না, এমন মূল্যবান জিনিষও জগতে আছে। বাহা হউক, বন্ধন শিথিল হইতেছে। আজকাল অল্প অল্প করিয়া এ কথা বলিতে আমরা সাহস করিতেছি যে, পাদ্রির বিচারে বাহা নিম্ননীর, বিলাতের বিধানে বাহা গর্হিত, আমাদের দিক্ হইতে তাহার পক্ষে বলিবার কথা অনেক আছে।

আমরা বাহাকে পলিটিক্স বলি, তাহার মধ্যেও এই ভাবটা দেখিতে পাই। প্রথমে বাহা সাধারণ প্রসাদভিক্ষা ছিল, দ্বিতীয় অবস্থাতে তাহার বুলি খসে নাই, কিন্তু তাহার বুলি অন্তরকম হইয়া গেছে—ভিক্ষু-কর্তা বতদূর পর্য্যন্ত উচ্চতম স্পর্ধার আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা করিয়াছে। আমাদের আধুনিক আন্দোলনগুলিকে আমরা বিলাতী রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুরূপ মনে করিয়া উৎসাহবোধ করিতেছি।

তৃতীয় অবস্থায় আমরা ইহার উপরের ধাপে উঠিবার চেষ্টা করিতেছি। এ কথা

বলিতে স্মরণ করিয়াছি যে, হাতজোড় করিয়াই ভিক্ষা করি, আর চোখ রাঙাইয়াই ভিক্ষা করি, এত সহজ উপায়ে গৌরবলাভ করা যায় না—দেশের জন্ত স্বাধীনশক্তিতে বতদূর কাজ নিজে করিতে পারি, তাহাতে দুইদিকে লাভ—এক ত ফললাভ, দ্বিতীয়ত নিজে কাজ করাটাই একটা লাভ, দেশের ফললাভের চেয়ে বেশি বই কম নয়—সেই গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমাদের দেশের গুরু বলিয়াছেন, ফলের প্রতি আসক্তি না রাখিয়া কর্ম্ম করিবে। ভিক্ষার অপৌরব এই যে, ফললাভ হইলেও নিজের শক্তি নিজে খাটাইবার যে সাধকতা, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

বাহাই হউক, ইহা দেখা বাইতেছে যে, সকল দিক্ দিয়াই আমরা নিজের স্বাধীন-শক্তির গৌরব অমুত্তব করিবার একটা উদ্যম অন্তরের মধ্যে অমুত্তব করিতেছি—সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পলিটিক্স পর্য্যন্ত কোথাও ইহার বিচ্ছেদ নাই।

ইহার একটা ফল এই দেখিতেছি, পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে প্রাচীন-নবীন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ, ছাত্র ও সংসারীর মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছিল, এখন তাহার উল্টা কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এখন আবার আমরা নিজেদের একান্ত্র সন্ধান করিয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছি। মধ্যকালের এই বিচ্ছিন্ন-তাই পরিণামের মিলনকে বধাধরাভাবে সম্পূর্ণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মিলনের আকর্ষণেই আজ বঙ্গভাষা-বঙ্গসাহিত্য আমাদের ইংরেজিবিদ্যাবিদ্যা-

লয়ের ছাত্রদিগকেও স্থাপন করিয়াছে। একদিন যেখানে বিপ্লবের হৃৎকোষ দুর্গ ছিল, সেখান হইতেও বঙ্গের বিজয়িনী বাণী স্বেচ্ছা-সমাপ্ত সেবকদের অর্ঘ্যলাভ করিতেছেন।

পূর্বে এমন দিন ছিল, যখন এই ইংরেজি-পাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ী আসিতাম, সেখানেও পাঠশালা পঞ্চাং পঞ্চাং চলিয়া আসিত। বন্ধকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজিকাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি-বক্তৃতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হউক, ক্রমে ক্রমে ছুটি পাইয়া থাকি, তখন সেই ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়? মাতার অন্তঃপুরে নহে কি? দিনের পড়া ত শেষ হইল, তার পরে ক্রিকেটখেলাতেও না হয় রণজিৎ হইয়া উঠিলাম। তার পরে? তার পরে গৃহবাতায়ন হইতে মাতার সহস্রআলিত সন্ধ্যাদীপুটি কি চোখে পড়িবে না? যদি পড়ে, তবে কি অবকা করিয়া বলিব, ওটা মাটির প্রদীপ? ঐ মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গৌরব নাই? যদি মাটির প্রদীপই হয় ত সে দোষ কার? মাতার কক্ষে সৈন্যের প্রদীপ গড়িয়া দিতে কে বাধা দিয়াছে? যেমনি হোক না কেন, মাটিই হউক আর সোনাই হউক, যখন আনন্দের দিন আসিবে, তখন এখানেই আমাদের উৎসব; আর যখন দুঃখের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তখন রাজপথে টাঙাইয়া চোখের জল ফেলা যায় না, তখন ঐ গৃহে ছাড়া আর গতি নাই।

আজ এখানে আমরা সেই পাঠশালার কেন্দ্র আসিয়াছি। আজ সাহিত্যপরিষদ আমাদেরকে যেখানে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা কলেজক্লাস হইতে হুয়ে, তাহা ক্রিকেটময়দানেরও সীমান্তরে, সেখানে আমাদের বরিত জনমীর সন্ধ্যাবেলাকার মাটির প্রদীপটিই জ্বলিতেছে। সেখানে আরোজন খুব বেশি নাই—কিন্তু তোমরা এক সময়ে তাঁহার কাছে শ্রান্তদেহে কিরিয়া আসিবে বলিয়া সমস্তদিন যিনি পথ তাকাইয়া বসিয়া আছেন, আরোজনে কি তাঁহার গৌরব প্রমাণ হইবে? তিনি এইমাত্র জানেন যে, তোমরাই তাঁহার একমাত্র গৌরব এবং আমরা জানি, তোমাদের একমাত্র গৌরব তাঁহার চরণের ধূলি, ভিক্ষালব্ধ রাজপ্রসাদ নহে।

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার বর্ধাৎ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে—সেইজন্যই বঙ্গবাণীর হইয়া বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

যে ব্যাপারের মধ্যে উদ্বেগের সহিত নিবিষ্ট থাকিতে হয়, সেটা উপস্থিতমত মানুষের কাছে অত্যন্ত বেশি বড় না হইয়া থাকিতে পারে না। যবে যদি বিবাহ থাকে, তবে পৃথিবীর সমস্ত বৃহৎ ব্যাপার তাহার কাছে ছায়ার মত হইয়া যায়। তেমনি পরীক্ষা দিবার কাণ্ডটি ছাত্রদের পক্ষে ক্রবজাপানের যুদ্ধের চেয়ে গুরুতর।

কিন্তু কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে, তাহার মহৎ একেবারে জ্বলিলে চলিবে

না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগস্থাপন করিতে হইবে।

অল্প দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ—সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত ঝোঁপাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। যেরূপ দেখা বাইতেছে, বিভাগশিক্ষা কালক্রমে কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়া এই প্রভেদকে বাড়াইয়া তুলিবে।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এই হইয়াছে, কি করিলে বিদেশী-চালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষার নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাকার্য্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা বাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনো-মতে পুঁথির গণ্ডির বাহিরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা, নানা বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি বেধানে প্রত্যাহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে, বাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা ই বেধানে শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায়, তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উত্তম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিজ্ঞানের অসহ জলুন থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায়,

তাহারই মধ্যে একান্তভাবে বন্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্য আমি বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎকে অনুরোধ করিতেছি—আমার অমুনর, বাঙালী ছাত্রদের জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব একটা স্বাধীনশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিন—যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিৎপরিমাণেও নিজের শক্তি-প্রয়োগ ও বুদ্ধির কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া চিন্ত-বৃত্তিকে ক্ষুণ্ণিত করিতে পারিবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষা-তত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি বাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের অমুনরুদান ও অঙ্গলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজিবিজ্ঞান-লয়ের পাঠ্যপুস্তক, বাহা ইংরেজিছেলেনের জন্য সুরচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি; ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিষ আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে ত্রাস করিতেছি, তথাপি স্বদেশ

আমাদের জানের কাছে সর্বাধিক ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

এইরূপে বহুদিককে সুখ্যাতিতে, সম্পূর্ণভাবে আমাদের জানের আরম্ভ না করিবার একটা ঘোষ এই যে, যদ্যপক্ষে সেবা করিবার ক্ষমতা আমরা কেহ বখাৰ্ণভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিবৃত্ত হইতে দৃষ্ট, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জানের চৰ্চ্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। বাহ্য পরিচিত, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে, বখাৰ্ণভাবে আরম্ভ করিতে শিখিলে, তবে বাহ্য অপ্রত্যক্ষ, বাহ্য অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

আমাদের বিদেশী গুরুত্ব প্রায়ই আমরা বিগত খোঁটা দিয়া বলেন যে, এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থবিজ্ঞা সংগ্রহ করিলে মাত্র।

যদি তাঁহাদের এ অপবাদ সত্য হয়, তবে ইহার প্রধান কারণ এই, বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে, তাহা আমাদের দৃষ্টগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জন-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, বাহার নানা লক্ষণ, নানা স্বতি

আমাদের ঘরে-বাহিরে নানান্যানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কি জিনিষ, তাহার উজ্জল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাবাত্তর মুগ্ধ করিয়া পরীক্ষার উচ্চস্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রবেশে প্রবেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাব্যরহস্য আমাদের কাছে লুপ্ত হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অহুসন্ধানপূর্বক, অতিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন, দুর্দেশের ধর্ম ও সমাজসম্বন্ধীয় বই পড়িয়ামাত্র কখনো হইতেই পারে না।

ধারণা যখন লুপ্ত ও দুর্বল থাকে, তখন উদ্ভাবনশক্তির আশা করা যায় না। এমন কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা আবাস্তবিক অল্প আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার ভেমন করিয়া আরম্ভ করিতে পারি নাই; কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অতু-পূর্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি; ধর্ম, সমাজ, এমন কি, সাহিত্য সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বাস্তবিকতাবিহীন হইলে আমাদের

মনই বল, জ্ঞানই বল, কল্পনাই বল, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতৈষী ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিচ্ছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার নষ্ট হইতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্য বাহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তাহারা বিদেশী সাহিত্য-ইতিহাসের পুঁথিগত প্যাট্রিষ্টিজ্‌ম্ নানা প্রকার অসঙ্গত অতুলকরণের দ্বারা লাভ করিয়াছি বলিয়া কল্পনা করে। এইজন্যই, এককাল গুল, তথাপি এই প্যাট্রিষ্টিজ্‌ম্ আমাদের কাছে বর্ধাৎ কোনো ভাগস্বীকারে প্রকৃত করিতে পারিল না। যে দেশে প্যাট্রিষ্টিজ্‌ম্ অবাস্তব নহে, পুঁথিগত-অতুলকরণ-মূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে, আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না,—আমাদের দেশ যে কিরূপ, তাহা সন্ধানপূর্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অল্পভব করি না। যোশিদা-তোরাজিরো আপানের একজন বিখ্যাত প্যাট্রিষ্টি ছিলেন। তিনি তাহার প্রথমাবস্থার চাল-চিড়া বাধিয়া পারে হাঁটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। এইরূপে দেশকে তর তর করিয়া জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন—শেষ-দশায় তাহাকে দেশের কাজে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এরূপ প্যাট্রিষ্টিজ্‌ম্‌র অর্থ বুঝা যায়। দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষী প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহা

মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মত কল দিতে থাকে।

অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষ-বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নিজীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে বর্ধাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাৱশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ আপনার অ্যুলোচ্যবিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনাব্যাপারে তাহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিকে, নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অল্প সমস্ত জানিবার বর্ধাৎ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভাল করিয়া জানার চর্চা নিজের দেশকে বর্ধার্থভাবে প্রীতির চর্চার অঙ্গ।

বাংলাদেশে এমন জিলা নাই, যেখান হইতে কলিকাতার ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তাস্তসংগ্রহে ইহাদের বহিঃসাহায্যতা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্য-পরিষদ সার্বকভালাভ করিবেন। এ সাহায্য কিরূপ এবং তাহার কতদূর প্রয়োজনীয়তা, তাহার হুইএকটা চুটীতে দেওয়া বাইতে পারে।

বাংলাভাষার একখানি ব্যাকরণ-রচনা

সাহিত্যপরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণসংগ্রহ একটি হ্রস্ব ব্যাপার। বাংলা-দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বর্তমান উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই বর্ধাৎ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। বাংলার উচ্চারণবিধি এবং অপভ্রংশের কি নিয়ম অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত মূলশব্দ বাংলায় রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে সমস্ত উপভাষার মধ্যে রূপান্তরের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। বাংলা কারকচিহ্নগুলির মূল কোথায়, তাহা সহজে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বাংলা কর্মকারকে “কে” “রে” বা “এ” বিভক্তি, সন্দেহের “র” বিভক্তি কোণী হইতে আসিল, তাহা সন্ধান করিবার বিষয়। কোনো কোনো ইংরেজপণ্ডিত বলেন, এই বিভক্তিগুলি আর্যের অনার্যভাষার চিহ্ন, সংস্কৃত-ভাষার সহিত ইহাদের যোগ নাই। এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক আছে। কিন্তু এই তুর্কের মীমাংসা যে পর্যন্ত না বিদেশী পণ্ডিতেরা করিয়া দিবেন, সে পর্যন্ত কি আমরা শুক হইয়া থাকিব? বাংলার কর্মকারক ও সন্দেহের বহুবচনের রূপটি একটি সমস্যা। “দিগকে” ও “দিগের” কোথা হইতে আসিল? আমাদের বিচিত্র উপভাষার অরূপার মধ্যে এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া হইতে পারে।

যদি ঋগ্বেদপরিষদে ইচ্ছুক ছাত্র পাওয়া

যায় এবং এইপ্রকার ভাষার তথ্য সন্ধান করা, সংগ্রহ করা, শ্রেণীবিভাজন করা ও তত্ত্বনির্ণয় করার কাজে পরিষদের কোনো উপযুক্ত পণ্ডিতসভা তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া নিযুক্ত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে ছাত্রদের শিক্ষা, পরিষদের কর্তব্য-সম্পাদন ও বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, সমস্ত একসঙ্গে হইতে পারে।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃতলোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত-লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্যগতিতে নিঃশব্দ-চরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে—নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না—যেখানেই হোক না কেন, মানবসাধারণের মধ্যে বা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভাল করিয়া জানারই একটা সার্বকতা আছে,—পুঁজি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে এতদ্ব্যক পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে গুরু জানা নয়, কিন্তু জাদি-বার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ার তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিবেশনকার ছাত্রগণ

যদি বহু প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মাহুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা, তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন ।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnologyর বই যে পড়ি না, তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ত, পোদ্-বাগদি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবীর জন্ত আমাদের লেশমাত্র ঐৎসুক্য জন্মে না, তখনি বুদ্ধিতে পারি, পুঁথিসম্বন্ধে আমাদের কত-বড় একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে— পুঁথিকে আমরা কত-বড় মনে করি এবং পুঁথি বাহার প্রতিবিষ, তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি । কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনি কেতনে একবার যদি জড়ত্বাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঐৎসুক্যের সীমা থাকিবে না । আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত ধোঁজে একবার ভাল করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই । আমাদের ব্রতপার্কণগুলি বাংলার এক অংশে বেক্সপ, অল্প অংশে লেক্সপ নহে । স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে । এ হাড়া, প্রোয়াহড়া, ছেলে ভুলাইবার হড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জাতব্যবহার নিহিত আছে । বস্তুত দেশবাসীর

পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্য-পরিষদ নিজের কর্তব্যনিরূপণ করিয়াছেন ।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্তৃ-শালার সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্ত আমার অনুরোধ পরিষদ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অন্তকার এই সভায় আমি ছাত্র-গণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি । সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তরুণাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে ।

আমাদের তরুণাবস্থা বলিলে যে অভ্যস্ত সুদূরকালের কথা বোঝার, এত-বড় প্রাচীনত্বের দাবি আমি করিতে পারি না—কিন্তু আমাদের তখনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনের এমন একটা পরিবর্তন দেখিতে পাই যে, সেই অদূরবর্তী সময়কে যেন একটা যুগান্তর বলিয়া মনে হয় । এই পরিবর্তনটা বয়সের দোষে আমি দেখিতেছি অথবা এই পরিবর্তনটা সত্যই ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয় । একটু বয়স বেশি হইলেই প্রাচীন-তর লোকেরা তাঁহাদের সেকালের সঙ্গে তুলনা করিয়া একালকে ধোঁটা দিতে বসেন—তাহার একটা কারণ, সেকাল তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল এবং একালটা তাঁহাদের হিসাব বুঝিবার দিন । তাঁহারা ভুলিয়া যান, একালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চস্মাচোখে হিসাব মিটাইতে বসে নাই । অতএব আমাদের সেদিনকার কালের সঙ্গে অন্তকার কালের যে এতদটা আমি দেখিতেছি, তাহা বথার্থ কি না, তাহার বিচারক একা আমি

নহি, তোমাদিগকেও তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সত্যমিথ্যা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু মনে হয়, এখনকার ছেলেদের চেয়ে তখন আমরা অনেক বেশি ছেলেমানুষ ছিলাম। সেটা ভাল কি মন্দ, তাহার দুই পক্ষেই বলিবার কথা আছে—কিন্তু ছেলেমানুষ থাকিবার একটা গুণ এই ছিল যে, আমাদের আশার অন্ত ছিল না, ভবিষ্যতের দিকে কি চোখে যে চাহিতাম, কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা এমন-সকল সভা করিয়াছিলাম, এমন-সকল দল বাধিয়াছিলাম, এমন সকল সঙ্কল্প বদ্ধ হইয়াছিলাম, বাহা এখনকার দিনে তোমরা শুনিতে নিশ্চয় হস্তসংবরণ করিতে পারিবে না—এবং আমাদের সাহিত্যে কোনো কোনো স্থলে আমাদের সেদিনকার চিত্র হাস্যরসরঞ্জিত ভুলিকার চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সব কথা যদি খুলিয়া বলি, তবে তোমরা এই মনে করিয়া বিস্মিত হইবে যে, আমাদের সেকালে আমরা,—বালকরা,—সকলেই যে একবয়সী ছিলাম, তাহা নহে, আমাদের মধ্যে পক্ষেপের অভাব ছিল না এবং তাহাদের আশা ও উৎসাহ আমাদের চেয়ে যে কিছুমাত্র অল্প ছিল, তাহাও বলিতে পারি না। তখন আমরা নবীন-প্রবীণে মিলিয়া ভয়-লজ্জা-নৈরাশ কেমন নিঃশেষে বিসর্জন দিয়াছিলাম, তাহা আজও ভুলিতে পারি না।

সেদিনের চেয়ে নিঃসন্দেহই আজ আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু আজ

আকাশে আশার আলোক বেন দান এবং পৃথিবীর হস্তে আনন্দের পাথর বেন অগ্রচুর।

কেন এমনটা ঘটিল, তাহার জবাবদিহি এখনকার কালের নহে। আমাদিগকেই তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। যে আশার সম্বল লইয়া বাত্মা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা পথের মধ্যে কোন্‌খানে উড়াইয়া-পুড়াইয়া দিয়া আজ এমন রিক্ত হইয়া বসিয়া আছি ?

অপরিমিত আশা-উৎসাহ আমাদের অল্পবয়সের প্রথম সম্বল; কর্মের পথে যাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাতৃ-মাতা এইটে আমাদের অকল্যাণে রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থ যেমন খাতি নহে, তাহা ভাঙাইয়া তবে থাইতে হয়, তেমনি আশা-উৎসাহ-মাত্র আমাদিগকে সার্থক করে না, তাহাকে বিশেষ কাজে খাটাইয়া তবে ফললাভ করি। সে কথা ভুলিয়া আমরা বরাবর ঐ আশা-উৎসাহেই পেঁট ভরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

শিশুরা শুইয়া শুইয়াই হাতপা ছুঁড়িতে থাকে,—তাহাদের সেই শরীরসঞ্চালনের কোনো লক্ষ্য নাই। প্রথমাবস্থায় শক্তির এইরূপ অনির্দিষ্ট বিক্ষেপের একটা অর্থ আছে—কিন্তু সেই অকারণ হাত-পা-ছোঁড়া ক্রমে যদি তাহাকে সকারণ চেষ্টার জন্ত প্ররোচিত করিয়া না তোলে, তবে তাহা ব্যর্থ বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদেরও অল্পবয়সের উত্তমগুলি প্রথমে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই বিকশিতভাবে, উদ্যমভাবে চারিদিকে সঞ্চালিত হইতেছিল

—তখনকার পক্ষে তাহা অসম্ভব ছিল না, তাহা বিজ্ঞপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমেই বখন দিন বাইতে লাগিল, এবং আমরা কেবল পড়িয়া-পড়িয়া অঙ্গসকালন করিতে লাগিলাম, কিন্তু চলিতে লাগিলাম না, শরীরের আক্ষেপবিক্ষেপকেই অগ্রসর হইবার উপায় বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, তখন আর আনন্দের কারণ রহিল না—এবং এক সময়ে বাহা আবৃত্তক ছিল, অল্প সময়ের পক্ষে তাহাই হৃদয়স্থার বিষয় হইয়া উঠিল।

আমাদের প্রথমবরসে ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন, তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই—লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বার বারের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবাল্ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং প্যাট্রি-রটিজমের ভাবরসসম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মস্ত যেরূপ খাত্তের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশ-হিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড় হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ, তাহার ভাষাকে বিশ্বস্ত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখদুঃখকে নিজের জীবনবাজা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত দেশবাসী লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীর রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম—এমন অব-

স্থাতেও, এমন কাঁকি দিয়াও, কললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ব-বিধাতার চোখে ধূলা দিবার আরোজন করিতে হয়।

“আইডিয়া” বত বড়ই চৌক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমা-বদ্ধ জায়গার প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা হুদ হুদক, দীন হুদক, তাহাকে লজ্জন করিলে চলিবে না। দূরত্ব নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে, হিমালয়ের হর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবল করুণমুখে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লিতেই পক্ষশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্রীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্ত-স্বাপন শূত্রভীণ্ডারের দিকে হতাশ-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিষ্ণুমিজের ঔষোবনে শুমীকুম্বুলে আলবালে জলসেচন করিয়া, বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে কর-জোড়ে প্রণাম করিতেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজিবিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরাগিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যস্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্ত অর্দ্ধাশনে পরের পাকশালে রাখিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে ত অবন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

বাহাই হৌক, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মত বাহির হইলাম, ভিত্তারীর মত পরের

ঘরে ঝাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ার বসিয়া সেভিস্ব্যাকের খাতা খুলিলাম। কারণ, যে ভারতমাতা, যে ভারতলক্ষ্মী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধনুবাণে রচিত, বাহা পরাঙ্গমরণের সুগন্ধিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারটুকু যে চের বেশি প্রত্যক্ষ,—নিজের কঠরগহ্বরটা যে চের বেশি সুনির্দিষ্ট—এবং ভারতমাতার অশ্রুধারা বিখিটধাঙ্গরাগিণীতে যতই স্নর্গভেরী হউক না, ডেপুটিগিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণধারামধুর বেতনটি মিলে, তাহাতে সম্পূর্ণ সাহুনা-পাওয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত। এমনি করিয়া যে মানুষ একদিন উদারভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে, সে যখন সেই ভাবপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষবস্তুর প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মস্তরী বার্ষণর হইয়া বার্ষভাবে দিনশেষ করে—একদিন যে ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণ সমস্তই হঠাৎ দিরাফেলিবার অন্ত প্রস্তুত হয়, সে যখন দান করিবার কোনো লক্ষ্যনির্ণয় করিতে পারে না, কেবল সঙ্কল্প করিবার বিলাসভোগেই আপনাকে পুরিতৃপ্ত করে, সে একদিন এমন কঠিনজদয় হইয়া উঠে যে, উপবাসী স্বদেশকে যদি সুস্থূরপথে দেখে, তবে টাকা ভাঙাইয়া শিকিটি বাহির করিবার ভয়ে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, শুদ্ধমাত্র ভাব যত বড়ই হোক, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষবস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবেই।

• এইজন্যই বলিতেছিলাম, বাহা আমরা পুঁথি হইতে পড়িয়া পাইরাছি, বাহাকে আমরা ভাবসম্ভোগ বা অহংকারভৃষ্ণির উপার-

বরণ করিয়া রসালনমুখের মধ্যে উপস্থিত হইরাছি ও ক্রমে অবসাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রত্যক্ষতার সৃষ্টি, বাস্তবিকতার গুরুত্ব দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। শুধু বড়জিনিষ করনা করিলেও হইবে না, বড়দান তিকা করিলেও হইবে না এবং ছোট মুখে বড় কথা বলিলেও হইবে না, ধানের পার্শ্বে নিতান্ত ছোট কাণ স্নরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চা হইবে—সেই শক্তির, চর্চামাজেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাজেই আনন্দ।

আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অব্যবহিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ যে কি, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও ত ভ্রমাবৃত অগ্নিকণার মত পক্ষ-কেশের নীচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই স্মৃতির বশে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ-আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনের যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে, তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম, সেই তীক্ষ্ণ, সেই প্রত্যাহ্ব্যরশ্মি-নির্মিত তত্ত্বর তার উজ্জল তন্ত্রীতলিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই।—উদারউদ্দেশ্যের প্রতি নির্বিকারে আত্মবিসর্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে, তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা সূত্র-

বাধার দ্বারা বাধাবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হইয়া নাহি ; আমি জানি, বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অগ্নির দ্বারা তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে—নিজের ব্যবসায়ের সঙ্গী-বর্তা ও স্বার্থসাধনের চেষ্টা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাহি ; দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে, সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রক্তনীর বিন্দু প্রবাহ ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ করে ;—আমি জানি, ইতিহাসবিদ্রুত যে সকল মহাপুরুষ দেশ-হিতের জন্ত, লোকহিতের জন্ত আপনাকে উৎসর্গ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ও দুঃখক্লেশকে অমরমহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া গেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে, তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিবরীর মত বিজ্ঞপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না—তোমাদের সেই অনাঘাত পুষ্প, অথবা পুণ্যের দ্বারা নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি—ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কষ্টের পথে । কর্মশালায় প্রবেশদ্বার অতি ক্ষুদ্র, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের দ্বারা ইহা অত্ৰভেদী নহে—কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে—গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্ত দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, জীবনের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আসিতে হয় ;—এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে,

কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নতব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন, সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট । তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এ পর্যন্ত কেহও সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া নাই ;—দেশ যখন বিলাতি পিনাক বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল, তখন তোমরা পশ্চাৎপদ হও নাই—প্রাচীন শ্লোকে যে স্থানটাকে অশানের ঠিক পূর্বেই বসাইয়াছেন, সেই রাজদ্বারে তোমরা যাত্রা করিয়া আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছ—আর আজ সাহিত্য-পরিষদ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন, তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে—সে আহ্বান দেশের “উৎসবে বাসনে চৈব,” কিন্তু “রাজদ্বারে অশানে চ” নয় বলিয়াই কি তোমাদের উৎসাহ হইবে না ?—সাহিত্যপরিষদে আমরা দেশকে জানিবার জন্ত প্রবৃত্ত হইয়াছি—দেশের কাব্য, গানে, ছন্দ, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্র, গ্রাম্য পার্কণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কুবিদ্যুতের পরি-বদ্য যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্ত উন্মত্ত হইয়াছেন, সেখানে বিদেশী লোকে কোনোদিন বিশ্বদৃষ্টিপাত করে না, সেখানে হইতে সংবাদপত্রবাহনখ্যাতি সমুদ্রপারে জয়যোষণা করিতে যায় না—সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই—কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিষ-মাত্রকে যদি রাজমহিবীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পার, তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবক-

দের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডারমান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেডনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্ণে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক কর। তাহা হইলে অন্তত এইটুকু বুঝিবে যে, যদি শক্তি থাকে তবে কর্ণও আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষের অভাব নাই, সেজন্য গবর্নেন্টের কোনো আইনপাসের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকারতিকার প্রত্যাশায় রুদ্ধদ্বারের কাছে অনন্তকর্মী হইয়া দিনরাত্রি বাপন করা অত্যা-বশ্যক নহে।

আমার আশঙ্কা হইতেছে, অস্তকার বক্তব্য-বিবরণসম্বন্ধে আমি ঠিক মাত্রারক্ষা করিতে পারি নাই। কথাটা শুদ্ধমাত্র এই যে, দেশীভাব্য ব্যাকরণ চর্চা কর, অভিধান সঙ্কলন কর, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্ত-রিক বিবরণ সংগ্রহ কর। এই সামান্য প্রস্তাবের অবতারণার জন্য এমন করিয়া উচ্চ-ভাবে মোহাই দিয়া দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা কিছু যেন অসঙ্গত হইয়াছে। হইয়াছে তাহা স্বীকার করি—কিন্তু কালের গতিকে এইরূপ অসঙ্গত ব্যাপার আমাদের দেশে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই আমাদের হৃদয়ঙ্গোর লক্ষণ। যদি কোনো মাতার এমন অবস্থা হয় যে, ছেলের প্রতি তাঁহার কর্তব্য কি, তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য দেশবিদেশের বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র পড়িয়া তিনি কুল-কিনারা পাইতেছেন না, তবে তাঁহাকে এই অত্যন্ত সহজ কথাটি বদ্ব করিয়া বুঝাইতে হয়—আগে দেখ তোমার ছেলেরা কোথায় আছে, কি করিতেছে, সে পাতকুয়ার পড়িল, কি আত্মপিত্ন গিলিয়া রসিল, তাহার

কথা পাইয়াছে, কি মীত করিতেছে? এ সব কথা সাধারণত বলিতেই হয় না, কিন্তু যদি হৃদৈবক্রমে বিশেষস্থলে বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে বাহুল্য করিয়াই বলিতে হয়। বর্তমানকালে আমাদের দেশে যদি বলা যায় যে, দেশের জন্য বস্তুতা কর, সত্য কর, তর্ক কর, তবে তাহা সকলে অতি সহজেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু যদি বলা হয়, দেশকে মান ও তাহার পরে সব্বশেষে বখাণাঘা দেশের সেবা কর, তবে দেখিয়াছি, অর্থ বুঝিতে লোকের বিশেষ কষ্ট হয়। এমন অব-স্থায় দেশের প্রতি কর্তব্যসম্বন্ধে ছোটো-একটা সামান্য কথা বলিতে বহিঃসামান্য বাক্যব্যয় করিয়া থাকি, তবে মার্জনা করিতে হইবে। বস্তুত সকালবেলার যদি ঘন কুয়াশা হইয়া থাকে, তবে অধীর হইয়া কল নাই এবং হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না—স্বর্ঘ্য সে কুয়াশা ভেদ করিবেনই এবং করিবামাত্র সমস্ত পরিষ্কার হইয়া বাইবে। আজ আমি অধীরভাবে অধিক আকাঙ্ক্ষা করিব না—অবিচলিত আশার সহিত, আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব, নিবিড় কুজ্জ্বলিকার মাঝে মাঝে ঐ যে বিচ্ছেদ দেখা বাইতেছে—স্বর্ঘ্য-রশ্মির ছটা খরখার কুপাণের মত আমাদের নৃষ্টির আবরণ তিনচারি জায়গায় ভেদ করি-য়াছে—আর ভয় নাই—আমাদের রাজপথ গৃহদ্বারের সম্মুখেই অনতিবিলম্বে পরিষ্কৃত-রূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে—তখন দিগ্বিদিকসম্বন্ধে দশজনে মিলিয়া দণ্ড-প্রকারের মত লইয়া ঘরে বসিয়া বাদবিত্ততা করিতে হইবে না—তখন সকলে আপন-আপন শক্তি অনুসারে আপন-আপন পথ

নির্দাচন করিয়া তর্কসভা হইতে, পুঁথির
কলকল হইতে বাহির হইয়া পড়িব—তখন
নিকটের কাছকে দূর বলিয়া মনে হইবে না
এবং অজ্ঞাবস্তক কাছকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা
করিবে না। এই শুভক্ষণ আসিবে বলিয়া
আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে—সেইজন্ত,
পরিব্রমের অন্ত্যকার আহ্বান যদি তোমাদের
অন্তরে স্থান না পায়, বাংলাদেশের ঘরের
কথা জানাকে যদি তোমরা বেশি একটা
কিছু বলিয়া না মনে কর—তবু আমি ক্ষুদ্র
হইব না এবং আমার যে মাতৃভূমি এতদিন
তাহার সন্তানগণের গৃহপ্রত্যাগমনের জন্ত

অনিবেদনদৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন,
তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিব, জননি, সমর
নিকটবর্তী হইয়াছে, ইকুলের ছুটি হইয়াছে,
সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটীর-
প্রাক্ষণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তান-
দের পদধ্বনি ঐ শুনা যাইতেছে,—এখন
বাক্যও তোমার শব্দ, আলো তোমার
প্রদীপ—তোমার প্রসারিত শীতলপাটের
উপরে আমাদের ছোটো-বড় সকল ভাইয়ের
মিলনকে তোমার অশ্রুগুণাদ আশীর্ব্বচনের
দ্বারা সার্থক করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া
থাক ।

ভট্টাচার্য্যমহাশয় ।

সিপাহীবিদ্রোহের কিছুদিন পূর্বে নব-
দ্বীপের শ্রামাদ শিরোমণি মহাশয় প্রবাস
হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। চৈত্রসংক্রান্তির
আর বড় দেরি নাই, গ্রামে গ্রামে
গাছনের উৎসববাগ্য বাজিয়া উঠিয়াছে।
পূর্ব্বরাত্রি গৌরীপুরগ্রামে কুটুম্বগৃহে বাপন
করিয়া প্রত্যুষে তিনি আবার পথ চলিতে
আরম্ভ করিয়াছেন, সঙ্গে একজনমাত্র ভার-
বাহী, খড়িনদীর ধারে পৌঁছিতে বেলা প্রহর
উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাজপুরের ঘাটের উপর ক্ষুদ্র
আশ্রয়টিকা দেখিয়া তিনি বিশ্রাম ও স্নান-
দির জন্ত উপবেশন করিলেন, নিকটে
কোথাও গ্রাম নাই; বিরলবিটপী, কদাচিৎ
স্বপকরবিশিষ্টকেন্দ্রখচিত প্রান্তর চারি-
দিকে দৃষ্টি করিতেছে। বিকশিত-চূতবৃক্ষল-

পরিমূল-লোভে দল্লো দলে সমাগত মৌমাছি-
ভ্রমরের গুঞ্জনরব ছাড়া আর কোন শব্দ
সেখানে শোনা যাইতেছিল না। কেবল
দূরে গ্রামপ্রান্তে অরুণপুষ্পিত যে দীর্ঘ
শাখালীতরুগুল আকাশ চূষন করিতেছে,
তাহাদের শাখাজরাল হইতে কখন-কখন
কুজনবৃত্ত কোকিলের অস্পষ্ট সঙ্গীতধ্বনি
ঈষৎ বায়ুহিল্লোলে প্রহত হইতেছিল।

শিরোমণিমহাশয় সাধারণত তাঁহার
কৌলিক ভট্টাচার্য্যনামে পরিচিত। বড়
বড় . পণ্ডিতবিদ্যারসভায় নিমন্ত্রণরূপ
উপলক্ষে বঙ্গদেশের সর্বত্র তাঁহার গতিবিধি।
তা ছাড়া, শিব্যসেবকও অনেকগুলি। কিন্তু
চালচলনে চিরদিন তিনি পরিব। একমাত্র
ভারবাহী সাধবদাসকে সহায় করিয়া পদব্রজে

বৎসরের মধ্যে ছয়সাতমাস বাঙলা পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন, তাহাতে ক্রেশ কি অমর্যাদা অল্পভব করিতেন না ।

মাধব পেটারি হইতে ডাবাহঁকা বাহির করিয়া তাহাতে জল পুরিল এবং একছিলিম তামাক সাজিয়া প্রভুকে সেবন করিতে দিবার পূর্বে নল প্রস্তুত করিবার উদ্দেশে একটি আত্মশাখা ভাঙিতে উত্তত হইল। শিরোমণি ইহা নিবারণ করিলেন। তদন্ত হইয়া তিনি প্রস্তুত মুকুলস্তবকের শোভা এবং তাহাতে প্রমত্ত মধুকুলের সঞ্চরণ লক্ষ্য করিতেছিলেন ।

এমন সময়ে কতকগুলি জ্বীলোক নদীর অপরাপারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের প্রায় সকলেরই কক্ষে পিত্তলকলস এবং অধিকাংশের হাতে রূপার পৈঁছা ও খাড়ু। দুইটি প্রৌঢ়া বিধবার নেত্রে অবগুষ্ঠনবতী গ্রামবধুর দল অবগাহন ও পানীয় জল সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে। ভট্টাচার্য্য-মহাশয়কে দেখিয়া সহজেই তাহারা সঙ্কুচিত হইল এবং উত্তপ্ত নদীসৈকত ভাঙিয়া দূরের ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিয়া তিনি কিছু খ্যস্ত হইলেন। মাধবদাস প্রভুর নির্দেশমত ছুটিয়া আসিল এবং বলিয়া গেল, “বাসকল, ঠাকুর ইচ্ছা করেন এইখানেই তোহরা চান্ কর, তিনি আড়ালে বাছেন।” তখন শিরোমণি পেটারি ও বজ্রাদি সেইখানে রাখিয়া মাধবদাসসঙ্গে ঘেরেঘের দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হইয়া গেলেন।

তাকাতাড়ি মান শেষ করিয়া তাহারা পূর্ণকুস্তককে খাট হইতে উঠিল, কিন্তু চলিয়া না গিয়া ঠাকুরের দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইল।

ইল। ইহা লক্ষ্য করিয়া ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন, সম্ভবত মেয়েগুলি তাঁহার জব্যাদি অরক্ষিতাবস্থায় ফেলিয়া বাইতে ইতস্তত করিতেছে। কাজেই তাঁহাকে সেখানে ফিরিতে হইল। কিন্তু তথাপি তাহারা সেই-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, অনেকে কেবল আপন-আপন অবগুষ্ঠনের মাজা কিছু বাড়াইয়া দিল। তখন তাঁহার কাছে তাহাদের অবস্থা কিছু প্রার্থনীর আছে অনুমান করিয়া শিরোমণিমহাশয় মহিলাদের সম্মুখীন হইলেন।

অপেক্ষাকৃত অন্নবয়স্কারা পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। প্রৌঢ়া দুইজন কক্ষের কলস হইতে কিছু কিছু জল মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর পূর্ণকুস্ত-দুইটি রাখিল এবং ঠাকুরকে গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তখন উভয়েই করজোড়ে প্রার্থনা করিল, আজ মধ্যাহ্নে, তাঁহাকে তাহাদের গৃহে পদধূলি দিতে হইবে।

ভট্টাচার্য্য মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণীর কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, বাসন্তী-পূজার পূর্বে গৃহে ফিরিবেন। এবার অশোকাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রস্থানে বাইবার মানসে তিনি স্বামীত প্রবাসবাডা নিবারণ করিতে চাহিয়া ছিলেন। শিরোমণিমহাশয় অন্নপূর্ণা-পূজার ব্যবস্থা করিয়া সে আদ্যার ধামাইয়া যান। অতএব পথে আর একদিনও ঘেরি করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না।

সে কথা মেয়েদের সংক্ষেপে বলিয়া শিরোমণি জুখাইলেন, তাহাদের গ্রাম কতদূর এবং কি পর্ব্বোপলক্ষে আজ নদীস্থানে আসা হইয়াছে।

উত্তরে গুনিলেন যে, রাজপুরগ্রামেই তাহাদের বাস, আর আধক্রোণ হাঁটিয়া প্রত্যহ দুইটি বেলা পানীরজলসংগ্রহার্থ এইখানে সকলকে আসিতে হয়। কেন না, গ্রামের প্রাচীন দীধিকা ফুলনমাসেই শুকাইয়া গিয়াছে, এবং দুইবৎসর হইতে এইরূপ জলকষ্ট বাইতেছে। সরিকী-বিবাদে গ্রামের ব্রাহ্মণ-জমিদারদের অবস্থাপ্রাচীন হওয়ার তাঁহার কোন প্রতীকার করিতে পারেন না, তাহাদের মেয়েছেলেরা পর্যন্ত প্রকৃতবে এখানে আসিয়া স্নানাদি করিয়া যান। রাজপুরে বরং পাঁচটা ডোবা আছে, নিকটবর্তী ক্ষুদ্র গ্রামগুলিতে তাহা নাই।

নতনয়না প্রৌঢ়াদের মুখে জলকষ্টের এই কাহিনী শুনিয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণ করুণার্জ হইলেন। সহসা চিত্ত স্থির করিয়া বলিলেন, “মাসকল, আজ তোমরা ঘরে ফিরে যাও। তোমাদের নিষঙ্গণ আমার মনে রহিল। বৈশাখের শেষে আমি তোমাদের দেখা দিব।”

মহিলারা চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্য স্নান-স্নিক শেব করিলেন, এমনসময় দূরের ঢকা-নিদ্রা ক্রমশ নিকটতর হইল। তখন গাজনের সন্ন্যাসীরা দলে দলে বেজদণ্ডহস্তে নাচিতে নাচিতে নদীতীরে আসিয়া পৌছিল। তাহাদের সকলেরই অঙ্গে জীর্ণনোচিত স্বর্ণ-মোপোন্ত অলঙ্কার এবং সকলের সমবেত কণ্ঠে “জয় শিবলজু” বন বন উচ্চারিত হইয়া দিগ্দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

সন্ন্যাসীদের দান শেব হইলে কেহ একজন ক্রতপদে আশ্রয়ভটিকার আসিল এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া শিরোমণিবংশায়ের সম্মুখে

দুইটি কচিড়ার স্থাপন করিল। জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিলেন যে, মেয়েরা বাটা পৌছিয়াই তাঁহার অস্ত্র ভক্তির এই উপহার পাঠাইয়াছে। ব্রাহ্মণ স্বয়ংবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা পড়িল।

সন্ন্যাসীদের তিনি নিকটে ডাকাইলেন। গ্রামের উপর প্রব্রু করিয়া জানিলেন যে, রাজপুরের মাঠে, গ্রামের অদূরে অথচ বাহিরে যে পরিষ্কার ভূমিখণ্ড আছে, তথায় একটি দীঘি কাটাইয়া দিলে এখানি গ্রামের লোকে জল খাইয়া বাঁচিতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে সেই ভূমিখণ্ড যাহার আখেরাজ সম্পত্তি, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসিদলে উপস্থিত ছিল। পঞ্চাশ-টাকা মূল্যে সে জমিটুকু ছাড়িয়া দিতে রাজি হইল। হিসাব করিয়া শিরোমণিবংশায় দেখিলেন, ন্যূনাধিক দেড়সহস্র মুদ্রার কার্য্যটি সম্পন্ন হইবে।

তখন সেই সমবেত সন্ন্যাসিদল হইতে পাঁচ গ্রামের পাঁচজন প্রথাম লোক নির্বাচন করিয়া তিনি একটি পঞ্চায়েৎ গঠন করিলেন। পেটারি হইতে তুলাট কাগজ ও লেখনী বাহির করিলেন, মাথব লাঙ্গারসে ফাঁটী প্রস্তুত করিয়া দিল। জমিদারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ বিনি; তাঁহার নাম জানিয়া লইয়া শিরোমণি তাঁহাকে সংক্ষেপে একখানি পত্র লিখিলেন,—তাঁহার সহায়তার পঞ্চাইত্তেরা বেন আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার মধ্যে গুফরিগাঁথন শেব করে। কেন না, সেইদিন-সতীক রাজপুরে আসিয়া তিনি উহা উৎসর্গ করিয়া বাইবেন।

পেটারির ভিতর ক্ষুদ্র কণ্ঠের বাজে

বর্ণরোপ্যমুদ্রার আর দেড়হাজার টাকাই এবার শিরোমণিমহাশয়র জমা করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, সেই অর্থে গৃহিণীর নিকট বহুদিনের ঐতিশ্রুতিরক্ষা অর্থাৎ সস্ত্রীক তীর্থদর্শন এবং ভবিষ্যতের অন্নসংস্থানের জন্য একটা ভাল জোৎ খরিদ করিবেন। কিন্তু সে কথা আর মনে টাঁই দিলেন না। গণিয়া টাকাগুলি পলাইতের প্রধান ব্যক্তির হাতে দিলেন এবং প্রয়োজন হইলে আরও সাহায্য পাঠাইতে প্রতিক্ষিত হইলেন।

লোকগুলি আশ্চর্য্য হইয়া ব্রাহ্মণের কার্য্য দেখিল। সকলে একত্রে অমুরোধ করিল, তিনি নিজে গ্রামে পদার্থ করিয়া জমিদারের হস্তে এই অর্থ দিলে ভাল হইত। কিন্তু ভট্টাচার্য্য হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিলেন;—“বাপুসকল, তোমাদের নিজের কাজ, ধর্ম্ম তেবে তোমরা করিবে। জমিদারমহাশয়কে চিঠি দিলাম—নহিলে তিনি অভিমান করিয়া তোমাদের কার্য্যে বাধা দিলেও দিতে পারেন।” সন্ন্যাসীরা পরস্পর মুক্তকণ্ঠে “শিবস্তু”র জয়বের, সহিত শিরোমণিমহাশয়ের নাম সংযোগ করিতে করিতে গাজনতলায় ফিরিয়া গেল। তখন আর দেরিমান না করিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার দানের কথা পাঁচখানি গ্রামের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল এবং আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে দেখিতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু ততক্ষণ তিনি বাঁকাপথে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন—লোকে দেখিতে না পার! সকলে বলাবলি করিল, “কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন।”

যথাসময়ে ভট্টাচার্য্যমহাশয় গৃহে উপস্থিত হইলেন। এবার গৃহিণী তীর্থদর্শনের আশার আভিসন্ন উৎসাহাবিতা ছিলেন; সেই উৎসাহের আবেগ তিনি অধিকক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই—প্রথম সাক্ষাতে কুলশাখা-জিজ্ঞাসার আদানপ্রদানের পরই গৃহিণী স্বয়ং তীর্থে বাইবার দিন স্থির করিবার আবেদন কর্তৃকর্তৃক নিকট পেশ করিলেন। কর্ত্তা তাহাজ্জ কোন উত্তর না দিয়া শুধু একটু চাপাহাসি হাসিলেন—সে হাসি যে উৎসাহনৃচক নহে, তাহা গৃহিণীর বুঝিতে বাকি রহিল না। সহসা কোথা হইতে শরভের মেঘের মত রাগ ও অজ্ঞানানের কালো ছায়া গৃহিণীর মুখচন্দ্রমা আবৃত করিয়া দিল, বুঝিয়া কর্ত্তা উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন; রামপ্রসাদী স্তরে তিনি বলিলেন—

“কাজ কিরে মোর কাণী।

ঘরে বসে দেখে বো আমি পরা পদা বারাপদী।

আমার কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশিরাশি।”

ইত্যাদি।

ইহারে সহধর্ম্মিণীর রাগ-অভিমান কমিল না, বরং বাড়িল। তখন ভট্টাচার্য্যমহাশয় অগত্যা রাজপুরের নূতন-পুষ্করিণী-খননের ও সেজন্য রিক্তহস্ততার কথা গৃহিণীকে শুনাইলেন। এ সংবাদে যেন আগুনে জল পড়িল, রাগ-রোষ সব চলিয়া গেল, ব্রাহ্মণী পরমানন্দ লাভ করিলেন, পরে যশ্কালাে যাত্রীর সঙ্গে রাজপুরে উপনীত হইয়া সেই মেয়েরের দেখা দিলেন। বৈশাখী পূর্ণিমার জলাশয় উৎসর্গ করা হইল।

ইহার তিনবৎসর পরে জমিদারমহাশয়ের নূতন বার্ষিকার চারিটি রোহিতসং

ধরাইয়া শিরোমণিমহাশয়কে উপহার দিয়া-
ছিলেন । ব্রাহ্মণ, বাহকটিকে পরিতোষ-
পূর্বক ভোজন করাইয়া মৎস্যের মূল্যস্বরূপ
কয়েকটি মুদ্রা তাহার সঙ্গে ফেরৎ পাঠাইলেন
এবং বলিয়া দিলেন, খুঁড়া পুষ্করিণীর সংস্কার-
কার্য্যে ব্যয় হইবে ।

রাজপুরগ্রামে আজও সেই পুষ্করিণী
আছে—তাহা ‘তট্টাচার্য্যাপুষ্কর’ বলিয়াই

খ্যাত । গ্রামের এবং নিকটবর্তী স্থানের
শত শত নরনারী ঘানের ও পানের জন্য
সেই জলই ব্যবহার করে । সে অঞ্চলে
আর দ্বিতীয় পুষ্করিণী নাই—কিন্তু সংস্কার-
অভাবে সে পুষ্করিণীটিরও অবস্থা শোচনীয়,
বারমাস ব্যবহারের উপযুক্ত জল থাকে না,
তবু সেদিকের লোকের ভরসা সেই ‘তট্টাচার্য্য-
পুষ্করিণী ।’

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার ।

রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ ।

গত চৈত্রমাসের বঙ্গদর্শনে ‘রঘুবংশ’ নামক
একদিকে রঘুবংশের অন্তর্ভুক্ত দিলীপের
উপাখ্যানের মূল কোথায়, এই প্রশ্ন উত্থাপিত
ও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের অন্তর্গত ঋতস্করের
উপাখ্যান উহার মূল হইতেও পারে, এইরূপ
অভ্যুমান করা হইয়াছে ।

এবন্ধের লেখক বঙ্গবর অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বে
এবন্ধসম্বন্ধে আমার মন্তব্যপ্রকাশের অব-
কাশ দিয়া আমাকে অনুগ্রহীত করিয়াছেন
ও তন্নিমিত্ত কয়েকখানি মুদ্রিত পদ্মপুরাণ
সংগ্রহ করিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন ।

বহুদিন হইতে আমার জানা ছিল, পদ্ম-
পুরাণের পাতালখণ্ডে কালিদাসের রঘুবংশের
প্রথম অংশটা অর্থাৎ প্রথম আটসর্গের বর্ণিত
বৃত্তান্তসমুদয় রহিয়াছে । আমার ধ্রুপদিতা-
ম্বের সংগৃহীত হাতে-লেখা পুরাণসমূহের

মধ্যে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড একখানি রহি-
য়াছে । ঐ পুঁথিখানি আমার ঐ বিশ্বাসের
অবলম্বন ।

এই পাতালখণ্ডের প্রায় আরম্ভেই সূর্য্য-
বংশবর্ণনা । ভগবান্ শেষ বক্তা, ঋষি বাৎ-
স্ত্রায়ন শ্রোতা । চতুর্থ অধ্যায়ে বৈবস্বত মহু
হইতে ষট্টাঙ্গ পর্য্যন্ত রাজগণের কথা । পঞ্চমে
দিল্লীপের কথার আরম্ভ ও একাদশে অজ্ঞের
স্বর্গারোহণ । পাতালখণ্ডের এই সাতটি
অধ্যায়, আর কালিদাসের রঘুবংশের প্রথম
আটসর্গ,—এই দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য-এত
অধিক যে, একে অজ্ঞের নিকট ঋণী, তাহার
কোন সংশয় থাকে না ।

নমুনাস্বরূপ গোটাকতক শ্লোক এখন
এখান হইতে তুলিয়া দেখাইব । পাতাল-
খণ্ডের শ্লোক তুলিব—রঘুবংশ হইতে তুলি-
বার প্রয়োজন নাই ।

দিলীপস্ত মহাভাগঃ সর্বদগুণভূষিতঃ ।
মহোরকা মহাপ্রাণো মহাকর্কো মহাভূজঃ ॥

* * *
কভাং বগধরাজস্ত নারী বিপ্র হৃদক্ষিপাম্ ।
উপবেশে মহাশীলাং পতিব্রতপরারণাম্ ॥

* * *
দম্পতী রথমাহার বৃদ্ধসারথিসংহিতাম্ ।
বশিষ্ঠতান্ত্রমং প্রাপ সারং শিষ্যগণৈর্গুতাম্ ॥
* * *
স্বকাসক্তসম্বন্ধিতৈঃ প্রত্যাগাভিবান্ধরাং ।
শিথৈঃ প্রপূজ্যমানঞ্চ ফারং সক্ষ্যার্থিত্ত্বিতাম্ ॥

* * *
মুনিকঙ্কাগণৈঃ সিধ্য তরুশূন্যনি সর্বতঃ ।
বিশ্রামার্থং নিবন্ধৈশ্চ পরিহৃতঃ পরিশোভিতাম্ ॥
* * *

এবা ব্রহ্মঃস্তব বধূর্ভাধ্যা মম হৃদক্ষিপা ।
ন ধারয়তি যদগর্ভং তেন দুঃখং * * *
* * *
মন্তোহধ ছলভঃ পিণ্ডঃ পূর্বেবাং পরমেব হি ।
বংশবিচ্ছেদকর্ত্তাহং পিতৃণাং দুঃখকারণম্ ॥

* * *
অখামুং বোধরামাস সন্ততিস্তুভ্জকারণম্ ॥
* * *
হৃদক্ষিপামৃতুয়াতাং শূদ্রা ভাতহৃদাধিকঃ ।
বিলোকিতঃ সুরভ্যা ভং কলতর্কভূঙ্গিসংহয়া ॥
* * *
শাপস্ত ন প্রভো রাজনু ভয়া সারথিনাপি ন ।
কুজৎসু রথচক্রেণ নদৎসু দিগন্তেবুচ ॥

* * *
নান্নি কীর্ষিত এবাসো যদার্যতি স্তমঙ্গলা ।
তৎ সিদ্ধিঃ তব রাজেন্দ্র বেদ্বি হস্তগতামিব ॥
* * *

* * *
ঋশাস্ত্রানুগচ্ছেখা অমৃতিষ্ঠেরপি হিতাম্ ।
নিবরণাং নিবীদেখাঃ শিবন্ত্যাঞ্চ জলং শিবেঃ ॥
* * *

নিবর্ত্য ভূত্যবর্গঞ্চ ততো রাজা হৃদক্ষিপাম্ ।
প্রত্যাবর্ত্য স একাকী শেতুমবগমদবলী ॥

* * *
অন্তেষ্টাঃ সা বসিষ্ঠস্ত হোমধেতুমহীপতেঃ ।
ব্রতদার্য্যং পরীক্ষন্তী এবিবেশ হিমালয়ম্ ।
নন্দ্রীং হরভেদেহুর্ন প্রধূধ্যা হি হিংসকৈঃ ।
ইতি বিশ্বাসবান রাজা শোভাইমকত ভূভূতঃ ॥

* * *
অম্লহত স্বভেজোভিঃ স্বরমেব স ভূপতিঃ ।
চিত্রার্পিতাইবাতিষ্ঠচাপার্পিতকরশূদ্রা ॥
* * *
ভ্রুতোহহং দেবদেবস্ত গৌরীভর্ত্তুঃ পিনাকিনঃ ।
কুন্তোদরোহস্মি বিশ্বাতো ভবান্তাশ্চ প্রিয়ঃ সদা ॥

* * *
দেবদাকরয়ং দেব্য্য স্বয়ং যত্নৈকপার্জিতঃ ।
স্তুতেন পরসা কলপীতশেষেণ বর্জিতঃ ॥

* * *
মদীরেন শরীরেণ স্বাহারমতিবর্জয় ।
দিনাবসানকুণ্ঠিতবৎসামেনাং বিনুঞ্চ গাম্ ॥

* * *
যদিয়ং ভবতাক্রান্তা কাতরা মাং নিরীকতে ।
সাপ্রপাতং ভতঃ সিংহ হৃদয়ং দীর্ঘাতীব মে ॥
স্বাতাং জাণাং ক্ষত্রজকো বিমুখস্য ততো মম ।
কিং জীবনেন তৎ সিংহ কীর্ষিলোপান্মৃতিবরা ॥

* * *
কুপানুর্ভব তৎসং মে যশো দেহি মহন্তরম্ ।
ত্যজেনাং মচ্ছরীরেণ যুগেন্দ্র কুঙ্গ পারণাম্ ॥
* * *
পীড়া হৃদক্ষিপায়ৈতৎ পীতশেষং প্রদাত্ততি ।
ভবিষ্যতি কুমারন্তে বংশকর্ত্তা মহীপতিঃ ॥

* * *
অখাময়্য মহাত্মানং বসিষ্ঠং যমিনাং বরম্ ।
সং পুরং প্রদায়ৌ বানবাক্ষহ স্বগণৈর্ভূতঃ ॥

আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই ।
ইহাই বথেষ্ট । তৎপরে ৩য় অঙ্ক, অব-
শেষে অশ্বহারী ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ, রাজ্য-

প্রাপ্তি ও বিধিভঙ্গ (বিধিভঙ্গের সবিশেষ বর্ণনা নাই), সর্বস্বদক্ষিণ-বজ্রদমাণ্ডি, কৌৎসাগমন, অজের জন্ম, অজের বিবাহাৰ্থ যাত্রা, পণে হস্তিবধ, ইন্দুমতীস্বয়ংবর (সভাবর্ণনা নাই), রাজাদের সহিত বৃদ্ধ, রাজ্যশাসন, ইন্দুমতীর মৃত্যু ও অজবিলাপ ।

কালিদাস এছারদেই স্বীকার করিয়াছেন, তিনি পূর্বসূরীদের বর্ণনা আশ্রয় করিয়া রঘুবংশ রচনা করিয়াছেন । রামকথা ভিন্ন পূর্বকালীন বা পরকালীন রঘুবংশবর্ণনার মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না । অথচ কালিদাসের কাব্যের কোন পৌরাণিক মূল ছিল । সে মূল কোথায় ?

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে যখন অজ-বিলাপ পর্য্যন্ত সকল কথাই পাওয়া যাইতেছে, তখন বতই মনে হইবে, মূল এইখানে । কিন্তু কেবল একখানা পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া একরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না ।

পাতালখণ্ডের পুঁথি বোম্বাইয়ে, পুনায় ও কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে । কলিকাতার কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের ও বঙ্গবাসীর প্রকাশিত পাতালখণ্ড আছে । আনন্দাশ্রমের বহি দেখি নাই । অত্র তিনখানিতেই ঠিক এই অংশটিরই অভাব ।

এই সংস্করণগুলি কোন্ কোন্ পুঁথি দেখিয়া প্রকাশ করা হইল, তাহা প্রকাশকেরা লেখা আবশ্যক বোধ করেন নাই । কলিকাতার সংস্করণইখানি একরূপ । বোম্বাইয়ের সহিত ইহাদের কিছু তফাত আছে । আমার পুঁথির ১—৩ অধ্যায় কুমিকা, ৪ অধ্যায়ে বহু হইতে খট্টাজ, ৫—১১

অধ্যায়ে দিলীপ হইতে অজ, ১২—২৮ অধ্যায়ে দশরথ হইতে রামের বর্গারোহণ পর্য্যন্ত । আমার পুঁথির বাহা ২৯ অধ্যায়, বোম্বাইখন্ডের পুস্তকের ও বঙ্গবাসীর পুস্তকের তাহা প্রথম অধ্যায় । এইস্থলে রামের অশ্বমেধযজ্ঞের কথার পুনরায় সবিস্তারে আরম্ভ । এই অশ্বমেধের বর্ণনা আমার পুঁথিতে ২৯—৩৬, বোম্বাইপুস্তকে ১—৬৮ ও বঙ্গবাসীর পুস্তকে ১—৩৭ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে । কাজেই মনে হইতে পারে, আমার পুঁথিতে রঘুবংশের যে বর্ণনাটুকু আছে, অর্থাৎ উহার প্রথম ২৮ অধ্যায় প্রাক্কিপ্ত । বলা আবশ্যক, আমার পুঁথির কাগজ দেখিয়া উহার বয়স খুব অধিক বোধ হয় না । ১০০ বৎসরের কমই হইবে ।

তিন পুস্তকেই রামের অশ্বমেধবর্ণনা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে । বাৎস্তায়ন শেষকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “স্বর্গবংশের রাজাদের কথা ত শুনিলাম, তন্মধ্যে রামের অশ্বমেধের কথাও সংক্ষেপে শুনিলাম, এখন ঐ অশ্বমেধের কাহিনী সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করি ।”

ইহাতে বোধ হইতেছে, রঘুবংশের বর্ণনা কেবল আমার পুঁথির নিজস্ব নহে । উহা সম্ভবত অত্র পুস্তকেরও পূর্ববর্তী খণ্ডে অর্থাৎ স্বর্গখণ্ডে আছে । পাতালখণ্ডের পূর্ববর্তী স্বর্গখণ্ড । স্বর্গখণ্ডের পুস্তক খুঁজিবার আমার সময় হয় নাই । পাঠকেরা কেহ অনুগ্রহ করিয়া স্বর্গখণ্ডের শেষভাগে রঘুবংশবর্ণনা আছে কি না, সন্ধান দিলে বাধিত হইব ।

কল কথা, পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডের সূত্রিত

বা হস্তলিখিত পুস্তক না দেখিয়া মীমাংসা চলে না। রঘুবংশের বিবরণ আমার পুঁথিতে পাতালখণ্ডের আরম্ভে, অত্র পুস্তকে স্বর্গ-খণ্ডের শেষে থাকিলে, উহাকে পদ্মপুরাণ-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলিবার উপায় থাকে না। ধরিয়া লইলাম, উহা পদ্মপুরাণের অন্তর্গত।

আর এই বর্ণনা যদি পদ্মপুরাণের অন্তর্গত হয়, তবে কালিদাসের দিলীপকর্তৃক গোসেবা-ঘটিত উপাখ্যানের মূল সূক্তানের জন্ত ঋতস্করের উপাখ্যানের আশ্রয় লইতে হয় না। কেন না, ঋতস্করের উপাখ্যানের সহিত কালিদাসের উপাখ্যানের সাদৃশ্য বৎসানুমান্য।

এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করিতে পারিলাম। কিন্তু প্রবন্ধলেখক পদ্মপুরাণের আর এক জায়গার ঐ গোসেবার বৃত্তান্ত আমাকে দেখাইয়াছেন। বোধাইসংস্করণ ও কলিকাতার কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের সংস্করণ, উভয়জ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডমধ্যে এক জায়গায় দিলীপকৃত গোসেবার কথা বর্ণিত দেখিলাম। সেখানে সূর্য্যবংশবর্ণনা নাই, তবে পুত্রপ্রাপ্তির উপায়নির্দেশে প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে, দিলীপ নামে সূর্য্যবংশে এক রাজা ছিলেন, তিনি গোসেবা করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে দিলীপের বশিষ্ঠাশ্রমগমন, গোসেবা, মায়্য-সিংহদর্শন ও বরলাভে পুত্রোৎপত্তি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাখ্যানটুকুর ভাবার সহিতও কালিদাসের ভাবার খুব সাদৃশ্য। আমার পাতালখণ্ডের ভাবা, এই উত্তরখণ্ডের ভাবা ও কালিদাসের ভাবা, পরস্পরে এত মিল যে, একটাকে অস্তটার paraphrase বলা বাইতে পারে। বহি কেহ বলেন,

কালিদাসের রঘুবংশ সম্বন্ধে রাখিয়া কোন মহাত্মা পাতালখণ্ডে দিলীপ হইতে অত্র-বিলাপ পর্য্যন্ত বলাইয়া দিয়াছেন এবং আর কোন মহাত্মা উত্তরখণ্ডে দিলীপের গোসেবা-ঘটিত উপাখ্যানটুকু বলাইয়া দিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়।

এখন এই গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হয়, কে কাহার ভিক্টর ঋণী? কালিদাস পদ্ম-পুরাণ হইতে লইয়াছেন, বা পদ্মপুরাণ-লেখক কালিদাস হইতে লইয়াছেন? ইহার মীমাংসা আমার অসাধ্য। এ দেশের পণ্ডিতেরা দ্বিধাহীন হইয়া বলিবেন, কালিদাসই ঋণী; সাহেবীদল তেমনই নিঃসঙ্কোচে বলিবেন, পদ্মপুরাণই ঋণী।

মীমাংসা আমার অসাধ্য; তবে এ প্রশ্নে দুটা কথা বলিয়া ফেলিতেও চাই। পদ্ম-পুরাণ পাতালখণ্ডের আগাগোড়া উন্টাইয়া দেখিয়াছি। রামায়ণমধকথার পর কৃষ্ণ-কথার আরম্ভ। উহা বাঙলার ছাপা পুঁথি, বোধাইরের ছাপা পুঁথি ও আমার হাতে-লেখা পুঁথি, তিনেই রহিয়াছে। কৃষ্ণকথা-মধ্যে বৃন্দাবনমণ্ডলের যে বর্ণনা দেখিলাম, স্ত্রীরাধিকার সখীগণের যে বর্ণনা দেখিলাম, গোপীভাবে কৃষ্ণভজনার যে মহাত্ম্য দেখিলাম, তাহাতে এই বর্তমান পাতালখণ্ডে যে কালিদাসের বহুপরবর্তী, তাহাতে সংশয় করা বড়ই দুঃসাহসের কাজ। আমার অন্তঃসাহস নাই। আমি আধুনিক পদ্মপুরাণের ভাবা কালিদাসের অঙ্কুরণ স্বীকার করিতে সক্ষম আছি।

তবে কালিদাসের পূর্বেও যে পদ্মপুরাণ ছিল না, তাহা বলিতেও আমার সাহস হয়

না। পুরাণশাস্ত্র বৈদিককাল হইতেই আছে। পদ্মপুরাণও কালিদাসের বহুপূর্ব-বর্তী কাল হইতেও বর্তমান থাকাই সম্ভব ও সম্ভব। কালিদাস পৌরাণিক মূল হইতেই বহন 'রঘুবংশ' রচনা করিয়াছেন, তখন সেই আদি 'পদ্মপুরাণের' সেই অংশটুকুও আধুনিক পদ্মপুরাণে পরিত্যক্ত হয় নাই,

তাহাই বা কিরূপে বলিব? বর্তমান পদ্মপুরাণের কৃষ্ণকথা বা অস্তান্ত অংশ অর্কাতীন হইয়াও স্বর্যবংশকথাটুকু প্রাচীন হইতে পারে। এ সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে আমি অক্ষম। এই অক্ষমতা স্বীকার করিয়া আমার এই নিতান্ত অনধিকার-চর্চার উপসংহার করিলাম।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

রঘুবংশ ।

মূলপ্রবন্ধলেখকের বক্তব্য ।

আমার প্রবন্ধটি খসড়া-অবস্থায় কয়েকজন বন্ধুকে দেখাইয়াছিলাম। তাঁহারা কলেজে সংস্কৃতসাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। তাঁহারা কেহ কেহ বলিলেন—“দিলীপ ও সুদক্ষিণার গোসেবা ও পুত্রলাভের বৃত্তান্ত পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে আছে। সেই বৃত্তান্তের সহিত রঘুবংশের প্রথম দুই সর্গে বর্ণিত বিষয়ের বিলক্ষণ ঐক্য দেখা যায়। একটি যে অপরটি হইতে লওয়া, ইহা নিঃসন্দেহ। পক্ষান্তরে, ষষ্ঠস্তকের বৃত্তান্তের সহিত রঘুবংশের সপ্তম অস্তান্ত হয়।” ইহার পরে পদ্মপুরাণ উত্তর-খণ্ড তাঁহাদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া ঐ গ্রন্থ ও আমার অবলম্বিত ‘পদ্মপুরাণ — পাতালখণ্ড’ এবং আমার প্রবন্ধটি পরস্পর-প্রত্যক্ষাভিনয় সুপণ্ডিত সুলেখক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট আরও একটা নূতন কথা পাইলাম—রঘুবংশের

প্রথম আটসর্গে বর্ণিত সমস্ত বৃত্তান্তই অর্থাৎ দিলীপ হইতে অজ পর্যন্ত স্বর্যবংশীয় রাজ-গণের বৃত্তান্ত তাঁহার বাটীতে রক্ষিত একখানি ‘পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ড’ পুঁথিতে আছে। এবং সেই পৌরাণিক বিবরণের সহিত রঘুবংশের কয়েক সর্গের আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার সমালোচনার ফল পাঠকবর্গ উপরিশ্রুতি-প্রবন্ধাকারে পাইয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর নিজে সাহিত্যক্ষেত্রে নানা-কার্যে ব্যস্ত, এ অবস্থায়ও যে তিনি আমার অনুরোধে মূলপ্রবন্ধের ঐটি সংশোধনকল্পে তাঁহার মহামূল্য সময় এবং তাঁহার সর্বতো-মুখী প্রতিভা নিবোজিত করিয়াছেন, তদন্ত আমি তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার মন্তব্য গতমাসেই লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু হানাতাবে চৈত্রের বঙ্গদর্শনে মূলপ্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় নাই।

যে করখানি স্মৃতি-অস্মৃতি পদ্মপুরাণ

দেখা গেল, তাহাদের পরম্পরের মধ্যে বিলক্ষণ অসঙ্গতি রহিয়াছে। সম্ভবত যেখানি যত পরের সঙ্কলন, সেখানিতে তত নূতন জিনিষের সমাবেশ, হইয়াছে। এ অবস্থায় ইহার কোনখানি কালিদাসের পূর্বের, কোনখানি কালিদাসের পরের, অথবা সবগুলিই কালিদাসের পূর্বের বা পরের কি না, এ সমস্তার বিচার করা কঠিন। মূলপ্রবন্ধে, কালিদাসের কাব্যের সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ঋতসূত্রের উপাখ্যানটিকে অত্যন্ত কাঁচা (crude) বিবেচনা করিয়া, সেটি কালিদাসের পূর্বে রচিত, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। দিলীপ ও হৃদকিণার বৃত্তান্ত অত্যন্ত পদ্মপুরাণে যেরূপ দেখিলাম, সেগুলিসম্বন্ধে এরূপ মত-প্রকাশ হইল। সেগুলিতে কালিদাস-বর্ণিত প্রায় সকল বৃত্তান্তই রহিয়াছে, কবিত্বেরও অভাব নাই। কাজেই সেগুলিকে কালিদাসের পূর্বের বলিলে কালিদাসের আর বড় মাহাত্ম্য থাকে না। পক্ষান্তরে, সেগুলিকে কালিদাসের অন্তর্ভরণে রচিত বলিতে গেলেও কথাটা ঠিক সঙ্গত হয় কি?

পুরাণ ও কাব্যনাটকের পৌরীপর্গ্য-বিচারকালে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। শকুন্তলা, উত্তরচরিত, রঘুবংশ প্রভৃতিতে রামায়ণ ও মহাভারতের বিরোধী অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়; এগুলির মূল কোথায়? আমরা ইংরেজী শিখিয়া শেক্স-পীয়ারের প্রাণী দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, এ সকল কবিকল্পনাগ্রন্থ। ইহাতে কবিকে খুব বড় করা হয় বটে, কিন্তু

ইহাই কি ঠিক? শেক্সপীয়ার যে সকল গল্প সুবল্বন করিয়া নাটক লিখিয়াছেন, তাহার সহিত ধর্ম্মের কোন সংঘর্ষ নাই। কাজেই সেখানে কবি বাহা-খুসি করিতে পারেন, তাহার প্রতিভার উদ্ভাসগতিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু ধর্ম্মসাহিত্যে ঐ প্রাণী থাকে না। আমরা দেখিতে পাই, মিল্টন্ তাঁহার মহাকাব্যে স্থলে স্থলে খ্রীষ্টানবিরোধী বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু হুম সমালোচকগণ দেখাইয়াছেন যে, সেগুলি যিহুদীধর্ম্মের ভাষ্যকার Rabbiদিগের ও খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের ভাষ্যকার Fathersদিগের প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, ইংরেজ-কবির স্বকপোলকল্পিত নহে। প্রাচীন গ্রীকসাহিত্যেও দেখিতে পাই, সফোক্লীজ (Sophocles) প্রভৃতি নাটককারেরা যে সমস্ত পৌরাণিক গল্প নাট্যাকারে রচিত করিয়াছেন, সেগুলির মূল গ্রীক mythology হইতে গৃহীত। যেখানে সর্বজনবিদিত বৃত্তান্ত (version) পরিহার করিয়াছেন, সেখানেও দেখা যায় যে, তাহাদের সুবিধার জন্য যেভাবে গল্পটি লইয়াছেন, তাহাও mythologyতে আছে, তবে সেটা সর্বজনবিদিত নহে। অতএব, হিন্দুকবিরাও যখন রামসীতার পুনর্জন্ম, দুর্কাসার শাপ প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতবিরোধী বৃত্তান্ত কাব্যনাটকে সংযোজন করেন, তখন সেগুলি কবির স্বকপোলকল্পিত বলিয়া বস। ঠিক নহে। দিলীপ হইতে অজ পর্ষদ হৃদকিণীর রাজ-গণের কোন বিবরণ পুরাণে না থাকিলে, কালিদাস যে নিজে সমস্ত উদ্ভাবন করিয়াছেন, ইহা বলিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

কবি হয় ত পৌরাণিক ভিত্তির উপর কারিকুরি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি একেবারে শূন্যের উপর নির্মাণ করেন নাই। আমাদের দেশের একটা প্রচলিত সংস্কার আছে যে, পুরাণগুলি কালিদাসদিগর কাব্যনাটকের পূর্বে রচিত। এরূপ একটা প্রচলিত বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হইতে পারে, আমরা ত এরূপ বিবেচনা হয় না। সঁস্তবত ব্যাপার কতকটা এইরূপ :—কাব্যনাটকের পূর্বে পুরাণ ছিল, এবং সেই সকল পুরাণ হইতে কবিগণ উপকরণ সংগ্রহ ও তাহার উপর কারিকুরি করিয়াছেন। কোনরূপ বিপ্লবে প্রাচীন পুরাণগুলি লোপ পাইয়াছে। পরে পুরাণগুলির দ্বয় সংস্করণে সুকবির কাব্য হইতে গৃহীত শ্লোকমালা অথবা তদনুসারে রচিত শ্লোকমালা মূলশ্লোকগুলির স্থান

অধিকার করিয়াছে; রচনাটা আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মূলবৃত্তান্তটি পরম্পরাগত, অতএব অবিকৃত। অনেকের অজ্ঞান, মনুসংহিতা ও ভৃগুসংহিতার সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিয়াছে। পুরাণসম্বন্ধেও এই অজ্ঞান সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক, কালিদাসবর্ণিত বৃত্তান্ত পদ্মপুরাণে রহিয়াছে, এ বিষয়ে ঋষিকবর্ণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তজ্জন্ত রামেন্দ্রবাবু ও সংস্কৃতসাহিত্যের অধ্যাপক আমার কয়েকজন বন্ধু সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। স্বার যখন আমার মূলগ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই তত্ত্ব প্রকাশিত হইল, তখন আমিও নিজে 'নিমিত্তমাত্র' মনে করিয়া কিঞ্চিৎ গর্ক অশ্রুতব না করিতেছি, এমন নহে।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ত্রিবেঙ্কুর ।

৬ •

একণে তিনসহস্র ব্রাহ্মণ মহারাজের নিমন্ত্রিত অভিষি। উঁহার উচ্চবর্ণের জন্ত রক্ষিত সেই ঘরের মধ্যে বাস করিতেছেন এবং উঁহাদের সমাগমে পবিত্র পুষ্করিণীগুলিও সমাজ্য। উঁহারা চতুর্দিকের গ্রামপল্লী ও আরণ্যপ্রদেশ হইতে আসিয়াছেন, কলমূল-শস্যাদি আহার করিয়া জীবনধারণ করেন, পার্শ্ববিবরের প্রতি বীভরণ এবং রহস্যময় ধ্যানধারণার দিয়ারাজি নিমূ। একটা

যজ্ঞস্থানের জন্ত উঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন। এই যজ্ঞ ১৫ দিন ধরিয়া চলিবে এবং ইহা ৬বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্বকালে, কোন পার্শ্ববর্তী দেশ জয় করিবার জন্ত যে বৃদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বৃদ্ধকালে ঐ ভূমিতে যে রক্তপাত হয়, তাহারি প্রাপ্তিসত্ত্বরূপ এই ব্রাহ্মণেরা সুদীর্ঘ প্রার্থনা-যজ্ঞাদি পাঠ করিয়া থাকেন। অগণিত বৎসর অতীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে কিছুই

আসে যায় না। সেই রক্তপাতের প্রারম্ভিক-
স্বরূপ এখনো ভগবানের নিকট উচ্চকণ্ঠে
কমাপ্রার্থনা করিতে হইবে, তুরীভেরী
বাজাইতে হইবে, প্রবিজ শঙ্খধ্বনি করিতে
হইবে। রাজচিহ্নস্বরূপ এই শঙ্খ, ত্রিবজ্রম-
অধিপতির ছত্রচামরাদিতে অঙ্কিত।

পাণ্ডবদিগের প্রতিমূর্ত্তি—ত্রিশকূট উচ্চ,
মস্তকের উপর কিরণমণ্ডল বিরাজিত,
ভীষণদর্শন; উহাদের মোহকবারিত নেত্রের
কুজদৃষ্টি মানবগণের উপর নিপতিত। এই
উৎসব উপলক্ষে, উহাদিগকে মন্দিরের গুপ্ত-
কক্ষ হইতে বাহির করিয়া, রসারসি দিয়া,
বহু আয়াসে মন্দিরের বৃত্তপ্রাঙ্গণে—সূর্য্যা-
লোকের মধ্যে—টানিয়া আনা হইয়াছে।
উদ্দেশ্য—বাহাতে সাধারণ লোকেরা উহা-
দিগকে দর্শন করিয়া ভীত হয়। ইহাদিগের
নিকট বখন প্রার্থনাদি হয়, তখন ব্রাহ্মণেরা
অল্প অন্তরের অন্তস্তল হইতে সেই অদৃশ্য
অনির্বচনীয় পরব্রহ্মেরই আরাধনা করিয়া
 থাকেন। যজ্ঞোৎসবের এই ১৫দিন, অসংখ্য
অমুষ্ঠান—সাগ্রহ প্রার্থনা—ভয়-আনন্দের
জীবন-উচ্ছ্বাসে—ব্রাহ্মণ-গণের প্রাণীরা-
ভ্যন্তরস্থ তুরি ভীতরূপে স্পন্দিত হইতে থাকে।
দূরস্থ লোকদিগের তুমুল কোলাহলে আমি
প্রসীড়িত হইতেছি—আকৃষ্টও হইতেছি।
কিন্তু সেখানে আমার প্রবেশ একেবারেই
নিষিদ্ধ;—মহারাজের অঙ্গপ্রহর এখানে কিছুই
করিতে পারে না;—সর্বপ্রকার মানবচেষ্টা
এখানে নিষ্ফল।

যে বিশাল তালবনে এই নগরটি সমা-
চ্ছন্ন—সেই তালবনের মধ্যে যে সময়ে দীক্ষিত
ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞোৎসব করিতেছেন, সেই একই

সময়ে, তাহারি অঙ্গুরণে, মধ্যবর্তী ও
নীচবর্ণের লোকেরাও নিজ নিজ গৃহে এই
অমুষ্ঠানে ব্যাপৃত। আমার ভ্রাতা তাহারি ও
ব্রাহ্মণসংসর্গ হইতে বর্জিত। সেখানেও,
চতুর্দিকে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত,
দেবতার নিকট এইরূপ অমুশোচনা ও
কমাপ্রার্থনা চলিতেছে।

যুদ্ধে-নিহত বীরপুরুষদিগকে বেথানে
বেথানে গোর দেওয়া হইয়াছে, সেই-সব
সমাধিস্থানে—সেই-সব চৈতন্যবৃক্ষতলে এইরূপ
পূজা-অর্চনা হইতেছে।

রাজি হইবামাত্র, সেই বনের প্রত্যেক
ছায়াচ্ছন্ন মার্গে, এবং বেথানে বেথানে সমাধি-
স্তম্ভ সমুখিত হইয়াছে এইরূপ প্রত্যেক
চতুর্পাশে, ছোট-ছোট প্রদীপ জ্বলান হইয়া,
বাত্তোত্তম হইতে থাকে, এবং বিবিধ নৈবেদ্য-
সামগ্রী প্রদত্ত হয়। কুজ দেবালয় কিংবা সামান্ত
যজ্ঞবেদি—যাহা তরু-অধিষ্ঠাত্রী নিকট দেবতা-
দিগের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত—সেখানেও
সহস্র-সহস্র কুজ কল্পমান অগ্নিশিখা জলি-
তেছে। এখানে আমি অবাধে প্রবেশ
করিতে পাইলাম। সহসা, পরম্পরসংগঠিত
তালবনের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে গিয়া
পড়িলাম। যেখান হইতে বাতের শব্দ
শোনা যাইতেছে—আলো দেখা যাইতেছে।
আমি সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া, পথভ্রান্ত
পথিকের ভ্রাতা ইতস্তত বিচরণ করিতে
লাগিলাম।

• প্রথমেরই একটি সামান্ত কুজ দেবালয়;—
বহুপুরাতন, লুপ্তমুখপ্রী-প্রস্তরস্তম্ভ-বৃত্ত, অতীত
নিয়, তরুগুঞ্জের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত; তরুণ
তাহাকে ছাড়াইয়া অতি উর্ধ্বে অন্ধকারের

মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে । দেবালয়টি কুলের মালায় ও কুলের অলঙ্কারে বিভূষিত । নারিকেলতৈলের ছোট-ছোট দীপ চারিদিকে জ্বলিতেছে এবং তাহা হইতে যেন অসংখ্য জ্যোৎস্বিনির আলো বিকীর্ণ হইতেছে । দুই-তিনটি কুল জালানের পশ্চাভাগে মন্দিরের বিগ্রহটি সমাসীন,—ভীষণদর্শন, মস্তকে উচ্চ মুকুট, বহুবাহুবিশিষ্ট, সূক্ষ্মশূল শুক-পক্ষীর জায় হরিবর্ণ । দেবালয়ের সুপরিচিত ও পবিত্র শাদা-শাদা ছাগশিশু চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । পুষ্পমালায় বিভূষিত, অর্ধনগ্ন ভক্তের দল দ্বারের সম্মুখে ভিড় করিয়া হড়াহড়ি করিতেছে । শোকবিবাদময় তুরী-রবে ও পবিত্র শব্দধ্বনিতে ঢাক-ঢোলের শব্দ ও বংশীধ্বনি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে ।

উহার স্বাগত-স্মিতহাস্যে আমাকে অভ্যর্থনা করিল ; ভীষণগন্ধি জুইকুলের মালা আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিল । রাজির ‘গুমট’-উত্তাপে, স্নগন্ধি-রস-পাকের কটাহ-সমুখিত ধূমের জ্বায়, এই জুইকুলের গন্ধ আমার ‘মাথায় চড়িল’ । তাহার পর লোক সরাইয়া আমার জন্য একটু জায়গা করা হইল । তালবনের চতুঃপাশবর্তী শত-বর্ষব্যয় একটি ডুমুরগাছের তলায় আমি দাঁড়াইলাম । প্রাচীনধরণের মস্তকহীন ক্ষুদ্র-স্তম্ভ-পরিবৃত্ত একটি প্রস্তরবেদীর চতুর্দিকে সমবেত দ্রোণের আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বাস্ত শ্রবণ করিতেছে । এখানেও দীপা-লোক, গোলাপ ও জুইকুলের মালা, কল-শস্যাদির নৈবেদ্য । পুরোহিতের মত একজন নীচবর্ণের লোক, মুখের রং কালো, দুই উজ্জ্বলস্নেহ সহিত সজ্জা দি পাঠ

করিতেছে ; আর মধ্যে মধ্যে ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিতেছে । বৃক্ষসমূহের পশ্চাতে, ছায়ার মধ্যে, প্রচ্ছন্নপ্রায় রমণীগণ দাঁড়াইয়া আছে এবং সৰূপে মিলিয়া দীর্ঘকরে চীৎকার করিয়া মুহুর্ভ কি-একপ্রকার শব্দ করিয়া উঠিতেছে । কতকগুলি বালক বাগের আগুন আলাইয়া ক্রমাগত উড়াইতেছে ; আর বাদকেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহা-দের বাস্তবস্ত্রগুলি সেই আগুনের উপর সঞ্চালিত করিয়া, যথোপযুক্ত শব্দ বাহির করিবার জন্য, তাহাইয়া লইতেছে । পুরোহিতের উন্মত্ত উজ্জ্বল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ;—ক্রমে সে ভূতাবিষ্ট হইল । সে বিকট চীৎকার করিয়া, বৃক্ষের উপর—প্রস্তরের উপর মাথা ঠুকিতে উন্মত্ত হইল ; লোকেরা চারিদিকে শব্দলের জায় বাহুবৈষ্টন করিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিল ; তাহার পরেই সে অবসর ও স্পন্দহীন হইয়া স্তম্ভিত হইল ; কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘরশব্দ বাহির হইতে লাগিল ।...

• • এই দেবতা—যিনি আমাদের হইতে বহু-দূরে—যাঁহাকে এখানকার লোকেরা ঘোর-বাস্তধ্বনি-সহকারে পূজা করিতেছে—ইনি রহস্যময় ব্রাহ্মণদিগের দেবতারই রূপান্তর-মাত্র,—সেই দেবতা, যাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের নিভৃতকক্ষে আধ্যাত্মিকভাবে আরাধনা করিয়া থাকেন ।

আমরাও যে-দেবতাকে ভজনা করি—তিনিও এই দেবতারই রূপান্তরমাত্র...কেন না, ব্রহ্ম, বিহোবা, আল্লা—যে নামেই অভিহিত হউন না, “মিথ্যা-দেবতা” কেহই নাই । যে ভক্তজানীরা অভিমানে করেন কেবল

তাহাদের দেবতাই সত্য, তাহাদের বৃথা-পূজা নিতর্যনোচিত বলিয়া আমার মনে হয়। আসল কথা, সেই অপরিমেয় অনধিগম্য পুরুষ আমাদের জ্ঞানকে এতদূর অতিক্রম করেন যে, আমরা তাহার স্বরূপসম্বন্ধে যে-কোন ধারণাই করি না কেন, তাহাতে ভ্রান্তি হইবারই কথা; একটু কম ভ্রম হইল, কি

একটু বেশি ভ্রম হইল, তাহাতে কিছুই আসে-যায় না। বাহার্য্য জীবন-মুহুর্য্য কঠবস্ত্রণায় চীৎকার করিয়া আত্মনাশ করিতে করিতে অরণ্যের মধ্যে একটা হীনবিগ্রহের পদতলে প্রার্থনা করে—বতই তাহারাজুড় হউক, বতই তাহারাজুড় হউক, তাহাদের প্রার্থনাও তিনি শ্রবণ করেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠা।

“সত্যেন লোকং জয়তি সত্যন্ত পরমং তপঃ।”

ভারতবর্ষের পুরাতন সত্যনিষ্ঠা দিন দিন মলিন হইয়া পড়িতেছে! হয় নাই,—যেমন ছিল, ঠিক সেইরূপ আছে,—এমন জাতিশ্রোদ্ধিতে কেহ আত্মস্থাপন করিতে পারিবেন না। পাশ্চাত্যসংসর্গে নিপতিত হইয়া ভারতবর্ষ যে কিরূপরিমাণে তাহার চিরপুরাতন পূর্বসংস্কার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, সে কথা অস্বীকার কুরিবার উপায় নাই। পূর্বসংস্কারকে নিতান্ত সুসংস্কার বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া-দিয়া, পাশ্চাত্যশিক্ষা তাহার স্থানে অস্ত্রাপি সুসংস্কার সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হয় নাই। বাহা ছিল, তাহা নাই। বাহা আসিয়াছে, তাহাকে সর্বতোভাবে অত্যাধনা করা যায় না। তথাপি তাহাকে লইয়াই সংসারযাত্রা স্রিষ্টি করিতে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় পাশ্চাত্যগণ আমাদেরকে সত্যব্রট বলিয়া কলংকিত করিলে; মহারাধ হৃদয়ের রহস্ত-

প্রিয় বয়সোর তাহার বলিতে হয়,—“বয়ং চক্ষু আকুল করিয়া-দিয়া, অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ?”

আমাদের পুরাতন সত্যনিষ্ঠার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ-পরম্পরার অভাব নাই। সে ইতিহাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিত হয় না বলিয়াই তাহার কথা জনসাধারণের নিকট ক্রমে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। অত্ৰাপি যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ভিন্নদেশের লেখকবর্গ বাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এক শ্রেণীর প্রমাণ। আমাদের পুরাতন সাহিত্যে বাহা লিখিত আছে, তাহা আর এক শ্রেণীর প্রমাণ। উভয় শ্রেণীর প্রমাণই একবাক্যে আমাদের পুরাতন সত্যনিষ্ঠার গৌরবোৎসাহ করিয়া থাকে।

সত্য কাহাকে বলে? এ বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মানবসমাজের সাহিত্যে দুইটি

বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় । পাশ্চাত্যসাহিত্যের সত্যের নাম “ট্রুথ” । বাহা বহুলোকে বিশ্বাস করে, তাহারই নাম “ট্রুথ” । তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাহার কিছর অনাবশ্যক । বহুলোকে বিশ্বাস করিলেই হইল । ইহাই ধাত্ত্বগত ব্যুৎপত্তি । পাশ্চাত্যজাতির ইতিহাসেও এই কথাই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । বহুলোকে বিশ্বাস করিল,—পৃথিবী অচলা । যে ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ করিল, যে ব্যক্তি সাহস করিয়া সে কথা অস্বীকার করিতে চাহিল, যে ব্যক্তি প্রমাণপ্রয়োগে বহুলোকের বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রয়াস করিল, বহুলোকে মিলিয়া তাহার ঘৃণতার সমুচিত দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া “ট্রুথ” রক্ষা করিয়া দিল । বহুলোক কাহারো ? বাহারো অজ্ঞ, অশিক্ষিত, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, তাহারাই ত বহুলোক ! তাহারো বাহা মানিল না, তাহা মিথ্যা হইয়া গেল ; তাহারো বাহা মানিল, তাহারই নাম হইল—“ট্রুথ” । ইহাই ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা ।

We are all very apt to consider truth to be what is *troued* by others, or believed in by large majorities. That kind of truth is easy to accept. But whoever has once stood alone, surrounded by noisy assertions, and overwhelmed by the clamour of those who ought to know better, or perhaps who did know better,—call him Galileo

or Darwin, Colenso or Stanley, or any other name,—he knows what a real delight it is to feel in his heart of hearts, this is true,—this *is*—this is *sat*—whatever daily, weekly or quarterly papers, whatever bishops, archbishops or popes, may say to the contrary. —Max Muller's "India : what can it teach us." p. 64.

ইহার সহিত প্রাচ্যসাহিত্যের সত্য-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক । বাহা অর্থার্থ—বাহা আছে—বাহা থাকে—বাহা চিরন্তন, তাহারই নাম সত্য । তাহার সহিত কেবল ইহলোকের সম্বন্ধ নয় ; ইহপরলোকের সম্বন্ধ । তাহার সহিত কেবল বহুলোকের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সম্বন্ধ নয় ; বাধার্থের সম্বন্ধ । স্মৃতরাং সত্যের সহিত “ট্রুথের” পার্থক্য অত্যন্ত অধিক । প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জনসমাজের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতেও সেই প্রবল পার্থক্য দেখা যায় । “ট্রুথ” তাহার চারিদিকে অধিকৃত প্রজ্বলিত করিয়া, বাহবলে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে । “সত্য” কেবল হিমালয়ের সমুন্নত শিখরভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া শাস্ত্রশীতল সৌম্যমূর্তিতে নিরন্তর আত্মপ্রচার করিয়াই অধিকাররক্ষার আরোজন করিয়াছে । সে কাহাকেও ভয় না করিয়া তারবারে কহিয়াছে—

“যুক্তিযুক্ত উপদেশের বচনং বালকাদিপি ।”

অন্তঃ তুমিবা ত্যাক্যামপুং পদ্মকলনা ।”

যুক্তিযুক্ত উপদেশের বাক্য বক্তার পদ-মৰ্যাদার উপরে নির্ভর করে নাই । যে

কেহ বলুক না কেন, সত্য হইলেই যথেষ্ট । তাহার বিপরীত বাক্য ব্রহ্মার বেদবাক্য হইলেও অগ্রাহ্য । এমন সরল কথা, এমন সাহসের কথা, এমন অকৃত্রিম সত্যনিষ্ঠার কথা, “টুথ্” শব্দের ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না । “টুথ্” চিরদিনই মানুষের মুখের দিকে চাহিয়া, কত নির্ধাতন সছ করিয়া, অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস কুড়াইবার আশায় ভিত্তারীর মত পাশ্চাত্যজনপদের পণ পথে কাঁদিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে ! তাহার ইতিহাস পাশ্চাত্য মানবসমাজের পদ-অলনের ইতিহাস । সত্য কতবার তাহাদের সম্মুখ দিয়া বিদ্যাকামের মত দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে ;—তথাপি জনসমাজ তাহার মর্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে নাই ! সত্য কতবার বীরদর্পে আত্মপ্রচার করিবার আরোহণ করিয়াছে ;—জনসমাজ তখনই তাহাকে নির্দয়চরণে নিপীড়িত করিয়া উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছে ! অত্যাধি সত্য ভাল করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস পাইতেছে না—বুক অপেক্ষা শঙ্কিত ভাল ; হিংসা অপেক্ষা প্রেম ভাল ; পরস্ব অপেক্ষা নিজস্ব ভাল ; ইহলোক অপেক্ষা পরলোকের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ !

সত্য কি ? তাহার অহুসঙ্কান করিবার জন্ত মানবসমাজ নানা আলোচনার নিরন্তর ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছে । সভ্যসমাজের চেষ্টার দিনদিন যে সকল অভিনব বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা যেন ভাষা-রূপে কোন-এক মূলস্রবের বিশদ ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইয়াছে । সে মূলস্রব ভারতবর্ষেই সুপরিচিত । ভারতবর্ষ বহুপূর্বেই বুঝিয়া-

ছিল,—সত্য এবং ব্রহ্ম অভিন্ন—বাহ্য থাকে, তাহাই সত্য,—তাহাই ব্রহ্ম,—তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, আর সমস্তই মিথ্যার অলীক আড়ম্বরে পর্যাবসিত হয় । সত্যনিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠতপস্যা । তাহাতে সিদ্ধিলাভ কদিলে, মানবসমাজ তর্ককোলাহল হইতে দূরে দাঁড়াইয়া, নীরবে সত্যসেবা করিতে সমর্থ হয় । তখন শ্রামনগর হইতে তত্ত্বরতা-ব্যভিচার গলায়ন করে ; সত্যপালন করা স্বাভাবিক হয় ; সত্যত্যাগ না করিয়া প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া প্রতিভাত হয় । সেরূপ অবস্থায় জনসমাজ অবিচলিত সত্যনিষ্ঠার প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া, ইতিহাসে আপন নাম চিরস্মরণীয় করে । মানবজাতির ইতিহাসে কাহার নাম এইরূপে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ? কাহার কাব্য, কাহার শাস্ত্র, কাহার প্রতিদ্বসের সাংসারিক ব্যবহার, এই মূলমন্ত্র প্রচার করিয়া বিদেশের লেখকবর্গের সমুচিত শ্রদ্ধালাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে ?

“বিশ্বচরাচরে আছে একমাত্র হেন ঠাই ।

সে আমার জন্মভূমি,—তাহার তুলনা নাই ।”

যে সকল বিদেশী লেখক ভারতবর্ষের পুরাতন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মেগাস্থিনিন্স এবং এরিয়ানের নাম সর্বত্র সুপরিচিত । তাহারা বিশ্বাস্ত অতীতসাক্ষী বলিয়াই সুপরিচিত । মেগাস্থিনিন্স খৃষ্টাব্দ-বর্তাবের পূর্বে এবং এরিয়ান্ খৃষ্টাব্দবর্তাবের পূর্বে—এই দুই জগদ্বিখ্যাত অতীত-সাক্ষীর আবির্ভাবসময়ে—মানবসমাজের সত্য-নিষ্ঠা কিরূপ ছিল ? এই যুগের পাশ্চাত্য সত্য-

নিষ্ঠার কথা ইতিহাসপাঠকের নিকট সুপরিচিত। জলে-বলে-কৌশলে পরস্পারহরণ করিবার জন্য এই যুগের পাশ্চাত্যসমাজে যে অশান্ত আকাজকা অকস্মৎ বিবর্তিত হইয়া উঠিয়াছিল, দ্বিতীয় সেকেন্দরশাহ তাহারই দ্বারা দেহরূপে এশিয়ার জলে-বলে তাণ্ডবনৃত্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। ইউরোপের অন্তান্ত দেশে তখন পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য সভ্যনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই যুগের ভারতবর্ষে বাস করিয়া মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন,—তৎকালে ভারতবর্ষে তৎপরতা অপরিজ্ঞাত ছিল বলিলেই হয়; সকলেই সত্য ও পুণ্যের সমাদর রক্ষা করিত।* মহাকবি কালিদাস লিখিয়া গিয়াছেন—

“ক্রতো তৎপরতা হিতা।”

সে কবিকাক্যকে অসঙ্গত অতিশয়োক্তির নিদর্শনরূপেই আধুনিক অধ্যাপকগণ ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন! কিন্তু কালিদাসের এই কবিকাক্য এবং মেগাস্থিনিসের সাক্ষ্যবাক্য একজু বিচার করিলে, সকল সংশয় নিরস্ত হইয়া যায়। জনসমাজে অবি-

চলিত সভ্যনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, সকল দেশের ইতিহাসেই এই চিত্র পরিস্ফুট হইত। এরিয়ানের সময়েও ভারতবর্ষের সভ্যনিষ্ঠার গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—“রাজকর্মচারিগণ ‘মিথ্যা রিপোর্ট’ লিখিতে জানিতেন না; লোকেও ‘মিথ্যাবাদী’ বলিয়া কেহ কাহাকেও অভিযুক্ত করিতে পারিত না।”†

আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষা কতদিনে মানবসমাজে একরূপ কল্যাণযুগের প্রবর্তন করিতে পারিবে? দ্বিসহস্র বৎসরের চেষ্টায় ইউরোপ নানাবিধে আশাতীত সমুন্নতি লাভ করিলেও, সভ্যনিষ্ঠায় এখনও এতদূর সমুন্নতিলাভে সমর্থ হয় নাই। না জানি কতকালের চেষ্টায় ভারতবর্ষ এই কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল! কতকাল পর্য্যন্ত সে সভ্যনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্তও যে ভারতবর্ষের সভ্যনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল, চীনদেশের বৌদ্ধভ্রমণ-যুগের ভ্রমণকাহিনীতে তাহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।‡

* Thefts were extremely rare, and that they honored truth and virtue.—Fragments.

† They oversee what goes on in the country or towns and report everything to the king, where the people have a king, and to the Magistrates, where the people are self-governed, and it is against use and wont for these to give in a false report; but indeed no Indian is accused of lying.—McCrindle.

‡ Though the Indians are of a light temperament, they are distinguished by the straightforwardness and honesty of their character. With regard to riches, they never take anything unjustly; with regard to justice, they make even excessive concessions; straightforwardness is the distinguished feature of their administration.—Hiouen-thsang.

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মুসলমান-লেখককেও সংক্ষিপ্ত উপস্থিত করিতে পারা যায়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর খনাম-খ্যাত পাশ্চাত্যপণ্ডিতক মার্কো পোলো হইতে ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাসলেখক আবুল-ফজল পর্যন্ত সকলেই মুক্তকণ্ঠে আমাদের সত্যনিষ্ঠার গৌরববোধনা করিয়া গিয়াছেন।*

এই সকল বিদেশের লেখকগণের উক্তি কোন পুরাতনগ্রন্থগত নীতিবাক্যের অনুবাদ নহে। তাঁহারা অনেকেই আমাদের পুরাতন সাহিত্যের সহিত অপরিচিত ছিলেন; কেবল লোকব্যবহার লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন। সে লেখা তর্কহুৎকারে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই!†

তাহারা বাণিজ্যোপলক্ষে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, কালক্রমে এদেশে আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্মচারিরূপে আমাদের সত্যনিষ্ঠার গৌরব-বোধনা করিতে বিশ্বস্ত হইয়া নাই।

যে জাতি সত্যনিষ্ঠার জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল, কোন্ সময় হইতে কি সূত্রে তাহাদের সত্যনিষ্ঠা শিথিল হইতে আরম্ভ করিল, তাহা ইতিহাসের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। সে ইতিহাস অত্যাধিক লিখিত হয় নাই; কেহ লিখিবার জন্ত যত্ন প্রদর্শন করিলেও, আধুনিক সত্যনিষ্ঠা সেরূপ ইতিহাসের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য আগ্রহ-প্রকাশ করিতে সম্মত হইবে না। তাহা নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্ককাহিনী! অধ্যাপক

* (১) The Indians are naturally inclined to justice, and never depart from it in their actions. Their good faith, honesty, and fidelity to their engagements are wellknown, and they are so famous for these qualities, that people flock to their country from every side.—Elliot's History, vol I. 88.

(২) You must know, that these *Abraimaman* (Brahmans?) are the best merchants in the world, and the *most truthful*, for they would not tell a lie for anything on earth.—Marco Polo, vol II. 350.

(৩) The people of Lesser India are true in speech and eminent in justice.—Friar Jordanus.

(৪) The Hindus are religious, affable, cheerful, lovers of justice, given to retirement, able in business, admirers of truth, grateful and of unbounded fidelity; and their soldiers know not what it is to fly from the field of battle.—Abul Fozl.

† There must surely be some ground for this, for it is not a remark that is frequently made by travellers in foreign countries, even in our time, that their inhabitants invariably speak the truth. Read the accounts of English travellers in France, and you will find very little said of French honesty and fidelity, while French accounts of England are seldom without a fling at *Perfidie Albion*.—Max Muller.

উইল্‌সন্ তাহার রহস্যভেদের জ্ঞান সংক্ষেপে লিখিয়া গিয়াছেন,—ইউরোপীয় সংসর্গে পতিত হইয়াই এই দুর্গতির সূত্রপাত হইরাছে !*

যে সময়ে ইউরোপীয় বণিক এদেশে প্রথম পদাৰ্পণ করেন, তাহার স্বদেশ হইতে অপরিজ্ঞাত সমুদ্রপথে অপরিচিত বিদেশে উপনীত হইবার আশায় একরূপ নিরুদ্দেশবাজায় বহির্গত হইয়াছিলেন । তাহাদের সত্যনিষ্ঠা প্রবল থাকিবার কথা নহে । তাঁহাদের অন্তঃস্ব-যে-কোনও উপায়ে হউক, জাহাজ ভরিয়া পণ্যভাণ্ডার স্বদেশে বহন করিতে পারিলেই তাহারা কৃতকৃতার্থ হইতেন । কি উপায়ে পণ্যভাণ্ডার স্বদেশে আনীত হইল, লোকে তাহা জানিলেও, তাহাতে লজ্জাবোধ করিতে পারে নাই । তখন লাভের লোভে অন্ধ হইয়া, ইউরোপ কত কুকার্য্যই না লিপ্ত হইয়াছিল ! সত্যপথ ভিন্ন অসত্যপথে কদাচ কাহারও সমুন্নতি হয় না,—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসেই ভারতবর্ষের লোকে ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে নিয়ত সত্যরক্ষা করিয়া অগদ্বিখাত হইয়াছিল । ইউরোপীয়গণের সংসর্গে পতিত হইবার পূর্বে তাহারা অসত্যের উপকার অল্পতর করিতে পারে নাই । ছল-প্রভারণার কাহারও কল্যাণ হয়, একথা একরূপ অপরিজ্ঞাত ছিল । কেহ তাহা চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হইত না । ইউরোপীয় সংসর্গ সেই নূতন চিন্তার পথ

উন্মুক্ত করিবারাজ, এদেশের লোকে অসত্যের উপকার উপলব্ধি করিতে লাগিল । কোম্পানীর কর্মচারীকে উৎকোচ দান করিতে পারিলে কোম্পানীর নিশান উড়াইয়া বিনা শুকে বাণিজ্য করিয়া, অধিক অর্থোপার্জন করিতে পারা যায় ;—এমন সুবিধার কথা যেদিন হইতে প্রথমে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, সেই দিন হইতেই ঐ দেশের লোকের মনে অসৎপথে অর্থোপার্জনের কথা জাগিয়া উঠিতে লাগিল । পূর্বসংস্কার নিতান্ত কুসংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগিল । মুখে সত্যের গোরবঘোষণার আড়ম্বর অম্লিক হইয়া উঠিল ; কার্য্যে অসত্যের প্রভাব দিনদিন বর্দ্ধিত হইয়া চলিল । বহুবৎসরের অক্লান্ত অধ্যবসারে যে গগনম্পর্শী দেবমন্দির স্থানস্থিত হয়, একদিনেই তাহাকে লোষ্ট্রস্বৰূপে পরিণত করিতে পারা যায় । এক শতাব্দীর পাশ্চাত্য সংসর্গ ও শিক্ষা এইরূপে বহুশতাব্দীর পুরাতন প্রাচ্য সভ্যনিষ্ঠার সমুন্নত দেবনিকেতন ধরাবিলুপ্তি করিয়া দিয়াছে ! ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসলেখক, সত্যনিষ্ঠ হইলেন, ইহার প্রমাণ অল্পসংখ্যক করিবার জ্ঞান পশ্চিম হইবেন না । প্রত্যেক ঘটনার এই ঐতিহাসিক তথ্য পরিষ্কৃত হইয়া উঠিবে !

যাহারা অশিক্ষিত অবস্থায় কুসংস্কার-বশত নিভৃত পল্লীপথেও মিথ্যা কহিতে জানিত না, তাহারা অশিক্ষিত হইয়া

* Where that feature was lost, it was chiefly by those who had been long familiar with Europeans.—Wilson in Mill's History of British India, Vol. I. 375.

অবলীলাক্রমে রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়াও মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! ইহার কি কিছুমাত্র কারণ নাই? কারণ-অল্পসম্বন্ধানের চেষ্টা। কর্ত্তিবামাত্র পাশ্চাত্য সংসর্গ ও শিক্ষার দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করিতে হয়। অন্ধবিশ্বাসই প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠার মূলভিত্তিরূপে বর্ত্তমান ছিল। লোকে তর্ক করিত না; বিচারবিতণ্ডায় সময়ক্ষয় করিত না; পুরুষাঙ্কুরে বিশ্বাস করিত,—“সত্যই ইহপরলোকের একমাত্র সদগতির সোপান। সত্যব্রট হইলে, ইহপরকাল নষ্ট হইয়া যাইবে!” পাশ্চাত্য ‘সত্যনিষ্ঠা’ নীরস তর্কবুদ্ধির ককরভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ‘অসত্যো’ অধিকাংশের অকল্যাণ; সত্যো অধিকাংশের কল্যাণ; অতএব অসত্য হইতে সত্যো উপনীত হও।”—এই নীতিবাক্য মানব-সমাজকে সত্যনিষ্ঠ করিতে পারে না। ইহার ‘সহিত ধর্ম্মের সংশ্লব নাই; ইহার ‘সহিত ধর্ম্মের সংশ্লব নাই; ইহার ‘সহিত সংশ্লব কেবল তর্ককোলাহলের!

ইহাই যে পাশ্চাত্যশিক্ষার পরিণত ফল, সে কথার প্রধান প্রমাণ ইতিহাস। প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠার মূলভিত্তি ধর্ম্ম। ধর্ম্মই ‘লোক-সমাজকে ধরিয়া রাখিয়াছিল।’ ধর্ম্মই পরলোকের সদগতির প্রলোভনে লোক-সমাজকে ইহলোকে সত্যনিষ্ঠ করিয়াছিল। ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্যশিক্ষার সে পুরাতন সংস্কার উড়িয়া গিয়াছে; তাহা কুসংস্কার বলিয়াও পরিচিত হইয়াছে।

শিশুর জ্ঞান জনসমাজ সরলভাবে পরাঙ্কুরণে লিপ্ত হইয়া থাকে। নীতিশাস্ত্রের সহস্র উপদেশে বাহ্য কদাপি সিদ্ধ হইতে

পারে না, দৃষ্টান্তের বলে তাহা। সহজেই জনসমাজের অস্থিমজ্জার প্রবিষ্ট হইয়া যায়। জনসমাজ এখন সত্যনিষ্ঠার বিরূপ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইতেছে? যে দেশের রাজা ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাঁহার ভরস্ব্যপোষণের জন্য ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের “দেওয়ানী সনন্দ” পাইয়া, কোম্পানী-বাহাদুর ব্রাহ্মণের বাক্য অবিশ্বাস করিয়া দানপত্র দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন! অগত্যা ব্রাহ্মণ দানপত্র দেখা-ইয়া ভূমিরক্ষা করিতে বাধ্য হইল। বলা বাহুল্য, ঠাকুর দ্বারে ঠেকিয়া জাল করিয়া রক্ষা পাইয়া গেল। মিথ্যার একরূপ, অমোঘ উপকার জনসমাজ গত্যার্থ্যমান করিতে পারে না। ইংরেজ-বাঙালীতে কলহ ঘটিল; দোষ কাহার, তাহার বিচার হইল না, বাঙালীর দণ্ড হইল। বাঙালী ভবিষ্যতের জন্য—চিরদিনের জন্য—বিচারকের উপর আস্থা হারাইয়া, মিথ্যাসাক্ষ্যে জুরগাভের নূতন পথ আবিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইল। মিথ্যাসাক্ষ্যের উপকার একবার প্রকাশিত হইবামাত্র জনসমাজ তাহাকে আর পরিত্যাগ করিতে পারে না। রাজসদনে উপনীত হইয়া সত্য কহিলে লাঞ্ছনা; অসত্য কহিলে পদোন্নতির সূত্রপাত হয়;—জনসমাজ একবার তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, আর পুরাতন সত্যনিষ্ঠা লইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ঘটনার পর ঘটনার “পাশ্চাত্যসংসর্গে” প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠা এইরূপে অতিপদে বিপর্যাস্ত হইয়াছে! পাশ্চাত্যসংসর্গের প্রথম সময়ে হিন্দু গজাজল স্পর্শ করিয়া মিথ্যা কহিতে সাহস করিত

না। পাশ্চাত্যশিক্ষা শিখাইয়া দিল,—
 “গঙ্গা হিমালয়ের তুষারস্তুপে উদ্ভূত হইয়া,
 বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে ; তাহা নদী-
 মাত্র ; দেবতা নহে।” শুনিয়াছি, ঈষ্টধর্ম-
 প্রচারক ফ্রান্সিস্ ডক্সাহেব কলিকাতার
 বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া হিন্দুছাত্রগণকে
 জিজ্ঞাসা করিতেন,—“গঙ্গা কাহাকে বলে ?”
 ছাত্র ভূগোলস্থত্রের সুপরিচিত বর্ণনার
 আবৃত্তি করিবারাত্র, ডক্সাহেব ভক্তি-
 বিগলিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন,—“আর
 ভয় নাই, ভারতবর্ষের উদ্ধারলাভের পথ
 উন্মুক্ত হইয়াছে !” গঙ্গা হিমালয়ের তুষার-
 স্তুপের ধলিত ধারা হইলেও, আমার পক্ষে
 চিরসমুদ্রজন্মের পরম দেবতা। তাহার তীরে
 তীরেই আমার পূর্বপিতামহবর্গের
 অলৌকিক কীর্তিকলাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।
 তাহার শীতল সলিলপ্রবাহেই আমার পিতৃ-
 পিতামহের চিত্তাভ্যাস চিরনির্বাণ লাভ
 করিয়াছিল। সে পুণ্যসলিল স্পর্শ করিয়া
 মিথ্যা বলিলে, আমি মনুষ্যানামের অযোগ্য
 হইয়া পড়িব। এক্ষণে যুক্তিমূলক স্বদেশ-
 প্রীতি জনসমাজকে সত্যনিষ্ঠ করিতে পারে
 না। তাই তাহারা লোকাচাররক্ষার্থ গঙ্গার
 পিতৃপুরুষের অস্থি বিসর্জন করে ; লাভের
 লোভে সেই গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়াই মিথ্যা
 কহিতে সঙ্কচিত হয় না ! গঙ্গা ত সেই
 হিমালয়ের গলিত তুষারধারা,—তবে আর
 ভয় কি ?

প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠার পৃষ্ঠপোষক কেহ কোন-
 রূপ আয়োজন করে নাই। তজ্জন্মই তাহা
 পাশ্চাত্যসংসর্গে পরাস্ত হইয়া পড়িয়াছে।
 এখন আবার সে পুরাতন সত্যনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা-

লাভ করিতে পারে কি না, তাহা বহু সংশয়ে
 আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। মানবের ইতিহাস
 মলিন করিয়া পাশ্চাত্য শক্তিসংঘ ভূমণ্ডলে
 যে অসুস্থশক্তির আশ্রয় প্রচলিত করিয়া
 দিয়াছেন, এখন তাহার মধ্যাহ্নকাল। প্রচণ্ড
 মার্ত্তণ্ডতেজে মানবহৃদয়ের সকল সুকুমার
 বৃত্তি দগ্ধ হইয়া গেল ! মানব এখন মানব-
 সংহারব্রতে দীক্ষিত হইয়া, গৃহকলহে লিপ্ত
 হইয়াছে। এই পাশ্চাত্যসত্যতার পরিণাম
 কি, সে কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে না ;
 তাহার অবসর পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।
 পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভূমণ্ডলে
 এই অভিনব শিক্ষার মানবমনকে শোণিত-
 লোমূষ করিয়া তুলিতেছে। তাহার সম্মুখে
 সত্যনিষ্ঠা কদাপি আত্মপ্রকাশ করিতে সাহস
 পায় না। সত্য ভাগের ধর্ম। সত্য সংঘের
 ধর্ম। সত্য সমবেদনার ধর্ম। বর্তমান
 যুগের শিক্ষা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথে
 ধাবিত হইয়াছে। এখন সন্তোষের ধর্মই
 প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মূলমন্ত্র—

“যেন তেন প্রকারে কাধসিদ্ধিগরীসী।”

সভ্যসমাজের এই কলহকোলাহলমধ্য বিপ্লব-
 যুগে সত্যনিষ্ঠা উপযুক্ত বিপর্যাস্ত হইয়াও,
 প্রাচ্যসমাজকে সম্পূর্ণরূপে পরিভ্রাণ করিতে
 পারে নাই। এখনও এদেশের প্রশান্ত পটী-
 নিকেতনে যে রূপ সত্যনিষ্ঠা বর্তমান, তাহা
 অল্পজ্বলন্ত। তাহাই আমাদের নিজস্ব
 মহারত্ন। তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা
 “কি আবার মানব হইয়া উঠিতে পারি না ?

সত্য সাহসের ধর্ম। সাহস হারাইলে,
 “সত্যনিষ্ঠা রক্ষা করা যায় না। যে সত্য
 কহিতে সঙ্কচিত হয়, তাহার মত কাপুরুষ

আর কে আছে? তথাপি দেশের শিক্ষা, সভাপন্ন হইবার জন্য উপদেশদান দেশের দৃষ্টান্ত আবাদিকে এমন কাপুরুষ করিয়া তুলিতেছে যে, আমরা সভ্যত্ব হইয়া, কিরাইরা-ঘুরাইরা কাজ শুছাইরা লইবার আশায়, দেশের দোহাই দিয়া, দেশের হট্টবোলে মিলিয়া, মিথ্যা বাগ্জালবিত্তারে দেশোদ্ধারের সুধবগ্নে বিভোর হইয়া, আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করি।

সত্য নিরত নীরবে কর্তব্যপালন করিবার উপদেশ দান করে; কার্য সম্পন্ন হইবামাত্র ফলদানের অলীক আশায় প্রলুব্ধ করিয়া জনসমাজের নিকট বণিকের ক্ষতিভা-গণনার তুল্যদণ্ড সংস্থাপিত করে না। সত্য-নিষ্ঠাই সত্যনিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সে সংস্কার অত্য়পি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

এই সংস্কার একদা আমাদের সমগ্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া ছুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রধান প্রমাণ—রামায়ণ, মহাভারত। হৃদ্যাগত্বে এই দুই মহাকাব্যের পঠন-পাঠন বিরল হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষক-বর্গও এই দুইখানি মহাকাব্যের অনেক অলীক সমালোচনার লিপ্ত হইয়াছেন। একদা এই দুইখানি মহাকাব্য প্রাচ্য সভ্য-নিষ্ঠার প্রধানশিক্ষকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সত্যই কি সে মর্যাদা সহসা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে?

রামায়ণ সভ্যতার ইতিহাস। মহাভারত সভ্যভঙ্গের ইতিহাস। গম্ভীরবে এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও, উভয় কাব্যের প্রতিপাত্ত সিদ্ধান্তে পার্থক্য নাই। সত্যনিষ্ঠার মাহাত্ম্য-কীর্তনে উভয় কাব্যই জনসমাজকে নিরত

সভাপন্ন হইবার জন্য উপদেশদান করিতেছে।

দশরথ কৈকেয়ীকে যে যুগলবয় দান করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার না করিয়াও, দশরথ রামবনবাস নিবারণ করিতে পারিতেন। তথাপি তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াও সত্যরক্ষা করিয়াছিলেন। তখন ভরত মাতুলালয়ে। ভরত আসিয়া কৈকেয়ীর কোশলোপার্জিত রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন না। তিনি বননিরাসিত জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার অধেষণে বহির্গত হইয়া, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবামাত্র সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অমুরোধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন—

“ভবানপি তথৈত্বেষ পিতরং সভাবাদিনম্।

কর্তৃমর্মতি রাজেন্দ্র! ক্ষিত্রমেবাভিষেচনাৎ।”

রামচন্দ্র বলিলেন—“আমি পিতৃসত্য পালন করিতেছি; তুমিও তাহা পালন করিতে প্রবৃত্ত হও। পিতৃনিরোগ আমাকে বনবাস ও তোমাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছে। তুমি রাজ্যভার গ্রহণ না করিলে, পিতৃসত্য বধাধম পালিত হইতে পারে না। আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্র অভিব্যক্ত হইয়া, আমার ভ্রাতৃ তুমিও পিতাকে সভাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন কর।

ভরত পিতৃসত্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্বের তাঁহাকে বিচলিত করিল। তিনি পিতৃনিরোগ লঙ্ঘন করিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার পাছকাষুগল সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া, ভরত চতুর্দশবৎসর রামচন্দ্রের ভ্রাতৃ জটাবহুল ধারণ করিয়া ভোগসুখ বিসর্জন করিলেন। ভরতের

এই আশ্রয়ত্যাগে বিমুগ্ধ হইয়া, কথক-সম্রাটের ভরতচরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া, নানা রাগরাগিণীর আলাপ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে পরিভ্রান্ত করিয়া থাকেন। কোন কোন সমালোচক এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ভরতচরিত্রকে রামায়ণের শ্রেষ্ঠচরিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ভরতের ব্যবহার দ্রাঘদৈর্ঘ্যে সরস হইলেও, পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য-প্রতিপালনের চেষ্টা করে নাই। ভরতের ব্যবহার চতুর্দশবৎসর ধরিয়া দশরথের অবিচারের কথা লোকসমাজে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। তাহা • নিবারণ করিবার জন্যই রামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন—“আমার স্থান তুমিও পিতৃনিয়োগ পালন কর।” আত্মবিসর্জন ভিন্ন সত্যরক্ষা করা যায় না। ভরত বাহা করিয়াছিলেন, দ্রাঘবৎসলের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যরক্ষার জন্য স্বাভাবিক চিন্তাবৃত্তিকেও সংযত করিতে হয়। দশরথ কৈকেয়ীকে প্রত্যাখ্যান করিলে স্বাভাবিক হইত; যে জী স্বামীর স্বেচ্ছানুবর্তিনী নহে, তাহাকে শাস্ত্রশাসনের দোহাই দিয়া পরিত্যাগ করিলেও দশরথের কার্য নিতান্ত অস্বাভাবিক হইত না। তিনি সত্যরক্ষার্থ এই সকল স্বাভাবিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। লঙ্কণের প্ররোচনায় রামচন্দ্র প্রজাবৃন্দের পক্ষগ্রহণ করিয়া বাহবলে সিংহাসন অধিকার করিলে, অস্বাভাবিক হইত না। বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন,—রাম বনগমন করিলে, শাস্ত্রানুসারে সৌভাদেবী সিংহাসন-পাভের অধিকারিণী। সে কুটতর্কের আশ্রয়

গ্রহণ করিয়া কৈকেয়ীকে পরাস্ত করিলেও, অস্বাভাবিক হইত না। এই সকল কুটতর্কের অবতারণা করিয়া মহাকবি দেখাইয়াছেন,—স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত না করিলে সত্যপালন করা যায় না। রামচন্দ্রের সত্যপালন কত সুসংযত চিন্তাবলে সাধিত হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্যই মহাকবি এত কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। জাবালির বক্তৃতায় পিতৃনিয়োগলঙ্ঘনের নানা যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়া, মহাকবি রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া গিয়াছেন।

• প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠার প্রকৃত মর্ম্ম ক্ষতিলাভ-গণনাপরাগণ • পাশ্চাত্যবুদ্ধির বোধগম্য বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠা পাশ্চাত্যশিক্ষকের বিচারে কুসংস্কার বলিয়াই প্রতিপাত। তাহা যুক্তিতর্কের অধীন হইতে সম্মত হয় না। তাহার প্রকৃতমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, তাহাকে কুসংস্কার বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। পাশ্চাত্য-শিক্ষা আমাদের নিকট তাহাই কীর্তন করিতেছে;—বুক ফুলাইয়া, হাত নাড়িয়া, কণ্ঠ কাঁপাইয়া বলিয়া বেড়াইতেছে—“ইহলোকই লোক; তাহার সুখই সুখ।” কেহ তাহাতে প্রতিবাদ করিবারাত্র পাশ্চাত্যসমাজ মালগাট মারিয়া “যুদ্ধং দেহি” বলিয়া বীরবর্পে অগ্রসর হয়। এই পথ প্রকৃতপথ কি না, তাহাতে কিন্তু সমূহ সংশয় আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-বর্গ, সমুচিত সাহসের অভাবে, ফিরাইয়া-ঘুরাইয়া সেই সংশয়ের কথা কখন-কখন ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর একবার বক্তৃতা-

জলে সাহস করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—প্রকৃত মনুষ্যজাতির জন্ত মানবসাহিত্য হইতে চরিত্রসংশোধনের উপায় আবিষ্কার করিতে হইলে, ভারতবর্ষের দিকেই অভ্যুত্থাননির্দেশ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্য মনুষ্যজাতির যে সকল উপায়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সত্যনিষ্ঠাই প্রধান। তাহাই পরম তপস্তা; তাহাতেই ইহপরলোক জয় করিয়া যায়। এই আদর্শ পাশ্চাত্যশিক্ষার মলিন হইয়া গেলে, সমগ্র মানবসমাজ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে! যাহারা রুধিরকর্দমে ধরাভুল পিচ্ছিল করিয়া নিরন্তর নরহত্যার খাতির হইতেছে, তাহার প্রকৃত মনুষ্য লাভ করিয়াছে কি না, তাহাতে বিলক্ষণ সংশয় আছে। যে দিন মানবসমাজ রণশ্রান্ত অবসর অন্তঃকরণে চারিদিকে চাহিয়া “কি করিতেছি” বলিয়া সহসা কাদিয়া উঠিবে, সেদিন ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কেহ তাহাকে শাস্তিদান করিতে পারিবে না। সমগ্র মানবসমাজ যদি স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন করিয়া একমস্ত্রে দীক্ষিত হয়, তবে আর মানবসমাজের চরিত্রসংশোধনের উপায় থাকে না। এইজন্যই ভারতবর্ষের পক্ষে প্রাণপণে তাহার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করা কর্তব্য। গর্বাক্রান্ত পাশ্চাত্যশিক্ষা বাহা বলুক না কেন, একদিন তাহাকে মোক্ষমূলরের ভাষায় বলিতে হইবে:—

And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most want-

ed in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life—again I should point to India.

একজন খৃষ্টধর্ম্মীয়মূলক পাশ্চাত্যপণ্ডিতের এই সকল কথা অতিবাদ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। প্রতীচ্যের তুলনায় প্রাচ্যের মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব আছে, যাহা মানবসমাজকে প্রকৃত মনুষ্যজাতির পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে। সে বিশেষত্ব কেবল ভারতবর্ষেই, জনসমাজের আশ্রয় হইয়াছিল। তাহা যদি কখন সমগ্র ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইতে পারে, তাহাতে কেবল ভারতবর্ষেরই গৌরবগাথা ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। সমগ্র মানবসমাজের চিরপরিজ্ঞাপ্রদ মুক্তি-মন্ত্র যাহার নিভৃত নিকেতনে বিধাতা সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, সে দেশের লোক যদি তাহাকে প্রাণপণে রক্ষা না করিতে পারে, তবে ভারতবর্ষের নাম অতল সলিলে নিমগ্ন হইবে। পাশ্চাত্যশিক্ষাবিড়ম্বিত ভারতবাসীকে যে মহাপুরুষ তাহার চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যরক্ষার সমুদয় করিতে পারিবেন, তিনি যুগাবতাররূপে ভবিষ্যৎশীর্ষগণের প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিবেন। সে অক্ষয়পদ লাভ করিবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি ভারতবর্ষের সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসলেখক। আমরা তাহারই অভ্যুদয়কাল প্রতীক্ষা করিয়া প্রতীচ্য পাণ্ডিত্যের অসঙ্গত ঔদ্ধত্য সহ করিয়া মত্তরক্ষা করিবার জন্ত বিধাতার নিকটে সমুচিত চরিত্রবল ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

বঙ্গদর্শন ।

নৌকাডুবি ।



৬৫

কেমকরীর নিকট হইতে কিরিয়া-আসিয়া
হেমলিনী তাহাদের বসিবার ঘরের
টেবিলের উপর একখানা মত তারি চিঠি
পাইল। লেফাফীর উপরকার হস্তাক্ষর
দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, চিঠিখানি রমেশের
লেখ। স্পন্দিতবক্ষে চিঠিখানি হাতে
করিয়া শরনগৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িতে
লাগিল।

চিঠিতে রমেশ কমলাস্বকীয় সমস্ত
ব্যাপার আত্মপূর্বিক বিস্তারিতভাবে লিখি-
য়াছে। উপসংহারে লিখিয়াছে, “তোমার
সহিত আমার যে বন্ধন জীবন দৃঢ় করিয়া
দিয়াছিলেন, সংসার তাহা ছিন্ন করিয়াছে।
তুমি এখন অস্ত্রের প্রতি চিত্ত সমর্পণ
করিয়াছ—সেজন্য আমি তোমাকে কোনো
দোষ দিতে পারি না—কিন্তু তুমিও
আমাকে দোষ দিয়ে না। যদিও আমি
একদিনের জন্য কমলার প্রতি জীবন মত
ব্যবহার করি নাই, তথাপি ক্রমশ সে যে
আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল,
এ কথা তোমার কাছে আমার স্বীকার করা
কর্তব্য। আজ আমার হৃদয়, কি অবস্থায়

আছে, তাহা আমি নিশ্চয় জানি না।
তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না করিতে, তবে
তোমার মধ্যে আমি আশ্রয়লাভ করিতে
পারিতাম। সেই আশ্বাসেই আমি আমার
বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া তোমার নিকট ছুটিয়া
আসিয়াছিলাম। কিন্তু আজ যখন স্পষ্ট
দেখিলাম—তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া আমার
নিকট হইতে বিমুখ হইয়াছ, যখন শুনিলাম—
অস্ত্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধে তুমি সম্মতি
দিয়াছ, তখন আমারও মন আবার দোলারিত
হইয়া উঠিল। দেখিলাম, এখনো কমলাকে
সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই। ভুলি বা না
ভুলি, তাহাতে সংসারে আমি ছাড়া আর
কাহারো কোনো ক্ষতি নাই। আমারি বা
ক্ষতি কিসের! সংসারে যে ছুটি রমণীকে
আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি,
তাঁহাদিগকে বিশ্বৃত হইবার সাধ্য আমার
নাই এবং তাঁহাদিগকে চিরজীবন স্মরণ
করাই আমার পরম লাভ। আজ প্রাতে
যখন তোমার সহিত কণিক সাক্ষাতের
বিদ্যাবৎ আশাত প্রাপ্ত হইয়া বাসার কিরিয়া
আসিলাম, তখন একবার মনে মনে বলিলাম,
‘আমি হতভাগ্য।’ কিন্তু আর আমি সে

কথা স্বীকার করিব না। আমি সবল-
চিত্তে আনন্দের সহিত তোমার নিকট
বিদায় প্রার্থনা করিতেছি—আমি পরিপূর্ণ
হৃদয়ে তোমার নিকট হইতে প্রস্থান
করিব—তোমাদের কল্যাণে, বিধাতার
কল্যাণে আমি অন্তরের মধ্যে এই বিদায়-
কালে যেন কিছুমাত্র দীনতা অনুভব না
করি। ভূমি স্বধী হও, তোমার মঙ্গল
হউক! আমাকে ভূমি স্বগা করিয়ো না—
আমাকে স্বগা করিবার কোনো কারণ
তোমার নাই।”

অন্নদাবাবু চৌকিতে বসিয়া বই পড়িতে-
ছিলেন। হঠাৎ হেমনলিনীকে দেখিয়া
তিনি চমকিয়া উঠিলেন—কহিলেন, “হেম,
তোমার কি অসুখ করিয়াছে?”

হেমনলিনী কহিল—“না, অসুখ করে
নাই। বাবা, রমেশবাবুর একখানি চিঠি
পাইয়াছি। এই লও, পড়। হইলে আবার
আমাকে ফেরৎ দিয়ো।”

এই বলিয়া চিঠি দিয়া হেমনলিনী চলিয়া
গেল। অন্নদাবাবু চম্মা লইয়া চিঠিখানি
বারহুয়েক পড়িলেন—তাহার পরে হেম-
নলিনীর নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া বুসিয়া
ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে ভাবিয়া
স্থির করিলেন, “এ একপ্রকার ভালই
হইয়াছে। পাত্রহিসাবে রমেশের চেয়ে
নলিনাক্ষ অনেক বেশি প্রার্থনীয়। ক্ষেত্র
হইতে রমেশ যে আপনাই সরিয়া পড়িল, এ
হইল ভাল।”

এই কথা ভাবিতেছেন, এমন-সময়
নলিনাক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে
দেখিয়া অন্নদাবাবু একটু আশ্চর্য্য হইলেন।

আজ পূর্নাঙ্কে নলিনাক্ষের সঙ্গে অনেককাল
দেখাশাফাৎ হইয়াছে, আবার কয়েকঘণ্টা
বাইতে না বাইতেই সে কি মনে করিয়া
আসিল! বৃদ্ধ মনে মনে একটুখানি হাসিয়া
স্থির করিলেন, “হেমনলিনীর প্রতি নলি-
নাক্ষের মন পড়িয়াছে।”

কোনো ছুতা করিয়া হেমনলিনীর
সহিত নলিনাক্ষের দেখা করাইয়া-দিয়া নিজে
সরিয়া যাইবেন কল্পনা করিতেছেন, এমন-
সময় নলিনাক্ষ কহিল—“অন্নদাবাবু, আমার
সঙ্গে আপনার কস্তার বিবাহের প্রস্তাব
উঠিয়াছে। কথাটা বেশিদূর অগ্রসর হইবার
পূর্বে আমার যাহা বক্তব্য আছে, বলিতে
ইচ্ছা করি।”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“ঠিক কথা, সে ত
বলাই কর্তব্য।”

নলিনাক্ষ কহিল—“আপনি জানেন না,
পূর্বেই আমার বিবাহ হইয়াছে।”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“জানি। কিন্তু—”
নলিনাক্ষ। আপনি জানেন জুনিয়া
আশ্চর্য্য হইলাম। কিন্তু তাঁহার স্বভাব
হইয়াছে, এইরূপ আপনি অনুমান করিতে-
ছেন। নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এমন
কি, তিনি বাঁচিয়া আছেন বলিয়া আমি
বিশ্বাস করি।

অন্নদাবাবু কহিলেন—“ঈশ্বর করুন,
তাহাই যেন সত্য হয়। হেম! ‘হেম!’

হেমনলিনী আসিয়া কহিল—“কি বাবা!”

• অন্নদাবাবু। রমেশ তোমাকে যে চিঠি
লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে অংশটুকু—

• হেমনলিনী সেই চিঠিখানি নলিনাক্ষের
হাতে দিয়া কহিল, “এ চিঠির সমস্তটাই তাঁহার

পড়িয়া দেখা কর্তব্য।”—এই বলিয়া হেম-
নলিনী চলিয়া গেল ।

চিঠিখানি পড়া শেষ করিয়া নলিনাক্ষ
স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অন্নদাবাবু
কহিলেন—“এমন শৌচনীর ঘটনা সংসারে
প্রায় ঘটে না। চিঠিখানি পড়িতে দিয়া
আপনার মনে আঘাত দেওয়া হইল—কিন্তু
ইহা আপনার কাছে গোপন করাও আশা-
দের পক্ষে অসম্ভব হইত।”

নলিনাক্ষ একটুখানি চুপ করিয়া বসিয়া-
থাকিয়া অন্নদাবাবুর কাছে বিদায় লইয়া
উঠিল। চলিয়া যাইবার সময় উত্তরের
বারান্দার অদূরে হেমনলিনীকে দেখিতে
পাইল। মনটা হইতে লাগিল একবার তাহার
কাছে যাব। কিন্তু গিয়া কি হইবে? পূর্বে
হেমনলিনীর কাছে সে যেমন সহজে যাইতে
পারিত, এখন তাহার পথ বন্ধ হইয়া গেছে।
মাক্ষণানে অনর্থক একটা বিবাহের প্রস্তাব
আসিয়া উভয়কে দূর করিয়া দিয়াছে। এখন
পরস্পরের সখ্যের মধ্যে নানাপ্রকার কট-
লতা আসিয়া পড়িয়াছে।

হেমনলিনীকে দেখিয়া নলিনাক্ষের মনে
আঘাত লাগিল। ঐ যে নারী স্তব্ধ হইয়া
পাড়াইয়া, উহার হির-শাস্ত্র মূর্তিটি উহার অন্তঃ-
করণকে কেমন করিয়া বহন করিতেছে?।
এই মুহূর্ত্তে উহার মন যে কি করিতেছে,
তাহা ঠিকমত জানিবার কোনো উপায় নাই—
নলিনাক্ষকে তাহার কোনো প্রয়োজন আছে
কি না, সে প্রশ্নও করা যায় না, তাহার উত্তর
পাওয়াও কঠিন। নলিনাক্ষের পীড়িত চিত্ত
তাবিতে লাগিল, “ইহাকে কোনো সাহসী
দেওয়া যায় কি না? কিন্তু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে

কি দুর্ভেদ্য ব্যবধান! মনজিনিষটা কি
ভরস্বর একাকী—আপনার গভীর গুহাস্ত-
রালের মাক্ষণান হইতে নিজেকে একটুখানি
বাস্তব করিবার জন্য যে একটা ভাষা তাহার
স্বল, তাহাও কত অসম্পূর্ণ—আবার অধি-
কাংশসময়ে সেই সঙ্কীর্ণ সহায়কেও বর্জন
করিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়।
হয় ত অতিবড় দুঃসহবেদনা অত্যন্ত কাছেই
আছে, কিন্তু কিছুই করিবার নাই—যেন
এখান হইতে ঐ বারান্দাটুকু সহস্রযোজন-
দূর।”

• নলিনাক্ষ একটু ঘুরিয়া ঐ বারান্দার
সামনে দিয়া গাড়িতে উঠিবে স্থির করিল—
মনে করিল, যদি হেমনলিনী তাহাকে কোনো
কথা জিজ্ঞাসা করে;—বারান্দার সম্মুখে
যখন আসিল, দেখিল, হেমনলিনী বারান্দা
ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে সরিয়া গেছে! হৃদয়ের
সহিত হৃদয়ের সাক্ষাৎ সহজ নহে, মাহুবেগ
সহিত মাহুবেগ সখ্য সরল নহে, এই কথা
চিন্তা করিয়া ভারাক্রান্তচিত্তে নলিনাক্ষ
গাড়িতে উঠিল।

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে যোগেন্দ্র আসিয়া
উপস্থিত হইল। অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করি-
লেন—“কি যোগেন, একলা যে?”

যোগেন্দ্র কহিল, “দ্বিতীয় আর কোন্
ব্যক্তিকে প্রত্যাশা করিতেছ তুমি?”

অন্নদা কহিলেন—“কেন? রমেশ?”

যোগেন্দ্র। তাহার প্রথমদিনের অভ্য-
র্থনাটাই কি ভঙ্গলোকের পক্ষে বধেষ্ঠ হয়
নাই! কানীর গন্ধার কাঁপ দিয়া মরিয়া যদি
তাহার শিবফলাভ না হইয়া থাকে, তবে আর
কি হইয়াছে, আমি নিশ্চয় জানি না। কাল

হইতে এপৰ্য্যন্ত তাহার আর দেখা নাই, টেবিলে একখানা কাগজে লেখা আছে—“পালাই—তোমার রমেশ ।” ঐ সব কবিত্ব আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই । সুতরাং আমাকেও এখান হইতে পালাইতে হইল—আমার হেডমাষ্টারিই ভাল—তাহাতে সমস্তই খুব স্পষ্ট—রাপসা কিছুই নাই ।

অন্নদাবাবু কহিলেন—“হেমের জন্ত ও একটা কিছু স্থির—”

যোগেন্দ্র । আর কেন ? আমিই কেবল স্থির করিব, আর তোমরা অস্থির করিতে থাকিবে, এ খেলা বেহিদ্দিন ভাল লাগে না । আমাকে আর কিছুতে জড়াইয়ো না—আমি বাহা ভাল বুঝিতে পারি না, সেটা আমার ধাত্তে সহে না । হঠাৎ দুর্কৌশল হইয়া পড়িবার যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা হেমের আছে, সেটা আমাকে কিছু কাবু করে । কাল সকালের গাড়িতে আমি বিদায় হইব, পথে বাঁকিগুরে আমার কাজ আছে ।

অন্নদাবাবু চুপ করিয়া বসিয়া নিজের মাথার হাত বুলাইতে লাগিলেন । সংসারের সমস্তা আবারে দুঃস্থ হইয়া আসিয়াছে ।

৬৬

শৈলজা এবং তাহার পিতা নলিনাকের বাড়ীতে আসিয়াছেন । শৈলজা কমলাকে লইয়া একটা কোণের ঘরে বসিয়া কিস্কিস্ করিতেছিল, চক্রবর্তী ক্ষেমকরীর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন ।

চক্রবর্তী । আমার ত ছুটি কুরাইয়া আসিল—কালই গাড়িগুরে বাইতে হইবে । যদি হরিদাসী আপনাদের কোনোরকমে বিরক্ত করিয়া থাকে—বা যদি আপনাদের পক্ষে—

ক্ষেমকরী । ও আবার কিরকম কথা চক্রবর্তীমশায় ? আপনার মনের ভাবটা কি শুনি ? আপনি কি কোনো ছুতা করিয়া আপনাদের মেয়েটিকে কুরাইয়া লইতে চান ?

চক্রবর্তী । আমাকে ভেতন লোক পান নাই । আমি দিয়া কুরাইয়া লইবার পাত্র নই—কিন্তু যদি আপনার কিছুমাত্র অন্তর্বিধা হয়—

ক্ষেমকরী । চক্রবর্তীমশায়, ওটা আপনার সরল কথা নয়—মনে মনে বেশ জানেন, হরিদাসীর মত অমন লক্ষ্মী মেয়েটিকে কাছে রাখিলে সুবিধার সীমা নাই, তবু—

চক্রবর্তী । না না, আর বলিতে হইবে না—আমি ধরা পড়িয়া গেছি । ওটা একটা ছলমাত্র—আপনার মুখে হরিদাসীর শুণ শুনিবার জন্তই কথাটা আমার পাতা । কিন্তু একটা ভাবনা আছে—পাছে নলিনাকবাবু মনে করেন যে, এ আবার একটা উপসর্গ কেঁপা হইতে যাড়ে পড়িল ! আমাদের মেয়েটি অভিমানী—যদি নলিনাকের লেশমাত্র বিরক্তিতাব ও দেখিতে পায়, তবে উহার পক্ষে বড় কঠিন হইবে ।

ক্ষেমকরী । হরি বল ! নলিনের আবার বিরক্তি ! ওর সে ক্ষমতাই নাই ।

চক্রবর্তী । সে কথা ঠিক । কিন্তু দেখুন, হরিদাসীকে আমি নাকি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, তাই ক্রুর সবচেয়ে আমি অল্পে লম্বট হইতে পারি না । নলিনাক যে ওর পরে বিরক্ত হইবেন না, উদাসীনের মত থাকিবেন, এইটুকুই আমার পক্ষে খেচট মনে হয় না । তাঁর বাড়ীতে এখন হরিদাসী আছে, এখন

তাকে তিনি আপনার লোক বলিয়া ঘেহ করিবেন, এ না হইলে মনে বড় সঙ্কোচ-
বোধ হয়। ও ত ঘরের দেয়াল নয়, ও
একটা মানুষ—ওর প্রতি বিরক্তও হইবেন
না, ঘেহও করিবেন না, ও আছে ও আছে,
এইটুকুমাত্র সম্বন্ধ, গৈটাবে কেন—

কেমকরী। চক্রবর্ত্তিমশায়, আপনি
বেশি তাবিবেন না—কোনো লোককে
আপনার লোক বলিয়া ঘেহ করা আমার
নলিনের পক্ষে শক্ত নয়। বাহির হইতে
কিছুই বুঝিবার জো নাই, কিন্তু এই যে হরি-
দাসী আমার এখানে আছে, ও কিসে স্বচ্ছন্দে
থাকে, ওর কিসে ভাগ হয়, সে চিন্তা নিশ্চয়ই
নলিনের মনে লাগিয়া আছে—খুব সম্ভব, সে-
র কম ব্যবস্থাও সে কিছু-না-কিছু করিতেছে,
আমরা তাহা জানিতেও পারিতেছি না।

চক্রবর্ত্তী। শুনিয়া বড় নিশ্চিন্ত হইলাম।
তবু আমি বাইবার আগে একবার বিশেষ
করিয়া নলিনাক্ষবাবুকে বলিয়া বাইতে চাই।
একটা জীলোকের সম্পূর্ণ ভার লইতে পারে,
এমন পুরুষ জগতে অল্পই মেলে—ভগবান
যখন নলিনাক্ষবাবুকে সেই বথার্ঘ পৌরুষ
দিয়াছেন, তখন তিনি যেন মিথ্যা সঙ্কোচে
হরিদাসীকে তফাতে রাখিয়া না চলেন,
তিনি যেন বথার্ঘ আত্মীয়ের মত তাহাকে
নিভাস্ত সহজভাবে গ্রহণ ও রক্ষা করেন,
তাঁহার কাছে এই প্রার্থনাটি জানাইতে
চাই।

নলিনাক্ষের প্রতি চক্রবর্ত্তীর এই বিশ্বাস
দেখিয়া কেমকরীর মন গলিয়া গেল। তিনি
কহিলেন—“গাছে আপনারা কিছু মনে
করেন, এই ভয়েই হরিদাসীকে জামি মলি-

নাক্ষের সামনে তেমন করিয়া বাহির হইতে
দিই নাই—কিন্তু আমার ছেলেকে আমি ও
জানি, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া আপনি
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।”

চক্রবর্ত্তী। তবে আপনার কাছে সব
কথা খোলসা করিয়াই বলি। শুনিয়াছি,
নলিনাক্ষবাবুর বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে—
বধূটির বয়সও নাকি অল্প নয় এবং তাঁহার
শিক্ষাদীক্ষা আমাদের সমাজের সঙ্গে মেলে
না। তাই ভাবিতেছিলাম, হয় ত হরি-
দাসীর—

কেমকরী। সে আর আমি বুঝি না।
সে হইলে ভাবনা ছিল বই কি! কিন্তু সে
বিবাহ হইবে না—

চক্রবর্ত্তী। সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে ?

কেমকরী। গড়েই নি, তার ভাঙিবে
কি! নলিনের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না,
আমিই জেদ করিতেছিলাম। কিন্তু সে
জেদ ছাড়িয়াছি। বাহা হইবার নয়, তাহা
জোর করিয়া ঘটাইয়া মজল নাই। ভগ-
বানের কি ইচ্ছা, জানি না—মরিবার পূর্বে
বুঝি আর বৌ দেখিয়া বাইতে পারিলাম না।

চক্রবর্ত্তী। অমন কথা বলিবেন না।
আমরা আছি কি করিতে? ঘটকবিদ্যার
এবং মিঠার আদার না করিয়া ছাড়িব বুঝি?

কেমকরী। আপনার মুখে ফুলচন্দন
পড়ুক চক্রবর্ত্তিমশায়! আমার মনে বড়
চঃখ আছে যে, নলিন এই বয়সে আমারি
জন্তে সংসারধর্মে প্রবেশ করিতে পারিল
না। তাই আমি বড় ব্যস্ত হইয়া সকল দিক্
না তাবিয়া একটা সম্বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম
—সে আপা ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আপনার

একটা দেখিয়া দিন। দেখি করিবেন না—
আমি বেশিদিন বাঁচিব না।

চক্রবর্তী। ও কথা বলিলে শুনিব
কেন! আপনাকে বাঁচিতেও হইবে,
বৌয়েরও মুখ দেখিবেন। আপনার যে-
রকম বোটা দরকার, সে আমি ঠিক জানি;
নিতান্ত কচি হইলেও চলিবে না, অথচ
আপনারকে ভক্তিপ্রদা করিবে, বাধ্য হইয়া
চলিবে—এ নহিলে আমাদের পছন্দ হইবে
না। তা সে আপনি কিছুই ভাবিবেন না—
ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই সে ঠিক হইয়াই
আছে! এখন যদি অসুস্থ হইতেন, একবার
হরিদাসীকে তার কর্তব্যসম্বন্ধে দুচক্ষুতে কথা
উপদেশ করিয়া আসি—অমনি শৈলকেও
এখানে পাঠাইয়া দিই—আপনাকে দেখিয়া
অবধি আপনার কথা তাহার মুখে আর ধরে
না।

কমলকরী কহিলেন, “না, আপনারা
তিনজনেই এক ঘরে গিয়া বসুন, আমার
একটু কাজ আছে।”

চক্রবর্তী হাসিয়া কহিলেন, “অগতঃ
আপনাদের কাজ আছে বলিয়াই আমাদের
কল্যাণ। কাজের পরিচয় নিশ্চয়ই যখনসময়ে
পাওয়া যাইবে। নলিনাক্ষবাবুর বধুর কল্যাণে
ব্রাহ্মণের ভাগ্যে মিষ্টারের পালা শুরু হউক!”

চক্রবর্তী, শৈল ও কমলার কাছে আসিয়া
দেখিলেন, কমলার দুটি চক্ষু চোখের জলের
আভাসে এখনো ছলছল করিতেছে।
চক্রবর্তী শৈলজার পাশে বসিয়া নীরবে
তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন।
শৈল কহিল, “বাবা, আমি কমলকে বলিতে-
ছিলাম যে, নলিনাক্ষবাবুকে সকল কথা বলিয়া

বলিবার এখন সময় হইয়াছে, তাই লইয়া
৫তমার এই নির্যাস হরিদাসী আমার সঙ্গে
বগড়া করিতেছে।”

কমল বলিয়া উঠিল—“না দিদি, না,
তোমার দুটি পারে পড়ি,—তুমি এমন কথা
মুখে আনিয়ো না। সে কিছুতেই হইবে
না।”

শৈল কহিল—“কি তোমার বুদ্ধি! তুমি
চুপ করিয়া থাক, আর হেমেন্দ্রিনীর সঙ্গে
নলিনাক্ষবাবুর বিবাহ হইয়া যাক! বিবাহের
পরদিন হইতে আর আজ পর্যন্ত কেবলি
ত যত-রাজ্যের অন্তঃসত্ত্বার মধ্যে পাক
খাইয়া মরিলি, আমার আর একটা নতুন
অনাস্তিগের দরকার কি?”

কমল কহিল—“দিদি, আমার কথা
কাহাকেও বলিবার নয়—আমি সব সহিতে
পারিব, সে লজ্জা সহিতে পারিব না। আমি
যেমন আছি, বেশ আছি, আমার কোনো
দুঃখ নাই, কিন্তু যদি সব কথা প্রকাশ করিয়া
দাঁও, তবে আমি কোনমুখে আর একদণ্ড
এ বাড়ীতে থাকিব? তবে আমি বাঁচিব
কি করিয়া?”

শৈল এ কথার কোনো উত্তর দিতে
পারিল না—কিন্তু তাই বলিয়া হেমেন্দ্রিনীর
সঙ্গে নলিনাক্ষের বিবাহ হইয়া যাইবে, ইহা
চুপ করিয়া সহ্য করা তাহার পক্ষে বড়
কঠিন।

চক্রবর্তী কহিলেন—“যে বিবাহের কথা
বলিতেছ, সেটা খটিতেই হইবে, এমন কি
কথা আছে!”

শৈল। বল কি বাবা, নলিনাক্ষবাবুর
মা যে আশীর্বাদ করিয়া আসিয়াছেন।

চক্রবর্তী । বিশ্ববরের আশীর্বাদে সে আশীর্বাদ ফাঁসিয়া গেছে । মা কমল, তোমার কোনো ভয় নাই, ধর্ম তোমার সহায় আছেন ।

কমলা সুব কথা স্পষ্ট না বুঝিয়া ছই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া খুড়ামশায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ।

তিনি কহিলেন, “সে বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে । এ বিবাহে নলিনাক্ষবাবুও রাজি নহেন এবং তাঁহার মার মাধ্যমও সুবুদ্ধি আসিয়াছে ।”

শৈলজা ভারি খুসি হইয়া কহিল—“বাচা গেল বাবা ! কাল এই খবরটা শুনিয়া রাজে আমি ঘুমাইতে পারি নাই । কিন্তু সে বাই হোক, কমল কি নিশ্চয় ঘরে চিরদিন এমনি পরের মত কাটাইবে ? কবে সব পরিকার হইয়া বাইবে ?”

চক্রবর্তী । ব্যস্ত হোস কেন শৈল ? যখন ঠিক সময় আসিবে, তখন সমস্ত সহজ হইয়া বাইবে ।

কমল কহিল—“এখন যা হইয়াছে, এই সহজ—এর চেয়ে সহজ আর কিছু হইতে পারে না । আমি বেশ সুখে আছি, আমাকে এর চেয়ে সুখ দিতে গিয়া আবার আমার ভাগ্যকে কিরাইয়া দিয়ো না খুড়ামশায় ! আমি তোমাদের পায়ে ধরি, তোমরা কাহাকেও কিছু বলিয়ো না, আমাকে এই ঘরের একটা কোণে কেলিয়া আমার কথা তুলিয়া যাও । আমি খুব সুখে আছি ।”— বলিতে বলিতে কমলার ছই চোখ দিয়া বহুদূর করিয়া জল পড়িতে লাগিল ।

চক্রবর্তী ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন—

“ও কি মা, কীদ কেন ? তুমি বাহা বলিতেছ, আমি বেশ বুঝিতেছি । তোমার এই শান্তিতে আমরা কি হাত দিতে পারি ! বিধাতা আপনি বাহা ধীরে ধীরে করিতেছেন, আমরা নির্যোধের মত তার মধ্যে পড়িয়া কি সমস্ত তপুল করিয়া দিব ? কোনো ভয় নাই ! আমার এত বয়স হইয়া গেল, আমি কি স্থির হইয়া থাকিতে জানিনা ?”

এমন-সময় উমেশ মরে প্রবেশ করিয়া তাহার আকর্ষবিস্ফারিত হস্ত লইয়া দাঁড়াইল ।

খুড়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কিরে উমেশ, খবর কি ?”

উমেশ কহিল, “রমেশবাবু নীচে দাঁড়াইয়া আছেন, ডাক্তারবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।”

কমলার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল । খুড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন— কহিলেন—“ভয় নাই মা, আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি ।”

খুড়া নীচে আসিয়া একেবারে রমেশের হাত ধরিয়া কহিলেন—“আমুন রমেশবাবু, রাত্তার বেড়াইতে বেড়াইতে আপনার সঙ্গে গোটাঘরেক কথা কহিব ।”

রমেশ আশ্চর্য হইয়া কলিল—“খুড়া-মশায়, আপনি এখানে কোথা হইতে ?”

খুড়া কহিলেন, “আপনার জন্তই আছি— দেখা হইল, বড় ভাল হইল । আমুন, আর দেরি নহ, কাজের কথাটা শেষ করিয়া ফেলা যাক ।”—বলিয়া রমেশকে রাত্তার টানিয়া লইয়া কিছুদূর গিয়া কহিলেন—“রমেশবাবু, আপনি এ বাড়ীতে কেন আসিয়াছেন ?”

রমেশ কহিল, “নলিনাক্ষডাক্তারকে খুঁজিতে আসিয়াছিলাম! তাঁহাকে কমলার কথা আগাগোড়া সমস্ত খুলিয়া বলা উচিত স্থির করিয়াছি। আমার এক একবার মনে হয়, হয় ত কমলা বাঁচিয়া আছে।”

খুড়া কহিলেন, “যদি কমলা বাঁচিয়াই থাকে এবং যদি নলিনাক্ষের সঙ্গে তার দেখা হয়, তবে আপনাদের মুখে নলিনাক্ষ সমস্ত ইতিহাস শুনিবে। কি সুবিধা হইবে? তাঁহার বৃদ্ধা মা আছেন, তিনি এসব কথা জানিতে পারিলে কমলার পক্ষে কি ভাল হইবে?”

রমেশ কহিল—“সামাজিক হিসাবে কি কল হইবে, জানি না—কিন্তু কমলাকে যে কোনো অপরাধ স্পর্শ করে নাই, সেটা ত নলিনাক্ষের জানা চাই। কমলার যদি মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে নলিনাক্ষবাবু তাঁহার স্মৃতিকে ত সম্মান করিতে পারিবেন!”

খুড়া কহিলেন—“আপনাদের ও সব একেলে কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না—কমলা যদি মরিয়াই থাকে, তবে তাঁহার একরাত্রির স্বামীর কাছে তাহার স্মৃতিটাকে লইয়া টানাটানি করিবার কোনো দরকার দেখি না। ঐ যে বাড়ীটা দেখিতেছেন, ঐ বাড়ীতে আমার বাসা। কাল সকালে যদি একবার আসিতে পারেন, তবে আপনাকে সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলিব। কিন্তু তাঁহার পূর্বে নলিনাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা করিবেন না, এই আমার অনুরোধ!”

রমেশ বলিল, “আচ্ছা।”

খুড়া কিরিয়া আসিয়া কমলাকে কহিলেন—“মা, কাল সকালে তোমাকে

আমাদের বাড়ীতে বাইতে হইবে। সেখানে তুমি নিজে রমেশবাবুকে বুঝাইয়া বলিবে, এই আমি স্থির করিয়াছি।”

কমলা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। খুড়া কহিলেন, “আমি নিশ্চয় জানি, তাহা না হইলে চলিবে না—একেলে ছেলেদের কর্তব্যবুদ্ধি সেকেলে শোকের কথার ভোণে নী। মা, মন হইতে সঙ্কোচ দূর করিয়া ফেল—এখন তোমার যেখানে অধিকার, অন্ত লোককে আর সেখানে পদার্পণ করিতে দিবে না, এ ত তোমার কাজ। এ সম্বন্ধে আমাদের ত তেমন জোর থাকিবে না।”

কমলা তবু মুখ নীচু করিয়া রহিল। খুড়া কহিলেন—“মা, অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, এখন এই ছোটোখাটো জঞ্জালগুলো শেষবারের মত বাঁটাইয়া ফেলিতে সঙ্কোচ করিয়ো না।”

এমন সময়ে পদশব্দ শুনিয়া কমলা মুখ তুলিয়াই দেখিল—দ্বারের সম্মুখে নলিনাক্ষ। একেবারে তাহার চোখের উপরেই নলিনাক্ষের দুই চোখ পড়িয়া গেল—অন্তদিন নলিনাক্ষ যেমন তাড়াহাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া চলিয়া যায়, আজ যেন তেমন তাড়া করিল না। যদিও কণকালমাত্র কমলার দিকে সে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার সেই কণকালের দৃষ্টি কমলার মুখ হইতে কি যেন আদার করিয়া লইল, অন্তদিনের মত অনধিকারের সঙ্কোচে দেখিবার জিনিষটিকে প্রত্যাখ্যান করিল না। পরমুহূর্তেই শৈলজাকে দেখিয়া চলিয়া বাইতে উদ্ভত হইতেই খুড়া কহিলেন, “নলিনাক্ষবাবু, পালাইবেন না—আপনাকে আমরা আদ্যীর বলিয়াই জানি। এটি আমার মেয়ে

উঠিয়া আসিবে, এমন-সময় খাটের ওপাশে মেঝের উপরে ও কে অকালে মুখ ঝাঁপিয়া লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশাইতে চম্ভিল ! হায়রে কমলা, লজ্জা রাধিবার আর স্থান নাই ! সে আজ কুলুজিতে গোলাপ সাজাইয়া বহুতে নলিনাক্ষের বিছানা করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ নলিনাক্ষের পারের শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার ওপাশে গিয়া লুকাইয়াছিল—এখন পালানোও অসম্ভব, লুকানোও কঠিন ।

তাহার রানীকৃত-লজ্জা-সমেত এই ধুলির উপরে সে এমন একান্তভাবে ধরা পড়িয়া গেল !

নলিনাক্ষ এই লজ্জিতাকে মুক্তি দিবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল । দরজা পর্যন্ত গিয়া একবার দাঁড়াইল । কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল—কমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল—“তুমি ওঠ, আমার কাছে তোমার কোনো লজ্জা নাই ।”

ক্রমশ ।

রামায়ণের রচনাকাল ।

আৰ্ঘ্যপ্রয়োগ । . .

“আৰ্ঘ্য ধৰ্মোপদেশক বেবশাস্ত্রাবিরোধিনা ।

যতর্কণামুসন্ধস্তে স ধৰ্ম্মং বেদ নেতরঃ ।”

রামায়ণের রচনাকাল বহুপুৰাতন । তাহার নানা প্রমাণ রামায়ণের রচনারীতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান আছে । আলোচনার প্রবৃত্ত হইবামাত্র অনেক বিষয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব দৃষ্টিগ্ৰে পতিত হয় । তন্মধ্যে “আৰ্ঘ্যপ্রয়োগের” বাহ্য্য একটি সুপরিচিত বিশেষত্ব ।

আৰ্ঘ্যপ্রয়োগ পারিভাষিক সংজ্ঞারূপে পরিচিত হইয়াছে । কোন্ সময়ে হইতে তাহা প্রচলিত হইল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই । ব্যাকরণশাস্ত্রে আৰ্ঘ্যপ্রয়োগ-

নামক কোন বিশেষ প্রয়োগের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না । পুরাতন কোষ-শাস্ত্রেও কোনরূপ বিশেষ ব্যুৎপত্তি উল্লিখিত হয় নাই । আৰ্ঘ্যপ্রয়োগের অর্থ কি ?

কোন কোন আধুনিক অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়,—যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ, অথচ ঋষিলেখকের লেখনীপ্রসূত বলিয়া ঋষিগৌরবে সমাদরপ্রাপ্ত, তাহারই নাম আৰ্ঘ্যপ্রয়োগ । ঋষিলেখক ভিন্ন অন্য লেখকের পক্ষে সেরূপ প্রয়োগের ব্যবহার করিবার অধিকার নাই ;—তাহা অসংস্কৃত—কেবল ঋষিবাক্য বলিয়াই রক্ষা ! ইহাই কি আৰ্ঘ্যপ্রয়োগের প্রকৃত ব্যাখ্যা ?

* “ব্যাকরণোক্ত অমুশাসন উল্লেখ করিয়া ঋষিপ্রসূত অসাধুপ্রয়োগ”—বিষকোষনামক আধুনিক অভিধানে “আৰ্ঘ্যপ্রয়োগের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহার প্রমাণ কি, সে কথা উল্লিখিত হয় নাই ।

ইহা প্রকৃত ব্যাখ্যা। হইলে, রামায়ণের আৰ্হপ্রয়োগের বাহুল্য তাহার রচনাকাল-নির্ণয়ের পথপ্রদর্শন করিতে পারিবে না। তাহাতে কেবল এই পর্য্যন্ত জানা যাইবে,— রামায়ণ ঋষিলেখকের লেখনীপ্রসূত!

বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আৰ্হ-প্রয়োগের পরিচয়, প্রদান করিবার জন্য আর একটি নূতনধরণের সংজ্ঞার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই শ্রেণীর প্রয়োগকে “সারসিক-প্রয়োগ-বিরুদ্ধ,” অথবা “অসারসিক” নামে অভিহিত করিয়াছেন।*

“সারসিক”প্রয়োগ কাহাকে বলে, তাহা বোধগম্য হয় না! ব্যাকরণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের বিচারকালে “স্ব-রস” নামে একটি কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি লিপিকরপ্রমাদে সেই “স্ব-রস” শব্দ “সারসিক” পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও অর্থগ্রহণ করা কঠিন। “স্বারসিক” শব্দের অর্থ—ইচ্ছাকৃত। দত্তমহাশয় “অসারসিক” শব্দের যেরূপ উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তদ্বারা “অসারসিক” প্রয়োগকে প্রকারান্তরে অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার মতে সেরূপ প্রয়োগ ব্যাকরণবিরুদ্ধ—অশুদ্ধ—অপ্রামাণ্য!

রামায়ণের রচনাকাল নির্ণয় করিতে গিয়া দত্তমহাশয় স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন,— “সে সময়ে বৈদিকভাষা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া সংস্কৃত অর্থাৎ পরিষ্কৃত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তখনও সর্বতোভাবে সার্বভৌম ভাষায় পরিণত হয় নাই।”

এই সিদ্ধান্ত সর্মাচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বৈদিকভাষা অসংস্কৃত-ভাষা! তাহাই পরিষ্কৃত হইয়া সংস্কৃত-ভাষায় পরিণত হইয়াছিল! ইহা সাহেব-দিগের সিদ্ধান্ত।† ভারতবর্ষের সাহিত্য এই সিদ্ধান্তকে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না।‡

বৈদিক ও লৌকিক নামক উভয়-শ্রেণীর সংস্কৃতভাষাই সাহিত্যের ভাষা। তাহা রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বেও সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত। রামায়ণেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। § পাণিনির তৃতীয় পুরাতন বৈয়াকরণের আবির্ভাবের পূর্বেও বৈদিক এবং লৌকিক ভাষা সাহিত্যের ভাষা বলিয়া পরিচিত ছিল। পাণিনিহুঞ্জেণ লৌকিকসাহিত্যেরও নানা গ্রন্থ বর্তমান থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণিনি নিজে “জাযবতীজয়” নামক

* ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়। দ্বিতীয়ভাগ। উপক্রমণিকা।

† By the term *classical or later language* of those literary monuments which are written in conformity with the rules of native grammar.—Whitney's Sanskrit Grammar : Introduction.

‡ যে ভাষা “শব্দরূপ জায় ঝাড়িতে ঝাড়িতে” সংস্কারসম্পন্ন হইয়া বিবৰ্ণাখ্যাত হইয়াছিল, তাহারই নাম “সংস্কৃত-ভাষা”। তাহা বৈদিক ও লৌকিক নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত। এই উভয় ভাগেরই সাধারণ নাম—সংস্কৃতভাষা। পতঞ্জলির “মহাভাষ্যে” সংস্কৃতভাষার এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল শব্দ এইরূপে সংস্কারসম্পন্ন হয় নাই, পতঞ্জলি তাহাদিগকে “অপশব্দ” নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। বৈদিকসাহিত্যে “অপশব্দ” নাই; তাহার সকল শব্দই ব্যাকরণসম্মত—পরিষ্কৃত—সংস্কৃত।

§ রামায়ণে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র, পুরাণ, ইতিহাস, যজুর্ভূতি, কাব্য ও নাটকাদির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শৈল, এরি মেয়েকে 'আপনি' চিকিৎসা করিয়াছেন।" শৈল নলিনাককে নমস্কার করিল এবং নলিনাক প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মেয়েটি ভাল আছে?"

শৈল কহিল—"ভাল আছে।"

খুড়া কহিলেন—"আপনাকে যে পেট ভরিয়া দেখিয়া লইব, এমন অবসর ত আপনি দেন না—এখন, আসিলেন যদি ত একটু বসুন।"

নলিনাককে বসাইয়া খুড়া দৈখিলেন, পশ্চাৎ হইতে কমলা কখন সন্নিহিত পড়িয়াছে। নলিনাকের সেই একমুহূর্তের দৃষ্টিটি লইয়া সে পুলকিত বিষয়ে আপনার ঘরে মনটাকে সংবরণ করিতে গেছে।

ইতিমধ্যে ক্ষেমকরী আসিয়া কহিলেন, "চক্রবর্ত্তিমশায়, কষ্ট করিয়া একবার উঠিতে হইতেছে।"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"যখন আপনি কাজে গেলেন, তখন হইতেই এটুকু কষ্টের জন্ত আমি পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলাম।"

আহার সমাধা হইলে পর বসিবার ঘরে আসিয়া চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"একটু বসুন, আমি আসিতেছি।"—বলিয়া পরক্ষণেই অস্ত্র ঘর হইতে কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে নলিনাক ও ক্ষেমকরীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে শৈলজাও আসিল।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"নলিনাকবাবু, আপনি আমাদের হরিদাসীকে পর মনে করিয়া সঙ্কোচ করিবেন না—এই ছুঃখিনীকে আপনারাই ঘরে আমি রাখিয়া বাইতেছি—

ইহাকে সম্পূর্ণই আপনারদের করিয়া লইবেন। ইহাকে আর কিছু দিতে হইবে না, আপনাদের সকলের সেবা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দিবেন—আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, আপনাদের কাছে জ্ঞানপুৰুষক এ একদিনের জন্তও অপরাধিনী হইবে না।"

কমলা লজ্জার মুখখানি রাঙা করিয়া নতশিরে বসিয়া রহিল। ক্ষেমকরী কহিলেন—"চক্রবর্ত্তিমশায়, আপনি কিছুই ভাবিবেন না, হরিদাসী আমাদের ঘরের মেয়েই হইল। ওকে আমাদের কোনো কাজ দিবার জন্ত আমাদের তরফ হইতে আজ পর্যন্ত কোনো চেষ্টা করিবার দরকারই হয় নাই। এ বাড়ীর রান্নাঘরে, তাঁড়ার ঘরে এতদিন আমার শাসনই একমাত্র প্রবল ছিল, এখন আমি সেখানে কেহই না। চাকর-বাকররাও আমাকে আর বাড়ীর গৃহিণী বলিয়া গণ্যই করে না। কেমন করিয়া যে আশ্বে-আশ্বে আমরা এমন অবস্থাটা হইল, তাহা আমি টেরও পাইলাম না। আমার গোটাকরেক চাষি ছিল, সেও কৌশল করিয়া হরিদাসী আশ্রয় লাভ করিয়াছে—চক্রবর্ত্তিমশায়, আপনার এই ডাকাত-মেয়েটির জন্তে আপনি আর কি চান বলুন দেখি? এখন সব চেয়ে বড় ডাকাতি হয়, যদি আপনি বলেন, এই মেয়েটিকে আমরা লইয়া যাইব।"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"আমি যেন বলিলাম, কিন্তু মেয়েটি কি নড়িবে? তা মনেও করিবেন না। উহাকে আপনারা এমন ভুলাইয়াছেন যে, আজ আপনারা ছাড়া ও আর পৃথিবীতে কাহাকেও জানে না।

হৃৎখের জীবনে এতদিন পরে ও আপনাদের কাছেই আজ শান্তি পাইয়াছে—ভগবান্ ওর সেই শান্তি নির্কিয় করুন, আপনারা চিরদিন ওর ‘পরে’ প্রসন্ন থাকুন, আমরা উহাকে সেই আশীর্বাদ করি।”

বলিতে বলিতে চক্রবর্তীর চক্ষু সম্মল হইয়া আসিল। নলিনাক্ষ কিছু না বলিয়া শুক্ক হইয়া চক্রবর্তীর কথা শুনিতেছিল; যখন সকলে স্থিদায় লইয়া গেলেন, তখন ধীরে ধীরে সে আপনার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন শীতের সূর্যাস্তকাল তাহার সমস্ত শয়নঘরটিকে নববিবাহের রক্তিমচ্ছটার রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই রক্তবর্ণের আভা নলিনাক্ষের সমস্ত রোমকূপ ভেদ করিয়া তাহার অন্তঃকরণকে যেন রাঙাইয়া তুলিল।

‘আজ সকালে নলিনাক্ষের এক হিন্দুস্থানী বন্ধুর কাছ হইতে একটুকরি গোলাপ আসিয়াছিল। ঘর সায়াইবার জন্ত সেই গোলাপের টুকরি ক্ষেমকরী কমলার হাতে দিয়াছিলেন। নলিনাক্ষের শয়নঘরের প্রান্তে একটি ফুলদানী হইতে সেই গুটলাপের গন্ধ তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ‘সেই নিশ্চয় ঘরের বাতায়নে আরক্ত সন্ধ্যার সঙ্গে গোলাপের গন্ধ মিশিয়া নলিনাক্ষের মনকে কেমন যেন উতলা করিয়া তুলিল। প্রকৃতির সঙ্গে আপন মনের একটা যোগের আনন্দ অজুতব করা নলিনাক্ষের একটা বিশেষ সাধনা ছিল—কিন্তু আজ সেই যোগের মধ্যে এ কি একটা নূতন রসের সঞ্চার হইয়াছে—তাহার সে শুদ্ধতা কোথায়, সে শুদ্ধতা কোথায়! নলিনাক্ষের

মর্মস্থানের নাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া আর ঐ পাণ্ডুরতম হৃদয় দিগন্তের রেখাটি পর্যন্ত স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। এতদিন তাহার বিশেষ চারিদিকে সংযমের শাস্তি, জ্ঞানের গভীরতা ছিল, আজ সেখানে হঠাৎ এমন নানাস্বরের নহবৎ ব্যক্তিরা উঠিল কোথা হইতে—কোন অদৃষ্ট নৃত্যের চরণক্ষেপে ও নৃপুরুষকারে আজ আকাশতল এমন ঢকল হইয়া উঠিতে লাগিল।”

নলিনাক্ষ জানালা হইতে কিরিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, তাহার বিছানার শিরের কাছে কুলুঙ্গির উপরে গোলাপফুল-গুলি-সাজানো রহিয়াছে। এই ফুলগুলি জানি না কাহার চোখের মত-তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, নিঃশব্দ আত্মনিবেদনের মত তাহার হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে নত হইয়া পড়িল।

নলিনাক্ষ ইহার মধ্যে একটি ফুল তুলিয়া লইল—সেটি কাঁচাসোনার রঙের হৃদয়ে গোলাপ, পাপড়িগুলি খোলে নাই, কিন্তু গন্ধ লুকাইতে পারিতেছে না। সেই গোলাপটি হাতে লইতেই যেন সে কাহার আঙুলের মত তাহার আঙুলকে স্পর্শ করিল, তাহার শরীরের সমস্ত স্নায়ুতন্তকে রিমিঝিমি করিয়া বাজাইয়া তুলিল। নলিনাক্ষ সেই দ্বিধা কোমল ফুলটিকে নিজের মুখের উপরে, চোখের পল্লবের উপরে বুলাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাশ হইতে অতঃসূর্যের আভা মিলাইয়া আসিল। নলিনাক্ষ ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্বে একবার তাহার বিছানার কাছে গিয়া শয্যার আচ্ছাদনটি তুলিয়া কেঁলিল এবং মাথার বাগিশের উপর সেই গোলাপফুলটি রাখিল। রাখিয়া

“কৃতকৃত্যসো রাবো বিশ্বঃ প্রমোদ হ ।” ১।১।৮৫
এই শ্লোকটির “প্রমোদ” শব্দকে দত্তমহাশয়
“অসারসিক” প্রয়োগের প্রথম দৃষ্টান্তরূপে
উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,— “প্রমুদে-
শব্দই সারসিক” । সুদ-ধাতুর পরস্মৈপদ
লৌকিকব্যাকরণে অপরিচিত হইলেও,
বৈদিকব্যাকরণে সুপরিচিত । তৎপ্রতি লক্ষ্য
করিয়া, টীকাকারগণ ইহাকে ব্যাকরণবিরুদ্ধ
না বলিয়া বৈদিকব্যাকরণসম্মত বলিবার
জন্ত লিখিয়া গিয়াছেন,—

“প্রমোদেতি ছান্দসঃ পরস্মৈপদম্ ।”

সুতরাং এরূপ প্রয়োগ অসংস্কৃত নহে,—
বৈদিকপ্রয়োগমাত্র । “ছান্দস” বলায়
তাহাই সুব্যক্ত হইয়াছে । ঋষিলেখক ভিন্ন
অন্ত কেহ এরূপ প্রয়োগের ব্যবহার করিবার
অধিকারী না হইলে, ইহাকে ঋষিলেখকের
পদমর্যাদাগত অনন্তসাধারণ রচনারীতি
বলিয়া ব্যক্ত করা চলিত । কিন্তু ইহাকে
ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত অনন্তসাধারণ
অধিকার বলিয়া ঘোষণা করিবার উপায়
নাই । মৃচ্ছকটিকরচয়িতা ঋষি না হইয়াও,
লৌকিকব্যাকরণসম্মত পরস্মৈপদের ধাতুর
স্তায় ব্যবহৃত করিয়া গিয়াছেন ! ইহাকে
বৈদিকরচনার অমুকরণস্বূহায় উদাহরণ
বলিলেই অসঙ্গত হয় ।

“তত্তাত্যাসে দু মিথুনঃ চরন্তমনপারিনম্ ।

দধর্ষ ভগবাত্তম্র ক্রৌঞ্চোচ্চাক্রিনঃখনম্ ।” ১।২।৯

এই শ্লোকের “চরন্তম্” এবং “অনপারিনম্”
এই দুইটি পুংলিঙ্গের বিশেষণ “মিথুনম্” এই
ক্লীবলিঙ্গের সহিত অর্ষিত । ইহা লৌকিক-
রচনারীতিবিরুদ্ধ হইলেও, বৈদিকরচনা-

রীতিবিরুদ্ধ নহে । টীকাকার তজ্জ্ঞ ইহাকে
অশিষ্ট না বলিয়া, “আর্ষ” বলিয়া গিয়াছেন ।
মৃচ্ছকটিকেও এই শ্রেণীর প্রয়োগ দেখিতে
পাওয়া যায় ; তাহাও আর্ষ—বৈদিকরচনা-
রীতির অমুকরণমাত্র !

এইরূপে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত ধরিয়া
বিচার করিলে দেখা যাইবে,—যাহা “আর্ষ-
প্রয়োগ” নামে কথিত হইয়া থাকে,
ব্যাকরণের ভাষায় তৎহাকে “বৈদিক প্রয়ো-
গের অমুকরণ” বলিয়াই ব্যক্ত করিতে
হইবে । রামায়ণের টীকাকারগণ যে এই
কথা ব্যক্ত করিবার জন্তই “আর্ষ”-শব্দের
ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, একটি উদাহরণে
তাহা স্পষ্ট প্রত্নিত হইয়া রহিয়াছে ।

“বদ্বিগৃভিরূপসন্নিষ্টো যথাবৎ কৃতুরাপ্যাতাম্ ।” ১।৮।২২
এই শ্লোকটির উপ এবং সম্ এই দুইটি উপ-
সর্গ আছে । উপ-উপসর্গ “দিষ্ট”-শব্দের
সহিত অর্ষিত হইয়া “উপদিষ্ট” হইবে । সম্-
উপসর্গ “আপ্যাতাম্”-শব্দের সহিত অর্ষিত
হইয়া “সমাপ্যাতাম্” হইবে । তাহা না হইয়া
উপসর্গদ্বয় একত্র গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে ;
ক্রিয়াপদ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে ! ইহা
লৌকিকব্যাকরণবিরুদ্ধ হইলেও, বৈদিক-
ব্যাকরণবিরুদ্ধ নহে । টীকাকার সেই
কথা বলিবার জন্ত লিখিয়া গিয়াছেন,—

“ব্যবহিতপ্রয়োগ আর্ষঃ ।”

ইহা “ব্যবহিত প্রয়োগ” নামক “আর্ষপ্রয়োগ”
এখানে-আর্ষশব্দের উল্লেখ করিয়া বৈদিকসূত্র
উদ্ধৃত করার স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে,—
টীকাকার বৈদিকপ্রয়োগকেই আর্ষপ্রয়োগ
নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন ।

উপসর্গ কোথায় বসিবে ? ধাতুর পূর্বে

না পরে? পূর্বে বা পরে বেথানেই বহুক
না কেন, কত পূর্বে বা কত পরে বসিবে?
এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পাণিনি-
ব্যাাকরণে তিনটি স্থত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

“তে আগ্ধাতোঃ।” ১।৪।৮।

উপসর্গগুলি ধাতুর (অব্যবহিত) পূর্বে
বসিবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। ইহার কি
ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না? পারে।
কোথার? বৈদিকরচনারীতিতে। বিরূপ
ব্যতিক্রম? ছই শ্রেণীর।

“হৃদসি পরেহপি।” ১।৪।৮।

“ব্যবহিতাচ্।” ১।৪।৮।

বৈদিকরচনার ধাতুর (অব্যবহিত) পরেও
উপসর্গ ব্যবহৃত হইতে পারে। “নিহস্তি
মুষ্টিনা” না বলিয়া, “হস্তি নি মুষ্টিনা” বলিলেও
চলিতে পারে। উপসর্গের স্থান অব্যবহিত
পূর্বে বা পরে না হইয়া, বৈদিকরচনার তাহা
ধাতু হইতে “ব্যবহিত” হইয়াও ব্যবহৃত
হইতে পারে। “আ মন্ত্ৰৈরিন্দ্র হরিভির্ঘাহি
ময়ুরয়োমভিঃ”—এই মন্ত্ৰের “আয়াহি”—
ক্রিয়াপদের আ-উপসর্গ ব্যবহৃত,—ক্রিয়াপদ
হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এরূপ প্রয়োগ যে
ঋষিলেখকগণের অনন্তসাধারণ-অধিকারভূক্ত
ছিল না, অস্তান্ত কবির রচনার তাহারও
কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

লৌকিকসাহিত্যের অনেক লেখক—
ঋষি না হইয়াও—বৈদিকপ্রয়োগের ব্যবহার
করিয়া গিয়াছেন। মহাত্ম্যবোর এক স্থলে

তাহার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া পতঞ্জলি
লিখিয়া গিয়াছেন,—কবিকুল বৈদিকপ্রয়ো-
গের অনুকরণ করিয়া থাকেন বলিয়াই এরূপ
ঘটিয়া থাকে।* তাহার এই উক্তি, নানা
কাব্যগ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলে,
সমর্থিত হইতে পারে।

যে সাহিত্যযুগে বৈদিক প্রয়োগানুকরণের
রীতি প্রবল ছিল, সেই সাহিত্যযুগের কাব্যে
ইহার উদাহরণ তত অধিক। ইহাকে,
একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এরূপ
বলিতে পারা যায় না। ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত
হইলেও, একেবারে ইহা বিলুপ্ত হয় নাই।

ইংরাজকবি মিল্টনের মহাকাব্যে
লাটিনপ্রয়োগের অনুকরণস্বহার নিদর্শন
প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিকবিব্রিচিত মহা-
কাব্যের আর্ষপ্রয়োগের বাহুল্য সেইরূপ,—
বৈদিকপ্রয়োগের অনুকরণস্বহার পরিচয়
প্রদান করে। এই সকল প্রয়োগ
“আর্ষপ্রয়োগ” বলিয়া অভিহিত হইল কেন?

ঋষিশব্দের মুখ্যার্থ—মন্ত্ৰ, বেদ। আর্ষ-
শব্দের মুখ্যার্থ—বৈদিক। ঋষিশব্দের এই
অর্থ কালে ব্যাপ্তিলাভ করিয়া, মন্ত্ৰপ্রোক্তার,
মন্ত্ৰপ্রোক্তার,—এমন কি সাধুপুরুষমাত্রেয়
—বংশপরম্পরাগত উপাধিমাতে পরিণত
হইয়াছিল। আর্ষশব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি প্রচ-
লিত থাকিলে, সে কথা সকলেরই জ্ঞদরসম
হইত।

ঋষিশব্দের উত্তর অণুপ্রত্যয় করিয়া

* “স্ব ভ্রাতৃণ্যো নদী।” ১।৪।৩ এই মন্ত্ৰের আলোচনাকালে “অথ ভ্রাতৃণ্য্যাবিতি কোহয়ঃ শব্দঃ” এই প্রশ্ন
উত্থাপিত করিয়া পতঞ্জলি একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, কবিকুল বৈদিকপ্রয়োগের অনুকরণ করিয়া
থাকেন। কথা :—

“বসিন্ দশসহস্রাণি পুত্রৈ জাতে গবাঃ দশৌ।

ব্রাহ্মণৈভ্যঃ প্রিষ্ঠাথৈভ্যঃ সোমৈরনুত্থেন জীবতি।”

—“হ্রস্বাবৎ কবয়ঃ কুর্কন্তি। ন হি এষ ইষ্টঃ। ইতি মহাত্ম্যম্।

একখানি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া পরিচিত। সূত্রকার পাণিনি এবং কবিতাকার পাণিনি যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহার স্মৃতি অন্তাপি বিলুপ্ত হয় নাই। * সূত্ররাজ-দত্তমহাশয়ের সিদ্ধান্তের সহিত সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। রামায়ণের রচনাকালে সংস্কৃত-ভাষা “সর্বতোভাবে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয় নাই”—ইহা অসম্ভবমাত্র।

ইংরাজকবি চসন্ বা শেক্সস্পিয়ার যে সময়ে কাব্যরচনার ব্যাপ্ত ছিলেন, তখন তাঁহার ব্যাকরণবিধি অশিষ্টপ্রয়োগের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখনও ইংরাজী ভাষা সৰ্বিশেষ সংস্কার-সম্পন্ন হয় নাই। রামায়ণের রচনাকালে সংস্কৃতভাষার সেরূপ দুর্দশার অবস্থা বর্তমান ছিল না। ইংরাজীভাষার আধুনিক দৃষ্টান্ত ধরিয়া সংস্কৃতভাষার পুরাতন সাহিত্যের বিচার করিলে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি সমুহ অবিচার করিতে হয়।

সংস্কারসম্পন্ন হইবার পূর্বে আমাদের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সে অতীতযুগের কোনরূপ সাহিত্য কখন বর্তমান থাকিলেও, কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা

আছে, সে সমস্তই সংস্কৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পর উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার অনেক প্রয়োগ এক্ষণে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যাহা অপ্রচলিত হইয়াছে, তাহাও অ-সংস্কৃত ছিল না। কোন সময় হইতে কোন শ্রেণীর প্রয়োগ অপ্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পুরিলে, রচনারীতি ধরিয়া বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে রচনাকাল নির্ণীত হইতে পারে। তাহার জন্মই যথোপযুক্ত চেষ্টা প্রবর্তিত হউক !

আর্ষশব্দের ব্যুৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে, আর্ষপ্রয়োগের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইতে পারিত। কিন্তু আর্ষশব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি কি, তাহা নিয়ে নানা মতভেদ প্রচলিত হইয়াছে। অধুনা “ঋষিরিদ্” বলিয়া যে ব্যুৎপত্তি নির্দিষ্ট হইতেছে, তাহাই প্রকৃত ব্যুৎপত্তি হইলে, আর্ষপ্রয়োগকে ঋষিলেখকের অসাধু-প্রয়োগ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই কি প্রকৃত ব্যুৎপত্তি ?

• . পাণিনিহুত্রে + “অনার্ঘ” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। টীকাকারগণ তাকে “অবৈদিক” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ঊণাদি-হুত্রেণ স্প্রশিদ্ধ বৃত্তিকার উচ্চলদন্ত “অবৈদিক” অর্থেই “অনার্ঘ” শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে দেখিতে পাওয়া

* স্মৃতি পাণিনিতে তন্মৈ বস্তু ব্রহ্মপ্রসাদতঃ ।

আদৌ ব্যাকরণং কাব্যমনু জার্ববতীজরম্ ।

পাণিনিবিরচিত “জার্ববতীজর” নামক কাব্য বর্তমান না থাকিলেও, তাহার নামা স্নোক পুরাতন গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির ভ্রাতৃ কাত্যায়নও কাব্যকার ছিলেন। পতঞ্জলি তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে কাব্যের দুই একটি স্নোক টীকাকারগণ উদ্ধৃত করায় অদ্যাপি বর্তমান আছে; মূলগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রামায়ণের পূর্ববর্তী লৌকিকসাহিত্যের কাব্যগ্রন্থ বর্তমান না থাকিলেও, একদা সেরূপ গ্রন্থ বর্তমান থাকিবার এমনপরিমাণ বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার কথা বখাখানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

† ১৩১৩৬

‡ Aufrecht's UNADI-SUTRAS.

যায়,—বৈজ্ঞানিকগণের গ্রন্থোক্ত “আর্ষ” ও “বৈদিক” শব্দ একার্থসূচক। তাঁহারা আর্ষ বলিতে বৈদিকপ্রয়োগকেই লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। তাহা কি ঋষিগণ-বিগলিত চ্যুতসংস্কৃত—ব্যাকরণদৃষ্ট—অশিষ্ট—অপপ্রয়োগ?

রামায়ণের যে সকল প্রয়োগ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হইতেছে, তাহা এক শ্রেণীর নহে। এক শ্রেণীর প্রয়োগ সত্যসত্যই ব্যাকরণবিরুদ্ধ। তাহার সংখ্যা অধিক নহে। আর এক শ্রেণীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। তাহা লৌকিক ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ হইলেও, বৈদিক-ব্যাকরণ-সম্মত। রামায়ণের টীকা-কারগণ এই উভয় শ্রেণীর প্রয়োগকেই “আর্ষপ্রয়োগ” নামে অভিহিত করেন নাই। দৃষ্টান্ত ধরিয়া বিচার করিলে, তাহা সুব্যক্ত হইবে।

“ভক্তভিবেকসম্ভারান্ দৃষ্টা ভাষ্য কৈকরী। ১।১।২১
এই শ্লোকটির “কৈকরী” শব্দ ব্যাকরণসম্মত নহে। “কৈকরী” শব্দই ব্যাকরণসম্মত। রামায়ণে তাহা অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। শিষ্টপ্রয়োগ জ্ঞাত থাকিয়াও, কবিগুরু এখানে তাহার ব্যতিক্রম করিলেন কেন? ইহা কি ঋষিগণের পদমর্যাদাগত রচনারীতি? ইহা কি আর্ষপ্রয়োগ?

টীকাকারগণ ইহার সেক্ষণ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারা ব্যাকরণসূত্রের উল্লেখ করিয়া, এক্ষণ প্রয়োগের দোষপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন,—পশ্চনিবন্ধে ছন্দোভঙ্গ নিবারণ করিবার জন্ত কবিকে প্রয়োজন বুলিয়া শিষ্ট-প্রয়োগের ইত্তরবিশেষ করিবার অধিকার

দান করিতে হয়। তিলকটীকার স্পষ্টই লিখিত আছে,—

“অপি মাৎ নবং কুর্ধ্যাৎ ছন্দোভঙ্গং ন কারয়েৎ।”

মাবশ্যক সাধু। কিন্তু ছন্দোভঙ্গ ঘটবার আশঙ্কা থাকিলে, মাবশ্যককে মবশ্যকে পরিণত করিও; তথাপি ছন্দোভঙ্গের প্রশ্রয়দান করিও না। ইহাই উল্লিখিত কারিকার ভাবার্থ। এই অধিকার কেবল ঋষিগণের বর্ণের অনন্তসাধারণ অধিকার বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। ইহা কবিমাজেরই সাধারণ অধিকার। চলে না বলিয়াই এই অধিকার স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে; ইহা অশিষ্ট হইলেও, মহাকবিপ্রয়োগ বলিয়া শিষ্টপ্রয়োগের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহাকে আর্ষপ্রয়োগ বলা যায় না। ঋষিগণের অশিষ্টপ্রয়োগের নাম “আর্ষপ্রয়োগ” হইলে, বাস্তবিকপ্রযুক্ত এই অশিষ্টপ্রয়োগকে আর্ষপ্রয়োগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইত।

রামায়ণের টীকাকারগণ কোন্ শ্রেণীর প্রয়োগকে আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন? দৃষ্টান্ত ধরিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাঁহারা “বৈদিক” প্রয়োগকেই কখন “আর্ষ”, কখন বা “ছান্দস” নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাহাকে ব্যাকরণবিরুদ্ধ—অশিষ্ট—অসংস্কৃত বলা দূরে থাকুক, টীকাকারগণ ব্যাকরণসূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাহার শিষ্টতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই শ্রেণীর প্রয়োগকে কুজাপি ঋষিগণের পদ-মর্যাদাগত অনন্তসাধারণ অধিকারের অন্তর্গত করিবার জন্ত আগ্রহপ্রকাশ করেন নাই।

আৰ্হণক নিশ্চয় হইয়াছে । এ বিষয়ে কোন-
রূপ সতর্কতা দেখিতে পাওয়া যায় না ।
কিন্তু কি অর্থে অণু-প্রত্যয় হইবে, তাহাতে
সতর্কতায় অভাব নাই । এখানে কোন
অর্থে অণু-প্রত্যয় স্বীকার করিব ?

“শব্দকল্পদ্রুমে” আৰ্হণকের ব্যুৎপত্তি-
নির্দেশের জন্য “ঋষিরিদ্ং” বলিয়া বিগ্রহ-
ব্যাক্যে অণু-প্রত্যয়ের অর্থ হুচিহ্ন হইয়াছে । *
ইহা ঠিক সূত্রের কথা নহে । সূত্রের ভাষায়
বলিতে হইলে, “তস্তেদং” এই অর্থে অণু-
প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে
হইত । “ঋষিরিদ্ং” বলার প্রকারান্তরে
তাহাই বলা হইয়াছে । -

“তস্তেদং” ৪৩১২০.

এই সূত্রানুসারে “ঋষিলিখিত” অথবা
“ঋষিগ্রন্থক” বলিয়া আৰ্হণকের ব্যাখ্যা
করা যায় না । “তস্তেদং” বলিতে কেবল
প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সম্বন্ধমাত্রই বিবক্ষিত হই-
য়াছে ; অস্ত্র কোন সম্বন্ধ বিবক্ষিত হয় নাই ।
এই সূত্রের সুপরিচিত উদাহরণ—রাষ্ট্রিয়ম্ ।
“শব্দকল্পদ্রুমে” উদাহরণস্বরূপ “মহুসংহিতারি”
একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে । † তাহাতে
যে আৰ্হণক আছে, তদ্বারা “ঋষিলিখিত”

বা “ঋষিগ্রন্থক” বলিয়া অর্থসংগ্রহ করা
যায় না ।

“আৰ্হং ধর্মোপদেশক বৈদ্যশাস্ত্রবিদ্যোদিতা (?) ।

ব স্তর্কোপদেশক স ধর্মং বেদ নেতরঃ ।” ১২১১০৬
এই বচনোক্ত আৰ্হণকের অর্থ কি ? যিনি
বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা
“আৰ্হং ধর্মোপদেশের” মর্ম্মানুসন্ধান করিয়া
থাকেন, তিনিই ধর্ম্ম (তত্ত্ব) জ্ঞাত হইতে
পারেন ; অস্ত্র কেহ পারেন না ।” ইহাই
উল্লিখিত বচনের ভাৎপর্য্য । সুতরাং
“আৰ্হং ধর্ম্মোপদেশং” বলিতে যে “বৈদিক
ধর্ম্মোপদেশ” হুচিহ্ন হইয়াছে, তাহাতে
সংশয় নাই । ঋষিগ্রন্থিত ধর্ম্মোপদেশ
বলিলে, সংস্কৃতরচনারীতির মর্যাদা রক্ষা
করা যায় না । উপদেশকে “প্রদত্ত”
বলা যাইতে পারে, “প্রণীত” বলা যায় না ।
সংস্কৃতরচনারীতি এ সকল বিষয়ে সুসংযত ;
বাঙলা রচনারীতির মত নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল
নহে ।

বারেজেনন্দনাবাসীর—ভট্টদ্বিবাকরানুজ—
শ্রীমংকুলকভট্ট “মহুসংহিতার” সুবিখ্যাত
টীকাকার । তিনি এই বচনোক্ত আৰ্হ-
ণকের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,

* নানরাকরে মুদ্রিত “শব্দকল্পদ্রুমে” এই ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় । তাহা কোন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত,
তাহার উল্লেখ নাই । প্রমাণস্বরূপ যে বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে, লিপিকরপ্রমাদে তাহাও দুর্ব্বোধ হইয়া রহিয়াছে ।
এই এককের শিরোনামে বচনটি বখায্য উদ্ধৃত হইল ।

† সংস্কৃতশাস্ত্রে গ্রন্থের ভাৎপর্য্যসংগ্রহের জন্য কিরূপ বিচারপ্রণালীর আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়, এই বচনে
তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে । বৈদ্যশাস্ত্রের প্রবৃত্ত হইলে, বেদশাস্ত্রের অ-বিরোধী তর্কপ্রণালীর আশ্রয়গ্রহণ না
করিলে, বৈদ্য প্রতিভাত হইতে পারে না । সেইরূপ শব্দার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলেও, শব্দশাস্ত্রের অ-বিরোধী তর্ক-
প্রণালীর আশ্রয়গ্রহণ না করিলে, প্রকৃত অর্থ প্রতিভাত হইতে পারে না । আৰ্হণের অর্থ কি, তাহার বিচারে
প্রবৃত্ত হইলে, তর্কপ্রণালী অবলম্বন করিবার পূর্বে এই ইঙ্গিতের অনুসরণ করিতে হয় । বহু অর্থে অণু-প্রত্যয়
হইতে পারে । অনেক সূত্রে তাহার ব্যবহৃত আছে । এখানে কোন অর্থে অণু-প্রত্যয় স্বীকার করিব, তাহা নির্ণয়
করিবার জন্য ব্যাকরণের সুপরিচিত তর্কপ্রণালীর আশ্রয়গ্রহণ করাই বিধেয় ।

“শব্দকল্পদ্রুম”-সঙ্কলনকালে সকলরিতা তৎ-
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হইত।
কুল্লুকভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন,—

“কবির্বেদন্তত্ব ভব আৰ্যো ধর্মোপদেশো বো বৈদিকঃ।”
অর্থ—বেদ। “তত্র ভবঃ”—
তাহাতে আছে,—তাহাতেই দেখিতে পাওয়া
যায়,—এই অর্থে আৰ্য। আৰ্য ধর্মোপদেশ
কাহাকে বলে? যাহা বৈদিক, তাহারই
নাম আৰ্য। কুল্লুকভট্টের এই ব্যাখ্যা,
যে স্বত্বের দ্বারা আৰ্যশব্দ নিষ্পন্ন হইবে,
তাহা অস্বাস্থ্য হইয়া রহিয়াছে। তাহা
“তত্ত্বদং” নহে। তাহা,—

“তত্র ভবঃ।” ৪৩০.৫৩

“তত্র ভবঃ” বলিতে ‘কি’ বুঝিব?
টীকাকারগণ বলেন,—ভবশব্দের অর্থ—
সত্তা। তাহাতে যাহার সত্তা আছে,—
তাহাতেই যাহা দেখিতে পাওয়া যায়,
তাহারই নাম “তত্র ভবঃ।” কুল্লুকভট্টের
দ্বারা প্রাচীন প্রমাণপুরুষগণ এই স্বত্বাশু-
সারেই আৰ্যশব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দিষ্ট
করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনগণ যে “আৰ্য”
বলিলে “বৈদিক” বুঝিতেন, ইহাতে তাহারই
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া বাইতেছে। এই ব্যাখ্যা
বর্তমান থাকিতে, “শব্দকল্পদ্রুম”-সঙ্কলন-
কালে “তত্রভবঃ”-অর্থে অণু-প্রত্যয় স্বীকৃত
না হইয়া, “তত্ত্বদং”-অর্থে অণু-প্রত্যয়
কল্পিত হইল কেন, তাহার কোনরূপ কারণ,
কি বিচার, কি প্রমাণ—“শব্দকল্পদ্রুমে”
উল্লিখিত হয় নাই! এরূপ ব্যুৎপত্তি
প্রচলিত হইয়াই সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস
ক্রমে তমসাজ্বর হইয়া পড়িতেছে!

বৈদিকপ্রয়োগের অহুকরণ করিয়া

লৌকিকসাহিত্যে বৈদিক রচনারীতির
অহুসরণ করিবার প্রবৃত্তি সংস্কৃতসাহিত্যের
লেখকবর্গের মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত
প্রচলিত ছিল। কালিদাসের সময়েও এই
প্রবৃত্তি একেবারে নিরস্ত হয় নাই।
রামায়ণের রচনাকালে ইহা সমধিক প্রবল
থাকিবারই কথা। সে কোন্ পুরাতন
সাহিত্যযুগের কথা? ৮

বেদাভ্যুত্থিত আৰ্যাসমাজ বৈদিক শিক্ষা
ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ চিরপ্রচলিত রাখিবার
আশার কত-না উপায় উদ্ভাবিত করিতে
বাধ্য হইয়াছিল! বেদবাক্যের বধ্যবণ
উচ্চারণ, বেদমন্ত্রের বধ্যবণ ব্যাখ্যা, বৈদিক
ক্রিয়াকলাপের বধ্যবণ অনুষ্ঠান, চিরপ্রচলিত
রাখিবার জন্ত বিবিধ বেদোদ্দেশ্য অত্যাশ্রয়
হইয়াছিল। বৈদিক শব্দানুশাসনের জন্তই
ব্যাকরণের প্রয়োজন অহুত্বত হয়।
“মহাভাষ্যের” আরম্ভে যে সুদীর্ঘ উপক্রম-
ণিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সেই
কথাই প্রতিভাত হইতেছে। লৌকিক-
ব্যাকরণ ধরিয়া বেদবাক্যের অর্থবিচার
করিতে গিয়া লোকে পথভ্রষ্ট না হয়, যেন
সেই উদ্দেশ্যেই পাণিনিব্যাকরণে লৌকিক ও
বৈদিক শব্দানুশাসনের পার্থক্য বিশেষভাবে
প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপে বৈদিকশিক্ষার প্রাধান্ত
সংস্থাপিত হইয়াছিল। লৌকিকসাহিত্যের
পুরাতন রচনাযুগে লোকসমাজে বৈদিক-
শিক্ষারই প্রাধান্ত ছিল। তাহার প্রভাব
সকল কার্যেই প্রকাশিত হইত। সে
যুগের লৌকিকসাহিত্যের লেখকবর্গ বৈদিক
রচনারীতি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে

পারিবেন কেন ? কাব্যায়নযুগে—পতঞ্জলি-
যুগে—আরও পরবর্তী যুগে—লৌকিকসাহিত্য
ধীরে ধীরে বৈদিকরচনারীতি পরিত্যাগ
করিয়া, স্বতন্ত্র ও সংহত হইয়া উঠিয়াছিল ।
তৎপূর্বে লৌকিকব্যাকরণের বিধিনিষেধ
লঙ্ঘন করিতে বিশেষ ইতস্তত করিবার
কারণ ছিল না । রামায়ণ সেই পুরাতন
রচনাযুগের গ্রন্থ । ইহাতে ঐক্য শিলা ও
সদাচারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,
তাহাতে রামায়ণের রচনাকালে বৈদিক-
শিল্পের পূর্ণপ্রভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে ।
তৎকালে বৈদিকরচনারীতির অল্পকরণস্পৃহা
প্রবল . থাকিবার কথা । আর্ষপ্রয়োগের
প্রকৃত ব্যুৎপত্তি . বিস্মৃত হইয়া, তাহাকে
বহিঃলেখকের অশিষ্ট রচনারীতি বলিয়া
ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া, আমরা
অজ্ঞাতসারে সংস্কৃতসাহিত্যের এই ঐতি-
হাসিক স্মৃতি ছিন্ন করিবার আয়োজন
করিয়াছি ।

রামায়ণ সংস্কৃতসাহিত্যের পরিবর্তন-
যুগের মহাকাব্য । বৈদিকরীতি পরিত্যাগ
করিয়া লৌকিকসাহিত্যরচনার অগ্রসর
হইবার প্রথম চেষ্টা প্রবর্তিত হইবার
অনেকাল পূর্বেই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল
বলিয়া বোধ হয় । এক দিকে পুরাতন
বৈদিকরচনারীতির প্রভাব, অন্যদিকে
উদীয়মান . লৌকিকরচনারীতির কোশল
রামায়ণকে পুরাতনের গাভীর্য্যের সহিত
নূতনের লাভ্য দান করিয়া, নিরতিশয়
মধুর করিয়া রাখিয়াছে ।

লৌকিক রচনারীতি ক্রমশ অটলকার
ধারণ করিয়া, কাব্যরসকে হ্রস্বগাহ করিয়া

তুলিয়াছিল ! নানা কৃত্রিমতার আবর্তে
বিঘূর্ণিত হইয়া, তাহা যেন দিনদিন আবল
হইয়া উঠিয়াছিল ! তাহার তুলনার
রামায়ণের রচনারীতি অকৃত্রিম রচনালীতিতে
অভিষিষ্ট । সেই রচনারীতির সহিত আর্ষ-
প্রয়োগ যেন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য
রক্ষা করিয়া সরলভাবে মিশিয়া রহিয়াছে ।
পরবর্তী রচনাযুগের কৃত্রিম রচনাকৌশলের
সহিত আর্ষপ্রয়োগ . সেরূপভাবে মিশিয়া
থাকিতে পারিত না । এই কারণে
রামায়ণের আর্ষপ্রয়োগে মহাকাব্যের
স্বাভাবিক গাভীর্য্য সমৃদ্ধিক্রমে স্বব্যক্ত হইয়াছে !
তাহা অজ্ঞতাবিজ্ঞাপক . নহে ; তাহাকে
আকস্মিক বলিয়াও স্বীকার করা যায় না ।
বরং এরূপভাবে লৌকিকসাহিত্যে বৈদিক
রচনারীতির অঙ্গসরণ করিবার নানা কারণ
বর্তমান থাকিবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া
যায় ।

রামায়ণ নিরবে পঠিত হইবার অল্প-
রচিত হয় নাই । তাহা স্বরসংযোগে গীত
হইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল । মহাকাব্য
কাব্যরচনা সমাপ্ত করিবার পর, শিবামণ্ডলী-
পরিবেষ্টিত হইয়াও চিন্তা করিতে লাগিলেন,
—কে ইহাকে যথোপযুক্তরূপে লোকসমাজে
কীর্তন করিতে সমর্থ হইবে ? সেরূপ লোক
কোথায় পাইব ?

“চিন্তামাস কো যেতৎ প্রযুক্তীর্নাদতি প্রভুঃ ।” ১০৮০
সুদীর্ঘ সংগীতের মধ্যে বিচিন্তিতা আনয়ন
করিবার জন্য কথকগণ থাকিয়া-থাকিয়া
ধীমগভীর শব্দবজারের অবতারণা করিয়া
কণ্ঠস্বরে বিচিন্তিতা প্রদান করিয়া থাকেন ।
রামায়ণপাঠের সময় আর্ষপ্রয়োগ সেই

বিচিহ্নতা দান করিয়া থাকে। তাহা বিন্যস্ত হইয়া, নীরবে রামায়ণ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আর্ষপ্রয়োগের কল্যাণে রামায়ণের রচনা কত ঐতিমধুর হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় তিরোহিত হইয়া যায়।

বাহা কালগত রচনারীতি, তাহাকে ঋষিলেখকের পদমর্যাদাগত উচ্ছৃঙ্খলতা (?) বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, রামায়ণের আর্ষ-প্রয়োগ আলঙ্কারিক-বিচারে “চ্যুতসংস্কৃত”-দোষের অন্তর্গত হইয়া পড়িতেছে! আলঙ্কারিকগণ তাহাফে দোষ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই কেন, আধুনিক, অভিধান-লেখকগণ তাহারও কোনরূপ বিচার করিবার চেষ্টা পান নাই। বরং পাশ্চাত্য-পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধান্তই আমাদেরগকেও সাহেব করিয়া তুলিতেছে! একজন পাশ্চাত্য-পণ্ডিত স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—“ছন্দের অহুরোধেই আর্ষপ্রয়োগ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।” * ইহা যে স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত, তাহাতে সংশয় নাই। যিনি অবলীলাক্রমে চতুর্বিংশতিসহস্র “শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আর্ষ-প্রয়োগের সংখ্যা সমগ্র গ্রন্থের তুলনায় কত অল্প,— তাহা রামায়ণপাঠকের নিকট অপরিজ্ঞাত নাই। যিনি আর্ষপ্রয়োগ না করিয়া অধিকাংশস্থলে ছন্দোভঙ্গ নিবারণ করিতে সমর্থ ছিলেন, তিনি কি সমগ্র কাব্য সেই ভাবে সমাপ্ত করিতে পারিতেন না? বাহার রচনার লৌকিকব্যাকরণজ্ঞান সর্বত্র পরিকুট, আর্ষপ্রয়োগের সময়ে তাঁহার অজ্ঞতা

বা আত্মবিশ্বাস্তি স্বীকার করা যায় না; ইচ্ছাপূর্বক আর্ষপ্রয়োগের ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। তাহার কারণ কি উচ্ছৃঙ্খলতা? ছন্দোভঙ্গ নিবারণ করিবার জন্তই কি মহাকবি সেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন? তাহা হইলে, “কৈকয়ী”-শব্দের ব্যাখ্যায় তাহাকেও “আর্ষপ্রয়োগ” বলিয়া ব্যক্ত করিতে হইত।

আর্ষপ্রয়োগসম্বন্ধে যে ধারণা আধুনিক পাঠকসমাজের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা যেন গাল ফুলাইয়া ভর্ক করিবার জন্ত পুনঃপুন বলিয়া আসিতেছে,—(১) আর্ষপ্রয়োগ অসাধুপ্রয়োগ, (২) কেবল ঋষিলেখকগণই তাহার ব্যবহার করিতে পারিতেন, (৩) তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতাই এরূপ প্রয়োগ ব্যবহৃত হইবার প্রকৃত কারণ, (৪) হয় ত না জানিয়া, অথবা ছন্দোভঙ্গ নিবারণ করিবার উপায়ান্তর না পাইয়া, তাঁহারা এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন! সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস ইহার কোন সিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে পারে না। রামায়ণের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বিলুপ্ত হইয়া, এই সকল অপসিদ্ধান্তই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

আর্ষপ্রয়োগের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি কি, তাহা যেমন মানুষ জানা তর্কবিতর্কে আজ্ঞহ হইয়া পড়িয়াছে, সংস্কৃতসাহিত্যের অধিকাংশ শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি সেইরূপ হইয়া থাকাই-
রাছে। অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি জ্ঞান

নানা মনঃকল্পিত পরিবর্তনের অধীন হইয়া, ভাবার্থের নানারূপ বিপর্যয় সাধিত করি-
য়াছে। রামায়ণ বৃত্তিতে হইলে, শব্দবিচারে
প্রবৃত্ত হইতে হইবে। শব্দের ব্যুৎপত্তির
মধ্যে কত পুরাতন প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে,
শব্দবিচারে প্রবৃত্ত না হইলে, তাহা সম্যক
জ্ঞদয়ঙ্গম হয় না। তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে
দেখিতে পাওয়া যায়, রামায়ণের রচনাকালে
যে শব্দের বৈরূপ ব্যুৎপত্তি বা অর্থ প্রচলিত

ছিল, তাহার অনেক পরিবর্তন সংঘটিত
হইয়াছে। পুরাতন অর্থ এবং পুরাতন ব্যুৎপত্তি
গ্রহণ না করিলে, কোন কোন শ্লোকের
মর্মগ্রহণ করিবার উপায় থাকে না।
সেই সকল শ্লোক ও শব্দ ধরিয়া
বিচার করিলে, রামায়ণের রচনাকাল
যে কত পুরাতন, তাহা প্রকাশিত হইতে
পারে। অতএব অতঃপর তাহাতে প্রবৃত্ত
হইব।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

যুগলনক্ষত্র।

যাহারা দূরবীন্সাহায্যে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ
করিয়াছেন, তাহাদের নিকট যুগলজ্যোতিষ
কোনক্রমেই নূতন হইতে পারে না। যুগল-
নিহারিকা আকাশের নানা অংশে প্রায়ই
দেখা যায়, বারেন্দার যুগল ধুমকেতুর কথা
পাঠক অবগুই শুনিয়াছেন, তা ছাড়া যুগল-
গ্রহের কথাও আজকাল শুনা যাইতেছে।
যে চক্ষুকে আমরা এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর উপগ্রহ
বলিয়াই জানিতাম, সেটি এখন গ্রহপদে
উন্নীত হইবার উপক্রম করিয়াছে। কয়েক-
জন আধুনিক জ্যোতির্বিদের মতে পৃথিবী ও
চন্দ্র একটি যুগ্মগ্রহ বাতীত আর কিছুই নয়।
যুগলনক্ষত্রের ত কথাই নাই,—দৃশ্যমান
তারকাগুলির মধ্যে, এই শ্রেণীর নক্ষত্রের
সংখ্যা আজকাল প্রায় সহস্রাবিক হইয়া
গিয়াইরাছে।

আকাশে যতগুলি নক্ষত্র নগ্নচক্ষে বা
যন্ত্রসাহায্যে আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের
মধ্যে সাধারণত দুইপ্রকারের যুগ্মতা দেখা
যায়। জ্যোতির্বিদগণ ইহাদের মধ্যে কতক-
গুলিকে চাক্ষুষযুগল (optical doubles)
এবং অপরগুলিকে দূরবীক্ষণিক বা প্রকৃত-
যুগল সংজ্ঞায় আখ্যাত করিয়াছেন। চাক্ষুষ-
যুগল নক্ষত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনই
সম্বন্ধ নাই; আকাশের নানাস্থানে আমরা
যে সকল একক তারকা দেখিতে পাই,
তাহাদেরই মত ইহারা কোটিকোটিনাইল
দূরে থাকিয়া নিজেদের নির্দিষ্টগতিতে
স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, কোনপ্রকারে
ইহারা পৃথিবীর সহিত সমন্বয়ে আসিয়া পড়ে
বলিয়া, আমরা উহাদিগকে যুগল দেখি।
আণুবীক্ষণিক যুগল তারকাগুলির অবস্থা

* সপ্তর্ষিঘণ্ডের Mizerদামক নক্ষত্রটির প্রতি দুটিপাত করিলে, পাঠক ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটির পাশেই একটি
— ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখিতে পাইবেন। • যুগল দেখাইলেও ইহারা প্রকৃত যুগল নয়, ইহাদের যুগ্মতা চাক্ষুষমাত্র।

কিন্তু তাহা নয়, ইহারা প্রকৃতই পরস্পরের নিকটবর্তী থাকিয়া একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের পরস্পরের আকর্ষণের প্রারম্ভ্য এত বেশি যে, তাহা ছিন্ন করিয়া দূরে বাইবার সামর্থ্য কাহারো থাকে না।

একটা উদাহরণ দিলে, এই দুই শ্রেণীর যুগলতারকার পার্থক্যটা পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবেন। মনে কর, একটি বৃহৎ মাত্রের ভিতর দিয়া ক্রমিক পথিক চলিয়াছে, বহুদূরে কেবল দুইটিমাত্র গাছ দেখা যাইতেছে ; গাছদুটির ব্যবধান প্রায় অর্ধমাইল। পথিক চলিতে চলিতে যখন সেই দূরবর্তী বৃক্ষদ্বয়ের সহিত প্রায় সমন্বয়ে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন গাছদুটির মধ্যে যে একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান আছে, তাহা বুঝিতে পারিবে না, উহাদিগকে প্রায় গায়ে-গায়ে বা পাশাপাশি দেখাইবে। আমরা পূর্বে যে চাক্ষুষ যুগলতারকার কথা বলিয়াছি, তাহাদের অবস্থান কতকটা ঐরূপ। তাহারা উদাহৃত বৃক্ষের দ্বায় পরস্পর খুব দূরে থাকিয়াও, খুব কাছাকাছি আছে বলিয়া অনিদিষ্ট চকুকে প্রভাবিত করে। দুইটি গাছ খুব কাছাকাছি জন্মাইলে, যে-কোনো স্থানে দাঁড়াইলে যেমন তাহাদিগকে সর্বদাই পরস্পরের নিকটবর্তী দেখা যায়, প্রকৃত যুগলতারকার অবস্থান কতকটা সেইরূপ। তাহারা স্বভাবতই সর্বদা কাছাকাছি থাকে, তাই যে কোনো স্থান হইতে পর্যবেক্ষণ করিলে উহাদিগকে যুগল দেখায়। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে এই প্রকৃত যুগলতারকারই বিষয় আলোচনা করিব।

জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, স্থানে স্থানে যুগলতারকার উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীকপণ্ডিত টলেমি তাঁহার * কোন গ্রহে যুগলতারকার উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেই অতি প্রাচীনকালে দূরবীণের প্রচলন ছিল না, সুতরাং তাহাদের উল্লিখিত তারকাগুলি যে প্রকৃত যুগল নয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সম্ভবত তাঁহারা নগচকে চাক্ষুষ যুগলতারকা দেখিয়াই সেই কথা লিপিবদ্ধ রাখিয়া গেছেন। বাহা হউক, পুরাবৃত্তের কথা ছাড়িয়া-দিয়া আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে, যুগলনক্ষত্র-আবিষ্কারের সম্মান অধ্যাপক মিচেলের (Michell) প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়। ইনি ১৭৬৭ অব্দে রয়াল সোসাইটির কোন এক অধিবেশনে যে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে যুগলতারকা-সকল যে মহাকর্ষণের নিয়মামুখ্যরী কোন এক কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছে, তাহার আভাস ছিল। যুগলতারকার

প্রকৃতির এই সামান্য আভাস দিয়াই মিচেল সাহেবকে নিরন্তর থাকিতে হইয়াছিল। কারণ, ইহার অধিক কিছু বলিলে, তাঁহার উক্তি পোষকপ্রমাণের অভাবে, সেই সকল কথাই কেহ কর্ণপাতও করিতেন না। কাজেই সেই সময়ে যুগলতারকাসম্বন্ধীয় রহস্যের কোন মীমাংসা হইয়া উঠে নাই।

* যুগলতারকাসম্বন্ধে • আজকাল আমরা বাহা-কিছু জানিতে পারিয়াছি, তৎসম্বন্ধে বিংশতিশতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী লর্ড উইলিয়াম হার্শেলের নিকট আমাদিগকে

সম্পূর্ণ ধূমী বলিয়া মনে হয় । অষ্টাবিংশতি-
শতাব্দীর শেষভাগে যুগলতারকার গতির নির-
মাদি আবিষ্কার করিবার জন্ত, হার্শেলসাহেব
এক সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণের আয়োজন করিয়া-
ছিলেন । তিনি আশু করিয়াছিলেন, যদি
কোন যুগলনক্ষত্রের মধ্যে কোনটি তাহার
সহচর অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্তী থাকে,
তবে বার্ষিকগতিতে পৃথিবী যেমন এক-
একবার সূর্য্যপ্রদক্ষিণ শেষ করিবে,
তারকাযুগলের পরস্পর ব্যবধানের মধ্যেও
সেইপ্রকার একটুআধটু বিচলন দেখা
দিবে । হার্শেল এই ফললাভের আশায়
প্রায় পঁচিশবৎসরকাল যুগলতারকা লইয়া
পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন । কিন্তু গণনার
পূর্বাভাসিত ফল দেখা যায় নাই, তৎপরি-
বর্ত্তে তিনি প্রত্যেক পর্যবেক্ষণেই, অধিকাংশ
তারকাযুগলের কোন-না-কোন নক্ষত্রকে
একই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছিলেন ।
পৃথিবী যেমন বৃত্তাভাসপথে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ
করে, তারকাযুগলের প্রত্যেক নক্ষত্রটি
তাহার সহচরকে ঠিক সেইপ্রকার পথে
প্রদক্ষিণ না করিলে, পর্যবেক্ষণে কোন-
প্রকারে ঐপ্রকার গতি দেখা যাইতে পারে
না । মনে কর, কোন সার্কাসের খেলোয়াড়
অনুষ্ঠানে বৃত্তাভাসপথে ঘুরিতেছে । এখন
যদি সে কোন একটি লোককে ঠিক তাহার
অগ্রবর্ত্তী থাকিয়াই চলিতে দেখে, তবে এই
দ্বিতীয় ব্যক্তিও যে অস্বাভাবিক ভাবে কোন
এক বৃত্তাভাসপথে ঘুরিতেছে, তাহা আমরা
অন্যাসেই অনুমান করিতে পারি । হার্শেল-
সাহেব যুগলতারকায় প্রত্যেক নক্ষত্রটিকে
কই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ইহাদের

প্রত্যেকটিই যে নিরন্তরই অপরিবর্তিত চারিদিকে
ঘুরিতেছে, তাহা কতকটা ঐপ্রকারে বুঝিতে
পারিয়াছিলেন ।

হার্শেলের ঐ আবিষ্কারসম্ভার প্রচারিত
হইলে, জ্যোতির্বিদ্যাজেই বিস্তৃত হইয়া
পড়িয়াছিলেন । সে সময়ে জ্যোতির্বিদ্যাজে
নবাবিষ্কার বড়ই দুর্লভ ছিল, কীটমট
জীর্ণ পুঁথি হাতে করিয়া অতি প্রাচীন
আবিষ্কারগুলির চর্চিতচর্চণ ব্যতীত
পণ্ডিতগণের উপায়ান্তর ছিল না ।
হার্শেলের আবিষ্কারে তাহার দুইএকটা
নূতন কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া
গিয়াছিলেন । সুযোগ উপস্থিত হইল বটে,
কিন্তু তৎপরে অনেকদিন অবধি কোন
জ্যোতিষীই আর নূতন যুগলতারকা
আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং
পরজ্ঞাত যুগলতারকাগুলির ভ্রমণপথ নির্দেশ
করিতে গিয়া অনেককই অকৃতকার্য হইয়া
ছিলেন । কিন্তু এই অকৃতকার্যতার জন্ত
পণ্ডিতগণের উপর কেহই দোষারোপ
করিতে পারেন নাই ; কারণ সেই সময়ে
কোন পর্যবেক্ষণমন্দিরেই ক্ষুদ্রজ্যোতিষ্ক-
পর্যবেক্ষণোপযোগী দূরবীক্ষণযন্ত্রাদি ছিল
না, কুজ্জেই আবিষ্কারের শত উদ্যোগ ব্যর্থ
হইয়া যাইতেছিল ।

হার্শেলের আবিষ্কারের প্রায় কুড়িবৎসর
পরে, কয়েকটি বৃহৎ দূরবীন্ নিশ্চিত হওয়ার
পর্যবেক্ষণের খুব সুবিধা হইয়া পড়িয়াছিল ।
এই সকল উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে চল্লিশবৎসরের
মধ্যে প্রায় একহাজার নূতন যুগলতারকার
সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল এবং বৃহৎ হার্শেলের
সুযোগ্য পুত্র জনু হার্শেল ও অধ্যাপক

জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এই সুযোগে অনেকগুলি যুগলতারকার ভ্রমণপথ পর্য্যন্তও স্থির করিয়া কেলিয়াছিলেন।

নানা জ্যোতিষের পরিভ্রমণবেগ তুলনা করিলে, পরস্পরের বেগের মধ্যে কোন ঐক্য বা শৃঙ্খলার আভাস পাওয়া যায় না। বৃহস্পতি-শুক্র হইতে আরম্ভ করিয়া শত-সুৰ্য্যোপম নক্ষত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক জ্যোতিষই এক এক নির্দিষ্টবেগে মহাকাশে বিচরণ করিতেছে। যুগলতারকাগণের পরিভ্রমণও অবিকল পূৰ্ব্বোক্ত প্রকার বেগবৈচিত্র্য ধরা পড়িয়াছে। গণনাষাড়া দেখা গিয়াছে, কুন্তরাশিহ একটি যুগলতারকা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ১৬৫০ বৎসর অতি-বাহন করে, আবার ইকুইলি-(Equuleii)-রাশির একটি নক্ষত্র তাহার সহচরটির চারিদিকে ঘুরিতে এগারো বৎসরের অধিক-কাল ক্ষেপণ করে নহে। কিন্তু ইহাই যুগলতারকার পরিভ্রমণকালের সীমা নয়, পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের পর্য্যবেক্ষণেও জ্যোতিষগণ অনেকগুলি যুগলতারকার পরিভ্রমণকাল স্থির করিতে পারেন নাই। এই সুদীর্ঘকালে ইহারা এত অল্পদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, তৎসাহায্যে গণনাকার্য্য চলিতেছে না, সুতরাং উক্ত নক্ষত্রগুলির পরিভ্রমণকাল পরিজ্ঞাত উর্দ্ধসীমা ১৬৫০ বৎসরের যে কত অধিক হইবে, তাহা পাঠক অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন। এই সকল যুগলতারকার পরিভ্রমণপথ আবিষ্কারের ভার সুদূর ভবিষ্যতের জ্যোতিষগণের উপর অর্পণ করিয়া আধুনিক জ্যোতিষবিদগণকে পরিতৃপ্ত

ধাকিতে হইতেছে, শত শত বৎসরের পর্য্যবেক্ষণকল তুলনা করিয়া ঐ সকল জ্যোতিষের ভ্রমণপথনিয়ন্ত্রণের সুযোগ ভবিষ্যৎশতাব্দীরে পাইবেন।

যুগলতারকাগুলির পরিভ্রমণকাল নানা জ্যোতিষগণনার আজকাল খুব প্রচুর হইতেছে। কেবল ১০ খ্রীস্টাব্দেই যশবন্তী হইয়া যে, জ্যোতিষবিদগণ রাজির পর রাজি দূরবীণে চোখ লাগাইয়া অনিচ্ছায় কাটাইতে-ছেন, তাহা নয়। আমরা জ্যোতিষগ্রন্থে কোন নক্ষত্রের বিবরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, নক্ষত্রটি কত বড় জানিবার জন্য প্রথমেই ব্যগ্র হইয়া পড়ি। জ্যোতিষগণ আজকাল যুগলতারকার পরিভ্রমণকালের সাহায্যে গণনা করিয়া, আমাদের এই অনু-সন্ধিসা চরিতার্থ করিতেছেন। পৃথিবীর নিকটবর্তী যুগলনক্ষত্রসকল ধরাককার ব্যাসার্ধের যে কোণ উৎপন্ন করে, তাহা স্থির করা বড় কঠিন নয়; কাজেই সেই কোণপরিমাপ দ্বারা পৃথিবী হইতে জ্যোতিষগুলির দূরত্বও হিসাব করিয়া বাহির করা কঠিন হয় না। জ্যোতিষগণ যুগলতারকার পরিভ্রমণপথ ও দূরত্ব অবলম্বনে (কেপ্লারের তৃতীয় নিয়ম অনুসারে) ইহাদের গুরুত্বান্বিতকীর অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। এই হিসাবে সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি যুগল-তারকাকে সূর্য্য অপেক্ষা প্রায় ১৮০০ গুণ বৃহত্তর দেখা গিয়াছে এবং আমাদের সূর্য্যের স্থানে নক্ষত্রটি অবস্থান করিলে, সেটিকে ধরাবাসিগণ সূর্য্যাপেক্ষা দৈর্ঘ্যতঃ ৩৭ গুণ তর দেখিত বলিয়া স্থির হইয়াছে।

যুগলনক্ষত্রের উৎপত্তিতত্ত্ব লইয়া কিছুকাল পূর্বে জ্যোতিষবিদমহলে খুব আলোচনা চলিয়াছিল। কিন্তু এই আলোচনার ফলে তাঁহারা যে, কোন নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না। একদল জ্যোতিষী বলেন,— দুইটি নক্ষত্র তাহাদের নির্দিষ্টপথে স্বাধীনভাবে চুলিতে চুলিতে একসময় পরস্পরের খুব নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল। তার পর বৃহত্তর নক্ষত্রটি ক্ষুদ্রটিকে আর কাছছাড়া হইতে দেয় নাই, এবং প্রবলের আকর্ষণবন্ধন ছিন্ন করিয়া ক্ষুদ্রটি যে বৃহতের স্তম্ভিকার ত্যাগ করিবে, সে সাংমর্ধ্য তাহার নাই। কাজেই সেই মিলনের দিন হইতে সেটিকে বৃহতের চারিদিকে ঘুরিয়াই বেড়াইতে হইতেছে।

নক্ষত্রগণ গতিশীল সত্য এবং তাহাদের পূর্বোক্তপ্রকারের মিলনও অসম্ভব নয়, স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু অনন্ত আকাশের অনন্ত দিক্ ধরিয়া যে সকল নক্ষত্র আনুষ্টি চলাফেরা করিতেছে, তাহাদের মধ্যে এপ্রকার সাক্ষাৎকার যে একটা স্থলভ ঘটনা, একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। অনন্ত নক্ষত্রগুলির মধ্যে কতগুলি যে যুগ্মাবস্থায় পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা স্থির হয় নাই এবং স্থির করিবার উপায়ও আপাতত নাই, কিন্তু আমাদের দূরবীণের সক্ষীর্ণ গতির মধ্যেই যখন সহস্রাধিক যুগলতারকা দৃষ্ট হইতেছে, তখন সমগ্র নক্ষত্রের অল্পপাতে এগুলির সংখ্যা যে নিতান্ত অল্প নয়, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। যুগলনক্ষত্রের এই সংখ্যা-

ধিকা দেখিয়া, পূর্ববর্ণিত আকস্মিক মিলন হইতেই যে প্রত্যেকের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত সকলে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না।

নাক্সট্রিক জগতের উৎপত্তিপ্রসঙ্গে এপর্যন্ত যতগুলি মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ল্যাপ্লাসের নিহারিকাবাদই বৈজ্ঞানিক-সমাজে খুব প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত করিয়াছে। একদল পণ্ডিত এই নিহারিকাবাদের সাহায্যে যুগলতারকার উৎপত্তিতত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন। নিহারিকাবাদিগণ বলেন, নাক্সট্রিক জগৎগুলি সৃষ্টির প্রথমে বর্তমান আকারে ছিল না। তখন এক-একটা বিশাল জগৎ নিহারিকাকে নক্ষত্র-গুলির স্থানে ঘুরিতে দেখা যাইত; তার পর সেই নিহারিকাকুলিও তাপক্ষয়দ্বারা কালক্রমে জমাট হইয়া গেলে, এই গ্রহ-উপগ্রহযুক্ত নাক্সট্রিকজগতের উৎপত্তি করিয়াছে। যুগ্মতারকার উৎপত্তিপ্রসঙ্গেও তাঁহারা বলিতেছেন,—প্রথমে এই সকল নক্ষত্রের স্থানে যুগলজ্যোতিষের চিহ্নমাত্রও ছিল না, তখন সেখানে কেবল এক একটি ঘূর্ণমান অল্প নিহারিকারানি দেখা যাইত। পরে সেগুলি শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিলে, সেই ঘূর্ণনবেগ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত যে, তখন আর নিহারিকাটি একসঙ্গে থাকিতে না পারিয়া, সবই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িত। নিহারিকাবাদিগণের মতে, যেই দ্বিধাভিত্ত নিহারিকারই পরিণতি যুগলতারকা।

যুগলনক্ষত্রের উৎপত্তিতত্ত্বস্বকীয় পূর্বোক্ত উক্তিটি পাঠক কেবল অসম্ভবমূলক মনে

করিবেন না। সূর্য্যমান পদার্থ ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলে যে তাহার আবর্তনবেগ বৃদ্ধি পায় এবং তদ্বারা তাহার দ্বিধা বিভক্ত হওয়ারই যে সম্ভাবনা, গণিতের সাহায্যে নিহারিকাবাদিগণ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তা ছাড়া, পর্য্যবেক্ষণদ্বারা আকাশে যে কতকগুলি যুগলনিহারিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্বারাও ইহাদের উক্তির সার্থকতা জানা যাইতেছে। নিহারিকাদিগণ বলিতেছেন, একএকটি বৃহৎ নিহারিকা কোটি কোটি বৎসরের তাপক্ষয়জনিত সঙ্কোচে বেগশালী ও খণ্ডিত হইয়া প্রথমে, যুগলনিহারিকার আকার প্রাপ্ত হয়, এবং পরে ইহারাই আবার ক্রমে আরো সঙ্কুচিত হইয়া যুগলতারকার উৎপত্তি করে।

সূর্য্যের জ্ঞায় একক নক্ষত্রগুলির সহিত যুগলনক্ষত্রের তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। বৃহস্পতি, শুক্র ও পৃথিবী ইত্যাদি মৌরসহচরগুলির পরিভ্রমণপথ প্রায় বৃত্তাকার, কিন্তু কোন যুগলতারকার সহচরের কক্ষ এপর্য্যন্ত সৌ প্রকার দেখা যায় নাই। যুগলনক্ষত্রের ভ্রমণপথ বৃত্তাভাস বটে, কিন্তু সেগুলি অনেকটা লম্বা-আকৃতি-যুক্ত অর্থাৎ ইহাদের বৃহৎ ব্যাস-(major axis)-গুলি ক্ষুদ্র ব্যাসের (minor axis-এর) তুলনায় অত্যন্ত দীর্ঘ। নিহারিকাবাদিগণ এপর্য্যন্ত যুগলনক্ষত্রের এই বিশেষত্বটির কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহারা নক্ষত্রের যুগলতা-উৎপত্তির যে ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, তাহাতে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্তি ডাক্তার সি-(See)-নামক জনৈক

জ্যোতিষী নিহারিকাবাদই অবলম্বন করিয়া যুগলতারকার ভ্রমণপথের পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্বটির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। চন্দ্রের উৎপত্তি ও গতিসম্বন্ধে অধ্যাপক ডাক্তার ইন্ বে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক তাহা অবজ্ঞাই অবগত আছেন। ডাক্তার ইন্ বেলিয়া- ছিলেন, সেই প্রাথমিক নিহারিকার কোন অংশ খণ্ডিত হইয়াই যে ক্রমে পৃথিবী ও চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু চন্দ্রের কুটিলগতি ও উহার আবর্তনের বিশেষত্ব কেবল পৃথিবী ও চন্দ্রের পরস্পর আকর্ষণজাত জোয়ারভাঁটা দ্বারাই হইয়াছে। ডাক্তার সি ডাক্তার ইন্ বেলিয়ার মতবাদ অনুসরণ করিয়া, কেবল জোয়ারভাঁটার সাহায্যে যুগলতারকার ভ্রমণপথের বিশেষত্বটির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অধ্যাপক ডাক্তার ইন্ ও ডাক্তার সি উভয়েই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, গণিতই তাহার মূল অবলম্বন, সুতরাং এখন আর তাঁহাদের উক্তিতে কোনক্রমেই অবিশ্বাস করা চলে না।

পরিবর্তনশীল তারকার কথা পাঠক শুনিয়া থাকিবেন। এই নক্ষত্রগুলির উজ্জলতা সকল সময়ে একপ্রকার থাকে না। একএকটি নির্দিষ্ট সময়ের অন্তে এগুলিকে কখন ম্লান ও কখন উজ্জল দেখা যায়। অতি প্রাচীন জ্যোতিষিগণও কতকগুলি নক্ষত্রের এই বিশেষত্বটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পার্সিউস-(Perseus)-রাশিহ আল্‌গল-(Algol)-নামক নক্ষত্রটির পরিবর্তনশীলতার কথা প্রাচীন পারস্তগ্রন্থেও লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এপর্য্যন্ত এই জ্যোতিষিক

ঘটনাটির কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, বিশ্বব্যবস্থার তিনেত্র নক্ষত্রগুলির এই অদ্ভুত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা বাতীত তাহাদের উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু আধুনিক জ্যোতিষিগণ যুগলতারকাকেই এই দীপ্তবৈচিত্র্যের কারণস্বরূপ উল্লেখ করিতেছেন। ইহার বুলিতেছেন,—আমরা এ পর্যন্ত বতগুলি পরিবর্তনশীল তারকা আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেককেই যুগলনক্ষত্রশ্রেণীভুক্ত; ইহাদের সহস্রগুলি তাপবিকিরণদ্বারা কালক্রমে অমুজ্জল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া দূরবীণে উহাদের যুগতা ধরা পড়ে না। অমুজ্জল হইয়া পড়ায় কিন্তু উহাদের গতির কোন অপচয়

হয় নাই, তাহাদের প্রত্যেককেই ঠিক পূর্ববৎ সহস্রের চারিদিকে আজও ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন,—এই অমুজ্জল বৃদ্ধনক্ষত্রগুলি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যখন তাহাদের উজ্জল সহস্র ও পৃথিবীর মাঝে আসিয়া ঠিক একস্থানে অবস্থান করে, তখন অমুজ্জল নক্ষত্রটির দেহ উজ্জল নক্ষত্রটি আচ্ছাদিত হইয়া যায়; কাজেই আমরা তৎকালে আচ্ছন্ন নক্ষত্রটিকে স্নানতর দেখি। কিন্তু ইহার এই মলিনতা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারেনা, কালক্রমে যথাকালে বৃদ্ধনক্ষত্রটির দেহান্তরাল হইতে মুক্তিলাভ করিলেই, সেটি আবার পূর্বজ্যোতি ফিরিয়া পায়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ত্রিবেঙ্কুর ।

৭°.

ভারতে, কাকের কা-কা-ধ্বনি যেন সমস্ত শব্দরাশির ভিত্তিস্বরূপ। তাই, ক্রমে সেই ধ্বনি অভ্যস্ত হইয়া যায়—আর গ্রাহ্যের মধ্যে আইসে না। মন্দিরের কোলাহল থামিয়া গেলে, পার্শ্ববর্তী কাকদিগের ভীষণ বৈতালিক সঙ্গীত যখন আরম্ভ হয়, আমি জাগ্রত হইয়া আর তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। আমার ছাদের সম্মুখেই একটা বৃহৎ বৃক্ষ,—সেই বৃক্ষশাখাই তাহাদের প্রিয় বাসগৃহ। সেই বৃহৎ তরুর গোলাপিরঙের কুসুমগুচ্ছ অনেকটা আমাদের chestnut-

তরুর পুষ্পের জায়। অক্লেশেই পর্যন্ত ইহার শাখাগুলি এই কৃষ্ণবর্ণ বিহঙ্গদিগের ভায়ে বক্র হইয়া থাকে।

আজ প্রাতে, সূর্যোদয়ে,—যখন পল্লব-পুষ্পের তলদেশ—হরিৎ-শাখা-মণ্ডপের তলদেশ নবভাসুর কিরণচ্ছটার উদ্ভাসিত হইল, আমি সেই সময়ে ব্রাহ্মণঘরের মধ্যে মহা-রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটা গাড়িতে উঠিলাম।

সিংহদ্বার পার হইয়া, প্রথমেই আবার সেই পবিত্র পুষ্করিণীগুলি দেখিতে পাইলাম।

এই সব পুরুষের জলে ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন প্রভাতে অর্ধনিমজ্জিত হইয়া স্নান করে—পূজার্মনা করে।

এই প্রাচীরবেষ্টিত নগরের মধ্যে এইবার আমি পূর্ণাপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছি। এই নগরস্থ উদ্ভানের মধ্যে,—তালপুঞ্জের মধ্যে, শুধু যে রাজপরিবারেরই বাসস্থান, তাহা নহে; তা ছাড়া, রাস্তার দুধারে ছোট ছোট মাটির ঘর রহিয়াছে,—তাহাতে শুধু উচ্চবর্ণের লোকেরা বাস করে। আয়তনয়না ব্রাহ্মণগৃহিণীরা, এই রমণীয় উষাকালে, নিজ নিজ গৃহের সম্মুখস্থ ভূমির শোভা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। সেই লাল মাটি উত্তমরূপে পিটাইয়া ও ঝাঁটাইয়া, একটা শাদা গুঁড়া দিয়া তাহার উপর নানাবিধ অদ্ভুত নক্সা কাটিতে থাকে। কিন্তু এই নক্সাগুলি এত ক্ষণস্থায়ী যে, একটু বাতাস উঠিলেই বিলুপ্ত হয়—ঐখবা মাগুবেধ, ছাগলের, কুকুরের, কাকের পদসন্ধারে মুছিয়া যায়। অগ্রে তাহারা একটু-একটু চিহ্ন দিয়া রাখে,—পরে সেই চিহ্ন-অনুসারে খুব তাড়াতাড়ি নক্সাগুলি রচনা করে। অতীব শোভনভাবে আনত হইয়া, গুঁড়ার আধারপাতি হস্তে লইয়া, মাটির উপর ঘুরিয়া-ফিরিয়া দ্রুতভাবে বেড়াইতে থাকে। সেই চূর্ণপাত্র হইতে শাদা-শাদা চূর্ণধারা, অক্ষুরস্ত ফিতার দ্বারা অনবরত পড়িতে থাকে। গোলাপপাপড়ির অঙ্কুরণে জটিল নক্সা, জ্যামিতিক আকৃতির চিত্রাবলী, উহাদের নিপুণ অঙ্গুলি হইতে আশ্চর্য্যরূপে বাহির হইতে থাকে। নক্সারচনা শেষ হইলে, অঙ্কিত রেখাবালের প্রধান-প্রধান

সন্ধিস্থলে উহারা নানাবিধ পুষ্প বসাইয়া দেয়। এইরূপে, সেই ছোট রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিভূষিত হইলে, অস্তুত ঘণ্টাখানেকের জন্ত মনে হয়, যেন একটা চিত্রবিচিত্র অদ্ভুত গালিচার রাস্তাটি অচ্ছাদিত হইয়াছে।

তা ছাড়া, এই অঞ্চলটির সর্বত্রই কেমন-একটা প্রাচীনধরণের শোভনপারিপাট্য, বিমল শাস্তি ও সরল গান্ধীয়া বিরাজমান।

মহারাজার উদ্ভানের সিংহদ্বারের সম্মুখে, সেই একইধরণের কায়দাভর লালপাগড়ি-ওয়ালা সিপাই-সান্নী। উহারা তুরীভেরী বাজাইয়া, অস্ত্রশস্ত্র বন্ধ হইতে নামাইয়া, উচিত সম্মান প্রদর্শনে সতত তৎপর। মহারাজার পতি রাজা বহিঃসোপানের নিম্নতম চাতালে নামিয়া-আসিয়া, বিশিষ্ট শিষ্টতার সহিত পূর্ণ উপচারে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজের ন্যায় ইনিও সুরুচির অনুসরণ করিয়া, ভারতীয় বেশেই আসিয়াছিলেন। সবুজরঙের মণ্ডলের পোষাক, মাথায় শাদা রেশমের পাগড়ি, আর সর্কাজে হীরক বকমক করিতেছে। এই সমস্ত বেশভূষা সম্বন্ধে ইনি একজন কৃতবিস্ত পণ্ডিত।

প্রাসাদের প্রথমতলস্থ দরবারশালার মহারাজা আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই দরবারশালাটি যুরোপীয় আস্বাবে সজ্জিত। কিন্তু মহারাজা বয়ঃ বদেহীয় পরিচ্ছদ ধারণ করায় তাঁহাকে মূর্তিমতী ভারতলক্ষ্মী বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার পার্শ্ববুকের অবয়ব-রেখা সরল, মুখখণ্ড অতি বিশুদ্ধ, চোখদুটি বেশ বড় বড়,—তাঁহার সমস্ত শ্রীসৌন্দর্য্য

স্ববংশমূলভ। নায়ের-জাতির প্রথা-অনু-
সারে, তিনি তাঁহার কৃষ্ণ কেশকলাপ প্রথমে
কিতাবন্ধনের আকারে বিনাস্ত করিয়া, পরে
সেইগুলি একত্র সম্মিলিত করিয়া ছোট
একটি মস্তণ টুপি মত মস্তকে ধারণ করিয়া-
ছেন। উহা সম্মুখদিকে খুঁকিয়া, ললাটের
উপর ছায়াপাত করিয়াছে। হারক-মাণিকা-
খচিত কানবালায় ভারে কর্ণদ্বয়ের নিম্নাংশ
অতিমাত্র প্রসারিত। মথমলের চোলী
পরা, নগ্ন বাহুরে বহুমূল্য মণিখচিত বাজু-
বন্ধ; পরিধানে জ্বরির পাড়ওয়ালা শাড়ী ;—
তাহাতে স্থলর নক্সা কাটা। প্রস্তর-
প্রতিমা বেক্সপ পরিচ্ছদে আবৃত হয়, তাঁহার
পরিচ্ছদ তদনুরূপ। যে দেশে নিম্নাংশের
মধ্যেও বেশভূষায় মার্জিতরূচি পরিলক্ষিত
হয়, সেখানে পুরাতন রাজবংশের সম্ভ্রান্ত
রমণীদিগের কিরূপ বেশভূষা, তাহা সহজেই
কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই
মহারাজার স্রীমৌল্য,—বেশভূষা অতিক্রম
করিয়া, সর্বোপরি তাঁহার করণার্জ মুখশ্রীতে,
তাঁহার মৌনমাধুর্য্যে, তাঁহার নারীজনোচিত
শালীনতায় আরো যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তা ছাড়া, তাঁহার স্নিতহস্তের অন্তরালে
যেন একটা চাপা বিষাদের ভাব প্রচ্ছন্ন
রহিয়াছে, বেশ বুঝা যায়। তাঁহার তাপসী-
কল্প জীবন কিসের দুঃখে তমসচ্ছন্ন, তাহা
আমি অবগত আছি। তজ্জা তাঁহার অন্তরে
একটিও কন্যারস্ত্র লেখেন নাই, তাঁহার
একটি ভাগিনেয়ীও নাই বাহাকে তিনি
দত্তকস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। তাই
তাঁহার বংশলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।
বহু শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত বাহা কখন

ঘটে নাই, এইবার তাহা ঘটতে চলিল।
এইবার ত্রিভঙ্গুরে একটা বিষম বিপ্লব
উপস্থিত হইবে।...

মহারাজার সহিত যুরোপসম্বন্ধে আমার
কথাবার্তা হইল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার
কল্পনা বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।
আমি ব্রিটিশ, ঐ সুদূরভূখণ্ড-সম্বন্ধে জ্ঞান-
লাভ করাই তাঁহার জীবনের একটি চির-
পোষিত স্বপ্ন। কিন্তু, মঙ্গলগ্রহের কিংবা
চন্দ্রলোকের কাল্পনিক দেশসমূহের ত্রাণ,
এই যুরোপ তাঁহার পক্ষে দূরবিগম্য।
কেন না, ত্রিভঙ্গুরে, কোন সম্ভ্রান্ত উচ্চকুলের
রমণী, বিধেযত কোন রানী যুরোপযাত্রা
করিলে, তাঁহাকে জাত্যাংশে পতিত হইয়া
“পারিয়া”র সামিল হইতে হয়।

আর যে-কয়েকদিন আমি ত্রিভঙ্গুরে
অবস্থিত করিব, ইহার মধ্যে কখন-কখন
মহারাজের দর্শনলাভ আমার হইলেও হইতে
পারে, কিন্তু এই লক্ষ্মীস্বরূপা মহারাজার
দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে আর কখনই
ঘটিবে না। তাই, এখান হইতে বিদায়
হইবার পূর্বে, যে মূর্তিটি একালের বলিয়া
মনে হয় না, সেই মূর্তিটি আমার নেত্রের
উপর ভাল করিয়া মুদ্রিত করিয়া লইতে
আমি অভিলাষী হইয়াছি। ইতঃপূর্বে
আমি এইরূপ রানীদিগকে কেবল ভারতের
পুরাতন ক্ষুদ্র চিত্রপটেই দর্শন করিয়াছি।
মহারাজার নিকট বিদায় লইয়া, এই ব্রাহ্মণ-
গণ্ডির মধ্যেই, মহারাজার এক ভগিনীর
পুত্রদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।
তাঁহারাই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী।
তাঁহাদের পরেই এই রাজবংশ লোপ

পাইবে। উঁহাদের মধ্যে একজনের পদবী “প্রথম রাজকুমার”, অপরটির পদবী “দ্বিতীয় রাজকুমার”। এই উত্তানের মধ্যে, তাঁহাদের পৃথক্ আবাসগৃহ। এই যুবকদ্বয়ের উচ্চায়ে মরকত্তমণির শ্রীপচ্ছক সংযোজিত। ইঁহারা ব্যাঙ্গশিকার করেন, ব্রাহ্মণ্যের অমুষ্ঠানাদি করেন, অথচ আধুনিক কালের সমস্ত বিষয়েরই গোঁজখবর রাখেন, এবং সাহিত্য ও ভৌতিকবিজ্ঞানের অমুশীলন করেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন, আমার অমুরোধক্রমে, প্রথমে আমাকে হাওদা-খানায় লইয়া গেলেন। সেইখানে হাতীদের সাজসজ্জা ও সুরঞ্জাম রক্ষিত। তাহার পর, তাঁহার স্বগৃহীত কতকগুলি ফোটো-চিত্র আমাকে দেখাইলেন;—তিনি নিজ-হস্তে সেগুলি পরিষ্কৃত করিয়াছেন। এবং পরে, পদকপুরস্কারলাভের আশায় ঐগুলি সঞ্চ করিয়া তিনি যুরোপের কোন প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া দেন।

আজ সন্ধ্যার সময়, সূর্যাস্তকালে, ভারত-সমুদ্রে দেখিতে আমার ইচ্ছা হইল। জিবকুর হইতে সমুদ্র প্রায় দেড়কোশ দূরে। সেখানে উহার বীচিমালা বিজন তটভূমির উপর অনবরত ভাঙিয়া পড়িতেছে।

মহারাজের একটা গাড়িতে উঠিয়া, প্রথমে সমস্ত প্রাচীরবেষ্টিত নগরটি অতিক্রম করিতে হইল। ব্রাহ্মণগৃহসমূহের ধার দিয়া যে সব রাস্তা গিয়াছে, সেই সব নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়া, প্রাসাদ ও উত্তানের লাল প্রাচীরের সম্মুখ দিয়া, বৃহৎ মন্দিরটির ধার দিয়া, আমার গাড়ি চলিতে লাগিল। মন্দিরের এত নিকটে আমি ইতঃপূর্বে কখন আসি নাই।

শীঘ্রই নগর পার হইলাম এবং নগর পার হইয়াই, নিস্তব্ধ সৈকতভূমির মধ্যে, স্তূপাকার বালুরাশির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড সূর্য্য দিগন্তে মগ্নপ্রায়,—তাহারি ভাঙা-ভাঙা রশ্মিচ্ছটা চারিদিকে প্রসারিত।, অস্বদেশের সমুদ্রোপকূলস্থ বৃক্ষের ছায় বাতাহত ও আলুলিতশাখ কতকগুলি বিরল তালজাতীয় বৃক্ষ, সাগর-বায়ুর অবিপ্রান্ত প্রবাহবেগে, ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বহুশতাব্দীসঞ্চিত এই সব বালুকারাশি, এই সমস্ত প্রস্তর, প্রবাল ও শব্দকের চূর্ণরাশি, সহস্র-সহস্র চূর্ণীকৃত জীবদেহের ধূলিরাশি—এই ভীষণ স্থানের সান্নিধ্য ঘোষণা করিতেছে। তাহার পরেই, সেই অস্তহীন মহা কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। এবং এই বালুকাস্তূপের মধ্যে, একটা পথের বাক ফিরিবামাত্র, সেই সচল অনন্তমূর্ত্তি আমার সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইল।

পৃথিবীর অন্তান্ত প্রদেশে, মনে হয় যেন, মানবজীবন স্বভাবতই সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত হয়। সেখানে লোকেরা সমুদ্রের ধারে আবাসগৃহ নির্মাণ করে, সমুদ্রের যতটা নিকটে হওয়া সম্ভব—তাহাদের নগর-পত্তন করে; তাহাদের নৌকাদির জন্ত অল্পস্বল্প স্থান এবং বেলাভূমির একটু আধটু কোণ খালি রাখিতেও তাহারা যেন কুণ্ঠিত হয়।

কিন্তু এখানকার লোকেরা সমুদ্রকে শূন্য অশান ও সাক্ষাৎ মৃত্যু মনে করিয়া, যতটা পারে, তাহা হইতে তফাতে সরিয়া যায়। এদেশে সমুদ্র—একটা দূরতীক্ষ্মমণীর অন্তলম্পর্ক রসাতলবিশেষ—যাহা কোন

কাজে আইসে না, বাহ্য কেবল মনুষ্যের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক করে। সমুদ্রকে দুর্গম স্থান মনে করিয়া কেহ তাহার নিকটে যাইতে সাহস করে না। আমি এই অনন্ত বীচিমালার সম্মুখে, বায়ুরাশির অফুরন্ত রেখার উপরে, একটি পুরাতন প্রস্তরমন্দির ছাড়া মনুষ্যের আর কোন নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না। মন্দিরটি রুচু-ধরণে গঠিত, স্থূল ও ধর্মাকার, থামগুলি লুপ্তমুখত্রী,—

কতকটা তরঙ্গশীকরে, কতকটা লবণাক্ত জলে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যে সমুদ্র-কর্তৃক ত্রিধকুর কারাকর, সেই হ্রবৃত্ত সমুদ্রকে মস্তবশীভূত ও প্রশমিত করিবার নিমিত্তই যেন এই মন্দিরটি এখানে অধিষ্ঠিত। এই সন্ধ্যাকালে সমুদ্রটি বেশ প্রশান্ত। কিন্তু গ্রীষ্মের আরম্ভ হইতে, এই সমুদ্র কিছুকালের জন্ত আবার রুদ্ধমুখী ধারণ করিবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

অনুস্মার ও বিসর্গ ।

স্বরবর্ণ-অস্ত্রে তাহাদের উচ্চারণবিশেষের ছুইটি চিহ্ন সন্নিবিষ্ট আছে। একটির আকার এক বিন্দু, অত্রটি দ্বিবিন্দু। তাহাদের বৈয়াকরণিক নাম অনুস্মার ও বিসর্গ। উহাদিগকে বৈয়াকরণগণ স্বরও বলেন নাই, ব্যঞ্জনও বলেন নাই। উহাদিগকে অযোগবাহ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত ইহারা বর্ণমধ্যে পরিগণিত নহে। ইহারা স্বরবর্ণে যুক্ত হইয়া কেবল তাহাদের উচ্চারণের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটায় মাত্র, তন্নিমিত্ত ইহাদের স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই।

এই চিহ্নদ্বয় স্বর ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণে কখনই যুক্ত হয় না, এইজন্ত চিরপ্রসিদ্ধপ্রণামুসারে অকারাদি ঔকার পর্যন্ত চৌদ্দটি স্বরবর্ণের অস্ত্রে ইহাদের স্থান হইয়াছে। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর মহাশয় সেই চিরপ্রচলিত প্রথা অতিক্রম করিয়া ইহাদিগকে

ব্যঞ্জনবর্ণের অস্ত্রে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু যখন ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই, স্বরবর্ণের সহিতই একমাত্র সম্বন্ধ, তখন ইহাদিগকে স্বরাস্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যঞ্জনাস্ত্রে আনিয়া স্থান দেওয়া বোধ করি সম্মত হয় নাই। ইহারা স্বরেরই অনুগামী, সুতরাং ঔকারের পরেই ইহাদের স্থান চিরকাল ছিল এবং এখনও রাখা উচিত। স্বরের অনুগামী বলিয়াই ং এই চিহ্নের নাম অনুস্মার হইয়াছে। ইহাকে বলপূর্বক অনুস্মার হইতে অনুব্যঞ্জন করিয়া লওয়া বোধ করি ঠিক হয় নাই। অনুস্মারের প্রকৃত উচ্চারণ বিচ্ছিন্নতা নির্ণয় করার জন্ত অগ্রে আমাদের বর্ণমালার সমস্ত অনুনাসিক বর্ণের সমালোচনা করা আবশ্যিক।

অত্রাণ্ড ভাষার অনুনাসিকবর্ণ একটি

কি দুইটি থাকে, কিন্তু আমাদের ভাষায় পাঁচটি, যথা;—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম। ইহারা এক এক বর্ণের জন্ত এক একটি নির্দিষ্ট। এই পঞ্চবিধ অমুনাসিকের ব্যবস্থা করিয়া আৰ্য্যাবিগণ যে ভাষায় প্রতি নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক অমুনাসিকসূতা এবং সুকোশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎপ্রতি প্রণিধান-পূর্বক মনঃসংযোগ করিলে হৃদয় পুলকিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের জন্ত এক একটি অমুনাসিকের সৃষ্টি করার কারণ এই যে, এক বর্ণের অমুনাসিক অন্য বর্ণে প্রযুক্ত হয় না; এবং প্রয়োগ করিলে উচ্চারণ দ্রুত হয়। যেমন ইংরেজীতে দুইটিমাত্র অমুনাসিক এন্ (n) এবং এম্ (m)। এই এন্কে যদি আমরা দন্ত্য ন ধরিয়া লই, তবে rankশব্দের উচ্চারণ রেক্ হইতে পারে না, রেন্কে হইবে। কিন্তু এরূপ অস্বত বাঙনিষ্পত্তি কেহ করে না। কণ্ঠ্যবর্ণের উপর দন্ত্য অমুনাসিক প্রয়োগ করা অস্বাভাবিক। কণ্ঠ্যবর্ণের উপর কণ্ঠ্য অমুনাসিকের প্রয়োগ করাই স্বাভাবিক। আমাদের কণ্ঠ্য অমুনাসিক ঙ। ইংরেজীতে উক্ত ঙ-বর্ণ না থাকা সত্ত্বেও তাহাতে rankশব্দের nকে ঙর স্থায় উচ্চারণ করিয়া থাকে।

Gangশব্দ উচ্চারণ করিতেও সেই প্রকার ঙ-উচ্চারণ হয়, ন-উচ্চারণ হয় না। অর্থাৎ k এবং g কণ্ঠ্যবর্ণ, সুতরাং তাহাদের উপর যে অমুনাসিক বসিবে, তাহা “ঙ”র স্থায় উচ্চারিত হইবে; ঐ ঙ-বর্ণ সেই ভাষাতে থাকুক আর না থাকুক। এইপ্রকার প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া

যায় যে, প্রত্যেক বর্ণের উপর সেইবর্গীয় অমুনাসিক ব্যতীত অন্যবর্গীয় অমুনাসিক প্রযুক্ত হয় না; এই কারণেই প্রত্যেক বর্ণের জন্ত স্বতন্ত্র অমুনাসিক উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইংরেজীতে যে ওষ্ঠ্য অমুনাসিক এম্ (m) আছে, তাহা যদি না থাকিত এবং দন্ত্য অমুনাসিক এন্ (n) দ্বারা lampশব্দ স্থলে lanp লিখিত, তবে তাহাকেও লোকে লেম্পই উচ্চারণ করিত, কখনও লেনপ্ বলিত না। P এবং B বর্ণের উপর nযুক্ত কোন শব্দ ইংরেজীতে দেখা যায় না। ইহার কারণ ওষ্ঠ্যবর্ণের উপর দন্ত্য-অমুনাসিক-প্রয়োগ অস্বাভাবিক। এই কারণের প্রতি ভারতীয় আৰ্য্যগণই লক্ষ্য করিয়াছেন, অন্য কোন জ্ঞাতি করে নাই; কিন্তু স্বভাব সর্বত্রই এক, তাহার বশে সকলেই রেন্কে রেক্ উচ্চারণ করে। অর্থাৎ বর্ণমালায় না থাকিলেও উচ্চারণে ঙ-বর্ণটি সর্ব-ভাষাতেই বর্তমান আছে।

অসদৃশ-অমুনাসিক-যুক্ত যে কোন শব্দ গঠিত হইতে পারে না, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তাহা করিলে সেই শব্দের উচ্চারণ অস্বাভাবিকত্বহেতু সুখদ এবং সহজ হয় না। স্বাভাবিকনিয়মানুসারে যে বর্ণ যে স্থান হইতে উৎপন্ন, তদুপরি যে অমুনাসিক ব্যবহৃত হইবে, তাহাও সেই স্থান হইতে উৎপন্ন হইবে। অধুনা “বঙ্গভাষা” লইয়া নানাপ্রকার বাধিতগুণ চলিতেছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ বলন, দন্ত্য ন এবং মূর্দ্ধন্য ণ, এই দুই অমুনাসিক বাঙলাতে একপ্রকারই উচ্চারিত; সুতরাং মূর্দ্ধন্য ণ বাঙলাতে নিম্নয়োজন এবং উহাকে বর্ণমালা

হইতে বর্জন করা কর্তব্য। অনেক প্রাচীন প্রাকৃতিকও দেখা গিয়াছে, মূর্দ্ধন্য গকারের ব্যবহার নাই; কিন্তু মৌলিক আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, স্বাভাবিক-নিয়মানুসারে একটি অনুনাসিকও ত্যাগ করা যায় না। “কঠ” আর “কন্দর” কখন এক অনুনাসিক দ্বারা উচ্চারণ করা যাইতে পারিবে না। কারণ কঠের গকে দন্ত হইতে উচ্চারণ করিয়া ঠকে মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারণ করিতে গেলে তাহার উচ্চারণ এত কঠিন ও অস্বাভাবিক হয় যে, তাহা কেহ করিবেই না। ঠ এবং তাহার অনুনাসিক উভয়কেই অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতির বেশে লৌকিক একস্থান হইতে উচ্চারণ করিবে, ইহার অস্তিত্ব নাই।

আরও দেখুন, Panther শব্দের গকারের উচ্চারণ করিতে জিহ্বা যে স্থানকে স্পর্শ করে, তাহা মূর্দ্ধা; কারণ t বা ট মূর্দ্ধন্য-বর্ণ। আর Panther বলিতে নকারের উচ্চারণ যে স্থান হইতে হয়, অর্থাৎ জিহ্বাগ্র যে স্থান স্পর্শ করে, তাহা দন্ত; কারণ th বা থ দন্ত্যবর্ণ। Panther শব্দের গ বলিতে জিহ্বাগ্র মূর্দ্ধাতে না যাইয়া কখনই দন্তে বাইবে না, এবং Panther শব্দের ন বলিতেও জিহ্বাগ্র দন্ত ছাড়িয়া মূর্দ্ধাতে কোনমতেই যাইবে না। অতএব প্রত্যেক অনুনাসিকের উচ্চারণ স্বতন্ত্র। তাহাদের একের দ্বারা অন্তের কার্য্য কখনই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যে বৈজ্ঞানিক ভাবে আমাদের ভাষা অগজরী, সেই ভাবে উপর হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া অতি দুর্ব্বল কার্য্য, এবং তাহাতে অত্যন্ত সাবধানতার প্রয়োজন।

ব্যঞ্জনবর্ণের যেমন প্রত্যেক বর্ণের সহিত সেই বর্ণের একটি অনুনাসিক সংস্থিত আছে, সেইপ্রকার অকার হইতে ঔকার পর্য্যন্ত স্বরবর্ণের পরেও তাহাদের একটি অনুনাসিক চিহ্ন ব্যবস্থিত আছে, তাহার নাম অনুস্বার। প্রত্যেক অনুনাসিকই তাহার আপন অধিকারমধ্যে কার্য্য করে, যেমন ও কবর্ণের উপর বসে, কিন্তু অন্ত বর্ণের উপর বসিতে পারে না; আবার দন্ত্য ন দন্ত্যবর্ণ ভিন্ন কবর্ণ প্রভৃতির উপর বসে না। সেইপ্রকার অনুস্বারও তাহার আপন অধিকার স্বরবর্ণে ভিন্ন অন্ত বর্ণে যুক্ত হইতে পারে না। অং ইং ইত্যাদি হইতে পারে, কিন্তু কং হয় না, কং হইতে পারে, কারণ কং = ক্ + অ + ঙ। অকার না থাকিলে কেবল কবর্ণে ঙ যুক্ত হইতে পারিত না। এইজন্যই ইহাকে অনুস্বর বা অনুস্বার বলা যায়। ব্যঞ্জনানুসঙ্গিকসকল যেমন আপন আপন বর্ণের অনুগামী, অনুস্বার তেমনি স্বরের অনুগামী।

• বর্গীয় অনুনাসিকসকল যেমন প্রত্যেকে আপন আপন বর্ণের উচ্চারণযন্ত্রের সংঘাতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্বরবর্ণ যদি কোন যন্ত্রের সংঘাতে উৎপন্ন হইত, তবে ঐ নিয়মানুসারে তাহার অনুনাসিকও সেই যন্ত্রের সংঘাতে উৎপন্ন হইত, কিন্তু স্বরবর্ণোচ্চারণ করিতে কোন দুই উচ্চারণস্থানের সংঘাত হয় না, সুতরাং তাহার অনুনাসিক অনুস্বারের উচ্চারণেও কোন দুই যন্ত্রের স্পর্শ হওয়া উচিত নহে; কিন্তু আমরা সংস্কৃতশব্দোচ্চারণ করিতে অনুস্বারকে যে অঙ্গ অথবা অঙ্গ শব্দের “ঙ”র দ্বারা উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহা কঠকে

স্পর্শ করে। যদি ও এবং অহুস্বরের এক উচ্চারণ হইত, তাহা হইলে এক উচ্চারণের অন্ত দুইটি বর্ণ ব্যবহৃত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। অতএব বোধ হয়, অহুস্বারকে যে “ঙ”র ভ্রায় উচ্চারণ করা হয়, তাহা ভ্রম, ইহার প্রকৃত উচ্চারণ আমাদের চক্ষুবিন্দু এবং করানীভাবার Monsieur শব্দের n এর ভ্রায় হওয়া উচিত। আমরা মৌখিক ভাষাতে অহুস্বরের প্রকৃত উচ্চারণই করিয়া থাকি। কাংস, মাংস প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ আমরা কাংস, মাংসই করি এবং তাহাই ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণ; কিন্তু বিস্ময় করিয়া অর্থাৎ সংকুত করিয়া বলিতে গেলেই কাঙ্‌স, মাঙ্‌স বলিয়া থাকি। স্বাভাবিক উচ্চারণ চলিতভাষাতে ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের শিক্ষিতভাষা অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষা যাহা শিকা করিয়া গইতে হয়, তাহা শিখিবার সময় কুশিক্ষাহেতু অন্তর্কোচ্চারণ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে; এবং বহুকাল হইতে ভাষার মৌলিক তত্ত্বানুশীলন না হওয়াতে আমরা যাহা শুনিয়া আসিতেছি, তাহাই বলিতেছি।

সকল অহুনাসিকের উচ্চারণস্থান যুধ এক নাসিকা, কিন্তু “নাসিকানুস্বারস্ত” ইতি পাণিনি। অর্থাৎ অহুস্বরের উচ্চারণস্থান কেবল নাসিকা। ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, ইহার উচ্চারণ চক্ষুবিন্দুর ভ্রায়। অহুস্বারকে চক্ষুবিন্দুর ভ্রায় উচ্চারণ করিলে তাহা উল্লিখিত সকল নিয়মের সহিত মিলিয়া যায়, আর “ঙ”র ভ্রায় উচ্চারণ করিলে তাহা সকল নিয়মের সহিত অসংলগ্ন হইয়া পড়ে।
বলা,—

১। “ঙ”র ভ্রায় হইলে এক উচ্চারণের অন্ত দুইটি বর্ণের প্রয়োজন কি ?

২। যদি “ঙ”র ভ্রায় ইহার প্রকৃত উচ্চারণ হয়, তবে চিরপ্রথা অনুসারে ইহার ব্রবর্ণের অন্তে গল্পিবিষ্ট আছে কেন ?

৩। যেমন প্রত্যেক বর্ণান্তে তাহার উপযোগী একটি অহুনাসিক আছে, সেইরূপ ব্রবর্ণের অন্তে তাহাদের উপযোগী একটি অহুনাসিক থাকিবে না কেন ?

৪। কঠাবর্ণ “ক”র সহিত কঠানু-নাসিক “ঙ” যুক্ত হইলে যে একটি যুক্তবর্ণ (ক্) হয়, তাহাও কঠাবর্ণই থাকে এবং প্রত্যেক বর্ণের সম্বন্ধেই এই নিয়ম, অন্তরাং ব্রবর্ণের সহিত ব্রানুনাসিক যুক্ত হইলে তাহাও ব্রই থাকা উচিত; কিন্তু অহুস্বরের উচ্চারণ “ঙ”র ভ্রায় করিলে অঁ, ই ইত্যাদির ব্রব্ব থাকে না। অঁ যদি “অঁ”র ভ্রায় উচ্চারিত হয়, তবে তাহার ব্রব্ব থাকে।

৫। “ঙ”র ভ্রায় উচ্চারণ করিলে আমরা যে চলিতকথার অহুস্বারকে চক্ষুবিন্দুর ভ্রায় উচ্চারণ করি, তাহার কোন কারণ দর্শান যায় না।

৬। অহুস্বরের উচ্চারণ যদি চক্ষুবিন্দুর ভ্রায় হয়, এবং বিসর্গের উচ্চারণ (নাহা আমরা ইহার পর আলোচনা করিব) কেবল একটুকু শক্তিপ্রয়োগমাত্র হয়, তবে এই দুই বর্ণের উচ্চারণ এত সামান্য যে, ইহাদিগকে বর্ণমধ্যে পরিগণিত না করিলেও চলে। বোধ করি এইজন্যই পাণিনি প্রভৃতি ইহাদিগকে বর্ণমধ্যে পরিগণিত করেন নাই। ইহারা ব্রবর্ণে যুক্ত হইয়া তাহাদের উচ্চারণের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য

ঘটার মাত্র, এইজন্ত ইহাদিগকে স্বতন্ত্রবর্ণ না বলিয়া উচ্চারণচিহ্নস্বরূপ জ্ঞান করা যাইতে পারে। যদি অনুস্বার-বিসর্গের উচ্চারণ ও এবং হকারের জ্ঞান হইত, তাহা হইলে ইহাদিগকে রীতিমত বর্ণমধ্যে পরিগণিত না করার কোন কারণ ছিল না।

তত্ত্বশাস্ত্রের বীজমূল্যে অনুস্বার-স্থলে চন্দ্রবিন্দু বর্ণিত হইয়াছে। “কপূরং মধ্যমাক্ষ্যং স্বরপরিহিতং সেন্দুবক্ষ্মাক্ষিবৃক্ষম্” শ্লোকে অকাটাভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, অনুস্বারস্থলেই চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার হইয়াছে অর্থাৎ অনুস্বার এবং চন্দ্রবিন্দু এক এবং তাহাদের একই উচ্চারণ। চন্দ্রবিন্দু নামে একটি স্বতন্ত্র বর্ণ কখনও ছিল না এবং নাই। ইহা অনুস্বারেরই নামান্তর-মাত্র; কিন্তু ভ্রমপ্রযুক্ত অনুস্বারকে “ঙ”র জ্ঞান উচ্চারণ করিতে করিতে যখন কোন-স্থলে (ং), কোন স্থলে (ঁ) বিন্দুর জ্ঞান উচ্চারণ করিতে হয়, তখন স্বর্গীয় বিভাসাগর-সম্ভার অনুপায় হইয়া চন্দ্রবিন্দুকে এক স্বতন্ত্রবর্ণরূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহাকে অনুস্বার বলা যায়, তাহার প্রকৃত নাম বিন্দু। উহাকে চন্দ্রবিন্দু, ইন্দু, বিধু এবং অনুস্বার বলে। প্রথম তিনটিই ইহার স্বাভাবিক এবং প্রকৃত নাম; কারণ তাহারা ইহার আকৃতিগত। বিন্দু গোলাকার, চন্দ্রও গোলাকার, আবার চন্দ্রোদয়ে যেমন আকাশ শোভাধারণ করে, স্বরোপরি বিন্দুপ্রয়োগ করিলে স্বরবর্ণও সেইপ্রকার মাধুর্য্য লাভ করে। এইজন্ত ইহার নাম চন্দ্রবিন্দু হইয়াছিল; কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে বৈজ্ঞানিক নাম প্রদান করিয়াছেন; উহা

স্বরবর্ণের অনুগামী, এইজন্ত উহাকে অনুস্বার বা অনুস্বার বলিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে উহারা উভয়েই এক, এবং উহাদের উচ্চারণ চন্দ্রবিন্দুর জ্ঞান।

যে কারণে উহার উচ্চারণবৈকল্য ঘটিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়; যেমন যুক্তাক্ষর ইঅ বলিতে বলিতে তাহার উচ্চারণ প্রায় বর্গীয় “জ”র জ্ঞান হইয়া উঠে, যেমন ওঅ বলিতে বলিতে তাহার উচ্চারণ প্রায় ব-কারের জ্ঞান হইয়া আসে, যেমন অএ বলিতে বলিতে তাহার উচ্চারণ (অই)র জ্ঞান হইয়াছে; আর অও বলিতে বলিতে অউ হইয়া পড়িয়াছে, সেইপ্রকার অ-শব্দের চন্দ্রবিন্দুর জ্ঞান উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার অঙ-শব্দের জ্ঞান উচ্চারণ হইয়া উঠে, সেইজন্যই লোকে অনুস্বারের ঐরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে। কিন্তু যেমন উল্লিখিত ঙ, ব প্রভৃতির উচ্চারণকে তাহাদের শেবপরিণতি ঙ, ব প্রভৃতিতে আসিতে দেওয়া উচিত নয়, সেইরূপ অনুস্বারের উচ্চারণকেও তাহার শেবপরিণতি “ঙ”তে আসিতে দেওয়া অবিহিত।

[বিসর্গ]—ইহাও স্বর ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয় না, স্বর ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং ইহার স্থানও স্বরবর্ণের পরেই হওয়া উচিত এবং তাহাই চিরপ্রথা। ইহার উচ্চারণ যে “হ”র জ্ঞান করি, তাহা ব্যঞ্জন। যদি বিসর্গ আর “হ”র উচ্চারণ এক হইত, তবে কেবল “হ” থাকিলেই হইত, বিসর্গের কোন প্রয়োজন ছিল না। ইহা কেবল অন্ত স্বরবর্ণকে কিঞ্চিৎ অধিক শক্তি প্রদান করে

মাত্র। অহুসার যেমন স্বরবর্ণকে অহুনাসিক উচ্চারণ দিয়া তাহার মাধুর্য্যবিধান করে, বিসর্গও তেমনি স্বরবর্ণে যুক্ত হইয়া তাহাদের সমধিক বল বিধান করে। সংস্কৃতভাষায় যে তেজস্বিতা এবং মাধুর্য্য, তাহা এই অহুসার-বিসর্গের উপরই অধিক নির্ভর করে। মনে হয়, যেন ভাষাতে অধিক বল এবং লালিত্য বিধান করার জন্তই এই উচ্চারণচিক্কষয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা-দিগকে ত্যাগ করিলে সংস্কৃতভাষা এককালে নির্জীব হইয়া পড়ে। সেই শক্তিবৃদ্ধি করিতে বাইরা পণ্ডিতমহাশয়েরা বিসর্গকে এককালে “হ” উচ্চারণ করিয়া বসেন।

আমাদের বঙ্গদেশে বিসর্গের উচ্চারণ হলন্ত “হ”র স্থায় করিয়া থাকে, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ কালী ইত্যাদি স্থানে এককালে সম্পূর্ণ “হ”ই উচ্চারণ করিয়া থাকে। বাঙলাদেশে রামহ=রামহ্, পশ্চিমে রামঃ=রামহ। অধুনা বাঙালীরাও পশ্চিমের অনুকরণ করিয়া রামহ-স্থলে রামহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং মনে করেন যে, ইহাতে উচ্চারণের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। বিসর্গশব্দের দ্ব্যর্থক বিসর্জনীয়। বোধ করি, ইহাকে বর্ণমালা হইতে বর্জন করা যায়, ইহা ভাবিয়াই পাণিনি ইহাকে স্বর বা ব্যঞ্জন কিছুই মথোই ধরেন নাই। কিন্তু যদি ইহার উচ্চারণ হকারের স্থায় স্পষ্ট ব্যঞ্জনবৎ হইত, তাহা হইলে তিনি কখনই ইহাকে বর্জন করিতে পারিতেন না। অতএব বিসর্গের প্রচলিত উচ্চারণ ভ্রমাত্মক। ইহার উচ্চারণ হকারের স্থায় নহে, ইহা কেবল অল্প স্বরবর্ণের শক্তিবৃদ্ধিকারক চিক্কবিশেষমাত্র।

পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, অহুসার ও বিসর্গকে বর্ণমধ্যে পরিগণিত না করিয়া স্বর-বর্ণের উচ্চারণবিশেষের চিক্কমাত্র জ্ঞান করিতে হয়। যেমন, ‘অপিচ’ ‘অধুনা’ বলিতে অকারের মুহু উচ্চারণ হয়, আর অখ, অন্ম বলিতে প্রশস্তোচ্চারণ হয়, তেমনি অ বলিতে অকারের অহুনাসিক উচ্চারণ হয়, এবং অঃ বলিতে অকারের বিশেষশক্তিবৃদ্ধ উচ্চারণ হয়, উক্ত প্রশস্ত ও মুহু উচ্চারণের কোন চিক্ক বলিত হয় নাই, কিন্তু অহুনাসিক এবং শক্তিবৃদ্ধ উচ্চারণের দুইটি চিক্ক ব্যবস্থিত হইয়াছে। তাহা বিন্দু ও বিসর্গ,— একটি এক বিন্দু দ্বারা এবং অন্যটি বিন্দুদ্বয় দ্বারা নিম্পন্ন। ইহাদিগকে উচ্চারণচিক্ক না বলিয়া ব্যাকরণের টীকাকারগণ বর্ণসংজ্ঞা প্রদান করিয়া নানাপ্রকার গোলযোগে পড়িয়াছেন। প্রথম বলিয়াছেন, ইহার স্বরও নহে ব্যঞ্জনও নহে, ইহার অযোগ্যবাহ। আবার বলিয়াছেন, গণ্ডবিধিতে ইহার স্বর, এবং স্বরসন্ধিতে ইহার ব্যঞ্জন; বধা, গণ্ডবিধির সূত্রানুসারে র, ব, ঞ, এই তিনটি বর্ণের পরে যে অনন্ত্য নকার, তাহা সূর্জন্য হয় এবং স্বরবর্ণ, হ, ব, ব, কবর্গ, পবর্গ ব্যবধানেও হয়। এই বিধানানুসারে বৃহৎশব্দের অহুসারকে স্বরবর্ণ না বলিলে তাহার নকার সূর্জন্য হইতে পারে না। উরঃকেণ শব্দেও সেইপ্রকার বিসর্গকে স্বর না বলিলে গকার সূর্জন্য হয় না। অতএব বৃহৎশব্দের অহুসারকে স্বরবর্ণ মানিতে হইল। কিন্তু আবার দেখুন, যদি বৃহৎশব্দের অহুসারকে স্বর বলি, তবে ‘অকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঞস্থানে র হয়’ এই সূত্রানুসারে অংহণ হইয়া পড়ে। অতএব

একটি শব্দের মধ্যেই অল্পস্বারকে একবার স্বর, আরবার ব্যঞ্জন বলিতে হয়,—টাকা-কার-গণ এই দুইটি উচ্চারণচিহ্নকে স্বতন্ত্রবর্ণ জ্ঞান করিয়া সঙ্কটে পড়িয়াছেন। একবার বলেন স্বর, আবার বলেন ব্যঞ্জন, আবার বলেন অযোগবাহ।

বাস্তবিক বৈয়াকরণাণ অল্পস্বার-বিসর্গকে বর্ণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই যদি করিতেন, তবে গণবিধানের সূত্রে “স্বরবর্ণ, হ, ব, ব, কবর্ণ, পবর্ণ ব্যবধানের” স্থলে “স্বরবর্ণ, অযোগ-বাহ, হ, ব, ব, কবর্ণ, পবর্ণ ব্যবধানের” বলিলেই সকল গোলযোগ নিরাকৃত হইত। স্বরসন্ধির সূত্রেও সেইরূপ অযোগবাহের উল্লেখ করিলেই আর কোন গোল থাকিত না। এইরূপ করা অতি সহজসাধ্য হইলেও যখন তাঁহারা তাহা করেন নাই, তখনই

জানিতে হইবে যে, তাঁহারা এই দুইটি উচ্চারণ-চিহ্নকে বর্ণ বলিয়াই ধরেন নাই। বাস্তবিক ইহারা স্বরবর্ণের উচ্চারণবিশেষের চিহ্নমাত্র, ইহারা বর্ণ নহে, এবং তাহা বলিলেই উল্লিখিত সকল গোল নিকাসিত হইয়া যায়। আর ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণ কি, তাহাও লোকে সহজে বুঝিতে পারে।

এই অল্পস্বার-বিসর্গের উচ্চারণদোষে এত ক্ষতি হইয়াছে যে, ইহাতে আমাদের লিখিত অর্থাৎ সংস্কৃতভাষা এবং কথিত অর্থাৎ বাঙলাভাষাকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃতভাষার অর্দ্ধাধিক শব্দ অল্পস্বারবিসর্গযুক্ত; সুতরাং তাহাদের উচ্চারণ যদি দূষিত হয়, তবে উক্ত ভাষার প্রায় সকল শব্দই অগুচ্ছোচ্চারিত হয় এবং কাজেই বাঙলার সহিত তাহার অত্যন্ত অসাদৃশ্য ঘটে।

শ্রীশ্রীনাথ সেন ।

গোয়ালিখন্দ ।

১

দিল্লীর হইয়া শেরশাহ একবারমাত্র বাঙলার আসিয়াছিলেন। মুঘলের তাঁহার উন্নতি-সোপানের প্রথম ধাপ, অতএব জাহ্নবী-স্রোতোবিধৌত দুর্জয়-শৈলপ্রাকার-পরিবেষ্টিত মুগলপুরীকে চিরদিন তিনি ঘেরের চক্ষে দেখিতেন। তাই দিল্লীর তক্তে বসিয়া বিজোহনমনস্ক বাঙলার আসিতে মুঘলের-দুর্গে সপ্তাহখানেক শেষ বাস করিয়াছিলেন।

তখন বৈশাখমাস, দুগয়ার সময়। সুবাদার তাহার আরোহণের ক্রটি করেন নাই। প্রভাতে প্রস্তুত হইয়া বাদশাহ বহিরঙ্গণে আসিলে তাঁহার জন্ত সুসজ্জিত শিকারী হস্তিসমূহ মাহতদের ইজিতে নত-জাহ্নু এবং উর্দুও হইয়া যুগপৎ তাঁহাকে অভিবাদন করিল। অদূরে ঘোটকশ্রেণী এবং উষ্ট্রের দল রাজাধিরাজের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল,—তাঁহার প্রিয় অশ্ব

প্রভুকে করিপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে দেখিয়া
ঈর্ষার হ্রেবাক্ষনি করিয়া উঠিল। শেরশাহ
ইহা লক্ষ্য করিলেন। হাওদার উঠিয়া
উপবেশন না করিয়াই করিরক্ষকের দিকে
হস্তপ্রসারণ করিলেন—“কিলোরান, বালা-
গাম দে!” মাহত তাহার কাজে বুড়া
হইয়াছে, কিন্তু হস্তসম্বন্ধে একরূপ হস্তমুখতা
আর কখন দেখে নাই। ইহা কি সম্ভব,
হুনিয়ার মালিক বোদ্ধ কুলপতি শেরশাহ আর
কখন গজপৃষ্ঠ স্পর্শোভিত করেন নাই?
সাতপাঁচ ভাবিয়া করজোড়ে সে জনাব-
আলীকে জানাইল যে; হাতীর লাগাম হয়
না, তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য আত্মা
আকবর কিলোরানজাতি এবং “আঁকুশ”-
নামক আয়ুধের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই
এতাল শেব করিয়া অপ্রস্তুতভাবে সে অকুশ
উঠাইয়া শাহনশাহের অগ্রসর-দৃষ্টি-সমক্ষে
এরিল। তিনি ক্রকুটি করিয়া বলিয়া উঠিলেন
—“ম্যার্সা বেএক্তিয়ার সওয়ারি মৈ নেহী”
কন্স সক্তা হঁ!” তখন হুকুমে হস্তী আবার
বসিল। বাদশাহ অবতরণের জন্য সোপানের
অপেক্ষা না করিয়া লক্ষ্য দিয়া ভূতলে পীড়াই-
লেন এবং ষোটকারোহণ করিয়া বিছাদবেগে
বাহির হইয়া গেলেন। শিকারীর দল এবং
শরীররক্ষকেরা এই আকস্মিক খেরালের জন্য
প্রস্তুত ছিল না। বধাসম্ভব সত্তর হইলেও
তাহাদের ভিতর একজনও বাদশাহের সঙ্গ
লাইতে পারিল না।

“ম্যার্সা বেএক্তিয়ার সওয়ারি মৈ নেহী
কন্স সক্তা হঁ!” শেরশাহ চকিতে অখণ্ডে
লাফাইয়া উঠিয়া কোথায় অস্তিত্ব হইলেন,
কিন্তু তাঁহার মুখমিস্রিত এই বাকী হুদের-

চূর্ণপ্রাপ্তি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া
তৎক্ষণাৎ বাজারগল্লের বিবরীভূত হইল।
কেহ বলিল, “সত্যই ত, অমন হুঁসিয়ার
না হইলে আজ পাঠান হুনিয়ার মালিক
হইতে পারিত না।” অন্যে কহিল, “দেখিলে
বাদশাহী নজর আর মন্জী, কথার বলে
আসমানজমীন কারুক্ষ!” বাহারী চুপিচুপি
বক্তব্য সংযমিত করিতেছিল, তাহাদের মনের
ভাবধানা কতকটা এইরূপ :—“বাপুরে দেমাক
দেখ! নাসেরামের আরগীরগক্ষ এখনও
তক্ততাউলসর খোসবুরে লোপ করিতে পারে
নাই!” বলা বাহুল্য, বাদশাহের অমুচরবর্গ-
মধ্যেও শিকারের পথে সেদিন এই ভিন-
প্রকারের সমালোচনা চলিয়াছিল।

সেখপুরাপর্বতের সামুদ্রেশবর্তী নিবিড়
বনমধ্যে মৃগয়ার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।
হস্তী অথ এবং উষ্ট্রারোহী অমুচরবর্গ ক্রমে
ক্রমে সেখানে নির্দিষ্ট শিবিরমধ্যে সমবেত
হইলেন। কিন্তু বাদশাহের দেখা নাই।
কেহ তাঁহার কোন-ধবর দিতে পারিতেছিল
না। কেবল মিক্রা জুলেমান পথে লক্ষ্য
করিয়া আসিয়াছেন যে, বাদশাহের ষোটার
ডাক বদল হইয়াছে। সহিস সওয়ার চিনিতে
পারে নাই বুঝিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া-
ছিলেন, শেরশাহ পশ্চিমধ্যে ছদ্মবেশ ধারণ
করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

২

বেহারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পূর্বরাজ্যর যদি
দেখিতে চাঁও, চৈত্র-বৈশাখের প্রভাতে
গওশৈলমালায় প্রত্যন্তদেশে বায়ুসেবনে
বাহির হইও। তথার বিস্তীর্ণ ভালীবন-
ছায়ার, অরুণপুষ্পিত পলাশবৃক্ষমালার

অবকাশপথে এবং পত্রশূন্য কাগজিৎ মব-
কিসলয়খচিত পুষ্পভারানত মহরাগাছের
নীচে শান্তি এবং মাধুর্যের সমাবেশ দেখিতে
পাইবে ।

বাদশাহ এই অল্পপদ সৌন্দর্য উপভোগ
করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু
তখন আর তাহার রাজবেশ ছিল না ।

মিঞা সুলেমান ঠিক খরিয়াজিহলেন ।
ছদ্মবেশে বেড়াইয়া প্রজাসাধারণের অবস্থা
স্বচক্ষে দেখা শেরের অভ্যাস ছিল এবং
সেইজন্য পশ্চিমধ্যে অন্যের অলঙ্কার বেশভূষা-
পরিবর্তনের উপায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে
ধাক্কিত । কলত এইরূপে এদেশের যে
অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করিয়াছিলেন, তদীয়
ভূমিসংক্রান্ত বন্দোবস্ত এবং লোকহিতকর
নানা কার্যের অনুষ্ঠানে তাহার পরিচয়
পাওয়া গিয়াছে ।

অনুচরের এড়াইবার জন্য বাদশাহ
জঙ্গল পার হইয়া অপথে অঞ্চালনা করিতে-
ছিলেন । গ্রাম দেখিলেই গতিবেগ সংযত
করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন এবং “খড়ি-
হানে” উপন্যাস হইয়া লোকের শ্রুতসংগ্রহ
ও তাহার বণ্টন পর্য্যবেক্ষণ করেন । তাহার
তাঁহাকে সামান্য সিপাহী ভাবিয়া মানুষি
সেলামাত্র করিতেছিল । চারগরত গোমহিষ-
রক্ষক, বিশেষ রাখালের দল দেখিলে শেরশাহ
তাহাদের সঙ্গে পরিচয় না করিয়া ছাড়িতে-
ছিলেন না, আর মহরাকুজ দেখিলেই তাহার
অদূরে ধীরে ধীরে বাইতে বাইতে পুষ্পচরন-
রত মহিলাদের স্তম্ভধ্বংসের গল্প শুনিয়া
আমোদিত হইতেছিলেন । এইরূপে তিনি
গুগুয়াহল হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন ।

ক্রমে রৌদ্র কুটিয়া উঠিতেছিল এবং প্রথর
পশ্চিমবায়ু প্রভাতমলয়ের স্থান অধিকৃত
করিতেছিল ।

মধ্যাহ্নে বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব
করিয়া বাদশাহ পাহাড়সন্নিহিত বৃক্ষবাটিকার
দিকে অগ্রসর হইলেন । তিনি তৃষ্ণার্ত
হইয়াছিলেন, অঞ্চটিরও কিঞ্চিৎ পরিচর্যা
আবশ্যক । উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ তাহার উপর
ক্রমশঃ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল । অতএব
বেগে অঞ্চালনা করিয়া তিনি লক্ষ্যস্থলে
উপস্থিত হইলেন । তথায় ছায়াচ্ছন্ন একাণ্ড-
বটবৃক্ষতলে গোমহিষেরা বিশ্রাম করিতে-
ছিল, রাখালেরা তাহার আভিমুখ্যে শাখার-
প্রশাখায় এবং দোহুল্যমান জটাজালে বসিয়া-
বসিয়া ঝুলন-উৎসবে মাতিয়াছিল । সহসা
একজন সিপাহীকে সেভাবে সেখানে আসিতে
দেখিয়া তাহার ভয়চকিত হইয়া উঠিল ।
কিন্তু বাদশাহ অভয় দিয়া একজনকে
ঘোড়া টহলাইতে প্রবৃত্ত করাইলেন ।
আর একজন তাঁহাকে অদূরে ইদারার ধারে
লইয়া চলিল । জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি
জানিলেন যে, সেখপুরা-বস্তিতে ইহাদের
বাস এবং পাহাড় ঘুরিয়া গ্রামে বাইতে হয় ।

ইদারার অনতিদূরে অঞ্চগাছের নিধিড়
ছায়াতলে একটি মধ্যবয়স্ক জীলোক বসিয়া-
বসিয়া রাশীকৃত মহরাকুল শুকাইতেছিল ।
তাহার সমক্ষে, যতদূর দৃষ্টি চলে, মহরাগাছের
সারি প্রবল বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া
কণে কণে পুষ্পপুষ্প করিতেছে এবং সুবতী
ও বালিকারা ডালাহস্তে তাহা চুনিয়া
লইতেছে । রাখালবালক দূর হইতে
জীলোকটিকে “নানী” সম্বোধন করিল এবং

ছুটিয়া-গিয়া পথিকটিকে দেখাইয়া বলিল, সে জলপান করিতে চায়। বাদশাহ তাহার প্রকোষ্ঠে কঁাসার গহনার বাহ্য এবং দেহের প্রায় সর্বত্র উল্কির ছাপের প্রাচুর্য দেখিয়া বুঝিলেন যে, মহিলাটি গোপালনা। পিপাসার্ত পথিক দেখিয়া সে দৌড়িয়া ফুলের কাছে বসাইল এবং পরমমত্রে, যতক্ষণ তাঁহার প্রয়োজন, স্নিগ্ধমুখে জল তুলিয়া দিল। শেরশাহ দেখিলেন, কুপটি বৃহৎ, কিন্তু সংস্কারভাবে জীর্ণ। তাহার তিনদিকে পরিধাকারে গোমহিষাদির জলপানের জন্য চৌবাচ্চার সমাবেশ আছে। গোয়ালিনী পরিষ্কার জলে তাহা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কাক এবং শুকপক্ষীরা মহারাজুলের দিকে গেলে সে তাড়না করিতেছে বটে, কিন্তু ভয়ানক হইয়া চৌবাচ্চার দিকে আসিলে কিছু বলিতেছে না। আগন্তকের সঙ্গে ঘোড়া আছে শুনিয়া সে তাহাকে জলপান করাইবার জন্য রাখালদের ডাকিয়া বলিয়া দিল। তাহার আদেশে অনেকে বুলন-হাতীর লোভ সংবরণ করিয়া ছুটিয়া পাহাড়ের বরণার দিকে গেল এবং দেখিতে দেখিতে জলজ কোমল তৃণরাশি অপরিচিত শ্রান্তক্লান্ত পথিকের অশ্বটির সম্মুখে স্থাপন করিল। বাদশাহ দেখিলেন, মানুষ এবং মুকজীবের সেবাসুস্রাবর এই মলিনবসনা রমণীর সমান বদন। তিনি তাহার স্তম্ভিতে একটি দ্বিধা মাতৃভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইলেন। বাস্তবিক তিনি বিস্মিত হইয়া দেখিতে-ছিলেন যে, তাহার সহজ সরলভাবটুকু বরাবর অটুট রহিল। গ্রাম্য জীলোক আতিথ্যসংস্কারের সময় সিপাহীকেও ভয়

করে না, ইহা পূর্বে তাঁহার জানা ছিল না।

প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া রমণী বধন জানিতে পারিল, পথিক প্রাতঃকাল হইতে রোজে-রোজে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং এপর্যন্ত তাঁর আহারাদি হয় নাই, তখন সে বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে দ্রুতগদে বটতলার গিয়া বহুতে গাঁভী দোহন করিয়া আনিল এবং ডালার রন্ধিত গুড় ও ভিজা ছোলা পলাশপত্রপুটে সাজাইয়া তাহাকে আহার করিতে দিল। বাদশাহ এই অল্পরোধ মাতৃস্নানবৎ পালন করিলেন; তখন সুস্থ হইয়া গোপকন্ডার বিস্তৃত কদলাসনে বসিয়া শীতল বৃক্ষচ্ছায়াতলে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

তিনি দেখিতে লাগিলেন, গোয়ালিনীর শ্রমের তিলেক বিরাম নাই। আতিথ্য-সংস্কার শেষ করিয়া সে মহিবল্লিকে কুপের ধারে উঠাইয়া আনিল এবং জলপান করাইয়া লোটায় জল তুলিয়া তাহাদের প্রত্যেককে সযত্নে স্নান করাইল। এই সকল কাজ শেষ করিতে মধ্যাহ্নের উত্তম প্রথরতা মন্দীভূত হইয়া আসিল।

তখন বাদশাহ মুগরাশিবিরে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। গোয়ালিনীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, “মায়ি, তোমার পরিচর্যায় আমি ভুট্ট হইয়াছি। কি উপকার তোমার করিতে পারি?”

গোপরমণী লজ্জিত হইয়া কহিল, “সামান্য একটু জল তুলে দিইচি বই ত-নয় বাবা! ও ত রোজ আমি করি। ওর জন্য অন্য কথা কেন বলচো?”

শেরশাহ তবু ছাড়েন না। তখন গোপাঙ্গনা তাঁহাকে জানাইল, ঠাকুরের কৃপায় তার কোন অভাব নাই। তিনি তার গৃহ থাক্তে, মহরার, গোমহিষে পূর্ণ রাখিয়া ছেন। কোন উপকারে তাহার প্রয়োজন নাই।

বাদশাহের সহিত গোয়ালিনীর এই কথোপকথনের অবসরে সুবাদার মিঞা মুলেমান স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে কুর্নিশ করিলেন। তখন আর ছদ্মবেশ অসম্ভব জানিয়া শেরশাহ গোপাঙ্গনাটক বলিলেন, “মাসি, আমি তোমার মুন্সুকের বাদশাহ। কি উপকার করিতে পারি বল।”

সুবাদারের দ্বারবেশ ও কুর্নিশ দেখিয়া গোপাঙ্গনার একটু ভয় হইয়াছিল। সে দ্রব্য উত্তেজিত হইল। অপেক্ষাকৃত কম্পিতকণ্ঠে

বলিল, “মীরা, উপকার যদি নিতান্তই করিবে, এই পাহাড় কাটাইয়া আমার বস্তিতে যাইবার যোজা রাস্তা বানাইয়া দেও। ধূর জানোয়ার লুইয়া রোজ ঘুরিয়া যাইতে বড় কষ্ট।”

শেরশাহ মিঞা মুলেমানের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “বেশ, তাহাই হইবে। আচ্ছা মাসি, আমি চুলিলাম। যদি কখন কোন মুফিলে পড়, বাদশাহকে জানাইও।”

রাজাধিরাজ তাঁহার এই প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বিলম্ব করেন নাই। সুখপুরাণামের পূর্বকৃত্যপথ এইরূপে নিশ্চিত হইয়াছিল। লোকে তাহাকে “গোয়ালি-খন্দ” বলিয়া জানে। শেরশাহ তাহাতে নিজের নাম যোগ করিতে দেন নাই।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

ধর্মপদং ।

ধর্মপদং ।—অর্থাৎ ধর্মপদনামক পালি-গ্রন্থের মূল, অম্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। শ্রীচারণচন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

জগতে যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আছে, “ধর্মপদং” তাহার একটি। বৌদ্ধদের মতে এই ধর্মপদগ্রন্থের সমস্ত কথা স্বয়ং বুদ্ধদেবের উক্তি এবং এগুলি তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়াছিল।

এই গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা সমস্তই বুদ্ধের নিজের রচনা কি না, তাহা

নিঃসংশয়ে বলা কঠিন, অন্তত একথা স্বীকার করিতে, হইবে, এই সকল নীতিবাক্য ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব-কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের অল্পরূপ শ্লোক মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই বাংলা অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় দেখাইয়াছেন।

এস্থলে কে কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা লইয়া তর্ক করা নিরর্থক। এই সকল ভাবের ধারা ভারতবর্ষে অনেক-

দিন হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশ এমনি করিয়াই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধ এইগুলিকে চতুর্দিক্ হইতে সহজে আকর্ষণ করিয়া আপনার করিয়া, সুস্বাদু করিয়া, ইহাদিগকে চিরস্থানরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন,—যাহা বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া মানবের ব্যবহার-যোগ্য করিয়া গেছেন। অতএব, ভগবদ্বাক্যে ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন একস্থানে একটি সংহতমূর্তি দান করিয়াছেন, ধর্মপদগ্রন্থেও ভারতবর্ষের চিন্তার একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে। এইজন্যই কি ধর্মপদে, কি গীতার, এমন অনেক কথাই আছে, ভারতের অন্তর্ভুক্ত নানা গ্রন্থে যাহার প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্মগ্রন্থকে যাহারা ধর্মগ্রন্থরূপে ব্যবহার করিবেন, তাহারা যে ফললাভ করিবেন, এখানে তাহার আলোচনা করিতেছি না। এখানে আমরা ইতিহাসের দিক্ হইতে বিষয়টাকে দেখিতেছি—সেইজন্য ধর্মপদ-গ্রন্থটিকে বিশ্বজনীনভাবে না লইয়া আমরা তাহার সহিত ভারতবর্ষের সংশ্রবের কথাটাই বিশেষ করিয়া পাড়িয়াছি। •

সকল মানুষের জীবনচরিত যেমন, তেমনি সকল দেশের ইতিহাস একভাবে হইতেই পারে না, এ কথা আমরা পূর্বে অন্তত কোথাও বলিয়াছি। এইজন্য, যখন আমরা বলি যে, ভারতবর্ষে ইতিহাসের উপকরণ মেলে না, তখন এই কথা বুলিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে যুরোপীয়রাঁদের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ

ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। ভারতবর্ষ এক বা একাধিক নেশন্ কোনো-দিন সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের চাক বাঁধিয়া তুলিতে পারে নাই। সুতরাং এদেশে কে কবে রাজা হইল, কতদিন রাজত্ব করিল, তাহা লিপিবদ্ধভাবে রক্ষা করিতে দেশের মনে কোনো আগ্রহ জন্মে নাই।

ভারতবর্ষের মন যদি রাষ্ট্রগঠনে লিপ্ত থাকিত, তাহা হইলে ইতিহাসের বেশ মোটা মোটা উপকরণ পাওয়া যাইত এবং ঐতিহাসিকের কাজ অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোনো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নাই, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। সে সূত্র সূত্র, কিন্তু তাহার প্রভাব সামান্য নহে;—তাহা স্থূলভাবে গোচর নহে, কিন্তু তাহা আজ পর্যন্ত আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় নাই। সর্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড় বড় বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ির যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বোপেক্ষ সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের ধর্মার্থ ইতিহাস। সেই যোগটি কি লইয়া? পূর্বেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ লইয়া নহে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে, ধর্ম লইয়া।

কিন্তু ধর্ম কি, তাহা লইয়া তর্কের সীমা নাই—এবং ভারতবর্ষে ধর্মের বাহুরূপ যে নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া আসিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই ।

তাহা হইলেও এটা বোঝা উচিত, পরিবর্তন বলিতে বিচ্ছেদ বুঝায় না । শৈশব হইতে যৌবনে পূর্ণ পরিবর্তন বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া ঘটে ন। যুরোপীয় ইতিহাসেও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির বহুতর পরিবর্তন ঘটয়াছে । সেই পরিবর্তনের ভিতর দিয়া পরিণতির চেহারা দেখাইয়া দেওয়াই ইতিহাসবিদের কাজ ।

• যুরোপীয় নেশনগুণ নানা চেষ্টা ও নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া মুখ্যত রাষ্ট্র গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে । ভারতবর্ষের লোক নানা চেষ্টা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ধর্মকে সমাজের মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছে । এই একমাত্র চেষ্টাতেই প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের ঐক্য ।

যুরোপে ধর্মের চেষ্টা আংশিকভাবে কাজ করিয়াছে, রাষ্ট্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীণভাবে কাজ করিয়াছে । ধর্ম সেখানে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হইলেও রাষ্ট্রের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে ; যেখানে দৈবক্রমে তাহা হয় নাই, সেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের চিরস্থায়ী বিরোধ রহিয়া গেছে ।

আমাদের দেশে মৌগলশাসনকালে শিবাজিকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই । শিবাজির ধর্ম-গুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন । অন্তএব, দেখা বাইতেছে, রাষ্ট্র-

চেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল ।

পলিটিক্স এবং নেশন্ কথটা যেমন যুরোপের কথা, ধর্মকথাটাও তেমনি ভারতবর্ষের কথা । পলিটিক্স এবং নেশন্ কথটার অনুবাদ যেমন আমাদের ভাষায় সম্ভবে না, তেমনি ধর্মশব্দের প্রতিশব্দ যুরোপীয়ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য । এইজন্য ধর্মকে ইংরিজি রিলিজি়নরূপে কল্পনা করিয়া আমরা অনেকসময়ে ভুল করিয়া বসি । এইজন্য, ধর্মচেষ্টার ঐক্যই যে ভারতবর্ষের ঐক্য, এ কথা বলিলে তাহা অস্পষ্ট শুনাইবে ।

মাগুয মুখমুখাবে কোন্ ফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কর্ম করে, তাহাই তাহার প্রকৃতির পরিচয় দেয় । লাভ করিব, এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়,—কল্যাণ করিব, এ লক্ষ্য কুরিয়াও টাকা করা যায় । যে ব্যক্তি কল্যাণকে মানে, টাকা করিবার পথে তাহার অনেক অপ্রাসঙ্গিক বাধা আসে, সেগুলিকে সাবধানে কাটাইয়া তবে তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়—যে ব্যক্তি লোভকেই মানে, তাহার পক্ষে ঐ সকল ব্যাধার অস্তিত্ব নাই ।

এখন কথা এই, কল্যাণকে কেন মানিব ? অন্তত ভারতবর্ষ লোভের চেয়ে কল্যাণকে, প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কে কি বুঝিয়া মানিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে ।

যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ একা, তাহার ভালমন্দ কর্ম কিছুই নাই । আত্ম-অনাত্মের যোগে ভালমন্দ সকল কর্মের উদ্ভব । অন্তএব

গোড়ায় এই আত্ম-অনাওয়ার সত্যসম্বন্ধনির্ণয় আবশ্যক। এই সম্বন্ধনির্ণয় এবং জীবনের কাজে এই সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়া চলা, ইহাই চিরদিন ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টার বিষয় ছিল।

ভারতবর্ষে আশ্চর্যের বিষয় এই দেখা যায় যে, এখানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এই সম্বন্ধকে ভিন্নভিন্নরূপে নির্ণয় করিয়াছে, কিন্তু ব্যবহারে একজায়গায় আসিয়া মিলিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র দিক হইতে ভারতবর্ষ একই কথা বলিয়াছে।

এক সম্প্রদায় তুলিয়াছেন, আত্ম-অনাওয়ার মধ্যে কোনো সত্য প্রভেদ নাই। যে প্রভেদ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার মূলে অবিজ্ঞা।

কিন্তু যদি এক ছাড়া ছই না থাকে, তবে ত ভালমন্দের কোনো স্থান থাকে না। কিন্তু এত সহজে নিষ্কৃতি নাই। যে অজ্ঞানে এককে ছই করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে, নতুবা মায়ায় চক্রে পড়িয়া হৃৎকের অন্ত থাকিবে না। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্মের ভালমন্দ স্থির করিতে হইবে।

আর এক সম্প্রদায় বলেন, এই যে সংসার আবর্তিত হইতেছে, আমরা বাসনার দ্বারা ইহার সহিত আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছি ও হৃৎক পাইতেছি—এক কর্মের দ্বারা আর এক কর্ম এবং এইরূপে অন্তহীন কর্মশৃঙ্খল রচনা করিয়া চলিতেছি—এই কর্মশাশ ছেদন করিয়া মুক্ত হওয়াই সাধুদের একমাত্র প্রের।

কিন্তু তবে ত সকল কর্ম বন্ধ করিতে

হয়। তাহা নহে, এত সহজে নিষ্কৃতি নাই। কর্মকে এমন করিয়া নিয়মিত করিতে হয়, যাঁহাতে কর্মের হৃৎকৃত্ত বন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া আসে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন কর্ম শুভ, কোন কর্ম অশুভ, তাহা স্থির করিতে হইবে।

অন্য সম্প্রদায় বলেন, জগৎসংসার ভগবানের লীলা। এই লীলার মূলে তাঁহার প্রেম,—তাঁহার আনন্দ অমুভব করিতে পারিলেই আমাদের সার্থকতা।

এই সার্থকতার উপায়ও পূর্বোক্ত ছই সম্প্রদায়ের উপায় হইতে বস্তুত ভিন্ন নহে। নিজের বাসনাকে ধর্ম করিতে না পারিলে ভগবানের ইচ্ছাকে অমুভব করিয়া না। ভগবানের ইচ্ছার মধ্যেই নিজের ইচ্ছাকে মুক্তিদানই মুক্তি। সেই মুক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কর্মের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে।

যাঁহারা অবৈতানন্দকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাও বাসনামোহকে ছেদন করিতে উত্তম; যাঁহারা কর্মের অনন্তশৃঙ্খল হইতে মুক্তিপ্রার্থী, তাঁহারাও বাসনাকে উৎপাটিত করিতে চান; ভগবানের প্রেমে যাঁহারা নিজেকে সম্মিলিত করাই প্রের জ্ঞান করেন, তাঁহারাও বিষয়বাসনাকে তুচ্ছ করিবার কথা বলিয়াছেন।

যদি এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপদেশগুলি কেবল আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইত, তাহা হইলে আমাদের পরম্পরের মধ্যে পার্থক্যের সীমা থাকিত না। কিন্তু এই ভিন্ন সম্প্রদায়গণ তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে

তব্ব যতই স্তম্ভ বা যতই স্থল হউক, সে তব্বকে কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে যতদূর পর্য্যন্তই যাওয়া থাকে, আমাদের গুরুগণ নির্ভীকচিত্তে সমস্ত স্বীকার করিয়া সেই তব্বকে কর্মের দ্বারা সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ কোনো বড় কথাকে অসাধ্য বা সংসারবাজার সহিত অসঙ্গত বোধে কোনোদিন ভীতবাক্যে কথার কথা করিয়া রাখেন নাই। এইজন্য একসময়ে যে ভারতবর্ষ মাংসাশী ছিল, সেই ভারতবর্ষ আজ প্রায় সর্বত্রই নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছে। জগতে এক্ষণে দৃষ্টান্ত অল্প কোথাও পাওয়া যায় না। যে যুরোপ জাতিগত সমুদয় পরিবর্তনের মূলে সুবিধাকেই লক্ষ্য করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, কৃষির ব্যাপ্তিসহকারে ভারতবর্ষে আর্থিক কারণে, গোমাংসভক্ষণ রহিত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধানসম্বন্ধেও অল্প সকল মাংসাহারও, এমন কি, মৎস্য-ভোজনও ভারতবর্ষের অনেকস্থান হইতেই লোপ পাইয়াছে। কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না, এই উপদেশ জৈনদের মধ্যে এমন করিয়া পালিত হইতেছে যে, তাহা সুবিধার তরফ হইতে দেখিলে নিতান্ত বাড়াবাড়ি না মনে করিয়া থাকিবার জো নাই।

যাহাই হউক, তব্বজ্ঞান যতদূর পৌঁছিয়াছে, ভারতবর্ষ কর্মকেও ততদূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গেছে। ভারতবর্ষ তব্বের সহিত কর্মের ভেদ সাধন করে নাই। এইজন্য আমাদের দেশে কর্মই ধর্ম। আমরা বলি, মাতৃবের কর্মমাজেরই চরমলক্ষ্য কর্ম

হইতে মুক্তি—এবং মুক্তির উদ্দেশ্যে কর্ম করাই ধর্ম।

পূর্বেই বলিয়াছি, তব্বের মধ্যে আমাদের যতই পার্থক্য থাকে, কর্মে আমাদের ঐক্য আছে। অধৈর্যভূতির মধ্যেই মুক্তি বল, আর গতসংস্কার নির্বাণবাসনার মধ্যেই মুক্তি বল, আর ভগবানের অপরিমেয় প্রেমানন্দের মধ্যেই মুক্তি বল—প্রকৃতিভেদে যে মুক্তির আদর্শই যাহাকে আদর্শ কুরুক না কেন, সেই মুক্তিপথে যাইবার উপায়-গুলির মধ্যে একটি ঐক্য আছে। সে ঐক্য আর কিছু নয়, সমস্ত কর্মকেই নিবৃত্তির অভিমুখ করা। সোপান যেমন সোপানকে অতিক্রম করিবার উপায়, ভারতবর্ষে কর্ম তেমনি কর্মকে অতিক্রম করিবার উপায়। আমাদের সমস্ত শাস্ত্র-পুরাণে এই উপদেশই দিয়াছে এবং আমাদের সমাজ এই ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

যুরোপ কর্মকে কর্ম হইতে মুক্তির সোপান করে নাই, কর্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে। এইজন্য যুরোপে কর্মসংগ্রামের অন্ত নাই—সেখানে কর্ম জরমশই বিচিৎ ও বিপুল হইয়া উঠিতেছে, কৃতকার্য হওয়া সেখানে সকলেরই উদ্দেশ্য। যুরোপের ইতিহাস কর্মেরই ইতিহাস।

যুরোপ কর্মকে বড় করিয়া দেখিয়াছে বলিয়া কর্মকরাসম্বন্ধে স্বাধীনতা চাহিয়াছে। আমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিব—সেই স্বাধীন ইচ্ছা যেখানে অজ্ঞের কর্ম করিবার স্বাধীনতাকে হনন করে, কেবল সেইখানেই আইনের প্রয়োজন। এই আইনের শাসন ব্যতিরেকে সমাজের প্রত্যেকের স্বাধীনতাব

স্বাধীনতা থাকিতেই পারে না। এইজন্য যুরোপীয়সমাজে সমস্ত শাসন ও শাসনের অভাব প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছাকে স্বাধীন করিবার জন্যই কল্পিত।

ভারতবর্ষও স্বাধীনতা চাহিয়াছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা একেবারে কৰ্ম হইতে স্বাধীনতা। আমরা জানি, আমরা যাহাকে সংসার বলি, সেখানে কৰ্মই বস্তুত কর্তা, মানুষ তাহার বাহনমাত্র। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এক বাসনার পরে আর এক বাসনাকে, এক কৰ্ম হইতে আর এক কৰ্মকে বহন করিয়া চলি—হাঁক ছাড়িবার সময় পাই না—তাহার পরে সেই কৰ্মের তার অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া ইঠাৎ মৃত্যুর মধ্যে সরিয়া পড়ি। এই যে বাসনার তাড়নায় চিরজীবন অন্তবিহীন কৰ্ম করিয়া যাওয়া, ইহারই অবিরাম দাসত্ব ভারতবর্ষ উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে।

এই লোকের পার্থক্য থাকিতেই যুরোপ বাসনাকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিয়াছে এবং আমরা বাসনাকে যথাসম্ভব ধর্ম করিয়াছি। বাসনা যে কোনোদিনই শাস্তিতে লইয়া যায় না,—পরিণামহীন কৰ্মচেষ্টাকে জাগ্রত করিয়া রাখে, ইহাকেই আমরা বাসনার দোরায়া বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠি—যুরোপ বলে, বাসনা যে কোনো পরিণামে লইয়া যায় না, তাহা নিয়তই যে আমাদের প্রায়সকলে উদ্ভিক্ত করিয়া রাখে, ইহাই তাহার গৌরব। যুরোপ বলে—প্রাপ্তি নহে, সন্ধানই আনন্দ। ভারতবর্ষ বলে—তোমরা যাহাকে প্রাপ্তি বল, তাহাতে আনন্দ নাই বটে; কারণ, সে প্রাপ্তির মধ্যে আমাদের সন্ধানের শেষ নাই।

সে প্রাপ্তি আমাদের অগ্ৰে-অন্য প্রাপ্তির দিকে টানিয়া লইয়া যায়। প্রত্যেক প্রাপ্তিকেই পরিণাম বলিয়া ভ্রম করি এবং তাহার পরে দেখিতে পাই, তাহা পরিণাম নহে। যে প্রাপ্তিতে আমাদের শাস্তি, আমাদের সন্ধানের শেষ, এই ভ্রমে তাহা হইতে আমাদের অগ্ৰে দ্রষ্ট করে, আমাদের অগ্ৰে কোনোমতেই মুক্তি দেয় না। যে বাসনা সেই মুক্তির বিরোধী, সেই বাসনাকে আমরা হীনবল করিয়া দিব। আমরা কৰ্মকে জয়ী করিব না, কৰ্মের উপরে জয়ী হইব।

আমাদের গৃহধর্ম, আমাদের সন্ন্যাসধর্ম, আমাদের আহারবিহারের সমস্ত নিয়ম-সংযম, আমাদেবরাগী ভিক্ষুকের গান হইতে তত্ত্বজ্ঞানীদের শাস্ত্রব্যাখ্যা পর্যন্ত সর্বত্রই এই ভাবের আধিপত্য। চাষা হইতে পণ্ডিত পর্যন্ত সকলেই বলিতেছে—আমরা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি বুদ্ধিপূর্বক মুক্তির পথ গ্রহণ করিবার জন্য, সংসারের অন্তহীন আবর্তের আকর্ষণ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবার জন্য।

সংস্কৃতভাষার ভবশব্দের ধাতুগত অর্থ হওয়া। ভবের বন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন আমরা কাটিতে চাই। যুরোপ খুব করিয়া হইতে চায়—আমরা একেবারেই না হইতে চাই।

এমনতর ভরসার স্বাধীনতার চেষ্টা ভাল কি মন্দ, তাহার মীমাংসা করা বড় কঠিন। এরূপ নিশ্চিন্ততা যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, আসক্ত লোকের সংঘাতে তাহাদের বিপদ ঘটতে পারে, এমন কি, তাহাদের মারা বাঁধবার কথা। অপরদিকে বলিবার কথা এই যে,

মরা বাঁচাই সার্থকতার চরমপরীক্ষা নয়। ফ্রান্স তাহার ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবে স্বাধীনতার বিশেষ একটি আদর্শকে জন্মী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই চেষ্টায় প্রায় তাহার আত্ম-হত্যার জো হইয়াছিল—বদিই সে মরিত, তবু কি তাহার গৌরব কম হইত? একজন মজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় একটা লোক প্রাণ দিল—আর একজন তীরে দাঁড়াইয়া থাকিল—তাই বলিয়া কি উদ্ধার-চেষ্টাকে মৃত্যুপরিণামের দ্বারা বিচার করিয়া দিকার দিতে হইবে? পৃথিবীতে আজ সকল দেশই বাসনার অগ্নিকে প্রবল ও কঠোর দোঁরাঙ্কাকে উৎকট করিয়া ভুলিতেছে; আজ ভারতবর্ষ যদি—জড়ভাবে নহে, মৃতভাবে নহে—জাগ্রত সচেতনভাবে বাসনাবন্ধমুক্তির আদর্শকে, শাস্তির জয়পতাকাকে এই পৃথিবী-ব্যাপী রক্তাক্ত বিক্ষোভের উর্দ্ধে অবিচলিত দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া মরিতে পারিত, তবে আজ সকলে তাহাকে বতই দিকার দিক্, মৃত্যু তাহাকে অপমানিত করিত না।

কিন্তু এ তর্ক এখানে বিস্তার করিবার স্থান নহে। মোট কথা এই, যুরোপের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের ঐক্য হইতেই পারে না, এ কথা আমরা বারংবার ভুলিয়া যাই। যে ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত-ভবিষ্যৎ বিধৃত, তাহাকে যথার্থভাবে অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের শাস্ত্র, পুত্রাণ, কাব্য, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়—রাজবংশাবলীর 'জন্ত বৃথা, আক্ষেপ করিয়া বেড়াইলে বিশেষ লাভ নাই। যুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারত-বর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, এ কথা

আমাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হইবে।

এই ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন-অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র যুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ। দেশের প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসাই কেবল গয়র্মেন্টের দ্বারে ভিক্ষা-কাণ্ডের মধ্যেই আবদ্ধ—আর কোনো দিকেই তাহার কোনো গতি নাই? সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ত্রুতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না? এই বৌদ্ধ-শাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কাণা হইয়া আছে, এ কথা মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণ-যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না?

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় ধম্মপদংগ্রন্থের অনুবাদ করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশা করি, তিনি এইখানেই ক্ষান্ত হইবেন না। একে একে বৌদ্ধশাস্ত্রসকলের অনুবাদ বাহির করিয়া বঙ্গসাহিত্যের কলঙ্কমোচন করিবেন।

চারুবাবুর প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ এই যে, অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথায়-কথায় মিলাইয়া করিলেই ভাল হয়—যেখানে দুর্বোধ হইয়া পড়িবে,

মেনানে টীকার সাহায্যে বুঝাইয়া দিলে কোনো ক্ষতি হইবে না। অল্পবাদ যদি স্থানে স্থানে ব্যাখ্যার আকার ধারণ করে, তবে অজ্ঞান হয়—কারণ, ব্যাখ্যার অল্পবাদকের ভ্রম থাকিতেও পারে—এইজন্য অল্পবাদ ও ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে পাঠককে বিচার করিবার অবকাশ দেওয়া হয়। মূলের যে সকল ভ্রমের অর্থ সম্পূর্ণ নহে, অল্পবাদে তাহা যথাযথ রাখিয়া দেওয়াই কর্তব্য মনে করি। গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটিই তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। মূলে আছে—

মনোপূর্ণতয়া ধন্বা মনোসেষ্ঠা মনোময়া—

চাক্ৰবাবু ইহার অল্পবাদে লিখিয়াছেন :—“মনই ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মনই ধর্ম সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ধর্ম মন হইতে উৎপন্ন হয়।” যদি মূলের কথাগুলিই রাখিয়া লিখিতেন—“ধর্মসমূহ মনঃপূর্বগম, মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়”, তবে মূলের “অস্পষ্টতা” লইয়া পাঠকগণ অর্থ চিন্তা করিতেন। “মনই ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ” বলিলে ভাল অর্থগ্রহ হয় না, সুতরাং এরূপ স্থলে মূল কথাটা অবিকৃত রাখা উচিত।

অকোহি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে ।

যে ভং ন উপবহন্তি বেরং তেঙ্গপসমত্তি ॥

ইহার অল্পবাদে আছে :—“আমাকে

ভিন্নকার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এইরূপ চিন্তা বাহারা মনে স্থান দেয় না, তাহাদের বৈরভাব দূর হইয়া যায়।”

“এইরূপ চিন্তা বাহারা মনে স্থান দেয় না” বাক্যটি ব্যাখ্যা, প্রকৃত অল্পবাদ নহে—বোধ হয় “যে ইহাতে লাগিয়া থাকে না” বলিলে মূলের অমুগত হইত। অর্থ-সুগমতার অল্পরোধে অতিরিক্ত কথাগুলি ত্র্যাকেটের মধ্যে দিলে ক্ষতি হয় না—যথা, “আমাকে গালি দিল, আমাকে মারিল, আমাকে জিতিল, আমার (ধন) হরণ করিল, ইহা বাহারা (মনে) রাখিয়া না রাখে, তাহাদের বৈর শান্ত হয়।”

এই গ্রন্থে মূলের অর্থ, সংস্কৃত ভাষান্তর ও বাংলা অল্পবাদ-ধাকাতের ইহা পাঠকদের ও ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিলে পালিভাষা-অধ্যয়নের বিশেষ সাহায্য হইতে পারিবে।

এইখানে বলা আবশ্যিক, সম্প্রতি ত্রিবেণী কপিলাশ্রম হইতে শ্রীমৎ হরিহরানন্দ স্বামী কর্তৃক ধর্মপদং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অল্পবাদিত হইয়াছে। আশা করি, এই গ্রন্থখানিও এই ধর্মশাস্ত্রপ্রচারের সাহায্য করিবে।

বঙ্গদর্শন ।

নৌকাডুবি ।

৬৭

পরদিন সকালেই কমলা খুড়ামশায়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। যখন নির্জনে একটু অবকাশ পাইল, অমনি সে শৈলজাকে জড়াইয়া ধরিল—শৈল কমলের চিবুক ধরিয়া কহিল, “কি বোন, এত খুসি কিসের?”

কমলা কহিল, “আমি জানি না দিদি, কিন্তু আমার মনে হইতেছে, যেন আমার জীবনের সমস্ত ভার চলিয়া গেছে।”

শৈল। বল না, সব কথা বল না আমাকে! এই ত কাল সন্ধ্যাপর্যন্ত আমরা ছিলাম, তার পরে তোর হইল কি?

কমলা। এমন কিছুই হয় নাই, কিন্তু আমার কৈবলি মনে হইতেছে, আমি যেন তাঁহাকে পাইয়াছি—ঠাকুর যেন আমার ‘পরে সদয় হইরাছেন।

শৈল। ডাই হোক বোন, কিন্তু আমার কাছে কিছু লুকুনে!

কমলা। আমার লুকাইবার কিছুই নাই দিদি, কি যে বলিবার আছে, তাও খুজিয়া পাই না। রাত পোহাইতেই সকালে উঠিয়া বনে হইল আমার জীবনটা সার্থক—আমার

সমস্ত দিনটা এমন মিষ্ট, আমার সমস্ত কাজ এমন হালকা-হইয়া গেছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি ইচ্ছার চেয়ে আর বেশি কিছুই চাই না—কেবল ভয় হয় পাছে এটুকু নষ্ট হয়—আমি যে প্রতিদিন এমন করিয়া দিন কাটাইতে পারিব, আমার ভাগ্য যে এত প্রসন্ন হইবে, তাহা আমি মনে করিতেই পারি না।

শৈল। আমি তোকে বলিতেছি বোন, তোমার ভাগ্য তোকে এইটুকু দিয়াই ফাঁকি দিবে না—তোমার যাহা পাওনা আছে, তার সঙ্গীতই শোধ হইবে।

কমলা। না না দিদি, ও কথা বলিয়া না—আমার সমস্ত শোধ হইয়াছে—আমি বিধাতাকে কোনো দোষ দিই না—আমার কোনো অভাব নাই।

এমনসময় খুড়া আসিয়া কহিলেন—
“মা, তোমাকে ত একবার বাহিরে আসিতে হইতেছে—রমেশবাবু আসিয়াছেন।”

খুড়া এতক্ষণ রমেশের সঙ্গেই কথা কহিতেছিলেন। রমেশকে বলিতেছিলেন,
“আপনার সঙ্গে কমলার কি সম্বন্ধ, তাহা আমি সমস্তই জানিয়াছি। এখন আপনার

স্বাভি আমার পরামর্শ এই বে—আপনার জীবন এখন পরিষ্কার হইয়া গেছে, এখন আপনি কমলার সমস্ত প্রসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করুন। কমলাসম্বন্ধে যদি কোনো গ্রহি কোথাও মোচন করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে বিধাতার উপর সে তার দিন, আপনি আর হাত দিবেন না।”

রমেশ ইহার উত্তরে কহিতেছিলেন—
“কমলাসম্বন্ধে সকল কথা নিঃশেষে পরিত্যাগ করিবার পূর্বে নলিনাক্ষের কাছে সকল ঘটনা না জানাইয়া আমার নিষ্কৃতি হইতেই পারে না। এ পৃথিবীতে কমলার কথা তুলিবার সমস্ত প্রয়োজন হয় ত শেষ হইয়া গেছে, হয় ত শেষ হয় নাই—যদি না হইয়া থাকে, তবে আমার যেটুকু বক্তব্য, সেটুকু সারিয়া ছুটি পাইতে চাই।”

খুড়া কহিলেন, “আচ্ছা, আপনি একটু-খানি বহুন, আমি আশিত্তিছি।”

রমেশ ঘুরিয়া বসিয়া জানলা হইতে শূন্যদৃষ্টিতে লোকপ্রবাহের দিকে চাহিয়া রহিলেন—কিছুক্ষণ পরেই পারের শব্দ সতর্ক হইয়া দেখিলেন, একটি রমণী ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বখন সে প্রণাম করিয়া উঠিল, তখন রমেশ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না—তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—“কমলা!” কমলা শুক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খুড়া কহিলেন, “রমেশবাবু, কমলার সমুদয় হৃৎকম্পে সোভাগ্যে পরিণত করিয়া, তাঁহার তাহার চারিদিক হইতে সমস্ত কুরাশা কাটিয়া দিতেছেন। আপনি তাহাকে পরম সঙ্কটের সময় যেমন করিয়া রক্ষা করিয়াছেন,

তাহার জন্য বে বিধুম হৃৎকম্পে আপনাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহাতে আপনার সঙ্গে সঙ্কটহেদনের সময় কোনো কথা না বলিয়া কমলা বিদায় লইতে পারে না। আপনার কাছে ও আজ আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছে।”

রমেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সবলে রুদ্ধকণ্ঠে পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল—“তুমি মুখী হও কমলা—আমি না জানিয়া এবং জানিয়া তোমার কাছে বা-কিছু অপরাধ করিয়াছি, সব মাপ করিবে।”

কমলা ইহার উত্তরে কিছুই বলিতে পারিল না—দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রমেশ কিছুক্ষণ পরে কহিল, “যদি কাহারোও কিছু বলিবার জন্ত, কোনো বাধা দূর করিবার জন্ত, আমাকে তোমার প্রয়োজন থাকে ত বল।”

কমলা জোড়হাত করিয়া কহিল, “আমার কথা কাহারো কাছে বলিবেন না, আমার এই মিনতি রাখিবেন।”

রমেশ কহিল—“অনেকদিন তোমার কথা কাহারো কাছে বলি নাই—খুব গোলমাগে পড়িলেও চুপ করিয়া কাটাইয়াছি। অল্পদিন হইল বখন বনে করিয়াছিলাম, তোমার কথা বলিলে তোমার কোনো ক্ষতি হইবে না, তখন কেবল একটি পরিবারের কাছে তোমার কথা প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতেও বোধ হয় তোমার অনিষ্ট না হইয়া ভালই হইতে পারে। খুড়ামশায়ের বোধ হয় খবর পাইয়া থাকিবেন—অন্নদাবাবু, বাহার ঘরের সঙ্গে—”

খুড়া কহিলেন—“হেমনলিনী! আপনি বৈ কি! তাঁহারা সব শুনিয়াছেন?”

রমেশ কহিলেন—“হুঁ । তাঁহাদের কাছে আর কিছু বলা যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আমি বাইতে পারি—কিন্তু আমার আর ইচ্ছা নাই—আমার অনেক সময় গেছে এবং আরো আমার অনেক গেছে, এখন আমি মুক্তি চাই—হাতনাগাদ সমস্ত দেনাপাওনা শোধ করিয়া দিয়া এখন বাহির হইতে পারিলে বাঁচি ।”

খুড়া রমেশের হাত ধরিয়া সম্মেলকণ্ঠে কহিলেন, “না রমেশবাবু, আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না । আপনাকে অনেক বহন করিতে হইয়াছে, এখন ভারমুক্ত হইয়া নিঃস্বপ্নে স্বাধীনভাবে চালনা করুন, স্বাধীন হউন, সার্থক হউন, এই আমার আশীর্বাদ ।”

বাইবার সময় রমেশ কমলার দিকে চাহিয়া কহিল, “আমি তবে চলিলাম ।”

কমলা কোনো কথা না কহিয়া আর একবার ভূতলে মাথা ঠেকাইয়া রমেশকে প্রণাম করিল ।

রমেশ পথে বাহির হইয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, “কমলার সঙ্গে দেখা হইল, ভালই হইল, দেখা না হইলে, এ পালাটা ভাল করিয়া শেষ হইত না । যদিও ঠিক জানিলাম না, কমলা কি জানিয়া কি বুঝিয়া সে রাজে হঠাৎ গাজিপুরের বাংলা ছাড়িয়া চলিয়া আসিল, কিন্তু ইহা বুঝা গেছে, আমি এখন সম্পূর্ণই অনাবশ্যক । এখন আমার অবশ্যক কেবল নিজের জীবনটুকু লইয়া,—এখন তাহাকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে বাহির হইলাম—আমার আর পিছনে

কিরিয়া তাকাইবার কোনো প্রয়োজন নাই ।”

কমলা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—অন্নদাবাবু ও হেমনলিনী ক্ষেমকরীর কাছে বসিয়া আছে । কমলাকে দেখিয়া ক্ষেমকরী কহিলেন, “এই যে হরিদাসী, তোমার বন্ধুকে তোমার ঘরে লইয়া যাও বাছা ! আমি অন্নদাবাবুকে চা খাওয়াইতেছি ।”

কমলার ঘরে প্রবেশ করিয়াই হেমনলিনী কমলার গলা ধরিয়া কহিল—“কমলা !”

কমলা খুব বেশি বিস্মিত না হইয়া কহিল, “তুমি কেমন করিয়া জানিলে, আমার নাম কমলা ?”

হেমনলিনী কহিল, “একজনের কাছে আমি তোমার জীবনের ঘটনা সব শুনিরাছি ; যেমনি শুনিলাম, অমনি তখন আমার মনে সন্দেহ রহিল না, তুমিই কমলা । কেন কে তা বলিতে পারি না ।”

কমলা কহিল, “ভাই, আমার নাম যে ঠিক জানে, সে আমার ইচ্ছা নয়, আমার নিজের নামে একেবারে দিকার জন্মিয়া গেছে ।”

হেমনলিনী কহিল, “কিন্তু ঐ নামের জোরেই ত তোমাকে তোমার অধিকার পাইতে হইবে ।”

কমলা মাথা নাড়িয়া কহিল—“ও আমি বুঝি না । আমার জোর কিছুই নাই, আমার অধিকার কিছুই নাই, আমি জোর খাটাইতেই চাই না ।”

হেমনলিনী কহিল, “কিন্তু তোমার স্বামীকে তোমার পরিচয় হইতে বঞ্চিত

করিবে কি বলিয়া? তোমার ভালমন্দ সবই কি তাঁহার কাছে নিবেদন করিবে না? তাঁর কাছে কি কিছু লুকানো চলিবে?”

হঠাৎ কমলার মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল—সে কোনো উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া নিরুপায়ভাবে হেমনলিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আন্তে আন্তে কমলা মেজের মাছরের ‘পরে বসিয়া পড়িল,—কহিল, “ভগবান্ ত জানেন আমি কোনো অপরাধ করি নাই, তবে তিনি কেন আমাকে এমন করিয়া লজ্জায় ফেলিবেন? যে পাপ আমার নর, তার শাস্তি আমাকে কেন দিবেন? আমি কেমন করিয়া তাঁর কাছে আমার সব কথা প্রকাশ করিব?”

হেমনলিনী কমলার হাত ধরিয়া কহিল, “শাস্তি নর ভাই, তোমার মুক্তি হইবে। বতদিন তুমি তোমার স্বামীর কাছে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতেছ, ততদিন তুমি আপনাকে একটা মিথ্যার বন্ধনে জড়িত করিতেছ—তাহা তেজের সহিত ছিঁড়িয়া ফেল, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেনই।”

কমলা কহিল—“আবার পাছে সব হারাই, এই ভয় যখন মনে আসে, তখন সব বল চলিয়া যায়। কিন্তু তুমি বা বলিতেছ, আমি তা বুঝিয়াছি—অদৃষ্টে বা থাকে তা হোক, কিন্তু তাঁর কাছে আপনাকে লুকানো আর চলিবে না—তিনি আমার সবই জানিবেন।”—এই বলিতে বলিতে সে আপনার দুই হাত দৃঢ়বলে বদ্ধ করিল।

হেমনলিনী সঙ্করুণচিত্তে কহিল, “তুমি কি চাও,—আর কেহ তোমার কথা তাঁহাকে জানার?”

কমলা সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, “না না, আর কাহারো মুখ হইতে তিনি জানিবেন না—আমার কথা আমিই তাঁহাকে বলিব—আমি বলিতে পারিব।”

হেমনলিনী কহিল—“সুই কথাই ভাল। তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে কি না, জানি না। আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, তাহা তোমাদের বলিতে আসিয়াছি।”

কমলা জিজ্ঞাসা করিল—“কোথার যাইবে?”

হেমনলিনী কহিল—“কলিকাতার। তোমাদের সকলে কাজকর্ম আছে—আমরা আর দেরি করিব না। আমি তবে আসি ভাই। বোনকে মনে রাখিও।”

কমলা তাহার হাত ধরিয়া কহিল—“আমাকে চিঠি লিখিবে না?”

হেমনলিনী কহিল—“আজ্ঞা, লিখিব।”

কমলা কহিল—“কখন কি করিতে হইবে, আমাকে তুমি উপদেশ দিয়া লিখিও; আমি জানি, তোমার চিঠি পাইলে আমি বল পাইব।”

হেমনলিনী একটু হাসিয়া কহিল—“আমার চেয়ে ভাল উপদেশ দিবার লোক তুমি পাইবে, সেজন্তে কিছুই ভাবিও না।”

আজ হেমনলিনীর জন্ম কমলা মনের মধ্যে বড়ই একটা বেদনা অল্পতর করিতে লাগিল। হেমনলিনীর প্রশান্ত মুখে কি একটা ভাব ছিল; বাহা দেখিয়া কমলার চোখে যেন জল ভরিয়া আসিতে চাহিতেছিল। কিন্তু হেমনলিনীর কেমন একটা দুরত্ব আছে—তাঁহাকে কোনো কথা বলা বেশ চলে না,

তাহাকে প্রায় জিজ্ঞাসা করিতে যেন বাধে। আজ কমলার সকল কথাই হেমনলিনীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সে আপনার সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া চলিয়া গেল, কেবল একটা-কি রাখিয়া গেল, বাহা রিলীম্যান গোথুলির মত অপরিমেয় বিবাদের বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ।

গৃহকর্মের অবকাশকালে আজ সমস্ত দিন কেবলি হেমনলিনীর কথাগুলি এবং তাহার শাস্ত-সকরণ চোখের দৃষ্টি কমলার মনকে আঘাত দিতে লাগিল। কমলা হেমনলিনীর জীবনের আর কোনো ঘটনা জানিত না—কেবল জানিত, নলিনাক্ষের সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া ভাঙিয়া গেছে। হেমনলিনী তাহাদের বাগান হইতে আজ একসাজি ফুল আনিয়া দিয়াছিল। বৈকালে গা ধুইয়া আসিয়া কমলা সেই ফুলগুলি লইয়া মালা গাঁথিতে বসিল। মাঝে একবার ক্ষেমকরী আসিয়া তাহার পাশে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—“আহা মা, আজ হেম বধন আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, আমার মনের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল, বলিতে পারি না। যে বাই বলুক, হেম মেরেটি বড় ভাল। আমার এখন কেবলি মনে হইতেছে, উহাকে যদি আমাদের বউ করিতাম ত বড় সুখের হইত। আর একটু হইলেই ত হইয়া যাইত—কিন্তু আমার ছেলেটিকে ত পারিবার কো নাই—ও যে কি ভাবিয়া থাকিয়া বসিল, তা সে ঐ জানে।”

শেষকালে তিনিও যে এই বিবাহের প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে কথা

ক্ষেমকরী আর মনের মধ্যে আমল দিতে চান না।

বাহিরে, পারের শব্দ শুনিয়া ক্ষেমকরী ডাকিলেন—“ও নলিন, শুনে যা।”

কমলা তাড়াতাড়ি আঁচলের মধ্যে ফুল ও মালা ঢাকিয়া-ফেলিয়া মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল। নলিনাক্ষ ঘরে প্রবেশ করিলে ক্ষেমকরী কহিলেন, “হেমরা যে আজ চলিয়া গেল—তোর সঙ্গে কি দেখা হয় নাই?”

নলিন কহিল, “হাঁ, আমি যে তাঁহাদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিলাম।”

ক্ষেমকরী কহিলেন—“বাই বলিস্ বাপু, হেমের মত মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না।”

যেন নলিনাক্ষ এসম্বন্ধে বরাবর তাহার প্রতিবাদ করিয়াই আসিয়াছে। নলিনাক্ষ চুপ করিয়া একটুখানি হাসিল।

ক্ষেমকরী কহিলেন—“হাসলি যে বড়! আমি তোমার সঙ্গে হেমের সম্বন্ধ করিলাম, আশীর্বাদ পর্যন্ত করিয়া আসিলাম, আর তুমি যে জেদ করিয়া সব ভুল করিয়া দিলি, এখন তোমার মনে কি একটু অনুতাপ হইতেছে না?”

নলিনাক্ষ একবার চকিতের মত কমলার মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল, দেখিল, কমলা উৎসুকনেত্রে তার দিকে তাকাইয়া আছে। চারিচক্ষু হইবামাত্র কমলা লজ্জায় মাটি হইয়া চোঁথ নীচু করিল।

নলিনাক্ষ কহিল—“মা, তোমার ছেলে কি এমনি সংপাতি যে, তুমি সম্বন্ধ করিলেই হইল? আমার মত নীরস গভীর লোককে সহজে কি কারো পছন্দ হইতে পারে?”

এই কথায় কমলার চোখ আপনি আবার উপরে উঠিল—উঠিবামাত্র দেখিল, নলিনাক্ষের হাত্তোজ্ঞল দৃষ্টি তাহার উপরেই পড়িয়াছে,—এবার কমলার মনে হইতে লাগিল, বর হইতে ছুটিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচি!

ক্লেমকরী কহিলেন, “বা যা, আর বকিম্বনে, তোর কথা শুনিলে আমার রাগ ধরে।”

এই সভা ভঙ্গ হইয়া গেলে পর কমলা হেমনলিনীর সব-ক’টি ফুল লইয়া একটি বড় মালা গাঁথিল। ফুলের সাজির উপরে সেই মালাটি লইয়া জলের ছিটা দিয়া সেটি নলিনাক্ষের উপাসনাঘরের একপার্শ্বে রাখিয়া দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ বিদায় হইয়া যাইবার দিনে এইজন্তই হেমনলিনী সাজি ভরিয়া ফুল আনিয়াছিল—মনে করিয়া তাহার চৌধ ছলছল করিয়া উঠিল।

তার পরে আপনার ঘরে ফিরিয়া-আসিয়া তাহার মুখের দিকে নলিনাক্ষের সেই দৃষ্টিপাত কমলা অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিতে লাগিল। নলিনাক্ষ কমলাকে কি মনে করিতেছে? কমলার মনের কথা যেন নলিনাক্ষের কাছে সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কমলা পূর্বে যখন নলিনাক্ষের সম্মুখে বাহির হইত না, তখন সে একরকম ছিল ভাল। এখন প্রতিদিন কমলা তাহার কাছে থাকা পড়িয়া বাইতেছে। আপনাকে গোপন করিয়া রাখিবার এই ত শাস্তি! কমলা ভাবিতে লাগিল, “নিশ্চয়ই নলিনাক্ষ মনে মনে বলিতেছেন—‘এই হরিদাসী

মেরোটিকে মা কোথা হইতে আনিবেন, এমন নিলজ্ঞ ত দেখি নাই!’ নলিনাক্ষ যদি এক মুহূর্ত্তও এমন কথা মনে করে, তবে তৎসে অসহ।”

কমলা রাখে বিছানায় শুইয়া মনে মনে খুব জোর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, “যেমন করিয়া হোক, কালই আপনার পরিচয় দিতে হইবে, তাহার পরে বাহা-হির তাহা হউক।”

পরদিন কমলা প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান করিতে গেল। স্নানের পর প্রতিদিন সে একটি ছোটো ঘটিতে গঙ্গাজল আনিয়া নলিনাক্ষের উপাসনাঘরটি ধুইয়া, মার্জনা করিয়া তবে অন্য কাজে মন দিত। আজও সে তার দিবসের প্রথম কাজটি সারিতে গিয়া দেখিল, নলিনাক্ষ আজ সকাল-সকাল তাহার উপাসনাঘরে প্রবেশ করিয়াছে—এমন ত কোনোদিন হয় নাই। কমলা তাহার মনের মধ্যে অসমাপ্ত কাজের একটা ভার বহন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। খানিকটা দূর গিয়া সে হঠাৎ থামিল—হির হইয়া দাঁড়াইয়া কি-একটা ভাবিল। তার পরে আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া-আসিয়া উপাসনাঘরের দ্বারের কাছে চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে যে কিসে আবিষ্ট করিয়া ধরিল, তাহা সে জানে না; সমস্ত অগত্যা তাহার কাছে ছায়ার মত হইয়া আসিল, সময় যে কতক্ষণ চলিয়া গেল, তাহা তাহার বোধ রহিল না। হঠাৎ একসময় দেখিল, নলিনাক্ষ বর হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কমলা মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তখন ভূতলে হাঁটু গাড়িয়া একেবারে নলিনাক্ষের পায়ের উপর

মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল—তাহার সম্মুখে আঁধার চুলগুলি নলিনের পা ঢাকিয়া মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল । কমলা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পাথরের মূর্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল—তাহার মনে রহিল না যে, তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেছে—সে বেন দেখিতেই পাইল না, নলিনাক্ষ অনিমেষ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে—তাহার বাহ্যস্থান লুপ্ত, সে একটি অস্তরের চৈতন্য-আভার অপূর্বরূপে দীপ্ত হইয়া অবিকলিতকণ্ঠে কহিল—“আমি কমলা ।”

এই কথাটি বলিবার পরেই তাহার আপনায় কণ্ঠস্বরে তাহার বেন ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল—তাহার একাগ্র চেতনা বাহিরে ব্যাপ্ত হইল । তখন তাহার সর্বত্র কাঁপিতে লাগিল—মাথা নত হইয়া গেল—সেখান হইতে নড়িবারও শক্তি রহিল না, দাঁড়াইয়া থাকিও বেন অসাধ্য হইয়া উঠিল—সে তাহার সমস্ত বল, সমস্ত পণ “আমি কমলা” এই একটি কথায় নলিনাক্ষের পারের কাছে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে—নিজের কাছে নিজের লজ্জা রক্ষা করিবার কোনো উপায় সে আর হাতে রাখে নাই, এখন সমস্তই নলিনাক্ষের দয়ার উপরে নির্ভর । নলিনাক্ষ আস্তে আস্তে তাহার হাতটি আপনায় হাতের উপর তুলিয়া-লইয়া কহিল—“আমি জানি, তুমি আমার কমলা । এস, আমার ঘরে এস ।”

উপাসনার পরে তাহাকে লইয়া-গিয়া তাহার গলার কমলার গাঁথা সেই মালাটি পরাইয়া দিল এবং কহিল, “এস, আমরা

তাহাকে প্রণাম করি ।” হুই জনে পাশাপাশি যখন সেই খেতপাথরের মেজের উপরে নত হইল, জানালা হইতে প্রভাতের রৌদ্র হুই জনের মাথার উপরে আসিয়া পড়িল ।

প্রণাম করিয়া উঠিয়া আর একবার নলিনাক্ষের পারের ধূলা লইয়া যখন কমলা দাঁড়াইল, তখন তাহার হৃৎসহ লজ্জা আর তাহাকে পোড়ন করিল না । হর্ষের উল্লাস নহে, কিন্তু একটি বৃহৎ মূর্তির অচঞ্চল শাস্তি তাহার অস্তিত্বকে প্রভাতের অকুণ্ঠিত উদার-নির্ম্মল আলোকের সহিত ব্যাপ্ত করিয়া দিল । একটি গভীর ভক্তি তাহার হৃদয়ের কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার অস্তরের পূজা সমস্ত বিশ্বকে ধূপের পুণাগন্ধে বেষ্টন করিল । দেখিতে দেখিতে কখন অজ্ঞাতসারে তাহার হুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল—বড় বড় জলের কোঁটা তাহার হুই কপোল দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, আর, ধামিতে চাহিল না, তাহার অনাথজীবনের সমস্ত হৃৎধের মেঘ আজ আনন্দের জলে করিয়া পড়িল । নলিনাক্ষ তাহাকে আর কোনো কথা না বলিয়া একবার কেবল দক্ষিণহন্তে তাহার ললাট হইতে স্পিক্ত কেশ সরাইয়া-দিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল ।

কমলা তাহার পূজা এখনো শেষ করিতে পারিল না—তাহার পরিপূর্ণ হৃদয়ের ধারা এখনো সে ঢালিতে চায়—তাই সে নলিনাক্ষের শোবার ঘরে গিয়া আপনায় গলার মালা দিয়া সেই খড়মজোড়াকে জড়াইল এবং তাহা আপনায় মাথায় ঠেকাইয়া বহুপূর্বক বধ্যস্থানে তুলিয়া রাখিল ।

তার পরে সমস্তদিন তাহার গৃহকর্ম

যেন দেবসেবার মত মনে হইতে লাগিল।
প্রত্যেক কর্মই যেন আকাশে একএকটি
আনন্দের তরঙ্গের মত উঠিল-পড়িল।
ক্ষেমকরী তাহাকে কহিলেন, “মা, তুমি
করিতেছ কি? একদিনে সমস্ত বাড়ীটাকে
মুইয়া, মাজিয়া, মুছিয়া একেবারে নূতন
করিয়া তুলিবে নাকি?”

বৈকালের অবকাশের সময় আজ আর
সেলাই না করিয়া কমলা তাহার ঘরের
মেঝের উপরে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, এমন-
সময় নলিনাক্ষ একটি টুকরিতে গুটিকয়েক
ফলপত্র লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—
কহিল, “কমলা, এই ফুলক’টি তুমি জল
দিয়া ভাল করিয়া রাখ, আজ সন্ধ্যার পর

আমরা দুজনে মাকে প্রণাম করিতে
যাইব।”

কমলা মুখ নত করিয়া কহিল—“কিছু
আমার সব কথা ত শোন নাই।”

নলিনাক্ষ কহিল—“তোমাকে কিছু
বলিতে হইবে না, আমি সব জানি।”

কমলা দক্ষিণ করতল দিয়া মুখ ঢাকিয়া
কহিল, “মা কি,—” বলিয়া কথা শেষ করিতে
পারিল না।

নলিনাক্ষ তাহার মুখ হইতে হাত
নামাইয়া ধরিয়া কহিল—“মা তাহার জীবনে
অনেক অপরাধকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন,
যাহা অপরাধ নহে, তাহাকে তিনি ক্ষমা
করিতে পারিবেন।”

সমাপ্ত।

ইং-সিং।

—

হুয়েন্-সাং, কাহিরান্ প্রভৃতি চীনদেশীয়
পরিব্রাজকদিগের নাম আজকাল আমাদের
নিকট বিশেষ পরিচিত। ইহাদের স্থলিখিত
ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমাদের ভারতবর্ষের
বৌদ্ধযুগের অনেক খবর আমরা পাইয়াছি,—
এবং সে সকল, ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ
মূল্যবান। সম্প্রতি মিঃ তাকাকান্স, ইং-সিং-
নামক আর একজন চীনদেশীয় পর্যটকের
গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ইনি হুয়েন্-সাং-
এর মৃত্যুর কিছুদিন পরে ৬৭১ খৃষ্টাব্দে
বিশেষ ভ্রমণ করিয়া ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ভাগী-

রথীতীরবর্তী তাম্রলিপিবন্ধের উপস্থিত
হন। সেখান হইতে তিনি পদব্রজে
রাজগৃহে বান ও অনেকদিন নালন্দা-
বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্রচর্চা করেন। তিনি
‘বিনয়পিটক’ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের
প্রায় ৫০০০০ হাজার শ্লোক লিখিয়া স্বদেশে
লইয়া যান। ফিরিবার পথে তিনি সুমাত্রার
রাজধানী-ঐভোগে (বর্তমান পালাবাং)
সংস্কৃত ও পালি ধর্মগ্রন্থ আলোচনা ও
অনুবাদ করেন। ৬৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি তা-
সিনুনামক এক পুরোহিতের সঙ্গে তাঁহার

এহসমূহ পাঠাইয়া দেন । ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বদেশে প্রত্যাগমন করেন । ৬৭১—৬৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ।

ইং-সিং এর পুস্তক হইতে আমরা সেই-সময়কার ভারতবর্ষের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মাভিধান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের যে সকল নিখুঁত চিত্র পাই, তাহা আমাদের দেশের ইতিহাসগঠনের জন্য বিশেষভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য । আমরা বর্তমান প্রবন্ধে শুধুকেবল তাঁহার বলিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে উদ্ধৃত করিব ।

“আমি তখন, পশ্চিম রাজধানীতে (চাং-য়ান্) থাকিয়া অধ্যয়ন করিতাম । চু-ই, হং-ই, আমি এবং আরও কয়েকজনে মিলিয়া স্থির করিলাম—আমরা গৃহকূট, বোধিজ্ঞান দর্শন করিতে ভারতবর্ষে যাইব । চু-ই তাঁহার বৃদ্ধা মাতার জন্য, হং-ই নির্কাণলাভপ্রার্থী হইয়া এবং অন্তেরা মত্ত মত্ত কারণে যাইতে পারিলেন না—কাজেই আমি ও সান্-হিং নামক একজন অল্পবয়স্ক পুরোহিত উভয়ে যাত্রা করিলাম । [সান্-হিং সুমাত্রা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন—অনুহ হওয়ার তিনি এখান হইতে ফিরিয়া যান ।]

* * *

পথে আমার মন কখন সূদূর যুগদাবে খন বা কুকুটপদগিরিতে বিচরণ করিত । আমাদের জাহাজ বখন দক্ষিণসমুদ্রে গীছিল, তখন বর্ষা আসিয়া পড়িল । * * *

দিন পরে আমরা ভোজসময়ে উপনীত হলাম । এখানে আমি ছয়মাস থাকিয়া

সংস্কৃত শব্দবিজ্ঞা অধ্যয়ন করি । এখান হইতে শ্রীভোজ এবং শ্রীভোজ হইতে ‘কাচা’ গমন করি । কাচা হইতে দশদিন উত্তরাভিমুখে যাইয়া আমি উলঙ্গজাতির রাজ্যে উপস্থিত হই । এখানে নারিকেল ও সুপারি প্রভূতপরিমাণে জন্মে—ইহার নারিকেল, সুপারি, বেত প্রভৃতির বিনিময়ে লৌহ লইয়া থাকে । এখানকার পুরুষেরা একেবারে উলঙ্গ, স্ত্রীলোকের কটিদেশে পাভার আবরণ ।

“এখান হইতে একপক্ষকাল পরে আমরা তাম্রলিপ্তিবন্দরে পৌছি । তাম্রলিপ্তি হইতে মহাবোধি ও নালন্দ প্রায় বাটবোজন দূরে । তাম্রলিপ্তিতে আমি মহাবানপ্রাধীপকে (হয়েন্-সাং এর ছাত্র) প্রথম দেখি । এখানে তাঁহার কাছে কিছুদিন থাকিয়া ব্রহ্মভাষা (সংস্কৃত) শিক্ষা ও শব্দবিজ্ঞা অধ্যয়ন করি । তার পরে উভয়ে পশ্চিমের রাস্তা ধরিয়া চলিতে থাকি । আমাদের সঙ্গে অনেক সওদাগর ছিলেন ।

“মহাবোধিবিহার পৌছিবার দশদিন পূর্বে আমাদের এক সূর্যহং পর্বত ও জলা পাত্ৰ হইতে হইয়াছিল—এই পিরিপথ অতিশয় দুর্গম । এখানে কখন একলা যাইতে নাই । এই সময়ে আমার শরীর অনুহ হইল—আমি শ্রান্ত এবং দুর্বল হইয়া পড়িলাম, কোনক্রমেই সঙ্গীদের সঙ্গে যাইতে পারিলাম না । আমাদের সঙ্গে নালন্দার প্রায় কুড়িজন পুরোহিত ছিলেন—তাঁহারা সকলেই আগে চলিয়া গিয়াছিলেন । আমিই কেবল একলা সেই দুর্গম পিরিপথ

পায় হইতে লাগিলাম। বখন সন্ধ্যার অন্ধকার বনীভূত হইয়া আসিল, সেই সময় কতকগুলি পার্শ্বতা দ্বারা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ধনুক লইয়া সীংকার করিতে করিতে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে একদৃষ্টে দেখিতে ও নানাপ্রকারে অপমান করিতে লাগিল। তাহারা একে একে আমার বস্ত্রাদি ও কোমরবন্ধ প্রভৃতি খুণিরা লইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ সংসার হইতে আমার বিদায়ের কণ সন্নিবর্ত এবং আমার তীর্থ-দর্শনের আশা আর পূর্ণ হইল না। বিশেষত আমি ভনিরাছিলাম যে, শাদা মাতুষ পাইলে তাহারা দেবতার নিকট বলি দেয়। এই কথা ভাবিয়া আমি কাছের একটা কঁঠো কাদার মধ্যে গা' ডুবাইলাম এবং কাদা মাখিয়া পাতা দিয়া শরীর ঢাকিয়া আঁতে আঁতে অগ্রসর হইলাম। রাত্রি হইয়া আসিল—চাঁদ সেখানে হইতে তখনও চূরে,—আমি রাত্রি ত্রিপ্রহরে সহযাত্রীদিগের নিকট পৌছিলাম। গ্রামের নিকটবর্তী হইয়া শুনিতে পাইলাম—মহাবানপ্রদীপ আমার ন্যূন ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন। আমি পৌছিলাম তিনি আমাকে দান করাইয়া বস্ত্রাদি দিলেন। কয়েকদিন উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া আমরা নালন্দা পৌছিলাম। সেখানে মূল গুরুদেউতে পূজা ও গৃহকুটে আরোহণ করিলাম। তৎপরে • আমরা মহাবোধিবিহারে গমন করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা, কাষারবন্ধ প্রভৃতি করাইয়া সেই মূর্ত্তির নিকট নিবেদন ও উপাসনা করিলাম।

“বিষয়”-অধ্যাপক হিউন আমার

সঙ্গে যে সকল ছোট ছোট চন্দ্রাতপ দিয়া ছিলেন, সে সকল এইখানে দিলাম এবং ‘ধ্যান’-আচার্য্য আন-তাওএর অনুরোধমত তাঁহার হইয়াও বুদ্ধমূর্ত্তি পূজা করিলাম।

“এইপ্রকারে আমি সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিলাম। আমি বিমলকীর্্তির ক্ষুদ্র গৃহ (১০ হাত চৌকা) দেখিলাম। বারানসীতে যুগদাবে প্রবেশ এবং কুটুমগদিগের আয়োজন করিলাম। আমি নালন্দাবিহারে দশবৎসর ছিলাম।

“এই স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আমি ব্রহ্মশাস্ত্রমুখে বাজা করিলাম। ভাস্কর্য্যাদি আসিবার পথে আবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে পড়িয়াছিলাম—কোনপ্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়াছি। আমি প্রায় পঞ্চাশহাজার সংস্কৃতশ্লোক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।”

ইং-সিং পুনরায় ত্রীভোজে গমন করিয়া সেখান হইতে ব্রহ্মদেশে করিয়া যান। ব্রহ্মদেশে গিয়া কেং-কু বা শীলগুপ্ত নামক কোন পুরোহিতের সাহায্যে এই সকল শাস্ত্র চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ সম্পূর্ণ করিতে তাঁহার প্রায় বায়বৎসর লাগিয়াছিল (৭০০—৭১২ খৃঃ অব্দ)। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে উনাশিবৎসর বয়সে তিনি পরলোক-গমন করেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল তাঁহার ভ্রমণকৃতান্তটুকু প্রকাশ করিলাম। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া সেখানে এবং বরদীপে ও হুমাজা প্রভৃতি স্থানে যে সকল আচার-ব্যবহার দেখিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে প্রকাশ

করিবার ইচ্ছা রহিল। তাঁহার সমগ্র
মুক্তকের মধ্যে ভারতবর্ষের উপর যে একটি
প্রকার,—সম্রাটের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,
তাঁহা বড়ই মনোজ্ঞ। নিজের দেশের আচার-
ব্যবহার-অনুষ্ঠানাদির সমালোচনা করিতে
গিয়া, তিনি সর্বত্র ভারতবর্ষের আদর্শে
সকলের বিচার করিয়াছেন। যেখানে

তাঁহা ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলে নাই,
তিনি সে সকল পরিহার করিবার জন্য
বারবার বৃন্দেশবাদীদিগকে উপদেশ
দিয়াছেন। বলিয়াছেন—“তোমরা এরূপ
ব্যবহার কর, ইহা জানিলে ভারত-
বর্ষের লোকেরা কি বলিবে?” আর
আজ ?—

অধ্যাপক।

পৃথিবী ও সূর্যের তাপ।

পৃথিবী ও সূর্যের তাপ বহুকাল হইতে
মুড়বিক্রানের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া
রাহিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে যেদিন
প্রকৃতির রহস্য প্রথমে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ
করিয়াছিল, সেইদিন হইতেই পৃথিবী ও
সূর্যের তাপোৎপত্তির কারণ আবিষ্কারের
চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু অত্যাধিক সেই দুর্গ-
প্রান্তরবাসী চেষ্টার সাফল্য দেখা
নাই।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভাবিতেন,—কাঠ
একটা জ্বালাইলে, সেটা যেপ্রকার
গাপালোক বিকিরণ করে, সূর্য্যটা বৃষ্টি
সইরকমের একটা দাহপদার্থের বৃহৎ
রূপ। তার পর যখন হিসাবে দেখা গেল,
—সূর্য্য যদি কেবল অকার্যময়ই হইত, তবে
সমগ্র সমস্ত অকার্য চারিপাঁচজার
৭৫০০ একবারে পুড়িয়া বাইবার সম্ভাবনা,
তখন প্রাচীন পণ্ডিতগণের চমক ভাঙিল।

অনেকেই সূর্যের তাপোৎপত্তির কারণ
অনুসন্ধানে লাগিয়া গেলেন।

এই পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে কল্পনা
করিয়া লইলেন,—মাসাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী-
টিতে প্রতিদিনই যেমন হাজার হাজার
ছোট-বড় উদ্ভাপি ও আসিয়া পড়ে, বিশাল
সূর্য্যদেহে নিশ্চয়ই প্রতিবছরই সেইপ্রকার
কোটি কোটি উদ্ভার পতন হয়। কিন্তু
চলিযু পদার্থের গতি হঠাৎ অবরুদ্ধ হইলে,
তাঁহা ঘুরা যে প্রচুর তাপের উৎপত্তি হয়,
তাঁহা ত আমরা প্রতিদিনই দেখিয়া
আসিতেছি। স্থির হইল,—সূর্য্যগোলকে
যে অজস্র উদ্ভাবণ হইতেছে, সেই উদ্ভা-
প্তির অবরোধ ও বর্ষণজাত তাপই সূর্যের
তাপভাণ্ডারকে পূর্ণ রাখিয়াছে।

ইহা ছাড়া, সূর্য্যমণ্ডলস্থ নানা পদার্থের
রাসায়নিক সংযোগবিয়োগে যে তাপ
হয়, তাঁহাকেও সূর্যের তাপরক্ষার কারণ

বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া ছিলেন।

সৌর-তাপোৎপত্তি-সম্বন্ধে এই কথাগুলি এককালে গুণ্ডিতসমাজে খুব প্রতিষ্ঠানান্ত করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক-বুগের প্রারম্ভে সিদ্ধান্তটির উপর অনেক সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন উঠিল,—যদি সৌরমণ্ডলে অজস্র উদ্ভাববর্ষণই সম্ভবপর হয়, তবে সহস্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত উষ্ণ সূর্য্যদেহকে কি গুঁট করিত না? এবং সেই গুঁটাবয়ব সূর্য্যের আকর্ষণবৃদ্ধির সহিত সুনিয়ন্ত্রিত বিধে কি একটা বিশৃঙ্খলার লক্ষণ প্রকাশ পাইত না?

আমরা প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণে সূর্য্যকে ত অধুনা প্ররিপুষ্ট দেখি না, এবং গ্রহ-উপগ্রহাদির চলাফেরাতেও ত ছুইএক-হাজার বৎসরে কোন পরিবর্তনই হয় নাই। অনেকের মনে হইল,—তবে কিপ্রকারে উদ্ভাববর্ষণকেই সৌরতাপরক্ষার কারণ বলিয়া নিশ্চিত থাকা যায়?

বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন, কথাটা নিতান্ত উদ্ভাইয়া দিবার মত নয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিক মিলিয়া সৌরতাপ জন্মাইবার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান লাগিয়া গেলেন।

এই অনুসন্ধানে সুপ্রসিদ্ধ জর্জগণ্ডিত হেল্মহোল্জসাহেবও যোগ দিয়াছিলেন। ইন্ডিকটুয়ান পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—কোন বাষ্পময় পদার্থকে সঙ্কুচিত করিলে, সেই সঙ্কোচদ্বারা যে তাপের উৎপত্তি হয়, তাহা জ্ঞান আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। সূর্য্যদেহের অন্তত কতকটা যে বাষ্পময়, তাহারো ত প্রচুর প্রমাণ আছে। সুতরাং

তাপবিকিরণদ্বারা সৌর-বাষ্পাবরণ সঙ্কুচিত হইলে, যে তাপের উৎপত্তি হয়, তাহাই সূর্য্যের তাপরক্ষার পক্ষে প্রচুর নয় কি?

হেল্মহোল্জসাহেব একাধারে মহা-বৈজ্ঞানিক ও অসাধারণ গণিতবিদ ছিলেন। তিনি গণিতসাহায্যে স্পষ্ট দেখাইলেন, তাপবিকিরণজাত সঙ্কোচই সেই তাপ-পূরণের পক্ষে প্রচুর, এবং এই সঙ্কোচের পরিমাণ এত অল্প যে, ছুইচারিহাজার বৎসরের পর্য্যবেক্ষণেও আমরা পৃথিবী হইতে তাহা বুঝিতে পারিব না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের নেতা লর্ড কেলভিন ও টেট প্রমুখ গুণ্ডিতগণ হেল্মহোল্জের সিদ্ধান্তে পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিলেন, এবং গণনা দ্বারা স্থির হইল, সূর্য্যদেহ এখনো আড়াইকোটি বৎসর ব্যাপিয়া সঙ্কুচিত হইতে হইতে তাপালোক বিকিরণ করিতে থাকিবেন, এবং তার পর সৌরজগতে এক মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত হইবে।

হেল্মহোল্জের এই আকুলসিদ্ধান্তটিই এপর্য্যন্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছিল। ভাবা-গিয়াছিল, বিজ্ঞানরথী হেল্মহোল্জ ও লর্ড কেলভিনের পরিণত মস্তিষ্ক হইতে যে সিদ্ধান্তের উৎপত্তি, তাহার বুঝি কেহ প্রতিবাদী থাকিবে না। কিন্তু আজ-কাল সৌরতাপোৎপত্তিসম্বন্ধে আবার একটি নূতন কথার সূচনা দেখা বাইতেছে।

অধ্যাপক লাইডার্নামক জটনক বৈজ্ঞানিক আজ-করেকমাস হইল প্রচার করিয়াছেন, রেডিসনামক যে একটি ধাতু আজ দেখবৎসর হইল আবিষ্কৃত

হইরাছে, সূর্যের বর্ণাবরণে (chromosphere) তাহা প্রচুরপরিমাণে আছে। অধ্যাপকটির মতে এই ধাতুটিই সৌর তাপ ও আলোকের মূলকারণ। ত্যু ছাড়া, রেডিয়ম্ সহজ অবস্থাতে যে তাপ ও রশ্মি প্রচুরপরিমাণে ত্যাগ করে, তাহা অবলম্বন করিয়া সূর্য ও নক্ষত্রের আরো অনেক রহস্যের নীমাংসার চেষ্টা হইতেছে।

সূর্যের কলঙ্কের (sunspots) আবির্ভাব-তিরোভাব একটা বড় রহস্যময় ব্যাপার। প্রতি এগারোবৎসর অন্তর এই কলঙ্ক প্রচুরপরিমাণে দেখা যায়। আজকাল অনেক পণ্ডিত অস্বস্তিমান করিতেছেন, 'সূর্যমণ্ডলস্থ' রেডিয়মের উত্তেজনায় হ্রাসবৃদ্ধিতে কলঙ্কের আবির্ভাব-তিরোভাব দেখা যায়।

ভূগর্ভস্থ তাপের প্রসঙ্গেও আজকাল রেডিয়মের কথা শুনা যাইতেছে। এই তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—সৃষ্টির সময় পৃথিবী যখন কোন এক অত্যাশ্চর্য নিহারিকা হইতে খলিত হইয়া জগৎরচনার সূত্রপাত করিয়াছিল, তখন হইতেই তাপ পৃথিবীতে আছে। সৃষ্টির আদিতে এই তাপ অসংখ্য গুণই অধিক ছিল, হয় ত তদ্বারা পৃথিবীকে সূর্যের তায় উজ্জ্বল দেখা যাইত। কিন্তু পৃথিবী এপ্রকার অবস্থার অধিককাল থাকিতে পারে নাই, তাপত্যাগদ্বারা ক্রমে শীতল হইয়া ইহাকে ক্রমেই বর্তমান অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কোন উষ্ণবস্তু শীতল করিলে অগ্রে তাহার উপরটাই শীতল হইয়া পড়ে;—ভিতরের তাপ বাহির হইতে অনেক সময়ের

আবশ্যকতা হয়। পৃথিবীরও তাহাই ঘটিয়াছে। ইহার উপরটা শীতল হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই আদিমতাপের যে অংশটা ভূগর্ভে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। কাজেই ভূগর্ভের তুলনায় ভূগর্ভকে অত্যন্ত উষ্ণ দেখায়।

প্রতি বৎসর পৃথিবী কিপরিমাণ তাপ বিকিরণ করে, তাহা ঠিক করা কঠিন নয়। এইপ্রকার একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া আজ কয়েকবৎসর হইল লর্ড কেলভিন্ পৃথিবীর জন্মকাল পর্য্যন্তও ঠিক করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রবার্ট কোর্ড-সাহেব ভূগর্ভের তাপসম্বন্ধীয় প্রচলিত সিদ্ধান্তটিকে উল্টাইয়া দিতে চাহিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—সেই আদিমতাপ এবং এখনকার রাসায়নিক-সংযোগবিশেষণাদ্বারা তাপ ভূগর্ভের উষ্ণতারকার পক্ষে প্রচুর নয়। নূতন-আবিষ্কৃত রেডিয়ম্ ও সেই-শ্রেণীর ধাতুগুলির কার্য আলোচনা করিলে, তাহাদিগকেই তাপরকার মূল বলিয়া মনে হয়।

হিসাবে দেখা যায়, একপাউণ্ড রেডিয়ম্-ধাতু এক বৎসরে যে তাপ ত্যাগ করে, তাহা একশতপাউণ্ড উৎকৃষ্ট কয়লার দহনজাত তাপের সমান। এই তাপবিকিরণে রেডিয়মের ক্ষয় হয় সত্য, কিন্তু এই ক্ষয় এত অল্প যে, পঞ্চাশবাট বৎসরেও তাহার লক্ষণ দেখা যায় না। তা ছাড়া, এই তাপ-বিকিরণক্ষমতা কেবলমাত্র রেডিয়মেরই গুণ নয়। হোল্মিয়ম্, থোরিয়ম্ প্রভৃতি

অনেক ধাতুতেই ঐ সকল গুণ সম্ভ্রান্তি ধরা পড়িয়াছে। এই সকল দেখিয়া রদার্কোর্ড-সাহেব স্থির করিয়াছেন, আমাদের পৃথিবীর আকাশে ও মৃত্তিকাতে রেডিয়ম্ ও তজ্জাতীয় যে সকল ধাতু প্রচুরপরিমাণে আছে, তাহাই তাপত্যাগ করিয়া পৃথিবীর উষ্ণতাকর্য্য করিতেছে। ঘরে আগুন জ্বালাইলে, আগুনে ঘরটি যেমন বেশ গরম হইয়া উঠে, তুপ্তস্থ রেডিয়ম্জাতীয় নানা ধাতু সেইপ্রকার তাপ বিকিরণ করিয়া আমাদের আকাশটিকে বেশ গরম করিয়া রাখিতেছে।

পৃথিবীতে রেডিয়ম্জিনিয়টা অতি অল্পই আছে সত্য, কিন্তু রেডিয়ম্জাতীয় অপর জিনিষের বড় অভাব নাই। ইহা দেখিয়া রদার্কোর্ডসাহেব বলিতেছেন, এখনো তুপ্তে তাপবিকিরণের বস্তুভিত্তিক পদ্ধতি আছে, পৃথিবীর তাপরক্ষার পক্ষে তাহাই প্রচুর।

লর্ড কেলুভিন্ যে হিসাবে পৃথিবীর জন্মকাল নির্দেশ করিয়াছিলেন, রদার্কোর্ড-সাহেব সেই হিসাবেই দেখাইতেছেন যে, পৃথিবীতে সাতাইশকোটি টন রেডিয়মের অস্তিত্ব থাকিলে, তাহার তাপেই তুপ্তের উষ্ণতাকর্য্য হইতে পারে। এন্টের ও গায়টেল্ নামক দুইজন অধ্যয়ন পণ্ডিতের গবেষণার দেখা গিয়াছে, সমগ্র ভূদেহে পূর্বোক্তপরিমাণ রেডিয়ম্ প্রকৃতই আছে। তা ছাড়া, গভীর কূপ ও ঝরণার জল এবং সমুদ্রের কর্দমাদিতে যে সকল রেডিয়ম্ মিশ্রিত থাকে, তাহা দেখিয়া ভূদেহের রেডিয়ম্প্রাচুর্য্যে আর কেহ বড় অবিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না!

অতি অল্পদিনই হইল, রদার্কোর্ডের এই সিদ্ধান্তটি প্রচারিত হইয়াছে। নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ এসবকে কি মতামত প্রকাশ করেন, শুনিবার জন্য সমগ্র জগৎ আজ উৎকর্ষ হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

আমাদের ধর্মশাস্ত্র।

ধর্মশাস্ত্রকে বর্তমান প্রবন্ধে যাগ, হোম, দান, ধ্যান, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি হিন্দুসমাজের জন্মের কৰ্মকলাপকে বুঝিতে হইবে। যেসকল শাস্ত্র আমাদেরকে ঐ সমস্ত কৰ্মে প্রবর্তিত করে, তাহাদিগকে আমরা ‘ধর্মশাস্ত্র’ বলিয়া জানি।

‘বাবজীবন অগ্নিহোম হোম করিবে’,

‘স্বারাজ্যকামী জ্যোতিষ্টোম-যাগ করিবে’, ‘বর্গকামী দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ করিবে’, ‘পণ্ডকামী চিত্রাযাগ করিবে’,—এই সমস্ত ধর্মের উপদেশ বেদই আমাদেরকে দিয়াছেন, অন্তএব বেদ আমাদের ধর্মশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্র-বিদগণ বহু যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণে স্থির করিয়াছেন যে, বেদই ধর্মের মুখ্যপ্রমাণ।

বেদপ্রদর্শিত পণ্ডা অবলম্বন করিয়া ধর্মোচরণে প্রবৃত্ত হইলেও, কেবল বেদকেই আমরা অনুসরণ করি না। অবশ্য বহুপূর্বে এ পদ্ধতিও ছিল, যখন কল্পসূত্র, সংহিতা, পুরাণ, ইতিহাস ও আধুনিক স্থিতিবিবরণগুলির উৎপত্তি হয় নাই। আজকাল ধর্মোচ্চারণ করিতে হইলে, এই সমস্ত শাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে; সমস্ত শাস্ত্র বিচার করিয়া কর্তব্য স্থির করিতে হইবে; তাহা না হইলে সেই ধর্মোচ্চারণের যে পরিণাম হয়, তাহা মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যকার শবরস্বামী এইরূপে বলিয়াছেন :—

“ধর্মঃ প্রতি বিপ্রতিপত্তা বহবিদঃ, কেচিদন্তঃ ধর্মমাহঃ, কেচিদন্তঃ, বোহমবিচার্য্য প্রবর্তমানঃ কসিবেদোপাদানো বিহন্তেত, অনর্থকং বৃচ্ছেৎ ।”

বহুবিদ্য লোকগণের ধর্মসম্বন্ধে বিরোধ আছে; একজন যাহাকে ধর্ম বলেন, অন্যজন তাহা না বলিয়া ভিন্ন বলেন। এ অবস্থায় ধর্মোচ্চারণে প্রবৃত্ত ব্যক্তি বিচার না করিয়া যে-কোন একটি ধর্ম গ্রহণ করিলে, বিহত হইবে ও অনর্থ প্রাপ্ত হইবে।

মীমাংসাদর্শনকার যে সময়ে উৎপন্ন হন, তখন কল্পসূত্র-সংহিতা প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম-প্রতিপাদক নিবন্ধের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রত্যেক নিবন্ধেই কোন-না-কোন অংশে বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। মহর্ষি জৈমিনি ইহার ভীষণ পরিণাম চিন্তা করিয়া ধর্মতত্ত্বমীমাংসার জন্য এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাই আজকাল ‘ধর্মমীমাংসা-সূত্র’ বা ‘জৈমিনিসূত্র’ নামে পরিচিত। সেই সময় হইতে ঐ গ্রন্থই ধর্মমীমাংসার প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে। ইহা

কোন ধর্মশাস্ত্রকেই অস্বীকার করিতে পারেন না। ভগবান্ জৈমিনি অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্মোদ্ঘাটন সাধারণ ব্যক্তির সুকর নহে বিবেচনা করিয়া আচার্য্য শবরস্বামী ঐ সূত্রের ভাষ্য ও কুমারিলভট্ট বার্তিক রচনা করিয়াছেন। তাহার পরেও মীমাংসাদর্শনের বহু গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। ফলে এই সমস্ত গ্রন্থের মতভেদে জৈমিনির মতার্থ অভিপ্রায় কি ছিল, তাহা অত্যন্ত দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

যাহাই হউক, বেদের পর কল্পসূত্র-সংহিতা প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ উৎপন্ন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মহর্ষি জৈমিনি ও আচার্য্য শবরস্বামী প্রভৃতি কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই অল্প এখানে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে।

বোধায়ন, আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ কল্পসূত্রগুলির ধর্ম প্রামাণ্য আছে কি না, এই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া মহর্ষি জৈমিনি চারিটি সূত্রে নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন; তাহা এই :—

“প্রয়োগশাস্ত্রম্ (কল্পসূত্রম্) ইতি তৎ ।” “ন, অসম্মিয়মাৎ ।”—“অবাক্যশেবাচ্চ ।”—“সর্বত্র চ প্রয়োগাৎ সম্মিধানশাস্ত্রাচ্চ ।”

কোন ভাষ্য বা বার্তিক অনুসরণ না করিয়া কেবল মতার্থ ধরিলে, এই সূত্রগুলির অর্থ বোধ হয় এইরূপ হইতে পারে—‘প্রয়োগশাস্ত্র (কল্পসূত্র) প্রমাণ যদি (বল) ? তাহা নহে, (যেহেতু তাহাতে) ভাল নিয়ম নাই।—বাক্যশেষ নাই।—(ইহাতে) সর্বত্র প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে; (কিন্তু) সম্মিধানশাস্ত্র (বেদ) (অন্ত)।’

শব্দবাহী এই স্বত্বগুলির এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—বাহ্যতঃ আশ্রয় কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় স্বত্বের ভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি—

পূর্বপক্ষঃ।—“প্রয়োগস্ত শাস্ত্রং প্রমাণমেবৈবং জাতীয়ক্ ইতি ক্রমঃ। সত্যবাস্তাসেতানি বচনানি। কথমবগম্যতে? বৈদিকেরবাং সংবাদো ভবতি—ব এব হি বেদে গ্রহাঃ (বজ্রীয়পাত্রবিশেষাঃ) ত এব ইহ, বা-এব বেদে ইষ্টঃ, তা এবেহ। তস্মাৎ সত্যবাচ আচার্য্যাঃ। ‘আচার্য্যবচঃ প্রামাণ্যমিতি’ চ শ্রুতিঃ।”

প্রশ্ন।—এইজাতীয় প্রয়োগশাস্ত্র (কল্পস্বত্ব) প্রমাণ। কেন না, তাহা সত্যবাদীর বচন। আমরা দেখিতে পাই, বেদে যে সমস্ত বজ্রীয়পাত্র বিহিত হইয়াছে, এই কল্পস্বত্বসমূহও তাহাই হইয়াছে; বেদে যে ইষ্টি (যাগবিশেষ) বিহিত, কল্পস্বত্বও তাহাই। সুতরাং এই কল্পস্বত্ব-প্রণেতা আচার্য্যগণ সত্যবাদী। আর শ্রুতি খলিতেছেন—আচার্য্যবচন প্রমাণ। অতএব কল্পস্বত্বের প্রামাণ্য আছে।

ইহার সিদ্ধান্ত ভাষ্যের শেষে শব্দবাহী বলিয়াছেন—

“যদ্যুক্তং সত্যবাস্তাসেতানি বচনানি, তন্ন; আচার্য্যবচনং” হি ভবতি পূর্বপক্ষে—‘সর্বত্র তিথিবু অমাবান্তা’ ইতি, সন্নিহিতঞ্চ শাস্ত্রম্—‘শৌর্গমাস্যাং পৌর্ণমাস্যাং যজ্ঞেত, অমাবান্তারমমাবান্তরা যজ্ঞেত’ ইতি। তেন শ্রুতিবিরুদ্ধবচনাৎ ন সত্যবাচঃ, তস্মাদপ্রমাণম্।”

উত্তর।—তুমি বলিয়াছ, প্রয়োগশাস্ত্র সত্যবাদী আচার্য্যের বচন, কিন্তু তাহা নহে। কেন না, তাহারা বলিয়াছেন—সমস্ত তিথিতেই ‘অমাবান্তা’ বাগ করিবে। কিন্তু বেদ বলিতেছেন—শৌর্গমাসীতে ‘পৌর্ণমাসী’

ও অমাবান্তার ‘অমাবান্তা’ বাগ করিবে। অতএব শ্রুতিবিরুদ্ধ বিধান করার তাহারা সত্যবাক হইতে পারেন না। সুতরাং তাহাদের প্রণীত কল্পস্বত্ব অপ্রমাণ।

ভাষ্যকার শব্দবাহীর এই উক্তি বার্তিককার কুমারিলভট্ট ভাল বিবেচনা করেন নাই। তিনি বলেন—কল্পস্বত্বের প্রামাণ্য আছে কি না, তাহা ঐ স্বত্বগুলিতে আলোচিত হয় নাই; কিন্তু কল্পস্বত্বের ধর্মে স্বতন্ত্র প্রামাণ্য আছে কি না, স্বত্বকার তাহারই আলোচনা করিয়া স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই ও অস্বতন্ত্র প্রামাণ্য আছে, স্থির করিয়াছেন।—অর্থাৎ বেদ যেমন অপৌরুষেয় বলিয়া স্বয়ংই প্রমাণ, কল্পস্বত্ব সেরূপ হইতে পারে না; কেন না, কল্পস্বত্বগুলি মানব-প্রণীত—পৌরুষেয়। কিন্তু ইহারায়খন বেদ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে;—বেদে বাহা আছে, তাহাই বিনিয়োগপ্রদর্শন করিয়া স্পষ্টরূপে বলিয়াছে; তখন বেদের প্রামাণ্য থাকায় ইহাদেরও প্রামাণ্য আছে;—বেদ যেমন স্বয়ং—স্বতন্ত্র প্রমাণ, কল্পস্বত্ব অন্তের প্রামাণ্য ধার করিয়াছে বলিয়া সেরূপ স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে, কিন্তু অস্বতন্ত্র—পরাদীন প্রমাণ। এসম্বন্ধে স্বয়ং বার্তিককার ও তন্মতানুসারী পার্শ্বসারথিমিশ্র বহুপ্রকার বিচারচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখি না। তাহার মন্তর্য্য নির্ণয় এইঃ—কল্পস্বত্ব সর্বতোভাবে অপ্রমাণ নহে, কিন্তু যে যে স্থানে বেদের সহিত বিরোধ দৃষ্ট হইবে, সেই সেই স্থানেই তাহা অপ্রমাণ।

নীমাংসকধূরধর প্রভাকরভট্ট বিচার-ভঙ্গীতে উভয় মতেই সম্মতি দিয়াছেন বোধ হয়। মাধবাচার্য্য ভ্রামমালাবিস্তরে তাঁহার মত এইরূপে উদাহৃত করিয়াছেন—

“কল্পসূত্রকার আহ—সর্বাংস্ তিথিব্ অমাবান্তা কর্তব্য ইতি; অতিস্ত পৌর্ণমাস্তাং পৌর্ণমাস্তা যজ্ঞেত, অমাবান্তায়াম্ অমাবান্তায় যজ্ঞেতেতি অমাবান্তা-তিথৌ তৎকর্তব্যতাং ক্রতে। ততঃ কল্পসূত্ররূপেণ বেদেন বিরুদ্ধাদিগ্ অতির্ন মানস্ ইতি ৭৮৭—

মৈবন্, কল্পসূত্রস্ত বেদত্বং নাদ্যপি সিদ্ধন্, কিন্তু প্রযত্নেন সাধনীয়ন্, ন চ তৎ সাধয়িতুং শক্যতে— পৌরুষেয়ত্বস্য সমাখ্যায়, তৎকর্তৃরূপলভেন চ সাধিতত্বাৎ। অতঃ কল্পসূত্রস্ত দুর্কলতর্য্য ন প্রতিরপ্রমাণন্।”

ভাবার্থ—কল্পসূত্রে সমস্ত তিথিতেই ‘অমাবাস্যা’বাগের বিধান আছে, কিন্তু বেদে কেবল পৌর্ণমাসীতেই তাহা উক্ত হইয়াছে। অতএব কল্পসূত্ররূপ বেদের সহিত ঐ প্রতির বিরোধ উপস্থিত হইলেও, ঐ প্রতি অপ্রমাণ হইবে না। যেহেতু কল্পসূত্র যে বেদ, তাহার প্রমাণ নাই; তাহার বেদত্ব সাধন করিতেও পারা যায় না। কেন না, কল্পসূত্রগুলির ‘বোধায়ন’ ‘আখ্যায়ন’ প্রভৃতি নাম শুনিলেই ত তাহার প্রণেতার অসুসন্ধান পাওয়া যায়—তাহা যে পৌরুষেয়, ইহা বুঝা যায়। অতএব কল্পসূত্র দুর্কল বলিয়া প্রতির অপ্রামাণ্য করিতে পারে না।

যাহাই হউক, কাভ্যায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি কল্পসূত্রকারগণ যে স্ব স্ব গ্রন্থে বেদবিরুদ্ধ ধর্মেরও বিধান করিয়াছেন, এ বিষয়ে সমস্ত মীমাংসকেরই সম্মতি আছে বলিয়া, আমরা উল্লিখিত মতগুলি সমালোচনা করিলে, বুঝিতে পারি। ভাব্যকার প্রভৃতি কল্পসূত্র-

সমূহ হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া বিচার করিয়াছেন। কল্পসূত্রে এতাদৃশ বিধি আরও আছে কি না, তাহা সমালোচ্য।

সূত্রগ্রন্থের পর মনুপ্রভৃতির শ্রুতি স্মৃতি;—যাহাকে আমরা সাধারণত সংহিতাশব্দে অভিহিত করিয়া থাকি। বেদোক্ত মন্ত্রের বিনিয়োগাদি প্রদর্শনের জন্য কল্পসূত্রের উৎপত্তি হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের উৎপত্তির প্রয়োজন কি, এসম্বন্ধে পার্থসারথিমিশ্র শাস্ত্রদীপিকার স্মৃতিপ্রামাণ্যাদিকরণে বলিয়াছেন—‘বেদ বহুশাখায় বিভক্ত। সেই সমস্ত শাখায় বেদবোধিত ধর্ম বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় বেদের একশাখা-ধ্যায়ী শাখান্তরস্থিত ধর্ম জানিতে পারে না। সেইজন্য স্মৃতি শাখাসমূহে বিপ্রকীর্ণ ধর্মগুলিকে একত্র সংগৃহীত করিয়া দিয়াছে। মন্ববুদ্ধি ব্যক্তিও ইহা দ্বারা অন্নায়াসেই সমস্ত ধর্ম জানিতে পারে।’

স্মৃতিসমূহে যদি কেবলমাত্র বেদোক্ত ধর্ম উপনিবদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাহার প্রামাণ্য আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু বস্তুত তাহা হয় নাই। বেদে যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ নাই, স্মৃতিনিবন্ধে আমরা তাহাও দেখিতে পাই। এজন্য ধর্মমীমাংসকগণ সেসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া নীরব থাকিতে পারেন না।

স্মৃতিকার বলিয়াছেন—

“অষ্টকাঃ কর্তব্যাস্”—

অষ্টকাশ্রদ্ধ করিবে। ইহার প্রামাণ্য-বিষয়ে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হয়,— এক দিকে প্রসিদ্ধ বেদতত্ত্বজ্ঞ মনু প্রভৃতি

সেই শ্রাদ্ধের বিধান করিয়াছেন ও তাহা অবিশীতশিষ্টাচারপরম্পরায় প্রথিত বৈদিক-গণদ্বারা পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে ; অপর দিকে বেদে তাহার কোন মূল দেখিতে পাওয়া যায় না। মহর্ষি জৈমিনি এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া পূর্বোক্ত স্মৃতিব্যাক্যের অপ্রামাণ্য ঘোষণা করিতে পারেন নাই। তিনি এখানে বলিয়াছেন—

“অপি বা কৰ্ত্তৃনামাত্মাং প্রমাণমভুমানং স্যাৎ।”

১ অ, ৩ পা, ২ হ।

বেদমূলক না হইলে সে ধর্ম অপ্রমাণ, সত্য। অষ্টকাশ্রাদ্ধের মূলভূত ঋতিবচন বেদে প্রত্যক্ষ হইতেছে না, তাহাও ঠিক। কিন্তু যে সকল ধর্মস্মৃতিকার অধ্যয়ন, উপনয়ন প্রভৃতি ধর্মের বিধান লিখিয়াছেন—যাহার মূল বেদে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়, এই অষ্টকাশ্রাদ্ধ তাহাদের দ্বারাই বিহিত হইয়াছে। অতএব যদিও ইহার মূলশ্রুতি বেদে প্রত্যক্ষগোচর না হইতেছে, তথাপি উত্তর স্মৃতির (উপনয়নাদি ও অষ্টকাশ্রাদ্ধ) কর্ত্তা এক বলিয়া, বেদে ঐ অষ্টকাশ্রাদ্ধের মূলশ্রুতি আছে, ইহা আমাদের দ্বারাই বিহিত হইয়াছে। অতএব যদিও ইহার মূলশ্রুতি বেদে প্রত্যক্ষগোচর না হইতেছে, তথাপি উত্তর স্মৃতির (উপনয়নাদি ও অষ্টকাশ্রাদ্ধ) কর্ত্তা এক বলিয়া, বেদে ঐ অষ্টকাশ্রাদ্ধের মূলশ্রুতি আছে, ইহা আমাদের দ্বারাই বিহিত হইবে ও তাহা দ্বারাই অষ্টকাশ্রাদ্ধের প্রামাণ্য থাকিবে।

শবরস্বামী উল্লিখিত স্মৃতিপ্রামাণ্যধিকরণে কয়েকটি ভাল কথা বলিয়াছেন। তাহা এই :—স্মৃতিশাস্ত্রবোধিত যে সকল ধর্মের প্রয়োজন আমরা এ সংসারে দেখিতে পাই না, তাহাদের প্রামাণ্যরক্ষার জন্য ঋতিবচনের অভুমান হউক। যেমন অষ্টকাশ্রাদ্ধ করিলে কি ফল হয়, ইহার প্রয়োজন কি, তাহা আমরা এ সংসারে

খুঁজিয়া কিছুই পাই না। অতএব আমরা দিগকে স্থির করিতে হইবে, অষ্টকাশ্রাদ্ধের ফল সংসারে দৃষ্ট না হইলেও ভবিষ্যৎকালে কিছু অদৃষ্টকল আছে এবং এই অদৃষ্টকলের আকাজক্ষার আমরা ঐ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিব। কিন্তু যে সকল স্বত্ব্যুক্ত ধর্মের ফল দৃষ্ট, অর্থাৎ বাহার ফল আমরা এই সংসারেই দেখিতে পাই, সেই সকল ধর্মের প্রামাণ্য এই দৃষ্টকলের দ্বারাই সাধিত হইবে; ইহার জন্য বেদবচন-অভুমানের কোন আবশ্যকতা নাই। যেমন, স্মৃতিকারগণ বলিয়াছেন—“গুরুরভুগন্তব্যঃ”—গুরুর অনুগমন করিবে; “তড়াগঃ খনিতব্যম্” তড়াগ খনিত করিবে; “প্রপা প্রবর্ত্তয়িতব্যম্”—প্রপা (জলপানগৃহ) প্রবর্ত্তিত করিবে; “শিখাকর্ম কৰ্ত্তব্যম্”—শিখাকর্ম করিবে। এই সমস্ত স্বত্ব্যুক্তধর্মের আমরা দৃষ্টফলই পাইরা থাকি। যেমন—“গুরুরভুগন্তব্যঃ” ইহার দৃষ্টফল এই যে—

“গুরোরভুগমনাৎ প্রীতৌ গুরুদ্ব্যাপরিষ্যতি গ্রহগ্রহিতৈদিনশ্চ জ্ঞানানুপদেশকতি”—

গুরুর অনুগমন করিলে গুরু প্রীত হইয়া গ্রহের জটিলত্বভেদী জ্ঞানসমূহের উপদেশ দিবেন। এইরূপ—

“প্রপাতড়াগানি চ লোকোপকারায়, ন ধর্মায়, ইত্যোবাংগম্যতে।.....গোত্রচিহ্ন শিখাকর্ম।”

শবরস্বামী এইরূপে স্মৃতিপ্রায় প্রকাশ করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—

“তেন চৈব দৃষ্টার্থান্তে তত এব প্রমাণম্। যেহু অদৃষ্টার্থান্তে বৈদিকশাস্ত্রমানস্” ইতি।

পূর্বোক্ত বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, স্মৃতিকারগণ

বেদান্তিক ধর্মেরও উপদেশ দিয়াছেন ও তাহার প্রয়োজন ছিল দেশকালাদি । অতএব এখানে একটু আলোচনা করিবার জন্য আমরা সহৃদয়বর্গকে প্রসঙ্গক্রমে আহ্বান করিতেছি ।

বেদবোধিত বলিয়া যে সকল ধর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথচ সেগুলিকে কেবল স্মৃতিকারগণই উপনিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই সমস্ত ধর্মদ্বারা যদি বর্তমান লোকস্থিতি স্ফুরক সম্পন্ন না হয়, তবে তাহাদের পরিবর্তন কেন হইবে না ? ইহাতে দোষ কি ? আমরা দেখিতে পাই, পুরাকালেও লোকস্থিতির নিমিত্ত মনীষিগণ ধর্মের পরিবর্তন করিয়া গিয়াছেন । যথা বৃহস্পতিপুরাণে—

“সমুদ্রযাত্রাধীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্ ।

বিজানামসবর্ণায় কস্তাস্বপ্নযমন্তথা ॥

দেবরেশ্বর স্তোত্রোৎপত্তিরূপকৈ পশোর্বধঃ ।

* * *

ইমান্ ধর্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহর্মণীবিধঃ ॥”

সমুদ্রযাত্রা, সন্ন্যাসগ্রহণ, বিজগণের অসবর্ণ্য কস্তার সহিত বিবাহ, পতি মৃত হইলে দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কদানে গোবধ প্রভৃতি ধর্মকে মনীষিগণ কলিযুগে বর্জনীয় বলিয়াছেন ।

আদিত্যপুরাণেও এ কথা দেখিতে পাওয়া যায়—

“দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণকং কমণ্ডলোঃ ।

* * *

এতানি লোকশুণ্যার্থ্য কল্যেয়ানী মহান্ধিতঃ ।

নিবর্তিতানি কৰ্ম্মানি ব্যবহাপূর্ব্বকং বৃথৈঃ ॥”

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাসগ্রহণ প্রভৃতি

ধর্মকে লোকরক্ষার নিমিত্ত মহাত্মা বৃধগণ ব্যবহাপূর্ব্বক কলির প্রথমে নিষিদ্ধ করিয়াছেন ।

এখানে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, লোকরক্ষার জন্যই (‘লোকশুণ্যার্থঃ’) তাহার পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্মের নিষেধ করিয়াছেন । পূর্ব্বোক্ত ধর্মগুলি লোকরক্ষার উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ার সুহৃদ্ব্যগণের দ্বারা উপনিবদ্ধ হইয়াছিল । তাহার পর ক্রিয়াকাল অতীত হইলে, তৎকালকর্ত্তী পণ্ডিতগণ লোকতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত ধর্মদ্বারা সেই সময়ে লোকস্থিতি চলিতে পারে না ; অতএব তাহারা তাহা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন । তাহা না হইলে, যদি সেই সমস্ত ধর্ম বেদবোধিত হইত, তবে ‘মনীষী’ ‘বৃধ’গণ ‘ব্যবহাপূর্ব্বক’ লোকরক্ষার জন্য সেগুলিকে নিষিদ্ধ করিতে কিপ্রকারে সাহসী হইলেন ? অতএব বুঝিতে হইবে, লোকস্থিতির নিমিত্তই সেই সকল ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের ফল অলৌকিক—অদৃষ্ট ছিল না ; তাহাদের ফলাফল এই সংসারেই উপলব্ধ হইত ও তাহা দ্বারাই ঐ ধর্মের প্রামাণ্যরক্ষা হইত । পরবর্ত্তী কালে তাহা দ্বারা যখন আর লোকস্থিতি রক্ষিত হইল না, তখন তাদৃশ দৃষ্ট-ফলাভাবে ঐ সমস্ত ধর্মের প্রামাণ্য নষ্ট হইয়াছে । অতএব আজকালও যে সমস্ত ধর্মদ্বারা আমাদের লোকস্থিতি রক্ষিত হয় না, তাহাদের পরিবর্তন আবশ্যক ; ইহাতে কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না । যখন কালস্রোতে বাধ্য হইরা, ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা করিতে হইতেছে, তখন

একটু ভাবিয়া-চিন্তিয়া ব্যবস্থাপূর্বক তাহা করা কি মঙ্গলজনক নহে ?

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এতক্ষণ, অন্তঃস্থ গিয়া পড়িয়াছিলাম, এখন আবার আমাদের ঐ পূর্ববিষয়কেই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক । বলা হইয়াছে—যেখানে স্মৃতি-বোধিত ধর্মের মূলভূত ক্রতিবচন না পাওয়া যায়, সেখানে ক্রতি আছে বলিয়া আমা-দিগকে অনুমান করিতে হইবে । কিন্তু এরূপ স্থানও আছে, যে স্থানে বেদ এক কথা বলেন ও স্মৃতি আর-এক বলেন, এ সকল স্থলে কি করা কর্তব্য । এরূপ ঘটনা দুর্লভ নহে । যথা—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে সদোনামক মণ্ডপের মধ্যে একটি উডুঘর-বৃক্ষের শাখা স্থাপন করিবার নিয়ম আছে । স্মৃতি বলিতেছেন, ঐ শাখাটিকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে—“ঔডুঘরী বেষ্টরিতব্য” ; কিন্তু বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ শাখাটিকে স্পর্শ করিয়া গান করিতে হইবে—“ঔডুঘরীঃ স্পৃষ্টা উদ্গারেৎ” । যদি উডুঘর-শাখাটিকে বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর তাহাকে স্পর্শ করা চলে “না” । অতএব বলিতে হইবে, স্মৃতি এস্থলে ক্রতিবিরুদ্ধ ব্যবস্থা দিয়াছেন । আরও, ক্রতি—

“জাতপুত্রঃ কৃককেশোঃগীন্ আদধীত ।”

পুত্র উৎপন্ন হইলে কেশ কৃক থাকিতে থাকিতেই অগ্নির আধান করিবে । স্মৃতি বলিতেছেন—

“অষ্টচদ্বারিংশবর্ষাণি বৈদ্রাক্ষর্যচরণম্”—

৪৮বৎসর বৈদ্যাত্যসার্থ ব্রহ্মচর্য্য করিবে । এই দুই বাক্যের বিরোধ দেখা যায় ; কেন না,

যদি স্মৃতি অনুসারে ৪৮বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করা যায়, তবে কখন দারপরিগ্রহ করিবে, কখন বা পুত্র উৎপন্ন হইবে ? আর এত বৎসর পর্য্যন্ত কেশ অপকাবস্থায় কৃক থাকিবে, তাহাও সম্ভব নহে । ‘এস্থানে ক্রতির সহিত স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে । আরও দেখিতে পাওয়া যায়, বেদে আছে—

“কীতরাজকোহতোজীয়ারঃ” ;

স্মৃতি তাঁহারই গৃহে ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন—

“অগ্নীষোমীয়ে সংহিতে যজমানস্ত গৃহে অপিতবান্ ।”

অতএব এতাদৃশ স্থলে কি করা উচিত, তাহা মহর্ষি জৈমিনি দুইটি সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন । প্রথম—

“বিরোধে জনপেকং স্তাৎ, অসতি হনুমান্ ।”

১ অ, ৩ পা, ৩ হ ।

স্মৃতির সহিত ক্রতির বিরোধ হইলে স্মৃতির অপেক্ষা করিবে না ; বিরোধ না থাকিলে সেই স্মৃতির দ্বারা ক্রতি অনুমান করিবে ।

ভাষ্যকার এই সূত্রের উপসংহারে বলিয়াছেন—

“তন্মাদ্রুতং ক্রতিবিরুদ্ধা স্মৃতিরপ্রামাণ্যমিতি ।”

জৈমিনির দ্বিতীয় সূত্র—

“হেতুদর্শনাচ্চ ।” ৩, ৪ হ ।

কেন ঐ স্মৃতির অপেক্ষা করিতে হইবে না, তাহার হেতু আছে ।

ঐ হেতু কিপ্রকার, তাহা ভাষ্যকার এইরূপে বলিয়াছেন—

“লোভাস্থবাস আদিংসমানা ঔদুঘরীং বেষ্টিবস্তঃ কেচিৎ, তৎ স্মৃতবীজম্ । বৃদ্ধকথাগাঃ কেচিৎ কীতরাজকস্য ভোজনমচাৰিতবস্তঃ । অপুংখঃ প্রচ্ছাদয়ন্ত্যষ্টচদ্বারিংশবর্ষাণি বৈদ্রাক্ষর্য্যং চরিতবস্তঃ । তত এবা স্মৃতিরিত্যবগম্যতে ।”

“ঐহুঘরী বেটয়িতব্য” ইত্যাদি স্মৃতির মূল শ্রুতি নহে, এখানে তাহার মূল অন্তঃকর্তকগুলি লোক লোভবশবর্তী হইয়া বস্ত্র লইতে ইচ্ছা করিয়া ঐহুঘরী শাখাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলেন; ইহা হইতেই ঐ স্মৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। বুভুক্ষু হইয়া কয়েকজন ক্রীতরাজকের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই

“অগ্নিবোমীয়ে সংহিতে”

প্রভৃতি পূর্বোক্ত স্মৃতিবচন উৎপন্ন। কারণ-বিশেষে কাহারও ৪৮বৎসর পর্য্যন্ত অপুংস্ব (ক্লৈব্য) উৎপন্ন হইয়াছিল, তিনি তাহাকে গোপনে রাখিতে, ঐ সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্যা করেন, তাহাতেই

“অষ্টচকারিশদ্বর্ষাপি বেদব্রহ্মচর্যচরণম্”

এই স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছে।

শবরস্বামী এই ভাষ্যের উপসংহারে বলিয়াছেন—

“উপপন্নতরকৈতদবৈদিকবচনকল্পনাৎ”—

এরূপ স্থলে বেদবচন অহুমান করা অপেক্ষা তাদৃশ সিদ্ধান্তই যুক্ততর। অতএব, বলা বাহুল্য, শবরস্বামীর মতে এতাদৃশ স্মৃতির কোন প্রামাণ্য নাই।

বার্ত্তিককার কুমারিলভট্ট ইহা সহ করিতে পারেন নাই। এসম্বন্ধে তাহার অভিপ্রায় এই—সত্য কথা, বেদে পূর্বোক্ত ঐহুঘরী শাখার স্পর্শ ও স্মৃতিতে তদ্বিরুদ্ধ সর্ববেষ্টন বিহিত হইয়াছে,—দুইটি এক সময়ে করিতে পারা যায় না, কিন্তু বেদের মধ্যেও আমরা কোন কোন স্থানে যুগপৎ অসম্পাদ্য কর্মের বিধান দেখিতে পাই, যথা—

“অতিরাত্রো ষোড়শিনঃ গৃহাতি, নাতিরাত্রো ষোড়শিনঃ (বজ্রীয়পাত্রবিশেষ) গৃহাতি।”

তার পর,

“ঐহুঘরী সর্কা বেটয়িতব্য”

এই স্মৃতির মূলভূত শ্রুতিবচন যে নাই, তাহা তোমাকে কে বলিল? সমস্ত বেদ অহুসন্ধান করিয়া দেখা তোমার-আমার মত লোকের সাধ্য নহে; বেদগ্রন্থ অতিবৃহৎ—

“সহস্রং সামশাখাঃ, একশতম্ অক্ষরূপাশাখাঃ, একবিংশতি-শাখা বহুচন্ম”—

সামবেদের সহস্র শাখা, যজুর্বেদের একশত ও ঋগ্বেদের একবিংশতি। এই সমস্ত বিবেচনা না করিয়া যদি সেই পূর্বোক্ত স্মৃতির মূলশ্রুতি নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত কর, ও তাহা দ্বারা ঐ স্মৃতির অপ্রামাণ্য ইচ্ছা কর, তাহা হইলে স্মৃতিত্বসামান্ত্রে সমস্ত স্মৃতিরই অপ্রামাণ্য তুমি ইচ্ছা কর না কেন? অতএব ঐ স্মৃতি অপ্রমাণ নহে, তবে বাবৎ তাহার মূলশ্রুতি না পাওয়া যায়, তৎকাল-পর্য্যন্ত সেই স্মৃতি অহুসারে অহুষ্ঠান করিবে না।

ইহা আলোচনা করিলে বোধ হয়, বার্ত্তিককার বস্ত্তত ঐ স্মৃতির অপ্রামাণ্য স্বীকার করিলেও কেবল নির্বন্ধাতিশয়-প্রযুক্ত হইয়া স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করেন নাই।

পূর্বে “হেতুদর্শনাচ্চ” এই ভৈমিনিসূত্র উদ্ধৃত করিয়া শবরস্বামী তাহার কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শবরস্বামী সে স্থানে (পৃথক্ অধিকরণ রচনা করিয়া) স্মৃতিসম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। তাহা এইরূপ—জ্যোতিষ্টোম-

বাগে অগ্নীবোমোর পত্তর তত্ত্ব প্রকাশ হইলে
'বৈসর্জন' নামক একটি হোমের বিধান
আছে। তাহাতে যজমান ও তাহার পত্নী,
পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে নুতন বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছা-
দিত করিয়া ঐ বস্ত্রের অন্তে অগ্নিদেবতা বাঁধিয়া
হোম করিতে হয়। সেই বস্ত্রসম্বন্ধে স্মৃতিতে
উক্ত হইরাছে—

“বৈসর্জনহোমীয় বাসোঽধ্বর্যুগৃহীতীতি।”—

বৈসর্জনহোমের বস্ত্রধারি অধ্বর্যু (যজ্ঞের
অন্ততম ঋষিকৃ) গ্রহণ করিবেন। এই
স্মৃতির প্রামাণ্য আছে কি না, এই বিচার
তুলিয়া ভাষ্যকার বলিষ্ঠছেন—সে স্মৃতি
অগ্রমাণ, এ স্মৃতির মূল শ্রুতি নহে,—

“অত্র অস্ত্রমূলং, লোভাভাচারিতবস্ত্রঃ কেচিৎ, তত
এবা স্মৃতিঃ।”

এ স্থানে তাহার মূল অস্ত্র, লোভে কেহ
ঐরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্মৃতি
হইরাছে।

আধুনিক লোকের মুখে যদি এই সমস্ত
কথা বাহির হইত, তাহা হইলে আমরা
তাহাকে কোনমতেই কমা করিতে পারি-
তাম না। কিন্তু শবরস্বামীর মুখে ইহা
বাহির হইয়াছে জানিয়া সকলকেই তাহা
শুদ্ধদরে, নির্বাক্বদনে ও অবনতমস্তকে
স্বীকার করিতে হইতেছে। কর্ণকাণ্ডের
অষ্টমোক্তানে শবরস্বামীকে অবজ্ঞা করিতে
পারেন, একরূপ ব্যক্তি অতি অল্পই আছেন।
শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাঋগণও ইহার বচন
উদ্ধৃত করিয়া নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রামাণ্য
দৃঢ়তর করিয়াছেন। অতএব যদি কেহ—

“ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রং নিকর্করমকটকম্।

ব্রহ্মণো তত্র বীজানি সা কৃষিঃ সর্বকামিণী।

বেদপূর্ণমুখং বিপ্রং হুভুক্তমপি ভোজয়েৎ।

ন তু মুখং নিরাহারং বড়রাজমুগবাসিনম্।”

ব্যাসসংহিতা ৪৩০, ৪৮ ও ৫২ শ্লোক।

[‘ব্রাহ্মণের মুখ নিকটক ও কাঁকরহীন ক্ষেত্র,
ইহাতে বীজ বপন করিলে (কৃষকের) কৃষি
সর্বকামনা পূর্ণ করে। বেদজ্ঞ বিপ্র ভাল-
রূপে আহার করিয়া থাকিলেও আহার
ভোজন করাইবে, কিন্তু যদি মুখ ব্যক্তি
অনাহারে ৬দিনও উপবাসে থাকে, তবুও
তাহাকে খাওয়াইবে না।’]

ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া, শবরস্বামীর
মতানুসারে, তাহাদিগকে কোন বুদ্ধি
ব্রাহ্মণের লোভমূলক বলিয়া নিশ্চয় করে,
তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ করা শক্ত।
এইরূপ—

“কাস্তনী কস্তনীভূতা চেৎ, তস্যাং ব্রাহ্মণায় হসংস্কৃতঃ
স্বাতীর্ণঃ শরনং নিবেদ্য, ভাখ্যাং মনোজ্ঞাং রূপবতীং
ঐদীপবতীং চ আপ্রোতি।”

“জ্যৈষ্ঠী জ্যৈষ্ঠভূতা চেৎ স্যাৎ, ছত্রোপানহপ্রদানেন
গবাধিপত্যং আপ্রোতি।”

বিকৃষ্টতি ১ অং, ২৫।১১ ইত্যাদি।

এই সমস্ত স্মৃতিবচনের যদি কেহ শবর-
স্বামীর দোহাই দিয়া ব্যাখ্যা করেন—
কাল্পনে নববসন্তসমাগমে বিলাসভোগের
জন্ত অকোমল অসংস্কৃত শয্যার প্রয়োজন,
দরিদ্র ব্রাহ্মণের তাহা হুল্লভ; একটি বচন
উদ্ধৃত হইল—যদি কেহ ঐ সময়ে ঐরূপ
শয্যা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করে, সে মনো-
হারিণী, রূপবতী ও ধনবতী ভাখ্যা পায়;
জ্যৈষ্ঠমাসের এটিও সূর্য্যের কিরণে নগচরণে
ও অনাবৃতমস্তকে ভ্রমণ করা অত্যন্ত
কষ্টকর; অতএব বচন রচিত হইল—
জ্যৈষ্ঠমাসে ব্রাহ্মণকে ছত্র ও পাঙ্ক দান

করিলে গবাধিপত্যলাভ হয় ; তাহা হইলে ঐ স্মৃতিবচনগুলির প্রামাণ্যরক্ষা শবরস্বামীর মতামুসারে অতি দুষ্কর ।

জৈমিনির “হেতুদর্শনাচ্চ” এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ভাষ্যকার শবরস্বামী স্মৃতিসম্বন্ধে নিজের যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ; বার্তিককার কুমারিলভট্ট তাহা ভাল বিবেচনা করেন নাই । তিনি এখানে অন্য বিচার আরম্ভ করিয়াছেন । তিনি বলেন—“হেতুদর্শনাচ্চ” এই সূত্রদ্বারা

“বৈসর্জনহোমীয় বাসোহধর্যুগ্ধ্রাতি”—

ইত্যাদি স্মৃতিবচনের লোভমূলকত্ব প্রদর্শিত হইতেছে না—এ স্থানে তাহা বিচার্য্য নহে । কিন্তু ঐ স্মৃতিমূলক বলিয়া পূর্বোক্তরূপে স্মৃতির প্রামাণ্য যেমন সাধিত হইয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধস্মৃতিও স্মৃতির অন্তর্গত হইতে পারে বলিয়া তাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয় । কিন্তু বস্তুত তাহা অভিপ্রেত নহে । এজন্য ঐ সূত্রদ্বারা বৌদ্ধস্মৃতির প্রামাণ্য নিরাস করা হইয়াছে । বেদমূলক বলিয়া স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়, কিন্তু বৌদ্ধস্মৃতি বেদমূলক নহে, স্পষ্টতই সেই স্মৃতিতে বেদের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায় ।

বার্তিককার যে ঐ সূত্রের এতাদৃশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে ঠিকই হইয়াছে, বলিতে হইবে । তাঁহার সময়ে বৈদিকধর্ম বৌদ্ধধর্মের দ্বারা অত্যন্ত প্রতিহত হইয়াছিল । বৌদ্ধদেরই সেই সময়ে অত্যন্ত প্রাধান্য হইয়া উঠিয়াছিল ; সর্ববিষয়ে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন । কুমারিলভট্ট বৌদ্ধ-

আচার্য্যের নিকটেই বিদ্যাশিক্ষা করেন । বৌদ্ধাচার্য্যের নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিলেও, পরে তিনি বৈদিকধর্মে অত্যন্ত অগ্ররক্ত হইয়া বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন । বৌদ্ধধর্মস্বংসে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ছিলেন । মাধবাচার্য্যাকৃত শঙ্করদ্বিখণ্ডের বাহারা পাঠ করিয়াছেন, এ সমস্ত তাঁহাদের অবদিত নহে । বৌদ্ধধর্মের বিনাশ ও বৈদিকধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্তই কুমারিলভট্টের জন্ম হয় বলিয়া ঐ গ্রন্থে বর্ণিত আছে । শঙ্করদ্বিখণ্ডকার লিখিয়াছেন, বৌদ্ধদের দ্বারা বৈদিকধর্মকে বিপর্য্যস্ত হইতে দেখিয়া, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত দেবগণের কেহ কেহ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হন । কুমারিলভট্ট তাঁহাদের মধ্যে কুমার—কার্ত্তিকের । কুমারিলভট্ট সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা শঙ্করদ্বিখণ্ডের নিম্নলিখিত একটি বচনই প্রকাশ করিতে পারিবে—

“কুমারিলসুগেজ্জেন হতেষু জিনহস্তিবু ।

নিম্প্রভাহমবদন্ত ঐতিশাখাঃ সমস্ততঃ ॥”

কুমারিলসিংহদ্বারা বৌদ্ধহস্তিগণ হত হইলে, ঐতিশাখাসমূহ চারিদিকে নির্বিঘ্নে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল ।

যাহাই হউক, বৌদ্ধগণের প্রতি কুমারিলভট্টের যে বিদ্বেষ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । অতএব ভাষ্যকার বৌদ্ধস্মৃতিসম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও, তিনি যে তাহার প্রামাণ্যনিরাকরণে প্রয়াসী হইবেন, তাহা স্বাভাবিক । বার্তিককার বৌদ্ধস্মৃতির প্রামাণ্য পূর্বোক্তরূপে নিরাস করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি পরেও এসম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বৌদ্ধ-

বিবেচ্য স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।
আমরা এ স্থানে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি—

“শিষ্টাংশকোপেহবিরুদ্ধমিতি চেৎ।” “ন শাস্ত্রপরি-
মাণত্বাৎ।” “অপি বা কারণাগ্রহণে প্রযুক্তানি
প্রতীয়েন্নন।”

১অ, ৩পা, ৫—৭।

এই তিনটি জৈমিনিশূত্রের অর্থ করিতে গিয়া
ভাষ্যকার আৰ্য্যস্মৃতিসম্বন্ধেই কয়েকটি কথা
বলিয়াছেন। তাহা এই—শ্রুতিতে উক্ত
হইয়াছে,—

“বেদং কৃৎস্না বেদিং করোতি”—

বেদ (কুশনির্দ্ভিত সম্ভার্কজী) করিয়া বেদি
(গার্হপত্য ও আহবনীয় এই দুই অগ্নির
মধ্যস্থিত চতুঃস্কুল খাতভূমি) করিবে। এই
বেদ ও বেদি প্রস্তুত করিবার মধ্যে যদি ক্ষুৎ
(হাঁচি) প্রভৃতি হয়, তাহা হইলে স্মৃতি
বলিতেছেন—

“আচামেন কর্তব্যম্”—

আচমন করিয়া পরবর্তী কাজ করিবে।
কিন্তু “বেদং কৃৎস্না বেদিং করোতি” এই
শ্রুতিতে বেদ ও বেদিনিষ্ঠাণরূপ উভয়
কর্মের আনন্তর্য্য প্রতীত হইতেছে; অর্থাৎ
বেদ করিয়া বেদিকেই করিবে। এই উভয়
ক্রিয়ার মধ্যে যদি আচমন করা যায়, তাহা
হইলে বেদ করিয়া বেদি করা হইল না।
অতএব এ স্থলে আচমনবিধায়ক ঐ স্মৃতি-
বচনটির প্রামাণ্য আছে কি না? ইহার
উত্তর এইরূপ—শ্রুতিতে যেসকল বেদ ও বেদি-
করণরূপ দুইটি পদার্থ বিহিত হইয়াছে,
আচমনও স্মৃতিদ্বারা সেইরূপ বিহিত পদার্থ।
বেদবেদির আনন্তর্য্যরূপ ক্রম ঐ পদার্থনিষ্ঠ
ধর্ম্ম। অপ্রধান কর্মের জন্য প্রধানভূত

আচমনরূপ পদার্থের বাধ হইতে পারে না।
অতএব ঐ স্মৃতি প্রমাণ।

‘ কুমারিলভট্ট এ স্থানে পুনর্বার বৌদ্ধ-
স্মৃতির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি
বলেন—

“ব্রহ্মচর্য্যম্, অহিংসাক্, অপরিগ্রহক্, সত্যক্ যত্নে
রক্ষণং”—

ইহা শ্রুতির কথা। আবার বৌদ্ধস্মৃতিও
ব্রহ্মচর্য্য-অহিংসাদি-পালনের জন্য বিধান
দিয়াছে। অতএব এতাদৃশ বৌদ্ধস্মৃতির
যখন বেদের সহিত কোন বিরোধ নাই,
তখন তাহার প্রামাণ্যস্বীকারে দোষ কি? এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া তিনি বলিয়াছেন—যেমন
গন্ধোদক (কেহ কেহ এ স্থানে গোক্ষীর
বলেন) পবিত্র হইলেও কুকুরচর্ম্মপুটকের
মধ্যে (বদৃতিস্থ) থাকিলে, তাহা অগ্রাহ্য,
সেইরূপ অহিংসাদি উপাদেয় হইলেও বৌদ্ধ-
স্মৃতিসংসর্গে তাহা অসুপাদেয়,—বৌদ্ধস্মৃতি
হইতে তাহাকে গ্রহণ করিবে না। বৌদ্ধ-
শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম কোন ফলসাধন করিতে
পারে, এরূপ প্রশ্ন পাওয়া যায় না।
পক্ষান্তরে, আমাদের যথেষ্ট প্রশ্ন আছে—

“বাধ্যমোহেখ্যেতব্যঃ,” “বেদোহখিলো ধর্ম্মমূলম্,
তদ্বিদ্যাক্ স্মৃতিশীলো,” “ধর্ম্মজসময়ঃ প্রমাণম্”... ইত্যাদি।

বার্ত্তিককারের এ কথাগুলি একটু অন্তত-
রকমের। এ স্থানে আমরা কয়েকটি মনুর
বচন উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা মনে
করিতেছি। মনুর সম্বন্ধে বেদে লিখিত
হইয়াছে—

“বদবৈ কি কন মনুরবৎ তদভেবজম্।”—

“প্রদধানঃ শুভাংশবিদ্যামাদদীতাবরাধি।

অভ্যাদপি পরং ধর্ম্মং জীরয়ৎ মুক্তলাদপি।

বিবাদপ্যমৃতং গ্রাহং বালাদপি হৃতাযিতম্ ।
অমিত্রাদপি সত্বৃত্তম্ অমেধাদপি কাকনম্ ॥
ত্রিরো রত্নাভ্যো বিদ্যা ধর্মঃ শৌচং হৃতাযিতম্ ।
বিবিধানি চ শিদ্ভানি সমাধেয়ানি সর্বতঃ ॥”

তনিতে পাই, বার্তিককার বৌদ্ধাচার্য হইতেই বিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে গুরু প্রতিবাদ করার পাপবোধে তুযানলে প্রাণত্যাগ করেন।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বোধ হয় ভাষ্যকার শবরস্বামী ধর্মমোমাংসের অপক-পাতী ও উদার ছিলেন; কর্তব্যজ্ঞানে তিনি কতকগুলি স্মৃতিবাক্যের স্পষ্টকথায় অপ্রামাণ্য দেখাইয়া-দিয়াছেন। বার্তিককার এ বিষয়ে ভাষ্যকারকে যেন ইচ্ছা করিয়াই অগ্রসরণ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ শবরস্বামীর মতগ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সে সময়ে অতি দুষ্কর হইয়াছিল। কেন না, তিনি তখন বৌদ্ধধর্মকে সমূলে উন্মূলিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় যদি কেহ তাঁহাকে তাঁহার স্বপক্ষস্থিত স্মৃতিগুলির দোষ প্রদর্শন করে, তবে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রভূত অন্তরায়। এজন্য তিনি পূর্বে, যে-কোন প্রকারে হউক, স্বপক্ষ সমর্থিত করিয়া বৌদ্ধ-ধর্মের মস্তকে মূদগরপাতে উদ্ভূত হইয়া-ছিলেন।

বেদ ও বেদাবিরুদ্ধ স্মৃতি প্রভৃতির ভ্রায় প্রাচীন সাধুশ্রীতিগণের আচারও আমাদের ধর্মোপদেশ প্রদান করে বলিয়া, ঐ সদ্‌আচারও আমাদের ধর্মশাস্ত্রস্বামীর। অতএব তৎ-সম্বন্ধে মীমাংসকগণের হইচারিটি কথা প্রকাশ করা এ স্থানে অপ্রাসঙ্গিক নহে।

বসন্তোৎসব প্রভৃতি কতকগুলি আচার

আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে, ইহাদের মূলস্বরূপ কোন ঋতি বা স্মৃতিবচন পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় ঐ আচারের কোন প্রামাণ্য আছে কি না, এই কথা উত্থাপন করিয়া বার্তিককার বলিয়াছেন যে, যদিও ঐ আচারের মূল ঋতি বা স্মৃতি না পাওয়া যায়, তথাপি তাহা বহুপূর্ব হইতে শিষ্টগণ-দ্বারা অমুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে; যদি তাহার অপ্রামাণ্য-আশঙ্কা থাকিত, তবে বেদজ্ঞ শিষ্টগণ তাহা অমুষ্ঠান করিতেন না। যদিও গ্রন্থবাহুল্যভয়ে মনু প্রভৃতি স্পষ্টতঃ ঐ উৎসবদির কথা উল্লেখ করেন নাই, তথাপি সামান্তরূপে বলিয়া গিয়াছেন—“ঋতিঃ, স্মৃতিঃ, সদ্‌আচারঃ”—ধর্ম প্রমাণ। এই হেতু অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। উক্ত হইয়াছে—

“বেদোহবিধৌ ধর্মমূলম্, তবিশাক স্মৃতিশীলৈঃ”
“ধর্মজ্ঞসময়ঃ প্রমাণং বেদাচ্চ ॥”

এইরূপে শিষ্টাচার ধর্ম প্রমাণ হইলেও সর্বত্র হইবে না। স্মৃতি যেমন বেদমূলক বলিয়া ধর্ম প্রমাণ, শিষ্টাচার সেরূপ নহে। বেদের সহিত বিরোধ হইলে যেমন স্মৃতির প্রামাণ্য নষ্ট হয়, সেইরূপ স্মৃতির সহিত শিষ্টাচারের বিরোধ থাকিলে শিষ্টাচারের প্রামাণ্য যায়। বেদের সহিত বিরোধে যে, সদ্‌আচার মোটেই টিকিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। স্মৃতির প্রামাণ্য স্থাপন করিতে হইলে যেমন ঋতির অমুমান করিতে হয়, সদ্‌আচারের প্রামাণ্যস্থাপনে সেইরূপ স্মৃতির অমুমান করিতে হয় এবং ঐ অমুমান স্মৃতির দ্বারা ঋতির অমুমান হইয়া থাকে। অতএব স্মৃতি ও সদ্‌আচারের মধ্যে বেদোপেক্ষায় স্মৃতির একান্তরিত ও সদ্‌আচারের ব্যস্তরিত

প্রামাণ্য ও তজ্জন্ত সন্নাচার অপেক্ষা স্মৃতির
প্রামাণ্য বেশী। বার্তিকে উক্ত হইরাছে—

“আচার্য্য তু স্মৃতিং জ্ঞাত্বা স্মৃতেচ্চ অতিকল্পনম্।

তেন দ্যস্তরিতং তেবাং প্রামাণ্যং বিপ্রকৃষ্যতে ॥”

অতএব যদি একরূপ স্থান উপস্থিত হয়,
বেধানে সন্নাচারের সহিত স্মৃতির বিরোধ
দেখা যায়, সে স্থানে তাদৃশ শিষ্টাচার
ত্যাগ করিতে হইবে; যথা—দাক্ষিণাত্যে
মাতুলকন্তাবিবাহ। দাক্ষিণাত্যে অনেকেই
পূর্বপরম্পরাক্রমে মাতুলকন্তাকে বিবাহ
করেন। ইহা শিষ্টাচারের মধ্যে পরিগণিত
বলিয়া তাঁহারা বলেন। কিন্তু তাহা
পরিভ্রাঙ্ক্য। কেন না, স্মৃতির সহিত তাহার
বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতি
বলিতেছেন—

“মাতুলস্য হত্যমৃত্যু মাতৃগোত্রাং তথৈব চ।

সমানপ্রবরাট্কেব ত্যক্ত্য চাত্মারণং চরেৎ ॥”*

আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়,
কোন কোন আচার সমগ্র ভারতে অহুষ্ঠিত
না হইরা প্রদেশবিশেষে অহুষ্ঠিত হয়;
যথা প্রাচ্যদেশে ‘হোলাক’ (১), দাক্ষিণাত্যে
‘আলীনৈবুক’ (২), উদীচ্যদেশে, উদ্বুক-
বজ (৩) + ও হারীতাদি স্মৃতি কোন কোন
স্থানে প্রচলিত। এখানে কথা হইতেছে,
হোলাকাদি উৎসব কেবল প্রাচ্যদেশবাসীই
করিবেন, কি অপরদেশবাসীও করিবেন?
দেখিতে পাওয়া যায়, গোত্রাহসারে
কেহ কেহ তিনটি বা পাঁচটি শিখা ধারণ

করেন। এইরূপ যখন দেখিতে পাওয়া
যাইতেছে, হোলাকাদি উৎসব প্রাচ্যাদি
দেশমাত্রেই প্রচলিত, তখন ঐ-দেশবাসীই
তাহার অহুষ্ঠান করিবেন, অপর দেশ
তাহা করিতে পারেন না। মীমাংসক-
গণ এখানে বলিতেছেন—হোলাকাদি
উৎসবের প্রামাণ্য স্মৃতিসিদ্ধ নহে;
ঐ উৎসবরূপ সন্নাচারের দ্বারা স্মৃতি ও
তাহার দ্বারা বেদের অহুমান করিয়া তবে
তাহাদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়, ইহা
পূর্বে উক্ত হইরাছে। বেদে সাধারণের
জন্ত ধর্ম উপদিষ্ট হইরাছে,—ব্যক্তিবিশেষ
বা দেশবিশেষবাসীর প্রতি নহে। অতএব
যাহার প্রামাণ্যে হোলাকাদি উৎসবের
প্রামাণ্য, সেই বেদ কখনও বলিতে পারেন
না, প্রাচ্যদেশবাসীই তাহা করিবেন, অন্ত-
দেশবাসী করিবেন না।

“পদার্থা: কর্তব্য ইতি হি প্রমাণমতি, ব্যবহারান্ত ন
কিঞ্চিৎ প্রামাণ্যম্”...

শাষরভাষ্য।

পদার্থ কর্তব্য, ইহার প্রমাণ আছে;
দেশভেদাদির ব্যবহার কোন প্রমাণ
নাই। গোত্রভেদে বিভিন্ন শিখাধারণের
ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,
অতএব তাহার কথা এখানে উঠিতে
পারে না। আরও, দেখিতে গেলে দেশ-
ব্যবস্থা সম্ভবই নহে। কারণ, কে প্রাচ্য, কে
প্রতীচ্য, তাহারই নির্ণয় হইতে পারে না।

* মাতুলকন্তার বিবাহ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা দাক্ষিণাত্যবাসিগণ স্বীকার করেন না। “তুভ্যাং জুহুমা তুলসোব
যোবা” ইত্যাদি বৈদিকমন্ত্রের কষ্টকরিত অর্থহারা ও ‘এদ্যম্’ প্রভৃতি শিষ্টব্যস্তির মাতুলকন্তার পরিণয়দৃষ্টান্ত
উল্লিখিত করিয়া মাতুলকন্তাবিবাহকে তাঁহারা সমর্থিত করিয়া থাকেন।

+ (১) হোলাক—বসন্তোৎসব; পশ্চিমের ‘হোলি’ এই ‘হোলাক’ হইতেই উৎপন্ন। (২) অলবুক—সম্রাট
করুণাকাদি-স্বায়রসেবতা-পুজার নাম আলীনৈবুক। (৩) জৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমার বলীবর্জগণকে পূজা করিয়া দোড়ান
হয়, ইহার নাম উদ্বুকবজ।

তত্ত্বদেশসংযোগে প্রাচ্যপ্রতীচ্যাদি আখ্যা হয় বলিতে হইবে। এখানে যদি কেহ দক্ষিণদেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব বা উত্তরদেশে আসিয়া বসতি করে, কিন্তু সে তবুও ‘আক্সোনবুক’ অমুষ্ঠান করিয়া থাকে ; উত্তরদেশ হইতে দেশান্তরে বাইলেও দেখা যায়, ঐ ব্যক্তি ‘উদ্ভবকবজ্র’ করে ; প্রতীচ্য প্রাচ্যদেশে আসিলে সে নিরমপূর্বক প্রাচ্য-ধর্মের অমুষ্ঠান করে না ।

এখানে বলা বাইতে পারে—দেশ-সংযোগে আখ্যা হয়, তুমি বলিয়াছ ; কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কেন না, দেখা যায়, মথুরা হইতে কোন ব্যক্তি দেশান্তরে গেলেও, লোকে তাহাকে ‘মাপুর’ বলিয়া থাকে,— যদিও সে সময়ে তাহার সহিত মথুরার সংযোগ নাই। ভাষ্যকার শবরস্বামী ইহার উত্তর দিয়াছেন—লোকের আখ্যা দেশ-সংযোগেই হয়, কিন্তু ঐ সংযোগ অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ হইতে পারে ; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়—যে মথুরা হইতে বহির্গত হইয়াছে (যাহার সহিত মথুরার সংযোগ অতীত হইয়াছে), সে ‘মাপুর’ ; যে মথুরায় রহিয়াছে (যাহার সহিত মথুরার সংযোগ বর্তমান) সে ‘মাপুর’ ; আবার যে ব্যক্তি মথুরাতিমুখে প্রস্থিত (যাহার সহিত মথুরার সংযোগ হইবে), সেও মাপুর। যাহার সহিত এই ত্রিবিধ সংযোগের অন্ততম নাই, তাহাকে কেহ ‘মাপুর’ বলে না ।

অতএব প্রাচ্যপ্রতীচ্যাদিতেই ধর্ম-ব্যবস্থা হইতে পারে না—ধর্ম সাধারণ। দেশভেদে ব্যবস্থাসম্বন্ধে আমরা শবরস্বামীর যে কয়টি কথা আলোচনা করিয়া দেখিলাম,

তাহাতে ঐ ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত নয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, স্মৃতিপুরাণাদিতে তাহা অমুমোদিত হইয়াছে। যথা—

“যেহু স্থানেহু যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারস্ত বাদৃশঃ ।

তত্র ভগ্নাবশস্তেত ধর্ম্মভ্যেব তাদৃশঃ ॥” মরীচিস্মৃতি ।

যে স্থানে যেরূপ শৌচ ও বাদৃশ ধর্ম্মাচার, সে স্থানে তাহাই ধর্ম্ম, তাহাকে অবজ্ঞা করিবে না।

এই সমস্ত বচন অবলম্বন করিয়া রঘুনন্দনাদি নব্য স্মৃতিনিবন্ধকারগণ অশৌচাদি বিবিধ বিধিকে ইহা কলিঙ্গদেশে, ইহা উৎকলে, ইত্যাদিরূপে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। যদি শবরস্বামীর কথা মানিতে হয়, তবে ইহাদের মোটেই প্রামাণ্য নাই, বলিতে হইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত মরীচিস্মৃতি প্রভৃতির সহিত মৌমাংসকগণের উক্তির সামঞ্জস্যরক্ষা করিতে পারা যায়। সম্ভবত শবরস্বামীর অভিপ্রায় এই—বেদে সাধারণের প্রতি ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, দেশবিশেষবাসী বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নহে। অতএব যখন বেদের দ্বারাই বসন্তোৎসবদির প্রামাণ্য রক্ষিত হইতেছে, তখন তাহাও সাধারণের অমুষ্ঠের। শবরস্বামী বৈদিক ও বৈদমূলক ধর্ম্মসম্বন্ধে ঐরূপ বিধান করিয়াছেন। মৌমাংসকগণের বেদই একমাত্র ধর্ম্মে প্রমাণ ; এইজন্য, যে-কোন-রূপে ইউক না কেন, ধর্ম্মরূপে অমুষ্ঠের কর্ম্মের মূলে বেদকে রাখিতেই হইবে ও তাহাতে তাহার সচেঁট হইয়াছেন। মরীচি প্রভৃতি স্মৃতি (পূর্বো-ল্লিখিত) লোকস্মৃতির অন্ত দেশকালাদি অনুসরণ করিয়া কর্তব্যের বিধান করিয়া-

ছেন। ইহারা সর্বত্র বেদের অঙ্গগমন করেন নাই। তাঁহারা যে স্থানে ও যে কালে যে রূপে অঙ্গকুল বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাই স্মৃতিযুক্ত বোধ হয়। কেন না, স্থান ও কাল বিশেষে বাহা উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্যত্র তাহা হয় না। স্মৃতিগ্রন্থে এই দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পরাশর স্মৃত্যুতকণ্ঠে বলিয়াছেন—

“অন্তে কৃতযুগে ধর্ম্মান্তোত্তরাং যাপরে পরে ।

অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারত : ॥” ইত্যাদি ।

এইরূপ—

“সমুদ্রযাত্রাবীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণঃ ।

ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহম'নীবিণঃ ॥”

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বোধ হয় পরবর্ত্তী ধর্ম্মব্যবস্থাকারগণ কেবল বেদ অঙ্গসংগ্ৰহ না করিয়া দেশকালাদির অঙ্গকুল-রূপে বেদাতিরিক্ত ধর্ম্মেরও ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। ইহা পূর্বে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। অতএব যদি স্মৃতিকারগণের বেদাতিরিক্ত ধর্ম্মগুলির কোন কোনটি আজকাল লোকস্বভিত্তির অঙ্গকুল বিবেচিত না হয়, তবে তাহার পরিবর্ত্তনে কোন দোষ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী ।

ত্রিবন্ধুর ।

৮

মহারাজা-বাহাহরের উপদেশ-অঙ্গসারে দেও-রান আমার জন্ত যতপ্রকার অস্থান-আয়োজনের কল্পনা করিয়া আমাকে অঙ্গ-গৃহীত করিয়াছেন, তন্মধ্যে উচ্চবর্ণের বালিকা-মহাবিড়্যালয়ে আমার অর্ভাধনার্থ যে আয়োজন হইয়াছে, তাহাই আমি বিশেষ অঙ্গগ্রহ বলিয়া মনে করি। উহা আমি কখন ভুলিতে পারিব না।

স্বর্ঘ্যোদয় হইবামাত্র আমি গৃহ হইতে বাজা করিলাম। কিন্তু বলিতে কি, আমার মনে মনে একটু আশঙ্কা ছিল;—না জানি, সেখানে গিয়া কি দেখিব। হয় ত এমন-কিছু

দেখিব, বাহা শুধু কঠোর গ্রাম্য-গুরুমহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দিবে; কিংবা এমন-কিছু দেখিব, বাহা অতীব নীরস, বিরক্তিকর ও ক্লান্তিজনক। পাছে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সেখানে উপনীত হই, এইজন্ত তালবনের মধ্যে ঘোড়াদের ছাড়িয়া রাখিয়াছিলাম। এই তালবনে,—প্রথমে একটি, তার পর দুইটি, পরে তিনটি ক্ষুদ্র বালিকা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল;—বেশ সুন্দরী, অমূল্য। বেশভূষার ভূষিত হইয়া যক্ষ্মক করিতেছে; দশবর্ষবয়স্কা, নগ্ন পদ, কেশকলাপে শাদা কুল;—পরিধানে জরির পাড়-দেওয়া রেশমি

শাড়ী; কণ্ঠ ও বাহ্যিক মণিমাণিক্য—নব ভাস্কর্য্যের উদ্ভাসিত। আমার ভ্রাতা উহার্য্য ও ব্রাহ্মণবৈদ্যের অভিমুখে চলিয়াছে। আমার পাড়ি দেখিয়া, উহার্য্য প্রাণপণে ক্রত চলিতে লাগিল; এবং চলিবার সময়ে, উহাদের মহাশয় বস্ত্রের অঞ্চলশ্রান্ত পায়ে জড়াইয়া বাইতে লাগিল....তবে কি উহাদের এই পরীক্ষিত কিংবা অপরাহ্মিত সাজসজ্জা আমারই অস্ত?...

এই সব ভারতীয় পরীবালিকাগুলি উহাদের বিজ্ঞালয়ে গিয়া সম্মিলিত হইল। বিজ্ঞালয় সহস্রা যেন কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, এখন উহাদের ছুটির সময়। কিন্তু তাপাশি উহার্য্য আমার জন্য একটি দিনের প্রাতঃকাল ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন একটা ফুলের তোড়া উপহার দিবার জন্য আমার নিকট আসিল। ফুলের তোড়াটি বেশ সুগন্ধ ও সুসজ্জিত; ফুলগুলি অরির তারে জড়িত।

যে শিক্ষা অস্বদেশে সর্বোচ্চেকাদ্বী অনর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই শিক্ষা অস্বদেশে বিস্তার করা মহারাজের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু যতদিন ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষত থাকিবে, ততদিন ধর্ম্ম সর্বোপরি বিরাজমান থাকিয়া মঙ্গল-কিরণ বর্ষণ করিবে, ততদিন ত্রিষকুরে কিছু-কালের জন্য শিক্ষা হইতে ততফলই প্রসূত হইবে, সন্দেহ নাই।

উচ্চকুলোদ্ভবা বালিকাদিগের এই মহা-বিজ্ঞালয়—বাহ্য্য অস্বদেশীয় বিজ্ঞালয়ের সমতুল্য, অথবা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই বিজ্ঞালয়টি মহারাজ আমাকে দেখাইবেন

মনে করিয়া, বাহাতে আমার চক্ষে ইহা একটি চুলভদর্শন দ্রষ্টব্যজিনিষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তজ্জন্ত তিনি বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন; বালিকাগণের অভিভাবকদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যেন বয়োদোষ্ঠাদিগের গুরুভার অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া উহাদিগকে বিজ্ঞালয়ে পাঠান হয়। তাই, মন্দিরের দেবীগণ যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করেন, সেইরূপ সুগঠিত মণিমাণিক্যের পুরাতন অলঙ্কারগুলি এই সকল তরুণ বাহাতে—তরুণ কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া বিক্মিক করিতেছিল।

এই বিজ্ঞালয়ের পড়িবার ঘরগুলি আমাদের যুরোপীয় ইন্স্টিটিউটের পড়িবার ঘরের ভায়;—স্বল্প-উপকরণ ও মুক্ত-পরিসর। শুধু কতকগুলি বড়-বড় মানচিত্র শাদা দেয়ালের গায়ে ঝুলিতেছে। কচি-কচি মেয়েগুলি হইতে, বয়স্ক বালিকা পর্য্যন্ত—এই সমস্ত অপূর্ণ ছাত্রীবৃন্দ—আমার চক্ষে কতকগুলি পুতুল বলিয়া মনে হইল। কচি মেয়েগুলির ড্যাবা-ড্যাবা চোখের বিক্ষারিত তারা চারিদিকে ঘুরিতেছিল। শাড়ী ও অরির ঢোলী—এই ছয়ের মধ্যবর্তী স্থানে, উহাদের তাত্রাভ নগ্নগাত্র দেখা যাইতেছিল। বড়-বড় বালিকাগুলির মাথার উপরিভাগে “ভর্জিন্”-ধরণে ফিতা বাঁধা, তাহার উপর ভারতীয় শাদা মলমলের অবগুষ্ঠনবস্ত্র। যে বয়সে বালিকারা স্বীয় শরীরকে দেবালয়-বৎ সযত্নে রক্ষা করিতে প্রথম আরম্ভ করে—সেই বয়সের বালিকাদিগের দৃষ্টিতে যে উদ্বেগ ও গাভীর্য্যের ভাব লক্ষিত হয়, এই বালিকাদিগের মুখে ইহারি মধ্যে সেই ভাব

পরিব্যক্ত।...উহাদের প্রবন্ধরচনা, উহাদের ঐতিহাসিক রচনা আমাকে দেখাইল। ঐ ক্ষুদ্র দেবীগুলি যে-সব স্থলরূপে আঁকিয়াছে, তাহাও আমাকে দেখাইল। যে-সব আদর্শ আমাদের শিশুরা নকল করে—যুরোপ হইতে আনীত সেই-সব আদর্শচিত্র দেখিয়াই এই ছবিগুলি আঁকা। এই সব চিত্ররচনার নীচে উহাদের নাম লেখা। নামগুলি কতিপয়-পদাঙ্ক-বিলিষ্ট—গানের কলির ভ্রায় অতীব সুশ্রাব্য।

ছয়শত-বৎসর-বয়স্কা একটি বালিকা, একটা “ঈগল্”-পক্ষীর ছবি আঁকিয়াছে—উহার পালকরাশি অতীব জটিল; পাখীটা বৃক্ষশাখার বসিয়া আছে। বেশ বুঝা যাইতেছে, বালিকা মাপ-জোক না করিয়াই, মধ্যস্থল হইতে আঁকিতে আরম্ভ করে। সমস্ত মাথাটা কুলায়—কাগজের একরূপ উচ্চতা ছিল না; তাই, ঈগলের মাথাটা চ্যাপ্টা করিয়া আঁকিয়াছে—কাগজপ্রান্তের এক-বারে গা-বেঁধিয়া আঁকিয়াছে; কিন্তু তবুও একটি পালক বাদ দেয় নি,—একটি খুঁটি-নাটি বাদ দেয় নি। ছবির নীচে,

বেশ হৃৎপটরূপে—জোর-কলমে—নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়াছে—“অন্দরা”।

জরির কাজ-করা মৃৎমল; বাস্পবৎ স্বচ্ছ অবগুষ্ঠন; হীরা, মাণিক, স্বচ্ছ-পায়া; সরু-সরু ক্ষুদ্র বাহুতে বড়-বড় বালা সূতা দিয়া আবদ্ধ; হুস্ত্রাপ্য পুরাতন পোটুগী-মুদ্রায় প্রথিত কর্তৃহার;—যে সময়ে গোয়ার সমৃদ্ধ অবস্থা,—এই মুদ্রাগুলি সেইসময়কার;—চন্দনকাঠের ‘সিন্দুকের’ মধ্যে না জানি কত শতাব্দী ধরিয়া ঘুমাইয়া ছিল।

সর্বশেষ গান, বহু বেহালায় সমবেত-বাঁদ, তাহার পর নৃত্য। নৃত্য অতীব জটিল ও বিলম্বিত—একটু ধর্মভাবাবিহিত; তালে-তালে পা পড়িতেছে, বাহুসঞ্চালনে, মণি-মাণিক্য বিক্মিক করিয়া উঠিতেছে।...

এই বিভাগের ছাত্রীরা বেশ সুন্দর-সুশ্রী; সচরাচর একরূপ দৃষ্ট দেখা যায় না। আর, উহাদের কি সুন্দর চোখ!—একরূপ চোখ একমাত্র ভারতবর্ষেই দেখা যায়। অহো! রহস্তের এই কুসুমকলিকাগুলি কি-এক অপূর্ণ অতীতের অকলুষ সৌন্দর্যের ছবি আমার মনে অঙ্কিত করিয়া দিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবজীবনের আদর্শ।

[পূর্বানুবৃত্তি ।]

প্রাচীন ধর্মসাহিত্যে প্রায়ই নবজীবন বলিতে এ জীবন, বিষয় ও ইন্দ্রিয় লইয়া, এই স্বাভাবিক জীবনের অতীত, এই ‘সে জীবন’ বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অতীত। এ জীবনের বিরোধী একটা স্বল্পবিস্তর অতি-জীবন সংসারের প্রয়োজনানোহনা দ্বারা প্রাকৃত আদর্শকেই নির্দেশ করিয়া থাকে। পরিচালিত, সে জীবন সর্বপ্রকারের সংসার-

সম্পর্কবর্জিত। সে জীবন পাইতে হইলে, এ জীবনকে ধর্ম করিতে হইবে। প্রাণপণ সাধন করিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়সম্পর্ক-বিমুক্ত করিতে হইবে। বহিরিন্দ্রিয়কে বহিঃবিষয় হইতে, মনকে বহিরিন্দ্রিয় হইতে, বুদ্ধিকে মন হইতে, আত্মাকে বুদ্ধি হইতে প্রত্যাহার করিয়া, ক্রমে অন্তরময়, প্রাণময়, মনোময় প্রভৃতি পঞ্চকোষ ভেদ করিতে হইবে এবং এইরূপে সর্বপ্রকারের বহিঃসম্বন্ধ-বর্জিত শুদ্ধ আত্মরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইবে। প্রাচীন তন্ত্রে সাধারণত ইহাই নবজীবনের অর্থ ও আদর্শ ছিল।

সংসার ও পরমার্থের মধ্যে একটা আত্যন্তিক বিরোধ কল্পনা করিয়াই প্রাচীন ধর্মসকল নবজীবনের এই নিরতিশয়-সংসারবিমুক্ত আদর্শের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। সংসার যদি পরমার্থবিরোধী হইল, তবে পরমার্থসাধন করিতে গেলে সংসারকে তো বর্জন করিতেই হইবে। আর সংসার ও পরমার্থের মধ্যে এই বিরোধ সর্বত্রই নিগুণব্রহ্মবাদ হইতে উৎপন্ন হয়। হিন্দু, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান, সকল ধর্মতন্ত্রেই নিগুণ-ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সংসার ও পরমার্থের মধ্যে এই বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহারই ফলস্বরূপ নবজীবনের এই নিতাস্তসংসারবিমুক্ত আদর্শও সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। আবার, কি আমাদের দেশে, কি অন্তর্জ, সর্বত্রই সগুণব্রহ্মবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মজীবনের উচ্চতম আদর্শও সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সংসারাত্মকে আসিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

নিগুণব্রহ্মবাদ ব্রহ্মকে, সত্তামাত্র

প্রতিষ্ঠিত করে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংসারকে মিথ্যা বলিয়া বর্জন করিয়া থাকে। নিগুণব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের অতীত, আমাদের ধারণার অতীত, আমাদের বাক্যময় সকলেরই অতীত। নিগুণের ভাবনা নাই, নিগুণের ভজনা নাই, নিগুণে প্রেমভক্তি কিছুই প্রকৃতপক্ষে সম্ভবে না। অতীতি ক্রবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে— তাহার কেবল সত্তামাত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু উপলব্ধি কদাপি সম্ভব নহে। নিগুণব্রহ্ম শুদ্ধ প্রজ্ঞালভ্য। সমাধিতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। আর সর্বপ্রকারের বহিঃসম্পর্ক ও বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত না হইলে সমাধির সৃচনাই হয় না। সমাধিতে জ্ঞাতা নাই, জ্ঞেয় নাই, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ নাই; তখন কে কাহাকে কাহার দ্বারা দেখে, কে কাহাকে কাহার দ্বারা শোনে,— স্বপ্নবিরহিত গভীর নিদ্রার ত্রায় সে অবস্থা। এই সমাধি যখন অধ্যাত্মজীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতারূপে গৃহীত হয়, তখন ধর্মজীবনের আদর্শ যে নিতাস্ত অন্তর্মুখীন ও সংসার-বিমুক্ত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

কিন্তু সগুণব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইলে ধর্মজীবনের আদর্শ আর পূর্বেকার মত নিতাস্ত সংসারবিমুক্ত থাকিতে পারে না। সংসার তখন মায়াক্কর হইলেও ব্রহ্মতেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মকে জানিতে হইলে সংসারকে জানা তখন আবশ্যক হইয়া উঠে; কারণ সংসার ব্রহ্মেরই প্রকাশ ও অভিব্যক্তি।

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমবধং গ্রাহরব্যয়ম্ ।

হৃদ্যাসি যন্ত পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥

উর্দ্ধ বাহার মূল, অথ বাহার শাখা, বেদসকল বাহার পত্র, বাহাকে অব্যয় অর্থক বলা হইয়া থাকে, তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ । ”

কিন্তু প্রথম-প্রথম সগুণ-নিগুণের মধ্যে যেমন, সংসার ও পরমার্থের মধ্যেও সেইরূপ স্বভাবতই একটা গোঁজামিল দিবার চেষ্টা দেখা যায়। সগুণকে তখন নিগুণের নিম্ন অবস্থা, সংসারকে পরমার্থের নিম্নসোপানরূপে গ্রহণ করা হয়। ব্রহ্ম নিগুণ, এই নিগুণব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু। তবে এই নিত্যস্ত নিগুণের দ্বারা গুণময়ী সৃষ্টির কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় না বলিয়া, সেই নিগুণ হইতেই মায়াপ্রভাবে হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর প্রভৃতি সগুণ তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়া জড়চেতনময় বিশ্বের একটা বধাবধ কারণ নির্দেশ করিতে হয়, না করিলে এই অগতের উৎপত্তিস্থিতিরাদির উপযুক্ত সীমাংসা হইয়া উঠে না। নিগুণের ভজনসাধন নাই, মায়োপহিত সগুণ ঈশ্বরাদির ভজনসাধন সম্ভব। কিন্তু সগুণ ঈশ্বরাদিকে অতিক্রম না করিলে মুক্তিলাভও হইতে পারে না। সেইরূপ সংসার ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বটে, তথাপি ইহাকে অতিক্রম না করিলে পরমপুরুষার্থলাভ হয় না।

ন রূপমস্তেহ তথোপলভ্যতে
নাস্তো নচাধিন ৫ সম্ভাতি ।

অর্থমেনং হুবিক্রমূল-
মসঙ্গশ্রেণ দৃঢ়েন হিষা ॥

ভূতঃ পদং তৎ পরিমার্গিতবাং
বসিন্ গতা ন নিবর্ততি ভূয়ঃ ।

ভবেব চাভ্যং পুরুষং প্রপদ্যে

বৃত্তঃ প্রবৃত্তিঃ প্রমত্তা পুরাণী ।

এই সংসারবৃত্তের স্বরূপ ইহলোকে কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহার অন্তও নাই, আদিও নাই, অথচ ইহার স্থির প্রতিষ্ঠাও নাই। নিরাতশরবন্ধমূল এই সংসাররূপ অর্থকে অনাসক্তিরূপ সুদৃঢ় অন্তরায় ছেদন করিয়া, তদনন্তর, ‘বাহা হইতে এই চিবুস্তনী সংসারপ্রবৃত্তি প্রসূত হইয়াছে, সেই আদিপুরুষকে আশ্রয় করি’ এই বলিয়া সেই স্থান অধিবেশ করিবে, যেখানে গিয়া আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

এখানেও সংসারবিমুক্ত ভাবই প্রবল রহিয়াছে, তবে ব্রহ্মে সংসারের একটা সত্য ও অনাস্তনন্ত মূল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র।

এই সগুণব্রহ্মতত্ত্ব যখন ক্রমে পরিপূর্ণ ভগবন্তত্বে কুটিয়া উঠে, তখনই প্রকৃতপক্ষে ধর্মজীবনের উচ্চতম আদর্শ পূর্বেকার একান্ত অন্তর্মুখীনতা ও সংসারবিমুক্ততা পরিত্যাগ করিয়া, ইহজীবনের জ্ঞান-ভোগাদির উপরেই সহজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করে।

নবজীবনের এই আধুনিক আদর্শ, মূলত ও বস্তুত শ্রেষ্ঠতম ভগবন্তত্বেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত।

ভগবান্ পূর্ণপুরুষ; তিনি নিত্যস্ত নিগুণও নহেন, নিত্যস্ত সগুণও নহেন, সগুণ ও নিগুণ তাঁহার দুই ভিন্ন দিক মাত্র। ব্রহ্মভাব ও পরমাত্মভাব, উভয়ই তাঁহার মধ্যে বিস্তারিত রহিয়াছে, উভয়কে ধারণ করিয়া তিনি পূর্ণপুরুষরূপে বিরাজ করিতেছেন।

বদন্তি তৎ তদ্বিগতং বহুজ্ঞানমবয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দভেদে ।

তদ্বিরিদ্বেদা যে অদ্বয় জ্ঞানবস্তুরূপে তৎ

বলিয়া থাকেন, তাহাকেই উপনিষদ ব্রহ্মনামে, যোগিগণ পরমাত্মনামে এবং ভক্তেরা ভগবান্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও ব্রহ্ম, কোথাও পরমাত্মা, আর কোথাও বা ভগবান্ নামে সেই অখণ্ড অমরবস্তুই অভিহিত হন বলিয়া নামভেদে যে তাঁহার স্বরূপধারণাসম্বন্ধে কোন বিভিন্নতা আছে না, তাহাও নহে। ব্রহ্ম বলিতে শুদ্ধ জগৎকারণকেই বুঝাইয়া থাকে। সেই অমরজ্ঞান বিশ্বের মধ্যে জন্মস্থিতিভঙ্গহেতুরূপে যতটা প্রকাশিত হন, তাহাই ব্রহ্মশব্দবাচ্য। “জন্মান্নাস্ত যতঃ”—জগতের জন্ম-আদি যাঁহা হইতে; “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি”—যাঁহা হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা স্থিতি করে, প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি ভূতসকল গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাহাই ব্রহ্ম। এক কথায় বলিতে গেলে, তটস্থলক্ষণের দ্বারা যতটুকু পরমতত্ত্ব জানিতে পারা যায়, ততটুকুই বিশেষভাবে ব্রহ্মশব্দবাচ্য। জগৎচিন্তা দ্বারা ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ জানিতে পারি, আত্মচিন্তা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি। আত্মার মধ্যে, আত্মার রূপে তাঁহাকে স্বরূপত দেখিতে পাই। এই আত্মাতেই নিগূণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকি। কারণ আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ব্যাপার, আমাদের প্রত্যেক বিষয়জ্ঞান, আমাদের প্রত্যেক রসসম্ভোগ, আমাদের প্রত্যেক আধার্মবোধ অন্তরস্থিত এই নিগূণ সাক্ষি-চৈতন্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হয়।

জীবনের প্রত্যেক ক্ষণস্থায়ী অভিজ্ঞতার মূলে এই নিত্যচৈতন্য বিরাজ করিতেছেন। মনের জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে এই নিত্যজ্ঞান লুক্কায়িত থাকিয়া, উভয়কেই প্রকাশ করিতেছেন। বুদ্ধির বিচারের মূলেও এই নিত্যজ্ঞান বিরাজিত। আপনি সর্বপ্রকার বিচারের অতীত থাকিয়া জীবনের দৈনন্দিন বিচারের সাক্ষ্য তিনিই দিতেছেন। আপনি সর্ববিধ পরিবর্তনের অতীত থাকিয়া সকল পরিবর্তনের সাক্ষ্য তিনিই দিতেছেন। নদীগর্ভে প্রোধিত সূদীর্ঘ বংশধন্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যেমন নদীজলের হ্রাসবৃদ্ধি জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এই সাক্ষি-চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা বালক বা বালিকা, যুবক বা যুবতী, প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা, রূগ্ন বা সুস্থ, সুখী বা দুঃখী, ধনী বা নির্ধন ছিলাম, এ সকল কথা বলিতে পারি। সকল অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে সর্বদা যে “আমি আমি” বলি, তাহা কেবল এই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ সাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মবস্তু এই আমার সঙ্গে একাত্মভাবে সর্বদা বিরাজ করিতেছেন বলিয়া। নতুবা কে “আমি আমি” ও “আমার আমার” বলিয়া জীবনের একমুহূর্ত্তব করিতে পারিত? জীবচৈতন্যের মূলে, মনবুদ্ধি-অহঙ্কারাদির অবিরাম চাকুলোর মধ্যে, নির্কাত-নিকম্প দীপশিখার দ্বারা অহর্নিশ যে সাক্ষিচৈতন্য জলিতেছেন, তাহাই পরমাত্মা। মনবুদ্ধি-অহঙ্কারাদি হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিয়া এই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয়।

কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব যেমন পরমতত্ত্বের একাংশ-

মাত্র ব্যক্তি করে, পরমাত্মতত্ত্বও সেইরূপ অপর্যাংশমাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্রহ্মতত্ত্ব অজ্ঞের তত্ত্ব—কেবল সত্তামাত্রজ্ঞের। পরমাত্মতত্ত্ব নিঃশূণ্যতত্ত্ব, শুদ্ধ আত্মসাক্ষাৎকার-লভ্য। ওখানে কারণরূপে তত্ত্ববস্তুর জ্ঞানিলাম, কিন্তু স্বরূপ জ্ঞানিলাম না। এখানে স্বরূপ জ্ঞানিলাম বটে, কিন্তু এই বিপুল বিশ্ব তাঁহার বাহিরে পড়িয়া রহিল। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র বিবর্তনে যে আত্মতৃত্ব শক্তি, অচিন্ত্য জ্ঞান, অপূর্ণ আনন্দ ও অক্লান্ত কল্যাণ অবিরাম ফুটিত হইতেছে, ইহার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে, জানিতে, তাঁহাকে সম্বোগ ও তাঁহার পরিচর্যা করিতে পারিলাম না। ব্রহ্মরূপে তাঁহাকে জানিয়া শাস্ত ও নির্মলচিত্ত হইলাম বটে, কিন্তু তাঁহার আনন্দ আশ্বাদন করিলাম না; পরমাত্মরূপ তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইয়া চিদানন্দমাত্র লাভ করিলাম, কিন্তু তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য ও বিচিত্রলীলা দেখিতে ও আশ্বাদন করিতে পাইলাম না।

ভগবদ্রূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলেই তাঁহার এই অনন্ত ঐশ্বর্য ও এই বিচিত্রলীলা জানিতে ও সম্বোগ করিতে পারা যায়। ভগবত্তত্ত্ব পূর্ণতত্ত্ব। ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার একাংশ-মাত্র, পরমাত্মতত্ত্বও তাঁহার অপর্যাংশমাত্র। ব্রহ্ম বহির্ভগবৎ, পরমাত্মা অন্তররাজ্যে, পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন। ভগবানে উভয়ে সম্মিলিত হন। কারণ, একদিকে ভগবান্ সকল ঐশ্বর্য, সকল জ্ঞান, সকল মহিমা, সকল মাধুর্যের আধার বলিয়া বিশ্বের ঐশ্বর্য, অচিন্ত্য জ্ঞান, অত্যন্ত মহিমা ও বিচিত্র সৌন্দর্য্য তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া

তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। অন্য-দিকে তিনিই পরমাত্মরূপে, অন্তর্ভাবিকরূপে, জীবের অন্তর্নিহিত সাক্ষিচৈতন্যরূপে, তাঁহার জ্ঞান, ভাব, চেষ্টা, সমুদায়কে ধারণ করিয়া, সমুদায়ের প্রেরয়িতা ও ফলদাতা হইয়া, তাঁহার সমগ্র অন্তর্জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। আবার লীলাময়রূপে তিনিই হস্তাত্মকরূপেরোদ্ভূত প্রভৃতি অশ্রেষ্ঠ ও শাস্ত্রদাত্তসম্বাৎসল্যমধুর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রসের আধার ও প্রতিষ্ঠারূপে প্রকাশিত হইতেছেন। যে পরমপুরুষে সকল জ্ঞান, সকল রস, সকল চেষ্টা পরিপূর্ণতা ও সফলতা প্রাপ্ত হয়, শুদ্ধ সত্তামাত্রজ্ঞের আংশিক ব্রহ্মতত্ত্ব বা শুদ্ধ আত্মসাক্ষাৎকারলভ্য নিঃশূণ্য পরমাত্ম-তত্ত্বকে তাঁহার অঙ্গ-আভা ও অংশবিত্তি বলা হইয়াছে, ইহা আর বিচিত্র কি?

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।

উপনিষদ কহে তুমি ব্রহ্ম হুনির্মল।

আত্মাত্ত্বধামি ধীরে যোগশাস্ত্রে কর।

সেই ভগবানের অংশবিত্তি যে হয়।

অনন্ত ক্ষটিকে বৈছে এক-মুখ্য ভাসে।

তৈছে জীব ভগবানের অংশ প্রকাশে।

এই ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলেই ধর্ম-জীবনের আদর্শ আপনার পূর্বতন সংসার-বিমুক্ততা বর্জন করিয়া ইহজীবনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান-শক্তি-সৌন্দর্য্য-কল্যাণাদি-সাধনে নিযুক্ত হয়। কারণ ইষ্টদেবতা তখন সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্ঘ্য, বশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আধার ও প্রতিষ্ঠারূপেই প্রকাশিত হন এবং তখন ইহজীবনের বিভাসম্পৎশক্তিসৌন্দর্য্য প্রভৃতিকে বর্জন বা খর্ব্ব করিয়া নহে, কিন্তু এ সকলের যথাযোগ্য বিকাশসম্পাদনের দ্বারাই মানবধর্ম সফলতা প্রাপ্ত হয়।

ভগবত্ত্ব যেমন সংগঠনশীল প্রাচীন বিরোধ ভঞ্জন করিয়া উভয়কে আপনায় অঙ্গীভূত করিয়া লয়, সেইরূপ সংসার এবং পরমার্থের প্রাচীন বিরোধেরও মীমাংসা করিয়া, সংসারেই পরমার্থের ও পরমার্থেই সংসারের প্রতিষ্ঠা এবং পরম্পরের সাহায্যে উভয়েরই পরিপূর্ণতা সম্পাদন করিয়া থাকে ।

ভগবান্ ভক্তিরই উপজীব্য ; এবং সংসার ব্যতীত প্রকৃত ভক্তিসাধন কদ্যপি সম্ভব হয় না । ভগবান্কে নিখিলরসায়তমূর্তিরূপে সন্তোষ করাই ভক্তির চরম লক্ষ্য । হাত্তাহুতকরুণরোদ্ভ প্রভৃতি রসের মধ্যে তাঁহার রস আশ্বাদন করা, দাস্তসখ্য-বাৎসল্য প্রভৃতি সখ্যের মধ্যে তাঁহার ভজনা করা ভক্তির চির-আকাজকা । সংসারেই এ সকল রস ও এ সকল সখ্যের প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠা হয় । ইন্দ্রিয়সকলকে সতেজ না করিলে, মনোবৃত্তিসকলকে সজীব ও সচেত না করিলে, বিষয়জ্ঞান বিকশিত না করিলে, নরনারীর সঙ্গে জনসমাজের ও পরিবারের বিবিধ-সখ্যে আবদ্ধ না হইলে, হাত্তাহুতকরুণরোদ্ভ প্রভৃতি অশ্রেষ্ঠ এবং শাস্তদাস্তসখ্যবাৎসল্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রস, কিছুই কদ্যপি আশ্বাদন করিতে পারা যায় না । জড় ও জীব, এই বিচিত্র নিসর্গ ও এই বিচিত্রতর মানবসংসার, সকলই এই সমুদয় রসের আধার ও প্রত্যক্ষমূর্তি । এই জড় ও জীবের আধারেই কেবল সত্যভাবে বিবিধ রস আশ্বাদন ও সাধন করিতে পারা যায় । সুতরাং এই জড় ও জীব,—এবং জড় অপেক্ষা অনন্ত-

কোটিগুণে শ্রেষ্ঠভাবে এই জীব, ধর্মসাধনের সহায় ও ভগবত্ত্বজনের বিগ্রহরূপে তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে ।

কলত আমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবত্ত্বজন, উভয়ই মানবীয় জ্ঞান ও মানবীয় সম্বন্ধাদির দ্বারা সম্ভব হইয়া থাকে । আপনায় আত্মার মধ্যে, তাহার অন্তরহিত সাক্ষিচৈতন্যরূপেই সাধক সত্যভাবে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন । মানবচৈত-
ন্যের মধ্যেই ব্রহ্মচৈতন্য,—মানবজ্ঞানের মধ্যে তাহার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠারূপেই ব্রহ্মজ্ঞান জীবের নিকটে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে । তাহার আত্মশক্তির মধ্যেই প্রত্যক্ষরূপে জীব ব্রহ্মশক্তির স্বরূপজ্ঞান লাভ করে । আত্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানলাভের, আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত অপরোক ব্রহ্মানু-
ভূতির উপায়ান্তর নাই । সেইরূপ মানবপ্রেম ব্যতীত ভগবৎপ্রেমের অন্ত প্রকাশ ও আধার কিছুই নাই । যখন আমরা—

পিতা নোহসি পিতা নো বোধি নমস্তেহং—

তুমি আমাদের পিতা, পিতার জ্ঞান-দান কর, তোমাকে নমস্কার,—এই বলিয়া ভগবচ্চরণে প্রণত হই, তখন আমাদের প্রত্যক্ষ পিতৃস্নেহের মধ্যে, সেই স্নেহের জ্ঞান ও স্মৃতির সাহায্যেই, ঈশ্বরের পিতৃত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি । সংসারে যে পিতৃস্নেহ সন্তোষ করে নাই, তাহার পক্ষে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সোধোদন ও ভজনা করা, বন্ধ্যার পুত্রস্নেহের অভিনয়ের দ্বারা অলীক, অসার, শূন্যগর্ভা বাত্মরী কল্পনা মাত্র । আর সম্ভাবনরূপে পিতৃস্নেহের যে অভিজ্ঞতা লাভ করি, তাহাও পরোক অভিজ্ঞতামাত্র ।

সন্তান কদাপি পিতৃস্নেহের স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। বখন স্বয়ং বয়ঃপ্রাপ্তি-সহকারে সে আপনি পিতা হইয়া সন্তানকে কোড়ে ধারণ করে, তখনই পিতৃস্নেহ স্বরূপত যে কি বস্তু, তাঁহা সে বুঝিতে আরম্ভ করে। এইজন্য আপনার পিতৃস্নেহ মধ্যে ঈশ্বরের পিতৃস্ব প্রত্যক্ষ করিয়া জীব বখন তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে, এবং জগতের সমুদায় স্নেহশীল কল্যাণকামী পিতৃমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার নিখিলপিতৃস্ব প্রত্যক্ষ করে, তখনই ঈশ্বরের পিতৃস্ব প্রকৃত-গুণে যে কি বস্তু, তাঁহা বুঝিতে পারে। এইরূপে মাতা হইয়া তাঁহার মাতৃস্ব, সখা হইয়া তাঁহার সখিস্ব, প্রেমিক পতি হইয়া বা প্রেমময়ী সাধবী সতীর রূপেই তাঁহার মাধুর্য্য প্রত্যক্ষভাবে অমুতব ও আনন্দন করিতে হয়। এ সকল মানবীর সম্বন্ধ ব্যতীত, দাত্তসখ্যাবৎসল্যাদি শ্রেষ্ঠরসের মধ্যে ভগবানকে রসামৃতমূর্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিবার ও তাঁহাকে ভজনা করিবার, অন্য কোন উপায় নাই।

ভগবানের স্বরূপপ্রকাশ মানবের আত্মাতে,—তাঁহার শ্রেষ্ঠপ্রকৃতি জীবের মধ্যে। তাঁহার বিতৃতির প্রকাশ জড়চেতনময় এই বিশ্বে। তাঁহার লীলার প্রকাশ মানবসমাজের বিচিত্র সম্বন্ধসকলের, মধ্যে। ধর্মসাধনে জড় এবং মানব হৃদের কিছুকেই অবজ্ঞা করিলে চলিবে না।

অবজানন্তি মাং যুগ্মা মাছুবীকৃতমুমান্তিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।

মাছুবী তম্মু আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া, যুগ্ম লোকেরাই, ভূতমহেশ্বর যে আমি, আমার পরমতাব না জানিতে পারিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

ভগবানের এই মাছুবতাব ধারণা করিতে পারিলে ধর্মজীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শে আর প্রাচীন অতিপ্রাকৃত ভাব ও সংসারবিশুদ্ধতা স্থান পাইতে পারে না। সর্বপ্রকারে সমুদায়সাধন ও শ্রেষ্ঠতম ধর্মসাধন তখন একগর্যায়ভুক্ত হইয়া যায়। কারণ, জীবের মধ্যে শিবস্বপ্রতিষ্ঠাই ধর্মের চরম লক্ষ্য।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

উপাধিব্যাধি।

ভারতবর্ষে নানাপ্রকার ব্যাধির বহুকাল হইতে সঞ্চার হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে উপাধি একটি প্রধান ব্যাধি। এই ব্যাধিটির বহু উপসর্গ, আবার ইহা সংক্রামকও বটে এবং বংশপরম্পরায়ত্ত দোষেও দৃষ্ট।

হুয়ারোগ্য উপাধিব্যাধি যতই প্রবলতা লাভ করে, ধনীকে তত অধিকমাত্রায় লঘু করিয়া তোলে। তখন ইন্দ্রনাথবাবুর সেই অভিনব পঞ্জিকার উপাধিলোমুগ্ন ব্যক্তির সহিত “তুলারশির” তুলনা সত্যই বলিয়া মনে হয়।

দেশে যিনি গরীবের মা-বাপ ছিলেন, যথার্থ দেশের জন্ত যাহার প্রাণ কঁাদিত, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সকল জাতির নিকট যাহার প্রকৃত রাজোচিত সম্মান ছিল, আলালত-কৌশলদারী যাহার মুখের কথায় মীমাংসা হইয়া যাইত, যাহার গৃহ দরজের মুষ্টিভিক্ষার জন্ত অব্যাহত থাকিত, রাস্তা দিয়া যাতায়াত-কালে যিনি ছহাভের সেলাম পাইতেন—আলীকাদ পাইতেন, উপাধির দরবারকরে রাজধানীতে বাস করিয়া তাঁহার, বংশধরকে আজ লোকসম্মান প্রাপ্তির পরিবর্তে সাহেবকে সম্মান করিতে, প্যারদাকে প্রতিমস্কার দিতে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে—দরিদ্র প্রজা ও অতিথির প্রাপ্য রাজধানীর বহুব্যয়সাধ্য ভোজে ব্যয় করিতে হইতেছে। আজ তাঁহার তদ্রাসন দীপহীন, দেবারতন শ্রীভ্রষ্ট, অতিথি-শালা জনশূন্য; উৎসব ও আনন্দের দিনে যেখানে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া মনে হইত, সেই উৎসবমণ্ডপ-নাট্যমন্দির আজ পোড়ো-বাড়ীর মত হতশ্রী। বিজয়ার পর যে বৈঠকখানায় প্রীতি-আলিঙ্গনের আগ্রহাতিশয্যে আনন্দ উছলিয়া উঠিত, আজ সেই বৈঠকখানা বন্ধ! একএকটি শ্রদ্ধাব্যাপার বা বিবাহোৎসবে যাহার বাড়ীতে যজ্ঞকাণ্ড উপস্থিত হইত, দেশের সমস্ত লোকের আহ্বান পড়িত, সমস্ত সামাজিক দেহ আনন্দের স্পন্দন অল্পভব করিত, আজ রাজধানীর বিলাস-ভোগের মধ্যে তাঁহার সেই স্নানাম গুটি-কতক ইয়ারবজুর নিমজ্জণবিনময়ের মধ্যে সচ্ছিত। যাহার পিতৃপুরুষ দেবতাপ্রতিষ্ঠা, ঠাকুরসেবা এবং বহুবিধ দীর্ঘিকা-ধনন

দ্বারা প্রজাসাধারণের উপকার করিয়া গুণ্য-সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আজ সহরের কলের জলের জন্ত, নাগরিকনাট্যালা-স্থাপনের জন্ত, ইংরাজ রাজপুরুষবিশেষের স্মরণার্থ পাথরের পিণ্ডদানকার্যের জন্ত কত রকম-বেরকম চাঁদার খাতায় সহি দিয়া ধুত হইতে হইতেছে। অথচ সেই খাতায় মুক্তহস্তে অঙ্কপাত, করিয়াও তিনি শক্তিতনেত্র বারংবার নিজের ভাগ্যবিধাতার জায় রাজপুরুষের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন।

উপাধি-জিনিষটা আমাদের দেশে সকল সময়েই ছিল—হিন্দু-মুসলমান-আমলেও উপাধিদানপ্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের সময়ে উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্তকালে বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপের পরিচায়ক ও সাহিত্যাদিবিষয়ের দক্ষতাবাচক উপাধিদানের ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে। মুসলমান সম্রাট-গণ দেশের প্রকৃত রাজাদিগকে রাজযোগ্য উপাধিদানে ক্রটি করিতেন না। আজকাল-কার ভূমিশূন্য ভূমিপাল—রাজ্যশূন্য রাজা, রাজা-বাছাহর, মহারাজা, মহারাজা-বাছাহর তখনকার সময়ে দেখা যাইত না। মুসলমানের করমান পাইবার জন্ত মোগলরাজ-ধানী পর্য্যন্ত যাইয়া দরবার করা বিদ্যুত ভারতবর্ষের অনেক ধনবানেরও সামর্থ্যে কুলাইত না। আর ইংরেজ রাজা যেমন রাজকর্তব্যগুলি উপাধিলোপদের অর্থে সারিয়া লইতে সচেষ্ট, মোগলপাঠানদের সে ভাব—সে দৃষ্টিমাত্রই ছিল না, রাজকার্য্য রাজাই করিতেন। ইংরেজ সদাগর-রাজা এদেশে আসিয়া যখন মোগলসম্রাট হইতে

দেওয়ানি লইয়া পরে মোগলসম্রাটের বংশ-ধরকে কোজদারীসোপর্দ করিয়া-দিয়া রাজ্য-ভার গ্রহণ করিলেন, তখন উপাধিদান-কার্যটা স্বতই তাঁহাদের হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিবাহাদুর তখন উপাধির দানসাগর করিতে বসিলেন, পাত্রাপাত্রভেদ নাই,—নকরের পুত্র রাজা হইল, মনিবের পুত্র নকর হইলেন। যে কমিশরিয়টের মদের পিপাস ভার পাইয়া টাকা অর্জন করিল, ইংরেজ সদাগর-রান্না তাহাকে “রাজা” উপাধি দিলেন—ইংরেজ-সেফাইদের জন্ত রান্না করিয়া-দিয়া নীচজাতীয় লোক উচ্চ উপাধি পাইল। নিজসম্পত্তি বা প্রজার শত্রুক্ষেত্র রক্ষা করিতে যাইয়া উচ্চশ্রেণীর ভাগ্যবান পুরুষ অধম হইয়া পড়িলেন। সাহেবদের মনস্তি করিতে যাইয়া কেহ কেহ, সাহেবগণ যাহাদের দ্বারে কৃপাপ্রার্থী ছিলেন, তাঁহাদের মাথার উপর আসন গাইলেন। ইংরেজ রাজপুরুষের অপকীর্তিকাহিনী প্রচার করিতেছেন বলিয়া যাহাকে সন্দেহ করা হইল, তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া তাঁহার বধসাধনান্তে অনেকে ইংরেজের শ্রীতি উপাদান করিলেন এবং প্রভুপ্রসাদে গ্রামের মোড়ল হইয়া বসিলেন। এই ত গেল মধ্যযুগের কথা। তার পর ভারতবর্ষের শাসনভার ১৮৫৮ সালে সদাগরদের হস্ত হইতে স্বয়ং মহারাজী গ্রহণ করিলেন, এই সময় হইতে বৎসরে দুইবার উপাধিপ্রদানের ব্যবস্থা হইল—বর্ষা এবং শীত ঋতুতে উপাধির লিপি বাহির হইতে লাগিল। সেই ব্যবস্থা এখনও চলিয়া আসিতেছে। বর্ষাকাল যদি-চ বৎসরে একবারই উপস্থিত হইয়া

থাকে, উপাধিবর্ষা কিন্তু বৎসরে দুইবার ঘটে। এই দুইবারই কত লোককে যে আকাশপানে তাকাইয়া থাকিতে হয়, ইংরেজ-দেবতার নিকট কত মানত করিতে হয়, ইংরেজপুরোহিতের দ্বারা কত ইংরেজী বাগ-যজ্ঞ করাইতে হয়, ভুক্তভোগী ভিন্ন সেই অসাধ্যসাধনের তত্ত্ব অপরে কে বুঝিবে?

একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত* লেখকের আজও স্মরণ আছে। একবার পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণের উপলক্ষে আমাকে কোন ইংরেজহাকিমের আতিথ্যগ্রহণ করিতে হয়। একদিন প্রাতঃরাশের পর আমরা দুইজনে কটো তুলিবার ইচ্ছায় বাহির হইব, বেশপরি-বর্তনের জন্ত নিজের কামরায় প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলাম, সাহেবের আদালির সঙ্গে কে যেন বাহিরে কথোপকথন করিতেছে, —লোকটি সাহেবের দেখা পাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আদালি সেই ব্যক্তির নামালঙ্কৃত তাসখণ্ড হস্তে লইয়া একটু মিঠেকড়া ভাবায় এই সময়ে সাহেবের নিকট যাওয়ার অক্ষমতা বুঝাইবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল। লোকটি যত বাধা পাইতেছে, ততই ব্যগ্রভাবে পেরাদাকে “বাপধন” প্রভৃতি ভাবায় তোষামোদ করিয়া, এমন কি হাতে কিছু দিয়াও, তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু পেরাদা কিছুতেই সন্তুষ্ট না হইয়া, ক্রমশঃ স্তর চড়াইয়া সাহেবের সঙ্গে দেখার সে সময় নহে, ইহাই বুঝাইতে লাগিল এবং বুধবার ১০টার সময় সাহেব বখন সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া থাকেন, সেইদিন তাহাকে আসিতে উপদেশ দিল। লোকটি কাতরভাবে বুঝাইতেছিল—

বুধবার বড় ভিড়, এত জনতার মধ্যে তাহার কথা সাহেবকে বুঝাইয়া বলিবার সুবিধা হইবে না, আর তাহার বড় দরকারী কাজ, না বলিলে নয়, বড় জরুরী কাজ। পেয়াদাটা যেন আরও পাইয়া বসিল। বলিল—জরুরী হটক আর নাই হটক, এখন সাহেবকে সে কিছুতেই এই ‘তাস’ দিতে পারিবে না। ভাঙা হিন্দী এবং আলাপের ধরণেই বোঝা গেল, ব্যগ্র ব্যক্তিটি বঙ্গসন্তান। এমনসময় সাহেব প্রস্তুত হইয়া আমার সন্ধান করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে বারান্দার আসিয়া দেখি, একটি বাট-বছরের বৃদ্ধ বাঙালী স্থলকারাটি চোগা-চাপকানের দ্বারা বধাসাধ্য ঢাকিয়া সামলা-মাথায় দণ্ডায়মান। সাহেবকে দেখিয়া তিনি লম্বাচণ্ডা সেলাম ঠুকিলেন। সাহেব প্রতি-নমস্কার পর্যন্ত ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কিহে would-be রায়বাহাদুর, তুমি মন স্থির করিয়াছ ?” ভদ্রলোকটি জোড়-হাতে বলিলেন—“হুকুমের হুকুম পালন করিতে এ অধম সর্বদা প্রস্তুত, তবে এত অধিকমাত্রার হুকুমটি অধীনের উপর অসাধ্য ভারের মত চাপিয়াছে।” সাহেব বলিলেন, “বেশ, যখন ভার সহিতে পারিবে, তখন রায়বাহাদুরী পাইবে।” এই বলিয়াই, টম্‌টম্‌ প্রস্তুত ছিল, সাহেব রওনা হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধমাসুখটি পিছনে পিছনে ছুটিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া আমাদের সন্নিহিত হইতে অশক্ত হইলেন এবং ক্যালক্যুল করিয়া ছুটন্ত টম্‌টমের পানে তাকাইয়া রহিলেন। সাহেব আমাদের বলিলেন, ইনি একজন ধনবান ব্যক্তি। পূর্বে উকিল ছিলেন, নকেল

ঠকাইয়া জমিদারী নিলামে উঠাইয়া স্বয়ং সত্তাদরে কিনিয়া বেশ অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন। সহরের অনেকগুলি বাড়ীই ইঁহার, এমন কি, সাহেব তাঁহারই ভাড়াটিয়া। কুর্কশে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছেন, তবুও অভাব হয় নাই, সংকর্ষের জন্ত ইঁহার নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা সাহেবের ইচ্ছা। নগরের টাউনহলটি তাঁহারই প্রদত্ত ত্রিশহাজার টাকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে লোকটি উপাধির জন্ত বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। সাহেবের পূর্ববর্তী হাকিম সুপারিস করিয়া গিয়াছিলেন, সে আজ আটবৎসরের কথা। এবার এই সাহেবের অভিপ্রায় জানিবার জন্ত কর্তৃপক্ষের চিঠি আসিয়াছে, এ ব্যক্তিকে “রায়-বাহাদুর” উপাধি দেওয়ার পক্ষে তাঁহার মত কি ? সাহেব সময় বুঝিয়া তাঁহার নিকট সাহেবদের ক্লাবের জন্ত একটা বিলিয়ার্ড-টেবিল চাহিয়া বসিয়াছেন ; টেবিলটি পাইলে আর তাঁহার জন্ত সুপারিস করিতে কোন আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু লোকটা বড় কঙ্কস,—কিছুতেই টাকার মাত্রা ছাড়িতে পারে না,—৬হাজার টাকা দিতে কষ্টবোধ করিয়া কেমন খতমত করিতেছে। শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। ইংরেজের ক্লাবে বিলিয়ার্ড-টেবিলের দরকার,—যে ক্লাবে শুধু বাঙালী কেন, কোন দেশীয় লোকেরই প্রবেশাধিকার নাই, এমন কি সাহেবের বিশেষ অমুরোধেও যে ক্লাবে যাইতে আমি দ্বিধা বোধ করিয়াছি, সেই ক্লাবের জন্ত একটি বাঙালির নিকট হইতে ৬হাজার টাকা আদায় করিতে সাহেবের লজ্জা

হওয়া দূরের কথা, বরং একটা স্পর্শকার ভাবই প্রকাশ পাইতেছিল। আমি তাঁহাকে এই কথা বুঝাইতে গেলে তিনি উত্তরে বলিলেন, “যে ব্যক্তি অকার্য্যে অর্থ-ব্যয় করিতে পারে, পিতৃশ্রদ্ধে অর্থব্যয়ের ভয়ে হিঁচুয়ানি ছাড়িয়া উপধর্ম্মের দোহাই দিয়া অর্থরক্ষা করিয়াছে, ইংরেজরাজার নিকট উপাধিপ্রাপ্তির জন্ত বহু অর্থ ব্যয় করিতে কাতর হয় নাই, একটি ইংরেজ-রূপে ৬হাজার মিলে সে ব্যক্তির পক্ষে অর্থের বরং একটা সার্থকতা হয়। পিতৃশ্রদ্ধ করিতে গেলে ইহাকে অন্তত আরও দশগুণ অর্থ ব্যয় করিতে হইত।” আমি নিজেকে ধিকার দিয়া এই প্রসঙ্গের আলাপ বন্ধ করিলাম, কিন্তু বিধিবিড়ম্বনায় আমাকে আর এক নূতন বিপদে পড়িতে হইল। জানি না, কি উপায়ে সেই উপাধিপাগলা বৃদ্ধটি আমার খবর পান, আর আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত অতিমাত্রায় বিনয়পূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান। আমি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত টাউনহলের পুস্তকাগারে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে শ্রীকার করিলাম। যথাসময়ে তাঁহার দেখা পাইলাম। আমাকে লইয়া তিনি সাধারণ পুস্তকাগারের হলে গিয়া প্রথমত ভিত্তিগাঞ্জে সংবদ্ধ প্রস্তরফলকে তাঁহার দানকাণ্ডবিবৃতিখানি দেখাইলেন— সাহেবদের সঙ্গে একত্র তাঁহার ফটো তোলা হইয়াছে, তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন—৩০বৎসর কাল সেই স্থানে আছেন, কত সাহেবস্ববা তাঁহাকে কত-প্রকারে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহার

কুন্টিনামা আওড়াইলেন, ছোটলাটগণের মধ্যে কাহাকে ম্যাজিস্ট্রেট অবস্থায় ব্যবসায়-ঘটিত ব্যাপারে জ্ঞান করিয়াছিলেন, কোন ছোটলাট Belvedereএ তাঁহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন—ইত্যাদি নানা প্রকার প্রসঙ্গের বাহাছরীষায় রায়বাহাদুরীর পূরীভাস দিতে লাগিলেন। তৎপরে যখন পুস্তকাগারপরিদর্শনের ইচ্ছা-প্রকাশ করিলাম, তখন সেখানে যাইবার দরকার নাই বলিয়া আগ্রহসহকারে তিনি নিবেদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন—এখানে কোন ভাল কেতাব বা কাগজ রাখা হয় না, আর যে সকল খবরের কাগজ লওয়া হয়, তাহাও সাহেবদেরই ব্যবহারে সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়া থাকে, ৩৪দিন পরে দেশের লোকেরা প্রসাদ পান। এইজন্ত তিনি মাসিক ২৮টাকা চাঁদা দেওয়া অর্থের অপব্যবহার, এমন কি, পাপ মনে করিয়া বন্ধ করিয়াছেন, সেই অবধি সে কামরায় পদধূলি পর্যন্ত দেন নাই। লোকটি দান্তিকতার সহিত বলিলেন—“কি বলেন মশায়, আমরা পরসাদ দেব, আর কাগজ পড়বেন ওঁরা।”—তার পর শুনিলাম, দুকথাই সত্য। তিনি মাসে মাসে চাঁদা দিতেন না,—এজন্ত ডের বাকীর দায়ে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সাহেবেরা নিজেদের কাগজ লওয়া বন্ধ করিয়া-দিয়া এখানকার কাগজ লইয়া যান, এজন্ত দেশীয় অনেক শিক্ষিতব্যক্তি পুস্তকাগারের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। গুটিকতক খোসামুদে লোক—তাঁহার মধ্যে অশিক্ষিত ধনীর সংখ্যাই অধিক, চাঁদা দিয়া কাগজ জোগাইতেছে। তাহাদের লাভ কমিটির

অধিবেশনের সময় সাংহেবকে সেলাম দিতে পারে ও এক কুরছিতে বসিবার অধিকার পায়।

রায়বাহাদুর-উপাধির জন্য তাঁহার এত অধিক আগ্রহ কেন; প্রসঙ্গক্রমে যখন এ-প্রশ্ন উঠিল, তখন বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“আমার বাড়ী অসুখ স্থানে—সেখানে আমাদের শত্রুপক্ষ একজন রায়-বাহাদুর হইয়াছেন, তাঁর বাহাদুরীতে আমরা সবংশে নীচ হইয়া আছি। তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, রায়বাহাদুর না হইলে দেশে আর মুখ দেখাইব না। এমন কি, গৃহিণীর এত মনোহুংস বে; রায়বাহাদুরপত্নী না হইলে তিনি দেশের নামটি পর্য্যন্ত শুনিতে ইচ্ছা করেন না। প্রতিপক্ষ ব্যক্তিটি গবর্নমেন্টের চাকুরী করিয়া “রায়বাহাদুর” হইয়াছেন, তাঁহাকে টাকাখরচ করিতে হয় নাই। মাত্র ৮০০ টাকা নজর দিয়া খেলাৎ গইয়াছেন। আমার কিন্তু টাউনহলনির্মাণের জন্য ৩০ হাজার টাকা এবং ছোট-বড় নান্না কার্যে আরও তিনহাজার টাকা দিয়াও অব্যাহতি হইল না।”

উপাধিলোলুপতা আমাদের দেশে বৃদ্ধি পাইবার একমাত্র কারণ দশজনের কাছে বেশ বশ ও সম্মানসম্বলভ্যের আশা। কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহার বিপরীত। মনে করুন, একজন টাকার জোরে রাজা হইলেন। গবর্নমেন্ট “রাজা” উপাধি সর্বত্রই ব্যক্তিগতভাবে জীবনশাকাল পর্য্যন্ত দান করেন। কাজেই বংশধরেরা “বে তিমিরে” “সেই তিমিরে” ই পড়িয়া থাকেন। যিনি রাজা হইলেন, তাঁহার পত্নী “রানী” হইলেন

না; ব্যাকরণশাস্ত্রে এরূপ প্রথা অসিদ্ধ হইলেও, ইহা আধুনিক-রাজব্যবহার-সম্মত বটে। “রাজা”র পুত্র স্বয়ং ‘কুমার’ নাম ব্যবহার করিতে পারেন বটে, কিন্তু সরকার-বাহাদুর তাঁহাকে “বাবু” নামেই অভিহিত করিবেন। লাভের মধ্যে এই হয় যে, এই রাজাগিরি রাধিতে বাইরা পরাভুতরূপে বাড়িয়া উঠে, এবং তাহাতে উপাধিধারীকে একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। একটি অসংলগ্ন রাজচিহ্ন,—কম্বিত coat of arms গাড়িতে রাধিতে হইবে। একটা রোপ্যানিস্মিত ছোট্ট সহ চোবদার কোছবাল্লো না বলিলে রাজার গাড়ি বলিয়া লোকে সম্মান না-ও করিতে পারে। ঘোড়ার ওঠে-পৃষ্ঠে-লগাটে কম্বিত রাজচিহ্ন না হইলে মানাইবে না। এই সকল কম্বিত উপায়ে নিজসম্মান রক্ষা করিতে রাজাটির প্রাণ ওঠাগত হইয়া পড়ে। ছোটলাটের উদ্ভান-সন্নিগনীর শোভার্ব ইহাদের উপস্থিতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু লাট বা ছোটলাট তাঁহাদিগকে চিনিবেন না। একদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম—একজন “রাজা” ছোটলাটের উদ্ভানসন্নিগনীতে = কোন রাজপুরুষের নিকট হইতে প্রতিনিয়ম্ভার আদায়ের লোভে সেলাম ঠুকিবার জন্য আশেপাশে ঘুরিতেছিলেন। সাহেবটি একজন সেক্রেটারী, সঙ্গে মের ছিলেন; কিন্তু রাজাটি যত অগ্রসর হইতেছেন, সাহেবটি বেন তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, এইভাবে ততই চলিয়া বাইতেছেন। রাজা নাছোড়বন্দা, আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না; সম্মুখে বাইরা হাতখানি

বাড়াইরা দিলেন বটে, কিন্তু সাহেব "good morning Raja, how do you do?" বলিয়া চলিয়া গেলেন। যেমতি রাজার বিচিত্র বেশত্বা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "who is this living cushion?" সাহেবের উত্তর শুনিতে আর কুচি হইল না—আমি সরিয়া পড়িলাম। ভাবিতে লাগিলাম, এই সকল লোক কি গণ্ডার-চর্মে নিষিদ্ধ। লোকটি ৫০।৫৫ বৎসরবয়স্ক, মাথায় সন্মার পাগড়ী, গলায় মতির মালা, বক্ষে একটি হীরকের নক্ষত্র, কলে তাহার দলগুলি ঘুরিতেছিল। গায়ে বড়-বড় পুষ্প-পল্লবে চিজিত করাঙ্গী সাটিনবস্ত্রের চোগা। এমন কোতুলোদীপক হস্তরসাত্মক সজ্জা লইয়া রাজানাম ফলাইবার দরকার কি?

এদিকে মহারাজা-মহারাজাবাহাদুরগণকে আত্মসন্মান রক্ষা করিতে বাইরা যে কতরকমে নাকাল হইতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। 'মহারাজা' বা 'মহারাজা-বাহাদুর' হইএকটি বংশ ব্যতীত বাড়লার সর্বত্রই ব্যক্তিগত উপাধি। কিন্তু সন্মান আদায় করিবার বেলায় দেখা যায়, ভারতীয় স্বাধীন-নৃপতিবৃন্দের প্রাপ্য সন্মান ইহারা অকুণ্ঠিত-ভাবে প্রত্যাশা করিয়া থাকেন এবং তাহা না পাইলে ক্ষুব্ধ হন; এমন কি, কাহারও নিকট হইতে সে সন্মান আদায় করিতে না পারিলে তাঁহার সহিত বিবাদ পর্গাত্ত করিতে প্রস্তুত হন। হুইএকটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, যথা—His Highness এই হুইটি কথা (H. H.) তাঁহাদের অনেকেই নিজের নামের উপর ব্যবহার করিতে লাগারিত। কিন্তু গব-র্মেণ্ট হইতে তাহা পাইবার কোন উপায়

নাই। কারণ, এই সন্মান শুধু ১১তম প্রাপ্ত স্বাধীননৃপতিগণেরই লভ্য, ইহার ন্যূন ভোপের স্বাধীন রাজাদেরও ইহা প্রাপ্য নহে।* অথচ H. H. the Maharaja Bahadur স্বার্থায়েকী খবরের কাগজের সংবাদদাতা ও সম্পাদকবিশেষের নিকট প্রাপ্ত হইয়া আমাদের জমিদারমহারাজগণ ইহা সর্বত্র আদায় করিতে ব্যগ্র। অপ্রাপ্য বিষয়ে আকাজকা বালকদের পক্ষে মার্কিনীয় হইতে পারে, কিন্তু প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের পক্ষে এই লোভ অতি কুৎসিত দেখায়। তাঁহারা কি এই কথাটি মনে করিতে পারেন না, গবর্মেণ্ট হইতে তাঁহারা যে উপাধি সংগ্রহ করিয়াছেন বা পাইয়াছেন, সেই গবর্মেণ্ট যে ভাবে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে অনিচ্ছুক, দেশের লোক হইতে তাঁহারা তাহা কোন্ মুখে প্রত্যাশা করেন? সেদিন একটি মার্কিণদেশীয় ফটোগ্রাফার আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত। তিনি দেশীয় রাজাদের একখানি সচিত্র জীবনী প্রকাশ করিবেন। তালিকার দেখিতে পাইলাম, উপাধিপ্রাপ্ত রাজা ও মহারাজাদের নামের সংখ্যা অতিরিক্ত। আমি তাঁহাকে এ কথা বলাতে লোকটি অনারাসে বলিয়া ফেলিল, "মহাশয়, নামের পাশে কোন্ রাজা কত-গুলি কেতাব লইতেছেন, তাহা দেখিয়া আমাকে উপদেশ দিবেন।" তখন দেখিলাম, বখাৰ্শ রাজারা যেখনে ২৫খানার জন্ত সহি দিয়াছেন, জমিদাররাজারা সেই স্থলে ২৫১০০, এমন কি ৫০খানারও অধিক পুস্তক ক্রয় করিতে প্রতিক্ষিত হইয়াছেন। মার্কিণবিশিষ্টালা হাসিয়া বলিলেন, "Good for trade,

is not it ?” আমি বিদায়কালে তাঁহাকে বলিলাম, “একুপ পুস্তক ক্রয় করিবার আমা-
দের দরকার নাই ।” সেও ক্র কুক্ষিত করিয়া উত্তর দিল, “কিন্তু তোমার প্রতিবাসীরা তাহাদের নিজেকের দরকার তোমা অপেক্ষা অধিক জানে ।” এই পুস্তক অবশ্য প্রকাশিত হইবে, আর কল্পিত-H. H.-উপাধিভূষিত জমিদার রাজা-মহারাজাগণের মোসাহেবেরা ছবিওয়ালার স্তুখ্যাতি করিয়া প্রভুমনোরঞ্জে নিযুক্ত হইবেন ।

এদিকে ইহাদের অনেকেই দেশের কার্যে সাহায্যদানের প্রয়োজন হইলে একে-
বারে বুদ্ধমুষ্টি হইয়া-পড়েন । রাজপুরুষদের অল্পরোধে কোন গ্রন্থকারের অনাবশ্যক পুস্তক ক্রয় করিতে হয় ত তাঁহারা সহস্রসহস্র মুদ্রা দান করিতেছেন, কিন্তু যদি কোন সংকার্যের জন্ত অর্থসাহায্য চাহিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া যায়, তবে ইংরেজদের নাম সেই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট না দেখিলে সাহায্য-
দান করিতে তাঁহাদের ভয় হয় ; এমনও দেখা গিয়াছে, গোপনে লোক নিযুক্ত করিয়া জানিতে চেষ্টা পান—কোন কার্যে অর্থ-
সাহায্য দিলে সাহেবরাজপুরুষেরা স্পীত হইবেন । উপাধিবিজ্ঞান বহুবিচিত্র,—ইহার কয়েক পৃষ্ঠা উদঘাটন করিতে চেষ্টা করা গেল মাত্র ।

আজকাল উপাধির একটা হুতিক উপ-
স্থিত হইয়াছে । লর্ড কার্জন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া যখন এই সকল অসঙ্গত উপাধির অতিমাত্রায় ছড়াছড়ি দেখিতে পাইলেন, তিনি তখন সামুলাইতে বসিলেন । তাহার কলে নুতন রাজা-মহারাজার সৃষ্টি

এখন একেবারে হুলভদর্শন হইয়াছে । ইহার ফলে কোন ব্যক্তিবিশেষের বা বংশের মনঃ-
কষ্টের কারণ উপস্থিত হইলেও মোটের উপর উপকার হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই । দিল্লিদরবারের বহু অর্থব্যয়ের অন্তত একটা সার্থকতা দেখা গিয়াছিল ;—উপাধিভূষিত রাজা, মহারাজা, মহারাজাবাহাদুর, মহারাজা-
ধিরাজগণের সঙ্গে অভিসামান্য দেশীয় স্বাধীননৃপতিগণেরও কতটা প্রভেদ, তাহা আজল্যমান হইয়া উঠিয়াছিল । এই রাজস্বরসজ্ঞে তাহারা কে ? মণিমাণিক্য-
সুশোভিত উপাধিপ্রাপ্ত রাজা এবং উপাধি-
শূন্য লোকদের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ ছিল না বলিলেই হয় । দেশীয় নৃপতিগণের, জন্ত যে সৈনিকসম্মান, যে অভ্যর্থনা, যে আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে স্বীয় অবস্থার তুলনা করিয়া আমাদের উপাধিপ্রাপ্ত রাজারা কি মনে করিয়াছিলেন, জানি না—কিন্তু, দর্শকমাত্রকেই এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছিল—

“তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ ।”

এ সকল দেখিয়া-শুনিয়াও যদি আমাদের নোহভঙ্গ না হয়, পদমর্যাদা রক্ষা করিতে বাইরা পদে-পদে অপদহ হইতে হয়, শাস্তির ইচ্ছায় অশান্তিকে বরণ করিয়া লইতে হয়—
তবে আর কি বলিবার আছে ? চাণক্য বলিয়াছেন—“স্বদেশে পূজ্যতে রাজা”—
স্বদেশের নিকট যিনি পূজা পাইবেন, তিনিই প্রকৃত রাজা । নতুবা রাজা-উপাধি সুরকার-
বাহাদুর দিলেও সেটা ব্যাধি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে । কোন ইংরেজ রাজপুরুষ একজন দেশীয় স্বাধীনরাজাকে ‘মহারাজা’-উপাধি

দিবার প্রস্তাব করিলে, রাজা বলিয়াছিলেন—
 “দেখুন, আমি আমার রাজ্যের king, আমাকে
 ভায়ভদ্রসম্রাট,—বাবু, ঠাকুর, রাজা যে নামেই
 অভিহিত করিয়া সন্মানিত করুন না,
 আমার প্রজাদের নিকট তাহাতে আমার
 প্রতিপত্তি একরূপই থাকিবে—আমি
 তাহাদের দণ্ডমণ্ডের কর্তা চিরকালই
 থাকিব। অতএব আমাকে এমন সন্মান
 দিবেন না, বাহা আমার বংশ হইতে আবার
 উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারে। আমি
 ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার একজন ভক্ত বিশ্বস্ত-
 বদ্ধ, তাঁহার সাম্রাজ্যাত্মী কুশলে থাকিলেই
 আমাদের সন্মানও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।”
 ইংরেজ রাজপুরুষ আশা করিয়াছিলেন, রাজা
 না জানি কত উৎফুল্ল হইবেন। কিন্তু
 এরূপ অভিনব উত্তর শুনিয়া তিনি অগণকাল
 বিস্মিত হইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন—“সাচ্
 বাড্ হার রাজাসাহেব, সাচ্ বাড্।”—
 উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে
 রাজার এই উক্তিতে রাজপুরুষের বিরক্তি

ঘটিবারই আশঙ্কা ছিল, কিন্তু পরে রাজার
 জনৈক ইংরেজবন্ধুর মুখে শোনা গেল,
 রাজপুরুষটি রাজার এই উক্তিতে এতদূর
 পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি ইংরেজবন্ধুকে
 একথা উৎখাপন করিয়া বলিয়াছিলেন—
 রাজাটির মত যদি দেশীয় ভদ্রসাধারণের
 সুবুদ্ধি হইত, তবে উপাধিলোলুপতা
 এদেশে দেখা দাইত না। ইহার পর হইতে
 উক্ত রাজপুরুষের সহিত রাজার এমনই
 ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং রাজার প্রতি
 তাঁহার এতই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল যে, রাজ্য-
 সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুতর রাজনৈতিক
 বিষয়ে রাজপুরুষ কোনরূপ হস্তক্ষেপ না
 করিয়া রাজার প্রতিই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর
 করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই সকল জটিল
 বিষয়ের অতি সহজ সমাধান হইয়া
 গিয়াছিল। উপাধিলোলুপ ব্যক্তিগণকে
 রাজার উক্তিটি শ্রবণ রাখিতে অনুরোধ
 করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করা
 যাইতেছে।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

শেষ খেয়া ।



দিনের শেষে সূর্যের দেশে ঘোমটা-পর্য্য ঐ ছায়া

ভূলাল রে ভূলাল মোর প্রাণ !

ও পারেতে সোনার কূলে আঁধারবুলে কোন্ দ্বারা

গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান ।

নামিতে সুখ চুকিয়ে সুখ বাবার মুখে যার বারা

ফেরার পথে কিরেও নাহি চার,

ভাঁহের পানে তাঁটার টানে বাব রে আজ ঘর-ছাড়া
সন্ধ্যা আসে দিনেবে চলে যায় !

ওরে আর !

আমার নিয়ে বাবি কেরে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায় !

• সাঁজের বেলা তাঁটার স্রোতে ও পার হতে এক-টানা

একটি ছুটি যায় যে তরী ভেসে ।

কেমন করে' চিন্বে ওরে ওদের মাঝে কোন্‌খানা

আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে ।

অস্তাচলে তাঁরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁবে

ছায়ার বেন ছায়ার মত যায়,

ডাকলে আমি কণেক খামি হেথায় পাড়ি ধরবে সে

এমন নেয়ে আছে রে কোন্‌ নার ?

ওরে আর !

আমার নিয়ে বাবি কেরে

দিন-শেষের শেষ খেয়ায় !

ঘরেই বার। বাবার তারা গিয়েছে চলে ঘরপানে

পায়েরে বার। বাবার গেছে পায়েরে ;

ঘরেও নয় পায়েরেও নয়' যে জন, আছে মাঝখানে

সন্ধ্যাবেলার কে ডেকে নেয় তারে !

ফুলের বার নাইক আর ফসল বার ফল না,

চোখের জল ফেলতে হাসি পায়,

দিনের আলো বার ফুরালো সাঁজের আলো জল না

সেই বসেছে ঘাটের কিনারায় ।

ওরে আর !

আমার নিয়ে বাবি কেরে

বেলা-শেষের শেষ খেয়ায় !

প্রাচীন রচনা ও পাণিনির আদর্শ।

প্রবাদ আছে যে, বাম্পীকি আদিকবি ; এবং তিনি নূতন শ্লোকচ্ছন্দে রামকথা রচনা করিয়াছিলেন। সপ্তকাণ্ডসংবলিত প্রচলিত রামায়ণের ভূমিকাতেও ঐ কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই রামায়ণখানি যখন কেবলমাত্র শ্লোকচ্ছন্দে রচিত নহে, তখন উহাকে অক্ষুণ্ণ-ভাবে সেই আদিকাব্য বলিতে পারা যায় না। ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, বংশহবিল এবং ঐ তিনটি ছন্দের সঙ্কর রচনা খুব প্রাচীন। ঐ প্রাচীন ছন্দকয়েকটি ব্যতীতও রামায়ণে অনেক অর্ধপ্রাচীন ছন্দ পাওয়া যায় ; যথা—বৈশদেবী, ভূজঙ্গপ্রস্রাত, কুচিরা, প্রহ-বিশী, বসন্ততিলকা, মালিনী, মৃগেন্দ্রমুখ এবং অসংবাধা। উহাদের মধ্যে আবার মৃগেন্দ্রমুখ এবং অসংবাধা অধিক অর্ধপ্রাচীন ; এবং এই দুইটি ছন্দ মহাভারতেও পাওয়া যায় না।

মহর্ষি বাম্পীকির কথা রামায়ণের উপক-রনিকার যে ভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, যেন অত্র একজন কবি আদিকবি এবং তৎপ্রণীত আদিকাব্যের ইতিহাস দিতেছেন। তাহার পর আবার উত্তরা-কাণ্ডের কথাপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—
“তচ্চকারোত্তরে কাব্যে ভগবান্ বাম্পীকি-
খর্ষিঃ।” অতলোকে লিখিলেই কবির নামে ‘ভগবান্’ এই শব্দ যুক্ত হওয়া শোভা পায়, এবং চর্কার-ক্রিয়ার পূর্ণ সার্থকতা হয়।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, আদিকবির রামকথা গাথারূপে স্তম্ভমাগধাদির সুখে গীত হইয়া প্রচলিত ছিল, এবং পরবর্তী সময়ে

তাহা অবলম্বন করিয়া কেহ সপ্তকাণ্ড রামা-
য়ণ রচনা করিলেন, তাহা হইলে পূর্করচিত
শ্লোক কতদূর পর্য্যন্ত নূতন কাব্যে বর্থাযথ-
ভাবে রক্ষিত হইরাছিল, তাহা বলা যায় না।
রামায়ণের রচনাপ্রণালী এবং তাহার অবস্থা
দেখিলে অনায়াসে ইহা উপলব্ধ হয় যে,
প্রাচীনতা এবং নূতনত্ব এক সঙ্গে রহিয়াছে ;
এবং নূতনত্ব অত্যন্ত অধিক। এ অবস্থায়
রামায়ণরচনার কালনির্ণয় করিতে হইলে
যদি কেবল রামকথার প্রাচীনতা এবং পূর্ক-
গাথার প্রাচীনতার অনুসন্ধান করা যায়,
তাহা হইলে রামায়ণগ্রন্থের রচনাকাল
নির্ণীত হইবে না।

রামায়ণের রচনাকাল নির্দেশ করিবার
অত্র শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যে
ভূমিকা লিখিতেছেন, তাহাতে তাঁহার মৌলিক
অনুসন্ধান এবং পাণ্ডিত্যের সবিশেষ পরিচয়
পাওয়া যাইতেছে। রামায়ণরচনার যে
কোন কোন স্থলে পাণিনিনিবদ্ধ নিয়মের
অনুবর্তন দেখিতে পাওয়া যায় না, এই কথা
বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইতেছে। অক্ষয়বাবুর
প্রবন্ধগুলি শেষ হইবার পূর্বে কোন সমা-
লোচনা করা অসম্ভাব্য ; কিন্তু এই প্রবন্ধ শেষ
হইবার পূর্বে একটি কথা তাঁহার বিচারার্থ
উপস্থিত করিতেছি। কথাটা এই—যাহা
পাণিনির আদর্শে রচিত নহে, তাহাকেই
অতি প্রাচীন বলিয়া অস্বীকার করা চলে
কি না।

পাণিনিব্যাकरण রচিত হইবার পরদণ

হইতেই যে ঐ ব্যাকরণের বিধি সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা নহে। কাভ্যায়ন যখন ইহার বার্তিক রচনা করিয়া লোকগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং পতঞ্জলি যখন মহাভাষ্য রচনা করিয়া পাণিনির আদর্শ অবশ্যগ্রহণীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তখনও সংস্কৃতরচনার পাণিনির আদর্শ অবলম্বিত হয় নাই। মহাত্মা কুমারিলভট্ট সপ্তমশতাব্দীতেও ঐ আদর্শ গ্রহণ করেন নাই এবং প্রচলিত তত্ত্ববার্তিকগ্রন্থে এই কথা বলিয়াছেন যে, মশক, আখ্যায়ন, নারদ, মনু প্রভৃতি পাণিনিকে আদর্শ করেন নাই, এমন কি, রাজা পালকার্য্য পর্য্যন্ত ঐ আদর্শ উপেক্ষা করিয়াছেন। তখন উহা অবশ্য-অবলম্বনীয় বলা চলে না। (তত্ত্ববার্তিক, কানীসংস্করণ, ১৯৯ পৃষ্ঠা)।

সংস্কৃতব্যাকরণের মধ্যে পাণিনিকেই একমাত্র আদর্শ করিতে হইবে বলিয়া সপ্তম-শতাব্দীতে ভর্তুহরি ব্যাক্যপদীয় রচনা করিয়াছিলেন; এবং পাণিনিকে সহজবোধ্য করিবার জন্য উহার পরে কাশিকা বৃত্তি রচিত হইয়াছিল। পাণিনিস্থাপনার এই চেষ্টা হইতেই বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, ঐ আদর্শ সর্বত্র অবলম্বিত হইত না। এতলেও ইহার প্রমাণস্বরূপে ভট্টকুমারিলকে উপস্থিত করিতেছি।

মহাত্মা কুমারিল ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী। উহার উভয়েই এদেশ হইতে বৌদ্ধশূন্যবাদ এবং ব্রহ্মজ্ঞের তিরোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভট্টকুমারিল সঙ্ঘর্ষপ্রতিষ্ঠাতা; তিনি যখন তাঁহার তত্ত্ব-

বার্তিকের প্রথম অধ্যায়েই সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যে, পাণিনি, কাভ্যায়ন এবং পতঞ্জলি অবলম্বনীয় বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে না, তখন ঐ ব্যাকরণের বিধি সর্বত্র গ্রাহ্য ছিল বলিয়া প্রতীতি হয় না। কুমারিল ভর্তুহরির নাম করেন নাই; কিন্তু তত্ত্ববার্তিকের তৃতীয় অধ্যায়ে পদে পদে ব্যাক্যপদীয় হইতে বচন তুলিয়া অতি তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ব্যাক্যপদীয়ের মত খণ্ডন করিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐ ব্যাকরণ যখন বেদাদ্য নহে এবং উহার বিধি যখন বুদ্ধের বচনের মত মানবকল্পিত, তখন উহা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তত্ত্ববার্তিকের কানীসংস্করণের ২০৭ পৃষ্ঠায় আছে—

ন চ বেদাদ্যভাবোহপি কচ্চিৎ ব্যাকরণং প্রতি ।

তাদর্থ্যাবয়বভাবাং বুদ্ধ্যপিবচনেষু ॥

অতিলিঙ্গাদিভিন্দ্ভাবং তাদর্থ্যং নাস্তি গম্যতে ।

অকৃত্রিমস্ত বা কচ্চিৎ কৃত্রিমোহবয়বঃ কথং ॥

অক্ষরবাবু যেন মনে না করেন যে, আমি তাঁহার পথে একটা ক্ষুদ্র তর্ককণ্টক আনিয়া উপস্থিত করিতেছি। তাঁহার সুস্থ বিচার বাহাতে সর্বদা সন্দেহ হয়, তাহাই আমার কামনা। তিনি আমার বন্ধু; এ কথাগুলি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াও জানাইতে পারিতাম। কিন্তু কথাগুলি গুরুতর; অনেক সুদীপাঠকেরাও বাহাতে বিষয়টির বিচার করেন, সেইজন্য প্রবন্ধটি পত্রস্থ করিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি যে, বাহা পাণিনির আদর্শে রচিত নহে, তাহাই পাণিনির পূর্ববর্তী কি না, অথবা অতি প্রাচীন কি না?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

যুগলমূর্তি ।



১

অগ্নি বহুদরে ! তুমি লক্ষ্মীরূপে সারাবিখতল
‘উজলি’ তুলিয়া তা’রে বিতরিছ অপূৰ্ণ মঙ্গল ।
খান্ধপীন বন্ধে তব বিনিহিত অকুরন্ত সুখা
বিশ্লোকপাগরিজি ! মিটাইছ তাহে বিশ্বকুখা ।
রত্নগর্ভা দেবী তুমি রত্নকণ্ঠ অনন্ত ভাণ্ডার
গোপনে সঞ্চিত করি’ দেখাইছ কি মেঘ উদার !
সংসারসংগ্রামে হেথা বিষল্যাদিগ্ধ বত হিরা
শীতলিছ নিজ করে কোমল পবন বিলেশিরা ।
ফলপুষ্পে কত কুজ রচিয়া রেখেছ ধরে ধরে
ব্রান্তিক্লাস্ত অগতের নেত্রমন জুড়াবার তরে ।
স্নেহভ্রামছায়াকুণ্ডে প্রতিদিন শান্ত সন্ধ্যালোকে
তোমার অহ্বানশব্দ শুনি মাতঃ আকুল পুলকে ।

২

আর ওই মহাকাশ বিশ্বব্যাপ্ত দীপ্ত মূর্তিমান্—
উনি কে মা ? উনিই কি চিরধোর বিষ্ণু স্রমহান্ ?
নির্নিমেঘ নেত্রছাটি চন্দ্র-সূর্য্য কোমল-ভান্বর !
অবৃত-দীপ্যাহ-বন্ধে প্রেমে তোমা’ বাঁধি’ নিরন্তর ।
অগণ্য তারকারুল দীপ্ত লোমকূপ অগণন
নীলকান্ত দেহে কিবা বিভূষিত জলদচন্দন ।
প্রত্যক্ষমূর্তি তবু বিনিমিতের চির-অঘেষণ
মহান্ রহস্ত ও’কি নিত্য নব ব্যাপিরা কুবন !
হে মাতঃ ! পতির তব রূহন্তের পেলেকি স্বকান ?
পদতলে মুগ্ধ বসি’ আছ তাই রাজিদিনমান ?
ত্রিনরেন্দ্রনাথ তর্কচর্চা ।

বঙ্গদর্শন ।

দেশীয় রাজ্য ।*

দেশভেদে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভেদ হইয়া থাকে, এ কথা সকলেই জানেন। সেই ভেদকে স্বীকার না করিলে কাজ চলে না। বাঁহারা বিলখালের মধ্যে থাকে, তাহারা মৎস্যব্যবসারী হইয়া উঠে; বাহারা সবুজভীরের বন্দরে থাকে, তাহারা, দেশবিদেশের সহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়; বাহারা সমতল উর্বরাভূমিতে বাস করে, তাহারা কৃষিকে উপজীবিকা করিয়া তোলে। মরুপ্রাণ দেশে যে আরব বাস করে, তাহাকে যদি অন্তদেশবাসীর ইতিহাস শুনাইয়া বলা যায় যে, কৃষির সাহায্য ব্যতীত উন্নতিলাভ করা যায় না, তবে সে উপদেশ ব্যর্থ হয় এবং কৃষিযোগ্য স্থানের অধিবাসীর নিকট যদি প্রমাণ করিতে বলা যায় যে, যুগ্মা এবং পশু-পালনেই সাহস ও বীৰ্য্যের চর্চা হইতে পারে, কৃষিতে তাহা নষ্টই হয়, তবে সেসকল নিষ্ফল উদ্ভেজনা কেবল অনিষ্টই ঘটায়।

বস্তুত ভিন্ন পথ দিয়া ভিন্ন জাতি ভিন্ন-শ্রেণীর উৎকর্ষ লাভ করে—এবং সমগ্র মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিলাভের এই একমাত্র

উপায়। যুরোপ কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধাবশত যে বিশেষপ্রকারের উন্নতির অধিকারী হইয়াছে, আমরা যদি ঠিক সেই-প্রকার উন্নতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি, তবে নিজেকে ব্যর্থ ও বিশ্বমানবকে বঞ্চিত করিব। কারণ, আমাদের দেশের বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে আমরা মনুষ্যত্বের যে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারি, পরের বৃথা অনুকরণচেষ্টায় তাহাকে নষ্ট করিলে এমন একটা জিনিষকে নষ্ট করা হয়, বাহা মানুষ অস্ত্র কোনো স্থান হইতে পাইতে পারে না। সুতরাং বিশ্বমানব সেই অংশে দরিদ্র হয়। চাষের জমিকে ধনির মত ব্যবহার করিলে ও ধনিজের জমিকে কৃষিক্ষেত্রের কাজে লাগাইলে মানব-সভ্যতাকে কীকি দেওয়া হয়।

যে কারণেই হউক, যুরোপের সঙ্গে ভারত-বর্ষের কতকগুলি গুরুতর প্রভেদ আছে। উৎকট অনুকরণের দ্বারা সেই প্রভেদকে দূর করিয়া দেওয়া যে কেবল অসম্ভব, তাহা নহে, দিলে তাহাতে বিশ্বমানবের ক্ষতি হইবে।

আমরা যখন বিদেশের ইতিহাস পড়ি বা

* পৃষ্ঠ ১৭ই আবার শনিবার রাজধানী আগরতলার 'ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-কর্তৃক গঠিত।

বিদেশের প্রত্যাপকে প্রত্যক্ষক্ষেপে দেখি, তখন নিজের প্রতি দিকার অঙ্গে—তখন বিদেশীর সঙ্গে আমাদের যে যে বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাই, সমস্তই আমাদের অনর্থের হেতু বলিয়া মনে হয়। কোনো অধ্যাপকের অর্ধাঙ্গীণ বালকপুত্র যখন সার্কাস দেখিতে যায়, তাহার মনে হইতে পারে যে, এমনি করিয়া ঘোড়ার গিঠের উপরে দাঁড়াইয়া লাকালাকি করিতে যদি শিশি এবং দর্শক-বলের বাহবা পাই, তবেই জীবন সার্থক হয়। তাহার পিতার শাস্তিময় কাজ তাহার কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

বিশেষ স্থলে পিতাকে দিকার দিবার কারণ থাকিতেও পারে। সার্কাসের খেলোয়াড় বেক্স অক্লান্ত সাধনা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজের ব্যবসায়ে উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, সেইরূপ উত্তম ও উদ্যোগের অভাবে অধ্যাপক যদি নিজের কক্ষে উন্নতিলাভ না করিয়া থাকেন, তবেই তাঁহাকে লজ্জা দেওয়া চলে।

সুরোপের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য অনুভব করিয়া যদি আমাদের লজ্জা পাইতে হয়, তবে লজ্জার কারণটা ভাল করিয়া বিচার করিতে হয়, নতুবা বথার্থ লজ্জার মূল কখনই উৎপাটিত হইবে না। যদি বলি যে, ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট আছে, ইংলণ্ডের বোধকারবার আছে, ইংলণ্ডে প্রায় প্রত্যেক লোকই রাষ্ট্রচালনার কিছু-না-কিছু অধিকারী, এইজন্যই তাহার বড়, সেইগুলি নাই বলিয়াই আমরা ছোট, তবে গোড়ার কথাটা বলা হয় না। আমরা কোনো কৌতুকপ্রিয় দেবতার বরে যদি কয়েকদিনের জন্য মুঢ় আবুহোসেনের

মত ইংরেজিমাছাওয়ার বাহু অধিকারী হই—আমাদের বন্দরে বাণিজ্যতরীর আবির্ভাব হয়—পার্লামেন্টের গৃহচূড়া আকাশভেদ করিয়া উঠে, তবে প্রথম অঙ্কের প্রহসন পঞ্চম অঙ্কে কি মর্শ্ভেদী অস্ত্রপাতিভই অবসিত হয়। আমরা এ কথা যেন কোনোমতেই না মনে করি যে, পার্লামেন্টে মানুষ গড়ে—বস্তুত মানুষই পার্লামেন্ট গড়ে। মাটি সর্বত্রই সমান; সেই মাটি লইয়া কেহ বা শিব গড়ে, কেহ বা বানর গড়ে; যদি কিছু পরিবর্তন করিতে হয়, তবে মাটির পরিবর্তন নহে, যে ব্যক্তি গড়ে, তাহার শিক্ষা ও সাধনা, চেষ্টা ও চিন্তার পরিবর্তন করিতে হইবে।

এই ত্রিপুররাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে একটি সংস্কৃতবাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি—“কিল বিদ্ববীরতাং সারমেকং”—বীৰ্য্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেন্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীৰ্য্যই সার। এই বীৰ্য্য দেশকালপাত্রভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয়—কেহ বা শস্ত্রে বীর, কেহ বা শাস্ত্রে বীর, কেহ বা ভাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্মে বীর, কেহ বা কৰ্ম্মে বীর। বর্তমানে আমাদের ভারতবীর্য্যের প্রতিভাকে আমরা পূর্ণ উৎকর্ষের দিকে লইয়া বাইতে পারিতেছি না, তাহার কতকগুলি কারণ আছে—কিন্তু সর্বপ্রধান কারণ বীৰ্য্যের অভাব। এই বীৰ্য্যের দ্বারদ্রাবণ যদি নিজের প্রকৃতিকেই ব্যর্থ করিয়া থাকি, তবে বিদেশের অশ্রুতিকে সার্থক করিয়া তুলিব কিসের জোরে?

আমাদের আমবাগানে আজকাল আম ফলে না, বিলাতের আমগাছগাছের প্রচুর

আপেল ফলিয়া থাকে । আমরা কি তাই বলিয়া মনে করিব যে, আমগাছগুলো কাটিয়া-ফেলিয়া আপেলগাছ রোপণ করিলে তবেই আমরা আশাভরূপ ফললাভ করিব ? এই কথাই নিশ্চয় জানিতে হইবে, আপেলগাছে যে বেশি ফল ফলিতেছে, তাহার কারণ তাহার গোড়ায়, তাহার মাটিতে সার আছে—আমাদের আমবাগানের জমির সার বহুকাল হইল নিশেষিত হইয়া গেছে । আপেল পাই না, ইহাই আমাদের মূল দুর্ভাগ্য নহে ; মাটিতে সার নাই, ইহাই আক্ষেপের বিষয় । সেই সার যদি যথেষ্ট-পরিমাণে থাকিত, তবে আপেল ফলিত না, কিন্তু আম প্রচুরপরিমাণে ফলিত এবং তখন সেই আশ্রয়ের সফলতায় আপেলের অভাব লইয়া বিলাপ করিবার কথা আমাদের মনেই হইত না । তখন দেশের আম বেচিয়া অনায়াসে বিদেশের আপেল হাটে কিনিতে পারিতাম, ভিকার বুলি সঞ্চয় করিয়া এক-রাত্রে পরের প্রসাদে বড়লোক হইবার হুঁশা মনের মধ্যে বহন করিতে হইত না ।

আসল কথা, দেশের মাটিতে সার ফেলিতে হইবে । সেই সার আর কিছুই নহে—“কিন বিহ্বারিতাং সারমেকং”—বীরতাকেই একমাত্র সার বলিয়া জানিবে । খবরিয়া বলিয়াছেন—“নারমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”—এই যে আত্মা, ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন । বিখ্যাতা, পরমাত্মার কথা ছাড়িয়া দেওয়া বাক্য—যে ব্যক্তি দুর্বল, সে নিজের আত্মাকে পায় না—নিজের আত্মাকে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়াছে, সে অপর কিছুকেই লাভ করিতে পারে না । যুরোপ

নিজের আত্মাকে যে পথ দিয়া লাভ করিতেছে, সে পথ আমাদের সম্মুখে নাই ; কিন্তু যে মূল্য দিয়া লাভ করিতেছে, তাহা আমাদের পক্ষেও অত্যাশঙ্কক—তাহা বল, তাহা বীৰ্য্য । যুরোপ যে কর্মের দ্বারা যে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছে, আমরা সে কর্মের দ্বারা সে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিব না—আমাদের সম্মুখে অন্য পথ, আমাদের চতুর্দিকে অন্তরূপ পরিবেশ, আমাদের অতীতের ইতিহাস অন্তরূপ, আমাদের শক্তির মূলসঞ্চয় অন্তরূপ—কিন্তু আমাদের সেই বীৰ্য্য আবশ্যক, বাহা থাকিলে পথকে ব্যবহার করিতে পারিব, পরিবেশকে অনুকূল করিতে পারিব, অতীতের ইতিহাসকে বর্তমানে সফল করিতে পারিব, এবং শক্তির গূঢ়সঞ্চয়কে আবিষ্কৃত-উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার অধিকারী হইতে পারিব । “নারমাত্মা বলহীনেন” লভ্যঃ—আত্মা তাহা আছেই, কিন্তু বল নাই বলিয়া তাহাকে লাভ করিতে পারি না । ত্যাগ করিতে শক্তি নাই, দুঃখ পাইতে সাহস নাই, লক্ষ্য অনুসরণ করিতে নিষ্ঠা নাই ;—কুশ সঙ্কল্পের দৌর্বল্য, ক্ষীণশক্তির আত্মবঞ্চনা, সুখশিলাসের ভীকৃত্য, লোকলজ্জা, লোকভয় আমাদের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বখার্বভাবে আত্মপরিচয়, আত্মলাভ, আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে দূরে রাখিতেছে । সেইজন্যই তিস্তুরের মত আমরা অপরের মাহাত্ম্যের প্রতি ঈর্ষা করিতেছি এবং মনে করিতেছি, বাহ অবস্থা যদি দৈব-ক্রমে অন্তের মত হয়, তবেই আমাদের সকল অভাব, সকল লজ্জা দূর হইতে পারে ।

বিদেশের ইতিহাস যদি আমরা ভাল

করিয়া পড়িয়া দেখি, তবে দেখিতে পাইব, মহৎ কত বিচিত্রপ্রকারের—গ্রীসের মহৎ এবং রোমের মহৎ একজাতীয় নহে—গ্রীস বিজ্ঞা ও বিজ্ঞানে বড়, রোম কৰ্মে ও বিধিতে বড়। রোম তাহার বিজয়পতাকা লইয়া যখন গ্রীসের সংগ্রবে আসিল, তখন বাহুবলে ও কৰ্মবিধিতে জয়ী হইয়াও বিজ্ঞাবুদ্ধিতে গ্রীসের কাছে হার মানিল, গ্রীসের কলা-বিজ্ঞা ও সাহিত্যবিজ্ঞানের অমুকরণে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তবু সে রোমই রহিল, গ্রীস হইল না—সে আত্মপ্রকৃতিতেই সকল হইল, অমুকৃতিতে নহে—সে লোকসংস্থানকার্যে জগতের আদর্শ হইল, সাহিত্যবিজ্ঞান-কলাবিজ্ঞান হইল না।

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, উৎকর্ষের একমাত্র আকার ও একমাত্র উপায় জগতে নাই। আজ যুরোপীয় প্রভাপের যে আদর্শ আমাদের চক্ষের সমক্ষে অত্রভ্রমী হইয়া উঠিয়াছে, উন্নতি তাহা ছাড়াও সম্পূর্ণ অস্ত্র-আকারের হইতে পারে—আমাদের ভারতীয় উৎকর্ষের যে আদর্শ আমরা দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে প্রাণস্ফার, বলস্ফার করিলে জগতের মধ্যে আমাদের লজ্জিত থাকিতে হইবে না। একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানের দ্বারা, ধর্মের দ্বারা চীন-জাপান, ব্রহ্মদেশ-শ্রামদেশ, তিব্বত-মঙ্গোলিয়া,—এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশই জয় করিয়াছিল; আজ যুরোপ অস্ত্রের দ্বারা, বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে—আমরা ইহুলে পড়িয়া এই আধুনিক যুরোপের প্রণালীকেই যেন একমাত্র গৌরবের কারণ বলিয়া মনে না করি।

কিন্তু ইংরেজের বাহুবল নহে, ইংরেজের

ইহুল বহর-বাহির, দেহে-মনে, আচারে-বিচারে সর্বত্র আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। আমাদেরকে যে সকল বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, তাহাতে অন্তত কিছুকালের ঈর্ষণ আমাদের আত্ম-পরিচয়ের পথ লোপ করিতেছে। সেই আত্মপরিচয় ব্যতীত আমাদের কখনই আত্মস্বাধীনতা হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির বর্ষা উপযোগিতা কি, তাহা এইবার বলিবার সময় উপস্থিত হইল।

দেশবিদেশের লোক বলিতেছে, ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িতেছে। জগতের উন্নতির ব্যাপ্তিপথে পিছাইয়া পড়া ভাল নহে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে, কিন্তু অগ্রসর হইবার সকল উপায়ই সমান মঙ্গলকর নহে। নিজের শক্তির দ্বারা অগ্রসর হওয়াই বর্ষা অগ্রসর হওয়া—তাহাতে যদি সম্ভবগতিতে বাওয়া যায়, তবে সেও ভাল। অপর ব্যক্তির কোলে-পিঠে চড়িয়া অগ্রসর হওয়ার কোনো মাহাত্ম্য নাই—কারণ, চলিবার শক্তিস্বত্বই বর্ষা লাভ, অগ্রসর হওয়াস্বত্বই লাভ নহে। ব্রিটিশরাজ্যে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের কৃতকার্যতা কতটুকু! সেখানকার শাসনব্যবস্থা-বিধিব্যবহা বত ভালই হটুক না কেন, তাহা ত বড়ত আমাদের নহে। মাহুব কুলজাতি-কতিবন্ধের মধ্য দিয়াই পূর্বতার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু আমাদের কুল করিতে দিবার ঐচ্ছ্য যে ব্রিটিশরাজ্যের নাই। সুতরাং তাহারা আমাদেরকে তিকা দিতে পারেন,

শিক্ষা দিতে পারেন না। তাঁহাদের নিজের বাহা আছে, তাহার সুবিধা আমাদের দিতে পারেন, কিন্তু তাহার স্বয়ং দিতে পারেন না। মনে করা যাক, কলিকাতা-ম্যুনিসিপালিটির পূর্ববর্তী কমিশনারগণ পৌরকার্যে স্বাধীনতা পাইয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, সেই অপরাধে অধীর হইয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। হইতে পারে, এখন কলিকাতার পৌরকার্য পূর্বের চেয়ে ভালই চলিতেছে, কিন্তু এরূপ ভাল চলাই যে সর্কাপেক্ষা ভাল, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের নিজের শক্তিতে ইহা অপেক্ষা ধারাপ চলাও আমাদের পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল। আমরা গরীব এবং নানা বিষয়েই অক্ষম, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য বহিঃজানী বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তুলনীয় নহে বলিয়া শিক্ষা-বিভাগে দেশীয় লোকের কর্তৃত্ব ধরু করিয়া রাজা যদি নিজের জোরে কেব্জি-অলকোর্ডের নকল প্রতিমা গড়িয়া তোলেন, তবে তাহাতে আমাদের কতটুকুই বা শ্রেয় আছে—আমরা গরীবের বোণা বিভাগের যদি নিজে গড়িয়া তুলিতে পারি, তবে সেই আমাদের সম্পদ। যে ভাল আমার আরক্ত-ভাল নহে, সে ভালকে আমার মনে করাই মানুষের পক্ষে বিঘন বিপদ। অন্নদিন হইল, একজন বাঙালি ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট দেশীয় রাজ্যশাসনের প্রতি নিভান্ত অবজ্ঞাপ্রকাশ করিতেছিলেন—তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, তিনি মনে করিতেছেন, ব্রিটিশ-রাজ্যের ব্যবস্থা লম্বাই বেন তাঁহাদেরই ব্যবস্থা;—তিনি যে ভারবাহিনী, তিনি

যে বস্ত্রী নহেন, যন্ত্রের একটা সামান্য অঙ্গমাত্র, এ কথা যদি তাঁহার মনে থাকিত, তবে দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার প্রতি এমন স্পষ্টার সহিত অবজ্ঞাপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। ব্রিটিশরাজ্যে আমরা বাহা পাইতেছি, তাহা যে আমাদের নহে, এই সত্যটি ঠিকমত বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে, এই কারণেই আমরা রাজ্যের নিকট হইতে ক্রমাগতই নূতন নূতন অধিকার প্রার্থনা করিতেছি এবং তুলিয়া বাইতেছি,—অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া একই কথা নহে।

দেশীর রাজ্যের • ভুলত্রুটি-মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সাধনার বিষয় এই যে, তাহাতে বেটুকু লাভ আছে, তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্বক্ষে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পারে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র জিপুররাজ্যের প্রতি উৎসুকত্বটি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই কারণেই এখানকার রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে যে সকল অভাব ও বিয় দেখিতে পাই, তাহাকে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের হৃদ্যগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। এই কারণে, এখানকার রাজ্যশাসনের মধ্যে যদি কোনো অসম্পূর্ণতা বা শৃঙ্খলার অভাব দেখি, তবে তাহা লইয়া স্পষ্টাঙ্গপূর্বক আলোচনা করিতে আমার উৎসাহ হয় না,—আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়। এই কারণে, যদি জানিতে পাই, তুচ্ছ বার্থপরতা আপনার সামান্য লাভের জন্য,—উপহিত ক্ষুদ্র সুবিধার জন্য, রাজ্যের মন্দিরভিত্তিকে শিথিল করিয়া

দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তবে সেই অপ-
রাধকে আমি ক্ষুদ্র রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র
ঘটনা বলিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারি না।
এই দেশীয় রাজ্যের লজ্জাকেই যদি বখাৰ্থরূপে
আমাদের লজ্জা এবং ইহার গৌরবকেই যদি
বখাৰ্থরূপে আমাদের গৌরব বলিয়া না বুঝি,
তবে দেশের সম্বন্ধে আমরা ভুল বুঝিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় প্রকৃতিকেই
বীৰ্য্যের দ্বারা সৰল করিয়া তুলিলে তবেই
আমরা বখাৰ্থ উৎকর্ষলাভের আশা করিতে
পারিব। ব্রিটিশরাজ ইচ্ছা করিলেও এ
সম্বন্ধে আমাদের সাহায্য করিতে পারেন
না। তাঁহারা নিজের মহিমাকেই একমাত্র
মহিমা বলিয়া জানেন—এই কারণে ভাল-
মনেও তাঁহারা আমাদেরকে যে শিক্ষা
দিতেছেন, তাহাতে আমরা স্বদেশকে অবজ্ঞা
করিতে শিখিতেছি। আমাদের মধ্যে বাঁহারা
প্যাট্রিয়ার্ট বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদের অনেকেই
এই অবজ্ঞাকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য।
এইরূপে বাঁহারা ভারতকে অন্তরের সহিত
অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা ই ভারতকে বিলাত
করিবার জন্য উৎসুক—সোভাগ্যক্রমে
তাঁহাদের এই অসম্ভব আশা কখনই সফল
হইতে পারিবে না।

আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া-
পড়িয়া থাকুন, আর বাহাই হোক, এইখানেই
স্বদেশের বখাৰ্থ স্বরূপকে আমরা দেখিতে
চাই। বিকৃতি-অনুকৃতির মহামারী এখানে
প্রবেশলাভ করিতে না পারুক, এই আমাদের
একান্ত আশা। ব্রিটিশরাজ আমাদের
উন্নতি চান, কিন্তু সে উন্নতি ব্রিটিশমতে
হওয়া চাই। সে অবস্থায় জনপদের উন্নতি

প্রণালী স্থলপথে আরোপ করা হয়। কিন্তু
দেশীয় রাজ্যে স্বভাবের অব্যাহত নিয়মে
দেশ উন্নতিলাভের উপায় নির্ধারণ করিবে,
ইহাই আমাদের কামনা।

ইহার কারণ এ নয় যে, ভারতের
সভ্যতাই সকল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ। যুরোপের
সভ্যতা মানবজাতিকে যে সম্পত্তি দিতেছে,
তাহা যে মহামূল্য, এ সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশ
করা যুক্ততা।

অতএব যুরোপীয় সভ্যতাকে নিকৃষ্ট
বলিয়া বর্জন করিতে হইবে, এ কথা
আমার বক্তব্য নহে—তাহা আমাদের পক্ষে
অস্বাভাবিক বলিয়াই, অসাধ্য বলিয়াই। স্বদেশী
আদর্শের প্রতি আমাদের মন দিতে হইবে—
উভয় আদর্শের তুলনা করিয়া বিবাদ করিতে
আমার প্রবৃত্তি নাই—তবে এ কথা বলিতেই
হইবে যে, উভয় আদর্শই মানবের পক্ষে
অত্যাবশ্যক।

সেদিন এখানকার কোনো তত্ত্বলোক
আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে,
গবর্মেন্ট-আর্টস্কুলের গ্যালারি হইতে বিলাতি
ছবি বিক্রয় করিয়া কেলা কি ভাল হইয়াছে?

আমি তাহাতে উত্তর করিয়াছিলাম যে,
ভালই হইয়াছে। তাহার কারণ এ নয় যে,
বিলাতী চিত্রকলা উৎকৃষ্ট সামগ্রী নহে। কিন্তু
সেই চিত্রকলাকে এত সস্তায় আয়ত্ত করা
চলে না। আমাদের দেশে সেই চিত্রকলার
বখাৰ্থ আদর্শ পাইব কোথায়? ছোটো লক্ষ্য-
হুঁয়ি ও “হিলিমিলি পনিয়া” জন্মিয়া যদি
কোনো বিলাতবাসী ইংরেজ ভারতীয় সঙ্গীত-
বিদ্যা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তবে বহুর
কর্তব্য তাহাকে বিরত করা। বিলাতী

বাজারের কতকগুলি স্থলত আবর্জনা এবং সেই সঙ্গে ছুটি একটি ভাল ছবি চোখের সামনে রাখিয়া আমরা চিত্রবিত্তার বথার্থ আদর্শ কেমন করিয়া পাইব ? এই উপায়ে আমরা যেটুকু শিখি, তাহা যে কত নিকট, তাহাও ঠিকমত বুঝিবার উপায় আমাদের দেশে নাই। যেখানে একটা জিনিষের আগাগোড়া নাই,—কেবল কতকগুলি খাপ-ছাড়া দৃষ্টান্ত আছে মাত্র, সেখানে সে জিনিষের পরিচয়লাভের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষার আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেয়—পরের দেশের ভালটা ত শিখিতেই পারি না, নিজের দেশের ভালটা দেখিবার শক্তি চলিয়া যায়।

আর্টস্কুলে ভর্তি হইরাছি, কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষকলার আদর্শ যে কি, তাহা আমরা জানিই না। যদি শিক্ষার দ্বারা ইহার পরিচয় পাইতাম, তবে বথার্থ একটা শক্তিশালত করিবার সুবিধা হইত। কারণ, এ আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে—একবার যদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায়, তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে, খালার, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপুড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বসনে, ভূষণে, পটে, গৃহভিত্তিতে নানা-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-পরিপূর্ণ একটি সমগ্রস্থিতিরূপে দেখিতে পাইতাম, ইহার প্রতি আমাদের সচেষ্ট চিত্তকে প্রয়োগ করিতে পারিতাম—পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহাকে ব্যবসায়্যে খাটাইতে পারিতাম।

এই কারণে, আমাদের শিক্ষার অবস্থার বিলাতী চিত্রের মোহে জোর করিয়া তাড়িয়া দেওয়া ভাল। মহিলে নিজের দেশে

কি আছে, তাহা দেখিতে মন যায় না—কেবলি অবজ্ঞার আব্দ হইয়া যে ধন ঘরের সিন্ধুকে আছে, তাহাকে হারাইতে হয়।

আমরা দেখিরাছি, আপানের একজন সুবিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ পণ্ডিত এদেশের কীটদষ্ট কয়েকটি পটের ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইরাছেন—তিনি একখানি পট এখান হইতে লইয়া গেছেন, “পৈখানি কিনিবার জন্য আপানের অনেক গুণজ্ঞ তাঁহাকে অনেক মূল্য দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিক্রয় করেন নাই।”

আমরা ইহাও দেখিতেছি, যুরোপের বহুতর রসজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের অধ্যাত দোকানবাজার ঘাঁটিয়া মলিন ছিন্নকাগজের চিত্রপট বহুমূল্য সম্পদের ভ্রায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া বাইতেছেন। সে সকল চিত্র দেখিলে আমাদের আর্টস্কুলের ছাত্রগণ নাসাকুঞ্জন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি ? ইহার কারণ এই, কলাবিত্তা যথার্থভাবে যিনি শিখিয়াছেন, তিনি বিদেশের অপরিচিত-রীতির চিত্রের সৌন্দর্য্যও ঠিকভাবে দেখিতে পান—তাঁহার একটি শিল্পদৃষ্টি জন্মে। আর বাহারা কেবল নকল করিয়া শেখে, তাহারা নকলের বাহিরে কিছুই দেখিতে পায় না।

আমরা যদি নিজের দেশের শিক্ষকলাকে সমগ্রভাবে, যথার্থভাবে দেখিতে শিখিতাম, তবে আমাদের সেই শিল্পদৃষ্টি, শিল্পজ্ঞান জন্মিত, বাহার সাহায্যে শিল্পসৌন্দর্য্যের দিব্য-নিকেতনের সমস্ত দ্বার আমাদের সম্মুখে উদঘাটিত হইয়া বাইত। কিন্তু বিদেশী শিল্পের নিভাস্ত অসম্পূর্ণ শিক্ষার, আমরা বাহা পাই নাই, তাহাকে পাইরাছি বলিয়া

মনে করি, বাহা পরের তহবিলেই রহিয়া গেছে, তাহাকে নিজের সম্পদ জ্ঞান করিয়া অহঙ্কৃত হইয়া উঠি।

“পিরের-গোটি” হুদনামধারী বিখ্যাত কন্নাসী ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমাদের দেশের রাজনৈকতন-গুলিতে বিলাতী আস্বাবের ছড়াছড়ি দেখিয়া হতশ হইয়া গেছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, বিলাতী আস্বাবধানার নিত্য ইতর-শ্রেণীর সামগ্রীগুলি ঘরে সাজাইয়া আমাদের দেশের বড় বড় রাজারা নিত্যই অশিক্ষা ও অজ্ঞতাবশতই গৌরব করিয়া থাকেন। বস্ত্র বিলাতী সামগ্রীকে বথার্থভাবে চিনিতে শেখা বিলাতেই সম্ভবে। সেখানে শিল্পকলা সজীব, সেখানে শিল্পীরা প্রত্যহ নব নব রীতি সৃজন করিতেছেন, সেখানে বিচিত্র শিল্পকৃতির কালপরম্পরাগত ইতিহাস আছে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত বিশেষ দেশকাল-পাত্রের সম্বন্ধ সেখানকার গুণী লোকেরা জানেন—আমরা তাহার কিছুই না জানিয়া কেবল টাকার খলি লইয়া মূর্থ দোকানদারের সাহায্যে অজ্ঞভাবে কতকগুলি খাপছাড়া জিনিষপত্র লইয়া ঘরের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলি—তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের সাধ্যারত্ত নহে।

এই আস্বাবের দোকান যদি লর্ড কার্জন বলপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন, তবে দ্বারে পড়িয়া আমরা বিদেশী সামগ্রীর মর্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হইতাম—তাহা হইলে টাকার সাহায্যে জিনিষ-ক্রয়ের চর্চ্চা বন্ধ হইয়া রুচির চর্চ্চা হইত। তাহা হইলে ধনিগৃহে প্রবেশ করিয়া দোকানের

পরিচয় পাইতাম না, গৃহস্থের নিজের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাইতাম। ইহা আমাদের পক্ষে বথার্থ শিক্ষা, বথার্থ লাভের বিষয় হইত। এরূপ হইলে আমাদের অন্তরে-বাহিরে, আমাদের হৃৎপাত্য-তাহব্যা, আমাদের গৃহভিত্তিতে, আমাদের পণ্য-বীথিকায় আমরা স্বদেশকে উপলব্ধি করিতাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে সকল দেশেরই ইতর-সম্প্রদায় অশিক্ষিত। সাধারণ ইংরেজের শিল্পজ্ঞান নাই—সুতরাং তাহারা বিদেশী সংস্কারের দ্বারা অন্ধ। তাহারা আমাদের কাছে তাহাদেরই অল্পকরণ প্রত্যাশা করে। আমাদের বসিবার ঘরে তাহাদের দোকানের সামগ্রী দেখিলে তবেই আরাম বোধ করে, —তবেই মনে করে, আমরা তাহাদেরই করমারেসে তৈরি সভ্যপদার্থ হইয়া উঠিয়াছি। তাহাদেরই অশিক্ষিত রুচি অল্পপারে আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পদৌলব্দ্য স্থলত ও ইতর অল্পকরণকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। এদেশের শিল্পীরা বিদেশী টাকার লোভে বিদেশী রীতির অন্তত নকল করিতে প্রবৃত্ত হইয়া চোখের মাথা খাইতে বসিয়াছে।

যেমন শিল্পে, তেমনি সকল বিষয়েই। আমরা বিদেশী প্রণালীকেই একমাত্র প্রণালী বলিয়া বুঝিতেছি। কেবল বাহিরের গামগ্রীতে নহে, আমাদের মনে, এমন কি, হৃদয়ে নকলের বিষবীজ প্রবেশ করিতেছে। দেশের পক্ষে এমন বিপদ আর হইতেই পারে না।

এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধারের অর্থ একমাত্র দেশীয় রাজ্যের প্রতি আমরা

তাহাইয়া আছি। এ কথা আমরা বলি না যে, বিদেশী সামগ্রী আমরা গ্রহণ করিব না। গ্রহণ করিতেই হইবে, কিন্তু দেশীয় আধারে গ্রহণ করিব। পরের অল্প কিনিতে নিজের হাতখানা কাটিয়া ফেলিব না। একলবোর মত ধনুর্বিজ্ঞার গুরুদক্ষিণাস্বরূপ নিজের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দাঁন করিব না। এ কথা মনে রাখিতেই হইবে, নিজের প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিলে দুর্বল হইতে হয়। ব্যাঘ্রের আহাৰ্য্যপদার্থ বলকারক সন্দেহ নাই, কিন্তু হস্তী তাহার প্রতি লোভ করিলে নিশ্চিত মরিবে। আমরা লোভবশত প্রকৃতির প্রতি ব্যাভিচার যেন না করি। আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মে, ভাবে-ভঙ্গীতে প্রত্যহই তাহা করিতেছি, এইজন্য আমাদের সমস্তা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে—আমরা কেবলি অকৃতকার্য্য এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। বস্ত্রত জটিলতা আমাদের দেশের ধর্ম্ম নহে। উপকরণের বিরলতা, জীবনযাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব—এইখানেই আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রতিভা। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিলাতী কারখানাঘরের প্রভূত জঞ্জাল যদি খাঁট দিয়া না ফেলি, তবে ছই দিক্ হইতেই মরিব—অর্থাৎ বিলাতী কারখানাও এখানে চলিবে না, চণ্ডীমণ্ডপও বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই কারখানাঘরের ধুমধূলিপূর্ণ বায়ু দেশীয় রাজ্যব্যবহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—সহজকে অকারণে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, বাসস্থানকে নির্দোষ করিয়া দাঁড় করাইয়াছে। বাহারা

ইংরেজের হাতে মানুষ হইয়াছেন, তাঁহারা মনেই করিতে পারেন না যে, ইংরেজের সামগ্রীকে যদি লুইতেই হয়, তবে তাহাকে আপন করিতে না পারিলে তাহাতে অনিষ্টই ঘটে—এবং আপন করিবার একমাত্র উপায় তাহাকে নিজের প্রকৃতির অঙ্গুষ্ঠে পরিণত করিয়া তোলা—তাহাকে যথাযথ না রাখা। খাণ্ড যদি খাণ্ডরূপেই বরাবর থাকিয়া যায়, তবে তাহাতে পুষ্টি ঘুরে থাকে, ব্যাধি ঘটে। খাণ্ড যখন খাণ্ডরূপ পরিহার করিয়া আমাদের রসরসরূপে মিলিয়া যায় এবং যাহা মিলিবার নহে পরিত্যক্ত হয়, তখনই তাহা আমাদের প্রাণবিধান করে। বিলাতী সামগ্রী যখন আমাদের ভারতপ্রকৃতির দ্বারা জীর্ণ হইয়া তাহার আত্মরূপ ভাগ করিয়া আমাদের কলেবরের সহিত একাত্ম হইয়া যায়, তখনই তাহা আমাদের লাভের বিষয় হইতে পারে—যতক্ষণ তাহার উৎকট বিদেশীয়ত্ব অবিকৃত থাকে, ততক্ষণ তাহা লাভ নহে। বিলাতী সরস্বতীর পোষাপুষ্করণ এ কথা কোনোমতেই বুঝিতে পারেন না। পুষ্টিসাধনের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, বোঝাই করাকেই তাঁহারা পরমার্থ জ্ঞান করেন। এইজন্যই আমাদের দেশীয় রাজ্য-গুলিও বিদেশী কার্য্যবিধির অঙ্গজত অনাবশ্যক বিপুল জঞ্জালজালে নিজের শক্তিকে অকারণে ক্রিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। বিদেশী বোঝাকে যদি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিতাম, যদি তাহাকে বোঝার মত না দেখিত হইত, রাজ্য যদি একটা আপিসমাজ হইয়া উঠিবার চেষ্টায় প্রতিবৃহত্তে বর্ষান্তকলেবর হইয়া না উঠিত, যাহা সজীব জংগিপেডের

নাড়ির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিল তাহাকে যদি কলের পাইপের সহিত সংযুক্ত করা না হইত, তাহা হইলে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না । আমাদের দেশের রাজ্য কেরাণীচালিত বিপুল কারখানা নহে—নিভুল নির্বিকার এঞ্জিন নহে—তাহার বিভিন্ন সম্বন্ধযুক্তগুলি লৌহমণ্ড নহে, তাহা হৃদয়তন্ত্র—রাজলক্ষ্মী প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার কর্মের শুকতার মধ্যে রসসঞ্চার করেন, কঠিনকে কোমল করেন, তুচ্ছকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেন, দেনা-পাওনার ব্যাপারকে কল্যাণের কান্ধিতে উদ্ভল করিয়া তোলেন এবং ভুলত্রুটিকে কহার অশ্রুজলে মার্জনা করিয়া থাকেন । আমাদের সমাজগাঁ আমাদের দেশীয় রাজ্য-

গুলিকে বিদেশী আগিসের ছাঁচের মধ্যে চালিয়া তাহাদিগকে কলরূপে বানাইয়া না তোলে—এই সকল স্থানেই আমরা বদেশ-লক্ষ্মীর স্তম্ভসিক্ত দ্বিধ বক্ষস্থলের সজীব-কোমল মাতৃস্পর্শ লাভ করিয়া বাইতে পারি, এই আমাদের কামনা । যা যেন এখানেও কেবল কতকগুলি ছাপমারা লেফাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকেন—দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্ধি এখানে যেন মাতৃককে আশ্রয়লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে ।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ।

আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীর চিন্তা, আদর্শ বা সাধনাতে প্রতাপচন্দ্রের প্রতিভার চাক্ষুষ প্রভাব কতটুকু পড়িয়াছে, ইহা নির্দ্ধার করা সহজ নহে । অথচ শিক্ষিত ভারতসমাজে প্রতাপচন্দ্রের প্রতিপত্তি যে অল্প ছিল, তাহাও নহে । তাঁহার বাগ্মিতার বশঃসৌরভ ভারতময় পরিব্যাপ্ত ছিল । যেমন বাংলাতে, সেইরূপ ইংরেজিতে, উত্তর ভাষাতেই সুললিত বাক্যবিভাসে তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল । ভারতবাসীর তো কথাই নাই, ইংরেজ ও মার্কিনীয় লেখক ও বক্তাগণের মধ্যেও অতি অল্পলোকেই শব্দচিত্র-অঙ্কনে প্রতাপচন্দ্রের স্তায় এরূপ

স্নিগ্ধহস্ত ছিলেন । শিক্ষিত ভারতবাসী তাঁহার কবিদে বিমুগ্ধ হইয়াছে, তাঁহার অলোকসাধারণ বাক্চাতুর্য্যে বিশ্বরে অতিভূত হইয়াছে, দলে দলে বাইয়া নিরতিশয় আগ্রহসহকারে তাঁহার বক্তৃতামণ্ডপ লোকায়ত্ত করিয়া তুলিয়াছে ; কিন্তু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, কখনো আপনাদের চিন্তাতে, আদর্শে, সাধনাতে, বা চরিত্রে, প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার দ্বারী প্রভাব অনুভব করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না ।

ইহার কারণও চক্কর উপরেই পড়িয়া রহিয়াছে । ব্রাহ্মসমাজই প্রতাপচন্দ্রের প্রত্যক্ষ কার্য্যক্ষেত্র ছিল, আর ব্রাহ্মসমাজ

ভারতের চিন্তা ও সাধনাতে যে প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিরই সঙ্গে জড়িত,—আজ পর্য্যন্ত এ ক্ষেত্রে চাক্ষুষভাবে কোন চতুর্থ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কোন বিষয়েই প্রতাপচন্দ্রও ইহাদের সমকক্ষ ছিলেন না। আজীবনকাল তিনি একরূপ কেশবচন্দ্রের ছায়ারূপেই আমাদের সমক্ষে বিচরণ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার শৈশবসহচর ছিলেন, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, কেশবচন্দ্র হইতেই তিনি আপনার সমুদায় শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হন। কেশবচন্দ্র যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্ষেত্রে তাঁহার কোন স্বাধীন অধিকার ছিল না। কেশবের স্বর্গারোহণের পরেও, আত্মকলহনিবন্ধন, ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার যথোপযুক্ত প্রভাব ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। অথচ প্রতাপচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিভা যে নিতান্ত সামান্য ছিল, তাহাও নহে। অত্র ক্ষেত্রে, অত্র অবস্থাদীনে, কেশবচন্দ্রের মত প্রচণ্ড মার্কণ্ডেয় কিরণ-জালে আচ্ছন্ন না হইলে, প্রতাপচন্দ্রের প্রতিভাও সম্ভবত স্বদেশীয় সমাজের চিন্তা ও চরিত্রে কোন-না-কোন আকারে স্বলবিত্তর স্বাধীনপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত।

এদেশের আধুনিক নেতৃবর্গের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র আজীবন অত্যন্ত বৈদেশিক-ভাবাপন্ন ছিলেন। কোন কোন সামাজিক বিষয়ে, কখনো কখনো তিনি রক্ষণশীল হিন্দুর ভায়, প্রাচীন প্রথাসকলের পক্ষপাতি করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ সকল

ভাব বৈরাগ্য-ও-সন্ন্যাসপ্রধান আদর্শের সাধারণ নিদর্শন; খৃষ্টীয়, মোহনদী, বৌদ্ধ ও হিন্দু, সকলেরই পক্ষে নিবৃত্তিমার্গের সঙ্গে এ সকল ভাব স্বভাবতই জড়িত হইয়া আছে। জীশিক্ষা, জীস্বাধীনতা এবং সাধারণত রমণীকুলের সম্বন্ধে তাঁহার যে ভাব ও ধারণা ছিল, তাহা যেমন হিন্দুদিগের মধ্যে, সেইরূপ খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও সর্বদাই দৃষ্ট হয়। হিন্দুর সম্মান বলিয়া ও হিন্দুসমাজে ও হিন্দুপরিবারে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া, অন্তরে-অন্তরে একটা স্বাভাবিক হিন্দুত্ব তাঁহার মধ্যে সহজভাবেই সর্বদা বিদ্যমান ছিল, এবং এই হিন্দুত্ব তাঁহার অজ্ঞাতে, তাঁহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শকেও বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছিল সত্য, কিন্তু যাহারা কোনো কোনো সামাজিক বিষয়ে প্রতাপচন্দ্রের সুকীর্ত্তা ও রক্ষণশীলতা দ্বারা তাঁহার হিন্দুত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা হিন্দুর বিশেষত্ব কি, ইহা সম্যক্রূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। বিধি-মার্গে নহে, কিন্তু অধ্যাত্মবোগে ও ভাগবতী লীলাতেই হিন্দুর বিশেষত্ব; ইহাতেই সভ্যজগতে ও মানবীর সাধনার হিন্দুর অসাধারণ অধিকার ও প্রাধান্য। আর এই বিশেষ হিন্দুত্ব ও আদর্শের সঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের কখনো কোনও গভীর বোগ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

স্বদেশীয় শাস্ত্রসাহিত্যের সঙ্গে কেশবচন্দ্রেরও সাক্ষাৎযোগ ছিল না সত্য; কিন্তু কেশবচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভা এবং ইঙ্গিতমাত্র পাইলেই অতি জটিল ও নিগূঢ়

ভবের অভ্যন্তরেও মোটামুটরূপে প্রবেশ করিতে পারিত। তাঁহার ব্রাহ্মগীতোপনিষৎ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সাক্ষাৎভাবে এই সকল গভীর হিন্দুত্ব শিক্ষা বা সাধনা না করিয়াও শুদ্ধ আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসাধারণ অধ্যাক্ষদৃষ্টিপ্রভাবে কেশবচন্দ্র কতটা যে যোগভক্তির মুখ্যভাব ও আদর্শ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রভাপচন্দ্রের এ অধিকার ছিল না; সুতরাং আপনার প্রতিভার কলও তিনি স্বদেশীয় শাস্ত্রসাধনার মুখ্য সত্যগুলিকে সম্যক্রূপে কখনো আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

কেশবচন্দ্রের অভ্যুত্থানকালে শব্দর, রামাহুজ প্রভৃতি অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। পাশ্চাত্যদর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রভাবই তখন নবশিক্ষিত ভারতসমাজে নিরতিশয় প্রবল ছিল। শিক্ষিত ভারতসমাজের মতি-গতি তখনো স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করে নাই। সুতরাং সে সময়ে স্বদেশীয় শাস্ত্র-সাহিত্যসম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা শিক্ষিতসমাজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বপূর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় ছিল না। আপনার সাময়িক শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ে কেশবচন্দ্রের অসাধারণ অধিকার ছিল। স্বজাতির অভিনব চিন্তাশ্রোত প্রবলবেগে কে পথে প্রবাহিত হইতেছিল, সে পথ কেশবচন্দ্রের সুপরিচিত ছিল। দক্ষ, অভিজ্ঞ, শক্তিমান কর্ণধারের ভায়, এই-কতই তিনি সে সময়ে শিক্ষিত ভারতের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সেই বৈদেশিক পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত

করিয়া, তাহাদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইরা ছিলেন।

কেশবচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই দেশের মতি-গতি কিরিতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্রের আদর্শ ও সাধনা উত্তরোত্তর হিন্দুত্বাবাপন্ন হইয়া উঠে। তখনো কেশব-চন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বাবপ্রাণ করিয়া তুলিতে পারেন নাই, সত্য। তাঁহার জীবদ্দশায় আমাদের মধ্যে বর্তমান নব-বেদান্তের অভ্যুদয় হয় নাই—সুচনাই হইরাছিল কি না, সন্দেহের কথা। রামমোহন রায় উপনিষদ, বেদান্তসার ও বেদান্তসূত্র প্রভৃতি প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে শিক্ষা সমাজে বিশোপদ্রাণ হইরাছিল। পঁচিশবৎসর পূর্বে মহবি বেবেলনাথের সকলিত “ব্রাহ্মধর্ম” গ্রন্থই আমাদের মধ্যে উপনি-বক্তৃতাগুলির সারতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু মহবি কোন অর্থেই বৈদান্তিক ছিলেন না, তাঁহার “ব্রাহ্মধর্ম” গ্রন্থে মূল বৈদান্তিক তত্ত্ব ও আদর্শের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব ইহা কিছুই বিচিঞ্জ্য মহে যে, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে ধর্মশাস্ত্রে ও তখনো স্বজাতির সনাতন সাধনার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত করিবার অবসরই প্রাপ্ত হন নাই। তবে তাঁহার কবিত্বময়ী উপাসনার মধ্যে শেষদশায় অবৈতত্বভাবের আভাস কুটির উঠিয়াছিল বলিয়া, তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নামে,—ভাবোজ্ঞাসে our return to the Vedanta আমাদের বেদান্তে প্রত্যাবর্তন, ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনো ও ধর্মশাস্ত্রে হিন্দুত্বাবাপন্ন না হইয়াও, কেশবচন্দ্রের ধর্ম, ভারতবর্ষীয়

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর হইতেই, ভাবাদে বিশেষরূপে হিন্দুতাবপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিল । কিন্তু প্রভাপচন্দ্র সর্বদাই কেশবের এই হিন্দুপক্ষপাতিত্বকে ঈষৎ আশঙ্কার চক্ষে দেখিতেন । ভক্তশিরোমণি বিজয়রূপের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে যখন বৈকল্যী ভক্তি শনৈঃশনৈঃ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, তখন প্রভাপচন্দ্র তাহার বিরোধী ছিলেন । যেদিন প্রথমে খোল-করতালসংযোগে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীর্ভনের আয়োজন হয়, সেদিন কেশবচন্দ্র, “প্রভাপ যেন দেখিতে না পান”—এই কারণে খোল-করতাল উপাসনাস্থলে ঢাকিয়া আনিবার জন্য বিজয়রূপকে অহুরোধ করিয়াছিলেন । ক্রমে কীর্তনাক ব্রহ্মোপাসনার প্রধান সহায় হইয়া উঠিলে প্রভাপচন্দ্রও তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সন্তোষ করিতেন বলিয়াও মনে হয়, কিন্তু চিরদিনই ভিতরে ভিতরে এই সকল মন্তব্যকে তিনি একটু যেন অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন । কলত ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে হিন্দুতাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রভাপচন্দ্র আজীবনই মূলত বৈদেশিক ও খৃষ্টীয় তাবাপন্ন ছিলেন । এইজন্যই আপনার বহুদলী সমাজে তাঁহার কোন স্থায়ী প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারা যায় না ।

কিন্তু তাই বলিয়া প্রভাপচন্দ্রের প্রতিভা একেবারে নিফলে গিয়াছে বলিতে পারা যায় না । আমাদের মধ্যেও, সামান্যপরিমাণে হইলেও, তিনি একটা অতি মহৎকার্যের সহায়তা করিয়াছেন । ভারতের শিক্ষিত-সমাজে খৃষ্টানিত্বের প্রতি যে ভক্তি ও প্রকৃত

খৃষ্টীয়সাধনার প্রতি যে শ্রদ্ধার উদ্ভ্রক হইয়া, আমাদের ধর্মমত ও ধর্মজীবনে যন্ত্রবিস্তর-পরিমাণে হ্রাস একটা উদার সার্বভৌমিকতা ফুটাইয়া তুলিতেছে, ইহা বহুলপরিমাণে কেশবচন্দ্রের ও কিয়ৎপরিমাণে প্রভাপচন্দ্রের সাধনা ও বক্তৃতাদিরই প্রত্যক্ষ ফল । ইহা ঘারা কেবল যে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ উপকৃত হইয়াছেন, তাহা নহে । আমাদের বর্তমান জাতীয়জীবন গঠনও ইহা বিশেষ সাহায্য করিয়াছে ও ভবিষ্যতে আরো করিবে । নব-ভারত কেবল হিন্দুর নহে, যদিও লোকসংখ্যাগণনায় হিন্দুই ভারতের জনগণমধ্যে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন । মুসলমানকে ছাড়িয়া বর্তমান ভারতে কদাপি জাতীয় অভ্যুত্থান সম্ভব নহে । যাঁহারা ভারতবর্ষে একটা স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করেন, তাঁহারা আধুনিক রাজ্যতন্ত্রের এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শও আয়ত্ত করেন নাই এবং ভারতের বর্তমান অবস্থার সম্যকজ্ঞানও লাভ করেন নাই । যেমন হিন্দু ও মুসলমান, সেইরূপ খৃষ্টীয়গণও ভারতরাষ্ট্রের একটি প্রধান অঙ্গ, তাহাকে ছাড়িয়াও কোনপ্রকারের জাতীয়তন্ত্র আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না । রাজা রামমোহন রায় ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাই তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান, এই ত্রিবিধ ধর্মেরই উদারতাসম্পাদনে ত্রুতী হইয়াছিলেন এবং ভারতে ধর্মবিরোধই জাতীয় একত্বের প্রধান অন্তরায়, ইহা জানিয়া, এই সকল ধর্মসম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও, পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ

বর্ধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজে এদেশে এক চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিবে, এ কল্পনা তিনি করেন নাই। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান ও অন্ত্যজ ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া, আপন আপন সাম্প্রদায়িক ভাব ও বিশেষত্ব গম্ভীতে রাখিয়া সাধারণভাবে জগতের শ্রুতি ও পাল-নিয়তি যিনি, তাঁহারই ভজনা করিবে, ইহাই ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠায় রাজার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টডিড (trust deed) ইহার অকাটা প্রমাণ। কার্যত এই ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুগণ বিশেষভাবে যোগদান করেন, এবং তজ্জন্ম ক্রমে কলিকাতাসমাজের উপাসনাপ্রণালী প্রভৃতি হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠে। হিন্দুগণ আপনাদিগের শাস্ত্রসাহিত্যের অমূল্যরূপ করিয়াই হিন্দুধর্মকে উদার ও আধুনিক আদর্শের অঙ্গবাহী করিয়া তুলিবেন, ইহা রাজারও অভিমত ছিল। কিন্তু মুসলমানেরাও সেইরূপ আপনাদিগের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবর্তনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া আপনাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রাদি অবলম্বনে ও তাহার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া, মুসলমানধর্মকে উদার ও সার্বভৌমিক করিয়া তুলিবেন এবং খৃষ্টীয়ানেরাও ঐরূপ খৃষ্টীয়শাস্ত্রাদি অবলম্বনে, খৃষ্টীয়তন্ত্রকে উদার ও সার্বভৌমিক করিবেন, ইহাই রাজার অভিপ্রায় ছিল। এবং এই-জন্মই তিনি একদিকে যেমন বেদান্তাদিশাস্ত্রের সাহায্যে হিন্দুধর্মকে, সেইরূপ কোরাণ ও হাদিসাদির সাহায্যে মহম্মদীয় ধর্মকে ও বাইবেল এবং তালমুদ অবলম্বনে খৃষ্টীয়ধর্মকে সুসংস্কার-বজ্জিত, সত্যোপেত, বিভক্তজ্ঞানাহ্নমোদিত

ও উদার সার্বভৌমিকভাবাপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয়ধর্ম-সম্বন্ধে রাজা যে সংস্কারকার্যের হৃদয়গত করিয়া গিয়াছিলেন, বেশবস্ত্র এবং প্রতাপচক্র তাহারই সাহায্য করিয়া আমাদিগের মধ্যে খৃষ্টভক্তি, খৃষ্টীয়সাধনা ও খৃষ্টীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা বিকশিত করিয়া, ভারতের বর্তমান জাতীয়জীবনের একতা ও ঘনিষ্ঠবিহিতা সম্পাদনে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন। ইহাই হৃদয়ী শাসিতসমাজে প্রতাপচক্রের বিশেষ কীর্তি। আমাদিগের মধ্যে এই কীর্তিছারাই বেশবস্ত্রের স্মৃতির সঙ্গে তাঁহার স্মৃতিও 'চিরদিন জাগ্রত থাকিবে।

রাজা রামমোহন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠায় শাস্ত্রহীন যুক্তি বা যুক্তিহীন শাস্ত্র, হুএর কিছুই সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু শাস্ত্রযুক্তির আশ্রয় সম্বরণ সাধন করিয়া, এই উভয় ভিত্তির উপরেই ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সত্যের দ্বিবিধ প্রকাশ,—এক অন্তরে, মনোরাজ্যে; অপর বাহিরে, নিসর্গে ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশশীল চিন্তা, সাধনা, অহুতান ও প্রতিষ্ঠানাদিতে। একই সত্য অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়াই, আমরা অন্তরের বৃত্তিনিচয়কেও জানিতেছি এবং বাহিরের নৈসর্গিক ও সামাজিক নিয়ম ও বিধিব্যবহারি রূপ সম্যকরূপে বুঝিতে পারিতেছি। অন্তর ও বাহির একত্বতরে পরস্পরকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। বাহ্য নাই তাহা নাই ব্রহ্মত্বে, ইহা যেমন সত্য; বাহ্য নাই ব্রহ্মত্বে তাহা

নাগেও না ভাঙে, ইহাও ঠিক সেইরূপ সত্য। অন্তরবাহিরের সম্মিলন ও সাম্য প্রভেই প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে জ্ঞদয়জম করিয়া, শাস্ত্রকে বর্জন করিয়া স্বাভিমতকে অবলম্বন করেন নাই, স্বাভিমতকে বর্জন করিয়া শাস্ত্রকেও অবলম্বন করেন নাই, কিন্তু যোগবাশিষ্ঠের উপদেশানুযায়ী সদ্গুরু, মুশাস্ত্র ও স্বাভিমতের একবাক্যতার উপরেই ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন আচার্য্য-বৃত্ত অবলম্বন করিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, রাজা একান্ত সদ্‌যুক্তিসম্পন্ন, যোক্ত্যোপদেশক, ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করেন। পুরাণতন্ত্রাদিকেও তিনি একেবারে বর্জন করেন নাই, কেবল বেহুলে এ সকলের সঙ্গে বেদান্তবিজ্ঞানের বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে প্রাচীন যোগাংসকদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াই, রাজা কেবল তাহাই বর্জন করিয়া-ছিলেন। এইরূপে রাজার ধর্মে একটা বাহ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রামাণ্য বিদ্যমান ছিল।

মহর্ষি দেবেশ্বরনাথ শাস্ত্রপ্রামাণ্যসম্বন্ধে রাজার প্রতিষ্ঠিত পন্থা প্রকাশিত পরিত্যাগ করিয়াও কার্য্যত উপনিষদাদি হইতেই ব্রহ্ম-জ্ঞানপ্রতিপাদক ক্রতি সংগ্রহ করিয়া আপ-নার “ব্রাহ্মধর্ম”গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা করেন; এবং আমরণকাল-তিনি এই গ্রন্থকেই ব্রাহ্মধর্মের প্রামাণ্য ও বহিরাশ্রয়রূপে গণ্য করিতেন।

কেশবচন্দ্রই সর্বপ্রথমে তত্ত্ব ও ব্যবহারে উভয়ত বৈশেষীক শাস্ত্রপ্রাধান্যাদিকে পূর্ব অধি-কার হইতে বিচ্যুত করিয়া ব্যক্তিগত মতা-মতের শিথিল বাস্তুক্যত্বের উপরে ব্রাহ্ম-

ধর্মকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা তৎসময়ের প্রবলতম চিন্তা ও ভাবের অনুযায়ী হইয়াছিল, ইহাও যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সে সময়ে ভারতের নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে পাশ্চাত্য চিন্তা ও সাধনার অত্যন্ত প্রভাব পড়িয়াছিল। আর পাশ্চাত্য-জগতে তখন নববিজ্ঞানের প্রভাবে মানবের মন বহুশতাব্দীর কঠোর শাস্ত্রপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সত্যনির্ধারণে স্বাভিমতের অনন্তপ্রতিযোগী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে-ছিল। ইহা বিজ্ঞোহের অবস্থা ছিল, সন্দেহ নাই; এবং এই সকল সামাজিক, রাজনৈতিক বা মানসিক বিদ্রোহকালে প্রাচীন বন্ধন ছিন্ন হইয়া জনমণ্ডলীকে স্বল্পবিস্তরপরিমাণে উচ্ছ্বল করিয়া তোলে, ইহাও সত্য। কেশবচন্দ্র এই নিরঙ্কুশ মানসিক স্বাধীনতা ও উচ্ছ্বলতার যুগে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং সে সময়ে শাস্ত্রগুরু বর্জন করিয়া গুরু স্বাভিমতের উপরে ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্তই স্বাভা-বিক হইয়াছিল। কিন্তু এ জগতে আধাধানা সত্য লইয়া কোনো-কিছুই বৈদীর্ঘ্য ভিত্তিতে পারে না। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজেও সাধকমণ্ডলীর নিরঙ্কুশ স্বাভিমতের প্রতি-দ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়া, ধর্মের প্রামাণ্য ও সার্বভৌমিক প্রতিষ্ঠা আর বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। তখন কেশবচন্দ্র ব্যক্তিগত মতামতের উপরে, আদেশবাদ প্রভৃতি অদ্বৈত ও অতিপ্রাকৃত মতের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিলেন। আমাদের মতামতে নহে, কিন্তু ঈশ্বর অন্তর্ধামিরূপে আমাদের অন্তরে যে দত্যপ্রকাশ করেন, তাহাতেই ধর্মের সনাতন

প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠা, এই সিদ্ধান্ত করিলেন। তবে “মোহান্তগুরুকে” ছাড়িয়া গুরু চৈত্যা-
গুরুকে অবলম্বন করিলেন স্বাভিমতের গৌরব-
বুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু সত্য ও ধর্মের
প্রতিষ্ঠা হয় না। কেশবচন্দ্রের আদেশ-
বাদেও গোল মিটিল না। আদেশেরই বা
প্রমাণ কি? ব্যক্তিগত ধৈর্য ও মতামত
এবং ঈশ্বরাদেশের মধ্যে সত্য নির্ধারণ করিবে
কে? আমার ঈশ্বরাদেশকে তোমার
ধৈর্য বলিবার অধিকার কি?—আদেশ-
বাদে এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কেশব-
চন্দ্র তখন ব্যক্তিগত মতামত ও ব্যক্তিগত
ঈশ্বরাদেশের উপরে ও বাহিরে ধর্মের এক
প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যের প্রয়োজন অনুভব করিয়া,
অবশেষে তাঁহার শ্রীদরবারের প্রতিষ্ঠা
করিলেন। শ্রীদরবারে বসিয়া, প্রেরিত-
মণ্ডলী, অর্থাৎ তাঁহার প্রচারকগণ, সর্ববাদি-
সম্মতরূপে বাহা গ্রহণ করিবেন, তাহাই
ঈশ্বরাদেশ ও তাহাই ধর্মের প্রমাণ বলিয়া
গৃহীত হইবে, এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন।
গুরু ব্যক্তিগত মতামতের উপরে ধর্মের
প্রতিষ্ঠা যে অসম্ভব, কেশবচন্দ্রের স্মারপ্রতাপ-
চন্দ্রে ইহা বিলক্ষণই বুঝিয়াছিলেন। যে
পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ বা rationalism ব্যক্তি-
গত মতামতকে সত্যের কটিপাথররূপে
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সুযোগ পাইলে তাহার
উপরে প্রতাপচন্দ্র কখনো ঘৃণাকটাক্ষপাত
করিতে ছাড়িতেন না। অন্তদিকে কেশব-
চন্দ্রের স্মার আদেশবাদে বা শ্রীদরবারেতেও
ধর্মের সনাতন প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া তিনি
মনে করিতেন, এমনও বোধ হয় না।
কেশবপ্রতিষ্ঠিত কোন মত বা প্রতিষ্ঠান-

কেই প্রতাপচন্দ্র কখনো প্রকাশ্যভাবে প্রত্যা-
খ্যান করেন নাই, আদেশ ও দরবারের
মতেরও তিনি কখনো প্রকাশ্য প্রতিবাদ
করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু
এইজন্য তিনি যে আদেশবাদের বিষয়বস্তু
ও দরবারবাদের অসারতা না বুঝিয়াছিলেন,
এমনও বলা যায় না। কেশবচন্দ্রের স্বর্ণা-
রোহণের পরে দরবারের সঙ্গে তাঁহার গুরু-
তর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। কেশব-
চন্দ্র শ্রীদরবারে নববিধানধর্মের যে বহিঃ-
প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা
স্বীকার করিলে, প্রতাপচন্দ্র কখনো কার্য্যত
এরূপভাবে দরবারের সভ্যগণের সঙ্গে আধ্যা-
ত্মিক সহকারিতার সমুদায় সম্বন্ধ ছেদন
করিতে পারিতেন না।

রাজা রামমোহন জাতীয় শাস্ত্রসাহিত্যে
ধর্মের বহিঃপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেন।
কেশব ধর্মের বহিঃপ্রামাণ্যরূপে শ্রীদরবার
সংগঠিত করিয়াছিলেন। প্রতাপচন্দ্র এ দুয়ের
কোন পন্থাই অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু
আধুনিক উদারমতি খৃষ্টীয় আচার্য্যগণের
ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া, তিনি বিতর্ককে ধর্মের
বহিঃপ্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠারূপে অবলম্বন
করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার খৃষ্ট-
চরিত্র ও খৃষ্টীয় সাধনার প্রতি অসাধারণ
অনুরাগের উৎপত্তি হয়। McCosh, Man-
sel প্রভৃতি আধুনিক খৃষ্টীয় দার্শনিকগণ
বর্তমানযুগের যুক্তিবাদ বা rationalismকে
প্রতিহত করিতে বাইরা, আনুপ্রত্যয়বাদ বা
intuitionismএর পূর্ণতা প্রতিপাদনার্থে,
খৃষ্টকে ধর্মের বাহ্যবৃত্তি বা objective
revelationরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা

করিয়াছেন। রামমোহন, সমগ্র মানবেতিহাসের বিবর্তনের মধ্য দিয়া যে নিখিলজ্ঞান, নিখিল রস, নিখিল কৰ্মের চিরপুরাতন-চির-নবীন আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহাকেই আত্মপ্রত্যয়ের ও বাহ্যিকবাহিরের বহিঃপ্রকাশ ও বহিঃপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ম্যাক্‌কশ বা ম্যান্‌সেলের জ্ঞান তাহাকে ধর্মের অন্ত কোন সাময়িক ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার অবশেষ করিতে হয় নাই। প্রতাপচন্দ্র সমগ্র মানবেতিহাসকে রাজার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্বিচ্ছার ক্রম-প্রকাশরূপে যদি গ্রহণ করিতে পারিতেন, বিশেষভাবে খৃষ্টের আশ্রয় অবলম্বন করা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক হইয়া পড়িত। কিন্তু রাজার মনগিতা তাহার ছিল না। রাজার বিশাল পাণ্ডিত্যে তাহার প্রবেশাধিকার জন্মে নাই। রাজার গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টি তিনি কদাপি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কেশবচন্দ্রের উজ্জ্বল প্রথম প্রতিভাতে তাহার চক্ষু এমনই কলসিয়া গিয়াছিল যে, রাজার ক্ষুদ্রতর ও বিশালতর প্রতিভার উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ ও মর্যাদা রক্ষা করাও তাহার পক্ষে কদাপি সম্ভব ছিল না। এই জন্যই তিনি রাজার সর্বোচ্চ বিজ্ঞানদর্শন সমস্ত পছাও গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কেশবচন্দ্রের অল্পত পছাও প্রাণ ধরিয়া অহসরণ করেন নাই; কিন্তু ম্যাক্‌কশ-ম্যান্‌সেল প্রভৃতির ইচ্ছিতমাত্র গ্রহণ করিয়া, অন্য পথে বাইরা খৃষ্টচরিত্রকে ধর্মজীবনের প্রকাশপ্রতিষ্ঠারূপে বরণ করিয়া, সেই চরিত্রের আদর্শেই আপনার অধ্যাত্মজীবনকে গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টচরিত্র ও খৃষ্টীয় আদর্শের প্রতি তাহার এই অনুরাগ ও পক্ষপাতিত্ব নিবন্ধনই স্বদেশীসমাজে প্রতাপচন্দ্রের প্রভাব কোনপ্রকারে প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। কিন্তু অন্তর্দিকে এই কারণেই তিনি বর্তমান উদারমতি খৃষ্টীয় মণ্ডলীসকলের মধ্যে আসাধারণ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

প্রতাপচন্দ্র খৃষ্টকে ঈশ্বররূপে কখনো গ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বরের অবতাররূপেও কখনো তিনি খৃষ্টকে কোনোপ্রকারের ঐশ্বরিক মর্যাদা প্রদান করেন নাই। জিহ্বাবাদী খৃষ্টীয়ানেরা যে চক্ষে খৃষ্টকে দর্শন করেন, প্রতাপচন্দ্র সে চক্ষে কখনো খৃষ্টকে দর্শন করেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণবী পরিভাষা যাহাকে মোহান্তগুরু বলে, কিয়ৎপরিমাণে সেই চক্ষেই প্রতাপচন্দ্র খৃষ্টকে দর্শন করিতেন। সেই গুরুরূপেই তিনি খৃষ্টকে আপনার অধ্যাত্মজীবনের কেন্দ্রস্থলে বরণ করেন এবং অকৃত্রিম গুরুভক্তি সর্বদা খৃষ্টপদে অর্পণ করিয়া খৃষ্টচরিত্রকে আপনার অধ্যাত্মজীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধবীলতা যেমন সুবিশাল অশ্বখবৃক্ষকে বেঠন করিয়া, তাহারই আশ্রয়ে উর্দ্ধাদপি উর্দ্ধদেশে আপনার সুকুমার দেহবটিকে উদ্ভীত করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রতাপচন্দ্রের অধ্যাত্মজীবন সুবিশাল খৃষ্টচরিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহারই আশ্রয়ে ভগবচ্চরণ লক্ষ্য করিয়া উর্দ্ধমুখে অগ্রসর হইয়াছিল।

ইহাই বর্তমান খৃষ্টীয়জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম আদর্শ। জিহ্বাবাদী ও জিহ্বাবিরোধী,

উত্তর সম্প্রদায়ের খৃষ্টীয়ানমণ্ডলীই পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে এই উদার, এই আধ্যাত্মিক, এই দার্শনিক আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। বাহ্যিক প্রকাশিত খৃষ্টের জৈবরত্ন বা অবতারমর্যাদা অস্বীকার করেন না, তাঁহারাও চিন্তায় ও সাধনায়, কার্যে ও চরিত্রে খৃষ্টস্বকীয় অতিপ্রাকৃত মতামতের জটিলতাকে নীরখে উপেক্ষা করিয়া, শুদ্ধ খৃষ্টের মানুস্বভাব ও অধ্যাত্মচরিত্রের ধ্যান ও অনুকরণের দ্বারাই আপনাদিগের ধর্মজীবনের পরিপুষ্টিসম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন।

বৈষ্ণবপরিভাষায় বাহ্যকে মোহান্তগুরু বলে, আধুনিক খৃষ্টীয় মণ্ডলীসকল ঈশ্বর-খৃষ্টকে সেই চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতাপচন্দ্রও খৃষ্টকে সেই চক্ষেই দেখিতেন। অথচ হিন্দুর আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী বলিয়া, তিনি এই গুরু-খৃষ্টভাব ও আদর্শকে এমন গভীর, এমন সরস, এমন আধ্যাত্মিকসম্পৎসম্পন্ন করিয়া

তুলিয়াছিলেন যে, খৃষ্টজগৎ বহুশতাব্দীব্যাপী সাধনাধারাও সেরূপ করিতে পারিবে কি না, সন্দেহের কথা। প্রতাপচন্দ্রের এই মধুর, এই গভীর খৃষ্টবাদ খৃষ্টীয়জগতের সম্মুখে এক অভিনব অধ্যাত্মসম্পদভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এইজন্যই তিনি পাশ্চাত্য খৃষ্টীয়সমাজের আধুনিক আচার্যগণের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের, ও বিশেষত মার্কিণের উদারমতি খৃষ্টীয়ানেরা প্রতাপচন্দ্রের উপদেশবাক্যকে ফেনিলো, টমাস্ একেম্পিস্ এবং এমার্সনের উপদেশের সমকক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা প্রতাপচন্দ্রের স্বজাতীয় ও স্বদেশবাসিগণের পক্ষে সামান্য জ্ঞানার বিষয় নহে।

কলত প্রতাপচন্দ্র বর্তমান যুগের সভ্য-জগতের ধর্মসাধনা ও ধর্মচিন্তায় কত যে উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইংলণ্ড বা আমেরিকার না বাইলে তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না।

ত্রিবিপিনচন্দ্র পাল ।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের একটি বৈপরীত্য ।

যুরোপ ও আশিয়ার ইতিহাস আলোচনার কালে উত্তর খণ্ডের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য প্রভেদ লক্ষিত হয়। যুরোপের ব্যবহার পরমার্থশূন্য, আশিয়ার ব্যবহার পরমার্থপূর্ণ। প্রাচীন যুরোপ বলিলে বুঝা যায়, গ্রীস, রোম ও তাহাদের সংশ্লিষ্ট অসভ্য-জাতি। গ্রীসের Culture, রোমের Law

ও খৃষ্টীয় চরিত্রনীতি লইয়া বর্তমান যুরোপ। গ্রীকশিল্প, গ্রীকসাহিত্য, গ্রীকরাজনীতির মধ্যে পারমার্থিকতার প্রভাব অল্প, নাই বলিলেও অতৃপ্তি হয় না। গ্রীস-ইতিহাসে পারমার্থিকতা দ্বারা চালিত ঘটনা চক্ষে ঠেকে না। যে পৃথিবীতে মহুঘোর বাস, ইহাকেই স্মরণ ও উপভোগ্য করা

গ্রীকদের আদর্শ। গ্রীসে কলাবিৎ, শিল্পী, কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, রূপগণ্ডিত ও রাজনৈতিকের প্রাচুর্য্য। বহুপ্রকৃতির বহুজাতির একত্রে শাসন ও তাহাদের প্রতি প্রয়োজনমত প্রযোজ্য ব্যবস্থা বা আইন গ্রীসে উদ্ভাবিত হয় নাই। ইহা রোমকশক্তির বৈশিষ্ট্য। রোমকব্যবস্থাপ্রাচ্যের দুইটি মূলমন্ত্রের উল্লেখ করিলেই কথ্যটি কুটিয়া উঠিবে। Vox populi vox Dei, জনসাধারণের বাক্যই ঈশ্বরের বাক্য। ঈশ্বরের বাক্য শুনিতো শরীরশোষক তপস্তায় প্রয়োজন নাই, নিরালোক নির্জ্ঞান গিরিগহ্বরের প্রয়োজন নাই, ষাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যের প্রয়োজন নাই, উদ্যাবহ কঙ্কালমানী শ্মশানের প্রয়োজন নাই, দুর্কোথা শঙ্করাশির প্রয়োজন নাই। রাস্তাঘাট, হাটবাজার, সভাসম্মেলনে লোকে সমবেত হইয়া বাহা বলে, তাহাই ঈশ্বরের বাণী। আপন অন্তরে “হির, ক্ষীণ সুর” রূপে প্রেরিত ঈশ্বরের বাণী শুনিতো কান পাতিয়া থাকিতে হয় না। Vox populi vox Dei। রোমকব্যবস্থার আর একটি মহামন্ত্র—Salus populi suprema lex, জনসাধারণের হিতই শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা। বাহাতে জগতের কল্যাণ, তাহা শাস্ত্রসম্মত হউক আর নাই হউক, তাহা বাজকগণের অনুমোদিত হউক আর নাই হউক, তাহা শ্রেণীবিশেষের অনুমূলই হউক আর প্রতিকূলই হউক, তাহাই বথার্থ ব্যবস্থা। জনসাধারণকে একদৃষ্টিপাতে দেখিয়া তাহাদের এই পৃথিবীতে উন্নতি, অভ্যুদয়চিন্তা,—ইহাই রোমকব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস

হইতে উৎপন্ন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই রোমক-ইতিহাসে দেখা যায় না। রোমক নাগরিকের জীবন এ বিশ্বাস কখন বিশেষ জোর করে নাই।

১৬৪৮ খৃঃাব্দে ওয়েষ্টকেলিরার সন্ধির পর হইতে যুরোপের ব্যবহারকার্য সম্পূর্ণরূপে পরমার্থ-অনাশ্রিত। রুষ ও জার্মান দেশে ইহুদিভাড়া বাহারা স্মরণরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, “উহার মূলে আর্থিক স্বার্থ, পরমার্থের সহিত ইহার সূদূর সম্পর্ক, অনেকটা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাচ্য বিদ্যেবের সহিত তুলনীয়। ১৮৭০ সনের ফরাসী-জার্মানের যুদ্ধ জেন্নাইটসম্প্রদায়ের গুপ্তমন্ত্রণার ফল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু ইহার উপযুক্ত প্রমাণাতাব। এ বিশ্বাস সমূলক হইলেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। তৃতীয় নেপোলিয়ন চরিত্রগুণে আগাগোড়া যে নীতি অবলম্বন করিয়া ছিলেন, এ যুদ্ধ তাহার অবশ্রুতাবী ফল।

যুরোপে ব্যবহারকে পরমার্থসংশ্লিষ্ট করিবার চেষ্টা হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু শোণিতস্রোতে তাহার চিহ্ন পর্যাপ্ত এখন বিলুপ্ত। ত্রিশবার্ষিক যুদ্ধের (১৬১৮—১৬৪৮) পর সে চেষ্টা যুরোপে অর্থাবনীর। ইতিহাস চুর্কা করিলে বিশদরূপে প্রতীতি হয়, পরমার্থশূন্য-ব্যবহার-স্থাপনাই যুরোপবাসীর অত্যর্কিত লক্ষ্য। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে তুর্কি যুরোপ হইলেও প্রকৃতি ও উৎপত্তিভেদে বর্তমান হলে অগ্রাহ্য। রুষও কতকটা সেইরূপ।

আশিয়ার দিকে চাহিলে দেখা যায়, ইহার বিপরীত। মুশার ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ

দিগের ব্যবস্থা, মহামদের ব্যবস্থার সহিত রোমকব্যবস্থার তুলনা করিলে ইহা সহজেই বুঝা যায়। প্রথমোক্ত ব্যবস্থার আহাৰ-ব্যবহার, শ্রমবিরাম প্রভৃতি ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি পর্যন্ত দৈববাণীর উপর স্থাপিত। ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন ইহার প্রধান লক্ষ্য, লৌকিক উন্নতি-অবনতি ইহার গৌণ ফল। রোমকব্যবস্থা লৌকিক-হিতের জন্য লৌকিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য ধারণা এই যে, শক্তির মূলকেন্দ্র অতি-প্রাকৃত। সেই গুপ্ত বিষ্ণুপাদবিনিঃসৃত শক্তিগঙ্গা মহাদেবরূপী ঋষি, ব্রহ্মনি, পীর-প্যাগবরের জটামধ্যে অন্তর্হিতা হইয়া পুনরায় দেশব্যাপ্ত হইয়াছে। এই ব্যাপ্তি-লাভের পূর্বে অবশ্য নানা ভ্রমশূন্য বন্ধুরপথ অতিক্রমণ প্রয়োজনীয়। সেই অদৃষ্ট পর-দেবতার বাণী যাহারা শুনিয়াছেন, তাহারা অল্প লোকের সুবোধ্য ভাষার মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। নানা টীকা-টিপ্পনী-হাদিস-তালমুদ-পুরাণের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহা জনসাধারণের কর্ণগোচর হইতেছে। এ অবস্থার বাহা ঘটবার, তাহাই কঠিরাছে। পরদেবতা সর্বতোভাবে নিঃস্বামিক। রাজা পৃথিবীতে নিঃস্বামিক। সেই দেবতার আজ্ঞা শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণ-মোহা প্রভৃতি শ্রেণী-বিশেষ। রাজার কার্য চর্চা করা সাধারণের পক্ষে লৌকিক অপরাধ ও শাস্ত্রীয় পাপ। পুরাণে অমুক্ত রাজার চরিত্র আলোচনা সাধারণ হিন্দুর পক্ষে শাস্ত্রোক্ত পাপ। রাজার ধর্ম প্রজাপালন করা, প্রজার ধর্ম রাজাজ্ঞা পালন করা। ধর্মহীন রাজা ধর্মের

নিকট দণ্ডার্থ, প্রজার নিকট নহেন। ভারত-অন্তরত সিংহাসনপ্রাপ্তিমাঝেই রাজা প্রভু, প্রজা তাঁহার আজ্ঞাধীন। এ নিমিত্ত প্রাচ্য রাজা বেচ্ছাচারী। পিতৃহত্যা অজাতশত্রুর প্রতি দুহুদেবের ব্যবহার এখানে অরণীয়। রাজা শাস্ত্রাধীন, শাস্ত্রবিদের বশবর্তী বলিলে দৈখিবে, কার্যত তাহা নহে। শাস্ত্রবিৎ রাজার উপর শাস্তি-প্রয়োগে অক্ষম। রাজাকে ছাড়িয়া কোথায় শক্তি আছে যে, তাহা দণ্ডরূপে রাজার উপর নিপতিত হইবে? প্রজা ত সে শক্তির আধার হইবে না। কেন না, রাজাজ্ঞাপালনই প্রজার ধর্ম। প্রাচ্য ইতিহাসে এক রাজার দমনের জন্য অল্প রাজাকে ডাকিবার যে এত দৃষ্টান্ত আছে, তাহার মূল এই। আর এই একই হেতুবশত রাজার সম্বন্ধে দারাদিকারের নিয়ম অচল। যে নিয়মকে অক্ষুর রাধিতে কাহারও কমতা নাই, বাহার জন্য নিয়ম, তিনিই যে নিয়মের রক্ষা-ভঙ্গের প্রভু, তাহাকে নিয়ম বলা শব্দের ব্যক্তিচার-মাত্র। রাজ্যলোলুপ রাজসম্বন্ধিত বুদ্ধকাহিনী এজন্য প্রাচ্য ইতিহাসের এত অধিক স্থান জুড়িয়া আছে। আরও একটা কথা। রাজা যে প্রতিদ্বন্দ্বী পরাভূত করিয়া রাজা পাইলেন, সে শক্তি কাহার? এক দেবতাই সর্বশক্তির মূলধার, অতএব রাজ্যলাভমাঝেই রাজা ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত ও প্রজার প্রভু। এইরূপে আশিরাতে এক-দিকে রাজা বেচ্ছাচারী, অপর দিকে ব্যবহার পরমার্থপূর্ণ। একই কারণবৃক্ষের এ দুইটি বিভিন্ন ফল। যেখানে রাজা বেচ্ছাচারী, সেখানে রাজাজ্ঞার দ্বারা সমস্ত কার্য নিঃ-

মিত করা বা রাজা ভিন্ন অল্প পাখিৰ নিয়ামক
বীকার করা, দুই অসম্ভব। সিংহাসনরক্ষার
জন্ত সদাশক্তিত রাজার পক্ষে সৰ্ব্বতোমুখী
ব্যবস্থা স্থাপনের অবসর নাই। আর দৈবা-
ধীন ব্যবস্থা ভিন্ন অপরের অধীন ব্যবস্থার
রাজার অধিকারসকোচ ঘটে। কাজে
কাজেই পরমার্থ-আশ্রিত বিধি ও স্বেচ্ছাচারী
রাজা ছায়াতপের ভ্রার অবিচ্ছেদ্য। আশি-
য়ার লোকে মানে দুই—বাহুবল ও পরমার্থ-
ধীন ব্যবহার। রাজাকে কর দাও, আর
নিজের ধর্মরক্ষার উপায় কর—আশিয়াবাসীর
এই লক্ষ্য। রাজা যেমন কর্তব্যরক্ষার
বিষয়ে কাহারও অধীন নহেন, প্রজাও ধর্ম-
রক্ষার জন্ত কাহারও অধীন নহে, কেবল ধর্ম
জানিবার জন্ত স্বদেশের নির্দোষিত পণ্ডিতের
মুখাপেক্ষী—এই পর্য্যন্ত। বর্তমান ও অতী-
তের আলোচনার দেখা যায়, ইতিশীল
প্রাচ্যের একমাত্র পরিচালক—ঐতিহাসিক
আলোড়নের একমাত্র হেতু—বাহুবল ও
ধর্মরক্ষার চেষ্টা। ধর্মশব্দে এখানে পরিজ্ঞাপের
জন্ত বিশ্বাস বা অস্বীকারের কথা হইতেছে না।
যাহার মূল ও মূল দৈব, লৌকিক নহে,
এইরূপ ধারণাপ্রসূত ব্যবহারের নাম ধর্ম।

পরমার্থ-অসংশ্লিষ্ট ব্যবহার যে আমা-
দিগকে চালাইতে অক্ষম, ইহা আমরা না
বুঝিলেও আমাদের শাসনকর্তারা বুঝেন।
নতুবা তাঁহাদের নিকট কংগ্রেস অপেক্ষা
গৌরবান্বিত সভার গুরুত্ব থাকিত না।

লোকের মুখে তনিয়া আঁরাও মনে

করি, আমরা জড়, কার্যপরাশ্রয়। কিন্তু
যাহারা হর্গম তীর্থযাত্রী কুলবৃদ্ধিগকে
দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা বলিবেন না।
যাহারা সাজোপাজবেদকর্ত্ত ব্রাহ্মণকে দেখি-
য়াছেন, তাঁহারা এ কথা বলিবেন না। যাহারা
তীর্থ ও শিখসৈন্তকে “কুচ” করিতে দেখিয়া-
ছেন, তাঁহারা এ কথা বলিবেন না। যাহারা
একখণ্ড শাল বা কিংখাব প্রস্তুত জন্ত
শিল্পীকে জীবনশেষ করিতে দেখিয়াছেন,
তাঁহারা এ কথা বলিবেন না। এমন কি,
যাহারা জগন্নাথের মন্দির দেখিয়াছেন,
তাঁহারাও এ কথা বলিবেন না। যাহারা
বৌদ্ধ রাজা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের কীর্ত্তি পর্য্য-
লোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কখন এ কথা
বলিবেন না। আমরা জড়,—নিষ্কর্মী, কেন না,
আমরা নারীপরিবৃত হার্ক্যুলীস, গদা ছাড়া
কাটনা কাটিতেছি। আমাদের ঈশ্বরনির্দিষ্ট
কার্যের প্রতি আমরা দৃষ্টিশূন্য। আমরা
অহল্যা-পাবাগী হইয়া রামচন্দ্রের চরণকমল-
স্পর্শপ্রতীক্ষার রহিয়াছি।

Ah, God! for a man with
heart, head, hand
Like some of the simple
great ones gone
For ever and ever by,
One still strong man
in a blatant land,
Whatever they call him
what care I?

ঐমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

গহেলী ও মতিরাম ।

বাসজলের প্রাচুর্য্য বঙ্গে যেমন, বেহারে তেমন নহে। অন্তত বেনীদিনের কথা নয়, বখন খাস বাড়লার চাবারা ঘাস এবং জলের অভাবে তুহাদের গোধন লইয়া দারুণ ঐশ্বর্য্যের দিনেও বিপন্ন হইয়া পড়িত না। কিন্তু বেহার, বিশেষত দক্ষিণবেহার সৰ্ব্বদে সে কথা কখন বলা যায় না। তথায় চৈত্র-মাসের প্রারম্ভেই গোমহিষের আহাৰ্য্য ও পানীয় সংগ্রহ গোয়ালাদের পক্ষে এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়, কাজেই অনেকে সমস্ত ঐশ্বর্য্যকালটা তাহাদের লইয়া গঙ্গাপারে অথবা অন্ত কোন তৃণজলস্থলত স্থলে কাটা-ইয়া আসে এবং আবাড়ের প্রথমভাগে, আকাশে নবমেঘসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন করে। অনেক সম্পন্ন জমিদার, যাঁহারা নিজেদের তত্ত্বাবধানে গোমহিষ-পালন এবং কৃষিকার্য্য করেন, তাঁহাদের ভিতরও এই প্রথা চলিত আছে।

কলা বাহলা, গোপজাতির মধ্যে এই রীতি সৰ্ব্বজনীন। তাহাদের ভিতর বেহার ও ছোট নাগপুরে প্রথমবার যে পরীক্ষাভূতান হয়, তাহা ইহারই উৎসব। গহেলী ও মতি-রামের কাহিনীর উপলক্ষ্যও ইহাই।

গল্প বা গানের প্রথমে মতিরাম-গোপ তাহার মাতা গহেলীর কাছে অনুমতি চাহি-
তেছে, মহিষগুলি লইয়া করকিরা বাইবে ;
কেন না, দেশে তাহাদের আহাৰ্য্য এবং পানী-
য়ের বড় অভাব হইয়াছে। অনিতে পাই,

করকিয়ানামক হাম জনকপুরের পূৰ্ব্বদিকে
অবস্থিত এবং গঙ্গার তীরবর্তী। এইখানে
বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে,
করবৎসর পূৰ্বে জিহত্ত-অঞ্চলে প্রবাসকালে
আমরা একবার পূজার ছুটির সময় জনকপুর
ও ধনুকা দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রায় সৰ্ব্বত্র
সুবিভূত গোচারণক্ষেত্র এবং চারণরত ছটপুট
গাভী ও গোবৎসপাল দেখিতে দেখিতে
স্বতই মনে হইতেছিল, নেপাল হিন্দুসাম্রাজ্য
বলিয়া সম্ভবত সেখানে সেমিকে বিশেষ দৃষ্টি
আছে। সে বাহা হউক, আমরা যে পান সংগ্রহ
করিতে পারিয়াছি, তাহার আরম্ভ এইরূপ :—

খড় বিহু কলট আর পানিবিহু লালায়া
অব্ ভঁইস্ নহী রাখবো লে বাবো করকিরা।

তব্বোলে মাই গহেলী—

করকিরা করকিরা কি ঘোমরে খেটা
করকিরা জীকে কাল।

ইমসাল ভঁইস রাখব বিলম্বাকে।

তব্বোলে মতিরাম—

তুন্সে মাই গহেলী রোহণ তরতো দুগলিরা,

কেইসে হব্ ভঁইস রাখবো বিলম্বায়া।

তব্বোলে মাই গহেলী—

শাপ্ পুহো মিলকরক পাকড়বো বুগী,

গড়কে খিলাওব ছিলা খাস জমার,

ওর কাঁটা সে পানি ভরকে

পিলাওব ভঁইসকে।

তব্বোলে মতিরাম—

তুন্সে মাই গহেলী

সব্বে করকিরা রাখবো কীকহরি থৈ

হাব্ কেইসে খিলা রাখব বিলম্বা।

করকিয়া অনেকদূর, মাতার ইচ্ছা নয় যে, মতিরাম সেখানে যায়। কিন্তু বাজার দ্রুত পুত্র অধীর হইয়া উঠিয়াছে। রোহিণীর সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, যুগশিরা আসিয়া পড়িল, মহিষদের লইয়া। কিরূপে আমি আর এখানে বিলম্ব করিতে, পারি? মা বলিতে-ছেন, বাপু, তোমার গিয়া কাজ নাই, আমি গুজবধূন মহিষদের সেবাশ্রমচার ব্যবস্থা করিব, হুজনে খুরপী লইয়া ঘাস ছিলিব, আর কলসে জল ভরিয়া তাহাদের পান করাইব। কিন্তু সে সব ওজর শুনিলে মতিরামের চলে না। সে করকিয়া-অঞ্চলে বাজার দ্রুত জাতিভাইদের কাছে নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া “কীরহেরি” বা মাণ্ডল আদার করিয়াছে, আর দেরি সহিতেছিল না।

মাতা এবং জীর অম্বনর ও প্রার্থনা না মানিয়া মতিরাম সদলবলে প্রবাসঘাড়া করিল।

বোলে বলজোরি মতিরাম ভঁইস হাঁকাও করকে ।

পৌছা মতিরাম তিরছাপুর গাঁও ।

তীরকে বেটা তিরায়েন ইসে খাঁতা সায়ের,

এহ্না শুনকে মতিরাম গাঁওয়ে

ভঁইস হেলায়ে দিয়া ;

হানহমর খিঁচকে ভঁইসকে বিলায়েন লাগা

আর লাগুনীবীরো গানে লাগা ।

তিরছাপুর গ্রামে পৌছিয়া মতিরাম, তীরের কস্তা তিরায়েন খাঁতা পিষিতে পিষিতে যে সারিগান পাহিতেছিল, তাহা শুনিল এবং আপনার মহিষের দল সেখানে ছাড়িয়া দিল। তাহার লোকের চাল হইতে খড় টানিয়া পাহিতেছে, মতিরামের সে দিকে দ্রুতগমন নাই, সে তখন মনের আনন্দে “লাগুনীবীরো”

গান শ্রবণ করিয়া দিল। ইহাতে “তীরকে বেটা তিরায়েন” খাঁতা ও সারির গান ছাড়িয়া বাহিরে আসিল এবং মহাবিরক্ত হইয়া উঠিল।

বার বরিব হাম রহিলি তিরছাপুর গাঁও

কতি না শুনলি লাগুনীবীরো ।

কোন ঐছন লাগুনীবীরো গাওলক ।

খাঁতা ছোড় করকে পুছে তীরকে বেটা তিরায়েন

কাঁহা চাববাস কাঁহা কৈলা পেগাঁও ।

তাহার প্রমোত্তরে মতিরাম বলিল যে, বেগুয়াগ্রামে তাহার বাস, আর করকিয়াতে যাইতেছে।

এখন তিরছাপুরগ্রামে তীর নিশ্চয় একটা মাতব্বর লোক, তাহাতে বারবছর সেখানে তাহার বসবাস। তাহার কস্তা তিরায়েন মতিরামের লাগুনীবীরো গান গাওয়ার বেয়াদবি মাক্ করিবে কেন? সে বলিল যে, তিরছাপুরের মাণ্ডল চুকাইয়া দে, নহিলে মহিষ পাক হইতে দিব না। কাজেই ঝগড়া বাধিল।

তব্ বোলে তীরকে বেটা তিরায়েন—

মাণ্ডল লাগে তিরছাপুরকে

সে চুকার সে তব্ ভঁইস পার হোয়ে দেব ।

তব্ বোলে মতিরাম—

বার বরিব হাম করকিয়া ভঁইস চরাইলু

সে ইস্ রাত্তা মে কতি নেহী মাণ্ডল চুকাইলু ।

অব্ কেইসে হাম মাণ্ডল চুকাইবো ।

বলে বলজোরি ভঁইস লে ভাগা ।

সমান উত্তর করিয়া মতিরাম ত মহিষ লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল, কিন্তু তিরায়েন— সে ভাগ্যবানের বেটা—এই অপমান উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাণের কাছে সে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল এবং নানা কথা বলিয়া তাহাকে রাগাইয়া দিল। কস্তাকে একটা

বিদেশী আহীর গালি দিয়া গিয়াছে শুনিয়া,
তীর মতিরােমের পাছে পাছে ছুটিল এবং
তাহার মহিবগুলি “হেঁকিয়া” মাণ্ডল চাহিল ।

তব্বোলে মতিরােম—

সে কোন্ তুঁ ভঁইস ছেকে হে !

তব্বোলে তীর—

তিরছাপুরকে যে মাণ্ডল হৈ সে চুকার লে

তব্বার দেব । •

‘তখন আর জোরজবরদস্তি খাটে না
দেখিয়া মতিরােম দৈববলের আশ্রয় লইল এবং
মাতা কাত্যায়নী তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া হৃদ্ধ
তীরটাকে অঙ্গ করিয়া দিলেন । গোপপুত্র
অতঃপর নিরাপদে, ফরকিয়াতে উপনীত হইল
বটে, কিন্তু কাত্যায়নী মাতার নিকট প্রভি-
শ্রুত পূজা দেওয়ার কথাটা একেবারে ভুলিয়া
গেল । ইহাতে তাহার মহিব মরিতে
লাগিল । মতিরােম আসল কথা ভুলিয়া মনে
ভাবিল, মাতার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া আসি-
রাছে, হয় ত তিনিই শাপ দিয়াছেন ।

তব্বহ্নরে মতিরােম মাই গহেলী ।

সে মাই গহেলী তুহি কি সরাপ লেলি

সে ভঁইস মরা লাগুলো ।

মাতা কাত্যায়নী তাহার শুক পুত্রকে
বৃদ্ধার রূপ ধরিয়া একবার সাবধান করিয়া
দিলেন, তাহাতেও কিন্তু তাহার চক্ষু ছুটিল
না । তখন অপনার জননীর কথাই সে
ভাবিতেছিল,—এ জিভুবনে তাঁর চেয়ে আর
বড় কে ? না, আমি কাত্যায়নীর পূজা
দিব না ।

তব্ব, আদমি স্বরূপ হো করকে মারি কাতানে

খাড়া হোগেল, বুড়িকা সামান ।

যে মতিরােম সে আনেকে বধে

মাতা কাত্যায়নীকে পূজা কবল লে

সে পূজা ভুল গেল, এই সে ভঁইস মরা বার ।

তব্বোলে মতিরােম—

সেঁ হামারা মাই গহেলীসে কোন্ বাচন হৈ

সে হম পূজা নেহী দেবি কাতানে কে ।

এত্না শুনকে চলগেল বুড়িকা ।

তখন মতিরােমের বড় বিপদ ঘটিল ।
বৃদ্ধা চলিয়া যাওয়ার পর সে যেমন ছুছ হুহিতে
বসিল, অমনি ব্যাঘ্রের রূপ ধরিয়া মাতা
কাত্যায়নী তাহাকে বধ করিলেন । অন্তিমে
সে প্রার্থনা করিয়াছিল—

শুনগে মাই কাতানে, হামরাকে তো মারবে করেহ
হামারা মাই গহেলী সে মোলাকাং করয়ে দে ।

অতঃপর দেবী সাধুর রূপ ধরিয়া বেণুয়া-
গ্রামে অবতীর্ণ হইলেন । গহেলী পুত্রের
খবর না পাইয়া জীবন্ত হইয়াছিল । সাধুজী
তাহাকে সর্ব্বনেশে খবর শুনাইলেন ।

গহেলী সহসা সে কথার বিশ্বাস করিল
না, নিজে ফরকিয়া চলিয়া গেল । তথায়
তাহার শোকদঃখে করুণার্জ হইয়া মাতা
কাত্যায়নী বলিলেন যে, পূজা পাইলে সব
তিনি বাঁচাইয়া দিবেন । তদবধি মহিষেরা
ঘরে ফিরিলে আবাচমাসে তিনি গোপগৃহে
পূজা পাইয়া আসিতেছেন ।

তব্ব, বোলে মাই কাতানে হামারা পূজা দে ।

তব্ব, সবদিন ফরকিয়া ভঁইস চরতো ।

তব্ব, মাই গহেলী বোলা মাই কাতানে কো মন্দা ।

সে পূজা হাম তোরা দেব আবাচ মাহিনা সে

ভঁইস মোটারকে সে ঘাব বর পর তব্ব ।

আজ, দিন্ত সে ভঁইসকে কুহ নেহী হোম,

তব্ব, হরসাল পূজা দেব ।

তব্ব, বোলে কাতানে মাই—

আজ, দিনসে কুহ ভঁইস কো নেহী হোপা,

হরসাল পূজা হাম দেব ।

এত্না শুন্তে মাই গহেলী ঘর আইল ।

ঐশ্বরচন্দ্র মজুমদার ।

সাহিত্য ও ব্যাকরণ ৮

রামায়ণের-রচনাকাল শীর্ষক প্রবন্ধগুলি সমাপ্ত হইবার পূর্বেই শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় আবার “বঙ্গদর্শনে” একটি প্রবন্ধ উপস্থিত করিয়া লিখিয়াছেন,— “প্রবন্ধগুলি শেষ হইবার পূর্বে কোন সমালোচনা করা অসম্ভব; কিন্তু এই প্রবন্ধ শেষ হইবার পূর্বে একটি কথা * * বিচারার্থ উপস্থিত করিতেছি। কথাটা এই—যাহা পাণিনির আদর্শে রচিত নহে, তাহাকেই অতি প্রাচীন বলিয়া অস্বীকার করা চলে কি না ?”

ইহার সরল এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে—চলে না। কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্রশ্নকর্তা পরিতৃপ্ত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহার প্রশ্নটি প্রবন্ধলেখককে পত্র লিখিয়া জানাইলেও চলিত; তথাপি প্রশ্নের গুরুত্ব চিন্তা করিয়া প্রশ্নকর্তা তাহাকে ‘বঙ্গদর্শনে’ পত্র প্রেরণ করিয়া প্রেক্ষাগ্রহণে বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন। এক্ষণে ক্ষেত্রে এত সংক্ষিপ্ত উত্তর মনঃপূত না হইবারই কথা।

লিখনভঙ্গীতে প্রশ্নটি কিছু জটিল আকারে প্রভিভাভ হইয়াছে। পাঠ করিলেই মনে হয়,—যেন রামায়ণের-রচনাকাল-শীর্ষক প্রবন্ধমধ্যেই এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করিবার কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে; বৃষ্টি কোন স্থলে আকারে-ইজিতে বলা হইয়াছে—যাহা পাণিনির আদর্শে রচিত নহে, তাহা

অবশ্যই অতি প্রাচীন। নচেৎ এমন সংশয় উপস্থিত হইবে কেন ?

মূল প্রবন্ধে এমন সংশয় উপস্থিত হইবার কারণ নাই। তথাপি এমন সংশয় উপস্থিত হইল কেন ? মজুমদারমহাশয়ের প্রশ্নপত্রে তাহার আভাস পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। তাহা এই—“পাণিনি-ব্যাকরণ রচিত হইবার পরক্ষণ হইতেই যে ঐ ব্যাকরণের বিধি সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা নহে। কাব্যায়ন যখন ইহার বার্তিক রচনা করিয়া লোকগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং পতঞ্জলি যখন মহাভাষ্য রচনা করিয়া পাণিনির আদর্শ অবশ্যগ্রহণীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তখনও সংস্কৃতরচনায় পাণিনির আদর্শ অবলম্বিত হয় নাই।” এই কথাগুলি যে ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্বতই মনে হইতে পারে—এ সকল কথা বৃষ্টি স্বতঃসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য। মজুমদারমহাশয় এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য কোথায় পাইয়াছেন, প্রশ্নপত্রে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। প্রশ্নপত্র পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি যেন বলিতে চাহেন,—(১) পাণিনিমুনি ব্যাকরণ রচনা করিয়া ভবিষ্যৎশীল লেখকগণের সম্মুখে একটি আদর্শ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; (২) সে আদর্শ ব্যাকরণরচনার পরক্ষণ হইতেই সর্বত্র স্বীকৃত হইতে পারে না, তাহাতে সময় লাগিবার কথা; (৩)

কিন্তু কোন সময়েই তাহা সর্বত্র স্বীকৃত হয় নাই ; (৪) 'তত্ত্বজ্ঞান চেষ্টার' ফল ছিল না ; (৫) এমন কি, কাব্যায়ন ঋষিগণ রচনা করিয়া এবং পঞ্চমুখ মহাত্মা রচনা করিয়া পাণিনির আদর্শকে লোকগ্রাহ্য করিবার জন্য বিশেষভাবেই চেষ্টা করিয়াছিলেন ; (৬) কিন্তু সংস্কৃতরচনা তাহাকে কোন-কালেই আদর্শ বলিয়া স্বীকার করে নাই !

পাণিনি কি উদ্দেশ্যে সংস্কৃতরচনা প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা একটি সূত্রে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহা ঐতিজ্ঞাসূত্রে বলিয়া বৈয়াকরণসমাজে সর্বত্র সুপরিচিত। তাহাতেই সংস্কৃতরচনার প্রয়োজন প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা এই—

“অথ শব্দানুশাসনম্ ।”

ইহার অর্থ “শব্দ-শাসন” নহে ; ইহার অর্থ শব্দের “অনু-শাসন” । অনু-উপসর্গটি ‘বিনা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় নাই ; সূত্রের একটি বর্ণও বিনা প্রয়োজনে উচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হইবার নিয়ম ছিল না। অনু-শব্দের অর্থ—পশ্চাৎ। শাসন এবং অনুশাসনের মধ্যে উপসর্গযোগে বিলক্ষণ অর্থপার্থক্য সূচিত হইয়াছে। অনু-উপসর্গের ব্যবহারে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে—আগে-শব্দ, তাহার পর শাসন ; আগে সাহিত্য, তাহার পর ব্যাকরণ।

পাণিনির পূর্বকালবর্তী লৌকিক ও বৈদিক সাহিত্যের শব্দ অর্থাৎ সাধুশব্দ যে ভাবে ব্যবহৃত হইত, সেই ব্যবহারের “অনু-শাসন” ব্যাখ্যা করাই ব্যাকরণরচনার প্রয়োজন বলিয়া ঐতিজ্ঞাসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে কেহ সেই সকল

শব্দের সেরূপ অনুশাসনক্রমে ব্যবহার করিবেন কি না,—ভবিষ্যতে কখন সে প্রশ্নালী অবলম্বিত হইবে কি না,—সে কথা পাণিনি চিন্তা করেন নাই। তিনি অতীত এবং বর্তমান সাহিত্য ব্যাখ্যা করিবার জন্যই ব্যাকরণরচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন ; ভবিষ্যতের কথা তাহার অধিকারের অন্তর্গত হইতে পারে না বলিয়াই, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া অনধিকারচর্চার চেষ্টা করেন নাই। তিনি কোন সূত্রেই এমন কথা বলেন নাই, —সংস্কৃতরচনার চিরকালই এই সকল নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হইবে। তিনি বরং ইহাই বলিয়া গিয়াছেন,—এইরূপ নিয়মে সাধুশব্দ ব্যবহৃত হইতেছে—এইরূপ নিয়ম লক্ষিত হইতেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। পাণিনির সময় পর্য্যন্ত যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তিনি কেবল তাহারই শব্দানুশাসনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনাগত ভবিষ্যতের অপরিজ্ঞাত সাহিত্যের শব্দানুশাসনের কথা ব্যাকরণের অধিকারভুক্ত হইবার উপায় নাই ইচ্ছা করিলেও, সেরূপ ব্যাকরণসূত্র রচনা করা অসম্ভব। ব্যাকরণ-শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার করিলেই তাহা সুব্যক্ত হয় ; তাহাকে বেদান্ত বলিয়া নামকরণ করা হইয়াছিল কেন, তাহাতেও সে কথা পরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। আগে বেদ ; তাহার পর বেদ বুঝিবার জন্য বেদের অঙ্গ—ব্যাকরণ। পাণিনিব্যাকরণ বৈদিক ও লৌকিক শব্দের অনুশাসন করিয়াছিল ; অতএব আগে বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্য, তাহার পর—পাণিনিব্যাকরণ। সে ব্যাকরণ কেবল পাণিনির সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত

সাহিত্যের শব্দানুশাসন করিয়াই নিরন্ত হইয়াছিল।

পাণিনির গ্রন্থের নাম “ব্যাকরণ,” তাহা “সংস্করণ” নহে। যাহাকে “সংস্করণ” বলা যাইতে পারে, তাহা স্বাক্ষকে শাসন করিতে পারে। তাহারই নাম “গ্রামার।” ব্যাকরণ “গ্রামার” নহে;—ঠিক তাহার বিপরীত গ্রন্থ। ব্যাকরণ অতীত-সাহিত্যের প্রকৃতি বিচার করিয়া তাহাকে বুঝিয়া লইবার সুযোগ প্রদান করে। বিভাগলয়ে “গ্রামারকে” ব্যাকরণ বলিয়া অথবা নামকরণ করায়, আমরা এক্ষণে যাহাকে ব্যাকরণ বলিতেছি, তাহার সকল গ্রন্থই প্রকৃতপক্ষে ব্যাকরণ নহে; যাহাকে আবার না বুঝিয়া “গ্রামার” বলিতেছি, তাহাও প্রকৃতপক্ষে “গ্রামার” নহে। পাণিনিব্যাকরণকে “পাণিনি-গ্রামার” বলিতে গিয়া সাহেবেরা ভুল করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর শীঘ্র দূরীভূত হইতেছে না! এই ভুল সামান্য ভুল নহে; ইহারই নাম স্থলে ভুল। ইহার জন্তই লোক পাণিনিব্যাকরণকে বিভীষিকার চক্ষে দর্শন করিতেছে; তাহা যে কাব্যের ভায় মধুময়, বিজ্ঞানের ভায় শিক্ষাপ্রদ, সে কথা বিস্মৃত হইয়া তাহাকে “গ্রামারের” ভায় নীরস ভাবিয়া সংস্কৃতশিক্ষাধিগণ দ্বারে পলায়ন করিতেছেন। পাণিনিব্যাকরণ আর কিছুই নহে; পাণিনির সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত সাহিত্যের প্রকৃতিবিচারের বত্রিশটি বিশদ বস্তুত।

বিশিষ্ট বিচারপদ্ধতি সংস্থাপিত করিবার জন্ত যাহাকে “পাণিনি-যুগ” বলিয়া নামকরণ করা হইয়াছে, তাহা পাণিনির পরবর্তী সাহিত্যযুগ নহে;—পূর্ববর্তী সাহিত্যযুগ।

সাহিত্য যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া থাকে; মূল প্রকৃতি অবিকৃত থাকিলেও, শাখা-প্রশাখা পরিকল্পিত আকারে প্রতিভাত হয়। পাণিনির সময়ে যে সাহিত্য বর্তমান ছিল, কাত্যায়নের সময়ে তাহা অপেক্ষা কত নূতন সাহিত্য উদ্ভূত হইয়া কত নূতন নূতন রচনারীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল! সেই অভিনব সাহিত্যের সকল কথাই পাণিনিহুত্মসারে ব্যাখ্যাত হইবার উপায় ছিল না। পাণিনিব্যাকরণমাত্র সম্বল করিয়া বসিয়া থাকিলে সে সাহিত্যের সকল কথা ব্যাখ্যাত হইতে পারিবে না বলিয়াই, কাত্যায়ন বার্তিকসংযোগে পাণিনির পুরাতন ব্যাকরণকে অভিনব সাহিত্যের শব্দানুশাসনের প্রয়োজনসাধনের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিও ভবিষ্যতের জন্ত কোন আদর্শ-সংস্থাপনের কামনা করেন নাই; তিনিও অনধিকারচর্চায় হস্তক্ষেপ করিবার মত উচ্ছ্বল লেখক ছিলেন না। পাণনিকে লোকগ্রাহ্য করিবার জন্তও কাত্যায়নের চেষ্টা ছিল না। তিনি কেবল ১৫০০ পাণিনি-হুত্মে প্রায় ৪০০০ বার্তিক সংযোগ করিয়া এক বিচারগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পাণিনি-ব্যাকরণের কঠোর সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সমালোচনা সকল স্থলে সমীচীন হয় নাই; কোন কোন স্থলে সমালোচকশুলভ হুস্তবিচারে সমালোচনার প্রকৃত লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কাত্যায়নের পরে এবং পতঞ্জলির পূর্বে আবার অভিনব সাহিত্য উদ্ভূত হইয়া কত নূতন নূতন রচনারীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। তাহার

সকল কথা পাণিনির হৃদ্রে এবং কাত্যায়নের বার্তিকে ব্যাখ্যাত হইবার উপায় ছিল না। সেই অবস্থায় ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্য রচনা করিয়া পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত সমগ্র সাহিত্যের শব্দানুশাসন ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পতঞ্জলিও সমগ্র হৃদ্রের বিচার করেন নাই, যেখানে বিচার আবশ্যক, সেখানেই বিচার করিয়া গিয়াছেন। সে বিচারে কাত্যায়নের বহুসংখ্যক বার্তিকহৃদ্র সমালোচিত হইয়াছে; এবং যে সকল বার্তিকহৃদ্র অনাবশ্যক ছিল, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই মুনিজ্ঞর ভারতীয় সংস্কৃতসাহিত্যের তিনটি প্রসিদ্ধ রচনাযুগের রচনারীতির ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত হইয়া নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগকে সসঙ্গমে নবন্ধ্য করিয়া, শিষ্ট শিষ্যের জ্ঞান চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসসকলনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, সে চেষ্টা সফল হইতে পারে।

রামায়ণে যে রচনারীতি অভিযাক্ত হইতেছে, তাহা কি সম্পূর্ণরূপে পাণিনিহৃদ্রের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে? পারিলে বলিতে হইবে, রামায়ণ পাণিনিযুগের গ্রন্থ; না পারিলে, রামায়ণকে পাণিনিযুগের পর-বর্ত্তী গ্রন্থ বলিবার কারণ উপস্থিত হইতে পারিবে। তখন আবার বার্তিক এবং ভাষ্য ধরিয়া দেখিতে হইবে, রামায়ণের রচনারীতি তদ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে কি না। এই বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই যে রামায়ণের-রচনাকাল-নির্ধারক প্রবন্ধ লিখিত

হইবে, সে কথা প্রথম প্রবন্ধেই উল্লিখিত হইয়াছে। “রামায়ণরচনার কোন কোন স্থলে পাণিনিনিবদ্ধ নিয়মের অঙ্গবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না”—মজুমদারমহাশয় লিখিয়াছেন যে, মূলপ্রবন্ধে এই কথা প্রদর্শিত হইতেছে। কেন হইতেছে, তাহা দেখিলেই সংশয় নিরস্ত হইতে পারিত। ইহাতেই দেখা যাইতেছে—রামায়ণ পাণিনির পূর্ববর্ত্তী গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত এই একটি কথারই বিচার সমাপ্ত হয় নাই। ইতাবসরে মজুমদারমহাশয় গ্রন্থ উৎখাপিত করায় তাহার উত্তর দিতে গিয়া মূলপ্রবন্ধের অন্তঃসরণে বিলম্ব ঘটয়া গেল। বঙ্গসাহিত্যে এই সকল আলোচনা বিচারবাহুল্যে পাঠক-সমাজের ধৈর্য্যচ্যুতি সাধন করে। এরূপ ক্ষেত্রে মজুমদারমহাশয়ের জ্ঞান বিশিষ্ট পাঠক গ্রন্থ উৎখাপিত করিয়া প্রবন্ধলেখককে আশাতিরিক্ত সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদের অতীত-কাহিনী বখাষোপ্যক্ৰপে সঙ্কলিত হয় নাই। তন্মত্রে স্বদেশে-বিদেশে সকলেই বলিয়া থাকেন,—আমাদের ইতিহাস নাই। নাই,—তাহা সত্য কথা। কিন্তু উপাদানের অভাবকে তাহার কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যে দেশে আমাদের জ্ঞান বিপুল পুরাতনসাহিত্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, সে দেশের ইতিহাস-সকলনের উপাদানরাশির অভাব আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু উপাদানগুলি এখনও ইতস্তত বিকিপ্তভাবে ভস্মাক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! এরূপ অনেক উপাদান ত্রিসুনিব্যাকরণের কল্যাণে চিরজীবী হইয়া রহিয়াছে। এতদ্যেক শব্দের ভিতর দিয়া

কত পুরাকাহিনী আশ্রয়প্রকাশ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছে ।

ত্রিভুনি-ব্যাকরণ কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে প্রকৃত তথ্য তমসাজ্জ হইয়া পড়িয়াছে । এক সময়ে সাহেবেয়া ভাবিয়াছিলেন,—কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি বুঝি পাণিনির টীকাকার । কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি কোঁন টীকা রচনা করিয়াছিলেন কি না, সে কথাই অমুসন্ধান না করিয়াই, সাহেবেয়া বাস্তবিক ও ভাষাকে টীকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার পর তাঁহারা যখন দেখিলেন, পাণিনির সকল সূত্রেই বাস্তবিক বা ভাষা নাই, তখনও তাহার কারণ অমুসন্ধান না করিয়াই, সাহেবেয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন,—যে সকল সূত্রের বাস্তবিক বা ভাষা নাই, তাহা পুরাতন নহে, প্রকৃষ্ট ; পুরাতন হইলে, অবশ্যই বাস্তবিক ও ভাষা দেখিতে পাওয়া যাইত । কেহ কেহ আবার উদাহরণ-প্রত্যাধাহরণগুলি পাণিনি-বিরচিত মনে করিয়া পাণিনি-ব্যাকরণের আধুনিকত্বসংস্থাপনেও বহুপরিকল্প হইয়াছিলেন । ইহারা সকলেই একবাক্যে স্থির করিয়া গিয়াছেন,—পাণিনিব্যাকরণ প্রচলিত হইয়া, সংস্কৃতসাহিত্যকে “পাণিনীর ছাঁচে” ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে,—সমগ্র পরবর্তী সংস্কৃতসাহিত্য কেবল পাণিনিকে মানিয়া চলিবার জন্যই গলদগর্ণ হইয়াছে ! সাহেবদিগের পক্ষে এরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হওয়া অসম্ভব নহে । কিন্তু এই সকল ভ্রমপ্রমাদ যে আমাদের প্রকৃত পুরাতনামুসন্ধানের পক্ষে কত বিষবাধার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, মজুমদারমহাশয় তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন । তথাপি তিনিও যেন এই

সকল সিদ্ধান্তেরই অমুসন্ধান করিয়া আসিতেছেন ।

“পাণিনিব্যাকরণ রচিত হইবার পরক্ষণ হইতেই যে ঐ ব্যাকরণের বিধি সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা নহে ।” মজুমদারমহাশয়ের এই উক্তি যেন বলিতে চাহিতেছে,—পাণিনি-ব্যাকরণ রচিত হইবার পরক্ষণ হইতেই “পাণিনীর ছাঁচ” প্রচলিত হয় নাই—তাহা ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইয়া থাকিবে—তাহা সময়সাপেক্ষ বলিয়াই তাহাতে সময় লাগিবার কথা । কিন্তু মজুমদারমহাশয় আবার নিজেই দেখাইয়াছেন,—কাত্যায়ন হইতে ভট্টকুমারিণ পর্য্যন্ত কাহারও সময়েই পাণিনিব্যাকরণের বিধি সর্বত্র স্বীকৃত হয় নাই ! এরূপ অসঙ্গতির কারণ কি ? কারণ আর কি হইতে পারে ? ইংরাজী ধরিয়া সংস্কৃত-অধ্যয়নের চেষ্টা !

যুগে যুগে সাহিত্যের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে । সকল দেশেই তাহার প্রভাব দেখা প্যমান । ভারতবর্ষে তাহার ব্যতিক্রম ঘটবার কারণ ছিল না । এই সকল বিভিন্ন সাহিত্যযুগের গ্রন্থবিচারের কি কোনই উপায় নাই ? তাহার জন্যও কি আমাদেরকে নিরন্তর পরমুখাপেক্ষী হইয়া বিদেশের পণ্ডিতসমাজের চরিত্তচর্য্য লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে ! আমাদের স্বদেশের সাহিত্যে কি তথ্যামুসন্ধানের উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না ?

উপায় আছে । আগে সাহিত্য, তাহার পর ব্যাকরণ,—এই সহজ কথাটি স্মরণ করিয়া রাখিলেই, উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে । কে-কোন পুরাতন গ্রন্থ ধরিয়া,

তাহার রচনারীতি পর্যালোচনা করিয়া, একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা যাইতে পারে ; কঠিন হইলেও এই কার্য অসম্ভব নহে। মনে করুন, রামায়ণ ধরিয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। রামায়ণে দেখিলাম,—

“আশ্চর্যমিদমাখ্যানং মুনির্নাসম্প্রকীৰ্ত্তিতম্।”

ইহার অর্থ—“মুনিকর্তৃক সম্প্রকীৰ্ত্তিত এই আখ্যান আশ্চর্য্য।” এখানে “আশ্চর্য্য” বলিতে কি বুঝিব ? টীকাকার বলেন,—মনোহর। তাহাতে মোটামুটি ভাব বুঝিতে কষ্ট না হইলেও, আশ্চর্য্য-শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য সুব্যক্ত হয় না। রামায়ণে এই “আশ্চর্য্য” শব্দটি কি কেবল এই এক স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে ? নির্ঘণ্ট খুলিয়া দেখিলাম, তাহা নহে,—আরও অনেক স্থলে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন স্থলে আশ্চর্য্য-শব্দে কি বুঝিব, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই। ত্রিমুনি-ব্যাকরণের শরণাপন্ন না হইলে সংশয় দূর হইবার উপায় নাই।

পাণিনির সময়ে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহাতে “অ-নিত্য” এই একমাত্র অর্থেই “আশ্চর্য্য”-শব্দ ব্যবহৃত হইত ; অন্য কোন অর্থ পরিচিত ছিল না। পাণিনিহুত্রে সেই একমাত্র অর্থই উল্লিখিত হইয়াছে।

“আশ্চর্য্যমনিত্যে” ৬।১।১৪৭

এই অর্থ এক্ষণে প্রচলিত নাই ; ক্রমে ক্রমে এই অর্থ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়াছিল, তাহার অঙ্গসন্ধান আবশ্যক। এই পুরাতন প্রচলিত অর্থ সহসা বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। কাত্যায়নের সময়ে “আশ্চর্য্য” বলিতে “অ-নিত্য” বুঝাইত, “অদ্ভুতও” বুঝাইত। পাণিনির পরে এবং কাত্যায়নের

পূর্বে কোনসময়ে এই নূতন অর্থটি প্রচলিত হইয়া থাকিবে। এই নূতন অর্থটি পুরাতন হইতে পৃথক্। স্তত্তরাং কাত্যায়ন পাণিনিহুত্রে একটি বার্ত্তিক সংযোগ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

“আশ্চর্য্যমনিত্যে অদ্ভুতে চ।”

পতঞ্জলির সময় পর্য্যন্ত এই উভয় অর্থ প্রচলিত থাকিরা, পতঞ্জলির পর কোনসময়ে “অনিত্য”-অর্থটি বিলুপ্ত হইয়া, “অদ্ভুত”-অর্থটি বর্ত্তমান আছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে দুইটি অর্থই উল্লিখিত আছে ; কিন্তু পতঞ্জলির পরে যে সকল অভিধান প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে আর “অ-নিত্য” অর্থটি দেখিতে পাওয়া যায় না। কালে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অনিত্যের অর্থ “ধ্বংসশীল” নহে। অ-নিত্য Rare ; অদ্ভুত wonderful ; অ-নিত্য নূতনের আভাস ; অদ্ভুত বিশ্বের আতিশয্য।

এই দুইটি অর্থের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আকাশে যে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র উদ্ভিত ও অন্তর্মিত হইয়া থাকে, তাহারা ভূপতিত হয় না কেন ? ইহা কি আশ্চর্য্য নহে ? আশ্চর্য্য বটে। কিন্তু আশ্চর্য্য হইলেও, ব্যাপারটি অ-নিত্য (Rare), নূতন নহে ; কেন না, প্রত্যহই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহা আশ্চর্য্য বটে ; কিন্তু এখানে আশ্চর্য্য-শব্দের অর্থ “অদ্ভুত” অর্থাৎ বিশ্বব্যবহ। নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া অ-নিত্য নহে ; বখনই তাবিয়া দেখি, তখনই বিশ্বের অতিকৃত্ত হই বলিয়া অদ্ভুত—বিশ্বব্যবহ ! পতঞ্জলি এই উদাহরণ ধরিয়াই অর্থপার্থক্যের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন

আশ্চর্য্যশব্দের এই উভয় অর্থের মধ্যে যে শব্দের বিচারে রামায়ণের রচনাকালের বিলক্ষণ পার্থক্য আছে, ভগবান্ পতঞ্জলি * আভাস প্রাপ্ত হইতে পারি।

তাহা বিশদভাবে প্রদর্শিত না করিলে, কৃতক নিরন্ত হইত না।

“আশ্চর্য্যমিমাখ্যানম্।”

এই আখ্যান (রামায়ণ) আশ্চর্য্য,—

ইহার অর্থ কি বিস্ময়াবহ? এই আখ্যান (রামায়ণ) আশ্চর্য্য—অনিত্য—নূতনত্বময়—

এইরূপ বলিলেই কি অর্থসঙ্গতি সুরক্ষিত হয় না? এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত কি না, সুধী

পাঠক সুধীর হইয়া তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন। রামায়ণ হইতে আশ্চর্য্যশব্দ-

প্রয়োগের আর একটি উদাহরণ-উদ্ধৃত করিব। রাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবী বনগমন

করিবার সময়ে রামলক্ষ্মণের সঙ্গে ধনুর্দীপ ছিল। একদিকে সন্ন্যাসীর সৌম্যবেশ,

অন্যদিকে ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রশস্ত্র,—একদিকে অপরূপ রূপলাবণ্য, অন্যদিকে সন্ন্যাসের

কঠোর আত্মত্যাগ,—ইহাতে রামলক্ষ্মণ-সীতাদেবীকে দেখিয়া বননিবাসী ঋষিসমাজ

“আশ্চর্য্যভূত” দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন।

“রূপসংহননং লক্ষ্মী সৌকুমার্য্যং হৃদেণতাম্।

দদৃশুঃকিমিত্রাকার্য্যং রামস্য বনবাসিনঃ।

বৈদেহীঃ লক্ষ্মণঃ রামঃ নৈজেরনিমিষৈরিব।

আশ্চর্য্যভূতান্ দদৃশুঃ সর্ব্বং তে বনবাসিনঃ।”

৩।১।১৩-১৪।

এখানে “আশ্চর্য্য”-শব্দের অর্থ কি?

এখানে যে বিস্ময়ের ভাবই সমধিক প্রেরণ, তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া বাইতেছে।

তথাপি নূতনত্বেরও আভাস আছে। সে অরণ্যে লোকালয় হইতে কত নূনতরী

সমাগত হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিত; তাহাতে নূতনত্ব ছিল না,—বিস্ময়েরও

অবসর উপস্থিত হইত না। বননিবাসী

রামায়ণে বহুবার “আশ্চর্য্য”-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সকল স্থলেই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। বিচারে সকল স্থলেই যদি “অ-নিত্য” অর্থ ধরিয়া লইতে হয়, তবে বলিতে হইবে—রামায়ণ সেই সাহিত্যযুগের গ্রন্থ, যে যুগে আশ্চর্য্যশব্দের অনিত্য-অর্থ প্রচলিত ছিল। বিচারে কোনস্থলে অ-নিত্য এবং কোনস্থলে অদ্বিত অর্থ ধরিয়া লইতে হইলে, বলিতে হইবে—রামায়ণ সেই সাহিত্যযুগের গ্রন্থ, যে যুগে এই উভয় অর্থই প্রচলিত ছিল। বিচারে যদি কোনস্থলেই অনিত্য অর্থ ধরিতে পারা না যায়, সকল স্থলেই একমাত্র অদ্বিত-অর্থই স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তবে বলিতে হইবে—রামায়ণ সেই সাহিত্যযুগের গ্রন্থ, যে যুগে অ-নিত্য-অর্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অমরসিংহের সময়ে লৌকিকসাহিত্য হইতে এই অর্থ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি আশ্চর্য্যশব্দের ব্যাখ্যায় অনিত্য-অর্থের উল্লেখ না করিয়া কেবল ‘বিস্ময়াবহ অদ্বিত’ অর্থেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বলা,—

“বিস্ময়োদ্বিতমাস্তব্যং চিত্তমপি।”

সুতরাং পাণিনিযুগে কেবল অনিত্য-অর্থ, কাভ্যায়নের এবং পতঞ্জলির যুগে অনিত্য-অর্থ এবং অদ্বিত-অর্থ, তথা পরবর্ত্তী সাহিত্য-যুগে কেবল অদ্বিত-অর্থ আশ্চর্য্যশব্দ ব্যবহৃত হইবার এই ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিয়া আমরা রামায়ণে ব্যবহৃত “আশ্চর্য্য”-

তপস্বিগণ অস্ত্রশস্ত্রবিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না ; সুতরাং অস্ত্রশস্ত্রের আবির্ভাবেও নূতনত্ব বা বিস্ময়ের কারণ উপস্থিত হইতে পারে নাই। সে অরণ্যে অনেকেই আসিত ;—কেহ সন্ন্যাসীর দ্বার আসিত ;—কেহ বা আশ্রমরক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ক্ষত্রিয়ের দ্বার আসিত ;—কেহ কিন্তু সন্ন্যাসিবশে ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জীভূত হইরা আসিত না। ইহাতে নূতনত্ব ছিল না, এমন নহে, কিন্তু বিস্ময়ের ভাবই প্রবল হইবার কথা। এখানে “আশ্চর্য্য”শব্দের অর্থবিচার করিলে বলিতে হইবে,—রামায়ণ সেই সাহিত্যযুগের গ্রন্থ, যে যুগে অনিত্য ও অদ্ভুত, এই উভয় অর্থই প্রচলিত ছিল।

“আশ্চর্য্যমিতি তস্মৈতত্ত্বচনং ভাবিতান্ননঃ।

রাঘবঃ প্রতিজ্ঞগ্রাহ সহ ভ্রাতা মহাবলঃ।” ৩।১১।২০।
মাণ্ডুকার্মুনির “পঞ্চাঙ্গর” নামক তটাকের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র তাহাকে “আশ্চর্য্য” বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে “আশ্চর্য্য”শব্দে বিস্ময় অপেক্ষা অনিত্য-অর্থই সমধিক পরিষ্কৃত। এইরূপে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত ধরিয়া সমালোচনা করিলে রামায়ণের রচনাকাল কত পুরাতন নহে এবং কত নূতন নহে, এই দুইটি (প্রাচীনত্বের ও অক্ষাটনত্বের) সীমা আধিকৃত হইতে পারে।

ভাবে এবং ভাবায় রামায়ণ পুরাতন ও নূতনের অপূর্ব্ব মিশ্রণের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। মজুমদারমহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়া সাহিত্যসমাজের সুপরিচিত কথারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। কোন্ অংশ নূতন, কোন্ নূতন অংশ কবে সংযুক্ত

হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার পথ নির্দেশ করিয়া দিলে মজুমদারমহাশয় প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারিতেন। রামায়ণে নানা শ্লোক প্রেক্ষিত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষে সুপরিচিত আছে। কিন্তু বাহ্য প্রেক্ষিত ও আধুনিক, তাহা কত আধুনিক, সে কথা আমরা কি কেহ বিচার করিয়া দেখাইয়া দেন নাই। ইহাতে অনেকে প্রেক্ষিপ্তাবাদ শ্রবণ করিয়াই রামায়ণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। মজুমদারমহাশয়ের প্রস্তাবজ্ঞেও এই অশ্রদ্ধার গন্ধ প্রাপ্ত হইলাম। প্রেক্ষিপ্তাংশের পরিমাণ কি এতই অধিক যে, তাহার দ্বায়ে মূলগ্রন্থ অনাদৃত হইবার যোগ্য হইয়াছে? রামায়ণে যে সকল আধুনিক ছন্দের কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা কত, তাহার প্রভাবই বা কিরূপ, তাহার আলোচনা আবশ্যিক। মজুমদারমহাশয়ের লিখন-ভঙ্গীতে বোধ হয়, এ সকল যেন তুচ্ছ কথা,—ইহীর মীমাংসা হইয়া গিয়াছে! সাহেবেরা সংক্ষেপেই মীমাংসা সমাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহা ধরিয়া আমাদের দেশের কৃতবিদ্য-লোকেও প্রচলিত রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্তী গ্রন্থ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন। তাহা এ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন কথা বটে। পুরাতন মত কি, তাহা সকলেই জানি। কেবল তাহাকে সমর্থন করিবার প্রমাণ কি, তাহা না জানিয়াই নূতনের ঘোঁতে ভাসিয়া চলিয়াছি। যথাযোগ্য ধীরতা ও সঙ্গমে সতে ভারতবর্ষের আদি-কবির মহাকাব্যের আলোচনা সমাপ্ত করিতে পারিলে, নানা তথ্য আধিকৃত হইবার আশা

আছে। তাহার ‘অন্ত’ সহিত্বতা এবং
অধ্যবসার আবশ্যক।

মজুমদারমহাশয় লিখিয়াছেন—“এরূপ
অবহার রামায়ণরচনার কালনির্ণয় করিতে
হইলে, যদি কেবল রামকথার প্রাচীনতা এবং
পূর্বগাথার প্রাচীনতার অঙ্গুলক্ষণ করা যায়,
তাহা হইলে রামায়ণগ্রন্থের রচনাকাল নির্ণীত
হইবে না।” বলা বাহুল্য, মজুমদারমহাশয়ের
এই জ্ঞানগর্ভ উক্তি কেহই অমাত্র করিতে
পারিবেন না। রামায়ণের-রচনাকাল-নির্ধিক
প্রবন্ধে এ পর্য্যন্ত রামকথার প্রাচীনতার
আলোচনা হয় নাই; তাহা একটি সাহেবী-
মত;—যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে।

আর একটি কথা। মজুমদারমহাশয়
সুবিজ্ঞ সাহিত্যসেবক। তিনি প্রবন্ধ-
লেখককে প্রকৃতপক্ষে বহু বলিয়া স্বীকার
করিয়া সমূহ সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন।
তাঁহার লেখনীপ্রসূত সকল কথাই সাদরে
পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু বহুর অনর্গল
অধিকার লইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, একটু
সংযত হইয়া অতিমত ব্যক্ত করিলেই
সাহিত্যের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।
মজুমদারমহাশয় লিখিয়াছেন,—“রামায়ণের
রচনাপ্রণালী এবং ভাষার অবস্থা দেখিলে
অনার্য্যসে ইহা উপলব্ধ হয় যে, প্রাচীনতা
এবং নূতনত্ব একসঙ্গে রহিয়াছে; এবং
নূতনত্ব অত্যন্ত অধিক।” অধিককে
লেখনীগণনার বিবর্তিত-বেগে অত্যন্ত-
সংযোগে অত্যধিক করিয়া, মজুমদারমহাশয়
যে রূপ সাহসের সঙ্গে অতিমত ব্যক্ত করিয়া-
ছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। রামায়ণে
নূতনত্ব আছে,—তাহা “অনার্য্যসে” সাহেব-

দিগের গ্রন্থে পাঠ করিয়া শিখিয়া রাখিয়াছি;
কিন্তু কোন্ অংশ নূতন, আর কোন্ অংশ
পুরাতন, প্রমাণপ্রয়োগে তাহার বিচারে
প্রবৃত্ত হইবামাত্র বুঝিতেছি—সে বিচার
বিলক্ষণ আয়াসসাধ্য ব্যাপার,—“অনার্য্যসে
উপলব্ধ” হইবার বিষয় নহে।

ভর্তৃহরি কি উদ্দেশে “বাক্যপদীয়” রচনা
করিয়াছিলেন, কি উদ্দেশেই বা “কাণিকা
বৃত্তি” রচিত হইয়াছিল, তদ্বিশয়ে মতভেদের
অভাব নাই। তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে
কোন মতামত ব্যক্ত করিতে সাহস হয়
না। “পাণিনিকেই একমাত্র আদর্শ করিতে
হইবে” বলিয়া ভারতবর্ষে পাণিনিস্থাপনার
চেষ্টা হইয়াছিল কি না, তাহাতেও সংশয়
আছে। পাণিনিস্থাপনার চেষ্টা হইয়াছিল,
—তাহা সত্য কথা। অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণ-
রূপে নিরস্ত হয় নাই; কখন হইবে কি না,
তাহাতেও সন্দেহের অভাব নাই। তাহার
উদ্দেশ “পাণিনিকেই একমাত্র আদর্শ” করা
নহে। তাহার উদ্দেশ প্রাচীন সাহিত্যের
আলোচনা। সে আলোচনা যখনই প্রবর্তিত
হয়, তখনই পাণিনিস্থাপনার প্রয়োজন
অনুভূত হয়—গতান্তরাতায়াৎ। পুরাতন
সাহিত্য বুঝিতে হইলে পাণিনিকে পরিত্যাগ
করিবার উপায় কোথায়?

পাণিনির পঠনপাঠন প্রচলিত না
থাকায়, রামায়ণের ভাবার্থ নানা স্থানে
বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা “অনার্য্যসে”
উপলব্ধ না হইলেও, অনার্য্যসে উপলব্ধ
হইতে পারে। আর্য্যপ্রয়োগনির্ধিক প্রবন্ধে
তাঁহার কিছু-কিছু পরিচয় প্রকাশিত
হইয়াছে। বিভাগ্যের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ

বাহাকে “ঐতিহাসিক অসাধুপ্রয়োগ” বলিয়া
ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন, পানিনির পঠন-
পাঠন প্রচলিত থাকিলে তাহার প্রকৃত রহস্য

বিলুপ্ত হইতে পারিত না; আধুনিক
অভিধানেও নানারূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রবেশ-
লাভ করিতে পারিত না ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

ত্রিভঙ্গুর ।

৯

কাল আমি ত্রিভঙ্গুর ছাড়িয়া যাইব । এখানে
যে আদরবস্ত্র পাইয়াছি, আমি তার যোগ্য
নহি । রাজাকে একটি “ফুশ” উপহার
দিবার যে তার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি
সেই শ্রীতিকর, কাজটি সুসম্পন্ন করিয়াছি ।
মহারাজার একটা নৌকা করিয়া জলাভূমির
রাস্তা দিয়া আমি উত্তরদিকে যাত্রা করিব ।
কোচিনের ক্ষুদ্র রাজ্যে পৌঁছিতে ছই দিন
হই রাত্রি লাগিবে । সেখানে কিছুকাল
অবস্থিতি করিব । তাহার পর, কোচিন
ছাড়িয়া, ৩০৪০ বর্ষীয় পথ অতিক্রম
করিয়া, আবার সেই সব প্রদেশে আসিয়া
পড়িব, যেখান দিয়া রেলপথ গিয়াছে এবং
যেখান দিয়া আমি অনেকবার যাতায়াত
করিয়াছি । যে রেলপথ কালিকট হইতে
যাত্রাজে গিয়াছে, সেই মহারেলপথটি আবার
আমি ধরিব ।

ত্রিভঙ্গুরে আজ আমার শেষ রাজি ।
তাই আজ সহরের অলিগলির মধ্যে ইচ্ছা
করিয়া একটু বিলম্ব করিতেছি ;—সেই সব
পথ, যেখানে তরসাজুর নিবিড় পল্লবপুঞ্জের
মধ্যে ক্রমিকলতৈলের কঙ্করাস দীপগুলি

মহাপ্রভাবশালী তালপুঞ্জের নৈশ অন্ধকার
ভেদ করিতে না পারিয়া যেন হতাশ হইয়া
পড়িয়াছে । দিনমান অপেক্ষা রাত্রিকালেই
উজ্জ্বলজীবনের প্রভাব এখানে যেন একটু
বেশি করিয়া অহুতব করা যায় ;—হরিৎ-
শোভার মহিমাগগরে যেন ডুবিয়া বাটতে
হয় ।

কাল আমি চলিয়া যাইব । এখানে
কিছুই আমি দেখিতে পাইলাম না ।
তারতের হৃদয়দেশে প্রবেশ করিতে পারি-
লাম না । এই প্রদেশ—বাহা ব্রাহ্মণ্যের
কেন্দ্রস্থল বলিলেও হয়—এখানে আসিয়াও
আমি ব্রাহ্মণ্যের কিছুই জানিতে পারিলাম
না । যথোচিত সাদর অন্ত্যর্ঘনা পাইলেও,
আমরা যুরোপীয়, আমাদের নিকট সে সমস্ত
রহস্যের দ্বার এখনো বন্ধ ।

বেড়াইতে বেড়াইতে আমি অবশেষে
বলিকুদের সেই বড় রাস্তার আসিয়া
পড়িলাম । অনাবৃত্ত আকাশ । উপরে
তারার বিকসিৎ করিতেছে । সোজা বড়-
রাস্তা—প্রাসাদ ও মন্দিরের ঘের পর্য্যন্ত
আসিয়া মিলিত হইয়াছে । সন্ধ্যা-সন্ধ্যা উচ্চ

দেৱৰ উপৰ স্থাপিত সেকেন্দে-ধৰণেৰু দীপগুলি হইতে যে আলোক বিকীৰ্ণ—সেই আলোকেৰ মধ্য, জীজনমূলতঃ দীৰ্ঘ-কেশধারী পুরুষজনতা চলাফেৰা কৰিতেছে। এই সব লোক,—খোদিত পিতলসামগ্ৰী, ছাপ-দেওয়া ছিটেক কাপড়, পুতুল, দেব-দেৱীৰ মূৰ্ত্তি—এই সমস্ত জুৱাৰ ক্ৰেতা-বিক্ৰেতা। ইহাদেৱ কপিল গাভ্ৰু, কৃষ্ণবৰ্ণ কেশকলাপ, কৃষ্ণবৰ্ণ অলস্ত চকু। শস্তেৰ দানা, মিঠাৰ, উদ্ভিজ্জমূল প্ৰভৃতি ব্ৰাহ্মণ-দিপেৰ মিতাহাৰোপযোগী খাদ্যসামগ্ৰী বিক্ৰয়ৰ্থ সজ্জিত ৰহি আছে। অসংখ্য ছোট ছোট দোকান ;—উত্তম প্ৰদীপসমূহেৰ আলোকে আলোকিত। কোন-কোন দীপেৰ তিনটি শিখা। কোন পদ্মমূৰ্ত্তি অথবা দেবমূৰ্ত্তি এই দীপগুলিকে ধারণ কৰি আছে।

ৰাজপথ হইতে দূৰে সেই পবিত্ৰ ধৰেৰ সিংহদ্বাৰ এবং উহা ছাড়াইয়া আৱে দুৰে মুক্তদ্বাৰ মহামন্দিৰ ও তাহাৰ গভীৰ অভ্যন্তৰপ্ৰদেশ দেখা বাইতেছে। বিন্দু-চিহ্নেৰ মত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অসংখ্য দীপশিখা সান্নি-সান্নি জলিতেছে। ইহাই ব্ৰহ্মাৰ মন্দিৰ ;—যেন এই প্ৰদেশেৰই জগন্নাথৰ ধ্যানমগ্ন অন্তৰাত্মা।

বতৰ দৃষ্টি ধাৰ—মন্দিৰেৰ ভিতৰটা সমস্তই আলোকিত। ওখানে পুৰোহিত ছাড়া আৰ কাহাৰও বাইবাৰ অধিকাৰ নাই। দীপালোকেৰে দেখা দেখিবা বুকা বাৰ—মন্দিৰেৰ দালান কতদূৰ পৰ্য্যন্ত প্ৰসাৰিত। মধ্যস্থলে, গোলাপপাণ্ডিৰ অঙ্কৰণে একটা জ্যামিতিক নক্সা

পৰিলক্ষিত হইতেছে—বোধ হয়, উহা একটা প্ৰকাণ্ড বেলেগয়াৰি বাড় ;—কিন্তু এতদূৰে যে, ঠিক কৰিয়া কিছুই নিৰূপণ কৰা যায় না। মন্দিৰে সাৱাদিনই পূজাৰ্চনা চলিতেছে। আজ এই সাক্ষ্যপূজাৰ সময়, মানবকোলাহলেৰ সহিত মিশ্ৰিত হইয়া সন্ন্যাসধৰ্ম্মি—তুৱানিনাদ, আমাৰ নিকট পৰ্য্যন্ত আসিয়া পৌছিতেছে। এই সিংহদ্বাৰ যদিও কখনই বন্ধ থাকে না—তবু উহা দুৰ্গভৱনীয়। নভোবাণীৰ বহু তমোজালেৰ মধ্য হইতে একটা প্ৰকাণ্ড “পিরামিড,” সিংহদ্বাৰেৰ উপৰ দেখা বাইতেছে—উহা ৱালীকৃত দেবমূৰ্ত্তিৰ যেন একটা স্তূপ। উহাৰ গাঁজকাটা চূড়াদেশ—মনে হয় যেন তাৰকা-ৱাজিৰ সহিত সংলগ্ন। চাৰিটা সিংহদ্বাৰেৰ উপৰ এইৰূপ চাৰিটা “পিরামিড” অধিষ্ঠিত। প্ৰতিদিন সাক্ষ্যপূজাৰ সময় প্ৰত্যেক পিরামিডেৰ উপৰ দীপাবলী হইতে বিচ্ছুরিত একটা আলোকৰেখা পৰিলক্ষিত হয় ;—এই আলোকৰেখা তমসচ্ছন্ন খোদিত মূৰ্ত্তিৰাশিৰ মধ্য দিয়া লতাইয়া-লতাইয়া চূড়াদেশ পৰ্য্যন্ত উঠি আছে ;—মনে হয় যেন এই সব প্ৰস্তৰময় দেবমূৰ্ত্তিৰ মধ্য দিয়া একটা বৰ্গেৰ পথ উপৰে উঠি আছে।

যে সময়ে ৰাজপথ জনশূন্য হইয়া পড়ে, সেই সময় এখন উপস্থিত। এই সময়ে আদিমকালমূলতঃ কাঠেৰ দোকানগুলিতে দোকানদাৱেৰা বেচাকেনা বন্ধ কৰিবাৰ উদ্যোগ কৰিতেছে এবং ভূতবানি বাহাতে গৃহেৰ মধ্য প্ৰবেশ কৰিতে না পাৰে, এই উদ্দেশ্যে প্ৰাচীৰেৰ বহিৰ্ভাগে, কুলদিতে ছোট ছোট প্ৰদীপ জলাই আছে।

দোকানদারেরা হিসাবনিকাশ করি- যেন সেই পুরাকালের মধ্যেই অবস্থিতি
তেছে। জিবকুরের গোল-গোল টাকা ও করিতেছি।
পরস্য উহার ঝলিরা হইতে চালডালের রাজি অধিক হইয়াছে। জীবন-
মত মুঠা-মুঠা তুলিয়া একপ্রকার গণনা- কোলাহল সহসা শুভিত হইল। প্রাচীরের
বস্ত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। কতক- ও মন্দিরের প্রদীপগুলি ছাড়া আর সমস্তই
গুলি তক্তা—তাহাতে সারি-সারি গর্ত ; অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইল। রমণীরা
এই প্রত্যেক কুঠের গর্তের মধ্যে একএকটি নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে—কোথাও
মুদ্রা ধরে। যখন তক্তার সমস্ত আধার- আর তাহাদিগকে দেখা যায় না। পুরুষেরা
গর্তগুলি পূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহারা সেই শাদা মসিনা-মুজ-বস্ত্রে অথবা মলমলে আবৃত
মুদ্রার মোট সংখ্যা ঠিক জানিতে পারে ; হইয়া, কেশকলাপ মুক্ত করিয়া, ছাগাদির
তার পর, ঐ সব মুদ্রা একটা বাক্সের মধ্যে সহিত গৃহঘরের সম্মুখে, বাগাণ্ডার নীচে,
ঢালিয়া, আবার অল্প মুদ্রার গণনা আরম্ভ ছাতের উপর, মৃতবৎ সটান শুইয়া পড়িয়াছে।
করে। অপর কতকগুলি লোক, একতাড়া গৃহকুটির নীচে অথবা ভূগর্ভস্থ কক্ষে শয়ন
শুষ্ক তালপত্র তাহার অন্ধগুলি লিখিয়া করিতে ভারতবাসীর অভ্যস্ত চিত্ত। তাই,
হিসাব করিতে থাকে। এই শুষ্ক তালপত্র- তাহারা অবসানজনক গ্রীষ্মরাজ্যে, বিবিধ
গুলি কতকটা পুরাকালের “পেপাইরস্”- কুম্বের সুরতি উচ্চাঙ্গে পরিবিক্ত ও নীল
পত্রের ভার। আমার মনে হইল, আমি পূনার পরিলিপ্ত হইয়া বহির্দেশে শয়ন করে।

ক্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহেশ্বর।



উপনিষৎ ব্রহ্মের পর ও অপর এই দুইটি
বিশাবের (aspect) উপদেশ দিয়াছেন।
প্রথমটি নির্কিংশেব, নির্কিকল্প, নিরূপাধি,
নির্ভরণ ভাব ; দ্বিতীয়টি সবিশেষ, সবিকল্প,
সোপাধি, সঙ্গণ ভাব।

যে বাব ব্রহ্মণো রূপে।

বৃহদারণ্যক ২।৩।

‘ব্রহ্মের হয় দুই রূপ।’

এতদেব সত্যকাম পরম্ অপরঞ্চ ব্রহ্ম।

ঐশ ৭।১

‘হে সত্যকাম! এই পর ও অপর ব্রহ্ম।’
ব্রহ্মের নির্কিংশেব ভাবের অর্থ এই যে,
সে ভাবের কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দেশ
করা যায় না ; কোন চিত্তেরই পরিচয়
দেওয়া যায় না, বন্ধারা তাঁহাকে চিনিতে
পারা যায় ; কোন জ্ঞানেরই উল্লেখ করা
যায় না, বন্ধারা তাঁহার ধারণা করা যায়।
এই ভাবের পরিচয়হুনে শ্রুতি “তিনি ইহা
নহেন, তিনি ইহা নহেন” এইমাত্র
যদিয়াই কান্ত হইয়াছেন এবং নির্কিংশে

ব্রহ্মের উপদেশপ্রসঙ্গে “নভের” অত্যন্ত ছড়াছড়ি করিয়াছেন। তিনি স্থূল নহেন, তিনি সূক্ষ্ম নহেন; তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি শব্দ নহেন, তিনি স্পর্শ নহেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। মাণ্ড্য-উপনিষদের ভাষায়, ‘তিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দেশের অতীত, প্রপঞ্চের অতীত।’ তিনি একমাত্র সৎ; “একমেবাদ্বিতীয়ম্।” তাহাকে চিহ্নিত করা যায় না, লক্ষিত করা যায় না, বিশেষিত করা যায় না, পরিচিত করা যায় না। তিনি বিষয় নহেন, বিষয়ী নহেন; জ্ঞাতা নহেন, জ্ঞান নহেন, জ্ঞেয় নহেন; তিনি সৎ নহেন, তিনি অসৎ নহেন; তিনি চিং নহেন, তিনি জড় নহেন; তিনি সুখ নহেন, তিনি দুঃখ নহেন। পরব্রহ্ম ইজ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অগোচর; তিনি যোগসমাধিরও বেষ্টিত নহেন; তিনি সর্বথা অজ্ঞেয়। ইহাই সংক্ষেপে ব্রহ্মের নির্কিংশেব ভাবের উপদেশ।

সবিশেষ ভাব এই ভাবের বিপরীত। সবিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষণে লক্ষিত, বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নে চিহ্নিত করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এই সবিশেষ ভাবের বথাসম্ভব আলোচনা করিব।

ব্রহ্মের এই সবিশেষ ও নির্কিংশেব ভাব প্রতিপাদন করিবার অল্প ঋতি দুইপ্রকার বাক্যের অবতারণা করেন। ১. এক নির্কিংশেব লিঙ্গ ও অপর সবিশেষ লিঙ্গ। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

সত্তি উভয়লিঙ্গাঃ স্তত্রয়ো ব্রহ্মবিবরাঃ। সর্বকর্মা
সর্বকামঃ সর্বগতঃ সর্বরস ইত্যেবমাখ্যাঃ সাক্ষিশেবলিঙ্গাঃ।

অস্থূলম্ অনণু, অহ্রস্বমদীর্ঘম্ ইত্যেবমাখ্যাঃ নির্কিংশেবলিঙ্গাঃ।

‘ব্রহ্মবিবরৈ দুইপ্রকারেণ স্রুতি দৃষ্টে হয়। এক সবিশেষলিঙ্গ স্রুতি; যেমন, তিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগত, সর্বরস। অন্য নির্কিংশেবলিঙ্গ স্রুতি; যেমন, তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন।’

কিন্তু তথাপি শঙ্করাচার্য্য নির্কিংশেব (নির্কিংশ) ব্রহ্মই স্রুতির প্রতীপাত্ত, এই মত স্থাপন করিয়া, সুবিশেষ (সংশ্ল) ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

অতল্যান্তরলিঙ্গপরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্কিঙ্করকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্। সর্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেণ বাক্যেণ অশব্দ-ম্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিবু অপান্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিষ্টতে।

ব্রহ্মসূত্রের শাক্তরভাষ্য, ৩:২:১১

‘অত এব উভয়লিঙ্গ নির্দেশ থাকিলেও সমস্তবিশেষরহিত, নির্কিঙ্কর ব্রহ্মই প্রতিপাত্ত, তদ্বিপরীত (সবিশেষ সংশ্ল ব্রহ্ম) নহেন। কারণ উপনিষদ্বাক্যে যেখানেই ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদন করা হইয়াছে (যেমন অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি), সেখানেই ব্রহ্ম যে সমুদয়বিশেষরহিত, এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।’

অতঃপক্ষে, রামানুজাচার্য্য এই মতকে পূর্বপক্ষরূপে নিরাস করিয়া আপন মত এইরূপে প্রচার করিয়াছেন যে, স্রুতিস্থিত সর্বত্র সংশ্ল ব্রহ্মকেই (যিনি সমস্তদোষ-রহিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণের আকর) প্রতিপাদন করিয়াছেন।

মতঃ সর্বত্র স্রুতিস্থিতম্ পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্

উভয়লক্ষণসমিধীরতে নিরন্তনিখিলদোষদ্বকল্যাণগুণাকর-
লক্ষণোগেভমিতার্থঃ।

শ্রীভাষ্য ৩২।১১

নমু ৫ সত্যঃ জ্ঞানমনন্তঃ ব্রহ্মত্যাগিভিনির্বিশেষ-
প্রকাশকস্বরূপঃ ব্রহ্মাবগম্যতে, অন্তত্ব সর্বজ্ঞসত্য-
কামতাদিকং নেতি-নেতীত্যাগিভিঃ প্রতিবিধ্যমানত্বেন
মিথ্যাত্বমিত্যবগম্যব্য, তৎ কথং কল্যাণগুণাকর-
নিরন্তনিখিলদোষদ্বকল্যাণগুণাকরঃ ব্রহ্মণ ইতি তত্রাহ।

শ্রীভাষ্য ৩২।১৪ ও ১৭

‘কেহ কেহ বলেন যে, “ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ,
জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত” ইত্যাদি বাক্যে নির্বি-
শেষ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। আর
শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে “নেতি নেতি” এইরূপে
নির্দেশ করিয়াছেন, তখন ইহা দ্বারা তিনি
“সর্বজ্ঞ, সত্যসকল, জগৎকারণ, অন্তর্যামী,
সত্যাকার” ইত্যাদির নিষেধ করিয়া সঙ্গুণতাব
যে অবাস্তব, ইহাই বুঝিতে হইবে; তবে আর
তিনি কল্যাণগুণের আকর এবং সমস্তদোষ-
বহিত—তাহার এই “উভয়লক্ষণ কল্পে
প্রতিপন্ন হইবে?” এই পূর্বপক্ষের নিরাস
করিয়া রামানুজাচার্য্য যমতের প্রতিষ্ঠা
করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম শ্রুতিস্মৃতি সর্বত্র উভয়-
লক্ষণে (তিনি সমস্তদোষবহিত, এবং
কল্যাণগুণের আকর, এই উভয় লক্ষণে)
লক্ষিত হইরাছেন।

অতএব দেখা বাইতেছে, শঙ্করের মতে
নিগুণ ব্রহ্মই সত্য,—সঙ্গুণ নহেন এবং
রামানুজের মতে সঙ্গুণ ব্রহ্মই সত্য,—নিগুণ
নহেন।

মহামহোপাধ্যায় আচার্য্যগণের মধ্যে
যখন এইরূপ মতভেদ, তখন যে শ্রুতি তাহা-
দের উপজীবা, বাহার ব্যাখ্যানে তাহারা
স্ব স্ব সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন,

সেই শ্রুতিই আমাদের অবলম্বনীয়। এ
‘সম্বন্ধে যেতাৎপর্য উপনিষৎ এইরূপ বলিতে-
ছেন—

উদগীতমেতৎ পরমং তু ব্রহ্ম

তস্মিন্ ব্রহ্ম স্প্রতিষ্ঠাকরক।

‘এই যে পরব্রহ্ম, ইনি অক্ষর; ইহাতে
তিনটি স্প্রতিষ্ঠিত আছে’; এইরূপ উদগীত
হইরাছে।’

ইহার ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

“তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতং ভোক্তা ভোগ্যঃ
প্রেরিতারম্ ‘ইতি বাক্যমাণং ভোগ্যভোক্তৃনিরন্ত-
লক্ষণম্। * * অক্ষরকেতি বদ্যাপি বিকারপ্রকাশঃ
তথাপি অক্ষরম্ * * অবিনাশি এব ব্রহ্ম।”

‘সেই ব্রহ্মে ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা
(নিরন্তা), এই তিনটি প্রতিষ্ঠিত আছে।
পুনশ্চ তিনি অক্ষর। যদিও সবিকার প্রপ-
কের আশ্রয়, তথাপি তিনি বিকারী নহেন,
তিনি অবিনাশী।’

অন্তত্ব যেতাৎপর্য বলিয়াছেন—

ভোক্তা ভোগ্যঃ প্রেরিতারক মদ্য

* সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।

ইহার ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

“ভোক্তা জীবঃ, ভোগ্যম্ ইত্যরং সর্বম্, প্রেরিতা অন্ত-
র্যামী পরমেশ্বরঃ, এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মেব ইতি।”

অর্থাৎ ‘পুরুষ প্রকৃতি ও পরমেশ্বর, ব্রহ্মের
এই তিন ভাব।’

অতএব দেখা বাইতেছে যে, রামানুজাচার্য্য
যে সঙ্গুণব্রহ্ম পরমেশ্বরের অতিরিক্ত নিগুণ-
ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা শ্রুতি-
সিদ্ধ নহে। এবং শঙ্করাচার্য্য যে নিগুণ
ব্রহ্মের ব্যতিরিক্ত সঙ্গুণ মহেশ্বরের অস্বীকার
করিয়াছেন, তাহাও শ্রুতিসিদ্ধ নহে। তবে
ইহাও বক্তব্য যে, সঙ্গুণ ও নিগুণ একই

বস্তু । সর্বিশেষ ও নির্কিশেষে কেবল ভাবের
প্রভেদমাত্র ; বস্তুত কোন ভেদ নাই । *

এ কথা বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্ট উপদিষ্ট আছে—

সদকরং ব্রহ্ম ব ইশ্বরঃ পূমান্

জগোদ্বিসৃষ্টিহিতিক্যালসংসারঃ ।

বিষ্ণুপুরাণ ১।১।২

‘মি নি প্রকৃতিকোত্তরানিত সৃষ্টিহিতি-
প্রণয়ের হেতুত্বত পুরুষ ইশ্বরঃ, তিনিই সং
অকর ব্রহ্ম ।’

এ সম্বন্ধে ভাগবত এইরূপ বলিয়াছেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদগুণঃ যজ্ঞজ্ঞানমধ্বম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্নিতি শব্দভ্যে ।

ভাগবত ১।২।১১

‘সেই অধিতীয় চিহ্নকে তত্ত্বজ্ঞানীরা
“তত্ত্ব” আখ্যা প্রদান করেন । তিনিই ব্রহ্ম,
তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্ (সমুৎপ
ব্রহ্ম বা মহেশ্বর) ।

উপনিষদ্ প্রায়ই নিগুণব্রহ্মের নির্দেশ-
দ্বলে ক্লীবলিঙ্গ এবং সমুৎপব্রহ্মের নির্দেশস্থলে
পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছেন । যেমন—

“অলক্ষ্যমল্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ।”—কঠ ৩।১৫

ইহার দ্বারা নিগুণের নির্দেশ ; আবার —

“সর্গকর্মা সর্গকামঃ সর্গগন্তঃ সর্গরসঃ”

ছান্দোগ্য ৩।১৪।২

ইহার দ্বারা সমুৎপের নির্দেশ । কোথাও
কিছু দেখা যায় যে, একই মত্রে পুংলিঙ্গ ও
ক্লীবলিঙ্গ উভয়েরই প্রয়োগ করা হইয়াছে ।
যেমন—

স পর্যাপ্যাক্রমকারমতঃ—

মহাবিরঃ শুদ্ধমগাপবিভম্ ।

কবির্মনীষী পরিতুঃ স্বরতু-

ধাখাতখ্যাতোহর্ষান্ বাদখান্ধাখতীত্যঃ সমাত্যঃ ।

ঈশ ৮

এখানে প্রথম অংশ নিগুণব্রহ্মের
নির্দেশক, সেইজন্য ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ ;
আর শেষাংশ সমুৎপব্রহ্মের নির্দেশক, সেইজন্য
পুংলিঙ্গের প্রয়োগ । একই মত্রে সমুৎপ ও
নিগুণ এই উভয় ভাবেরই নির্দেশ করিয়া
শ্রুতি এই উপদেশ দিলেন যে, সর্বিশেষ ও
নির্কিশেষে কেবলমাত্র ভাবের প্রভেদ ;
সমুৎপ ও নিগুণ বস্তুত একই বস্তু ।*

কারণ নির্কিশেষ পরব্রহ্মই মাত্রা-উপাধি
অঙ্গীকার করিয়া মহেশ্বর হন—“মায়িনন্ত
মহেশ্বরম্ ।” এই মাত্রা-উপাধি দ্বারা তিনি
যেন নিজেকে সঙ্কুচিত করেন । তখন তাঁহার
যে বিভাব হয়, তাহাই সর্বিশেষ বা সর্বিকল্প
ভাব । তখন তাঁহাকে মহেশ্বর বলা হয় ।

যত্নূর্নাত ইব তত্ত্বতিঃ প্রধানভ্যেঃ

যত্নাবতো দেব একঃ স্বমাবুণোৎ ।

যেতাযতর ৬।১০

‘যেমন’ উপর্নাত জাগরণে করিয়া
নিজেকে আবৃত করে, সেইরূপ স্বভাবত
অধিতীয় ব্রহ্ম প্রধানজ জগলে আপনাকে
আবৃত করিলেন ।’

যেমন ছনিরীক্ষ্য তেজোমণ্ডলকে কান্ন-
শের দ্বারা আবৃত করিলে তাহার তেজ যেন

* এই মত্রে চীনভাষির প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ “তাওতেইং” বলিতেছেন—

So says Tao Teh Ching—Having no name it is the originator of
Heaven and Earth. Having a name it is the mother of all things.
Under these two aspects it is really the same.

(Quoted in Ancient Wisdom, p. 10.)

কতক সঙ্কুচিত হয়, পরব্রহ্মেরও তখন বিক্ষুব্ধ সঞ্চেদ-ভরদ্রুত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সেইরূপ ভাব হয়। সেইজন্য মায়াকে ব্রহ্মের 'সঞ্চেদ' ভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, বনিকা বা তিরঙ্করণী বলা হইয়াছে। এই কখন বিক্ষুব্ধ; একই ব্রহ্ম কখন নিশ্চল, কখন সঞ্চেদ। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্তভাব ধারণ করিতেছে; পরব্রহ্ম মায়াবনিকার আবরণে সঞ্চেদ-সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার

নারায়ণে ভগবতি তদিতং বিশ্বমাহিতম্।

গৃহীতমারোকগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বভঃ ॥

ভাগবত ২।৬।২২

‘এই জগৎ’ ভগবান্ নারায়ণে নিহিত আছে। তিনি স্বভাবত নিশ্চল, কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সঞ্চেদ হইলেন।*

অনন্ত সাগরের মেঘন নিবাত-নিষ্কম্প প্রশান্ত-নিখর অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের নিশ্চল ভাব। আর সমুদ্রের যে লহরীসঙ্কুল বীচি-জ্যোতি কখন সঙ্কীর্ণ-সমীম হইতেছেন, আবার তিরঙ্করণীর তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতি অসীম অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন।†

* অধ্যাত্মবিজ্ঞানের রহস্যভাষায় ‘পরিধিকেন্দ্রস্থ বিন্দুজ্যোতিঃ’ দ্বারা এই ভাব সূচিত হয়। ইহার সহিত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থ হিরণ্যগর্ভের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

The primeval point in the centre of the circle—the logos as one within the self-imposed encircling sphere of subtlest matter for the purpose of manifestation—of shining forth from the darkness. এই encircling sphere-ক Madam Blavatsky ‘The ring pass not’—এই সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

† এ সম্বন্ধে শ্রীমতী এনি বেসান্ট করেকটি ভূতি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

Coming forth from the depths of the One Existence, from the One beyond all thought and all speech, a Logos, by imposing on Himself a limit, circumscribing voluntarily the range of His own Being, becomes the manifested God, and tracing the limiting sphere of His activity thus outlines the area of His universe. Within that sphere the universe is born, is evolved, and dies; it lives, it moves, it has its being in Him.

The Ancient Wisdom, p. 51.

We may think of Him as an eternal Centre of Self-consciousness, able to merge in Super consciousness and to again limit Himself to Self-consciousness when a new universe is to be brought into existence. Isvara enveloped in *Maya*, brings forth a universe and is enclosed, as it were, in the universe of which He is the light. Breaking the shade, the light shines forth in every direction. Dissolving the universe, He still re-

বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মের যে মাত্রা আবরণ, তাহা বেচ্ছাকৃত । অতএব তিনি সোপানিক হইলেও সসীম হয়েন না । কারণ তিনি বিশ্বাত্ম (Immanent) হইয়াও বিশ্বাতিপ (Transcendent), প্রপঞ্চাতিমানী হইয়াও প্রপঞ্চাতিত । সেইজন্য ঐতি বলেন—

তদন্তর্য্য সর্বত্র তদ্ব সর্বস্যাস্য বাহুতঃ ।

ঈশঃ

‘তিনি সমস্ত জগতের অন্তরে আছেন, অথবা তিনি জগতের বাহিরেও আছেন ।’

বৃহদারণ্যকও এই কথাই বলিয়াছেন—

অয়মাত্মানন্তরোহবাহুঃ ।

বৃহদারণ্যক ৪।৫।১০

পাদোহস্য বিধা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ।

পুরুষব্রহ্ম ৩

‘সমস্ত ভূত তাঁহার একপাদমাত্র, তাঁহার আর তিন পাদ অমৃত—বিশ্বাতিত ।’

গীতাও এই কথা বলিয়াছেন—

বিত্যাহরিতঃ কংরমেকাংশেন হিতো জগৎ ।

গীতা ১০।৪২

‘আমি একাংশদ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি ।’

নারায়ণ-উপনিষদ্ এই ভাবে বলিয়াছেন—

বচ কিকিং জগৎ সর্বং দৃষ্টতে জ্ঞাতেহপি বা ।

অন্তর্বহিঃ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ হিতঃ ।

‘নারায়ণোপনিষদ্, ১৩ অনুবাক ।

‘জগতে যে-কিছু দৃষ্ট হয় বা শ্রুত হয়, সে সমস্তের অন্তরে নারায়ণ ব্যাপিয়া আছেন এবং তিনি সে সমস্তের বাহিরেও আছেন ।’

সেইজন্য বৈদান্তিকেরা বলিয়া থাকেন যে, পরব্রহ্মের বর্চাংশে মাত্রা । এ কথা বলা নিশ্চয়োজন যে, নিরংশ ব্রহ্মের অংশকল্পনা কেবল বোধের সুবিধার জন্ত । এক্ষণ বলার তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্ম মাত্রা উপহিত হইলেও প্রপঞ্চের সসীমতায় তাঁহার অসীমতা অভিভূত বা নিমজ্জিত হয় না । ব্রহ্মজ্যোতির পাদাংশ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় । *

এই যে সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর, ইনিই সচ্চিদানন্দ ।

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তিরীয় ২।১।১),

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” (বৃহদারণ্যক) ৩।২।২৮

এই সকল সবিশেষ ঐতি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে । ব্রহ্মসংহিতায় আছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । ৫।১

‘পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ।’

mains. The centre remains, but the circumference that circumscribed it is gone.

Relation of man to God, p. 9.

* But He will not be merged in His work, for, vast as that work seems to us, to Him it is but a little thing ; “Having pervaded this whole universe with a portion of Myself, I remain.” That marvellous Individuality is not lost, and only a portion thereof suffices for the life of a kosmos. The Logos, the Oversoul, remains, the God of His universe.

The Theosophical Review—July 1902, p. 453.

শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারে বলা হইয়াছে—

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃকারান্তিকারিণে ।

‘সচ্চিদানন্দরূপ-অক্লিষ্টকর্মা শ্রীকৃষ্ণকে
নমস্কার ।’

এই অবস্থার তাঁহাতে তিনটি শক্তির
প্রকাশ হয় । এই শক্তিত্রয়ের নাম যথাক্রমে
সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সংবিৎ ।

হ্লাদিনী সন্ধিনী * সংবিৎ ত্রয়োকা সর্বসংস্থিতৌ ।

বিকুপ্তরাণ ।

‘হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ, এই
শক্তিত্রয়’ বিখ্যাত অধিতীয় ভগবানে
অবস্থিত ।’

সন্ধিনীশক্তিযোগে মহেশ্বর সং, সংবিৎ-
শক্তিযোগে চিৎ ও হ্লাদিনীশক্তিযোগে
আনন্দরূপ হইলেন । সন্ধিনী শক্তির ক্রিয়া
সত্তা বা সত্য, সংবিৎ শক্তির ক্রিয়া জ্ঞান এবং
হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া আনন্দ ।

ইহা পেল সপ্তপত্রের স্বরূপলক্ষণ ।
তাঁহাকে যে “তজ্জলান্” * বলা হয়, ইহা
তাঁহার তটস্থলক্ষণ । “তজ্জলান্” অর্থে
তজ্জ, তজ্জ, তদন ;—তাঁহা হইতে জগৎ
জাত, তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, তাঁহাতেই
জগৎ লীন ।

কতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে । যেন তাতানি
জীবন্তি । যৎ প্রদত্ত্যভিসংবিশন্তি ।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ৩।১

‘বাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন
হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া বাঁহা দ্বারা জীবিত
রহিয়াছে, অন্তকালে বাঁহাতে বিলীন
হইবে, তিনিই ব্রহ্ম ।’

জন্মান্ত্যস্য বতঃ

‘এই ব্রহ্মস্থলে এই ভাবকেই লক্ষ্য করা
হইয়াছে ।

যথোপনিষত্তত্ত্বনোক্তরেদ্বখ্যায়েঃ কৃত্বা বিকুলিঙ্গা
বৃক্ষরস্তোবমেবাশ্রাণান্ননঃ সর্বো গ্রাণাঃ সর্বো লোকাঃ
সর্বো দেবাঃ সর্বানি ভূতানি বৃক্ষরন্তি ।

ইহাংগ্যাক ২।১।২০

‘যেমন উপনিষদ তত্ত্ব উল্লিখণ করে,
যেমন অগ্নি বিকুলিঙ্গ উল্লিখণ করে,
সেইরূপ এই আশ্রা হইতে সমস্ত গ্রাণ, সমস্ত
লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নিঃসৃত
হইয়াছে ।’

ইহাই সপ্তপত্র বা মহেশ্বরের তটস্থ-
লক্ষণ ।

সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার—মহেশ্বরের এই
তিন জগদ্ব্যাপার স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্য করিয়া
তাঁহার নাম দেওয়া হয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ।
রমোত্তমপ্রধান সৃষ্টিকার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া
তিনি ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণপ্রধান পালনকার্য্যকে
লক্ষ্য করিয়া তিনি বিষ্ণু এবং তমোত্তম-
প্রধান লয়কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি
রুদ্র । ইহাদিগকে ত্রিমূর্তি বলে । এ তিন
স্বতন্ত্র নহেন—ইহারা তিনেই এক, একেই
তিন । সেইজন্য মহেশ্বরের স্তোত্রে বলা
হইয়াছে—

তত্ত্বচিত্তসমাসীন ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক ।

হৃতসংস্থিতা ৩।৪৮

‘তিনি তত্ত্বের চিত্তে অধিষ্ঠিত ; তিনি
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক ।’

কালিদাস এই ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া
অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

* সর্বো থবিৎ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি ।

নমস্ত্রিভূত্রে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলান্নমো ।

গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেষুযে ॥

‘সৃষ্টির পূর্বে তুমি কেবল অদ্বিতীয় ;
পরে গুণত্রয়ের উপাধিতে তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু
ও শিবরূপে ত্রিমূর্ত্তিতে ভিন্নরূপ হও ।
তোমাকে নমস্কার ।’

• ভাগবত এই অর্থে বলিয়াছেন—

আত্মমায়্যং সমাধিত্বং সোহহং গুণমুরীং ধ্বজ ।

স্বজনং রক্ষণং হরন্ বিধং ধ্বজে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচ্চিহিতাম্ ॥

৪।৭।৪৮

‘হে ষিদ্ধ, আমি গুণময়ী আত্মমায়াকে
আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও
সংহার নিষ্পন্ন করি । সেই সেই ক্রিয়ার
অনুযায়ী আমার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও কৃষ্ণ) সংজ্ঞা
হয় ।’

এই সগুণ ব্রহ্মকে যে মহেশ্বর বলা হয়,
তাঁহার বিশেষ সার্থকতা আছে । কারণ
তিনি সর্বশক্তিমান, সমস্ত জগতের প্রভু,
সকলই তাঁহার শাসনাধীন । সেইজন্য যেতা-
বতর-উপনিষদ্ (৩।১) বলিয়াছেন—

য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীতিঃ

সর্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীতিঃ ।

‘যিনি এক মাত্রাবী সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর,

সমস্ত লোককে শক্তিদ্বারা শাসন করেন ।’

বৃহদারণ্যক (৩।৮।৯) বলিয়াছেন—

এতত্ত্ব বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যোচ্চক্রমসৌ
বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ।

‘হে গার্গি ! ইঁহারই শাসনে চন্দ্র ও সূর্য্য
নিরন্তরিত হইয়া অবস্থিত আছে ।’

ভীষাইন্দ্রাদ্ভাতঃ পবতে । ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।

ভীষাইন্দ্রাদগ্নিস্চেত্রেতচ্চ । সূর্য্যাদ্ভাবতি পক্ষমঃ ।

তেতিরীয় ২।৮।১

‘ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে,
ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে, ইঁহার
ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র এবং পক্ষম সূর্য্য দাবিত
হইতেছে ।’

সেইজন্য বলা হইয়াছে—

পরামস্য শক্তিব্যবধৌব অন্নতে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।

যেতাৱতর ৬।৮

‘তাঁহার পরা শক্তি বিবিধ বলিয়া প্রতীয়-
মান হয় ; তাঁহার জ্ঞানশক্তি, বল- (ইচ্ছা)-
শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি স্বাভাবিক । •

এই শক্তিব্যোগেই নির্দিষ্টতর ব্রহ্ম সবিশেষ
হইয়া নানাভাবে প্রতীয়মান করেন ।

* A Jewish prophet writes : ‘He hath made the earth by His Power, He hath established the world by His Wisdom and hath stretched out the heaven by His understanding’, the reference to the three functions being very clear. These three are inseparable, indivisible, three aspects of One. Their functions may be thought of separately, for the sake of clearness, but cannot be disjoined. Each is necessary to each and each is present in each. In the first Being, Will, Power (বল) is seen as predominant, as characteristic, but Wisdom (জ্ঞান) and Creative Action (ক্রিয়াশক্তি) are also present ; in the second Being, Wisdom (জ্ঞান) is seen as predominant, but Power (বল) and Creative Action (ক্রিয়াশক্তি) are

য একোইবর্ণী বহবা শক্তিযোগাদ-
বর্ণানলেকারিহিতার্থে কথ্যতি।

যেতাব্তর ৪।১

‘যিনি অদ্বিতীয়, অবর্ণ (নির্কিশেষ) ব্রহ্ম, তিনিই বিবিধশক্তিবোপে স্বার্থনিরপেক্ষ হইয়া নানা বিভাব ধারণ করেন।’

বাস্তবিক জগতে যেখানেই শক্তি, মহিমা বা ঐশ্বর্যের বিকাশ, সেখানে তাঁহারই প্রভাব বৃদ্ধিতে হইবে। সেইজন্য গীতার ভগবান্ বলিয়াছেন—

বহুবদবিকৃতিমং সত্ত্বঃ শ্রীমদুক্তিতমেব বা।

তত্তদেবাবর্ণচ্ছ হং মম ভেজোহংশসম্ভবঃ।

গীতা ১০।৪১

‘যে-কিছু বস্তু বিভূতিযুক্ত, শ্রীযুক্ত অথবা ওজোযুক্ত, সে সমস্তই আমার ভেজের প্রকাশ জানিবে।’

শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে, পরব্রহ্মের যে নির্কিশেষ ভাব, তাহা অনির্দেশ্য, অবাচ্য, অলক্ষ্য। সেইজন্য পরব্রহ্ম বচনের, লক্ষণের, নির্দেশের অতীত। আমরা এখন দেখিলাম যে, সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর ইহার বিপরীত। তাঁহাকে স্বরূপলক্ষণে লক্ষিত করা যায়; তাঁহাকে তটস্থলক্ষণে চিহ্নিত, বিশেষিত করা যায়। অতএব ব্রহ্মের যে সবিশেষ ভাব, তাহা লক্ষণের, বচনের, নির্দেশের অতীত নহে।

শ্রুতি আরও দেখাইয়াছেন যে, পরব্রহ্ম অজ্ঞের অর্থাৎ জ্ঞানাতীত। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, বাক্য-মন-বুদ্ধির অগোচর; এমন কি, তিনি সমাধির বা যোগজ মতিরও অতীত। সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর, কিন্তু, অজ্ঞের নহেন। অবশ্য তিনি ইন্দ্রিয়ের বা সাধারণ মন-বুদ্ধির গোচর হন না। কিন্তু তিনি অগ্ৰীয়া বুদ্ধির, বিতন্ম মনের এবং যোগ-সমাধির বেদ্য।

এব সর্বেরূ ভূতেষু গুঢ়োচ্চা ন প্রকাশতে।

দৃক্ততে ত্বগ্নায়া বুদ্ধ্যা হৃদয়া হৃদ্যদর্শিতঃ।

কঠ ৩।১২

‘এই আত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু হৃদয়দর্শীরা ইহাকে হৃদয়-স্মৃতীকৃত বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।’

অধ্যাত্মযোগাধিপমেন দেবঃ

মহা য়োরো হর্ষলোকৌ কথ্যতি।

কঠ ২।১২

‘অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিরা বীরব্যক্তি সুখদুঃখ অতিক্রম করেন।’

লব্ধা মনীষা মনসাভিকৃপ্তো

য এতদ্বিহরনৃত্যতে ভবতি।

কঠ ৩।১৩

‘তিনি হৃদয়ে সংশরয়হিত বুদ্ধিধারা দৃষ্ট করেন; তাঁহাকে জানিলে অমরত্বলাভ হয়।’

none the less inherent in them; in the Third Being, Creative Action (ক্রিয়াশক্তি) is seen as predominant, but Power (বল) and Wisdom (জ্ঞান) are ever also to be seen. And though the words First, Second, Third are used, because the Beings are thus manifested in time, in the order of Self-unfolding, yet in Eternity they are known as interdependent and co-equal. “None is greater or less than Another,”—Evolution of consciousness: Ibid.

বল পশ্যত পশ্যতে কর্তব্যং
কর্তারীণং পুরুষং ব্রহ্মবেদিনিং ।
তদা বিদ্বান্ পূণ্যপাপে বিশ্ব
নিরঞ্জনঃ পরমং সান্যদুপৈতি ।

মুণ্ডক ৩।১।৩

জ্ঞানপ্রসাদেন বিভক্তসম্ব-

ভূতন্ত তং পশ্যতে নিকলং ধ্যানমানঃ ।

মুণ্ডক ৩।১।৮

‘জীব বধন জ্যোতির্শ্বর, কর্তা, ঈশ্বর,
ব্রহ্মধোনি (ব্রহ্মার জনক) পুরুষকে দর্শন
করেন, তখন তিনি পাপপুণ্য পরিত্যাগ
করিয়া নির্মল হইয়া পরম সম্ব লাভ
করেন ।’

‘জ্ঞানপ্রসাদে বিভক্তচিত্ত (সাধক),
ধ্যানযোগে নিকল (অখণ্ড) পরমাত্মাকে
দর্শন করেন ।’

পরাকি ধ্যানি বাত্পং বরহু-

তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নাত্তরান্ ।

কচ্চিৎকীরঃ প্রত্যাপান্নানৈক-

দাবৃত্তচক্ষুরহৃতবনিচ্ছন ।

কঠ ৪।১

‘বরহু (ভগবান্) ইজ্রিসমূহকে বহির্দৃষ্ট
করিয়াছেন; সেইজন্য জীবগণ বহির্জীব
দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না ।
তবে কোন ধীর ব্যক্তি অমরত্ব ইচ্ছা করিয়া
আবৃত্তচক্ষু হইয়া (বহির্জীব হইতে ইজ্রি-
গ্রাম প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যাপাত্মাকে
দর্শন করেন ।’

এই সকল ক্রতি দ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহ্র-
দয় বলিয়াছেন—

অপি সংরাধনে প্রত্যাকানুমানাত্মান্ ।

ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২৪

‘সংরাধনকালে তিনি (মহেশ্বর) দৃষ্ট
হন; ক্রতিবৃতি ইহার প্রমাণ ।’ সংরাধন

অর্থে ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধান ইত্যাদির
অঙ্কুষ্ঠান ।

এই সত্ত্বগুণেশ্বরের পরিচয় উপলক্ষে ঋষিরা
শাস্ত্রের নানাহানে বহুতর হৃদয়-গভীর
বাক্যের সমাবেশ করিয়াছেন । তাহার
কয়েকটিমাত্র নিরে অঙ্কুবারসহ উদ্ধৃত
করিতেছি ।

এব সর্কেষ্বর এব সর্কজ্ঞ এবোহন্তর্ধ্যামোষ ধোনিঃ
সর্কজ্ঞ প্রভবাপ্যন্তো হি ভূতানাম্ ।

মাণ্ডুক্য ৩

‘ইনি সর্কেষ্বর, ইনি সর্কজ্ঞ, ইনি অন্ত-
র্ধ্যামী, ইনি বিশ্বের কারণ; ইনিই ভূতসকলের
উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান ।’

অপাপিপাদো জবনো ব্রহীতা-

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেদ্যাং ন চ তত্তাভি বেত্তা-

তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহাত্মন ।

বেতাংসভর ৩।১২

‘তাঁহার হস্ত নাই অঞ্চ অংঘ করেন, পদ
নাই অঞ্চ গমন করেন, চক্ষু নাই অঞ্চ দর্শন
করেন, কর্ণ নাই অঞ্চ শ্রবণ করেন । তিনি
সর্কজ্ঞ অঞ্চ তাঁহাকে কেহ জানে না;
তাঁহাকেই মহান্ পরমপুরুষ বলে ।’

এব আত্মাপহতপাপুনা বিজরো বিসৃত্যাবিশোকো
বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ।

ছান্দোগ্য ৮।১।৫

‘এই আত্মা অপাপবিহীন, জরাহীন, মৃত্যু-
হীন, শোকহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন; ইনি সত্য-
কাম, সত্যসঙ্কল্প ।’

নিত্যো নিত্যানাং চেতনচেতনানাম্ ।

কঠ ৪।১৩

‘তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন ।’
অণোরণীমান্ মহতো মহীমান্ ।

‘তিনি অণু অপেক্ষাও অণু; মহৎ
অপেক্ষাও মহান্।’

সমস্তকল্যাণশুভপাক্ষকোহসৌ

বশন্তিসেনাদ্যুতভূতবর্গঃ।

ভেজোবলৈবধ্যমহাবোধ্য-

হুবীৰ্য্যশক্ত্যাদিত্তৈকরাশিঃ।

পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্

ক্লেশাধরঃ সন্তি পরাবরুণে।

ব্রহ্মসূত্র ৩২।১১ সূত্রের শ্রীভাষ্যভূত।

‘সমস্ত কল্যাণশুভের আধার ভগবান্
ভেজ, বল, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বীৰ্য্য, শক্তি প্রভৃতি
শুভের ‘রাশি। তিনি ‘নিজশক্তির কণিকা-
মাত্রে সমস্ত ভূতগণকে ধারণ করিতেছেন।
তিনি শ্রেষ্ঠতম, পরাংপর; তাঁহাতে পক্ষ-
ক্লেশের তিলমাত্র নাই।’

সর্ব্বত বশী সর্ব্বভেশানঃ সর্ব্বভাষিপতিঃ স ন সাধুনা
কর্ম্মণা ভুতান্ নো এবাসাধুনা কর্ম্মণা কনীজান্ এষ সর্ব্বেশ্বর
এষ ভূতাধিপতিরেব ভূতপাল এষ সেতুবিধরণ এবাং
• লোকানামসমুদায়ঃ।

বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২

‘ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঐশ্বর,
সকলের অধিপতি; সাধুকর্ম্মের দ্বারা ইহার
উপচর হয় না, অসাধুকর্ম্মের দ্বারা অপচর
হয় না; ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি,
ইনি ভূতপাল; ইনি লোকসমূহের বিভা-
জক, ধারক সেতু।’

সংসারাত্তেহতবোধো নান্তবন্তি দ্বরা বিনা।

অগং সর্ব্বং শরীরং তে হৈব্যাং তু বহুধাতলম্।

রামায়ণ, বৃহদাণ্ড, ১০৭।১২৩০

‘বেদসকলে তোমার সংসার হইয়াছিল;
তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। সমস্ত অগং
তোমার শরীর; বহুধাতল তোমার চিরস্থায়
নিদর্শন।’

যন্ত্রিয়ং যতশ্চেনং কেনেনাং য ইদং স্বয়ম্।

• বোহিমাং পরমাত পরমং প্রপাদ্য স্বয়ংভুবম্।

ভাগবত ৮।৩২।৩

‘মোহাতে এই বিশ্ব, যাঁহা হইতে এই
বিশ্ব, যাঁহা দ্বারা এই বিশ্ব, যিনি স্বয়ং এই
বিশ্ব; যিনি এই বিশ্বের পরেরও পরে, সেই
স্বয়ম্ভূর শরণাগত হই।’

স বৃক্ষকাঁসাকৃতিভিঃ পরোহতো

যন্মাং প্রপকঃ পরিবর্ত্তেহয়ম্।

ধর্ম্মাবহঃ পাপমুখং ভগলং

জাযাজ্জহনমৃতং বিশ্বধাম।

তমীষরাণাং পরমং মহেশ্বরঃ

ভঃ দেবতানাং পরমঃ চ দেবভূম্।

পতিঃ পতীনাং পরমঃ পরমাদ্-

বিদ্যাম দেবঃ ভুবনেশমীভাম্।

ন তত্ কার্য্যং করণং চ বিদ্যাতে

ন তৎসম্বন্ধাত্মাদিকন্ড দৃষ্টতে।

পরোহত শক্তিবিশিষ্টেব জ্ঞাত্তে

যাতাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

বেতাভূত ৬।৩-৮

• ‘যিনি কালের অতীত, সংসারবৃক্ষের
উর্ধ্বে; যাঁহা হইতে এই প্রপঞ্চের পরিবর্তন
সংঘটিত হইতেছে; যিনি ধর্ম্মের সকার ও
পাপের পরিহার করেন; সেই অব্যত বিখা-
দার ঐশ্বর্যাধিপতি (মহেশ্বরকে) আশ্রয়
অধিষ্ঠিত জানিবে।

‘তিনি ঐশ্বর্য্যগণের পরম মহেশ্বর, দেবতা-
গণের পরম দেবতা, প্রজাপতিগণের পরম-
পতি; পরাংপর বিশ্বপতি আরাধ্য দেবকে
আমরা জানিয়াছি।

‘তাঁহার শরীর নাই, তাঁহার ইন্দ্রিয়
নাই; তাঁহার সমান, তাঁহার অধিক কেহ
দৃষ্ট হন না। তাঁহাতে বিবিশ পরা শক্তি

বভাবসিদ্ধ—জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি, ক্রিয়া-
শক্তি ।’

বিষতত্ত্বসূক্ত বিষতোমুখো

বিষতোবাহরত বিষতস্পৃহাৎ ।

সংবাহিত্যাং ধনন্তি সংপতজ্জৈ-

র্দ্যাবাহুযী জনয়ন্তের একঃ ।

যেতাযতর ৩৩

‘তাঁহার চক্ষু সর্বজ্ঞ, তাঁহার মুখ সর্বজ্ঞ,
তাঁহার বাহ সর্বজ্ঞ, তাঁহার গতি সর্বজ্ঞ ;
তিনি মনুষ্যকে ভুজবৃত্ত এবং পক্ষীকে পক্ষ-
বৃত্ত করিয়াছেন ; তিনি আকাশ-পৃথিবী
সৃষ্টি করিয়াছেন ; তিনি অধিতার ।’

সর্বতঃ পানিশাদ্যতং সর্বতোহকিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ প্রতিমদ্যেক সর্ববাস্তু্য তিষ্ঠতি ॥

সর্বোদ্রিয়ভণাতাসং সর্বোদ্রিয়বিবর্জিতম্ ।

সর্বন্ত প্রভুযীশানাং সর্বন্ত শরণং বৃহৎ ॥

যেতাযতর ৩১৬১৭

‘তাঁহার সর্বজ্ঞ করচরণ, সর্বজ্ঞ শিরঃ-
নয়ন, সর্বজ্ঞ প্রতি-আনন ; তিনি সমস্ত
ব্যাপিরা আছেন ।

‘তিনি সকলইন্দ্রিয়বর্জিত, অথচ সকল
ইন্দ্রিয়ের গুণবৃত্ত ; তিনি সকলের প্রভু,
মহেশ্বর, সকলের বৃহৎ শরণ (আশ্রয়) ।’

মহেশ্বরের এমন বর্ণনা অন্তর্জাতির ধর্ম-
শাস্ত্রে সুল্লভ ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত-।

কুমারসম্ভব ।



তপঃকলোদয় ।*

একপে চোখের ‘পরে পিনাকী দিলা’ মরে,
তাহাতে উমার করে হৃদয় বিকল !
আপনারও বোবনে থিক্ দিলা মনে মনে—
না চাহিলে প্রিয়জনে চাকুতা বিকল ! (১)

উঠিল বাসনা আগি’—অমোঘ জ্বপের লাগি’
তপোজ্বপে অজুরাগি’ পুরাবে ছুরাশা !
নহিলে কেমনে তাঁর এ উত্তর মিলিবার—
সেইরূপ দাবী, আর সেই ভালবাসা ? (২)

* ‘কুমারসম্ভব’ মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গ । ইহাতে যদনন্তরের পরের ঘটনা অর্থাৎ পার্বতীর তপস্চরণ বর্ণিত হইয়াছে ।

কঠিন যাদনতরে বালিকা বতন করে,
 পিনাক্ষাগিরি 'পরে সঁপি' প্রাণমন !
 শুনিয়া মেনকারাণী উমারে বুকেতে টানি'
 কহিলা সোহাগবাণী তপোনিবারণ :—(৩)

"দেবতা সে কনোমত আছে গৃহে শত শত ;
 কোথা বাছা মুনিত্তত, কোথা তহু তোর !
 ভর সহে ভ্রমরার শিরীষ সে স্নুকুমার,
 তা বলে' কি পারে আর পাখীর কঠোর ?" (৪)

দুঃসমনা মেয়েরে সে মেনা হেন উপদেশে
 তপোনীতি হ'তে শেষে নিবারিতে নায়ে—
 সাঁধের সাধনে বহি ধায় মন নিরবধি,
 কে ফিরাবে ক্রতনদী—স্রোতসম ভারে ? (৫)

সখী যে নিকটে আছে পাঠারে পিতার কাছে
 একদা মানিনী বাচে—"যাইব বিপিনে,
 মন-আশা সকলি ত আপনি জানেন পিতঃ,
 করিব সাধনা নিত' কলে বতদিনে !" (৬)

অনুরূপ অভিলাষে গিরিরাজ মনে হাসে,
 তনয়ার বনবাসে দিলা অনুরমতি ।
 বায় বালা,—এ ভুবনে পরে তাঁরি নামে ভণে -
 গৌরীশিখর-বনে, শিবীর বসতি ! (৭)

তপোমতি বালিকার বুচে সাধ বালিকার—
 বুকের সুরভিসার লুটিত বা' আগে,
 বাঁধিল বাকল বালা অরুণ-পাটল আলা--
 টুটিল বা', এ কি আলা, উচ' কুচতাপে ! (৮)

চিকণ চিকুরে লুটে' বেঁধুখে মাধুরী লুটে,
 রাজিল তা' জটাজুটে এখনো তেমন !
 কেবল ভ্রমরগারে কমল ত শোভে না রে—
 শেহালাদলেও তায়ে সাজায় কেমন ! (৯)

ব্রতবতী তিন-নরী তৃণ-গুণ দিল পরি',
 তুলত কি শিহরি' উঠে থেকে থেকে
 কত তা পরে মি আগে, কটিতে কঠিন লাগে—
 চারিধার রাঙা রাগে দিল এঁকে এঁকে ! (১০)

অথরে আলতা দিত বে-হাতে সে অবিরত,
 তনুরাগে অরুণিত তাঁটা নাহি ধরে ;
 কুশ-হৃতে অবিরত আঙুল হতেছে কত,
 করেছে প্রণয় কত অপমালা'পরে ! (১১)

কোমল শরনে, তুলে কিরে-গুণে যেত খুলে—
 সেই সে চুলের ফুলে বাজিত বেদন,
 তুলত-উপাধানে শুধু বালা সাবধানে
 বসে-গুরেও পাষাণে কাটিছে এখন ! (১২)

আজিকে নিরমবতী হুঁটি ধন দৌহা প্রতি
 রাখি' দিলা, পেনে পতি লইবেন কিরে—
 লতিকা সে সুকুমারী লীলাগতি দিলা তারি,
 চকিত চাহনি ছাড়ি' দিলা হরিণীরে ! (১৩)

নিরলস নিজে-থেকে ঘটনবারিসেকে
 বাড়াইলা একে একে চারাগাছগুলি,—
 প্রথমে জনমে বলে' বনের এ তরুণলে,
 নবীন 'কুমার' হ'লে, বাননিকো তুলি' ! (১৪)

মুঠা-মুঠা বনবীজে বৃক্ষ পালিভেন নিজে,
 তাই তারা এমনি যে তাঁহাতে তুলিত—
 সখীরা সমুখে থাকে তবু নাহি তর রাখে,
 কুতূহলে তাঁরি আঁখে আঁখিটি তুলিত । (১৫)

দান সারি', চীর পরি', হোমবাগ সমাচরি',
 বখাখিখি বেদ পড়ি' বাপিত দিবস ।
 নদা তাঁর বয়সে আসিভেন প্রবিশণে,—
 ধরবে যে বড়, গণে কে তার বয়স ? (১৬)

প্রভিলি প্রাণিকুলে আগেকার ঘেব তুলে ;
তরুণলি কলকুলে অভিধিরে সেবে ;
কুটীরে সারাটি কণ অলে হোমহতাশন ;
হইল সে তপোবন সুপাবন এবে ! (১৭)

বুঝিলেন উমা যবে—প্রথম ক্রমের তপে
কখনো নাহিক হবে কল মনোমত,
তখন তাপসব্রতা নাহি বাসি' কোমলতা
করিল সে তহুলতা আরো তপোরত ! (১৮)

‘আগে যেরা ভাঁটা খেলে’ বাঁচিত না খাস ফেলে’,
ধরিল সে অবহেলে যুনির আচার !
কনককমলদলে তহু না রচিত হ’লে,
কেন হেন সুকোমলে এমন স-সার ? (১৯)

সুহাসিনী চারিধার হতাশন আলি’ চার,
রাখিতেন মাঝে তার কণ তহুখানি ;
নিদাঘে তাহুর দিক্ চাহিতেন অনিমিখ—
চোখে যে ঠিকরে চিক সে কিছু না মর্নি’ ! (২০)

এইরূপে সবিতার সহি’ কুর ধরধার
ধরিল সুখানি তাঁর কমলের ছবি !
অবিরল বিলোকনে দীঘল নয়নকোণে
কেবল কালিমা ক্রমে লভিল পদবী ! (২১)

অবাচিত ধারা-পর, বিধূকর সুধাময়,
তহু এই ঘরে হয় তাপসী বাগার
পায়ণের বিধি সারা ! বিটপিগণের পারা
জীবিকা এতেক ছাড়ি নাহি ছিল আর ! (২২)

দহিরা বিবিধানলে—সমিধে, নভে স্না’ অলে, *
—নিদাঘ বাইত চলে’ । বরষা তথাও ?
তখন নুতন বারি শরীরে করিলে, তাঁরি
ধরা-সহ তাপ ছাড়ি’ বাইত উধাও ! (২৩)

কণ থাকি' ঘন-জল স্নান-লোমে টলান,
 পীড়িয়া অধরদল লুটে কুচশিরে !
 ত্রিংশদীর্ঘ খাঁজে খাঁজে স্থলিত, চলিত না যে—
 অবশেষে নাতিমাঝে পশিত স্মৃতিরে ! (২৪)

ততেন শিলার 'পর ছাড়িয়া কুটীরঘর,
 অবিরাম জলঝড় না মানি' মানিনী
 কি বঁঠোরে ব্রত রাখে ! চপলা-চমক-আঁধে
 যেন তা দেখিতে থাকে নিতি নিশীথিনী ! (২৫)

বহে ঘোর শীতবাত নাহি তাহে দৃকপাত—
 সারাটা পউষরাত বারিমাঝে রহে ।
 ছুটি চকাচকী পাখা অদূরে উঠিছে ডাকি'—
 করিছে উমার আঁধি তাদের বিরহে ! (২৬)

সরোজ সুরতি সুখে রজনীতে জলে ঢুকে,
 ঠোঁটখানি টুকটুকে কাঁপে ঠিক দল !—
 বুচেছে ভুবায়চার কমল সকলি হার,
 সেখা যেন শোভা পায় একটি কেবল ! (২৭)

ভরুতলে বরি'-পড়া পর্ণে পরাণ-ধরা
 সেই ত ভপের পরা' ! তাহারো বিহনে
 স্মৃত্যধিগী ধরে প্রাণ, তাই তাঁরে করে দান
 'অপর্ণা'-অভিধান পুরাবিদগণে ! (২৮)

এইষত নিশিদিন সাধি' ব্রত স্মৃতি
 করিতে লাগিল। কীপ যুগলের দেহ—
 হৃদয় শরীর দিয়া অবিরত আচরিয়া,
 পায়েন নি হেন ক্রিয়া যুনিরাও কেহ ! (২৯)

অকিনে আবাফে * সেজে', জলি' যেন তপ'তেজে,
 বতি এক—কর সে যে অভয়বচনে,
 শিরে বহি' জটাতার, সাধনারি অবতার—
 একদা পশিল তাঁর নব তপোবনে ! (৩০)

গিরিকান্ত অতিথিগণ, বর্ত্তিয়ে পূজিতে ধরা
উঠিল ত্যজিয়া ধরা দিলা বহমান ;—
সাধুরা স্বধীরমতি লোকবিশেষের প্রতি
দেখান অধিক রক্তি, হোন্ না সমান ! (৩১)

গৃহাগত, গ্রহি' তাঁর বিধিমত পূজাচার,
কণতরে শ্রমতার ঘেন করি দূর,
অকুটিল ছুটি আঁখি উয়ার উপরে রাখি'
কহিলা বিনয় মাখি' বচন মধুর ।—(৩২)

“বলি, তব ক্রিয়াতরে কুশকাঠ ছোটে ত রে ?
বারিও ত মেলে তোরে—জ্ঞানে বস লাগে ?
আপন শক্তিমত তপ তুমি করিছ ত ?
সাধিতে ধরমব্রত দেহই যে আপে ! (৩৩)

“বলি, নিভ' ঢালি' জল আপনি ত নবদল
ছুটাইছ এ সকল বনলতিকার ?
তাই চির রাগহার। ও-রাঙা ঠোঁটের পারা
পাটলবরণে তারা ছেন শোভা পায় ! (৩৪)

“স্বপ'গরে তব মন রয়েছে ত সবতন—
ভালবেসে লক্ষ্মণ লয় কৃপমুষ্টি ?
বলি লো কমল-আঁখি, তোমারি চাহনি নাকি
চল-চোখে নিতে আঁকি' তোলে আঁখিছুটি ? (৩৫)

“শোন বালা লোকে বলে—সুহৃদ না পাপে টলে—
সে বাণী সনাই ফলে জানিছ বিশেষ ;
নহে কেন স্নানোত্তনে ! ও-সত্য-বরণনে
সুনিগণো সবতনে লবে উপদেশ ? (৩৬)

বঙ্গদর্শন ।

ঘাটের পথ ।

ওরা চলেছে দীঘির ধারে ।

ঐ শোনা যায় বেগুনছায়

ককণ ঝঙ্কারে ।

আমার চুকেছে দিবসের কাজ,

শেষ হ'য়ে গেছে জলভরা আজ,

দাঁড়ায়ে রয়েছি ঘাটে ।

ওরা চলেছে দীঘির ধারে ।

আমি কোন্‌ ছলে যাব ঘাটে —

শাখা-ধরধর পাতা-মরমর

ছায়া-সুশীতল বাটে ?

বেলা বেশি নাই, দিন হ'ল শোধ,

ছায়া বেড়ে যায়, পড়ে আসে রোদ,

এ বেলা কেমনে কাটে ?

আমি কোন্‌ ছলে যাব ঘাটে ?

ওগো কি আমি কহিব আর ?

ভাবিস্নেহে কেহ ভর করি আমি

ভরা-কলসের ভার !

যা হোক তা হোক এই ভালবাসি,

বহে নিয়ে যাই, তরে' নিয়ে আসি,

কতদিন কতবার ।

ওগো কি আমি কহিব আর !

এ কি শুধু ভাল নিয়ে আসি ?

এই আনাগোনা কিলের লাগি যে

কি ক'র, কি আছে তাবা !

কত-না দিনের আঁধারে আলোতে

বহিরা এনেছি এই বাঁকাপথে

কত কাদা কত হাসা !

এক শুধু জল নিয়ে আসা ?

আমি ডরি নাই বড়জল ।

উড়েছে আকাশে উতলা বাতাসে

উদাম অকল ।

বেগুশাখা'পরে বারি বরষায়ে,

এ কূলে ও কূলে কালো ছায়া পড়ে,

পথঘাট পিচ্ছদ ।

আমি ডরি নাই বড়জল ।

আমি • গিরেছি আঁধার সঁজে ।

• শিহরি শিহরি উঠে পল্লব

নির্জন বনবাগে ।

বাতাস ধমকে, জোনাকি চমকে,

ঝিল্লীর সাথে ধমকে ধমকে

চরণে ভূষণ বাজে ।

আমি গিরেছি আঁধার সঁজে ।

ববে বৃকে ভরি উঠে বাধা—

ঘরের তিতরে না দেয় থাকিতে

অকারণ আকুলতা,—

ঐপন্যার মনে একা পথে চলি,

কাঁধের কলসী বলে হুলহুলি

জলভরা কলকথা ।

ববে বৃকে ভরি উঠে বাধা ।

ওগো দিনে কতবার করে'

ঘর-বাহিরের মাঝখানে বহি

ঐ পথ ডাকে ঘোরে !

কুম্ভের বারি খেয়ে খেয়ে আসে,

কপোত-কুম্ভ-করণ আকাশে

উদাসীন মেঘ ঘোরে—

ওগো দিনে কতবার করে' ।

আমি বাহির হইব বলে'
 যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
 নীল আকাশের কোলে !
 তাই কানাকানি পাতার পাতার,—
 কালো লহরীর মাঝার মাঝার
 চঞ্চল আলো দোলে—
 আমি বাহির হইব বলে' ।

আজ ভরা হ'রে গেছে বারি ।
 আঙিনার দ্বারে চাহি পথপানে
 ঘর ছেড়ে যেতে নারি ।
 দিনের আলোক দ্বান হ'রে আসে,
 বধুগণ ঘাটে যার কলহাসে
 কক্ষে লইয়া বারি ।
 মোর ভরা হ'রে গেছে বারি ।

রামায়ণের রচনাকাল ।

ব্যাকরণের জন্মকথা ।

“চষারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্ত পাণা যে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্ত । শব্দপ্রচার করিত । তাহার চারিটি শৃঙ্গ ;—
 ত্রিখা বক্সো বৃক্ষতো রোরবীতি মহো বেষো বর্জ ”। আবিবেশ ।” বিশেষ্য, ধাতু, উপসর্গ ও নিপাত ; তিনটি
 ভারতবর্ষের আর্ষাসমাজে শব্দ “ব্রহ্ম” পদ ;—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কাল ;
 বলিয়াই পরিচিত ছিল । শব্দ ব্রহ্ম ;—শব্দ দুইটি শীর্ষ ;—নিত্য ও কার্য ; সাতটি হস্ত ;
 “মহান্ দেবঃ” । তাহাকে ভাল করিয়া —সপ্ত বিভক্তি ;—কর্তা, কর্ম, করণ,
 বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য তাহার বৃষতরুপ সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ ; সে
 পরিকল্পিত দুইরাহিল । সেই বৃষত শব্দ বৃষত তিন স্থানে আবদ্ধ ;—উরসে, কণ্ঠে,
 করিতে করিতে মর্ত্যালোকে প্রবিষ্ট হইয়া শিরে ।* সে কতদিনের কথা, তাহার কোন

* “চষারি শৃঙ্গাণি—চষারি পদমাতানি,—নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাক । ত্রয়ো অস্ত পাণাঃ—ত্রয়ঃ কালঃ—
 ভূতভবিষ্যদ্বর্তমানাঃ । যে শীর্ষে—যৌ শব্দদ্বয়ানৌ—নিত্যঃ কার্যাক । সপ্ত হস্তাসো অস্ত্য—সপ্ত বিভক্তয়ঃ । ত্রিখা
 বক্সঃ—ত্রিখু হানেবু বক্সঃ—উরসি কণ্ঠে শিরসীতি । বৃক্ষতো বর্ষণাৎ । রোরবীতি—শব্দং করোতি । কৃত এতৎ ?
 রোতিঃ শব্দকর্ণী । মহো বেষো বর্জ ”। আবিবেশেতি । মহান্ দেবঃ শব্দঃ । মর্ত্যা—মরণধর্মীণো মনুষ্যাঃ । তান্
 আবিবেশ ।”—ইতি মহাত্মন্যাম্ ।

ইতিহাস পাইবার আশা নাই। তাহা সভ্যতা-বিকাশের সর্বপ্রথম পুরাতনযুগের কুস্মটিকার সমাজের ছিল। সে যুগ কেবল কন্ননার যুগ; তখনও পর্যবেক্ষণ ও বিচারণা প্রচলিত হইয়া সভ্যনির্ণয়ের জন্য আগ্রহপ্রকাশ করে নাই। সে যুগ কেবল বিশ্বাসের যুগ; তখনও তর্কপদ্ধতি সমুদ্ভূত হইয়া সকল কথাই বিচার করিয়া বুঝিয়া, হইবার জন্য ব্যস্ত হয় নাই।*

তখন জনসমাজ বুঝিয়াছিল;—শব্দই বেদ। তাহাকে সম্যক পরিজ্ঞাত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা উদ্ভিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল জানা নহে;—বেদবাক্যকে নিত্যকাল রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, বেদার্থবিজ্ঞাপনের চেষ্টায়, বিবিধ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ব্যাকরণ তাহারই একটি কৌশলমাত্র। তাহার প্রধান প্রয়োজন,—শব্দানুশাসন।*

শব্দসকল যেভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রকৃতি বিচার করিবার জন্য অতি পুরাকালেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল। শব্দশিক্ষা না করিলে, বেদার্থজ্ঞানে অধিকার জন্মে না। বেদার্থজ্ঞানে অধিকার না হইলে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক বাপন করা যায় না। বাঁহারা আধ্যাত্মিক নিয়ত লাগানিষ্ঠ ছিলেন, তাহারা যে শব্দশিক্ষার্থ ব্যাকুল হইবেন, তাহা স্বাভাবিক কথা।

শব্দশিক্ষার উপায় কি? সংখ্যায় অল্প হইলে, পৃথকভাবে প্রত্যেক শব্দের শিক্ষালাভ করিবার উপায় হইতে পারিত। কিন্তু

শব্দ যে অসংখ্য! অল্পকালে অল্পকালে অসংখ্য শব্দের ব্যাপ্তিশিক্ষার উপায় কি? এই প্রশ্ন পুরাকালের সমগ্র সভ্যসমাজকেই বিচলিত করিয়া থাকিবে। কিন্তু উপায়ান্তরের অভাবে, সমগ্র সভ্যসমাজ পৃথকভাবে প্রত্যেক শব্দের শিক্ষালাভ করিবার জন্যই বহুপন্থিক হইতে বাধ্য হইয়াছিল! এই প্রণালীতে শব্দশিক্ষা করিবার নাম,—“প্রতিপদপাঠ।”

অত্য়পি.চীনদেশে এই প্রণালী প্রচলিত আছে। এক সময়ে ভারতবর্ষেও এই প্রণালী প্রচলিত ছিল। ইহা যে শব্দশিক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নহে, ভারতবর্ষেই তাহা সর্বপ্রায়ে প্রতিভাত হয়। তাহা ভারতীয় সভ্যতার উল্লেখযোগ্য গৌরবের কথা। সংস্কৃতব্যাকরণশাস্ত্রে সেই গৌরব চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

পূর্বে শব্দশিক্ষার কিরূপ প্রণালী প্রচলিত ছিল, কিজন্মই বা তাহা পরিভাষ্য হইল, তাহার কোন লিখিত ইতিহাস না থাকিলেও, একটি প্রবল জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। ভগবান্ পতঞ্জলি “ব্যাকরণমহাত্ম্যোয়” উপক্রমণিকায় তাহার উল্লেখ করিয়া, তাহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিয়াছেন।

জনশ্রুতি এইরূপ। দেবশব্দক বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে শব্দশিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন পৃথকভাবে প্রত্যেক শব্দের শিক্ষালাভ করিবার “প্রতিপদপাঠ”-

* “অথ শব্দানুশাসনং” নামক যে প্রতিক্রিয়ায় পাণিনিব্যাকরণে বৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা মহাকাব্যকার পতঞ্জলিসূত্রির লেখনীগ্রহৃত বলিয়া “সর্বদর্শনসংগ্রহে” উল্লিখিত আছে। উহা পাণিনিবৃত্ত, নহে। কিন্তু উহাতেই ব্যাকরণশাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে।

প্রণালী প্রচলিত ছিল। দেবভক্ত বৃহস্পতি বরং অধ্যাপনার তার গ্রহণ করিয়াছিলেন ; দেবরাজ ইন্দ্র বরং অধ্যয়নার্থ বনশীল হইয়াছিলেন ; এইভাবে দিব্যসহস্রবর্ষ শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল ;—তথাপি শব্দশিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই ! মনুষ্যালোকে বাহার পরমায়ু সর্বাধিক অধিক, তাহারও পরমায়ু শতবর্ষমাত্র। তাহাতে “প্রতিপদপাঠ”-প্রণালী অবলম্বন করিয়া, কয়টি শব্দের শিক্ষালাভ করা সম্ভব ? এই কথা চিন্তা করিবামাত্র মনোবিগণ বুঝিয়াছিলেন,—“প্রতিপদপাঠ”-প্রণালী শব্দশিক্ষার একুঠপ্রণালী হইতে পারে না। তখন শব্দশিক্ষার একুঠপ্রণালীর অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। কালে তাহা হইতেই ব্যাকরণশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সহস্রা এই কার্য্য সাধিত হয় নাই। কত দিনে কত মনোবীর কত অক্লান্ত অধ্যবসারে এই একুঠপ্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।*

শব্দ অসংখ্য বলিয়াই, “প্রতিপদপাঠ”-প্রণালী ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল ! শব্দ অসংখ্য হউক ; তাহাকে কি কোন উপায়ে অল্পসংখ্যক শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করিবার উপায় নাই ? এই চিন্তা হইতেই ক্রমে ক্রমে ব্যাকরণশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছিল। যাহারা ইহার উপায়-অবেশে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারাই মানবসমাজের আদি বৈয়াকরণ—সভ্যসমাজের সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক শিক্ষক।

তাহারা কতকগুলি প্রকৃতিপ্রত্যয়ের কল্পনা করিয়া, তদ্বারা অসংখ্য শব্দকে অল্পসংখ্যক শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করিয়া, সহজে শব্দশিক্ষার এক একুঠপ্রণালীর উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীবিভাগে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহারাই যে-সকল শব্দকে শ্রেণীভুক্ত করিবার উপায় উদ্ভাবিত করিতে পারেন নাই, তাহাদিগের অন্ত একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা শিথিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহারই নাম—“নিপাতন।” তাহা “প্রতিপদপাঠেরই” নামান্তরমাত্র। কারণ, যে সকল শব্দ “নিপাতনের” নিয়মে শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক শব্দকে পূর্ববৎ পৃথকভাবেই শিক্ষা করিতে হয়। কেবল সংখ্যার অল্প বলিয়া, এই শ্রেণীর শব্দশিক্ষার আর পূর্ববৎ জীবনক্ষর করিতে হয় না।

অনেকে প্রকৃতিপ্রত্যয়কে চিরপ্রচলিত মনে করিয়া, তাহা যে বৈয়াকরণগণের কল্পনামাত্র, এই ঐতিহাসিক সত্যের উপলব্ধি করিতে পারেন না। কেহ কেহ স্পষ্টই বলিয়া থাকেন,—ভূ, কৃ, অস্ প্রভৃতি ধাতুই মূলশব্দ ; তাহার সহিত উত্তরকালে প্রত্যয় সংযুক্ত হইয়া ভবতি, কয়োতি, অস্তি প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের মত নহে। ভারতবর্ষের মতে “শব্দ নিত্য”—তাহা চিরকাল সমভাবে বর্তমান আছে। একসময়ে বুঝিবার সুবিধার জন্য ভবতি, কয়োতি, অস্তি

* এবং হি আরম্ভে। বৃহস্পতিরাজার দিব্য সহস্রবর্ষ : প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ। নাভং জগাম। বৃহস্পতিস্তি : প্রবক্তা, ইন্দ্রোধ্যোক্তা, দিব্যঃ বর্ষসহস্রমধ্যয়নকালো ন চাভং জগাম। কিং পুনর্যাবৎ ? বঃ সর্বথা চিরং জীবতি, স বর্ষশতং জীবতি। তস্যাং অনভ্যুপারঃ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ।”—ইতি মহাভাষ্যম্।

প্রকৃতি প্রত্যেক শব্দকে পৃথকভাবে শিক্ষা করিবার “প্রতিপদপাঠ”প্রণালী প্রচলিত ছিল; উত্তরকালে তাহার অন্তর্বিধা উপলব্ধি করিয়া, মনীষিগণ প্রকৃতিপ্রত্যয়ের কল্পনা করিয়া, তাহার দ্বারা এক সঙ্গে অনেক শব্দের শিক্ষাকোশল উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। এইরূপ বিশ্লেষণবুদ্ধি পরিস্ফুট না হইলে, “ব্যাকরণ” জন্মগ্রহণ করিত না;—“প্রতিপদপাঠ”প্রণালীই প্রচলিত থাকিত! ব্যাকরণ জন্মগ্রহণ করায়, সহজে শব্দশিক্ষার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার জন্ত ভারতবর্ষের মনীষিগণ কত প্রয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। *

এইরূপে শব্দশিক্ষার সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইবার সময়ে, মনীষিগণ আর একটি প্রবল তর্কে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সে তর্কটি এইরূপ। সকল শব্দই কি “ধাতুজ” বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে? এ বিষয়ে প্রবল মতপার্থক্য উপস্থিত হইয়াছিল। নিরুক্তকারণগণ সকল শব্দকেই “ধাতুজ” বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। শব্দটপুজ শাকটারন ভিন্ন অন্য কোন বৈয়াকরণ তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে অনেক শব্দ “ধাতুজ” হইলেও, সকল শব্দই “ধাতুজ” নহে।

বাহা “ধাতুজ” নহে, বৈয়াকরণগণ তাহাকে “অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক” বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রচলিত শব্দ

ধরিয়া, প্রকৃতিপ্রত্যয়ের কল্পনা করিয়া, শব্দব্যাখ্যার প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়,—নিতান্ত কষ্টকল্পনা ব্যতীত সকল শব্দেরই প্রকৃতিপ্রত্যয়ের নিয়মনিয়ম করা যায় না। বৈয়াকরণগণ সেরূপ কষ্টকল্পনার প্রস্তরদান না করিয়া, এই শ্রেণীর শব্দগুলিকে “অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক” নামে অভিহিত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—তাহারা “যথোপনিষ্টানি,”—যে ভাবে উপনিষ্ট হইবে, সেই ভাবেই তাহাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে।

“অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিকের” সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে! এই শ্রেণীর শব্দশিক্ষার সহজ উপায় কি? “প্রতিপদপাঠ”প্রণালী ভিন্ন এই শ্রেণীর শব্দশিক্ষার অন্য উপায় কোথায়? যে উপায়কে পরিহার করিবার জন্ত এত চেষ্টা, তাহাকে সম্পূর্ণ পরিহার করিবার উপায় রহিল না,—শব্দসকল ছই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এক শ্রেণীর শব্দ প্রকৃতিপ্রত্যয়বোধে ব্যাখ্যাত হইবার উপায় হইল; আর এক শ্রেণীর শব্দ পুরাতন “প্রতিপদপাঠ”প্রণালীতেই ব্যাখ্যাত হইতে থাকিবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া গেল। ইহা মনীষিদেরই মনঃপূত হইল না। বাঁহাদের মনঃপূত হইল না, তাঁহারা পুনরায় প্রত্যয় কল্পনা করিয়া, নিপাতনের নিয়মে “অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিকের”, ব্যুৎপত্তিব্যাখ্যার্থ বঙ্গীল

* রাজশাহী-সাহিত্যসমিতিতে প্রজ্ঞাপদ শ্রীযুক্ত এসমুদ্রার ভট্টাচার্য মহাশয় “উপনিষৎ”নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই সকল বিষয়ের বিবিধ আলোচনার উৎসাহদান করিয়াছেন। তাঁহার “পানিনিভাষের” প্রবন্ধ “ভারতী” প্রকাশিত হইতেছে; “উপনিষৎ” প্রবন্ধও মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইবে।

এইরূপে যে সকল নূতন প্রত্যয় করিত, হইতে লাগিল, তাহার প্রথম প্রত্যয়টির নাম “উণ্”। তাহা হইতেই “উণাদি” প্রত্যয়-নামক একটি স্বতন্ত্র শব্দশিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। বৈয়াকরণসমাজে এক-সময়ে এ বিষয়ে প্রবল মতপার্থক্য বিস্তারিত থাকিলেও, উত্তরকালের বৈয়াকরণমাজেই “উণাদি”কে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং “উণাদয়ো বহুলং” বলিয়া স্বত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন। কেবল পার্থক্য এই যে, কোন ব্যাকরণেই সমগ্র উণাদির আলোচনা হানপ্রাপ্ত হয় নাই; তাহার অল্প “উণাদি-স্বত্র” নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছে। *

কবে “উণাদির” প্রথম উদ্ভাবনা হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। “নিরুক্ত”-শাস্ত্রে তাহার মূল দেখিতে পাওয়া যায়। কবে ব্যাকরণগোষ্ঠ প্রকৃতি প্রত্যয় উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা যেমন অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কবে “উণাদি”-প্রত্যয় উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহাও সেইরূপ অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে! তাহার কালনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সফলকাম হইবার আশা নাই।

এইরূপে ব্যাকরণশাস্ত্র গ্রন্থ হইয়া, শব্দানুশাসনকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ স্থিতিশীল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ স্থিতিশীল হইয়াও, বিলক্ষণ গতিশীল ছিল। যাহারা ভারত-

বর্ষের পুরাতন সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাহারাই দেখিবেন,—এক-সময়ে যে শব্দের যে ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, চিরদিন সাহিত্যসমাজ সেই ব্যাখ্যা লইয়া পরিতৃপ্ত হয় নাই! একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়াছে। কখন পুরাতন ব্যাখ্যা বিলুপ্ত করিয়া, অভিনব ব্যাখ্যা প্রবল হইয়াছে; কখন বা নূতন-পুরাতন সকল ব্যাখ্যাই তুল্যভাবে সমাদরলাভ করিয়াছে। বৈয়াকরণগণ “নিপাতনের” ব্যবস্থা করিয়া যে সকল শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, “উণাদি”-কারগণ তাহারও কত শব্দের “উণাদি”-প্রত্যয়সম্মত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন।† শব্দশিক্ষার এই সকল উপায় যে কল্পনা-গ্রন্থত, এই সকল মতপার্থক্য এবং ব্যাখ্যা-পার্থক্যই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। এই সকল কারণে, সংস্কৃতসাহিত্যের শব্দবিচারে প্রবৃত্ত হইলে, পুরাতন গ্রন্থের রচনাকালনির্ণয়ের প্রকৃষ্ট-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার আশা আছে।

ব্যাকরণ একটি “বেদাঙ্গ” বলিয়া সুপরিচিত। অঙ্গের মধ্যে মুখ যেমন শ্রেষ্ঠ অঙ্গের অন্তর্গত, “বেদাঙ্গের” মধ্যেও ব্যাকরণ সেইরূপ—“মুখং ব্যাকরণং স্মৃতং”—তাহা বেদের মুখ বলিয়াই কথিত হইয়া আসিতেছে। এই বেদমুখ—ব্যাকরণ—প্রথমে কেবল বেদবাক্যের ব্যাখ্যা লইয়াই

* অধ্যাপক অক্রেটকর্ভুক লণ্ডননগরের মুদ্রিত উজ্জলভক্ত বৃত্তিসংযুক্ত “উণাদিস্বত্র” নামক গ্রন্থই এই প্রবন্ধরচনার ব্যবহৃত হইয়াছে।

† বৈয়াকরণগণ “হিন্”-বাক্য হইতে নিপাতনের নিয়মে “সিংহ” শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্দেশ করেন; “উণাদি-কারগণ” “সিহ্”-বাক্য হইতে নিপাতনের নিয়মে “সিংহ” শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্দেশ করেন। অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক।

ব্যাপ্ত ছিল ; তাহাতেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইত। তাহার পর লৌকিকসাহিত্য উদ্ভূত হইলে, সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্য বৈদিক ও লৌকিক নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। উত্তর ভাগের শব্দানুশাসন একরূপ হইতে পারে না বলিয়াই, ব্যাকরণশাস্ত্র উত্তরবিধ শব্দানুশাসনের অল্প উত্তরবিধ হ্রস্বরচনার প্রবর্তী হইয়াছিল। যে সাহিত্য-রূপে এই প্রথা প্রবর্তিত হয়, সে রূপের ব্যাকরণের সমগ্র হ্রস্ব আর “বেদাদ্ধ” বলিয়া অভিমানি প্রকাশ করিতে পারে নাই। পাণিনিব্যাকরণ এই শ্রেণীর মিশ্র ব্যাকরণ ; —তাহাতে বৈদিক ও লৌকিক হ্রস্ব একাধারে বর্তমান। কিন্তু লৌকিক শব্দানুশাসনের ব্যবস্থা থাকিলেও, পাণিনিব্যাকরণ সর্বপুৰাতন বলিয়া, এখনও “বেদাদ্ধ” নামেই কথিত হইয়া থাকে। যে ব্যাকরণ কেবল বৈদিকশব্দের অনুশাসনকার্য্যেই লিপ্ত ছিল, লৌকিকশব্দের ছায়াস্পর্শ করিত না,—বাহা কেবল “বেদাদ্ধ” নামেই কথিত হইবার যোগ্য,—সে রূপ ব্যাকরণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন যে সকল ব্যাকরণ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পাণিনিব্যাকরণ সর্বাপেক্ষা পুৰাতন বলিয়া, পাণিনিব্যাকরণকেই “বেদাদ্ধ” বলিলে বলিতে পারা যায় ; অল্প কোন ব্যাকরণ সে গৌরব লাভ করিতে পারে না।

পাণিনিব্যাকরণে লৌকিকসাহিত্যের যে সকল রচনারীতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে অনেক রীতি সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কত পুৰাতন রচনারীতি

বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কত অভিনব রচনারীতি সমুদ্ভূত হইয়াছে, সংস্কৃতব্যাকরণ ধরিয়া তাহার নির্বকি প্রস্তত করিয়া লইলে, পুৰাতন গ্রন্থের রচনাকালনির্ণয়ের অজ্ঞাত পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। তাহার সন্ধান লাভ করিবারাজ, বিশ্ববের অবধি থাকে না ; “সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস” নামের পাশ্চাত্যপাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবিধ গ্রন্থ আমাদিগকে কত বিষয়ে কিরূপ আন্তরিকতা জড়িত করিয়া কেলিয়াছে, তাহারও বিশিষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক মত পরিত্যাগ করিয়া, অল্প মত গ্রহণ করিবার সময়ে, সাহিত্য হইতে পুৰাতন মত সহসা বিলুপ্ত হইয়া, নূতন মতকে আসনদান করিতে পারে না। কিয়ৎকাল উত্তর মতই রূপসং বর্তমান থাকে। পরিণামে প্রবল মত হারিদ্ভাভ করে ;—চূর্ণল মত বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন রূপের ব্যাকরণ ধরিয়া সমালোচনার প্রবৃত্ত হইলে, ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিভাত হয়। পুৰাতন গ্রন্থের রচনাকাল-নির্ণয়ের মত এই বিষয়ের অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপ্ত হইয়া, ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার যে সকল বিলুপ্ত গৌরব সহসা আত্মপ্রকাশ করে, তাহা কেবল বিশ্বদাবহ বলিয়াই কীৰ্ত্তিত হইতে পারে না ; তাহাতে আর্য্যসমাজের সভ্যতাবিকাশের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—আর্য্যসমাজ হিত-শীল হইয়াও, গতিশীল ছিল। এক সময়ে তাহার জ্ঞানানুগাণ তাহাকে বিবিধ আলোচনার উৎসাহদ্রব্য করিয়া, সভ্য-

বিচারে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। কিছুদিন পরে, সে তাব তিরোহিত হইলে, অহুদার ও সর্দৌবুড়ি আর্ধ্যসমাজকে সর্কবিবরেই জড়তরতের দ্বারা নিতান্ত নিরুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল! এই ঐতিহাসিক সত্য সকল বিষয়েই দেদীপ্যমানে। কি ব্যাকরণ, কি কাব্যশাস্ত্র,—কি দর্শন, কি বিজ্ঞান,—কি চিকিৎসাবিজ্ঞান, কি জ্যোতিষ,—সর্বত্রই এক কথা! সাহিত্যের মধ্যে যেন ভিন্ন ভিন্ন স্তর বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এক এক স্তরে এক এক মূর্তি;—তাহা কোন স্তরে সজীব, নৈসর্গিক রূপলাবণ্যে সমুজ্জ্বল;—কোন স্তরে নির্জীব, কেবল অস্পষ্ট ছায়াবলেই স্বেৎ প্রতিভাত! এক যুগের সাহিত্যে ভাবে, ভাবার, রচনাকৌশলে সজীব সমাজের অবিরল প্রবল প্রবাহ; আর এক যুগের সাহিত্যে ভাবে, ভাবার, রচনাকৌশলে নির্জীব সমাজের কৃত্রিমতার উচ্ছ্বল আড়ম্বর! স্বদেশের সংস্কৃতসাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচনা ব্যতীত, বিদেশের বিকৃত সিদ্ধান্ত এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত করিতে পারে না। বিদেশের শিক্ষা আমাদের প্রগল্ভ করিয়া তুলিয়াছে;—জানাত্তরক ভক্ত সাধকের তার স্বদেশের সাহিত্যসেবার নিবিষ্ট করিতে পারে নাই। আমাদের সাহিত্যে এখনও অসার আলোচনার আভিষেক! তবিত্যন্ত ইতিহাসলেখকের নিকট ভাষ্য বর্তমান লেখক-পাঠক-সম্প্রদায়ের পৌরবোধবাণী করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না!

আমাদের প্রগল্ভতার সীমা নাই! ব্যাকরণ অবজ্ঞাপাঠা হইলেও, আমাদের

বিচারে তাহার মর্যাদা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা ব্যাকরণের জন্ম ও ক্রমবিকাশের আলোচনা করিতে অসম্মত। কেবল ভাষাশিক্ষার্থই ব্যাকরণ রক্ষা করিতেছি; নচেৎ তাহাকে চিরনির্কাসিত করিতেও আপত্তি ছিল না! এই শ্রেণীর তরুণকণ্টক যে এখনই সহসা কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে। অনেকদিন পূর্বে,—অন্তত দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্বেও,—তাহার প্রভাব আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তখনও কেহ কেহ বলিতেন,—শব্দশিক্ষার্থ আবার শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? লোকে যে শব্দ যে ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে, লোকের নিকটেই তাহা শিক্ষা করিতে পারি। ভগবান্ পতঞ্জলি “ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের” উপক্রমণিকার এই তর্কের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রচলিত ভাষাশিক্ষাই ব্যাকরণশিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নহে;—আরও কিছু লক্ষ্য আছে। নচেৎ শব্দশিক্ষার্থ শাস্ত্রের প্রয়োজন উপস্থিত হইত না। “যদি তহি লোক এষু প্রমাণং, কিং শাস্ত্রেন ক্রিয়তে?” এই পুরীতন পূর্বপক্ষ যেন এখনও থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে! বঙ্গসাহিত্যের কোন কোন বিশিষ্ট প্রবন্ধলেখক স্পষ্টাক্ষরেই তাহার উল্লেখ করিতেছেন! যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইয়া স্বদেশের উচ্চশিক্ষার প্রকৃতিনির্ণয়ে মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও যেন অজ্ঞাতসারে আশ্চর্য হইয়া, যে-কোন উপায়ে ভাষাশিক্ষা সমাপ্ত করাইবার অন্তই লাগানিত। ছাত্রসমাজও, ব্যাকরণশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত

হইলে, অসহিষ্ণু হইবেন বলিয়াই বোধ হয়। এমন কি, চতুর্পাঠের ছাত্রবৃন্দের পাণ্ডিত্য-উপার্জনের পথ সহজ করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদিগের পরীক্ষাতেও ব্যাকরণের বোধোপযুক্ত অধ্যয়নের প্রয়োজন ধীরে ধীরে অব্যাহত হইতেছে।

যে-কোন উপায়ে ভাষাশিক্ষা সমাপ্ত করাই একমাত্র লক্ষ্য নহে। যে-কোন জ্যেষ্ঠ উদয়পূরণ করিলেই ক্ষুদ্রবৃত্তি সাধিত হইতে পারে। ভগবান্ পতঞ্জলি তাহার উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—তবে আর ভক্ত্যাত্মকনির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? যে-কোন পাণ্ডে পাকক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে, তবে আর পাক্যাপাক্য-নির্ণয়ের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? যে-কোন যুগে পণ্ডবন্ধন সম্পন্ন হইতে পারে,

—তবে আর কাঠাকাঠবিচারের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন আছে। যুগে যুগে অর্থপার্থক্য সমুদ্ভূত হইতেছে বলিয়া, লোকব্যবহার-মাত্র সম্বল করিয়া শব্দশিক্ষা সমাপ্ত করিলে, তদ্বারা প্রচলিত সাহিত্যের অর্থবোধ করা সম্ভব হইলেও, অতীত-সাহিত্যের অর্থবোধের চেষ্টা সফল হইবে না;—পূর্বপুরুষের সহিত উত্তরপুরুষের ভাবসামঞ্জস্য খণ্ডিত হইয়া, আমাদিগকে নিরন্ত উচ্ছৃঙ্খলতার পথে প্রধাবিত করিয়া, আমাদিগের সর্বপ্রকার অধোগতি সাধিত করিয়া দিবে,—আমরা আবার “রেঙ্ক” হইয়া পড়িব। তজ্জন্তই পতঞ্জলি বলিয়া গিয়াছেন,—

“রেঙ্কা মা ভবেত্যর্থোঃ ব্যাকরণম্।”

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রায়গৃহিণী।



১

জিবেণীগ্রামে রজা-সরস্বতীর মিলনক্ষেত্রের অধরে বাণীনাথবাবুর প্রাচীন চক্রমিলান-করা বাড়ীটির জীর্ণসংস্কার সম্প্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে। কেন না, দীর্ঘকাল পূর্ববিতাগে কাজ করার পর পেনশন্ লইয়া বাড়ীতে বিদ্রাম করা তাঁহার অভিপ্রেত।

বাণীনাথের মাতা অস্ত্রাপি বাঁচিয়া আছেন এবং জিবেণীর এই বাটী তাঁহারই পিতৃভিট। বাণীনাথ নিজে চট্টবংশসম্বৃত

হইলেও সেইজন্য তাঁহার মাতামহ রায়বংশের সহিত এই গৃহের স্বতি জড়িত এবং “রায়গিরি” বলিলে তাঁহার মাতাকেই বুঝায়। ফলত পুত্র যে মাহুদ হইয়া উঠিয়াছেন, বিধবা মাতাই “তাঁহার মূল। কিন্তু জননীর উদার সরল হৃদয় সন্তানে বর্ধে নাই। বাণীনাথ কেবল তাঁহার হির নৃচচিত্ততার কতক কতক উত্তরাধিকার করিয়াই সংসারসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিয়াছেন। প্রৌঢ়বয়সের শেষসীমার

পৌছিয়াও সাংসারিক ব্যাপারে সকল বিষয়েই তাঁহাকে বৃদ্ধা মাতার ইচ্ছামত চলিতে হইত। প্রায় প্রতি দুইবৎসরে বদলীর হাজ্জামার তিনি কখন সপরিবারে কর্মস্থানে বাস করেন নাই। বরাবর সুদূর প্রবাসে—বোম্বাই এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে—তাঁহাকে ঘুরিতে হইয়াছে, গঙ্গাহীন দেশে পরিবার লইয়া যাওয়ার প্রত্যাশ্যমানে উঠিলেও কখন মাতার সমক্ষে উচ্চারণ করিতে সাহস করেন নাই। ইহার কলে তাঁহার একমাত্র পুত্র নলিনীনাথের সম্পূর্ণ ভার পিতামহীর উপর পড়িয়াছিল।

এ অবস্থার গচরাচর বাহা অনিবার্য, তাহাই ঘটিল। বৃদ্ধা ঠাকুরমাতার মানসিক বল সংসারে অল্প সকলের পক্ষে অজ্ঞেয় হইলেও আদরের পৌত্রের কাছে টুটিয়া গিয়াছিল। বাণীনাথের পত্নী নিতান্ত সাধা-সিধা লোক ছিলেন, শাওড়ীর কোন কার্যের উপর কথা কহিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। অতএব গোকুলে নন্দুলালের মত নলিনীনাথ দৃঢ়দ্যুত এবং নবনীত খাইয়া আর ভদ্র-অভদ্র বয়সাদলে মিলিয়া-মিশিয়া বাড়িতে লাগিল। সে তাহার ঠাকুরমার কাছে তনিতে পাইত যে, তাহাদের বা-কিছু আছে এবং এক কলমে তাহার পিতা বাহা উপার্জন করিয়াছেন, তাহা খাইবার বখেট লোক তাহাদের সংবारे নাই। গ্রামের ইকুলে আর পণ্ডিতের টোলে যে লেখাপড়া হয়, তার পক্ষে তাহাই বখেট। বেশী ইংরেজীবিজ্ঞার মন দিয়া হিন্দুর ছেলের চালচলন বিগড়াইয়া যায়, যেমন ওপাড়ার রামগোপাল ঘোষের হইয়াছিল; অতএব

নাভিকে তিনি ভাষা করিতে দিবেন না। ইহার কলে শেষবার ফার্গো লইয়া বাড়ী আসিয়া বাণীনাথ দেখিলেন, তিনি যে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াইয়া লাভজনক চাকরী কি ঠিকাদারী কার্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার আর কোন সম্ভাবনা নাই। গ্রামের মাইনর-স্কুলের পড়া শেষ করিয়া সৈন্তখন শিরোমণি-মহাশয়ের টোলে প্রবেশ করিয়াছে এবং ঠাকুরমার সহিত যোজ গঙ্গানান ও পূজা-আহ্নিক করে। ইহার উপর বাণীনাথ মাতার আদেশ পাইলেন যে, তাহার ছুটি ফুরাইবার আগে নলিনীর বিবাহকার্য সম্পন্ন হওয়া চাই; কেন না, তিনি কঁনে দেখিয়া ভদ্রলোককে কথা দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেশ কার্যকুশল লোক এবং মাত্রার অধিক হিসাবী বলিয়া মাতার কাছে মাঝে মাঝে তিরস্কৃত হইতেন। বিস্তর টাকা তিনি উপার্জন করিয়াছিলেন, তথাপি পেনশন্-গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বেও নিরনব্বইয়ের ধাক্কা সামলাইতে পারেন নাই। অবসর গ্রহণ করিয়া কি ভাবে মাতৃত্বমিতে দিন কাটাইবেন, সেই চিন্তা এখন তাঁহার প্রবল। পথে ২৩দিন রেলপাড়িতে আসিতে তিনি মনে মনে হিসাব করিয়া-ছিলেন, কারবারে প্রথম-প্রথম যে টাকাটা কেলিবেন, তাহার অন্তত একচতুর্থাংশ এখনকার প্রথমত পুত্রের বিবাহ দিয়া ভাবী বৈবাহিকের কাছে আদায় করিতে হইবে। কাজেই মা বখন বলিলেন যে, নলিনীর সম্বন্ধ দ্বিগুণ হইয়া দিয়াছে,

তখন তাঁহার মাথার আকাশ ভাঙিয়া পড়িল।

মাথা চুলকাইয়া বাণীনাথ মাতৃদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথার সন্ধ হইবে?” বুঝা ইহাতেই তাঁহার মনোগত বুঝিলেন এবং কানুনগরীর বন্দোপাধ্যায়দের উল্লেখ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তাদের এখন ভাঙনদশা বর্গে” আমি অলঙ্কারপত্রের কোন কথা হস্তে দিইনি। এ কালের ধরণ-ধারণ কিছুই আমি বুঝতে পারি না, আর মালম্ভীর কপার সেরকম বেণের ব্যবহার আমার দরকারই বা কি?” “বেণের ব্যবহার” কথাটার উপর জোর দিয়া মাতা যেভাবে তাঁহার স্মৃতি ও সম্মত নাসা সজ্জিত করিলেন, তাহাতে ছেলেবেলায় একবার প্রতিবেশিনীগৃহে শশাচুরী করার মাতৃহন্তে তিনি বেরূপ লাহিত হইরাছিলেন, সে দৃশ্য সহসা বাণীনাথের মনে পড়িয়া গেল। অতএব আর দিক্‌স্তির করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

কিন্তু বাঁহার কলকৌশলে ইষ্টক এবং প্রবৃত্ত প্রায় ত্রিশবর্ষকাল ধরিয়া অবিশ্রান্ত রৌপ্যচক্র বর্ষণ করিয়াছে, মনুষ্যলোকে কেহ তাঁহাকে ঠকাইয়া বাইবে, বাণীনাথবাবু স্বয়ং এরূপ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙে, এইরূপ পক্ষা তিনি অবলম্বন করিলেন। পক্ষার অপর তীরে কাঁচড়াপাড়াগ্রামে তাঁহার ভাবী বৈবাহিকের গৃহ। একদিন প্রাতঃস্মরণ উপলক্ষ্য করিয়া মাতার অজান্তে সময়ে সেখানে তিনি দেখা দিলেন। কতাত্যয়প্রবৃত্ত পরেশনাথবাবু রায়গৃহিণীকে

কত্না দেখাইয়া এবং তাঁহার পাকা কথা পাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, “হবু বেহাই”এর বাক্যভঙ্গীতে বুঝিলেন যে, কেজো কথাই মেয়েলী উচ্চাসের স্থান নাই। চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় তাঁহার এই কাজের কথাই ইহাও স্পষ্ট বন্দোপাধ্যায়মহাশয়কে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁর ছেলেটি বি. এ., এম্. এ., এমন কি, এনট্রান্স পর্য্যন্ত পাস করেন নাই সত্য, কিন্তু এই সব পাস করার যে উদ্দেশ্য আহার্য্য-দেয়ণ, তাঁহার সংসারে তাহার অপ্রাচুর্য্য নাই। পরেশনাথ শেষে শঙ্কিত হইয়া প্রতিশ্রুত হইলেন যে, বিবাহের সময় সামান্য অলঙ্কার ছাড়া তিনি কিছু দিতে না পারিলে বছরদুই পরে দিরাগমনের সময় দুইহাজার টাকার অলঙ্কার অবশ্য দিবেন। আর আভিজাত্য এই গোপন সাক্ষ্য ও পরামর্শ কোনরূপেই রায়গৃহিণীর কানে উঠিতে পারিবে না।

তার পর মাঘমাসে পুত্রের বিবাহ দিয়া বাণীনাথবাবু মাত্রাজ চলিয়া গেলেন। মা বলিয়াছিলেন যে, একবৎসর পরে নাত-বউকে ঘরে আনিবেন; কেন না, তিনি আর কতদিন, দিনকতক তাহাদের লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে চান। পুত্র মাতৃ-সদীপে কিছু বলিতে না পারিয়া বেহাইকে টিপিয়া দিয়া গেলেন, দুই বৎসরের আগে দিরা-গমন করান না হয়। কেননা, ততদিনে তিনি পেনশন লইয়া বাড়ী আসিবেন। মনে মনেই, পরেশনাথ অলঙ্কারগুলো কীকি দিতে না পারে! ইহাতে পরেশবাবু মর্মে মরিয়া গেলেন। সর্ব্বথ্য যেচিয়াও টাকাটা সংগ্রহ করিতে তিনি কৃত্তসম্মত হইলেন।

২

বিবাহের পর বছর দু'টিয়া আসিল, কিন্তু পরেশনাথবাবুর অবস্থাপরিবর্তনের কোন সন্ধাননা দেখা গেল না। নিজে তিনি কখন উপার্জন করেন নাই, পৈতৃক বিপুল সম্পত্তি পিতামহের সময় হইতে দেনার দ্বারে পরহস্ত-গত, কেবল দেবোত্তরটুকুর উপর নির্ভর, তাহাও সন্নিকীবিবাহে হস্তচ্যুত হইতে বসিয়াছে। এই সময়ে রায়গৃহিণী জেদ্ ধরিলেন, নাত্বউকে ঘরবসন্তে পাঠাইতে হইবে। উপায়াস্তর না দেখিয়া পরেশনাথ সন্ন্যাস একদিন বৈবাহিকমাতাকে প্রণাম করিতে গেলেন।

বুড়ীর সেই এক কথা—“আমি আর কতদিন? নাতি-নাত্বউকে লইয়া দিন-কতক আমোদ-আহ্লাদে ঘরকরা কর্তে পাব না?” কিন্তু পরেশনাথ কিছুতে ছাড়িলেন না, করতোড়ে আরো বছরখানেকের মহলং ভিক্ষা করিলেন। রায়গৃহিণীর হৃদয় গলিয়া গেল; তিনি বুঝিলেন, সদ্ভাস্তবয়ের ছেলে, বিবাহের সময় ইচ্ছামত তেমন-কিছু দিতে না পারিয়া লজ্জিত আছে। তাই ঘরবসন্তের সময় একটু সমারোহ করিতে চায়। অতএব কুটুম্বের ক্ষুদ্র ধনগৌরবে আশাত লাগিবার আশঙ্কায় তিনি আর জেদ্ করিতে পারিলেন না।

কিন্তু এপ্রম হইতে পুত্রহানীর পরেশ-নাথের উপর তাঁহার বড় মারাত্মক হইল। আগে গলার পরপারে বড়-একটা ঘাইতেন না, কিন্তু অতঃপর একখানা পান্থী কিনিয়া ইচ্ছামত বধন-তখন কুটুম্বগৃহে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে কিশোরী নাত্ব

উটির ওরকে হেমন্তকুমারীর সঙ্গে তাঁর সাধ-আহ্লাদের সখীত্ব বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিল এবং তদীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদার হৃদয় সমক্ষে নূতন কুটুম্বের সঠিক অবস্থা প্রতিভাত হইল।

পরেশনাথের আর একটি কল্পা বিবাহ-যোগ্যা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বৈবাহিকের কাছে প্রতিশ্রুত আভরণের, ঋণ শোধ না করিয়া সে সম্বন্ধে কোন চেষ্টা তিনি করিতে পারিতেছিলেন না। রায়গৃহিণী ভিতরের কোন কথা না জানিলেও বুঝিলেন, অর্থ-কুচ্ছই তাহার কারণ। ছোট নাত্বউটির সঙ্গে ইহার ভিতরই তিনি সাংসারিক সুখ-দুঃখের পরামর্শ করিতে শুরু করিয়াছিলেন। অর্থসাহায্যের কথা নিজে হইতে বলিলে পাছে পরেশনাথ মনে ক্রেশ পান, ইহা ভাবিয়া তিনি নাত্বউকে দিয়া বলাইলেন যে, দেবোত্তরবিঘরক্ষা ও কল্পার বিবাহে যে চারিপাঁচহাজার টাকা খরচ পড়িবে, তাহা এখন কর্তব্যরূপে তাঁহার কাছে লওয়া হউক।

পরেশবাবু কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্ত হইয়া মাহইমাতার চরণবন্দনা করিতে গেলেন এবং সাক্ষাৎকালে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহাতে রায়গৃহিণী পোতের সম্মুখে তাঁহাকে জানাইলেন যে, এই টাকা তিনি তাঁহার পিতৃবৃত্ত অর্থ হইতে দিবেন, বাণীনাথের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, দেবোত্তর বিঘর সম্পূর্ণ পরেশনাথের দখলে থাকিলে খরচখরচাবাদ একশত টাকা মাসিক লাভ হাঁড়াইবে। ইহার মধ্যে

পকাশটাকা দেনার হিসাবে তিনি যেন জামাতার নামে জমা রাখেন, কেন না, ইহারই ভিতর তাঁহার সমস্ত জীৱন তিনি নলিনীনাথের নামে উইল ও রেজেষ্টারি করিয়াছেন।

অতএব এই ঋণ গ্রহণ করিতে পরেশনাথ আর বিধা বোধ করিলেন না। বৈবাহিকের টেনাশোধের পূর্বে দ্বিতীয়া কস্তার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতে কাজে-কাজেই তাঁহাকে ত্রুটি হইতে হইল। মাহইমা ছাড়েন না, মাঘমাসে বিবাহ দিতেই হইবে। হেমন্তকুমারীর দ্বিরাগমনের দিনও প্রায় সেই সময়ে পড়িবে। কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের উপায় নাই।

পরেশবাবু সংবাদ পাইলেন, তাঁহার বাল্যবন্ধু যোগেশচন্দ্র রায় গবর্নমেন্ট কালেক্টর মাষ্টারি ছাড়িয়া সম্প্রতি স্বগ্রাম স্ববর্ণপুরে এক বিভাগর খুলিয়াছেন এবং তাঁহার দুইটি ছেলে বিবাহযোগ্য হইয়াছে। দুই বছরে প্রায় পনেরবছর দেখাশুনা নাই, অতএব পরেশনাথ একটু সঙ্কচিতভাবেই গেলেন। যোগেশকে তিনি “বাবু” ও “আপনি” বলিয়া সম্বোধন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, উত্তরে শুনিলেন, “ভাখ্ পরেশ, তুই যদি ওসব জ্যাঠামি করবি, তবে ছেলেবেলার মতই চড় কবাইয়া দিব।” ফলত পরেশ দেখিলেন, বয়োধর্মে চুলদাড়ির কতক-কতক পাকিলেও যোগেশের হৃদয়টুকু পূর্ববৎ সরস আছে।

পরেশ অধাইলেন, “চাকরী ছাড়িলে কেন?” উত্তর—“তুই কখন ও পাণ করিলি না কেন? কস্তার লাধি হ’তে নিষ্কলিত করছি, সেটা স্থখের না দুঃখের কথা?”

প্রশ্ন—“ইস্কুল করিলে, চলিবে কি? বিশেষ ভূমিতে পাই, পরীক্ষা-দেওয়ান তোমার উদ্দেশ্য নয়।” উত্তর—“না চলুক, চেষ্টা ত করিতে হয়। আমি দেখিতে চাই, অন্তত গোটাকতক ছেলে’ এ ‘অকলে মাহুস হয়। নিজের ছেলেটাককে নিজের আদর্শে বদী মাহুস করে’ যেতে পারি, ঢের কাজ হলো।” প্রশ্ন—“কিন্তু তোমার অনেকগুলি ছেলেপুলে এবং পোষা, চলিবে কি করে?” ইহার উত্তরে যোগেশচন্দ্র মধুর শ্লোক উচ্চারণ করিলেন :—

“সর্বঃ পরবশঃ দুঃখঃ সর্বমাত্মবশঃ স্বপ্নঃ।

এতদ্বিধাঃ সমাসেন লক্ষণঃ স্বপ্নদুঃখমোঃ।

তোর আশীর্বাদে আমি কোন বিষয়ে পরাধীন নই। মাহুসেরও নয়, কোন অভ্যাশেরও নয়। তা ছাড়া, চাষবাসের ব্যবস্থাও কিছু করেছি। কিন্তু তুই চিঠি না লিখে হঠাৎ এলি যে বড়? এমনই কি প্রয়োজন তুনি?”

‘পরেশনাথ কোন ভূমিকা না করিয়া একেবারে কাজের কথা পাড়িলেন; কেন না, যোগেশ কোনরকম লুকাচুরির ধার ধারে না, তাঁহার জানা ছিল। শুনিয়া যোগেশ বলিলেন—“আমার বেহাই হ’তে চান্, জানিস্ তো এখনকার দিনে ছেলের দর? চাকরি-হাজারের দর এই সবে কাল কিরাইয়া দিয়াছি। তুই ত শুনিতে পাই দেনাপত্রে বিব্রত—কত উঠিতে পারিবি? জানিস্ ত আমি গরিব লোক, লোভের—আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই।” যোগেশের সেই বিদ্রূপের স্মর, কিন্তু পরেশনাথ ইহা সত্য ভাবিতে-ছিলেন। বলিলেন, “তাই, হাজারই টাকা

কোনরকমে দিতে পারি। তুমি আমার, আর কুটুম্বগৃহ হইলেও ছোট-বড় সকল কথার খোঁজ রাখেন, উদ্দেশ্য—ভালমানুষ

বোণেশ উচ্চহাস্য করিলেন। বলিলেন, “ভাল ভাল, পাঁচটা হরীতকী দিতে পারিবি ত ? টাকাকড়ির কথা আমার কাছে আর বলি ন। যে কেহ বলিয়াছে, তাহাকেই তাড়াইয়া দিয়াছি, বসিতে পর্য্যন্ত বলি নাই। স্ত্রীত্বিক্রয়ের পাপ হিন্দুসমাজের অস্ব-মজাগত হ’তে বসেছে। ভক্তলোকমাজেরই ইহার প্রতিরোধ করা উচিত।”

মাঘমাসে বিবাহ দিতে সম্মত হইয়া বোণেশচন্দ্র পরেশকে বিদায় দিলেন। সম্মত হইয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ভাই, কোনরূপ ব্যবহালা তুমি করিও না। আমাকে ত ছেলেবেলা থেকে চেন। কথার খেলাপ হইলে বেহাই বলে’ খাতির করিব না।”

পরেশনাথ অতঃপর সহধর্মিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া ছোটা কস্তার জন্ত অলঙ্কার প্রস্তুত করাইলেন। হেমন্তকুমারী ভিতরের কথা এতদিন জানিত না, কিন্তু সম্প্রতি সে তেরবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার কাছে কোন কথা গোপন রাখা মাতা আর কর্তব্য মনে করিলেন না। হেমন্ত যদি শুনি, নলিনী না শুনিবে কেন ? সে সকল বিষয়ে পিতামহীর শিষ্য, ছেলেবেলা হইতে কোন কথা তাহার কাছে লুকাইতে শেখে নাই। কিন্তু পিতার ব্যবহারে অত্যন্ত দ্বিষ্ট হইলেও ঠাকুরমাকে কিছু বলিতে পারিল না, কেন না, হেমন্ত মাখার দিবা দিয়াছিল।

এদিকে রায়গৃহিণী বিবাহের উদ্যোগ-স্বত্বে সর্বদা পরেশনাথকে তাড়া দিতেছেন।

পরের আর জড়াইয়া না পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটি যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সহিত খানিকটা লুকোচুরীর ভাব রক্ষা না করিলে নহে।

শেষে বৃদ্ধা একদিন গহনার ফর্দ দেখিতে চাহিলেন। পরেশনাথকে বলিতে হইল যে, তাঁর ভাবী বৈবাহিক কোন ফর্দ দেন নাই, কোন বিষয়ে কোন দাওয়া করেন নাই। রায়গৃহিণী প্রশংসমান চক্ষু এই কথা শুনিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি কিছু না চাহিলেও অন্তত হাজার বারশত টাকার আভরণ দিতে হইবে। তার পর তিনি নাত-বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নিজেই অলঙ্কারের ফর্দ লেখাইতে বসিলেন। লেখিকা স্বয়ং হেমন্তকুমারী।

সেদিন পিতামহীর সঙ্গে নলিনীনাথও গিয়াছিল। বেলা পড়িয়া যায় দেখিয়া সে স্বশ্রমালয়ের অন্তরে ঠাকুরমাকে আনিতে গেল। যেখানে বৃদ্ধা ফর্দলেখিকার সঙ্গে প্রায় সর্বস্বস্বতার মত পরামর্শ আঁটিতেছিলেন, এবং সে মাখার কাপড় দিয়া গলদবস্ত্র হইতেছে দেখিয়া বারংবার তাহার অবগুষ্ঠন মোচন করিয়া দিতেছিলেন, নলিনী সহসা সেইখানে দেখা দিল। ঠাকুরমার আজ পর্য্যন্ত বর-কনেকে এভাবে একজ দেখার সুযোগ ঘটে নাই, অতএব তাঁর ভারি আনন্দবোধ হইল। ওদিকে তিনি যে নাতুবোয়ের মাখার কাপড় কেলিয়া-দিয়া তাহার অঞ্চলটা দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা আর মুক্ত করিলেন না। নলিনী মহা লজ্জার পড়িয়া

গেল, মুক্তাবশুর্ভনা নতমুখী ভাষ্যার দিকে অপাঙ্গে চাহিয়াই চক্ষু ফিরাইয়া লইল। রায়-গৃহিণীর অমুরোধে তাহাকেও কাছে বসিতে হইল। তখন তিনি উভয়ের চিবুকস্পর্শ করিয়া আদর ও চুম্বন করিলেন। এই মুহূর্ত্তটুকুর সুখামুভব করিতে করিতে বহুকাল পূর্বে স্বর্গগত স্বামীর স্মৃতি সহসা তাঁহার চিত্তে ভীরিয়া উঠিল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বিমনা হইলেন।

নলিনী অপ্রস্তুতভাবে দূর করিবার উপায়ান্তর দেখিতেছিল না। গহনার তালিকা দেখিয়া না ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিয়া বসিল, “ঠাকুরমা, বউএর জন্তে ছুইহাজার টাকার গহনা গড়ান হচে, আবার এ কিসের কর্দ ?”

কথাটা বলিয়া-ফেলিয়াই তাহার জ্ঞান হইল যে, কাজ ভাল হইল না। কিন্তু তখন আর লুকান যায় না। রায়গৃহিণী প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া আসল কথা জানিয়া লইলেন। বাড়ী ফিরিয়া-গিয়া পুত্রকে চিঠি দিলেন যে, তিনি আর তাহার সুখদর্শন

করিতে চান না এবং নলিনীর জীকে গৃহে আনিয়া মাঘমাসে স্বয়ং কানীয়াস করিতে যাইবেন।

পরেপনাথ প্রথমা কন্ডার জন্ত যে ছুই-হাজার টাকার গহনা গড়াইয়াছিলেন, দ্বিতীয়া কন্ডার বিবাহের রাত্রে, রায়গৃহিণী নিজের বাসরঘরে বসিয়া সেগুলি নবপরিণীতাকে পরাইয়া দিলেন। তার পর নাভবউয়ের দ্বিরাগমনের ব্যাপার শেষ হইলেই তিনি কানী চলিয়া গেলেন।

নলিনী ঠাকুরমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, বৎসরের অধিকাংশ কখন একাকী, কখন বা সত্নীক, তাঁহার কাছে থাকিত। অনেক চেষ্টা করিয়াও আর তাহাকে গৃহে ফিরাইতে পারিল না। কথা উঠিলেই তিনি বলিতেন, “বাণী আমার সত্যরক্ষা করে নাই। টাকাই কি এত বড় ?”

অস্তিমশবার মাতা বাণীনাথকে বলিয়া-ছিলেন, “এতদিনে তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম। মনে রেখো, ধর্মের বাড়া ধন নাই।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

কুমারসম্ভব।

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

“সাত-ববি’-পূজামেধে হুল আসে ভেসে ভেসে—

স্বয়ধূনী হেসে হেসে নামেন বরিতে,

তাহাতেও নগরাজ নাহি হন তত আজ

পরিপূত, যত আজ ও-সুতচরিতে (৫৭)

“ধন আর কামনার করিয়াছ পরিহার—

সেবিতেছ অনিবার কেবল ধরম ;

হে ভাবিনি ! আমি তাই ভাবিতেছি, তবু ঠাই

এ তিনের শেষটাই পরম চরম ! (৩৮)

“আজি এত সমাদর দেখালে আমার ‘পর !

হে সুতনু, যোরে পর ভেবো নাকো আর—

বলেছেন বৃথগণ—‘সেই ত আপন জন,

বার সাথে আলাপন সাতটি কথার !’ (৩৯)

“জানি’ তুমি কামাবতী, এবে এ চপলমতি

খিল কিছু তোমা’ প্রতি পুছিবারে চার ;

তুমি অরি তপোধনে ! বড় আশা করি মনে,

গোপন নহিলে, কণে বলিবে তাহার :—(৪০)

“জনম তোমার মূলে আদিবিধাতার কূলে,

জিলোকমাদুরী কূলে’ তনুটি তোমার !

ধনস্থখ মনোমত, বরস নবীন অত !

সাধনার ফল কত, বল চাহি আর ? (৪১)

“সহি’ ঘোর অপকার মহীরসী মহিলার

হ’তে পারে অনিবার এ হেন মনন—

বিশেষ বিচার করি’ দেখিলাম কুশোদরি !

সেও ত তোমার ‘পরি ঘটে নি কখন ! (৪২)

“রূপ বার মধুচালা স’বে না সে হৃথখালা—

গৃহে তব চাকবালা ! কোথা অবমান ?

পীড়া না দিবেক পরে,—বশিষ্ঠলাকার তরে

কপিনীর শিরে করে কে করপ্রদান ! (৪৩)

“বোধনে, এ কি মরি—আতরণ পরিহারি’

রহিয়াছ চীর পরি’ প্রাচীরের তুবা ?

শশিভাঙ্গা লরে’ সাঁঝে রজনী মধুরে রাখে,

যে কি রে অকণে সাঝে, না হইলে উবা ! (৪৪)

“যদি গো বরণে আশ, বুঝা তবে এ আশাস,—
তোমার পিতার বাস ত্রিদিবভূমি যে !
স্বামী যদি চাহি, তবে প্রয়োজন নাহি তপে—
রতনেরি খুঁজে সবে, সে খুঁজে না নিজে ! (৪৫)

“ছাড়িলে দারুণ বাস ! বুঝিছ বরেন্দ্ৰ আশ ;
আমার এ বিধা নাশ কর তুমি তবু—
কোনো-কিছু নাহি বার মনোমত চাহিবার,
চাহিলে কি সে আবার নাহি পায় কত ? (৪৬)

“তুমি চাহ যে বুঝার, সে এত নিষ্ঠুর হার !
হেয়ি’ তব এ দশার রয়েছে কি করে’—
যুচেছে কমলহল ; ধানের শীষের তুল
পাটল জটিল চুল গালে লুট’ পড়ে ! (৪৭)

“ভগ্নরূপে অবিরত শুকায়েছে দেহ কত !
গহনার ঠাঁই বত লহে রবিকর !
দিবা শশিলেখাপ্রায় নিরধি’ ও ক্লশ কার
কোন্ সজ্জদর হার হবে না কাতর ! (৪৮)

“বুঝিলাম তব প্রিয়, রূপের পরবে স্বীয়
ঠেকেছেন ও অমির সুধানি তুলিরা ;
আঁখিপুটে বলিহারি কুটিল রোঁয়ার সারি—
দেখিল না আজো তারি নয়ন খুলিরা ! (৪৯)

“ওগো, আর কতদিন শ্রমে তহু হবে কীণ ?
আমারো ত যোগাধীন স্বকৃতি রয়েছে !
তাহারি আধেকে লভ’ মনোমত বর তব—
কে তবে সে জানি’ লব বাসনা হয়েছে !” (৫০)

হৃদে হেন পশি’ দিজে শুধাইলা সাধ কি যে ;
লাজে নগবালা নিজে বলিতে না পারে !
কাছে ছিল সহচরী, কিরায়ে তাহার ‘পরি
কাজলবিহীন সরি হুটি আঁখি ঠায়ে ! (৫১)

বভিয়ে কহিল আলি—“বদি এত কুতূহলী,
হে সাধু, শুহুন বলি, ইনি যে কারণে
এ কোমল ভুললতা করেছেন তাঁঁপে রতা—
কমলের দল বধী রোদনিবারণে !—(৫২)

“দেবরাজ-আদি চারি দিক্‌পাল ভারি ভারি
অবহেলে সবে ছাড়ি’ শুধু এ মানিনী
করেছেন দৃঢ় পণ পেতে পতি জিনয়ন—
অরজিং—রূপে নন ভুলিবার যিনি ! (৫৩)

“অতহু যে বাণ ছুঁড়ে’ হরকোপে যান পুড়ে’,
সেই সে সায়ক ঘুরে’ অঘোর-গরজে
না সহি’ আসিল ফিরে, পরিহরি’ পিনাকীরে
গিরিজারি ছদি চিরে’ বিধিল বড় যে ! (৫৪)

“সে হ’তে পিতার ঘরে সখি মোর অরজরে ;
শীতল তিলক করে অলক ধূসর !
মিশে নাহি পার বালা কিসে যে জুড়ায় আলা—
বিকলে তহুয়া ঢালা হিম-শিলা’পর ! (৫৫)

“সখী সুর-গায়িকার—রাজার কুমারী তারা—
হর-অরগীতি-ধারা ছাড়ে বনপাশে !
তনি’ বনোবাধাভরে উমার না কথা সরে,—
দেখি’ তারা আঁখিলোরে কতদিন ভাসে ! (৫৬)

“রাতি তি-পহর পরে যদি বালা কণতরে
আঁখিছটি মুদিত রে, আগিত অমনি
স্বপনে কহিয়া কথা—‘অরি যেন বাও কোথা !’
বিছে গলে ভুললতা বাঁধিত রমণী ! (৫৭)

“বলেছে জানীয়া সবে—‘তুনি আহ নারা তবে ;
এ তকতকনে তবে কেন জিগীস’ না ?’
এত যদি নিজ করে আঁকা ছবিখানি’পরে
সরল্যা নিয়মে হয়ে করে তৎসনা ! (৫৮)

“বখন দেখিল এবে—লুপ্তিতে সে মহাদেবে
আবু ত উপার ভেবে নাহি পায় মনে,
তখন পিতারে করে’ সখী আশাদেয়ে লয়ে’
ব্রত লাগি’ আসিল এ দূর ভ্রমণেবনে। (৫৯)

“সেই যে আসিয়া তপে সখী নিজে তরু যোগে,
সাধনার সে পাদপে দেখা দিল ফল।
কল-ধরা’ থাক্ দূরে, যে বাসনা শশিচূড়ে,
আজো তার বীজ হুঁড়ে’ উঠিল না দল ! (৬০)

“না জানি সে দেব কবে সখীয়ে সদয় হবে !
মোদের এ চোখে ব’বে কত আঁখিধার
‘হেরি’ ওরে তপে ক্ষীণা ? ধরা যেন ধারা বিলা !—
করুণা করিবে কি না নভোদেবতার !” (৬১)

গিরিজার গূহ চিত্ত সখী ছিল সুবিদিত—
খুলিল সে সকলি ত চারু বিজরায়ে ;
“অরি ! সহচরীভাব প্রকৃত, না পরিহাস ?”
গুহে বসি মনোহাস চাপি’ মনোবায়ে ! (৬২)

বতিবর কুতূহলে—এতেক পুছিলে ছলে,
বুকুলিত করতলে রাখি’ নগমালা,—
লাজে অবনত মাথা,—কোনরতে গোণাগাঁথা
চিরবিরচিত গাথা কহে নগমালা—(৬৩)

“হে বিজ, তুলিলে বাহা সকলি প্রকৃত তাহা—
চাহিছে এ জনা আহা উচপদ অতি !
সেই পদ লভিবার মিছে তপ এ আমার—
তবু হার নাগনার নাহি যে অগতি !” (৬৪)

তখন তাপস তপে—“জান ত সে জিনয়নে,
তারি আশা তব মনে উঠিয়াছে পুন ?
অন্তত-আচারে বার অহরাস অনিবার
কতু না সেবিবে তার, বলিভেছি তন ! (৬৫)

“কি ছায় বিবর এতি মজেছে তোমার রতি !
না জানি লো গুণবতি । কেমনে আশু যে
বিবাহের সুভা-পর্য্য’ তব হাত দিবে ধরা
তুঙ্গ-বলরে ভরা’ পিনাকীর তুঙ্গে । (৬৬)

“তুমি নিজে বিবেচনা করি’ কেন দেখিছ না,
উভয়ের এ বোজন্য মানাইবে কি রে—
বধূর হৃকুলবাস আঁকা বাহে কলহাঁস,
আর গজাজিনপাশ ভিজে বা’ কথিরে ? (৬৭)

“কুলে-ছাওয়া মেজে’ পরে সদা যে চরণ চরে—
চলিতে-কিরিতে ঝরে আলতার আলো !
বেড়ালে শ্মশানে এসে’ ছড়ানো মড়ার কেশে,
অরাতিও হেন কে, সে বলিবেক ভালো ? (৬৮)

“অহুচিত এর পরে কি আছে বলহ মোরে—
তুমিও শিবের ক্রোড়ে পড়িবে সহজে !
কোথা উরসিজহুটি সুরভিতে রবে কুটি,’
তা’ না হ’রে লুটোপুটি খাবে চিত্তারজে ! (৬৯)

“আরেক মজার কথা, শোন লো কনকলতা !
গজরাজে তুমি কৌখা সাজিয়া আসিবে—
তা’ না, তোর বিয়ে সেরে’ বুড়া বাঁড়ে চড়াবে রে,
মহতে যে তাহা হেরে’ মুচকি’ হাসিবে ! (৭০)

“পিনাকীর সহবাস বধন করেছ আশ,
তখন উভর আজ লভিল শোচনা—
সুবিমল শশিকলা ভালে আগ্নে সে বিকলা,
তুমিও হইলে মলা অগতমোছনা ! (৭১)

“উল-আঁখি বপুখানা ! কুলেরি বা কি ঠিকানা !
ধন বত গগেছে জানা দিক্-বসনেই ।
লো বৃন্দনরনা, বরে লোকে বা’ বাচনা করে,*
তাহার বে হেন হরে কিছু লেশ নেই । (৭২)

* কড়া রূপ, দাতা ধন, বিদ্যা চান পিতা ;
জাতিয়া চাহেন কুল, অগ্নয়ে দিটিয়া ।

“এ কু-আশা হ’তে অহো ! মানস কিরায়ে লহ ;
কোথা সে গিনাকী কর্হ, তুমি তুতে ! কোথা ?—
কে সাধু অশানপাঁকে আরোপিত শূলটাকে
বৃণসম পূজ্যে’ থাকে, বেদে বিধি বধা ?” (৭০)

বিজ যদি এইমত প্রতিকূলে বলে কত,—
অধরে ক্রোধের স্রোত বাধা নাহি মানে,
ভুরুলতা বীকাইরা আঁধিকোণ রাঙাইরা
রহে উমা তাকাইরা কুটিল নয়ানে ! (৭১)

বলে শেষে—“তুমি হয়ে জান নাকো ভাল করে’,
‘তাই ত আমার ‘পরে কহিছ এমন !
নাথুদের সদাচার সাধারণে দেখা তার—
না বুঝিয়া হেতু তার, ঘূষে যে কুজন ! (৭২)

বিপদ হরিয়া নেবে, অথবা বিভূতি দেবে,
তাই লোকে সদা সেবে শুভ বাস-হার—
যিনি অগতের গতি, বাসনাবিহীন অতি,
আশা-কলুষিত-মতি এ-সবে কি তাঁর ? (৭৩)

“কিছু তাঁর নাহি বটে, তধু ধন তাঁহে বটে !
নিবসে অশানতটে ত্রিভুবনভূপ !
ভীষণমূর্তি, প্রভু শিব শোভাময় তবু—
হার তাঁর কেবা কভু জানিবে অরূপ ? (৭৪)

“ভূষণে ভাস্কর শোভা, বাধা থাকে ভূজগ বা,
চক্ৰল খলুক প্রভা, কিবা গজাঙ্গিন,
মাথায় মড়ার খোলা উঠুক বা শশিকলা—
কিছুতে না যায় বলা সে তব্বর চিন্ ! (৭৫)

“অই দেহে লভি’ ঠাই পুত যে চিত্তার ছাই,
তাহে আর ভুল নাই—দেখেছ আপনি,
নাচিতে নাচিতে শূলী করিলে গায়ের ধূলি,
দেবতারার জন ভুলি’ মাথায় অমনি ! (৭৬)

“কাঙাল সে, বাঁড়ে ফেরে ? স্বপ্নে যে তাঁরে হেরে’
মাতোয়ারা হাতী ছেড়ে পড়েন চরণে !—
লুটিতে মুকুট ধূলি’ ফোটা-পারিজাত-ধূলি
রাঙার আঙুলগুলি অরুণ বরণে ! (৮০)

“অসংস্রভাববশে শূলীয়ে কেলিতে দোবে
তোমারো রসনা ঘোষে ভাল এক কথা—
দেবারি কমলবোনি যাঁ হ’তে লভিলা অনি, *
তাঁহার জনমধনি কে জানিবে কোথা ! (৮১)

“আর না, হয়েছে ঢের—কাজ নাই বিবাদের !
হোক সে শতক-কের জান বা’, তাপস !
তীহাতেই মোর মন মজি’ আছে অমুখন—
না ডরে প্রেমিকজন পর-অপঘন ! (৮২)

“নিবার’ নিবার’, সখি ! আবারো এ বটু, লখি,
কি-বেন উঠিবে বকি,—ঠোট করে ফাঁক !
সামুঝে যে অপভাণে-তারে শুধু পাপে টানে
তা’ নয়,—যে শোনে কানে সেও পাপভাক ! (৮৩)

“হেথা হ’তে, ছুর-ছাই ! আমিই, চলিয়া যাই”——
বলি’ বালা ছুটে যাই, বৃকে টুটে চীর !
অমনি স্বরূপ ধরে’ হর মুহু হাসিভরে
গিরিজারে ভূজডোরে বাধিলেন হৃৎ ! (৮৪)

নিরখি’ শঠে শিহরি’ ওঠে, অঙ্গে শ্বেদবিশ্মু !
কমলপদ তুলিয়া শুধু করিবে বহি ভ্রম—
পথের মাঝে অচলরাজি-আকুলা বেন সিদ্ধ,
নগাধিরাজকুমারী আজ ‘ন যবৌ ন তহৌ’ ! (৮৫)

“আজি অবধি হে পার্শ্বতি ! হইহু দাস তব,—

কিনিলে মোরে সাধনা-মূলে,” কহিলা যোমকেশ ।

ঝটিতি বালা যতেক আলা তুলিলা তণোতব !

লভিলে কল, নবীন বল প্রদানে পুন ক্লেশ । (৮৬)

শ্রীবিহারিলাল গোস্বামী ।

৮ অক্ষয়কুমার দত্তের কথা ।

১

আমাদের আদরের চাকপাঠ, ধর্মনীতি ও ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের প্রণেতা অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর উনবিংশ বৎসর অতীত হইয়াছে । ১২২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-মাসে তাঁহার মৃত্যু হয় । তাঁহার চরম-পত্রের অভিপ্রায়মত আমি জনৈক “একজিকিউটার”রূপে কার্য্য করিয়া আনিতেছিলাম । ; অধুনা তাঁহার একমাত্র পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত ও বিবরাভিজ হওয়ার তাঁহার উপর তার বিরা আমি অবসর-গ্রহণ করিয়াছি । এই সময়ে তাঁহার সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি । অক্ষয়কুমারের সহিত যে সকল লোকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাঁহাদের অনেকেই ইহলোক হইতে অভ্যর্হিত হইয়াছেন । আমি বরষে ও তাঁহার মমতার পুত্রদ্বারীয়া ছিলাম, আমিই বার্কডো উপনীত । বোধ হয়, “আর কয়েকবৎসর পরে তাঁহার অন্তর্জীবনের কথা বলিবার আর কেহই থাকিবে না ।

১২৮০ সালে চৈত্রমাসে বাণীর গঙ্গাভীরব

বাটাতে আমি প্রথম অক্ষয়কুমারকে দর্শন করি । তিনি তখন পীড়িত অবস্থায় । বিষয় শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া ও সংসারে বিরক্ত হইয়া, শ্রী-পুত্র-কন্যা-বিরহিত-ভাবে বালীতে বাস করিতেছিলেন । তখন বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পত্র ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ তাঁহার পরিবার । শুকতর চিন্তা করিতে তিনি তখন অসমর্থ ; শুকতর কেন, সামান্ত চিন্তা করিতেও তিনি অসমর্থ । সাংসারিক বা বৈবরিক কোন বিষয়ের চিন্তা আবশ্যক হইলে,—কর্তব্যনিরূপণ করিতে হইলে, তাঁহাকে অপরের সাহায্য লইতে হইত । আমার স্বত্তর, ৮ স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের আমাত্য, ৮ শ্রীনাথ ঘোষ ও ৮রাজার দৌহিত্র ৮আনন্দকৃষ্ণ বসু, অক্ষয়কুমারের পরম বন্ধু ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন । তাঁহাদের নিকট তিনি উচ্চশ্রেণীর গণিত শিখা করিয়াছিলেন । অক্ষয়কুমারের বৈবরিক ও সাংসারিক চিন্তাকাব্যের তার, প্রায়ই এই দুইজনের উপর ভিত্তি ছিল । তাঁহাদের অভিপ্রায়মত সকল কার্য্য হইত । চিত্র

করিবার ক্ষমতা ছিল না, চিন্তা ধার করিতে হইত; তজ্জন্ত আমার স্বপ্নের অক্ষয়কুমারকে “think-loan” বলিতেন।

অক্ষয়কুমার আমাকে দেখিতে চাহিয়া ছিলেন; আমারও তাঁহাকে দর্শন করিবার আগ্রহ হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে কেবল গ্রহের দ্বারা পরিচিত মহাশ্মাকে দেখিতে কাহার না লালসা হয়? প্রাতঃকালে আমার স্বপ্নের সহিত বালীর বাটীতে উপস্থিত হইলাম, গ্র্যাণ্ড ট্র্যাকরোডের উপর বাটী; স্থানটিকে তিনি শোভনোত্তান বলিতেন, কিন্তু ঋষিকুটীর বলিলে অস্বাভাবিক হয় না। অনেকে অট্টালিকাকে “কুটীর” বলিয়া নিজের নিরুত্তম্য দেখান; অক্ষয়বাবু কুটীরকে শোভনোত্তান বলিতেন; তিনি “কুটীর”কেই শোভনোত্তান বলিয়া নিজের সমুদ্রতীরের পরিচয় দিয়াছেন। পূর্বদিকে পুতঙ্গলিলা ভাগীরথী; ভবন বিবিধলতাবৃক্ষসম্বিধিত; সংসারবিরত ব্যক্তির থাকিবার স্থান। দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়াই একটি আশ্রয়বৃক্ষ; মাধবীলতাসম্বিধিত সহকারের পরিবর্তে তাহা কণ্টকময় লতার রক্তবর্ণপুষ্পসম্বিধিত। প্রথমেই বৃক্ষ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দক্ষিণে অনতিদূরে অপর একটি রক্তবর্ণপুষ্পসম্বিধিত বৃক্ষ, ইহাও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অস্ত্রান্ত বিবিধ আকারের ও বিবিধ চিত্রের বৃক্ষলতাদি দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্ত হইলাম। সহকার-বৃক্ষের উপর বৃগেনভালা স্পেক্টাবিলিস্ (Bugainvalla spectabilis)। দক্ষিণের বৃক্ষটির নাম “পান্‌সেটিয়া রিজিয়া”। এখন কলিকাতার রাস্তার অনেক “পান্‌সেটিয়া

রিজিয়া” দেখিতে পাওয়া যায়। বাগানে বাগানে “বিউগেন্‌ভিয়ারা স্পেক্টাবিলিস্”। তখন এ সকল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত না; অন্তত আমি তখন দেখি নাই। দ্বিতল ইষ্টকালয়ের দক্ষিণে অনেক গোলাপের গাছ, মধ্যস্থলে একটি সুন্দর “অরেকেরিয়া এক্সেলসা”। কত রকমে অক্ষয়কুটীর সুশোভিত! তাঁহার পরিবারবর্গের সংখ্যা ও আকার ও প্রকৃতি অগণ্য ছিল! •

তখন অক্ষয়কুমার একটি ছোট কাচের যন্ত্র হস্তে লইয়া ফি পাতা দেখিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তিনি সাদরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “এস বাবা, এখনও উত্তাপ বেশী হয় নাই; তোমাকে উদ্ভিজ্জীবনের বৈচিত্র্য দেখাই।” বোধ হইল, যেন তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার নিকটস্থ পরিজনদের সহিতও আমার সম্প্রীতি হয়,— আমি তাহাদের নাম ও প্রকৃতি বুলিয়া লই। আমি তখনও উদ্ভিদবিজ্ঞানের নিকটেও যাই নাই। উদ্ভিদজীবনের কিছুই জানিতাম না। বৃক্ষলতাদি ভালবাসিতাম বটে; কিন্তু অস্ত্র চিন্তায়, অস্ত্র পাঠে, সময় অতিবাহিত করিতেছিলাম; তখনও উদ্ভিজ্জগতের কথা একবারও চিন্তা করি নাই। অক্ষয়কুমার সেইদিন প্রথম উদ্ভিদবিজ্ঞানের আনন্দে আমাকে দীক্ষা দিলেন। ক্রমে ক্রমে অনেক বৃক্ষলতাদি ও তাহাদের সৌন্দর্য দেখাইলেন; তৎকালে তাহাদের লিনিয়ানরীতির নামও বলিলেন। তিনি শিবপুরের “বোটানিকেল গার্ডেনে” প্রায়ই যাইতেন, নূতনরকমের উদ্ভিদ দেখিলেই তাহাকে আনাইয়া আদরের সহিত নিজের সঙ্গী করিতেন।

অক্ষরকুমারের যত্নে ও স্নেহে আমি সিক্ত হইলাম। অনতিপূর্বেই আমি “মুখার্জিস্ মাগাজিনে” “বঙ্গভাষার ভাষাবিজ্ঞান” বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তিনি তাহা পড়াইয়া গুনিয়াছিলেন। ভাষাবিজ্ঞান-সম্বন্ধে আমার সহিত অনেক কথাবার্তা হইল। তখন তিনি বপু, কার্ক ও মোক্ষ-মুলার সাহেবের ভাষাবিজ্ঞান আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনেক মতই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মধ্য-এশিয়া হইতে আৰ্য্যজাতির বিস্তৃতি হওয়ার কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। আমিও তখন “মাক্সমুলার” সাহেবের সকল কথাই বিশ্বাস করিতাম। আমাদের প্রকেষার টিনিসাহেবের সেই মত ছিল।

দ্বিতলে উঠিয়া প্রথমেই বিবিধ শব্দাদি ও প্রস্তরাদি দেখিলাম। প্রত্যহ পাঁচসাত-রকমের ঔষধসেবন ও ছইতিনরকম তৈলমর্দনেরও ব্যবস্থা দেখিলাম। পরে গঙ্গান্নান করিয়া আমরা আহালাকে বিশ্রাম করিলাম। তিনিও ঘরের ভিতরে স্নান করিয়া আহালাদি করিয়া বিশ্রাম করিলেন।

কিয়ৎকণ বিশ্রামের পর, আমাকে ভূবিজ্ঞা, প্রাণিবিজ্ঞা, শব্দবিজ্ঞা প্রভৃতিতে দীক্ষা দিবার সময় আসিল। আমাকে অনেকগুলি অনেকরকমের প্রতিকৃতি দেখাইলেন ও বাহাতে আমার তত্ত্ববিজ্ঞার আসক্তি হয়, তাহার চেষ্টা করিলেন। আমি অনেকই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু এতটুকু বুঝিলাম যে, অক্ষরকুমার এই সকল বিজ্ঞারও সূক্ষ্ম-ভাবে প্রবেশ করিয়াছেন। পরে বাহা

দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, তিনি প্রকৃতই বিজ্ঞানসেবক ছিলেন।

বেলা পড়িলেই তিনি আমাকে লইয়া “অর্কিড্‌হাউসে” প্রবেশ করিলেন। বিবিধ প্রকার অর্কিড্, ফার্ন, মস দেখাইলেন, তাহাদের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য্য দেখাইলেন এবং নাম বলিয়া দিলেন। হাতে কাঁচের, আমাকে ও তদ্বারা দেখিতে বলিলেন। নিকটে একটি শাদা ফুলের গাছ ছিল, তাহা আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া তাহার নাম বলিলেন এবং অন্ত্যস্ত অনেক বৃক্ষলতাদির গুণের কথা বলিলেন। পরে বেলা অবসর হইয়া আসিলে আমার খণ্ডর ও আমাকে স্নেহে বিনাম দিলেন, এবং আমি যেন সময় পাইলেই তাঁহাকে দেখিতে যাই, তজ্জন আমার খণ্ডরকে অহুরোধ করিলেন। সেই দিন হইতেই আমি অক্ষরকুমারের স্নেহের পাত্র হইলাম এবং আমারও অক্ষরকুমারকে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে হইল।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। অক্ষরকুমারের বসিবার স্থানে ও তাঁহার শয়ন-গৃহে ডারউইন্ ও নিউটনের ছবি, আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদির নক্সা, মনুষ্য ও কয়েকটি পশুপক্ষরের প্রতিকৃতি। কাঁচের ভিতর ছবির স্থলে এই কয়েকটি পংক্তিও বড় বড় নাগরাক্ষরে লিখিত ছিল—

আশ্রয় বহৎ স্বপ্নভেদে দিলকা চম্পসে।

বৈঠেন খুসী সে সারেক তলে হাব্।

কি আগশোষ দিলকা কবল করহি মিলনে না পায়া।

কই দিনসে চলা বাতহো মাটিকো তলে হাব্।

বাঙলা পন্তে ইহার অল্পবাদও ছিল।

তদবধি তাঁহার পরিচায়ক শ্রীরাম প্রায়ই

আমার নিকট আসিত। শ্রীরাম বাঙলা-
স্কুলে পণ্ডিত ছিল। সে কর্তৃত্ব্যগ করিয়া
অক্ষয়কুমারের নিকট নিযুক্ত হইয়াছিল,
তাঁহার লেখাপড়ারও সমস্ত কার্য্য করিত।
কার্তিকমাসে শ্রীরাম ছোট ছোট টবে কত-
গুলি গাছের চারা ও কলম আমাকে আনিয়া
দিল। আমি যে যে রকমের পুষ্প প্রীতি-
বিস্তারিতলোচনে দেখিয়াছিলাম, তাহা
অক্ষয়কুমার বুঝিতে পারিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত
হইয়া আমার নিকট কলম বাধাইয়া ও চারা
প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরাম
আমাকে বলিল যে, অক্ষয়বাবু আবার
আমাকে একদিন বাণীর বাটাতে যাইতে
অমরোধ করিয়াছেন। “চোর চায় ভাঙা
বেড়া;” আমি কয়েকদিবসের মধ্যেই বাণীতে
উপস্থিত হইলাম। যে সময়ে উপস্থিত
হইলাম, তখন অক্ষয়কুমার “ভারতবর্ষীয়
উপাসকসম্প্রদায়ের” উপক্রমণিকা-অংশ
শ্রীরামকে দিয়া লেখাইতেছিলেন। কোনদিন
পাঁচ ছত্র, কোনদিন দশ ছত্র মুখে মুখে বলি-
তেন ও শ্রীরাম লিখিয়া লইত। তাঁহার
নিজে লিখিবার সামর্থ্যের অভাব হইয়াছিল;
অতিকষ্টে আটদশ ছত্র লিখাইয়াই ক্লান্ত
হইতেন ও পুনর্বার শিরঃপীড়ার আক্রান্ত হই-
তেন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া
আমার অভিযন্ত্র কষ্টবোধ হইল, কিন্তু আশ্চ-
র্যের বিষয় এই, সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি
ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের দ্বিতীয়-
ভাগের ২৮২ পৃষ্ঠা উপক্রমণিকা লেখাইতে
পারিয়াছিলেন; এই ২৮২ পৃষ্ঠা অক্ষয়কুমারের
অক্ষয় কীৰ্ত্তি। উপক্রমণিকার শেষভাগে
তিনি লিখিয়াছেন—“এবার এই পর্যন্ত, আর

চলিয়া উঠিতেছে না.....যদি কখন এই
উপাসকসম্প্রদায়ের তৃতীয়ভাগ প্রকাশিত
হয়, তাহাতে অস্ত্রান্ত সম্প্রদায়ের কিছু কিছু
ইতিবৃত্ত বিনিবেশিত হইবে। এখন শরীরের
যে রূপ অবস্থা, তাহাতে এটি একটি ছয়াশা-
মাত্র; কিন্তু আশায় জগতের জীবন, আশায়
ইহলোক ও আকাশপথ অতিক্রম করিয়া
উজ্জীৱমান হয়, শরীরের ঐ প্রকার শোচ-
নীয় অবস্থায় এতদূর চলিল, তাহা আমি কি
বলিব। না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না
গ্রন্থশ্রবণ কোনরূপে মানসিক ও শারীরিক
কার্য্যে আমি সমর্থ নহি, ইহার কোনও
কার্য্যে প্রবৃত্ত মাত্র মানসিক কষ্ট হইয়া
থাকে.....অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ়
ভাবসংবলিত চিন্তাপ্রবাহ উপস্থিত হইয়া
মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যক্ষয় করিতেছে স্পষ্টই অমু-
ভব করিতেছি; তথাপি তাহা নিবারণ করি-
বার সামর্থ্য থাকে না। কষ্ট হয় বলিয়া
অন্তমনস্ত হইবার উদ্দেশে নানা চেষ্টা ও
বিবিধ উপায় অবলম্বন করি; কিছুতেই
সে চিন্তাস্রোত মন্দীভূত হয় না। যতক্ষণ সে
সমুদায় ও যাহা কিছু অন্তরূপে জানিতে পারি
তাহাও লিপিবদ্ধ করা না হয়, ততক্ষণ
মস্তকমধ্যে হুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে।
আমার কর্মচারীকে অথবা অন্য কোন
ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাঁহাকে লিখিয়া
রাখিতে বলি, অর্দ্ধরাজ্যেও নিজাকাতর
কর্মচারীকে আহ্বান করিয়াও কতবার কত
বিষয় লিখাইতে হইয়াছে।.....এইরূপ
করিয়া কখনও ৫৭ পংক্তি ও কখনও ২৪
পংক্তি, কখনও ২৪টি বা ২১টি শব্দমাত্র
এবং কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়।”

যে মহাত্মা একরূপ অবস্থার একরূপ অতুল কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কী অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার কি অসাধারণ উৎসাহ, কি অসাধারণ অধ্যবসায়! এইরূপে মহাত্মা অক্ষয়কুমার ১২৮৯ সালে ৮ই চৈত্র ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তৃতীয়ভাগ প্রকাশ করিবার আর অবকাশ হয় নাই। এই গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে আমি অনেকবার তাঁহার নিকটে গিয়াছি, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাঁহার চরম গ্রন্থের কোন অংশ লিখনের ভার পড়ে নাই। কিন্তু তখনও তাঁহার চর্যাচ্ছাদিত কঙ্কালাবশিষ্ট দেহের উত্তমভাগে বুদ্ধির, জ্ঞানের ও চিন্তার বশেষটুকু ছিল। চিন্তার অসমর্থ অথচ চিন্তার মগ্ন ছিলেন। তাঁহাকে দুইতিনবার লিখাইতে দেখিয়াছি মাত্র; আমাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহার বাৎসল্যভাবের আবির্ভাব হইত, গুরুতর চিন্তা অন্তর্হিত হইত। তিনি সকল সময়েই আমাকে উদ্ভিদবিজ্ঞা প্রভৃতি তাঁহার আদরের শাস্ত্রসমূহে দীক্ষিত করিবার জন্ত যত্নবান হইতেন। যতবার গিয়াছি, ঐ সকল শাস্ত্রেরই কথা। আমিও তাঁহার শিষ্য হইয়া বিজ্ঞানে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে-ছিলাম। কিন্তু বিজ্ঞান ভাববাসিতে শিখিয়াছি মাত্র; অক্ষয়কুমারের শিষ্য হইতে পারি নাই।

১২৯১ সালের শীতকালে, বোধ হয় মাঘ-মাসে, শ্রীরাম আসিয়া অক্ষয়কুমারের উইলের মুহূর্ত্তি আমার হস্তে দিল। তাঁহার ইচ্ছা যে, আমি তাহা দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিই। অনেকেই অক্ষয়কুমারের উইল বা চরম-

পুঞ্জের নকল দেখিয়া থাকিবেন; অন্তত অনেকেই শুনিয়াছেন। বোধ হয়, এতদিনের কথা অনেকেরই মনে নাই। তাঁহার পুত্রপৌত্র ও কন্যা বর্তমান, অথচ তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তির ঐ ভাগ বিজ্ঞান-আলোচনা, বিজ্ঞোৎসাহবর্ধন, দরিদ্রহৃৎ-বিমোচন, বালকগণের শরীরপুষ্টির জন্ত অর্পণ করিয়া বান। উইলের মুহূর্ত্তি স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিয়া ও বতদূর সম্ভব আইনসম্মত করিয়া আমার এক মুহূর্ত্তিকে আমি নকল করিতে দিলাম। মুহূর্ত্তি বথাবথ নকল করিল, কিন্তু একটি কথা অধিক লিখিয়াছিল। সে হিন্দু, মুহূর্ত্তিবার শিরোভাগে “শ্রীশ্রীহরি” লিখিয়াছিল। আমার সংশোধিত মুহূর্ত্তি ও তাহার নকল, আমি শ্রীরামের হস্তে পাঠাইয়া দিলাম। শ্রীরাম ৩৪দিবস পরে আসিয়া আমাকে বলিল যে, শিরোভাগের লিখিত “শ্রীশ্রীহরি” শব্দ লিখায় অক্ষয়বাবুর আপত্তি আছে, ও তিনি আমাকে দেখিতে চাহিয়া-ছেন। প্রায় একসপ্তাহ পরে এক রবিবারে আমি বালীর শোভনোত্তানে উপস্থিত হইলাম। আহা! আমার পর গিয়াছিলাম বলিয়া তিনি একটু বিরক্তিতাব প্রকাশ করিলেন। প্রিয়মুহূর্ত্ত শ্রীনাথ ও আনন্দ-কৃষ্ণের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভাগাগরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অন্ত্যস্ত কথার পর তাঁহার উইলের কথা তুলিলেন। প্রথম কথা—উইলের উপরি-ভাগে ঈশ্বরের কিংবা কোন দেবতার নাম না লিখিলে কি চলে না? আমি বলিলাম—“কিছুই লিখিবার প্রয়োজন নাই; তবে

বাঙলার উইল হইলে প্রায়ই কোন-না-কোন দেবতার নাম লিখা হইয়া থাকে।” তিনি বলিলেন—“তবে বিশ্ববীজ লিখার কি কোন আপত্তি আছে?” আমি বলিলাম—“কোন আপত্তি নাই; কিছুই না লেখায়ও ক্ষতি নাই।” তৎকালে অক্ষয়কুমারের মনের গতি কৌনদিকে চলিতেছিল, তাঁহার ধর্ম-বিশ্বাস কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল, তাহা এই কথাবার্তার বৃত্তিতে পারা যায়। তিনি তখন প্রকৃতিবাদী হইয়াছিলেন। আধুনিক-বিজ্ঞান-অধ্যয়ন ও সাংখ্যাদিদর্শন-অধ্যয়ন দ্বারা তাঁহার মানসিক প্রকৃতির পরিবর্তন হইয়াছিল, ধর্মবিশ্বাসের বিপ্লব হইয়াছিল।

তাহার পর উইলের একটি দফা পরিবর্তনের কারণ আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, “অজ্ঞাত ব্যক্তিকে দান করা যায় না।” স্মৃতরাং আমার সংশোধনই তিনি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। আমি উইলের “একজিকিউটার” হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন, “শ্রীনাথ আমার অপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ। শ্রীনাথের পরিবর্তে তোমাকে ভার লইতে হইবে।” অগত্যা আমি সম্মত হইলাম, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে অর্থাৎ চৈত্রমাসের শেষাংশেই তাঁহার উইল সম্পাদিত হইয়াছিল। আমি উইল-দস্তখতের সময় উপস্থিত ছিলাম না।

কিছুদিন পরে অক্ষয়কুমার আমাকে পুনরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেখিলাম, তাঁহার শরীর আরও শীর্ণ হইয়াছে; বোধ হইল, জীর্ণশরীর আর বহুদিন তিনি বহন করিতে পারিবেন না। তাঁহার অনেক

পুস্তক ছিল, দেখিয়া তাহার একটি ভালিকা করিতে বলিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেই পুস্তকগুলি বিশ্ববৎসর আমার নিকটে থাকে ও সাধারণে পড়িতে পারে। সেইদিন অনেকগুলি পুস্তক আমি খুলিয়া দেখিলাম ও দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। তিনি সকলগুলি পড়িয়াছিলেন অথবা অপরের দ্বারা পড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। পেনি সইক্লোপিডিয়ার ধারে ধারে অনেক স্থলেই বাঙলার তাঁহার অভিপ্রায় লিখা আছে। “এশিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণাল” প্রায় সমস্তই ছিল এবং পাশে পাশে বাঙলায় তাহার টিপনী। গণিতশাস্ত্রের অনেক পুস্তক ছিল, এমন কি “ক্যালকুলাস”ও তিনি পড়িয়াছিলেন। ফ্লাক্সানেও (fluxion) তাঁহার টীকা। জ্যোতিষ, প্রত্নতত্ত্ব, ভূবিজ্ঞা, উদ্ভিদবিজ্ঞা, শারীরিক বিজ্ঞা, ভাষাবিজ্ঞান, প্রায় সকল-প্রকার বিজ্ঞানেরই পুস্তক ছিল ও সকল পুস্তকই তিনি পড়িয়াছিলেন, সকল পুস্তকেই তাঁহার টিপনী। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৭৯সর পুস্তকগুলি আমার নিকটেছিল, অনেকসময় আমি তাহার অনেকগুলি দেখিয়াছি; তাঁহার অধ্যয়ন ও অধ্যাবসায়ের এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়াছি। অনেকে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাগারের শোভা বৃদ্ধি করেন, অনেকে পরের উপকারার্থ বিবিধ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন; অক্ষয়কুমার তাঁহার সংগৃহীত পুস্তক সমস্তই পড়িতেন বা পাঠ করাইয়া শুনিতেন ও তাহার স্বাদ সংগ্রহ করিতেন। তিনি সকল শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। উপাসক-সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা পড়িলে তাঁহার বিদ্যাহুশীলনের বখেই পরিচয় পাওয়া যায়।

পুস্তকের তালিকা আপনারা শুনিতে চাহিলে আমি শুনাইতে পারি, কিন্তু বোধ হয় এখন তাহা অনেকেরই তৃপ্তিদায়ক হইবে না।

তাঁহার মৃত্যুর ২৩মাস পূর্বে আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন তিনি আরও শীর্ণ হইয়াছিলেন। অনেক কথার পর আমাকে বলিলেন—“বাবা, তুমি ত উইল অমুসারে আমার সম্পত্তির পর্যালোচনা করিবে, কিন্তু আমার মৃতদেহসম্বন্ধে একটি কথা আছে; আমার মৃত্যুসংবাদ পাইলেই তুমি এখানে আসিবে, যতক্ষণ তুমি না আসিবে, আমার সংকার হইবে না।

ডাক্তারদ্বারা পরীক্ষা করা হইয়া সংকারের আদেশ দিবে, কিন্তু মৃত্যুর পর অন্তত ছয়-ঘণ্টা সংকার হইবে না।” এই কথার উদ্দেশ্য কি, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না, আমিও তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়াছিলাম।

মৃত্যুর ঐই একমাস পূর্বেও বিজ্ঞানে তাঁহার এরূপ আসক্তি ছিল যে, তিনি বিলাত হইতে প্রায় ১৫০ টাকা মূল্যের ভূতবের নমুনা (specimen) আনিবার বন্দোবস্ত করেন। সেগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল।*

ব্রতধারণ।†

আজ এই ত্রীসমাজে আমি যে উপদেশ দিতে উঠিয়াছি বা আমার কোনো নূতন কথা বলিবার আছে, এমন অভিমান আমার মনে নাই।

আমার কথা নূতন নহে বলিয়াই, কাহাকেও উপদেশ দিতে হবে না বলিয়াই, আমি আজ সমস্ত সঙ্কোচ পরিহার করিয়া আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

যে কথাটি আজ দেশের অন্তরে অন্তরে সর্বত্র জাগ্রত হইয়াছে, তাহাকেই নারী-সমাজের নিকট সুস্পষ্টরূপে গোচর করিয়া

তুলিবার জন্যই আমাদের অধ্যকার এই উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে সম্প্রতি একটি বিশেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দেশ আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের রাজ্যপাথের দিক্‌পরিবর্তন করিতে হইবে।

যে সময়ে এইরূপ দেশব্যাপী আঘাতের তাড়না উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে

* এই প্রবন্ধ সাহিত্যপরিষদের মাসিক অধিবেশনে গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ জন্ম শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম. এ., বি. এল., মহাশয়-কর্তৃক পঠিত।

† কোন “ত্রীসমাজে” জনৈক-মহিলা-কর্তৃক পঠিত।

আমাদের সকলেরই হৃদয় কিছু-না-কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে সেই সময়ে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তবে বিধাতার প্রেরণাকে অবজ্ঞা করা হইবে।

ইহাকে হুঁধোগ বলিব কি? এই যে দিগ্দিগন্তে ঘন মেঘ করিয়া আবরণে অন্ধকার বনাইয়া আসিল, এই যে বিদ্যাতের আলোক এবং বজ্রের গর্জন আমাদের হৃৎপিণ্ডকে চকিত করিয়া তুলিতেছে, এই যে জনধারাবর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া গেল—এই হুঁধোগকেই বাহারা স্রবোগ করিয়া তুলিয়াছে, তাহারাই পৃথিবীর অন্ন জোগাইবে। এখনি স্বপ্নে হল লইয়া ক্রমক্কে কোমর বাধিতে হইবে। এই সময়টুকু যদি অতিক্রম করিতে দেওয়া হয়, তবে সমস্ত বৎসর হুঁড়ক এবং হাহাকার।

আমাদের দেশেও সম্প্রতি জৈশ্বর হুঁধোগের বেশে যে স্রবোগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাকে নষ্ট হইতে দিব না বলিয়াই আজ আমাদের সামান্য শক্তিকেও যথাসম্ভব সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছি। যে এক বেদনার উত্তেজনার আমাদের সকলের চেতনাকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে, আজ সেই বিধাতার প্রেরিত বেদনাদূতকে প্রসন্ন করিয়া আদেশ জানিতে হইবে,—কর্তব্য স্থির করিতে হইবে।

নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার দিন আর আমাদের নাই। বহু হুঁধে আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, আমাদের নিজের সহায় আমরা নিজেরা ছাড়া আর কেহ নাই। এই সহজ কথা বাহারা সহজেই না বুঝে, অপমান তাহাদিগকে বুঝায়,

—নৈরাশ্র তাহাদিগকে বুঝায়। তাই আজ দ্বারে পড়িয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, “ভিক্ষার নৈব নৈব চ”। আজ আসন্ন-বিচ্ছেদশঙ্কিত বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙালী এ কথা স্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, যেখানে স্বার্থের অনৈক্য, যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, যেখানে রিক্ত ভিক্ষার স্কুলি ছাড়া আর কোনই বল বা সম্বল নাই, সেখানে ফললাভের আশা কেবল যে বিড়ম্বনা, তাহা নহে, তাহা লাঞ্ছনার একশেষ।

এই আঘাত আবার একদিন হয় ত সহ্য হইয়া যাইবে—অপমানে যাহা শিথিয়াছি, তাহা হয় ত আবার তুলিয়া-গিয়া আবার গুরুতর অপমানের জন্ত প্রস্তুত হইব। যে দুর্বল, যে নিশ্চেষ্ট, তাহার ইহাই দুর্ভাগ্য—হুঁধে তাহাকে হুঁধই দেয়, শিক্ষা দেয় না। আজ সেই শকার ব্যাকুল হইয়া সময় থাকিতে এই হুঁসময়ের দান গ্রহণ করিবার জন্ত আমরা একত্র হইয়াছি।

কোথায় আমরা আপনারা আছি, কোথায় আমাদের শক্তি এবং কোন্‌দিকে আমাদের অসম্মান ও প্রতিকূলতা, আজ দৈবকৃপায় যদি তাহা আমাদের ধারণা হইয়া থাকে, তবে কেবল তাহাকে ক্ষীণ ধারণার মধ্যে রাখিয়া দিলে চলিবে না। কারণ, শুদ্ধমাত্র ইহাকে মনের মধ্যে রাখিলে ক্রমে ইহা কেবল কথার কথা এবং অবশেষে একদিন ইহা বিস্মৃত ও তিরোহিত হইয়া যাইবে। ইহাকে চিরদিনের মত আমাদিগকে মনে গাঁথিতে এবং কাজে খাটাইতে হইবে। ইহাকে তুলিলে আমাদের কোনোমতেই চলিবে না—তাহা হইলে আমরা মরিব।

কাজে খাটাইতে হইবে। কিন্তু আমরা জীলোক—পুরুষের মত আমাদের কার্যক্ষেত্র বাহিরে বিস্তৃত নহে। জানি না, আজিকার দুর্দিনে আমাদের পুরুষেরা কি কাজ করিতে উত্তম হইয়াছেন? জানি না, এখনো তাঁহারা বর্থাৎ মনের সঙ্গে বলিতে পারিয়াছেন কি না যে—

“আশার ছলনে ভুলি কি কল লভিমু, হার,
তাই ভাবি মনে।”

যে নিজস্ব, যে সহজ পথ খুঁজিয়া আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতেই চায়, তাহাকে ভুলাইবার জন্য আশাকে অধিক-বেশি ছলনা বিস্তার করিতে হয় না। সে হয় ত এখনো মনে করিতেছে, যদি এখানকার রাজস্বার হইতে ভিক্ষুককে তাড়া খাইতে হয়, তবে ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়া সমুদ্র-পারে যাইতে হইবে! সমুদ্রের এ-পারেই কি, আর ও-পারেই কি, অনন্তশরণ কাঙাল সেই একই চরণ আশ্রয় করিয়াছে।

কিন্তু এ দশা আমাদের পুরুষদের মধ্যে সকলের নহে—তাঁহাদের বহুদিনের বিবাস-ক্ষেত্রে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছে; তাঁহাদের ভক্তি টলিয়াছে, তাঁহাদের আশা খিলানে-খিলানে কাটির ফাঁক হইয়া গেছে—এখন তাঁহারা ভাবিতেছেন, ইহার চেয়ে নিজের দীনহীন কুটার আশ্রয় করাও নিরাপদ। এখন তাই সমস্ত দেশের মধ্যে নিজের শক্তিকে অবলম্বন করিবার জন্য একটা মধ্যভেরী আহ্বান উঠিয়াছে।

এই আহ্বানে পুরুষেরা কে কি ভাবে সাড়া দিবেন, তাহা জানি না—কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরেও কি এই আহ্বান

প্রবেশ করে নাই? আমরা কি আমাদের মাতৃভূমির কল্যাণ নহি? দেশের অপমান কি আমাদের অপমান নহে? দেশের দুঃখ কি আমাদের গৃহপ্রাচীরের পাশাপাশি ভেদ করিতে পারিবে না?

ভগিনীগণ, আপনারা হয় ত কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা জীলোক, আমরা কি করিতে পারি—দুঃখের দিনে নীরবে অশ্রুধারণ করাই আমাদের সম্বল।

এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমরা যে কি না করিতেছি, তাই দেখুন! আমরা পরণের শাড়ী কিনিতেছি বিলাত হইতে, আমাদের অনেকের ভূষণ জোগাইতেছে হামিলটন, আমাদের গৃহসজ্জা বিলাতী দোকানের, আমরা শরনে-স্বপনে বিলাতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি। আমরা প্রতিদিন আমাদের জননীর অন্ন কাড়িয়া তাঁহার ভূষণ ছিনাইয়া বিলাত-দেবতার পায়ে রাশিরাশি অর্ঘ্য জোগাইতেছি।

আমরা লড়াই করিতেও বাইব না, আমরা ভিক্ষা করিতেও কিরিব না, কিন্তু আমরা কি এ কথাও বলিতে পারিব না যে, না, আর নহে—আমাদের এই অপমানিত উপবাসক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাস বিদেশের পাতে তুলিয়া-দিয়া তাহার পরিবর্তে আমাদের বেশভূষার সখ মিটাইব না? আমরা, ভাল হউক, মন্দ হউক, দেশের কাগড় পরিব, দেশের জিনিষ ব্যবহার করিব।

ভগিনীগণ, সৌন্দর্য্যচর্চার দোহাই দিবেন না! সৌন্দর্য্যবোধ অতি উত্তম

পদার্থ, কিন্তু তাহার চেয়েও উচ্চজিনিষ আছে। আমি এ কথা স্বীকার করিব না যে, দেশী জিনিষে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ ক্লিষ্ট হইবে; কিন্তু যদি শিক্ষা ও অভ্যাসক্রমে আমাদের সেইরূপই ধারণা হয়, তবে এই কথা বলিব, সৌন্দর্য্যবোধকেই সকলের চেয়ে বড় করিবার দিন আজ নহে—সন্তান যখন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত; তখন জননী বেনারসি শাড়ীখানা বেচিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে কুষ্ঠিত হন না—তখন কোথায় থাকে সৌন্দর্য্যবোধের দাবী ?

জানি, আমাকে অনেকে বলিবেন, কথাটা বলিতে বত সহজ, করিতে তত সহজ নহে। আমাদের অভ্যাস, আমাদের সংস্কার, আমাদের আরামস্থি, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ—ইহাদিগকে ঠেলিয়া-নড়ানো বড় কম কথা নহে।

নিশ্চয়ই তাহা নহে। ইহা সহজ নহে, ইহার চেয়ে একদিনের মত চাঁদার খাতার সহি দেওয়া সহজ। কিন্তু বড় কাজ সহজে হয় না। যখন সময় আসে, যখন ধর্ম্মের শব্দ বাজিয়া উঠে, তখন, বাহা কঠিন তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে হয়। বস্তুত তাহাতেই আনন্দ, সহজ নহে বলিয়াই আমন্দ, হঃসাদ্য বলিয়াই সুখ।

আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, যুদ্ধের সময় রাজপুতমহিলারা অস্ত্রের ভূষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছে, তখন সুবিধা বা সৌন্দর্য্যচর্চার কথা ভাবে নাই—ইহা হইতে আমরা এই শিখিয়াছি যে, জগতে জীলোক যদি-বা সুখ না করিয়া থাকে, ত্যাগ

করিয়াছে—সময় উপস্থিত হইলে ভূষণ হইতে প্রাণ পূর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কুষ্ঠিত হয় নাই। কর্ম্মের বীৰ্য্য অপেক্ষা ত্যাগের বীৰ্য্য কোনো অংশেই নূন নহে। ইহা যখন ভাবি, তখন মনে এই সৌরভ জন্মে যে, এই বিচিত্রশক্তিচালিত সংসারে জীলোককে লজ্জিত হইতে হয় নাই—জীলোক কেবল সৌন্দর্য্যদ্বারা মনোহরণ করে নাই, ত্যাগের দ্বারা শক্তি দেখাইয়াছে।

আজ আমাদের বঙ্গদেশ রাজশক্তির নির্দয় আঘাতে বিকৃত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা কোনো ক্রেশকে ডরিব না, উপহাসকে অগ্রাহ করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশয্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া সৌধীনতা করিতে বাইব না।

দেশের জিনিষকে রক্ষা করা—এও ত রমণীর একটা বিশেষ কাজ। আমরা ভালবাসিতে জানি! ভালবাসা চাকচিক্যে ভুলিয়া নৃতনের কুহকে চারিদিকে ধাবমান হয় না। * আমাদের বাহা আপন, সে স্ত্রী হউক আর কুণ্ডী হউক, নারীর কাছে অনাদর পায় না—সংসার তাই রক্ষা পাইতেছে।

একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বঙ্গ-সাহিত্য বলিষ্ঠভাবে অসঙ্কোচে মাথা তুলিতে পারিয়াছে, একদিন শিক্ষিতপুরুষসমাজে ইহার অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তখন পুরুষেরা বাংলা বই কিনিয়া লজ্জার সহিত কৈকিরং দিতেন যে, আমরা পড়িব না, বাকীর ভিতরে ঘেরেরা পড়িবে। আজ

আজ্ঞা, তাঁহাদের সে লজ্জার ভার আমরাই বহন করিয়াছি, কিন্তু ভাগ্য করি নাই। আজ ত সে লজ্জার দিন ঘুচিয়াছে! যে বাড়ীর ভিতরে মেয়েদের কোলে বাংলা দেশের শিশুসন্তানেরা— তাহারা কালেই হউক আর ধলাই হউক—পরম আদরে মানুষ হইয়া উঠিতেছে—বঙ্গসাহিত্যও সেই বাড়ীর ভিতরে মেয়েদের কোলেই তাহার উপেক্ষিত শিশু-অবস্থা যাপন করিয়াছে, অন্নবস্ত্রের হুঃখ পায় নাই।

একবার ভাবিয়া দেখুন, যেখানে বাঙালি-পুরুষ বিলাতী কাপড় পরিয়া সর্বত্র নিঃসঙ্কোচে আপনাকে প্রচার করিতেছেন, সেখানে তাঁহার স্ত্রীকন্ডাগণ বিদেশীবেশ ধারণ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোক যে উৎকট বিজাতীয়বেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া বাহির হইবে, ইহা আমাদের স্ত্রী-প্রকৃতির সঙ্গে এতই একান্ত অঙ্গত যে, বিলাতের মোহে আপাদমস্তক বিকাইরাছেন যে পুরুষ, তিনিও আপন স্ত্রীকন্ডাকে এই ঘোরতর লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই রক্ষণপালনের শক্তি স্ত্রীলোকের অন্তরতম শক্তি বলিয়াই, দেশের দেশীয়ত্ব স্ত্রীলোকের মাতৃকোড়েই রক্ষা পায়। নূতন-যুগের বস্ত্রার দেশের অনেক জিনিষ, যাহা পুরুষসমাজ হইতে ভাগিয়া গেছে, তাহা আজও অন্তঃপুরের নিভৃতকক্ষে আশ্রয়প্রাপ্ত করিয়া আছে। এই বস্ত্রার উপভোগ এক-দিন যখন দূর হইবে, তখন নিশ্চয়ই তাহাদের ধোঁজ পড়িবে এবং দেশ রক্ষণপটু স্নেহ-শীল নারীদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে।

অতএব আজ আমরা যদি আর সমস্ত

বিচার ত্যাগ করিয়া দেশের শিল্প, দেশের সামগ্রীকে অবিলম্বে নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করি, তবে তাহাতে নারীর কর্তব্যপালন করা হইবে।

আমার মনে এ আশঙ্কা আছে যে, আমাদের মধ্যেও অনেকে অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাসের সহিত বলিবেন, তোমরা করজবনে দেশী-জিনিষ ব্যবহার করিবে প্রতিজ্ঞা করিলেই অমনি নাকি ম্যাঞ্চেস্টর ফতুর হইয়া যাইবে এবং লিভারপুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে!

সে কথা জানি। ম্যাঞ্চেস্টরের কল চিরদিন ফুঁসিতে থাকুক, রাবণের চিতার ভায় লিভারপুলের এঞ্জিনের আগুন না নিভুক! আমাদের অনেকে আজকাল যে বিলাতির পরিবর্তে দেশীজিনিষ ব্যবহার করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহারা বিলাতকে ঘেউলেন করিয়া দিতে চান। বস্তুত আমাদের এই যে চেষ্টা, ইহা কেবল আমাদের মনের তাবকে বাহিরে মুক্তিমান করিয়া রাখিবার চেষ্টা। আমরা সহজে ন: হউক, অন্তত বারংবার আঘাতে ও অপমানে পরের বিরুদ্ধে নিজেকে যে বিশেষভাবে আপন বলিয়া জানিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি, সেই উৎসুক্যকে যে কারো-মনে-বাক্যে প্রকাশ করিতে হইবে—নতুবা দুইদিনেই তাহা যে বিস্মৃত ও বার্থ হইয়া যাইবে। আমাদের মস্ত ও চাই, চিহ্ন ও চাই। আমরা অন্তরে স্বদেশকে বরণ করিব এবং বাহিরে স্বদেশের চিহ্ন ধারণ করিব।

বিদেশীর রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশই সুস্পষ্ট-

রূপে পরিষ্কৃত হইরা উঠিয়াছে। আজ আর, ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে? রাজাও পারিলেন না, আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশ্বরের প্রেরিত। এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবলরূপে, যথার্থরূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না। আমরা যতদিন প্রসাদভিক্ষার আশে একান্তভাবে এই সকল বিদেশীর মুখ চাহিয়া থাকিতাম, ততদিন আমরা উত্তরোত্তর আপনাকে নিঃশেষভাবে হারাইতেই থাকিতাম। আজ বিরোধের আঘাতে বেদনা পাইতেছি, অশ্রুবিধা ভোগ করিতেছি, সকলই সত্য, কিন্তু নিজেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার পথে দাঁড়াইয়াছি। যতদিন পর্য্যন্ত এই লাভ সম্পূর্ণ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই বিরোধ ঘুচিবে না; যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজশক্তিকে আবিষ্কার না করিব, ততদিন পর্য্যন্ত পরশক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবেই।

যে আপনার শক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, যাহাকে নিরুপায়ভাবে পরের পশ্চাতে ফিরিতে হয়, ঈশ্বর করুন, সে যেন আরাম ভোগ না করে—সে যেন অহঙ্কার অশ্রুভব না করে! অপমান ও ক্লেশ তাহাকে সর্বদা যেন এই কথা স্মরণ করাইতে থাকে যে, তোমার নিজের শক্তি নাই, তোমাকে দিক্! আমরা যে অপমানিত হইতেছি, ইহাতে

বুঝিতে হইবে, ঈশ্বর এখনো আমাদের ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু আমরা আর বিলম্ব যেন না করি! আমরা নিজেকে ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়ের অনুকূল যেন করিতে পারি। আমরা যেন পরের অনুকরণে আরাম এবং পরের বাজারে কেনা জিনিষে গৌরববোধ না করি; বিলাতী আস্রাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের যদি কিছু কষ্ট হয়, তবে সে কষ্টই আমাদের গৌরবের কারণ হইবে। সেই কষ্টই আমাদের মন্ত্রকে ভুলিতে দিবে না। সেই মন্ত্রটি এই—

সর্বং পরবশঃ হৃৎঃ সৰ্বসাম্মবশঃ স্বথম্।

যাহা-কিছু পরবশ, তাহাই হৃৎঃ; যাহা-কিছু আশ্রবশ, তাহাই স্বথ।

আমাদের দেশের নারীগণ আত্মীয়-স্বজনদের আরোগ্যকামনা করিয়া দীর্ঘকালের জন্ত কুচ্ছত্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। নারীদের সেই তপঃসাধন বাঙালীর সংসারে যে নিফল হইয়াছে, তাহা আমি মনে করি না। আজ আমরা দেশের নারীগণ দেশের জন্ত যদি সেইরূপ ব্রতগ্রহণ করি, যদি বিদেশের বিলাস দূচনিষ্ঠার সহিত পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের এই তপস্যার দেশের মঙ্গল হইবে—তবে এই স্বস্ত্যয়নে আমরা পুণ্যলাভ করিব এবং আমাদের পুরুষগণ শক্তিলাভ করিবেন।

ত্রিবেঙ্কুর ।

১০

প্রভাতে, বারসদিগের অশুভ কোলাহলের মধ্যে, মন্দিরের প্রাতঃপূজা বধন শেষ হইল, সেই সময়ে একটা গাড়িতে উঠিয়া আমি যাত্রা করিলাম । প্রথমেই জিব্রল্মের বন্দরে উপনীত হইলাম । এই মধুর রমণীয় সূর্যোদয়কালে, আর একবার—এবং এই শেষবার—নারিকেলবনাচ্ছন্ন জিব্রল্মনগরের মধ্য দিয়া চলিতেছি ।

আজ রাত্রে একটা বড় উঠিয়া, রাস্তার রক্তিম ধূলা, ছোট ছোট মেটে দেয়ালের উপর—সুখালিপ্ত গৃহছাদের উপর ভ্রুত করিয়াছে ; তাহাতে, করিয়া, যেন একপ্রকার লাল আলোকে, গৃহগুলি দৃষ্ট হইতেছে । আবার স্থানে-স্থানে, স্তবকে-স্তবকে পুষ্পরাশি তরুসমূহের চূড়াদেশ হইতে ভূতল পর্য্যন্ত ছাইয়া পড়িয়াছে ।

প্রভাতে মহারাজার সিপাহী-শাস্ত্রি বিভিন্ন স্থানে বদলি হইয়া দলে-দলে বাতারাত করিতেছে ;—অস্ত্রশস্ত্রে ও উকীলে তাহাদের দেখিতে, খুব জম্‌কাল । একদল লোক শান্তভাবে গির্জার অভিমুখে চলিয়াছে ; কেন না, আজ রবিবার । ইহারা ক্ষুদ্র বালিকা, মলমলচামরে অবগুষ্ঠিতা—হস্তে একএকখানি গ্রন্থ । ইহাদের অধিকাংশই প্রাচীনঘুটানবংশীয় ; ইহাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের বহুশতাব্দী পূর্বে, ঘুটভক্ত । এই সিরীয় অথবা ক্যাথলিক ঘুটানদের গির্জা

হইতে ঘণ্টাধ্বনি শুনা যাইতেছে । এই গির্জাগুলি হিন্দুমন্দিরের সরিকটে এবং সেই একই হরিংশোভার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত । দেখিলে মনে হয়, শান্তি, স্নেহ, নিরীকৃত্য ও পর-ধর্মসহিষ্ণুতা এখানে পূর্ণভাবে বিরাজমান ।

নোকারোহণের ঘাট ;—ইহাই ত্রিবেঙ্কুরের বন্দর । কিন্তু বন্দর বলিলে বাহা বুঝায়—এ সেরূপ বন্দর নহে ;—অর্থাৎ সমুদ্রের বন্দর নহে । কেন না, এখানে হইতে সমুদ্র অনধিগম্য । এই বন্দরটি বিস্তৃত বিলের ধারে অধিষ্ঠিত । শতশত অচল-স্থির নোকার মধ্যে একখানি নোকা আমার দ্রুত অপেক্ষা করিতেছিল । এটি রাস্তার নোকা । ইহা দেখিতে কতকটা সেকালে সুদীর্ঘ রণতরীর জায় ; ইহার চোদটা দাঁড় ; পশ্চাত্তাপে একটি কামরা ;—এই কামরার মধ্যে পা-ছড়াইয়া ঘুমানো যায় । চোদজন দাঁড়ী চোদটা সরু বাঁনের দাঁড় যন্ত্রের জায় একসঙ্গে ফেলিতেছে । এই বস্তু—তাম্রাত মানবদেহ ;—অনমাতা ও বল যেন বৃত্তিমান ।

নিবিড় তালবনের মধ্যে, সূর্যালোকে, এই বিলটি আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল । এই গভীর বিলটি বরাবর নোকা চলিয়াছে । যাত্রারস্তের সময়, দাঁড়ীরা পান গাইয়া, চীৎকার করিয়া, আপনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল । কীটাদুসমূহ এই আবির্ভাব

জলরাশি আমরা ভেদ করিয়া চলিলাম ।
ত্রিদিবসব্যাপী নিঃশব্দ জলযাত্রার আজ এই
প্রথম আরম্ভ ।

বিলের হুইধারে তালভরপুঞ্জ অক্ষরন্ত
পদীর ভ্রার একটার পর একটা ক্রমাপত্ত
আসিতেছে । মধ্যে মধ্যে বহুকাণ্ডবিশিষ্ট
বটবৃক্ষ । শাখায়-শাখায় অপরিচিত কুমুম-
গুচ্ছ মালাকারে বিলম্বিত ; এবং বিন্দুলাহিত
আনুলিতদল একপ্রকার পদ্ম, কাঠিতে-
জড়ানো স্তার গুটির ভ্রার খাগড়াবনের
মধ্যে গজাইয়া উঠিয়াছে ।

ত্রিবেঙ্কুর-অভিমুখ নৌকাসকল প্রতি-
মূহুর্তে আমাদের নৌকার সম্মুখ দিয়া বাই-
তেছে । এই শান্তিময় নিরন্তরপ্রবেশের এই
বিত্তীর্ণ জলাশয়টি লোকযাতারাত্তের মহা-
মার্গ । এই নৌকাগুলি প্রকাণ্ড, আকারে
“গণ্ডোলা”র ভ্রার,—অতীব মন্থর ও নিঃশব্দ-
চারী । সুনয়া-সুন্দর-অজভঙ্গি-সহকারে
মারিয়ার লগি মারিয়া নৌকা চালাইতেছে ।
এই নৌকাগুলিরও পশ্চাত্তাগে একএকটি
কামরা,—এই কামরাগুলি ভারতবাসী স্ত্রী-
পুরুষে পরিপূর্ণ । আমরা চৌদদাঁড়ের
নৌকা করিয়া ব্যস্তভাবে কোথার-না-জানি
চলিয়াছি,—এই মনে করিয়া, ঐ সকল বড়-
বড় কালো-চোখের কুতূহলী দৃষ্টি আমাদের
উপর নিপতিত ।

মধ্যে মধ্যে, একরকম চমৎকার পাখী—
“মাহুরাঙা,”—খুব উজ্জল, খুব নীলবর্ণ, এক-
প্রকার আনন্দের চীৎকার করিতে করিতে
জলের পা বেঁধিয়া উড়িয়া বাইতেছে । নীল-
পদ্ম ও রক্তপদ্ম চারিদিকে ফুটিয়া আছে ।

আমাদের যাত্রাপথের এই অক্ষরন্ত জল-

রাশি, বিশেষ বিশেষ সময়ে, বিশেষ বিশেষ
ভাব ধারণ করিতেছে :—কখন সঙ্গীর্ণ ও
ছায়াময় ;—মাথার উপর, হুই ধারের নারি-
কেলগাহগুণী সন্মিলিত হইয়া মন্দিরমণ্ডপে
পরিণত হইয়াছে ; শাখাগুলি যেন তাহার
খিলান !—তাহার পর, এই জলরাশি ক্রমশ
বিস্তৃত হইয়া, উচ্ছলিত হইয়া, স্রুদ্র প্রদেশ
পর্যন্ত প্রাবিত করিতেছে । হুই ধারে,
যবনিকার ভ্রার নিবিড় তালপুঞ্জ ;—তাঁহার
মধ্যে, এই বিলটি উদ্ভিজ্জশ্রামল কুজ্বীপসকুল
সাগরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে ।

সূর্য্য ক্রমশ উল্টে উঠিল । এই ছায়া-
সম্বোধ, এই আলোড়িত জলরাশিসম্বোধ,
ঐশ্বদেশস্থলভ উত্তাপ ক্রমশ যেন ঘনাইয়া
উঠিতেছে । তথাপি, আমাদের দ্রুতগতির
কিছুমাত্র লাঘব নাই ; আমাদের দাঁড়ীরা
সমান জোরে দাঁড় ফেলিতেছে । মাঝি
মধ্যে মধ্যে হাঁকডাক দিয়া দাঁড়ীদিগকে
উত্তেজিত করিতেছে ; সেই হাঁকডাকে
তাহাদের সমস্ত মাংসপেশী একএক চাবুকের
ধারে যেন খাড়া হইয়া উঠিতেছে ; এবং
তাহারাও তাহার প্রত্যুত্তরে বানরের ভ্রার
তীব্রবরে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে ।
আমাদের নৌকার পার্শ্ব দিয়া—ভূগরাশি,
পদ্মের বৃন্তসমূহ, বিকশিত খাগড়াগুচ্ছ,
আমাদেরই ভ্রার দ্রুতভাবে চলিয়াছে ।

বেলা দশটা । এখন আমার নৌকা
আর তাল-নারিকেলের নীচে দিয়া বাইতেছে
‘না,—একটা গলির মত সঙ্গীর্ণ পথে,
একপ্রকার শাদা ফুলের ঝোপঝাড়ের মধ্য
দিয়া চলিয়াছে । আমার সম্মুখে,—হুইধারে
সমান মারিয়ারি তাম্রশঙ্কি-মানবেরা যজ্ঞের

জ্ঞায় অঙ্গচালনা করিতেছে। এইভাবে ১৮কোশ পথ উহার অতিক্রম করিয়াছে। কেবল, অন্নস্বন্ন খেদবিন্দু মুক্তাকলের জ্ঞায় উহাদের গাত্রে দেখা দিয়াছে; তাহাতে, উহাদের দেহবস্তু খাঁটি ধাতবপদার্থের জ্ঞায় বিক্ৰমিক করিতেছে। প্রথর-ভীষণ সূর্য্য-কিরণে উহাদের দেহপঞ্জরের রেখাবলি আরো যেন পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। তটজান্ত কোণের অবসাদক্লিষ্ট শুভ্র কুসুম-সমূহ বৃন্তচ্যুত হইয়া, উপর হইতে নীল অলরাশির উপর পতিত হইতেছে। উহাদের অতি প্রচুর অনাবশ্যক ফলরাশিও বিকীরণ হইয়া, ছোট ছোট সোনার “আপেলের” জ্ঞায় চারিদিকে জলের উপর ভাসিতেছে।

আমাদের মাঝিমাল্লারা অবিশ্রান্ত বাহিয়া চলিয়াছে। এইবার উহার গান ধরিয়াছে। স্বাহ্যকর-শ্রমপ্রভাবে তল্লাভিভূত স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির জ্ঞায় উহার অলস-অবশভাবে গান গাহিতেছে। একপ্রকার ভাবশূন্য স্মিতহাস্তে উহাদের দশনদীপ্তি প্রকটিত হইতেছে।

এইবার একটি অধুসিত প্রদেশ দিয়া আমরা চলিয়াছি। কতকগুলি গ্রাম; কতকগুলি মন্দির; কতকগুলি হিন্দুধরণে নিৰ্ম্মিত প্রাচীন গির্জা; সিরীর খুটানেরা এদেশে আসিয়া, এইরূপ গঠনপ্রণালী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবলম্বন করিয়াছে।

সন্ধ্যার মুখে, আবার বিলটি—উদ্বাহরের পর্ণতরুভূষিত উচ্চ পাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

হঠাৎ অন্ধকার;—অস্তর্ভৌম শৈত্য। আমরা একটা স্রঙ্গের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। বাহাতে দূরস্থ মস্তাক্ষ বিলের

সহিত—উত্তরস্থ বিলসমূহের যোগাযোগ ঘটে, এই উদ্দেশ্যে মহারাজা এই স্রঙ্গটি কাটাইয়াছেন। আজ সন্ধ্যার এবং কাল সমস্তদিন আমরা এই অস্তর্ভৌম খালের মধ্যে দিয়া বাইব। দাঁড়পঁতনের শব্দ এখন যেন দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। অন্ধকারের জ্ঞায় কালো-কালো চলন্ত নৌকাগুলা যখন আমাদের নৌকার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখন আমাদের মালারা চীৎকার করিয়া উঠে;—সেই শোকগন্তীর প্রতিক্রিয়ার অনেককণ পর্ষ্যন্ত পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে।

এখন মধ্যাহ্ন। এইবার মাঝিমাল্লারা বদলি হইবে। অস্তর্ভৌম খাল অতিক্রম করিয়া আবার আমরা ভালীবনসকুল ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের গোলকধাঁধার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। সুস্ত্রামল-তরুপল্লব-নির্মাজ্জিত একটি গ্রামের সম্মুখে তটভূমিতে আসিয়া আমাদের নৌকা তিড়িল! এইখানে চল্লিশজন নূতন মাল্লা আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। মহারাজার নৌকার জন্ত, সমস্ত পথ এইরূপ লোকবর্দ্ধির বন্দোবস্ত আছে।

এই নূতন মাল্লারা য য স্থানে উপবিষ্ট হইলে পর, একপ্রকার উন্নত অঙ্গচালনা ও কোলাহল আরম্ভ হইল। শিশুসুলভ আনন্দের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উহার বাজা আরম্ভ করিল, খুব উত্তেজিত হইয়া দাঁড় কেলিতে লাগিল, এবং শুভ্র দন্তপংক্তি আ-প্রান্ত বিকশিত করিয়া হাসিতে লাগিল—গাহিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ খুটান;—খুটানস্বাসীরা যে বন্ধ-আবরণ পরিধান

করে, সেই “ক্যাপুলারি” ইহাদের নগ্নবক্ষে
ঝুলিতেছে। অপর মাল্লাদের ললাটে
শৈবচিহ্ন, এবং বাহ ও বক্ষদেশে ভগ্নধূসর
ভিনটি করিয়া সমতল রেখা অঙ্কিত।

আবার সেই তালজাতীয় তরুপুঞ্জ,—
সেই একঘেয়ে তালীবনের প্রাচুর্য্যমহিমা!
...উহা দেখিয়া-দেখিয়া চিত্ত উবেজিত ও
ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মনে করিয়া দেখ,
—তিনশতক্রোশব্যাপী সমস্ত প্রদেশটি
উহাদের নিবিড় শাখাপুঞ্জ সমাচ্ছন্ন।
ইহাতে, মনের মধ্যে কেমন একপ্রকার
যাতনা উপস্থিত হয়। পুরাকালের লোকেরা
যাহাকে “অরণ্যভীতি” বলিত ইহা
তাহারি একটা বিশেষ-আকার বলিলেও
হয়।

সেই তালজাতীয় তরু; ক্রমাগত সেই
তালজাতীয় তরু—তাহার আর অন্ত নাই।
তন্মধ্যে কতকগুলি গগনস্পর্শী তালতরুর
শাখাপুঞ্জ একত্র পুঞ্জীভূত। তাহাদের
উত্তম কাণ্ডের চূড়াদেশ হইতে যেন
কতকগুলো পালোকের ধোপনা নীচে
ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আবার কতকগুলি
তরুণ তরু আদ্রতপ্ত ভূমি হইতে গজাইয়া
উঠিয়াছে; তাহাদের শাখাপুঞ্জ আরো
বিশাল। সমস্তই কি हरिৎ শ্রামল! ...
কি অভিনব উজ্জলকান্তি। স্বর্ধাকিরণে
ঐ সকল জিহ্মময় পত্রপুঞ্জ ঝিক্‌মিক্
করিয়া জলিতেছে; এবং উহাদের তলদেশে,
এই মধ্যাহ্নসময়ে, বিলের জলরাশি টিনের
ধর্পণের ভাৱ বক্সক্ করিতেছে।

স্বর্ধা এখন মাথার উপর। গৌরাজ
লোকদিগের যাহাতে সত্ত বৃত্ত্য হইবার

কথা—সেই মধ্যাহ্নস্বর্ধের প্রথর কিরণে,
আমার এই নৌকার মধ্যে, কি অপরিপাণ্ড
জীবনী শক্তি ব্যঞ্চিত হইতেছে! দাঁড়ীরা,
বাহপেনী প্রসারিত ও আকৃষ্ট করিয়া
দুইঘণ্টাকাল সমানভাবে দাঁড় টানিতেছে;
বাহর শিরাগুলো ফুলিয়া খাড়া হইয়া
উঠিতেছে; আর সেই সঙ্গে উহারা গলা
ছাড়িয়া তীক্ষ্ণস্বরে গান গাহিতেছে। এক-
একসময়ে, যেন একটা মন্ততার আবেশ
আসিয়া উহাদের চিত্তকে অধিকার করে;—
তখন, উহারা হাঁপাইতে-হাঁপাইতে ঝোঁকে-
ঝোঁকে গান গায়িতে থাকে, জলরাশিকে
অতীব ভীষণভাবে আক্রমণ করে;—
জল কেনাইয়া উঠে; দাঁড়গুলো ভাঙিবার
উপক্রম হয়। তখন কৃষ্ণচর্ম্মের উপর অঙ্কিত
শৈবচিহ্নগুলি স্তম্ভমান স্বদেশে মুছিয়া
যায়।

সন্ধ্যার মুখে, বিলটি আবার দুইধারের
গালিচা-বৎ ভূগর্ভস্থ উচ্চপাড়ের মধ্যে
আবদ্ধ হইয়া পড়িল। আমাদের চতুর্দিকে
শতশত নৌকা বিশ্রাম করিতেছে এবং
আমাদের মাথার উপর, খোদাই-কাজ-করা
একটা প্রস্তরসেতু প্রসারিত। যে স্থানে
আমরা আসিয়াছি, ইহা “কিলোনু”-নামক
ত্রিভঙ্করের একটি বৃহৎ নগর;—ত্রিভঙ্করের
ভ্রায়, বাগান-বাগিচার মধ্যস্থিত একটা মুক্ত
পরিসরভূমি। এখানে তালজাতীয় বৃক্ষ
আর দেখা যায় না। অল্প বৃক্ষ তাহাদের
স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বৃক্ষগুলি
আমাদের বৃক্ষ হইতে ভিন্ন। এমন কি,
এখানে শাখাভূমি ও গোলাপগুচ্ছও দৃষ্ট
হইতেছে।

একটা বৃহৎ সোপান জলের মধ্যে নাবিয়া গিয়াছে; অদূরে শাদা-শাদা শুভ্রশ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে। ঐ গৃহে, অনেকদিন কেহ বাস করে নাই। শুনিলাম, দেওয়ানের আদেশক্রমে এখানেই আমাদের জন্ত সাক্ষ্যভোজের আয়োজন হইয়াছে। রাজির প্রারম্ভেই, আমরা ঐ বাটিতে উঠিলাম। উঠিলামাত্র, ঐ শুভ্রগৃহের ভ্রাতা—শুভ্রবসনধারী ভারতীয় ভূতাপ্ন সোপান-পংক্তির উপর দৌড়িয়া আসিল এবং স্বাগত-অভ্যর্থনা করিয়া রূপার থালায় রন্ধিত একটা ফুলের-তোড়া আমাদের উপহার দিল। ছইএকঘণ্টাকাল মাত্র এখানে আমার থাকিবার কথা। ততক্ষণ আমার মাঝিমালায়া বিশ্রাম করিতে পাইবে।

সাক্ষ্যভোজের পর, ঐই বিজন উদ্ভানে বসিয়া চিন্তা করা ভিন্ন আমার আর কোন কাজ নাই। মনে হয় যেন, ফ্রান্সের একটা পুরাতন উদ্ভানে আসিয়া পড়িয়াছি।

উদ্ভানটির একটু “পোড়ো” অবস্থা; ইহার সর্ব পথগুলির ধারে-ধারে বঙ্গদেশীয় গোলাপগুচ্ছ। আমার সম্মুখে, ‘অস্তাচল-দিগন্তে, নির্দীপিতরশ্মি নভোদেশ এখনো তামসী রক্তিম। ধারণ করিয়া আছে—সেই রান্নাত আলোকচ্ছটা বাহা অন্তর্দেশের উজ্জ্বল গ্রীষ্মসন্ধ্যার কখন-কখন পরিলক্ষিত হয়।

এই শান্তিময় নিস্তব্ধতার মধ্যে, শৈশবের চিরাত্মক ও স্মৃতিময় স্থতির আবেশ আসিয়া আমার চিত্তকে অধিকার করিল; তখন,—সর্বসময়ে সর্বত্র আমি প্রায় বাহা করিয়া থাকি, এখন তাহাই করিলাম;—এই স্থতির

প্রবাহে আপনাকে একেবারে ছাড়িয়া দিলাম।

এই বিষাদময় স্থিতি লইয়া আমি বহুজ্ঞাক্রমে আত্মবিনোদন করিতে পারি—তাহাতে কিছু মাত্র আমার ক্লান্তি হয় না।...বনবেষ্টিত “পোড়ো”-খরণের ‘এই’ উদ্ভানের ভ্রাতা, স্বদেশের কোন-একটি উদ্ভানে, প্রকৃতির ভাব আমার মনে সর্বপ্রথমে প্রতিভাত হয়; এবং আমাদের সেই সমতল-দিগন্তপ্রদেশে, অগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের আলামতী সন্ধ্যার এইরূপ রক্তিম আলোকে, “গ্রীষ্মপ্রধান-দেশের” প্রথম স্বপ্ন আমার মনে সমুদিত হয়।

সেই সেকালের গ্রীষ্মবায়ুর মধ্যে, ঐই একই যুথির সৌরভ বিচরণ করিত; এমন কি, তাম্রাভ আকাশের নীচে, উত্তাপ ও সন্ধ্যালোকপ্রভাবে ধূসরীকৃত—এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ বাহুড় ও পেচকগুলি সেখানেও যাতায়াত করিত।...তবে কিনা, এখানে যে বাহুড়গুলি গৃহের মধ্যে বিচরণ করে, তাহা আমাদের চাম্চিকা অপেক্ষা অনেক বড়; আমাদের চাম্চিকার ভ্রাতা, ইহারো নিঃশব্দ-চারী ও বিচিঞ্জগতি; কিন্তু ইহারো সেই বৃহৎ আকারের বাহুড়, বাহাকে “ভ্যাম্পারার” বলে; এবং ইহাদের ডানা এত বিস্তৃত যে, উহারো সম্মুখে আসিলে পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়।...তাহার পর অদূরে—ঐ উদ্ভানের চারিদিকে তমোবেষ্টনের ভ্রাতা যে তরুপুঞ্জ রহিয়াছে, তাহারি মতল হইতে সহস্র তুরীনিলাস ঐ পবিত্র শব্দধ্বনি সমুদিত হইল। এখন পূজার সময়;—তাই মানবকোলাহলও শুনিতে পাইলাম;—মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে লোকেরা দেবতার নিকট যে স্তবস্তুতি করিতেছে—ইহা তাহারি শব্দ।..

তাহার পর, নিমন্তৃত্য আবার যেন, সহকারে হ্রাস হইয়া আসে। কিন্তু আজ ঘনাইয়া আসিল;—মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন একটা বিশেষ আকার ধরিয়া পুনরাবিভূত হইল। কি-যেন একটা অনন্তুভূতপূর্ব্ব বিষাদের ভারে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। স্মরণ হইল, আজ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ, ৩১শে ডিসেম্বরের রাত্রি। আমার শৈশবের শতাব্দীটি কালের অতল রসাতলে এখনি নিমগ্ন হইবে।... আমাদের নিকটে বাহা অনন্তবৎ—সেই তারকারাজি নভন্তলে ছুটিয়া উঠিয়াছে। গুরুভার অনন্তের ভাব আসিয়া, আমার জ্ঞান ক্ষণজীবী প্রাণীর চিত্তকে বিদলিত করিল। এই পুরাতন শতাব্দী বাহা অন্তো-মুখ, এবং এই উদীয়মান নব শতাব্দী—বাহাতে আবার আমি ভাসিয়া চলিব—এই উভয়েরই উত্থানপতন মহাভীষণ অনন্তের তুলনায় অতীব নগণ্য বলিয়া মনে হয়। সকল পদার্থই শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে—মরিয়া যাইতেছে—এইরূপ একটা ভাব আসিয়া, মনোমধ্যে একটা উৎকট যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। বৃহৎ বন ও বৃহৎ মন্দিরসমূহে আমি পরিবেষ্টিত—সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মণভারতের মধ্যে—ছায়াঙ্ককারের মধ্যে আমি আবদ্ধ—এই কথা মনে হওয়ার, মনোমধ্যে একপ্রকার অতীতপূর্ব্ব ও অসম্ভব উদ্বেগ উপস্থিত হইল। এই সব দোলাপযুগিকশোভিত উদ্ভান দর্শনে বারংবার স্বদেশবিশ্রম হইলেও, প্রবাসের ভাব মন হইতে একেবারে দূর হয় না। যখনি যে দেশে গিয়াছি—এইরূপ অসম্ভব ও অনির্ব্বচনীয় ভাবসমূহ আমার চিত্তমধ্যে উদয় হইয়াছে। তবে কিনা, সকল জিনিষেরই মত, তাহার তীব্রতা কাল-

রাত্রি, আমার এই দৈহিক শ্রান্তির মধ্যে, অবসাদময় উচ্চতার মধ্যে, তন্দ্রাবস্থার মধ্যে, ঐ সমস্ত ভাব আবার যেন সহসা ঘনাইয়া আসিল।...

রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়, এই সুন্দর পরি-ষ্কার তারার আলোকে, আবার আমরা যাত্রা করিব। আমার মাঝিমাল্লারী বিশ্রাম করিয়াছে। এখন আরো তিনক্রোশ তাহা-দিগকে নৌকা বাহিতে হইবে। তাহার পর, আমরা একটা গ্রামে গিয়া পৌছিব—সেই-খানে মাঝিমাল্লা বদলি হইবে।

আমাদের যাত্রাকালে, মধুরগামীর নৌকা-সকল, আবার আমাদের নৌকার পার্শ্বদ্বারা বাহিতে লাগিল;—কালো-কালো ছায়াচিত্র;—জলে প্রতিবিম্ব পড়ায় আরো বড় দেখাই-তেছে—যেন অতি-উচ্চ, “গণ্ডোলা”—কিন্তু একটু উপছায়াবৎ।

একটু পরেই, গোলকধাঁধার মত এই বিলগুলি সমুদ্রের জায় বিশাল হইয়া উঠিল—অগ্নিশিখার পূর্ণ হইল। এই অগ্নিশিখাগুলি ধীরবর্ধগের লগ্ঠান;—মৎস্তদিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্ত বড়-বড় মশাল; সুদীর্ঘ খাগুড়ার গুচ্ছে আগুন জ্বলাইয়াছে, এবং বাহাতে না নিবিয়া যায়, এইজন্ত উহা ক্রমাগত ঢলাইতেছে। এই সকল মশালের আলোক-চ্ছটা, দীর্ঘরেখার জলের উপরে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।...নিশার বৃহমন্ম নিবাসে, লঘু-লহরীর স্ত্রী রেখা জলের উপর কদাচিত্ অঙ্কিত হইতেছে। এই একঘেয়ে দাঁড়পতনের শব্দে সহজেই নিদ্রাকর্ষণ হয়; কিন্তু মনের মধ্যে এই ভাবটি সর্বদাই আগুরুক থাকে যে,

—আমার চতুর্দিকে, সর্বত্রই, জীবন-উত্তম, আদিমকালস্থলভ ;—আমাদের ইদবাণী
—স্বতীত্ব জীবন-উত্তম ক্ষুণ্ণি পাইতেছে । পূর্বপুরুষের জীবন হইতে অধিক ভিন্ন
তবে এ কথা সত্য,—এ জীবনক্ষুণ্ণি নিতান্ত নহে ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

আত্মগৃহ ।

হে 'ভারত, তোমার এ শ্রামসিদ্ধ ছারাকুণ্ণ'পরে
কুস্মে পন্নবে ধাত্তে বিকশিত উদার প্রান্তরে
বে মহান্ গ্রন্থখানি সম্মুখেতে রাখিয়াছ খুলি
তার ভাষা দাও শিখাইয়া । অতীতের স্মৃতিগুলি,
স্তব্ধ বাহা বহুদিন, স্পন্দিত আগ্রত করি তারে
ধ্বনিত করিয়া তোলি !—এ মহান্ জলধির পারে
দূরদূরান্তরে তার পাঠাইয়া দাও সমাচার,
অবসাদক্লান্ত প্রাণে নবপ্রেম করহ সঞ্চার,
নব আশা, উৎস যথা কক্কবাবু ধরা হ'তে টানি
উচ্ছ্বসিত করে তারে, তেমনি তোমার মহাবাগী
প্রেমের মঙ্গলধারা বন্ধ হ'তে হরি' ল'য়ে আজ
উৎসারিত করি দিবে দিকে দিকে ধরণীর মাঝ ।
তুমি ত রাখনি দূরে কাহারেও ! আপন যে নয়
তারেও ডাকিয়া ঘরে চিরদিন দিচ্ছে আশ্রয় ।
তবে কেন হে জননি, যারা তব আপন সন্তান
ছাড়িয়া তোমার কোড় পরঘারে পার অপমান ?
পর হতে পারে তবু আপনারে পারে না বুঝিতে
যে শত্রু আছে বনে', যার সূচ পরেয়ে হুঝিতে ।

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

পুরাণপ্রসঙ্গ ।

বৈদিকযুগে ঋষিগণ প্রকৃতিপূজক ছিলেন ; নীলাম্বরী প্রকৃতির সরলস্বন্দর বা ভীতি-সঙ্কুল শক্তিগুলিকে দেবভাবে দেখিতেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তিচিন্তার মধ্যে এক বিরাট সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করিতেন। সেই ধর্মবৃত্তি আবার উপনিষদের যুগে পরমার্থতত্ত্বের ভূমি আনন্দে পরিণত হইয়াছিল। বেদান্তের মার্যবাদ এবং গীতার কর্ম ও নিকারধর্মের প্রেষ্ঠতাত্ত্ব্যাপন অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি লইয়া পৌরব করিতে হইলে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই সকল তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু ধরিতে গেলে, বহুসংখ্যক বৎসর হইতেই এই সকল তত্ত্ব হিন্দুসমাজের দূর অতীতের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে এবং পৌরাণিক দেবদেবীপূজা ও পুরাণনির্দিষ্ট ধর্মনীতি ও সমাজনীতিই ভারতবর্ষের সর্বজনীন ধর্ম হইয়া পড়িয়াছে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ই পৌরাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গীতা ও বেদান্তের উচ্চতত্ত্বগুলি পর্য্যন্ত পৌরাণিক উপাখ্যান ও উপদেশমালা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া গাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে, স্বতিশাস্ত্রের স্মরণ ও তত্ত্বনির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী পর্য্যন্ত পুরাণগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাহা হইলে

দেখা যাইতেছে, পুরাণগুলিই প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ। বাহ্যতে ভিত্তি প্রশস্ত ও মজবুত হয়, তাহা বুঝিয়া সকল শাস্ত্রের সারমর্ম পুরাণগুলিতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরাণপাঠে সর্বশাস্ত্রপাঠের, বেদবেদান্তপরিজ্ঞানের ফল হয়, পুরাণসম্বন্ধে এক্ষণ মতেরও বহুল-প্রচার দেখা যায়।

হুংখের বিষয়, ইংরাজশিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে এই পৌরাণিকসাহিত্যপ্রচারের সম্যক্ হানি হইয়াছে। * যখন শতশত বৎসর ধরিয়া মুসলমানশাসিত হিন্দুস্থানের বিস্তৃত হিন্দুসমাজে, ইংরাজশিক্ষারূপ দাধানল জলিয়া উঠিল, তখন প্রথমেই এই পৌরাণিকসাহিত্য ধ্বংসোন্মুখ হইল। পুরাণগুলি নিত্যন্ত অর্কাচীন গ্রন্থ, ইহাতে ধর্মের ও নীতির আদর্শ বিকৃতভাবে স্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে নানারূপ কুসংস্কার, কদাচার, ছন্নীতির কথা আছে, আর্ধ্যগণের অবসাদ-দশার এগুলি রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, ইত্যাদি যুক্তির অবতারণা করিয়া কৃতবিত্ত-সম্প্রদায় এগুলির ধ্বংসে ও প্রচলিত হিন্দু-ধর্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। পৌরাণিক দেবদেবীকল্পনা ছাড়িয়া-দিয়া উপনিষদ্বক্ত সারসত্য ‘অপৌত্তলিক হিন্দুধর্ম’ বা ‘ব্রাহ্মধর্ম’ নামে প্রতিষ্ঠিত হইল। হিন্দুসমাজের হিরসলিলে ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া ইংরাজি-

* কেবল এক বৈষ্ণবসমাজে জীবন্তাঙ্গবস্তের চর্চা আছে ।

শিক্ষিত যুবকগণ পুরাণগুলিকে আবর্জনা-
বোধে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন।
বোধ করি, এখনও পুরাণগুলির উপর
একটা অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের ভাব ইংরাজি-
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে
তিরোহিত হয় নাই।

ইহার পর ৫০।৬০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে।
সুনাতন তথ্যগুলি নবীন আকারে ত্রাক্ষসমাজ-
কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। প্রচলিত হিন্দু-
ধর্মের উপরও এই তরঙ্গের আঘাত
লাগিয়াছে, এবং তাহার ফলে আধ্যাত্মিক
ব্যাখ্যার প্রবর্তন হইয়াছে। বহুসংখ্যক
'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব' রক্ষণশীল হিন্দু-
দিগের পক্ষের প্রধান কীর্তি। সংস্কারক-
গণের সেই অলস উৎসাহ এখন আর নাই,
রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও আর অসাড়াভাবে
পৌরাণিক দধিসমুদ্রে ক্ষীরসমুদ্রে ভাসিয়া
বেড়াইতেছেন না, পৌরাণিক সাহিত্যের
প্রকৃত মর্ম তলাইয়া বুঝিতে প্রবৃত্তি
জন্মিতেছে। পুরাণসম্বন্ধে আহলো বিলাতী
মতগুলি বিধাশূন্য হইয়া গ্রহণ করিতে
আজকাল ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায় ইতস্তত
করিতেছেন, এরূপ লক্ষণ দেখা যায়।
পুরাণগুলির সঙ্গে হিন্দুসমাজের কিরূপ ঘনিষ্ঠ
সম্বন্ধ, তাহা স্মরণ রাখিলে ইহাকে অলক্ষণ
বলিতে হইবে।

বেদ ও উপনিষদে যে প্রগাঢ় উদ্ভাস-
ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, পুরাণে তাহার
সম্পূর্ণ অভাব; পক্ষান্তরে, ইহাতে দেবদেবী-
পূজা ও প্রতিমাপূজারূপ অপকৃষ্ট ধর্ম
উৎপত্তি হইয়াছে; তদুপরি ইংরাজিশিক্ষিত
সম্প্রদায় পুরাণগুলিকে অশ্রদ্ধার চক্ষে

দেখেন। একথা সত্য যে, পুরাণে যুদ্ধ
পরমার্থতত্ত্ব বা বিশ্বব্যাপী বিরূপ সত্তার কথা
কম আছে; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য
করিতে হইবে যে, বিশাল উদার মনুষ্যত্ব
(humanity) পুরাণশাস্ত্রের মজ্জাগত।
দেবদেবীর লীলারহস্য প্রকটন করিয়া
পুরাণকার দেবপ্রকৃতির মানবীকরণ
(anthropomorphism) সংসাধিত করিয়া-
ছেন,—মনুষ্যহৃদয়ের উচ্চনীচ সকল ভাবগুলিই
(feelings) এই দেবদেবীতত্ত্বে উদ্ভাসিত।
যদি মার্জিতরূচি গম্ভীরপ্রকৃতি পাঠকগণ
এই দোষে সেন্তুলিকে পরিহার করিতে
প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা মনে
রাখিবেন যে, এই আদর্শে বিচার করিতে
হইলে খ্রীষ্টানের ও যিহুদীর বাইবেলও সেই
দোষদুষ্ট বিবেচিত হইতে পারে। মুসল-
মানের কোরাণও বড় বাদ পড়ে না।
বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত বোধিসত্ত্ব, যিহুদীর
খ্রীহোবা, খ্রীষ্টানের ঈশ, এ সকল দেব-
আত্মাতেই মানবের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।
মানুষ আপনার ধরণে দেবতা গড়াইবে
(Man must make god after his own
image), ইহা নিবারণ করা বোধ করি
অসম্ভব। অতএব এই দোষের জন্ত
পৌরাণিকধর্ম বর্জন করা অবিবেচনার
কার্য।

পূর্বের বলিয়াছি, পুরাণশাস্ত্রের দেবদেবী-
তত্ত্বে মনুষ্যহৃদয়ের সকল ভাবগুলিই
উদ্ভাসিত। যে সমস্ত সরলনীতি জীবন-
যাত্রার সহায়তা করে, দেবদেবীর লীলায়
সেই সকল নীতির অবতারণা করা হইয়াছে।
দক্ষকর্তা সত্তীর দেহত্যাগে সত্তীর দহিয়া

ও পতিগতপ্রাণা সাধবীর চরিত্রবল খ্যাপিত হইয়াছে। সাংবৎসরিক দুর্গোৎসবে গৌরীর পতিগৃহ হইতে পিতৃগৃহে আগমন ও দিনজর পিতৃগৃহবাসের পর পতিগৃহে প্রত্যাবর্তন, এই তত্ত্ব কল্পাগতপ্রাণ মাতাপিতার কণ্ঠহারী আনন্দ ও উচ্ছ্বসিত শোকের কি মর্ম্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার শিশুজীবনের প্রত্যেক তুচ্ছ ঘটনার উপর কি-এক অপূর্ণ গৌরব (halo) আনিয়া দিয়াছে; সাধীগণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের গোচারণব্যাপারে গোষ্ঠলীলা মধুর প্যাণ্টোরিয়াল কাব্যের রসে অভিষিক্ত হইয়াছে। আর . কত উদাহরণ দিব? পদ্মপুরাণে একস্থানে দেখিতেছিলাম, সদানন্দ মহাদেব প্রেমভরে গৌরীর চুল বাধিয়া টিপ পরাইয়া গামছা দিয়া মুখ ও পিঠ মুছাইয়া দিতেছেন! গভীরপ্রকৃতি পাঠক হয় ত নাক সিঁটুকাইয়া বলিবেন যে, ইহাতে শিবের শিবত্ব পেল; কিন্তু এস্থলে দেবদেবের মনুষ্যোচিত-ক্রিয়াবর্ণনে মানব-জীবনের সাধারণ কার্য্যপন্থার কেমন একটুকু সমধুর কাব্যরস ফুটিয়া উঠিতেছে। বর্ষমচন্দ্রের উপজ্ঞাসগুলি অনেকবার পড়িয়াছি, কিন্তু কৈ, কোথাও এমন মধুর দাম্পত্যপ্রেমলীলা দেখি নাই! এই মনোহর চিত্র দেখিতে দেখিতে জীবে-শিবে প্রভেদ ভুলিয়া যাইতে হয় এবং হরগৌরীর বা রামসীতার বা রাধাকৃষ্ণের দাম্পত্য-জীবনের আলেখ্যে আদর্শমানবদম্পতির অপূর্ণ সুখসুখময় জীবনযাত্রার প্রতিকৃতি দেখিতেছি বলিয়া বিজ্ঞম উপস্থিত হয়।

বাস্তবিক পক্ষে, পুরাণগুলির রচনা-

কৌশল কালিদাসাদির কাব্যের ভায় শোভনসুন্দর না হইলেও এবং আধুনিক রুচির হিসাবে স্লেগুলিতে অনেকরূপ উত্তম অসম্বন্ধ কথা লিপিবদ্ধ থাকিলেও, স্লেগুলির দ্বারা যে শতশত বৎসর ধর্ম্মের সন্মাজের অশেষ কল্যাণ হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সাধারণ লোকের ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার সহায়তা করিবার জন্য স্লেগুলি প্রণীত হইয়াছিল। খ্রীষ্টানজগতে শাদামাটা ল্যাটিনভাষায় লিখিত Legends of the saints প্রভৃতি গ্রন্থ ঠিক এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিল। বৌদ্ধসাহিত্যেও অবদানকল্পতিকা প্রভৃতি গ্রন্থের এই একই উদ্দেশ্য। যাহাদের বেদাদ্যরনে অধিকার ছিল না (খ্রীষ্টদাদি), তাহাদের জন্য পুরাণ সংকলিত হইয়াছিল। এদেশে ইংরাজি-সভ্যতার আবির্ভাবের পূর্বে রাজসভায় ও গ্রাম্যগোষ্ঠীতে পুরাণপাঠ একটা নিত্যকর্ম্ম ছিল, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণ পাঠ করিয়া দেশভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত হইয়াছিল। যখন আপামর সাধারণকে সংস্কৃতভাষায় বুঝান কষ্টকর হইয়া পড়িল, তখন একদিকে দেবদেবী-মাহাত্ম্য লইয়া দেশভাষায় কাব্যরচনা আরম্ভ হইল, এবং অপরদিকে কথকতা, বাজা, কীর্ত্তন ও পাঁচালীর সৃষ্টি হইল। ক্যাথলিকধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে ধর্ম্মগ্রন্থ সাধারণের অবোধ্য ভাষায় লিখিত ছিল বলিয়া ঠিক এই একইরূপ কারণে Miracle-plays, Mysteries প্রভৃতির অভিনয়প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে উপদেশ-

মালা মানবকণ্ঠের স্রমধুরস্বরসংযোগে ও স্বাভাবিক বাগ্মিতাশ্রমে মনোরম ও শ্রুতি-সুখদ করিবার ব্যবস্থা হইল। এইভাবে ধর্ম ও নীতির স্থূল স্থূল তত্ত্বগুলির প্রচারের সুচারু বন্দোবস্ত ছিল। এখন ইংরাজশিক্ষার ফলে কথকতা দেশ হইতে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। যাহা সামান্য অবশিষ্ট আছে, তাহা ইতরলোকে ও জীলোকে শুনে; কথকেরা উচ্চ আদর্শের অভাবে নানারূপ কুৎসিত রসের অবতারণা করিয়া জিনিষটাকে বোভংস করিয়া তুলিয়াছেন। অধিকাংশ যাত্রার পালা এখন থিয়েটারের ছাঁচে ঢালা। ইংরাজশিক্ষিত সম্প্রদায় কথকতা, কীর্তন, যাত্রা ইত্যাদি প্রথা নিতান্ত 'সেকেলে' বলিয়া পরিহার করেন। কীর্তনের আদর কেবল শ্রদ্ধার আসরে। থিয়েটারী অপেরা এখন দেশের লোকের রুচি বিগ্ড়াইয়া দিতেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কারবিষয়ক আন্দোলন উপলক্ষে একপ্রকার অভিনব বাগ্মিতার আবির্ভাব হইয়াছে, ইংরাজশিক্ষিত সম্প্রদায় এখন কথকতা ছাড়িয়া সেই 'বিলাতী আদর্শের বাক্‌চাতুর্য্যে মজিয়াছেন। ইংরাজ-শিক্ষার শুণে এই সম্প্রদায়ের সহিত সাধারণ লোকের রুচির মিল নাই। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, পৌরাণিক কাহিনী ও উপদেশমালা লোকপরিচিত করিবার যে সকল উপায় ছিল, সেগুলি লোপ পাইতে বলিয়াছে।

ইহার অনেকগুলি বিষয় ফল ফলিত হইতেছে। প্রথমত, আমরা এ অবস্থার আমাদের ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও সমাজের

আসল প্রকৃতি ভুলিয়া বাইতেছি। পৌরাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও সমাজ অবহেলা করিয়া আমরা ধর্মসংস্কারব্যপদেশে উপনিষদ্-বেদান্ত-গীতা লইয়া একটা খিচুড়ি বানাইতে বসিয়াছি;—সর্বসাধারণের জ্ঞান অধিকার করিতে পারে, এমন একটা সর্বজনীন ধর্ম সংস্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়াছি। পুরাতন হারাইয়াছি, অথচ নতুন পড়িতে পারি নাই, কেবল ভাঙিতেছি-চুরিতেছি ও প্রতিভার ক্যালিডোঙ্কোপে রং ফলাইতেছি। দ্বিতীয়ত, প্রকৃত ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানের অভাবে ও বিলাতী বিলাসপন্নায়ণতার প্রভাবে আমরা ঘোর আত্মসুখতৎপর ও হুর্নীতিপন্নায়ণ হইয়া পড়িতেছি। গীতার ফলকামনাশূন্য কর্ম্মানুষ্ঠান, বেদান্তের অপাধিব মার্য্যবাদ, উপনিষদের গভীর পরমার্থতত্ত্ব, কখনই সাধারণ লোকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই, এই বিলাসের ও সুখলিপ্সার যুগে হো করিতেই পারে না। এ সমস্ত উচ্চতত্ত্ব জনকতক বাছা-বাছা লোকের জন্ত; সাধারণ লোক এ সকল তত্ত্বের অধিকারী নহে। পক্ষান্তরে, পুরাণে যেরূপ মরণ ও স্থূলভাবে সংসারযাত্রার উপযুক্ত ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই সাধারণ লোককে সংপথে আনিবার প্রশস্ত উপায়। এই কারণেই পৌরাণিকসাহিত্যের উত্তর হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

লোকশিক্ষার এই সরল, সহজ, সর্বজন-মনোহর পন্থা ছাড়িয়া-দিয়া আমাদের আধুনিক শিক্ষকগণ তাহার পরিবর্তে নীতিবোধ ও চরিতাবলী পাঠ্যতালিকাকৃত করিয়া স্বকুমারমতি বালকবৃন্দের চিত্তক্ষেত্রে নীতি-

ধর্মের বীজ বপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, এবং বৃক্ষগণের আহারগ্রহণের প্রণালী ও বিড়ালের পদনখের সংস্থানকৌশল বুঝাইয়া তাহাদিগকে বাস্তবজগতের সঙ্গে পরিচিত করিতে উদ্দেশ্যী হইয়াছেন। কর্তৃপক্ষের তো এইরূপ বন্দোবস্ত। এখন যদি সমাজের প্রকৃত হিতচিন্তী ব্যক্তিগণ নিজেরা অগ্রসর হইয়া লোকশিক্ষার ভার লন, তবে তাহারা পৌরাণিক উপাখ্যান ও উপদেশগুলি সরল ভাষায় সঙ্কলন করিয়া পুস্তকাকারে লোকসমাজে প্রচার করুন এবং লুপ্তপ্রায় কথকতা, কীর্তন, যাজ্ঞা, পাঁচালী প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ সুপরিচিত উপাঙ্গগুলির পুনঃপ্রচলন করুন। ইংরাজশিক্ষিত সম্প্রদায় কথকতা, কীর্তন, যাজ্ঞা, পাঁচালীর উৎসাহ দিলে, সেগুলি আবার জাগিয়াও উঠিবে এবং সেগুলির আদর্শও উন্নত ও বিস্তৃত হইবে। তা ছাড়া, অবিশ্রান্ত বিলাতী অঙ্কুরণে অবসাদপ্রাপ্ত মনে খাটি বদেশী আমোদ উপভোগে আবার স্বাস্থ্য ও সরলতা ফিরিয়া আসিবে।

এতদ্বির, ইংরাজশিক্ষিত সম্প্রদায় বাহাতে পুরাণসম্বন্ধে একটু বিশিষ্টজ্ঞান লাভ করেন, সেই উদ্দেশ্যে পুরাণগুলির স্থূল পরিচয় দিয়া ‘পুরাণপরিচয়’ বা ‘পুরাণপ্রবেশ’ বা এইরূপ একটা-কিছু নাম দিয়া একখানি পুস্তক রচনা করিলে অনেক উপকার হয়।

ইংরাজিভাষায় Classics for the million এবং ঐরূপ অজ্ঞাত অনেকগুলি গ্রন্থে হোমরের কাব্যের সারসংগ্রহ ও গ্রীক-পুরাণের উপাখ্যানগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সকল উপাখ্যান কেবলমাত্র গ্রীকভাষা-নভিজ সাধারণ লোকের কৌতুহল চরিতার্থ

করিবার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। আমিও সেই আদর্শে আমাদের পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির সারসংগ্রহের প্রস্তাব করিতেছি। উপরন্তু, আধুনিক ইংরাজজাতির গ্রীক-পুরাণের সঙ্গে যে সম্পর্ক, আমাদের পুরাণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তদপেক্ষা সহস্রগুণে ঘনিষ্ঠতর। অতএব আমাদের দেশেও ভাষায় এরূপ সঙ্কলনকার্য্য নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

এ বিষয়ে উদ্যমশীল লেখকগণের মনো-বোগ আকর্ষণ করি। লেখকমহাশয় ইচ্ছা করিলে মাসিকপত্রিকায় ধারাবাহিক-প্রবন্ধ-আকারে গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রকাশ করিয়া পরে সম্পূর্ণপুস্তকাকারে প্রচার করিতে পারেন। পুস্তকের বিষয়বিভাগ কতকটা এইরূপ হইলে ভাল হয়। প্রথম পরিচ্ছেদে পুরাণগুলির ৩০ উপপুরাণগুলির নাম, সম্ভব হইলে তাহাদের শ্রেণীবিভাগ, পুরাণের লক্ষণ, পুরাণপাঠের ক্রম ও কল-শ্রুতি থাকিবে। অবশ্য এ-অংশ-সঙ্কলনে বিশেষ পরিশ্রম নাই। লক্ষণবিচারকালে যুরোপীয় প্রণালীতে বিচার করিলে পুরাণগুলির কিরূপ বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা করিলেও মন্দ হইবে না। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পুরাণগুলি কোন্ সাহিত্যযুগের রচনা, কি উদ্দেশ্যে ও কি ভাবে সেগুলির প্রচলন হইয়াছিল, ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বেদ ও উপনিষদের সঙ্গে এবং বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থের সঙ্গে তাহাদিগের কিরূপ সম্বন্ধ, ও কাব্য হিসাবে একপক্ষে রামায়ণ এবং মহাভারতের সঙ্গে, ও অপরপক্ষে কালিদাসাদির কাব্যনাটকের সঙ্গে সেগুলির কিরূপ সম্বন্ধ,

ইত্যাদি গ্রন্থের বিচার থাকিবে। এ সম্বন্ধে
 যুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মতের সম্যক্ বিচার
 বাঞ্ছনীয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পুরাণগুলির রচনা-
 রীতির দোষগুণবিচার, পুরাণবর্ণিত প্রধান
 প্রধান উপাখ্যানের উল্লেখ বা স্থূলবিবরণ,
 এবং ভিন্ন-ভিন্ন-পুরাণবর্ণিত বৃত্তান্তের মধ্যে
 কতটা মিল, কতটা অমিল, তাহার স্থূলভাবে
 নির্দেশ থাকিবে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে পুরাণগুলি-
 দ্বারা কিভাবে লোকশিক্ষা সম্পাদিত হইত,
 উদাহরণ দিয়া তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া
 দেওয়া হইবে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের সকল
 কার্যে প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞানের এবং চতুর্থ পরি-
 চ্ছেদের রচনায় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয়
 পাওয়া যাইবে, এইরূপ আশা করা যায়।
 সংস্কৃতে সুপণ্ডিত কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত
 এ কার্যে ব্রতী হইলে 'যোগ্য যোগ্য
 বোজয়ে' নীতির সার্থকতা হয়। তদভাবে
 সংস্কৃতবিৎ ইংরাজশিক্ষিত কোন লেখক
 এই কার্যের ভার লইলে ইহা সুসম্পন্ন হইতে
 পারে। 'বঙ্গবাসী'সংবাদপত্রের অধ্যক্ষ-
 মহাশয় শাস্ত্রপ্রকাশকল্পে প্রভূত চেষ্টা
 করিতেছেন এবং বৎসর-বৎসর রাশীকৃত অমূল্য
 শাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গের গৃহে গৃহে বিতরণ করিতে-
 ছেন। ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে তিনি যদি সংস্কৃতবিৎ
 কোন সুপণ্ডিত দ্বারা এই ধরণের এক-
 খানি পুস্তক প্রণয়ন করাইয়া লন, তাহা
 হইলে অনায়াসেই এ কার্য নিষ্পন্ন হইতে
 পারে। বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ বা সাহিত্য-
 সভা এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া যদি
 লেখকসম্প্রদায়কে পারিতোষিকদ্বারা উৎ-

সাহিত্য করেন, তাহা হইলেও কার্য সুসিদ্ধ
 হইতে পারে। তাঁহার এই উপায়ে সাহি-
 ত্যের একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তিকা প্রকাশের
 সহায়তা করিয়া হিন্দুসমাজের বিশেষ কল্যাণ-
 সাধন করিতে পারেন।

পরিশেষে ইংরাজশিক্ষিত যুবকগণের
 প্রতি একটা অনুরোধ করি। এপর্যন্ত
 এদেশে যাহারা সংস্কৃতসাহিত্যের আলো-
 চনায় মনোযোগী হইয়াছেন, তাঁহার
 হয় কাব্যরসবিশ্লেষণ, না হয় কালনির্ণয়-
 বিষয়ক গবেষণা করিয়াছেন, অথবা গীতা
 বা বৈদিকসাহিত্যের গভীরতত্ত্ব কিংবা
 দর্শনশাস্ত্রের জটিলতত্ত্ব বিৎসমাজে প্রকটিত
 করিয়াছেন, অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় পুরাণ-
 গুলির দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই।
 এখন জনকতক লোক এ পথে অগ্রসর
 হইবার সময় হইয়াছে। যাহারা রচনাপটু
 নহেন, সাহিত্যসৃষ্টি করিবার শক্তি নাই,
 সাহিত্য পাঠ করেন, তাঁহারও যদি Kipling
 ও Zola'র আপাতমনোরম উপন্যাসগুলি
 না পড়িয়া পুরাণপাঠে মনোনিবেশ করেন,
 তাহা হইলে একটা অতিনব জগতের সঙ্গে
 পরিচয়স্থাপন এবং নিজেদের সমাজবন্ধনের
 মূলতত্ত্ব জদয়জম করিতে পারেন। তাঁহাদের
 উৎসাহের জন্ত এ কথাও বলিয়া রাখি,
 তাঁহার যে রসের গোতে Zola, Daudet,
 Paul de Kock প্রভৃতি করাসীলেখকগণের
 উপন্যাসের "ইংরাজী অনুবাদ সাগ্রহে পাঠ
 করেন, পুরাণগ্রন্থের কোন কোন অংশে সে
 রসেরও অভাব দেখিতে পাইবেন না।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বঙ্গদর্শন ।

সোনার বাংলা ।

বাউলের সুর ।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমার ভালবাসি ।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাংলার বাণী ॥

ওমা কাণ্ডনে তোর আমের বনে
ছাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে) । ,

ওমা অত্যাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি ॥

কি শোভা কি ছায়া গো,
কি মেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
নদীর কূলে কূলে ।

মা, তোর মূখের বাণী আমার কানে
লাগে সুখের মত (মরি হায় হায় রে)—

মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

তোমার এই খেলাঘরে
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি দুলাবাঁটি আছে মাথি
পুত্র জীবন মানি ।

তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে

কি দীপ জালিস ঘরে (মরি হায় হায় রে)—

তখন খেলাধুলা সকল ফেলে

তোমার কোলে ছুটে আসি ॥

খেছ-চরা তোমার মাঠে,

পারে বাবার খেয়াঘাটে,

সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ার ঢাকা

তোমার পল্লিবাটে,—

তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে

জীবনের দিন কাটে (মরি হায় হায় রে)—

ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই

তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥

ওমা তোর চরণেতে

দিলেম এই মাথা পেতে

দেগো তোর পারের ধুলো সে যে আমার

মাথার মাণিক হবে ।

ওমা গরীবের ধন বা আছে তাই

দ্বি চরণতলে (মরি হায় হায় রে)

আমি পরের ঘরে কিন্ব না তোর

ভূষণ বলে' গলায় কীসি ॥

রামায়ণের রচনাকাল।

শব্দবিচার।

“হুমঃ পাদৌ তু বেদন্ত হন্তৌ কলোহং পঠ্যতে । পদঘর ; কল হন্তঘর বলিয়া কথিত ; জ্যোতিষ
জ্যোতিষায়নঃ চক্ৰনিরুক্তং প্রোক্তমুচ্যতে । চক্ৰ ; নিরুক্ত . কর্ণ , শিলা ভ্রাণ ;
শিলা ভ্রাণন্ত বেদন্ত যুগং ব্যাকরণং স্তম্ভম্ । ব্যাকরণ যুগ । অন্তএব বড়দে ব্যুৎপত্তি-
তস্যাং সাদৃশ্যবৈশিষ্ট্যং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।” লান্ত না করিলে, যেহাথে ব্যুৎপত্তিলাভ করা
বেদার্থ অবগত হইতে হইলে, বড়দে অসম্ভব । এইজন্য পুরাকালে বড়দের
ব্যুৎপত্তিলাভ আবশ্যক । হুম বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিশেষ আড়ম্বর ছিল।

বেদমন্ত্রের বধাবধ-উচ্চারণ-শিক্ষার্থ শিক্ষাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ আবশ্যক ; অন্তর্থা অর্থবোধ দূরে থাকুক, বেদমন্ত্রের আবৃত্তি পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে । মন্ত্রগুলির বধাবধ আবৃত্তি করিবার জন্য শিক্ষাশাস্ত্রের দ্বার ছন্দঃ-শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি আবশ্যক । কল্পশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ না করিলে, বেদমন্ত্রের প্রয়োগ-জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না । বেদবাক্যের অর্থনির্ব্বচনের জন্য “নিরুক্ত,” ব্যুৎপত্তি-বিজ্ঞানের জন্য “ব্যাকরণ” এবং বেদোক্ত কথ্যমুষ্ঠানের কালনির্ণয়ের জন্য “জ্যোতিষ” অধ্যয়ন করিতে হয় । সুতরাং যে যুগে বৈদিকশিক্ষা প্রবল ছিল, সে যুগে বড়জের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাও প্রচলিত থাকিবার কথা । কালক্রমে ধীরে ধীরে সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে !

সংস্কৃতশব্দের পুরাতন উচ্চারণরীতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে । বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইলে, উচ্চারণরীতির অভ্যাস করিতে হইত । লৌকিকসাহিত্য পাঠ করিবার সময়ে,—এমন কি, শিক্ষিতসমাজের কথোপকথনসময়েও,—সে অভ্যাস উচ্চারণ-রীতি পরিত্যক্ত হইত না । তাহা বিলুপ্ত হইবার পর হইতে, “উদাত্তাঙ্গদাত্তব্রিত”-ভেদে উচ্চারণভেদ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে ; পুরাতন ব্যাকরণে সে বিষয়ে যে সকল বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, আধুনিক ব্যাকরণ হইতে তাহাও দূরীকৃত হইয়া গিয়াছে !*

কোন সময় হইতে পুরাতন উচ্চারণরীতি বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহা নির্ণয় করিবার

উপায় নাই । পাণিনিযুগে,—কাত্যায়নযুগে,—পতঞ্জলিযুগে,—খৃষ্টাব্দিভাবের পূর্বকালবর্তী সমস্ত সাহিত্যযুগেই তাহা প্রচলিত ছিল । তাহার পর বৈদিকসাহিত্যালোচনার শিথিলতা উপস্থিত হইলে, পুরাতন উচ্চারণরীতি ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে ।

রামায়ণের রচনাকালে শিক্ষিতসমাজের কথোপকথনেও পুরাতন উচ্চারণরীতি প্রচলিত ছিল । এক্ষণে বেদাদ্ধের মধ্যে একমাত্র ব্যাকরণেরই বাহ্য-কিছু আলোচনা প্রচলিত আছে ; অন্যান্য বেদাদ্ধের আলোচনা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে । এখন আর পুরাতন উচ্চারণরীতি প্রচলিত নাই ।

ভরত বধন ভরদ্বাজের আশ্রমে আত্মপ্রাণীকৃত করেন, তখন . অশেষতপঃপ্রভাব-সম্পন্ন ভরদ্বাজ নানারূপে ভরতের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । কথোপকথনেও তাঁহার “শিক্ষা-শ্রব-সমাবৃত্ত” বাক্য উচ্চারণ করিবার কথা অবোধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে । বধা,—

“এবং সমাধিনা যুক্তশ্চৈবসাহিত্যমেন চ ।

শিক্ষাশ্রবসমাবৃত্তঃ স্তব্রতচ্চত্রবীশুনিঃ ।” ১।১১।১২২

তৎকালে শিক্ষিতসমাজে শিক্ষাশাস্ত্রোক্ত উচ্চারণরীতি সুপরিচিত না থাকিলে, গৃহীর সহিত কথোপকথনকালে শিক্ষাশ্রবসমাবৃত্ত বাক্য উচ্চারিত হইবে কেন ? রামায়ণের রচনাকালে লোকশিক্ষার্থে সকল শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে বড়ই বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে । বধা,—

“নাবড়ববিদ্যাক্রীৎ নারতী নাবহুতঃ ।” ১।১০।২১

রামায়ণ পাঠ করিয়া তাহার আভ্যন্তর

* রামায়ণের “জ্যোতিষাদ্যে” প্রবৃত্ত হইবার সময়ে এই কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইবে । বৈদিক সাহিত্যের দ্বার লৌকিকসাহিত্যও এক সময়ে ব্রহ্মসংযোগে পাঠ করিবার রীতি ছিল । তখনও আধুনিক হন্দ প্রচলিত হয় নাই ।

সম্মুখীন করিতে হইলে, বড়দের শরণাপন্ন হইতে হয় ; নচেৎ অনেক কথাই বুঝিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে দেখিতে পাওয়া যায়,—রামায়ণের রচনাকালে বৈদিক-শিক্ষা পূর্ণপ্রভাণেই প্রচলিত ছিল।

কালপ্রভাবে কেবল উচ্চারণরীতিই পরিবর্তিত হয় নাই। শব্দের ব্যুৎপত্তিও নানারূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ব্যাকরণশাস্ত্র প্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, এই সকল পরিবর্তনের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে।

শব্দসকল ত্রিধা বিভক্ত হইতে পারে ;—বৈদিক, লৌকিক ও লৌকিক-বৈদিক। এই শ্রেণীবিভাগও ক্রমে কত পরিবর্তনের অধীন হইয়াছিল। বাহা পাণিনিরূপে কেবল বৈদিক বলিয়াই পরিচিত ছিল, উত্তরকালে সেক্ষেপ অনেক শব্দ লৌকিকসাহিত্যেও ব্যবহৃত হইয়াছে। বাহা লৌকিক-বৈদিক উত্তর সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত, সেক্ষেপ কত শব্দ আর লৌকিকসাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নাই ! এই শ্রেণীর শব্দবিচার অটলাকারে প্রতিভাত হইয়া পাঠকবর্গের ঐর্ষ্যচ্যুতি সংঘটিত করিতে পারে ; তাহার কথা আপাতত উল্লিখিত হইবে না। আপাতত কেবল ব্যুৎপত্তিগত শব্দবিচারে প্রবৃত্ত হইলেই যথেষ্ট হইবে।

বিখ্যামিত্র-ঋষি দশরথের নিকট উপনীত হইয়া, বজ্রবিষ নিবারণ করিবার আশায় রামচন্দ্রকে বুদ্ধার্থ উপোষনে লইয়া বাইবেন বলিয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। দশরথ বলিয়াছিলেন,—রামচন্দ্র উনবোড়শ-বর্ষবয়স্ক,—বালক বলিলেই হয়,—এখনও

তাহার শত্রুশিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই। অক্ষৌ-
'হিনী সেনা প্রেরণ করিলে কি হয় না ? ঋষি
কহিলেন,—না। দশরথ স্বয়ং বুদ্ধার্থ অগ্রসর
হইবার জন্ত অমুমতি প্রার্থনা করিলেন।
ঋষি কহিলেন,—না 'না'। তখন অনন্তো-
পায় হইয়া দশরথ পুত্রসমভিষাহারে গমন
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঋষি
কহিলেন,—না। এইরূপে পুনঃপুন প্রত্যা-
খ্যাত হইয়া, দশরথ অবশেষে দৃঢ়স্বরে
কহিলেন—

“বালং মে তনয়ং ব্রহ্মণ্ । নৈব দাতামি পুত্রকম্ ।”

‘হে ব্রহ্মণ্ ! আমার বালক “তনয় পুত্রকে”
দান করিতে পারিব না।’ এই শ্লোকার্ধে
“তনয়” এবং “পুত্রক” এই দুইটি শব্দ যুগপৎ
ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কি মহাকবির
রচনাদোষ ? অথবা এই দুইটি শব্দের যুগপৎ
ব্যবহারের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে ?
শব্দবিচার না করিলে, তাহার মীমাংসা করা
যায় না।

রামায়ণের টীকাকার তাহাতে হস্তক্ষেপ
না করিয়া, এই শ্লোকার্ধের (তনয় পুত্রক)
পুনরুক্তিমোহ পরিহার করিবার জন্ত আল-
কারিক বিচারের অবতারণা করিয়া লিখিয়া
গিয়াছেন,—

“অতিদুঃখিতদ্বাং গৌনরক্তং ন দোষঃ ।”

এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ বলিয়া বোধ হয় না।
ইহাতে মহাকবির রচনা প্রথমে দোষাবহ
বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ; পরে বিশেষ কারণে
‘দোষকালনের চেষ্টা’ হইয়াছে। সেই বিশেষ
কারণটি বিচারসহ না হইলে, দোষ দোষই
থাকিয়া বাইবে। এইরূপে প্রথমে দোষ
কল্পনা করিয়া, তাহার পর দোষকালনের

চেষ্টা না করিয়া,—আদৌ কোনরূপ “পুন-
রুজ্জি” আছে কি না, তাহার বিচার
করিলেই ভাল হইত ।

“অতিদুঃখিত্বাৎ পৌনরুজ্জং ন দোষঃ ।”

ইহার প্রথম কথাটি—মূল কারণটি—সদ্বৃত্ত
হইলে, শেষ কথাটি—টীকাকারের সিদ্ধান্তটি
—অবশ্যই সুসঙ্গত হইবে । কিন্তু দশরথ
যখন এই বাক্যের উচ্চারণ করেন, তখন
তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ ? তাহা কি
তখন দুঃখভারে অন্ননত ? আত্মস্তের সহিত
ভাবসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এই আধ্যাত্মিক
পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—মহর্ষির
শুভাগমনে দশরথ প্রথমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া-
ছিলেন ; সংস্কারবশত অভ্যন্তরকণ্ঠে বলিয়া
উঠিয়াছিলেন,—

“অদ্য মে সকলং জগৎ জীবিতকং সুজীবিতম্ ।”

ইহা শিষ্টাচারবিজ্ঞাপক অভ্যর্থনামাত্র ।
বিশ্বামিত্র তাঁহার আগমনের প্রয়োজন
ব্যক্ত করিলামাত্র, এই শিষ্টাচার তিরোহিত
হইয়া গেল ! সহসা সংজ্ঞাহীন হইয়া,
আবার সংজ্ঞালাভের পর, দশরথ শোকাবিষ্ট
হইলেন ;—বিচলিত হইলেন ;—মোহপ্রাপ্ত
হইলেন ; অবশেষে নিতান্ত ভরাধিত হইয়া,
বিষম হইয়া পড়িলেন ।

“শোকেন মহতাবিষ্টচাল চ সুবোহ চ ।

লবসংজ্ঞতভোখার ব্যবীকৃত ভরাধিতঃ ।

প্রথমে হর্ষ, তাহার পর সংজ্ঞালোপ !
তাহার পর শোক,—চাক্ষুঃ,—মোহ,—
অবশেষে ভরাধিত বিষমতা,—পর্যায়ক্রমে ”

দশরথকে অভিভূত করার প্রথমে তাঁহার
বাক্যস্মৃতি হইল না । ক্রমে ভয় দূর হইলে,
প্রত্যুত্তরদানের সাহস হইল ;—শোক নিরস্ত
হইলে, উত্তরদানের জ্ঞাত কণ্ঠরোধ বিদূরিত
হইল ;—চাক্ষুঃ সংবৃত হইলে, মোহ অপগত
হইল ;—বিষমতা বশীকৃত হইয়া, দশরথকে
প্রত্যুত্তরদানের জ্ঞাত প্রণাল্য করিয়া তুলিল ।
তিনি বিশিষ্ট বাগ্মীর জ্ঞান বহুবাক্যে
বিশ্বামিত্রকে শাস্ত করিবার জ্ঞাত * চেষ্টা
করিতে লাগিলেন ; সুবিজ্ঞ নৈরায়িকের
জ্ঞান বহু তর্কে বিশ্বামিত্রকে বুঝাইতে
বসিলেন ; যখন কিছুতেই কিছু হইল না,
তখনই কেবল বলিতে বাধ্য হইলেন—
“বাং মে তনয়ঃ ব্রহ্মণ ! নৈব দাস্ত্যস্মি পুত্রকম্ ।” *

মানবচরিত্রতত্ত্ব সমালোচকগণ দশরথের
মানসিক অবস্থার সমালোচনা করিয়া
এই শেষবাক্য উচ্চারণ করিবার সময়ে
দশরথকে নিরতিশয় দুঃখভারাক্রান্ত বলিয়া
স্বীকার করিতে না পারিলে, পুনরুজ্জিদোষ
মহাকবির রচনাদোষ বলিয়াই ব্যক্ত করিতে
বাধ্য হইবেন ! ইহা আদৌ রচনাদোষ
কি না, তাহার বিচার না করিয়া, ইহাকে
প্রথমে রচনাদোষ বলিয়া ধরিয়া লইয়া,
তাহার পর “অতিদুঃখিত্বাৎ” বলিয়া আর
একটি অহুমানের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া
মহাকবিপ্রয়োগের সমালোচনার হস্তক্ষেপ
করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না । ইহা
কি আদৌ পুনরুজ্জিদোষের দৃষ্টান্তরূপে
উল্লিখিত হইবার যোগ্য ? তাহার বীমাংসা

* “নৈব” এই নিশ্চরিত্রক নিবেদনবাক্যে দশরথের হৃদয় সঙ্কর ব্যক্ত হইতেছে । ইহার সহিত দুঃখাতিশয্যের
সংশয় থাকিতে পারে না ।

“পুত্রক-”শব্দের বিচারের উপরে নির্ভর করিতেছে।

পুত্র কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের সহিত ভারতবর্ষের বহু বিলুপ্তকাহিনী সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার তথ্যাস্থানবন্ধনের জন্য বঙ্গসাহিত্যেরও আগ্রহ উপস্থিত হইবার কারণ আছে। পুত্র কোন্ শ্রেণীর শব্দ? ইহা কি “বুৎপন্ন”—অথবা “অবুৎপন্ন প্রাতিপদিক”?

এ বিষয়ে মতপার্থক্যের অভাব নাই! উণাদিকারিণ অস্ত্রান্ত “অবুৎপন্ন প্রাতিপদিকের” হ্রাস পুত্রশব্দেরও একটি ব্যুৎপত্তি-নির্দেশের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। অথচ বৈদ্যাকরণগণ পুত্রশব্দকে “অবুৎপন্ন প্রাতিপদিক” বলিয়া কুত্রাপি ব্যক্ত করেন নাই!

পুত্রশব্দ সুপরিচিত হইলেও, তাহার একটি ভিন্ন অস্ত্রান্ত বুৎপত্তি সুপরিচিত বলিয়া বোধ হয় না। যে বুৎপত্তি সুপরিচিত, তাহা পুত্রকে “পুত্রাম-নরকজাতা” বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। এই বুৎপত্তির ইতিহাস আলোচনার পূর্বে, তর্কস্থলে ইহাকেই পুত্রশব্দের একমাত্র বুৎপত্তি বলিয়া ধরিয়া লইলেও, পুনরুক্তিদোষ নিরাকৃত হয় না। এই বুৎপত্তি অনুসারে পুত্র,—জন্মগ্রহণ-মাজেই,—গিতাকে পুত্রাম-নরক হইতে পরিজ্ঞান করিয়া থাকে; সুতরাং রামচন্দ্রের বাহা করিবার, তাহা জন্মগ্রহণমাজেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহার বৃদ্ধকেই একমাত্র বৃত্ত্য সংঘটিত হইলে, দশরথের শোক ভিন্ন পারলৌকিক কতির আশঙ্কা ছিল না। এরূপ অবস্থার “তনয়” এবং

“পুত্রক” শব্দের যুগপৎ ব্যবহারের সার্থকতা সুব্যক্ত হইতে পারে না।

পুত্রশব্দের পুরাতন ব্যুৎপত্তি অপ্রচলিত হইলেও, সংস্কৃতসাহিত্য হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই শব্দ বহু পুরাতন;—বৈদিকসাহিত্যেও সুপরিচিত। ইহার অনেক প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে। কিন্তু কোন প্রতিশব্দেই পুত্রশব্দের বিশেষ অর্থ প্রতিভাত হয় না। স্নহু, সন্তান, তনয়, নন্দন ইত্যাদি প্রতিশব্দ কেবল জন্মগত অর্থ প্রকাশিত করে। স্নহু প্রশ্নত ব্যক্তি;—এই শব্দে অস্ত্র কোন ভাব প্রকাশিত হয় না। সন্তান ও তনয় বংশবিস্তারকারক;—তাহারা অস্ত্র কোন ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। নন্দন কেবল আনন্দমাত্রা,—অস্ত্র ভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এই সকল শব্দ একএকটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিয়া, কেবল তাহারই বিশেষ প্রয়োজন সঙ্গ্রহন করিয়া থাকে। পুত্রশব্দও এইরূপ একটি-না-একটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইত। তাহাতে অস্ত্র কোন ভাব ব্যক্ত হইত না; অস্ত্র কোন শব্দেও তাহার বিশেষ কার্য সাধিত হইতে পারিত না। সে ভাবটি কি? তাহা বৈদিক-সাহিত্যেই অভিযুক্ত।

বৈদিকযুগ আৰ্য্যসমাজের পরম কল্যাণাবহ বিজয়যুগ। সে যুগের আৰ্য্য-সমাজ বিবিধ বিজয়সাধনের জন্যই নিয়ত উত্তমশীল ছিল। সকলেই তনয় হইয়া বিবিধ বিজয়সাধনের আশায় কারমনোবাক্যে নিয়ত তপস্চরণ করিতেন। তদন্ত বিবিধ কর্মাজুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছিল। রাজ্যরক্ষা,

ধর্মরক্ষা, আচাররক্ষা,—রাজ্যভর, শত্রুভর, সমরবিভর,—ইহাকে ব্যক্তিমাভেরই প্রাণপণে তপস্তা করিবার দারিদ্ৰ ছিল। প্রত্যেক কর্ম্মমুঠানে এই দারিদ্ৰ স্পষ্টাক্ষরে পুনঃপুন কীর্ণিত হইত ; প্রত্যেক আছতি এই দারিদ্ৰ স্বরণ করাইয়া দিত ; প্রত্যেক মন্ত্রে এই দারিদ্ৰের কথাই নানাভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিত। এইরূপ একটি দারিদ্ৰবিজ্ঞাপক* কর্ম্মমুঠানের সহিত পুত্রশব্দের পুরাতন ব্যুৎপত্তি সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার কথা “বৃহদারণ্যক”-উপনিষদে অজ্ঞাপি উল্লিখিত আছে।

অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ ।

মনুষ্যালোকঃ পিতৃলোকঃ দেবলোক ইতি ।

সোমঃ মনুষ্যালোকঃ পুত্রোপৈব জযো নাস্তেন কর্ম্মণা ।

কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যা দেবলোকঃ ।

‘তিনটিমাত্র লোক ;—মনুষ্যালোক, পিতৃলোক, দেবলোক। তন্মধ্যে এই যে মনুষ্যালোক, ইহা কেবল “পুত্রের” দ্বারাই জিত হইতে পারে ; কোনরূপ অস্ত্র কর্ম্মমুঠানে জিত হইতে পারে না। কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক, বিদ্যার দ্বারা দেবলোক জিত হয়।’ এই বেদবাক্যে বৈদিকযুগের আধ্যাত্মমাজের মত ও বিশ্বাস স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে।

পুত্রের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনরূপ পারলৌকিক কল্যাণসাধন করিবার কথা এই বেদবাক্যে উল্লিখিত হয় নাই ;—পুত্র কেবল মনুষ্যালোক জয় করিবার সহায়। পক্ষান্তরে, “পুত্রামনরকজাতা” বলিয়া পুত্র শব্দের যে ব্যুৎপত্তি সুপরিচিত, তাহাতে মনুষ্যালোক জয় করিবার প্রসঙ্গ নাই ;

তাহাতে কেবল পারলৌকিক কল্যাণসাধনের কথা। দুইটি ব্যুৎপত্তি দুইটি বিভিন্ন মত ও বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিতেছে !

“অর্থাৎ : সংপ্রতিযদা প্রৈষ্যন্ মন্ততেহথ পুত্রমাহ ঙং ব্রহ্ম যং যজ্ঞস্যং লোক ইতি। স পুত্রঃ প্রত্যাহ অহং ব্রহ্ম অহং যজ্ঞোহহং লোক ইতি।”

মনুষ্যা যখন অরিষ্ট-লক্ষণে আপনার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী বলিয়া বুঝিবে, তখন তাহাকে “সংপ্রতি” নামক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সে পুত্রকে কহিবে—“তুমি আমার অসমাপ্ত কর্তব্য সম্পন্ন করিও।” পুত্র কহিবে—“অবশ্যই করিব।” এইরূপে পুত্রহস্তে অসমাপ্ত কার্য্যভার সমর্পণ করিবার কর্ম্মমুঠান প্রচলিত হইয়াছিল। এই কর্ম্মমুঠানে যথাশাস্ত্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, পিতার কর্তব্যপালনের ছিদ্র পূরণ করিয়াই পুত্র “পুত্র”-নামে কথিত হইতেন। আত্মজমাত্রেই এই গৌরবের উপাধি গ্রহণ করিতে পারিতেন না ; ইহা কেবল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিদ্রপূরণকারীকেই “পুত্র” বলিয়া ঘোষণা করিত। আত্মজের অভাবে অস্ত্র কেহ—দন্তক, কৃত্রিম, পুত্রিকাপুত্র—“পুত্র” হইতে পারিতেন। একজন না একজনকে এইরূপে অসমাপ্ত কর্তব্যভার সমর্পণ করিতে হইত ; কেহই লোকজন্মের কার্য্য বিস্মৃত হইয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিতেন না !

এই বেদবাক্যের ব্যাখ্যায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন, এই কর্ম্মমুঠানের বিবরণের মধ্যেই পুত্রশব্দের নির্ম্মচন—নিরুক্ত—ব্যাখ্যা—প্রাপ্ত হওয়া যায়।*

* পুরুষের জ্ঞানতে স পিতরঃ যস্মাৎ তস্মাৎ পুত্রো নাম ।—ইতি শঙ্করভাষ্যম্।

ঔরসজাত না হইলেও যে পুত্রপদবাচ্য হইতে পারা যায়, এই বৈদিক-কন্দীভূতানের মধ্যেই তাহার রহস্য নিহিত রহিয়াছে। “পুত্রাম-নরকজ্ঞাতা” বলিয়া পুত্রশব্দের যে ব্যুৎপত্তি সর্বত্র সুপরিচিত, তাহা যে প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নহে, তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন—“যাহারা বেদোক্ত বিশেষ অর্থ অনবগত, সেই সঙ্কল তর্কলোলুপ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুত্রাদি সাধনকে মোক্ষলাভের হেতু বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে।” *

বৈদিকযুগে এক্ষণে বিশ্বাস জনসমাজে প্রচলিত ছিল না। সে যুগের আৰ্য্যসমাজ কর্তব্যপালনকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া যাক্ত করিয়াছিল। মনুষ্যমাজেই বিজয়যাত্রার বহির্গত,—প্রত্যেকেই বীরব্রতে সঙ্গরাক্রুত। তাহাকে লোকজয় জয় করিতেই হইবে, তাহাতেই মানবজীবনের সফলতা। সেই বিজয়কার্য্য অসমাপ্ত থাকিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে পুরণকর্তা নিযুক্ত করিতে হইত। সেই পুরণকর্তার নাম “পুত্র”।

মৃত্যুকাল সমুপস্থিত হইলে, আমরা কেবল পুত্রের বিলাসভোগের ব্যবস্থা করিবার জন্তই “উইলু” করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। স্বর্গীয় পিতৃপুরুষেরাও “উইলু” করিতেন। তাহারা মৃত্যুকালে সন্মুখে পুত্রের মন্তক আত্মাণ করিয়া যথাশাস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কহিতেন,—

ঔ ত্বং ত্বং বজ্রং লোক ইতি।

‘তুমি অসমাপ্ত বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিও;

তুমি অসমাপ্ত বজ্র সমাপ্ত করিও; তুমি অসমাপ্ত লোকজয় সমাপ্ত করিও। আমি যাহা পারিলাম, করিলাম; যাহা পারিলাম না, তাহা পুরণ করিবার ভার তোমার উপর ছত্ত করিলাম।’

এইরূপে মন্বচরনে পিতার ইচ্ছা পুত্রকে জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া, বৈদিকযুগের আৰ্য্যসমাজ পিতাপুত্রের মধ্যে যে সন্ধক সংস্থাপিত করিয়াছিল, তাহা পিতৃধন উপভোগ করিবার,—পিতা এত অল্প রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া তৎসনা করিবার,—আধুনিক সন্ধক হইতে কত পৃথক! তাহা কেবল পিতৃকর্তব্যপালনের জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের সন্ধক। তাহাতে পিতৃলোকের মুখ উজ্জল হইয়াছিল; পুত্রজীবন কৃতার্থ হইয়াছিল; দেশের মুখও সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহাকে এইরূপে মৃত্যুকালে “পুত্র” করিতে হইবে, তাহাকে আবাল্য সেইরূপ শিক্ষায় সমুন্নত করিবারই ব্যবস্থা ছিল। পিতা চিরজীবন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহাকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতেন। দশরথ এইরূপে রামচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন; তাহাকে “পুত্র” করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। অধি বখন কোন তর্কেই কর্ণপাত করিলেন না, তখন বাধা হইয়া বলিতে হইল,—

বালং মে তনয়ঃ ব্রহ্মন্। সৈব দাস্যামি পুত্রকন্।

‘হে ব্রহ্মন্! রামচন্দ্র একে বালক,— তাহাতে আমার বংশবিত্তার্ককারক “তনয়”,

কেচিং বাবুকা: ক্রতুজবিশেষার্থানভিজা: সন্ত: পুত্রাদিসাধনানাং মোক্ষার্থবতাং বদন্তি।

—ইতি শাকরভাষ্যন্।

—তাহাতে আবার মরণান্তে আমার ছিত্র-
পূরণকারী “পুত্র”রূপে নির্দোষিত ও
প্রতিপালিত হইতেছে ;—তাহাকে কিছুতেই
‘দান করিতে পারিব না !’

পুত্রশব্দের এই পুরাতন ব্যাখ্যা গ্রহণ
করিলে, আর পুনরুজ্জীবন দেখিতে পাওয়া
যায় না ; আর দোষকালনের জন্ত অল-
ঙ্কারিক কষ্টকল্পনারও প্রয়োজন উপস্থিত
হয় না । বালং—তনয়ং—পুত্রকং—এই
তিনটি শব্দের একত্র ব্যবহারে মহাকবি কত
সংক্ষেপে, কত সুকৌশলে, নশরথের সকল
কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার
অনুধাবন করিবার কবিগুরু চরণতলে
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে হয় ! যাহা
সত্যসত্যই কবিগুরুর রচনাগুণ, ব্যাখ্যা-
বিভ্রাটে তাহাই রচনাদোষ বলিয়া প্রতিভাত
হইয়াছে ! রামায়ণ যে সাহিত্যযুগের
গ্রন্থ, সেই যুগের প্রচলিত ব্যুৎপত্তি পরিভাষা
করিয়া, উত্তরকালের ব্যুৎপত্তি লইয়া
অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে, এতরূপে পদে
পদে বিভ্রান্ত হইতে হয় । রামায়ণে ইহার
উদাহরণের অভাব নাই ; বাহ্যভায়ে
একটিমাত্র উদাহরণ উল্লিখিত হইল ।

রামায়ণের রচনাকালে আখ্যায়িকা
পুত্রশব্দের এই পুরাতন ব্যুৎপত্তিই প্রবল
ছিল । “পুত্রাম-নরকজাতা” বলিয়া পুত্র-
শব্দের যে ব্যুৎপত্তি এখন প্রবল হইয়া
উঠিয়াছে, তাহা রামায়ণের রচনাকালে
জনশ্রুতিমধ্যে পরিগণিত ছিল ;—লোক-
সমাজে সুপরিচিত হয় নাই । রামায়ণে
এই শব্দান্তের অল্পকুল প্রমাণের অভাৱ
প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

পুরাণে চৌরাসী নরকের নাম ও বর্ণনা
উল্লিখিত আছে । তন্মধ্যে পুং-নামক
কোন নরকের নাম বা বর্ণনা প্রাপ্ত
হওয়া যায় না । পুত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিব্যাখ্যা
ভিন্ন অন্য কোন উপলক্ষে সংস্কৃতসাহিত্যে
পুং-নামক নরকের উল্লেখ হইয়া থাকিলেও,
তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।
পিতার অসমাপ্ত কর্তব্য প্রতিপালিত না
হইলে পিতার যে মনঃক্লেশ উপস্থিত হইতে
পারে, তাহাকে পুং-নামক নরক বলিয়া
কল্পনা করিয়া লইলে, পুরাতন ব্যুৎপত্তির
সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে । কিন্তু
কি উদ্দেশ্যে পুং-নামক নরক কল্পিত হইয়া-
ছিল, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার
উপায় নাই !

পুত্র যে পিতাকে নরক হইতে
পরিদ্ধাগ করিয়া পারলৌকিক সদগতি দান
করিতে পারে, বৈদিকযুগের আখ্যায়িকায়
এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা
ছিল না । আত্মাই আত্মার মিত্র,—আত্মাই
আত্মার শত্রু ;—আত্মা ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে
মুক্ত করিতে পারে না ;—এই চিরপ্রচলিত
আখ্যায়িকার কালক্রমে পরিবর্তিত না হইলে,
লোকে “পুত্রাদি সাধনের মোক্ষার্থতা” প্রচার
করিবে কেন ? তাহা যে বেদার্থানভিজ্ঞ
“বাবদুকগণের” ভ্রান্ত বিশ্বাস, কেবল তাহা
বলিলেই যথেষ্ট হয় না । সত্য হউক, মিথ্যা
হউক,—প্রকৃত হউক, আর ভ্রান্ত হউক,—
এই বিশ্বাস এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত
হইয়া অত্যাধিক বর্তমান আছে । ইহাকে
অনার্য্য-বিশ্বাস বলিয়া নিন্দা করিতে পার,
তথাপি এই বিশ্বাস যে আখ্যায়িকায়

প্রবীষ্ট হইয়াছে, সে ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই! কি হুজ্জে এই বিশ্বাস আর্ধ্যসমাজে প্রবীষ্ট হইয়া পুরাতন বিশ্বাসকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা অল্পসঙ্কানের বিষয়।

পুন্নায়ে নরকাৎ বন্নাৎ ত্র্যয়তে পিতরঃ সত্যঃ।

তন্মাৎ পুত্র ইতি শ্রোক্তঃ পিতৃন্ যঃ পাতি সর্বতঃ ॥”

রামায়ণের : এই শ্লোকে প্রসঙ্গক্রমে পুত্রশব্দের নূতন ও পুরাতন দুইটি ব্যুৎপত্তিই উল্লিখিত হইয়াছে। “ত্র্যয়তে” এবং “পাতি” ক্রিয়াপদ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যুৎপত্তি স্থচিত করিতেছে। রচনাতত্ত্বী যেন স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে,—প্রথমটি আধুনিক ও অপ্ৰচলিত। “পুন্না-নরকজাতা” বলিয়া বক্তব্য শেষ করিলে, সকলে বুঝিবে না বলিয়াই যেন, সর্বলোকপরিজ্ঞাত অস্ত্র ব্যুৎপত্তিও উল্লিখিত হইয়াছে। পুত্রশব্দের এই ব্যুৎপত্তি মহাকবির স্বকপোলকল্পিত নহে। এই ব্যুৎপত্তি তৃত্বশ্রোক্ত “মহুসংহিতাতে”ও উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানে চতুর্থচরণ অন্তর্ভুক্ত; এবং এই ব্যুৎপত্তির মূল কি, তাহাও অস্পষ্ট! রামায়ণে তাহা অস্পষ্ট নহে। কবিশুদ্ধ স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—গরনামক অশ্বরের এই ব্যুৎপত্তি প্রচার করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

“অরতে ধীমতা তাত! অতির্গাতা যশস্বিনা।

গরেন বজমানেন গরেষেব পিতৃন্ প্রতি ॥”

পিতৃলোকের উদ্দেশে গরাস্বরের বাহা পান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া বাইত,

কালে তাহাই পুত্রশব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। বান্দ্যাকি ইহাকে প্রচলিত বা আর্ধ্যসমাজসম্মত ব্যাখ্যা বলিয়া বর্ণনা করেন নাই; বরং বুঝিবার অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রচলিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। “মহুসংহিতায়” পুরাতন ব্যাখ্যাও উল্লিখিত আছে—

“পুত্রো লোকান্ জয়তি ॥”

ইহা যে বৈদিকযুগের প্রচলিত ব্যুৎপত্তিকেই স্থচিত করিতেছে, তাহাতে সংশয় নাই। বৈদিক ব্যুৎপত্তি অল্পসারে, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের কার্যের আরম্ভ। জন্মমাজে পুত্র কোনই উপকার সাধন করিতে পারে না! গরাস্বরের ব্যুৎপত্তি অল্পসারে, জন্মমাজেই পুত্র পিতাকে পরিজ্ঞাপ করিয়া থাকে। “মহুসংহিতায়” সুবিধাত টীকাকার মেধাতিথি “পুত্রো লোকান্ জয়তি” এই বচনের ব্যাখ্যার উভয় ব্যুৎপত্তির সমুদয়সাধনের আশার লিখিয়া গিয়াছেন,—

“পুত্রো জাতেন, তৎকৃতেন উপকারেণ ॥” *

পুত্রের জন্মদ্বারা লোক জিত হয় না; পুত্রকৃত উপকারের দ্বারাই লোকজয় সুসম্পন্ন হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণের টীকাকার আধুনিক ব্যক্তি হইয়াও, পুত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিব্যাখ্যায় গরাস্বরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন,—“পুণ্ডরাদি” নিপাতনের নিয়মে পিতৃশব্দ হইতেই পুত্রশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে! † উপাধিকারগণ আবার

* কুরুকৃত অনেকস্থলে মেধাতিথির ব্যাখ্যাকে চাচুরীমাত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও পুত্রশব্দের টীকা করেন নাই।

† “পিতৃন্ পাতি” ইত্যর্থে পুত্রত্ব “পুণ্ডরাদিহাৎ” সাধুত্ব। তিলকটীকা।

আর একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—যে পবিত্র করে, তাহারই নাম পুত্র, এই অর্থে পুত্রাত্ম হইতে পুত্রশব্দ উৎপন্ন হইরাছে।

“পুত্রো হুত্বঃ।”

এই সকল বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি বিভিন্ন যুগের আধ্যাত্মিকতার পুত্রবিস্ময়ক বিভিন্ন মত ও বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তন্মধ্যে পূরণার্থক পুত্রাত্ম হইতে পুত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিব্যাখ্যার পুরাতন মতই বেদবাক্যসম্মত। রামায়ণের রচনাকালেও এই মত প্রচলিত ছিল;—কিন্তু একালের সুবৃহৎ অভিধানেও তাহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। “শব্দকল্পদ্রুমে” বা “বিশ্বকোষে” পুত্রশব্দের ব্যাখ্যার আড়ম্বরের অভাব নাই; কিন্তু যে ব্যাখ্যাটি বেদবাক্যসম্মত, শব্দরচাচার্য্যধৃত, পুরাতন সাহিত্যে ব্যবহৃত, এবং অনাস্থ্য ব্যক্তির পুত্রনামগ্রহণের

রহস্তোদ্ধারে সুসমর্থ,—তাহার কথা উল্লিখিত হয় নাই।

গয়াম্বরের ব্যুৎপত্তিকে পুত্রশব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি বলিয়া স্বীকার করিলে, পুত্রশব্দের বর্ণবিভাগে তকারঘরের প্রয়োজন হয়। পুরাতন ব্যুৎপত্তি অনুসারে তকারঘরের প্রয়োজন অলঙ্ঘনীয় নহে। পুরাকালে পুত্রশব্দের বিরূপ বর্ণবিভাগ প্রচলিত ছিল, তাহার তথ্যমুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেও দেখিতে পাওয়া যায়,—পাণিনিযুগে তকারঘরের প্রয়োজন অলঙ্ঘনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল না। ইহার বিচার জটিল হইবে বলিয়া, এস্থলে উল্লিখিত হইল না। বিশেষজ্ঞগণ এখনও পুত্রশব্দের বর্ণবিভাগে তকারঘরের ব্যবহার করেন না কেন, তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেও, পুত্রশব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি পুনরায় লোকসমাজে সুপরিচিত হইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

আর্ট কাহাকে বলে ?

কশমীর সাহিত্যিক টলস্টয়ের what is art ? আর্ট কি, একটা প্রশ্নক পুস্তক। টলস্টয় বলিতেছেন, আর্টের খাতিরে ইউরোপের সহস্র সহস্র লোক খাটিয়া মরিতেছে, তাহাদের কোন আনন্দ নাই, তৃপ্তি নাই, হাপাধান্য, ধিরেটায় সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি নষ্ট করি-

তেছে। এ আর্ট ব্যাপারটা কি, এবং মানুষের পক্ষে ইহা এমন কি প্রয়োজনীয়, দেখা বাক্য।

আর্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ান বড় সহজ নয়। বস্তুত আর্টকে বাদ দিলে ইউরোপীয় ধনী ও বিলাসী সম্প্রদায়ের কিছুই থাকে না। তাহাদের আমোদ ভোগাইবার জন্ত অসংখ্য

লোকের এই দৃষ্টি পরিশ্রম এবং তাহারিও সাধামত এই অগ্নিতে অর্ধের ইন্ধন দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না।

এই আর্টটা কি, ইউরোপীয় নানা পণ্ডিত নানা উপায়ে বলিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। একটা বড় কথা হচে সৌন্দর্য্য, যাহা সকলেরই মুখে মুখে ফিরে। সৌন্দর্য্য বাহ্যতে আছে, তাহাই আর্ট। সৌন্দর্য্য মানে কেবল চক্ষুকে বাহ্য তৃপ্ত করে, তাহাই নয়,—তাহার অনেক আধ্যাত্মিক বাখ্যা হইয়া গেছে। কেহ বলেন, সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সম্পর্ক;—বাহ্য ভাল নয়, তাহা স্নন্দর নয়; কেহ বলেন, সৌন্দর্য্যটা রস্তুত বাহিরের নয়, বাহিরে তাহার প্রকাশ মাত্র,—সৌন্দর্য্য হচে আত্মার; কেহ বলেন, ভালমন্দ কিছু নয়,—সৌন্দর্য্য হচে বাহ্য চিত্তকে আনন্দ দেয়, সে আনন্দের সঙ্গে প্রয়োজনের কোন সম্বন্ধ নাই। এইপ্রকার নানা মূর্খির নানা মত আছে, তাহা জানিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই। কিন্তু একটা কথা বেশ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে যে, ইউরোপীয় আর্ট-সমালোচক আর্ট বলিতে বুঝেন—সৌন্দর্য্যকে বাহ্য প্রতিভাত্ব করে এবং সৌন্দর্য্যের অর্থ তাঁহাদের অভিধানে বাহ্য খুঁসি করে, আনন্দ দেয় বই আর কিছুই লেখে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আর্টের গোড়ার এক মানে লিখিয়া, শাস্ত্র তৈরি করিয়া পরে যেমন খুঁসি তেমন জিনিষকে আর্টের দোহাই দিয়া তাঁহারিা চালাইতেছেন।

মানুষের খাণ্ডসম্বন্ধে কেহ যদি বলে যে, খাণ্ড রসনাকে তৃপ্ত করে বলিয়াই মানুষ খায়, তবে সে যেমন হয়, তেমনি আর্টসম্বন্ধেও

তুখু আনন্দ দেয় বলিয়া আর্ট সৃষ্ট হইতেছে বলিলে আর্টের মানে এবং প্রয়োজনীয়তাই বুঝা যাইবে না। এই যে একটা প্রকাশ চেষ্টা মানুষের, ইহা কেন মানুষের অন্তরে এমন প্রবল এবং ইহার ফলাফলই বা কি জানিতে হইবে—খুঁসি বলিলে কোন কথাটা বলা হয় না।

মানুষে মানুষে মিলিবার একটা পথ হচে আর্ট। কথার দ্বারা যেমন আমরা আমাদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা জানাই এবং অন্য মানুষের মনের সঙ্গে সেই প্রকাশের সূত্রে আমাদের যোগ হয়, আর্টের দ্বারা তেমনি আমরা আমাদের অশুভূতিকে অন্তের অন্তরে উদ্বেষিত করি। এই একজনের অশুভূতি অন্তের মধ্যে সংক্রামিত হইবার উপায় আর্ট ছাড়া দ্বিতীয় কোন জিনিষের দ্বারা হইতে পারে না।

বরাবর মানুষ নিজের অন্তরের অশুভূতিকে নানারূপ প্রকাশের দ্বারা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছে। ছবি, গান, মৃতি, কবিতা, কত উপায় যে তাহাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু সকলপ্রকার প্রকাশচেষ্টাকেই কি আমরা আর্ট নাম দিই? কাপড়চোপড় ষটিবাটি শু এক হিসাবে আর্ট বটে, কিন্তু তাহার কথা হইতেছে না। মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় বড় অশুভূতির প্রকাশকেই আর্ট নাম দিয়া থাকি,—সেই আর্টের সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে।

মানুষের হৃদয়ের মধ্যে মানুষের হৃদয়ের প্রবেশের দ্বারই যদি আর্ট হয়, তবে ইহা যে কত বড়, একটুখানি চিন্তা করিলেই বুঝা

যাইবে। বস্তুত আর্টকে বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। মানুষ ক্রমাগত নিজের অল্প-ভূতিকে নানাপ্রকারে প্রকাশ করিবে, মানুষের নিকট চিরদিন সে প্রকাশ আছে এবং থাকিবেও। • •

এই পর্য্যন্ত টলস্টয় যে সংজ্ঞা আর্টের দিলেন, তাহা বোঝা গেল। কিন্তু এইটুকু বলা শেষ করিয়াই তিনি আর্টের এক গণ্ডী টানিতেছেন—সে হচ্ছে ভালমন্দের গণ্ডী, ধর্মের গণ্ডী; বলিতেছেন যে, আর্টকে দেই মাপকাঠিতে তৈরি করিতে হইবে ও বিচার করিতে হইবে।

তিনি বলিতেছেন যে, মানুষ জীবনের অর্থ ক্রমেই বুঝিতেছে। মানুষের উন্নতির মানের তাই যে, ক্রমে জীবনের অর্থ মানুষের কাছে স্ফুটতর, সম্পূর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। মানুষের মধ্যে সর্বদাই এমন-সকল লোক জন্মগ্রহণ করেন দেখা যায়, তাহাদের নিকট মানবজীবনের অর্থটা অজ্ঞাত মানুষের চেয়ে আরও খোলসা হইয়া দেখা দিয়াছে। এই জীবনের অর্থ লইয়াই জগতে নানা ধর্মের উৎপত্তি—কালে কালে এই অর্থকে মানব-গুরুগণ গভীরতর, ব্যাপকতর করিয়া বুঝিয়াছেন। সমস্ত মানুষও ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং এই ধর্ম দিয়াই বিচার করা যাইতে পারে—কোন ভাবটা ভাল, কোন ভাবটা মন্দ। যে সকল অল্পভূতি এই ধর্মভাবের সঙ্গে খাপ খায়, মাড়র তাহাকে আপনার করিয়া লয় এবং ভাল বলিয়া বিবেচনা করে; যে সকল অল্পভূতি খাপ খায় না, মানুষ তাহাকেই মন্দ বলে এবং পরিহার করে।

ইহুদীগণ এক দৈবরে বিশ্বাস করিত, দৈবরের আদেশ বলিয়া যাহা মানিত, তাহাকেই সম্বাদ রক্ষা করা ছিল তাহাদের ধর্ম। সুতরাং এই ধর্মভাবের অল্পভূতির দরুণ তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইল যে আর্ট, তাহা তাহাদের পক্ষে অপর সকল আর্ট অপেক্ষা বড় হইল। Psalms, Book of genesis প্রভৃতি হইল একমাত্র শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। গ্রীকেরা জীবনের অর্থ অল্পরূপে বুঝিয়াছিল। পার্শ্বীয় লুথেরাচ্ছন্দ্যাকেই তাহারা বড় করিয়াছিল, সুতরাং সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য, বল, জীবনের ক্ষুধা ও সম্ভোগ তাহাদের আর্টে স্থান পাইল—কুৎসিত রূপ, হীনবীর্যের ভাব কাছেও বেঁধিতে পাইল না। এইরূপে-যে-কোন জাতিকে দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, তাহাদের জীবনের আদর্শের অল্পকূল যে আর্ট, তাহাকেই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিকূল কোন আর্টকেই স্বীকার করে নাই, পরিহার করিয়াছে।

প্রতি যুগে, প্রতি সমাজেই এইপ্রকারের একটা ভালমন্দের ধারণা, একটা ধর্মভাব আছে, এবং এই ভাবটি থাকার জন্য আর্টের ভালমন্দও বিচার করা চলে।

খৃষ্টধর্ম প্রথমে শুধু খৃষ্টকে লইয়াই ব্যতি-বাস্ত ছিল, তজ্জন্ত খৃষ্টের নামগন্ধ বাহাতে নাই, এমন সমস্ত আর্টকে সে অবজ্ঞাই করিয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টধর্ম যে মুহূর্ত্তে গির্জার ধর্ম (church-religion) হইল, তখনই বীণ-মাতা, দেবদূত, পরী, সাধু, পীর প্রভৃতি কত-কি যে তাহার মধ্যে ছহ করিয়া স্থান পাইল এবং কত মূর্ত্তিই যে পূজা পাইতে লাগিল, তাহার সীমা নাই।

খৃষ্টের শিক্ষার সহিত ইহার মিল থাক বা নাই থাক, এই আর্ট তখনকার সমাজের উপযোগী ছিল—সমস্ত মানুষের অমুভূতিরই ইহা প্রকাশমাত্র ছিল—কারণ সকলেই এই সমস্ত মূর্তি ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাস করিত, ইহা তখনও বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের হইয়া পড়ে নাই ।

কিন্তু অমুভূতের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে পোপে ও প্রচলিত ধর্মে ধনী ও উচ্চ সম্প্রদায়ের ক্রমে অনাস্থা জন্মিল, খৃষ্টের শিক্ষার সঙ্গে চর্চের শিক্ষার বিরোধ স্পষ্টই সকলের চোখে ফুটিল ।

যদিও লুথর . (Luther), ক্যালভিন (Calvin), উইক্লিফ (Wycliffe) প্রভৃতি কোন কোন মনীষী খৃষ্টের বথার্থ উপদেশ গ্রহণ করিয়া চর্চের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় তাহা করিলেন না, করাও কোনমতেই সম্ভবপর ছিল না । সকলেই কিছু সত্যকে বথাবথ দেখিতে পার না এবং দেখিতে পাইলেও গ্রহণ করা আরও শক্ত হইয়া দাঁড়ায় । সুতরাং তাহারা কোন ধর্মেই রহিলেন না ।

তার পর ইউরোপীয় রেনেসাঁস (Renaissance) যে আগিল, যখন নাকি আর্ট ও বিজ্ঞান তাহার চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, —তাহার মূলমন্ত্র হইল ধর্ম বলিয়া কোন জিনিষ নাই, তাহাকে অস্বীকার করাও অনাস্থাসেই চলে । জীবনের অর্থ দাঁড়াইল আমোদপ্রমোদ, সুখসন্তোষ করা । সুতরাং সৌন্দর্য্যচর্চা অর্থাৎ বথেকাচার ধর্মের স্থান অধিকার করিল । গ্রীকদের টানিয়া-আনিয়া সৌন্দর্য্যচর্চার পাণ্ডাগণ বলিলেন

যে, ইহাও তাহাদের নবাবিষ্কার নয়, বহুপূর্ব হইতেই ইহা আছে,—গ্রীকদের মধ্যেও ইহা ছিল । গ্রীকদের মধ্যে নৈতিক আদর্শটা আসলেই উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই, তাহারা সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মনের একটা আব-ছায়া-সম্পর্ক পাতাইয়াছিল, সেই আগাগোড়া গোলমালে ব্যাপারের উপর দাঁড়াইল বর্তমান যুগের Aesthetics—সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ।

আর্ট যে মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝি—লোকে যখন ভারতবর্ষীয়, চীন-দেশীয়, গ্রীক, ইহুদী, কি মিশরের আর্ট বলে, তখন বুঝি যে, সে দেশের সব চেয়ে বড় অমুভূতি যেগুলি, সেইগুলিকে আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত আর্ট আগিয়াছে,—কিন্তু মানুষের সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই, সমস্ত মানুষ বাহার জন্ত খাটিয়া মরিবে, অথচ তাহার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইবে, একটি সম্প্রদায়বিশেষেই যাহা আবদ্ধ, ইহা কোন্ আর্ট ? কিন্তু ইহাকেই একমাত্র খাটি আর্ট বলা হইতেছে ।

যে সমস্ত ক্রীতদাস দিন হইতে দিন, রাজিরও অধিকাংশ সময় বিনিম্র হইয়া—এই আর্টের আমোদ জোগাইবার জন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, ইহার রসাস্বাদনে বাহার বঞ্চিত, তাহাদের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দাও, দেখি তোমাদের চাক্চিক্যময় আর্ট দাঁড়ায় কোথায় !

এইখানে কথা উঠিবে যে, আর্ট বুঝিতে গেলে যতটা শিক্ষা দরকার করে, তাহা ইহাদের নাই, সে শিক্ষা হইলে ইহার আশ্রয়ই বুঝিতে পারিবে । সকল আর্টেই দেখা গিয়াছে, প্রথমে লোকে বুঝিয়া উঠে নাই, পরে বুঝিয়াছে ।

কিন্তু কথা হচ্ছে যে, এই বর্তমান আর্টের প্রকৃতি এতই বিভিন্ন,—সমস্ত মানুষ্য প্রকৃতি হইতে এতই স্বদূরে যে, ইহাকে বুঝিয়া উঠাই প্রথমতঃ সাধা । যে সকল অমুভূতিকে এই আর্ট ক্রমাগত প্রকাশ দিবার চেষ্টা পাইতেছে,—যেমন স্বাদেশিকতা, জীপুরুষের প্রেম ইত্যাদি—সে সমস্ত অমুভূতি এমনিই অদূত যে, তাহা কখনই সর্বস্ত মানুষের হইতে পারে না । সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসিতেই হয় যে, এ আর্ট জীবন্ত ও সবল অমুভূতি হইতে উদ্ভূত নয়, এ আর্ট বিকৃত আর্ট ।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত বড় বড় অমুভূতি ধর্ম্মভাব অন্তরে সম্ভব থাকিলেই যেগুলি সম্ভবপর হয়, বাহ্য এক কালে সমস্ত মানুষকে আনন্দ দিত, বণ দিত, স্বাস্থ্য দিত, —তাহা আজকাল ধর্ম্মভাবে অবিস্মারের জন্ত উচ্চসম্প্রদায় একেবারে হারা হইয়াছে । হারাণের দরুন আর্ট বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সুস্থতার লক্ষণমাত্র নাই । এই বিকারের কতগুলি লক্ষণ দেখা দিয়াছে, যথা—আর্টের বিষয়ের লঘুত্ব, জটিলতা, অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা প্রভৃতি ।

আর্টের বিষয় যে হাল্কা হইয়া পড়িতেছে, তাহার কারণ হচ্ছে সরস অমুভূতির অভাব । যদি আমোদই একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়, তবে তাহার রসম জোগান শক্ত ব্যাপার । একই জিনিষকে খাঁটাইলে তাহা ক্রমেই দুর্বল ও নিম্নজীব হইয়া পড়িবে । কিন্তু সরস অমুভূতি ধর্ম্মভাব হইতে আইসে । ধর্ম্মভাব বাহার মধ্যে যত পরিষ্কৃত, যত ব্যাপক, যত গভীর হইতেছে, জীবনের মধ্যে

ততই সে প্রবেশ করিতেছে, তাহার প্রসার বাড়িয়া যাইতেছে, অনমুভূত অমুভূতি তাহার অন্তরে জাগিতেছে । এ অমুভূতির বস্তুত শেষ নাই, কারণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ, একেত্রে মানুষ তাহা যে প্রতি মুহূর্ত্তেই নবীন করিয়া উপলব্ধি করিতেছে । বর্তমান আর্টের দলের লোকেরা বলেন যে, ইহাদের বিষয়ের অন্ত নাই, বাহির হইতে মনেও তাহাই হয় নাটে, কিন্তু আমোদ ত আর অসীম হইতে পারে না । তিনটিমাত্র অমুভূতির বিষয় ইহাদের আছে দেখিতে পাওয়া যায়, এক—আভিজাত্যের গর্ব্ব, দ্বিতীয়—কামপ্রবৃত্তি, তৃতীয়—একটা শূন্ততা ও অবসাদের ভাব । এই কামপ্রবৃত্তির ইন্ধন ইহাদের আর্ট নিত্য নূতন জোগাইতেছে—নভেলে, নাটকে, জীলোকের নয়মূর্তির চিত্রে ও নানা প্রকার শ্রীলতাবজ্রিত ছবিতে ও গানে ।

জটিলতার কারণও এই সাম্প্রদায়িকতার জন্ত । যত বড়ই উঁচু কথা বলা থাকে না কেন, তাহার প্রকাশ স্বভাবতই এমনি হওয়া উচিত, বাহ্যতে বুঝিবার পক্ষে কোন বাধা না থাকে । একটা সোজামুজি খোলাখুলি প্রকাশ সমস্ত বড় আর্টেই দেখা যায় । কিন্তু এই সমস্ত আর্টিষ্ট ঘোঁয়াল-মেঘল করিয়াই বলিতে ভাগবাসেন, তাহার মধ্যে এমন সমস্ত কথার উল্লেখও মাঝে মাঝে করিয়া থাকেন,—বাহ্য তাঁহাদের দলের লোক ছাড়া আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই । দেখা যায় যে, সাদা কথা কে ঘুরাইয়া বলাই ইহাদের মতে আর্ট । আজকাল যে-কোন লেখকের কবিতা কিংবা গল্পরচনা

লইয়া বস না কেন, সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। ভারলেন, বদেলেন্নার আজকাল করাসীসদের মধ্যে সব চেয়ে বড় কবি, অথচ ইহাদের বলিবার কথা যে কি, তাহা বুঝা যায় না। একজন বলেন, নীতি কিছু না, সৌন্দর্য্যই সব। অপরটিও তাই। তিনি আবার ক্যাথলিক মূর্তি-উপাসক। ফ্রান্সের নমুনা ত এই। ইংলণ্ড, জার্মানী, সুইডেন, নরওয়ে, ইতালী, রুশিয়া, সমস্ত দেশেই এই ছদ্মশী—এবং এক কবিতায় নয়, ছবিতে, গানে, নাটকে, আর্টের সকল ক্ষেত্রেই।

তৃতীয় ব্যাপার হচ্ছে অমূল্যবোধ, পুনরাবৃত্তি, সর্বপ্রকার অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা। অমূল্যবোধ না আসিলেও জোর করিয়া যদি তাহাকে টানিয়া আনিতে হয়, তবে আর্টে কৃত্রিমতা জন্মে। অমূল্যবোধ নাই—পরের ধাব-করা অমূল্যবোধকে লইয়া ঘণিয়া-মাজিয়া রঙচঙ দিয়া চক্ষু ঝলসাইবার চেষ্টা হচ্ছে আজকালকার আর্টের আর একটা লক্ষণ। কতকগুলি কবিত্ব আছে (আমাদের দেশে যেমন মল্লপলন, বসন্ত, কোকিলের কুহ-কুহ), সেইগুলি লইয়া এবং একটা বর্ণনার মাত্রা অতিরিক্ত চড়াইয়া, খুনজখম একটা-কিছু দাঁড় করাইয়া আর্টিষ্টরা লোকের মনে বিলম্ব জন্মাইবার চেষ্টা করেন। একথা ভুলিয়া যান যে, অমূল্যবোধ যদি বাস্তবিক অন্তর হইতে না জাগে, তবে বাহিরের সাজসজ্জার রূপ কুটিয়া উঠিবে না, বরং ‘রূপের অভাবই প্রকাশ পাইবে। হ্যানিলে নাটকটি যেমন। একটি নিরপরাধা বালিকা তাহার মাতাল পিতার নিকটে নৃশংস ব্যবহার পাইতেছে, সেই উপলক্ষ্য

করিয়া নাটককার দর্শকের করুণা উদ্বেগ করিতে চান। ভাল, এমন করিয়া তাহার মুখ দিয়া কিংবা অন্ত কাহারও মুখ দিয়া তিনি হৃৎপ্রকাশ করান, বাহাতে সকলের হৃদয় করুণায় দ্রব হয়। তাহা নয়, ষ্টেজের আলো নিভাইয়া—মাতাল পিতা মেয়েটিকে মারিতেছে, তাহার চাপা কান্নার স্বর শ্রোতাদের কানে পৌছাইয়া দেবদূত পরী তাহাকে লইতে আসিতেছে—কত-কি কাণ্ড করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ করিবার চেষ্টা! এই যে Sensationalism—ইন্দ্রিয়ের উপর একটা অনাবশ্যক তাড়নাঘায়া চিত্তবিভ্রম জন্মান, ইহা উচ্চ আর্টের অঙ্গীভূত একেবারেই নয়, ইহা অভ্যাস। তাই তাক-লাগান হিসাবে কোন আর্ট যত বড়ই হোক না কেন, যদি সুত্র, মহৎ, বৃহৎ অমূল্যবোধ অন্তর মধ্যে সংক্রামিত করিতে সে আর্ট সক্ষম না হয়, তবে সে আটকে কিছুতেই বড় আর্ট বলা টলে না।

এই অমূল্যবোধের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, যে আর্টের ভাবটি যে ব্যক্তি গ্রহণ করুক, তাহার সহিত আর্টিষ্টের এমন মনের মিল হইয়া বাইবেই যে, গ্রহীতার মনে হইবে, বুঝি আর্টিষ্ট তাহার নিজের রচনা, আর কাহারও নয়। এই যে নিজের ব্যক্তিত্বকে একেবারে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলা, বিশ্বমানবের সঙ্গে নিজের একাত্মতাব অনুভব করা, ইহাতেই আর্টের শক্তি, এবং এই শক্তির অন্তই মানব-সমাজে আর্ট অত বড় স্থান পাইয়াছে। সুতরাং (আমি টলস্টয়ের শেষ কথায় আসিয়াছি) জ্ঞানের অভিব্যক্তিতে যেমন দেখা যায় যে, ভুলচুক এবং অনাবশ্যক জিনিষ বাদ পড়িয়া

ক্রমেই যোঁটাই আঁতুর্ক এবং যথার্থ জিনিষটুকুই পাড়াইয়া যায়, অহুত্বতির ক্ষেত্রেও অহুত্বতির বিষয় হইতে ঝড়তি-পড়তি কাটিয়া-গিয়া পরে জিনিষগুলিই ক্রমে টিকিয়া যায়।' তঁজ্ঞত পূর্বে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে যে সীমাবদ্ধ ধর্মভাব-টুকু ছিল, যাহা তাহাদের আর্টের ভালমন্দ-বিচারে সহায়তা করিত, তাঁবিষ্যতে সেই জাতিগত, সম্প্রদায়গত বা দেশগত সীমাটুকু টানিয়া রাখিলে চলিবে না, আর্টকে সমস্ত মানুষের করিতে হইবে। আজকাল জীবনের অর্থ হইবে—মানুষে মানুষে প্রীতির সম্বন্ধ, মঙ্গলসম্বন্ধ স্বীকার করা, মানুষের সুখদুঃখ নিজের বলিয়া ভাবা, মানুষ বলিয়া নিজেকে জানা।

অতএব এই অহুত্বতিকে যে আর্ট সব চেয়ে বেশী প্রকাশ দিতে পারিবে, সেই আর্টই হইবে আধুনিক আর্ট ; যাহা পারিবে না, তাহাকে বর্জন করিবার দ্বিম আসিয়াছে।

কোন অহুত্বতিতে মানুষ এক বলিয়া নিজেকে মনে করে, দেখিতে গেলেই চোখে পড়ে—দুটো জিনিষ। এক হুচে—আমাদের এক জঁখর, আমরা সকলেই তাঁহার সম্ভান,

এই ধারণা। দ্বিতীয় হুচে—সাধারণ জীবনের সুখদুঃখ, বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক জীবনের সুখদুঃখ নহে। এই আর্টের দৃষ্টান্তরূপে একপক্ষে Schillerএর Robbers, Victor Hugorএর Les Miserables, George Eliotএর Adam Bede প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, অন্যপক্ষে Moliere, Dickens প্রভৃতির লেখার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

জীপুরুষের প্রেমকে টল্‌স্টয়ের একপ্রকার আর্টের ক্ষেত্র হইতে বিদায় দিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। সে প্রেমে মানুষকে নাকি কলুষেই টানিয়া লয়, অতএব গোড়া ঘঁষিয়া তাহাকে উন্মূলিত করিয়া ফেলা হউক, নবীন আর্টের সহিত তাহার কোন সংস্রব না থাকুক।

টল্‌স্টয়ের আর্টসম্বন্ধে বক্তব্যবিষয় আমি সংক্ষেপে উপস্থিত করিলাম। পঞ্চদশ বর্ষের অধ্যবসায়ের ফলে নাকি পুস্তকখানি বাহির হইয়াছে। অল্প কথার তাহাকে সারিয়া দিয়াছি, জানি না, তুলচুকের হাত অতিক্রম করিয়াছি কি না। - বারান্তরে টল্‌স্টয়ের আর্টের মন্তব্যসম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে, দেখা যাইবে।

জী—

ত্রিবন্ধুর ও কোচিন ।

দাঁড়ীয়া সমস্ত রাত্রি অবিরাম তাগে-তাগে দাঁড় ফেলিয়াছে। এই কবোক্ষ রাত্রির অবসানে, নব-শতাব্দীর নবরক্তিম প্রথম সূর্য্য, একপ্রকার মৎস্তজীবী জগতের উপর সন্মুদিত হইল;—যে জগতের লোক শিকারে রত,—বাহারা এই অকলুষ তরুণ আলোকে আহাৰ্য্য-আহরণের প্রত্যাশায় চারিধারে বসিয়া আছে। বিশাল-বিত্তীর্ণ বিল; ছই ধারের তালজাতীর নিবিড় তরুপুঞ্জ তটের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে; অসংখ্য জেলে-নৌকা;—অনেক সময়ে আমাদের নৌকার গা বেঁধিয়া বাইতেছে—আমাদের পথরোধ করিতেছে। কোন নৌকা একস্থানে স্থির হইয়া আছে, আবার কোন নৌকা, যতদূর সম্ভব—নিঃশব্দে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লোক-জমা,—জাল, ছিপ, বল্লম হস্তে লইয়া, ভাসন্ত তক্তার উপর, সজাগ সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া আছে; জলের মধ্যে কোথাও কিছু নড়িলেই ব্যগ্রভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। পানিভেলা, বক এবং অস্ত্রাস্ত্র ছোট ছোট পাখীরাও জলের ধারে কাদার উপর বসিয়া অব্যবহের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে; এবং অনেক বর্ষির কাঁটার, প্রসারিত মৎস্তজালে, ত্রিমুখ শূল-অস্ত্রে, শত শত মৎস্তের মুখ আটকাইয়া রহিয়াছে। এই বিলটি—এই সব শীতলমাংস নিঃশব্দচারী

ক্ষুদ্রজীবের অকুরন্ত জলাধার। তাই, এত অসংখ্য মৎস্তভোজী এইখানে আকৃষ্ট হয় এবং মৎস্ত আহাৰ করিয়া প্রাণধারণ করে। নবোদিত শতাব্দী এ সমস্ত কিছুই পরিবর্তন করিতে পারিবে না,—এই ব্যাপার অনাদি-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

তটভূমি নিকটবর্তী হইলে দেখা যায়,—মহাপ্রভাবশালী নারিকেলপুঞ্জের নীচে, নিম্নশ্রেণী ইতর লোকদিগের বাস। এই দীনহীন মানবকুলের অস্তিত্ব বৃক্ষপুঞ্জের অস্তিত্বের উপর একান্ত নির্ভর করে। নারিকেলপুঞ্জের ডাঁটাগুলি একটা গুঁড়ি হইতে অস্ত্র গুঁড়িতে প্রসারিত হইয়া বেড়ার কাজ করিতেছে; মৎস্যের জাল, রসারসি—সমস্তই নারিকেল-ছোবড়ার প্রস্তুত।

এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বৃক্ষগুলি শুধু যে ছায়াদান করে,—কলদান করে,—তৈলদান করে,—তাহা নহে; বাহারা উহাদের হরিৎশ্রামল অনন্ত ছায়াতলে বাস করে, তাহাদের বাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই উহারা জোগাইয়া থাকে। •

রঙিন-রেশমের তলতলে গদির মত, চৌকোণা এক-এক টুকরা ধানের ক্ষেত যে ইতস্তত দেখা যায়—মনে হয়,—এ প্রদেশে সে সকল ক্ষেত না থাকিলেও চলে—খাতের কোন অভাব হয় না।

বিলটি ক্রমশই বিস্তৃত আকার ধারণ করিতেছে । এইবার একটু অল্পকূল বাতাস উঠিয়াছে । বাহুবয়ের সাহায্যার্থ,—মাল্লারা, ঠাণ্ডা উচ্চ একটা দন্দা একটা মাঙ্গলের উপর চড়াইয়া দিল ; নিরীহ ধরণের এই ক্ষুদ্র সমুদ্রটির উপর পাল ও দাঁড়যোগে আমাদের নৌকা 'আরো দ্রুত চলিতে লাগিল । বিলের দুই কূলে, বন ; এই বনরাজি দূর হইতে নীলাভ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । বায়ুধোণে, নৌকায় প্রসারিত পালটি ফুলিয়া উঠিয়াছে ; এই বায়ুর সাহায্য পাইয়া মাল্লারা নিজ বাহুবলগে অনেকটা কমাইয়া দিয়াছে এবং আর-এক ধরণের তান উঠাইয়া একপ্রকার ঘুমের গান মুখ বুজিয়া গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে । মনে হয়, যেন গির্জা-বড়ির সুর-সংবলিত ঘণ্টাধ্বনি দূর হইতে আসিতেছে—আর যেন, তাহা সুরার না ।

ফ্রান্সে, এ সময়ে প্রায় মধ্যরাত্রি ; এই সময়ে বিংশতি শতাব্দী প্রথম পদার্পণ করিয়াছে । এই নববর্ষের উৎসব আজ সেখানে অন্ধকারের মধ্যে, বরফের মধ্যে, পূর্ণ উপচারে অঙ্গীকৃত হইবে ।

বাতাস পড়িয়া গেল । মধ্যাহ্নের ততোচ্ছল নিশ্চলতা—অগ্নিকুণ্ডবৎ উচ্চতা । নারিকেলতরুশোভিত তটভূমিতে আমাদের নৌকা আসিয়া ভিড়িল । প্রাতঃকালের মাঝিমাল্লারা এইখানে বস্তু হইল,—অতীব নতভাবে উহার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল । নূতন মাল্লারা আর-একটু উচ্ছল-তীব্রবর্ণ ; উহাদের বহুল কৰ্মমালা,—কানবালা, পাত্রে নানাবিধ পৌরোহিতিক

নক্সা ধূসরবর্ণে অঙ্কিত । একেণে উহার ভৌষণ্যবেগে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল । বায়ু ভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে । উষ্ণবাস্পগর্ভ পরিম্লান আকাশমণ্ডল, বিস্তীর্ণ আবিল জলাশয়, সমস্ত জীব, সমস্ত পদার্থ,—অতিরিক্ত আলোকপ্রভাবে যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে । নেত্রাভিঘাতী অত্যাচ্ছল একটা শাদা-রঙের ব্যাপক প্রলেপে যেন সমস্তই একাকার । আবার এই সমস্ত একাকারের মধ্যে, নৌকার চতুর্পার্শ্বে, উচ্ছলকান্তি কাটা-হোলা হীরার টুকরাগুলির মত—জলবিন্দু উচ্ছ্বাসিত হইতেছে,—দাঁড়ের গা দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে ; এবং দাঁড়ীদের ও ললাট ও বক্ষ বাহিয়া স্বেদবিন্দু সান্দিত হইতেছে ।

প্রায় তিনঘণ্টিকার সময়, ত্রিভঙ্গুর হইতে—নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ক্ষুদ্র কোচিনরাজ্যে প্রবেশ করিলাম । কিন্তু, কি, জলরাশির উপর, কি তালীবনের মধ্যে—কোথাও কিছু রূপান্তর লক্ষিত হইল না । কেবল, দিব্যবসানে, বৃহৎ নদীর ত্রায় পরস্পর-দূরবর্তী দুই কূলে, নগরাদি দেখা বাইতে লাগিল ।

অপেক্ষাকৃত নিকটতর দক্ষিণকূলে রাজার রাজধানী—“এরাফুলম”—নগর । এইখানে রাজা বাস করেন । বিলের বরাবর ধারে-ধারে, প্যাগোদা-মন্দিরের ত্রায় চারিটা সীরীর খুঁটসম্প্রদায়ের গির্জা, একটা বৃহৎ দেবমন্দির, কতিপয় সৈন্ত-নিবাস, কতকগুলি পাঠশালা ;—এই সমস্ত, লালমাটির উপর অধিষ্ঠিত ও রক্তিমবর্ণ । একটি মহত্ব নাই । কিনারার

একখানি নৌকা নাই। এই সমস্ত প্রাণহীন নিশ্চল ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের পশ্চাতে বিষয়বিত্ত্বক ব্রাহ্মণদিগের আবাসগৃহগুলি অরণ্যের বিবাহ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া,—সর্বপ্রাসাদ তালজাতীয় তরুপুঞ্জের মধ্যে, কোপুঝাড়ের মধ্যে, নীলিম ছায়ার মধ্যে—ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আরো দূরে, জলাশয়ের অপর পারে, বাম কূলে,—জীবন-উদ্ভবের উদ্যম ক্ষুণ্ণি। প্রথমেই হিন্দু বণিকদিগের নগর—“মাতাকেরি”;—শত-শত ক্ষুদ্র গৃহ উত্তিজ্জামল ভূমির উপর অধিষ্ঠিত। একটি উপসাগর-স্রোত, মহাসমুদ্রের সহিত এই নগরীর যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। এই উপসাগরে অসংখ্য নৌকা নোঙর করিয়া আছে; এগুলি সেকলে-ধরণের নৌকা;—পাল ও অঙ্গুত মাঙ্গল বিশিষ্ট। এই নৌকাগুলি আরবসমুদ্রের উপর দিয়া ক্রমাগত বাতায়ানত করে, মস্তকের সহিত বাণিজ্য করে, পারস্য-উপসাগরের অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করে এবং বসোরা-নগরে মগলা-সামগ্রী ও শস্তাদি লইয়া যায়। তার পর, আরো দূরে—পোর্টুগী ও ওলন্দাজদিগের পুরাতন কোচিন। এখন ইহা অস্ত্র প্রভুদের হস্তে। উহাদের একটা বন্দর আছে,—সেইখানে আধুনিক জাহাজ-গুলার ধোঁয়া-চোং হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি নিরন্তর উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

এই বিলের মাঝখানে,—ঐ পরম্পর-বিসম্পূর্ণ তিনটি নগরের সংগ্রহ হইতে দূরে,—একটি তরুসমাজের দ্বীপ আছে;—এখন সেই দ্বীপের অভিবুখে আমার নৌকা

চলিতে লাগিল। হরিৎ-স্তাম্বল উত্তিজ্জ-রাশির মধ্যে নিমজ্জিত কুণ্ডকগুলি শাদা-শাদা সোপানপংক্তি, একটা শাদা ঘাট, একটি শাদা রঙের পুরাতন প্রাসাদ। আমি যে রাজার অতিথি, সেই রাজার আদেশক্রমে বোধ হয় ঐখানেই আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। উহার ঘেরূপ জীর্ণ ও “পোড়ো” অবস্থা, তাহাতে মনে হয়, ঐ সকল শাফল-ভূমির উপর, ঐ সকল শাখাপন্নবের মধ্যে—কোন নিয়ামত্যা ঔপত্যাসিক রূপসী বাস করে। সন্ধ্যা নিকটবর্তী হওয়ার, এই বিজন দ্বীপটি আরো বিষন্ন আকার ধারণ করিল।

কিলোন-নগরীর জায়, এখানেও শুভ্র-বসনধারী ভারতীয় ভূতাপণ আমাকে একটি গোলাপের তোড়া দিবার জন্ত, শাদা সিঁড়ির উপর দৌড়িয়া-আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি এখন, একটি স্তম্ভের পুরাতন উদ্ভানের মধ্য দিয়া চলিতেছি;—সেকলে-ধরণের সোজা-সোজা রাস্তা; ধারে-ধারে জুঁইগাছ, গোলাপগাছ।

এই দ্বীপের মধ্যে একটিমাত্র বাড়ী, আর সেই বাড়ীর মধ্যে আমি একা। যে শতাব্দীতে, কোচিনরাজ্য ওলন্দাজদিগের অধিকারে ছিল, তখন এই বাড়ীটিতে ওলন্দাজ শাসনকর্তা বাস করিতেন। ইহা দুর্গের জায় পিতাকৃতি; এবং ইহার অলিন্দ, বারান্দা—স্তম্ভের মসজিদ-ধরণের খিলানে বিভূষিত। অভ্যন্তরে, সেকালের শুভময়ী বিলাসিতা। চুমকাক-করা প্রকাণ্ড বড় বড় ঘর;—তাহাতে প্রাচীনকালের মাহুর বিহানো;—এপ্রকার স্তম্ভধরণের মাহুর আজকাল আর দেখা যায় না।

পুরাতন সুহৃৎ কাঠ-কাঠরার কাজ ;
অতি পুরাতন যুরোপীয় আদর্শে নির্মিত
খোদাই-কাজ-করা ঘরের আসবাব ;
দেয়ালে অল-রঙের ছবি ;—এই ছবিগুলো
সপ্তদশ-শতাব্দীর আমষ্টার্ডামের চিত্রকলার
নমুনা । কি রাজ্যে, কি দিনে,—দর্জাগুলো
কখনই বন্ধ করা হয় না । এই প্রত্যেক
দর্জার সম্মুখে এক-একটা দাঁড়ানো-পর্দা ;—
তাহাতে স্নান-মনোহর পীতবর্ণ রেশমের
কাপড় টানা ।

ভৃত্যরা আমাকে জানাইল,—আমি
যে রাজার অতিথি, তাঁহার সহিত আমার
সাক্ষাৎ হইবে না ; কেন না, তাঁহার অশৌচ
—এখন তিনি শ্রাদ্ধশাস্তি করিতেছেন ।
কোচিনরাজ্যের অন্নবরুণ যুবরাজ—নিতান্ত
শিশু—সম্প্রতি স্বকীয় কৃকবর্ণ কুহুমনেত্র
চিরতরে নিম্নলিখিত করিয়াছেন ; তাই,
প্রাসাদের সমস্ত লোক এখন শোকমগ্ন ।

এই রাজকীয় বিজনতার মধ্যে না
আসিয়া, মাতাকেরি-নগরে অবস্থিতি করিলে
আমার পক্ষে ভাল হইত । সেখানে একটা
কুজ পাহনিবাসে থাকিলেও, আজ আমি

সান্নাঙ্কে, তত্ততা জনতার মধ্যে মিশিয়া,
তাহাদের প্রকৃত জীবন প্রত্যক্ষ করিতে
পারিতাম !...এখানে ও জীবকুরে—আমি
ভারতবর্ষে থাকিয়াও যেন নাই । বিশিষ্ট-
দর্শন নিঃশব্দচারী ভৃত্যেরা, মার্জারবৎ-
পদসঞ্চারে, খাঁজ-কাটা-খিলান-বিলম্বিত
সমস্ত দীপগুলি জালিয়া দিল । নুতন-ধরণে
পুষ্পপন্নবে সুসজ্জিত টেবিলের ধারে বসিয়া
আমার “কেয়েদির ভোজ” শেষ হইলে, পর,
—মবশতাকীর প্রথম সন্ধ্যার অভ্যাস
দেখিবার জন্য আমি উজানের মধ্যে প্রবেশ
করিলাম । যেখানে নির্বাপিতপ্রায় অল্প
অঙ্গারের রং এখনো পর্য্যন্ত রহিয়াছে—
সেই পশ্চিম দিগন্তপটের উপর, এই দীপ-
তরুগুলি, ঘোর-কৃকবর্ণ কত-কি হ্রস্বোদ্য
চিত্রাঙ্কর অঙ্কিত করিতেছে । এখনো,
উজানবীথির উর্দ্ধদেশে—উত্তপ্ত নভস্তলে, সেই
সন্ধ্যার জীব—পেচক ও বৃহৎ-জাতীয় বাহুড়
বিচিত্র চক্রগতিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে ।

তাহার পর, সমস্ত আকাশে, মিটমিট
করিয়া তারা জলিতে লাগিল—সহস্রা
রাজি আসিয়া পড়িল ।

ত্রিভোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

আগমন ।

তখন রাজি আঁধার হ'ল

সাজ হ'ল কাজ—

আমরা মনে ভেবেছিলাম

আসবে না কেউ আজ । .

মোদের গ্রামে ছরার বত
 রুদ্ধ হ'ল রাতের মত,
 হুয়েক জনে বলেছিল
 “আসবে মহারাজ !”

আমরা হেসে বলেছিলাম
 “আসবে না কেউ আজ !”

ঘারে ঘেন আঘাত হ'ল
 শুনেছিলাম সবে,
 আমরা তখন বলেছিলাম
 বাতাস বুঝি হবে !
 নিবিরে প্রদীপ ঘরে ঘরে
 শুয়েছিলাম আলসতরে,
 হুয়েক জনে বলেছিল
 “দুত এল বা তবে !”

আমরা হেসে বলেছিলাম
 “বাতাস বুঝি হবে !”

নিশীথরাতে শোনা গেল
 কিসের ঘেন ধ্বনি।
 ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলাম
 মেঘের গরজনি ।
 “কণে কণে চেতন করি’
 কাপ্ল ধরা ধরহরি,
 হুয়েক জনে বলেছিল
 “চাকার ঝনঝনি ।”

ঘুমের ঘোরে কহি মোরা
 “মেঘের গরজনি ।”

তখনো রাত আঁধার আছে,
 বেজে উঠল ডেরী,
 কে হুকারে—“জাগ সবাই,
 আর কোন্না না ঘেরি !

বন্ধ'পরে ছু'হাত চেপে
আমরা ভরে উঠি কোঁপে,
হুয়েক জনে কহে কানে—

“রাজার ধ্বজা হেরি !”

আমরা জেগে উঠে বলি

“আর তবে নয় দেরি !”

কোথাক আলো, কোথায় মাল্য,

কোথায় আরোজন !

রাজা আমার দেশে এল

কোথায় সিংহাসন !

হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,

কোথায় সভা কোথায় সজ্জা !

হুয়েক জনে কহে কানে—

“বৃথা এ ক্রন্দন—

রিতকরে শূন্যঘরে

কর অত্যাধন !

ওরে হুয়ার খুলে দেয়ে --

বাজা শব্দ বাজা !

গভীর রাতে এসেছে আজ

আধার ঘরের রাজা !

বল ডাকে শূন্যতলে,

বিছ্যভেরি ঝিলিক্ ঝলে,

ছিন্নশরন টেনে এনে

আঙিনা ভোর সাজা !

ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো

হুঃখরাতের রাজা !

রাজা ও প্রজা ।



ইংরেজ অনেকসময় বলিয়া থাকে যে, তরবারির সাহায্যেই ভারতে তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তরবারির সাহায্যেই ভারতকে চিরদিন পদানত রাখিতে হইবে ।

কথাটা সত্য হইলেও সাধু হইত না । বলপূর্ব্বক তুমি একদিন আমাকে তোমার পদানত করিতে পারিয়াছিলে বলিয়া, চিরদিনই যে আমাকে তোমার পদলগ্ন করিয়া রাখিবার একটা ধর্ম্মাভিগত বা স্বাভাবিক মূলত দাবি জন্মিল, তাহা নহে । আমা অপেক্ষা প্রবল বলিয়া তুমি আমাকে পদদলিত করিতে পার, কিন্তু তাহাতে আমার অসারতা প্রতিপন্ন হইলেও তোমার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না ।

কথাটা কিন্তু আদোপেই সত্যও নহে । ইংরেজ আপনাদের সন্তানের সাহায্যে বিশাল ভারতভূমে এই একচ্ছত্র রাজত্ব লাভ করে নাই, প্রধানত ও মূলত ভারতবাসীর তরবারির সাহায্যেই তাহার এই অপরিদ্রাও সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আর আজও ভারতের নিশ্চেষ্ট ও নির্বীৰ্য্য প্রকৃতিপুঞ্জের নীরব আত্মকুল্যেই সে আপনার এই অনন্ত-প্রতিষন্দী অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছে ।

প্রজার এই আত্মকুল্যের উপরে সর্ব্বত্রই রাজসিংহাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করিয়া থাকে । কারণ রাজা কুজাপি শুদ্ধ আপনার

প্রহরি-পাহারার বলে রাজ্যশাসন করিতে পারে না । জনমণ্ডলীর স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ শক্তিরশিই প্রচ্ছন্নভাবে রাজশক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া, এই সকল সামান্য প্রহরি-পাহারাকে শক্তিশালী করিয়া তোলে । এইরূপে সর্ব্বত্রই জনগণ আপনাদিগের স্বাভাবিক শক্তিকে সংহত করিয়া রাজ-আধারে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাহার সাহায্যে আপনাদিগের শাসনসংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া লয় ।

ভারতে ইংরেজ-প্রভুশক্তিও এই সার্বভৌমিক বিধানের বশবর্তী হইয়া এদেশের প্রজাশক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আমাদের শক্তিতেই শক্তিশালী হইয়া ইংরেজ এই সুবিশাল ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিতেছে । অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ইংরেজ সকল সময়ে ইহা ভাবে না, যোরতন-মোহাচ্ছন্ন হইয়া আমরাও ইহা দেখি না,— ইহাই তাহার ঘনঘন চূর্ণান্তির ও আমাদের নিরবচ্ছিন্ন চূর্ণান্তির একমাত্র সুখ্য-কারণ ।

উপনিষদে এরূপ গল্প আছে যে, একদা অহুরসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া দেবতার অত্যন্ত অতিমানী ও আত্মবিশ্বস্ত হইয়া পড়েন, এবং “আমাদেরই এই মহিমা,” “আমরাই বিজয়ী হইরাছি” এইরূপ ভাবিতে আরম্ভ করেন । তখন সহসা দেবদত্তা-

সমীপে এক অদ্ভুতদর্শন পুরুষ প্রকাশিত হইলেন। দেবতার তাঁহার পরিচয় লইবার জন্য প্রথমত অগ্নিকে, পরে বরুণকে, পরে মরুৎকে প্রেরণ করেন। ইহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া 'সেই অদ্ভুতদর্শন পুরুষ ইহাদের সম্মুখে একথণ্ড তৃণ রাখিয়া, ইহাদের শক্তিপরীক্ষা করেন। অগ্নি আপনার সমুদয় শক্তিপ্রয়োগেও সেই তৃণখণ্ড দগ্ধ করিতে পারিলেন না, বরুণ তাহা ভাসাইতে পারিলেন না, মরুৎ তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে ক্রমে ইহারা পরাভব মানিয়া দেবতার ফিরিয়া আসিলে, দেবতার দেবরাজ ইন্দ্রকে এই বন্ধের পরিচয় লইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তখন সেই পুরুষ শূভে অভ্যহিত হইয়া গেলেন এবং সেই আকাশে ব্রহ্মবিভারপিণী উমা হৈমবতী প্রকাশিত হইয়া, 'ইনি যে সেই ব্রহ্ম, বাহার শক্তিতে দেবতার জয়ী হইয়াছেন', ইন্দ্রকে এই উপদেশ দান করিলেন।

ব্রহ্মের শক্তিতে অগ্নরসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া দেবতার আত্মবিশ্বত ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া যেমন "আমরাই বিজয়ী হইরাছি", "আমাদেরই এই মহিমা"—এইরূপ ভাবিতে-হিলেন, ভারতের শক্তিতে এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্য অধিকার করিয়া আত্মবিশ্বত ইংরেজ ও আজ সেইরূপই ভাবিতেছে। কিন্তু একবার যদি ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জ কিয়ৎ-পরিমাণে আত্মহ হইতে পারে এবং ভারতের এই প্রচুর প্রজাশক্তি যদি একবার কেন্দ্রীভূত, বনীভূত ও একত হইয়া দাঁড়ায়, সেই বন্ধের সমক্ষে ইংরেজ আপনার বিপুল জ্ঞান-

বিজ্ঞানের ও অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্রের সমপ্রশক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণাদপি লঘুতর তৃণখণ্ড পর্য্যন্ত বিচলিত বা বিদগ্ধ করিতে পারিবে না।

ইংরেজকে আপনার কল্যাণের জন্যই ইহা বুঝিতে হইবে যে, যেমন তাহার স্বদেশে, সেইরূপ জগতের সর্বত্রই প্রজাশক্তি হইতে রাজশক্তি উৎপন্ন হয়। 'প্রজার সম্পূর্ণ আত্মকুল্যাভ না করিলে রাজশক্তি' শুদ্ধ সৈন্তসামন্তের সাহায্যে কুজাপি আত্মরক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রজার আত্মকুল্যই রাজশক্তির মূলধার। সৈন্তসামন্ত এই আত্মকুল্যাভে রাজাকে সাহায্য করে মাত্র, কিন্তু এই আত্মকুল্য ব্যতীত তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। ইহাই রাজনীতির মূলমন্ত্র। জড়রাজ্যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে একান্ত অগ্রাহ্য করিয়া যেমন কোন জড়-বস্ত শূভে স্থিতি করিতে পারে না, রাজনীতিকক্ষে্রে সেইরূপ প্রকৃতিপুঞ্জের শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া ও তাহাদের আন্তরিক আত্মকুল্য বা প্রাতিকুল্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া কোন রাজশক্তি কুজাপি স্থায়ীকৃত করিতে পারে না। রাজা প্রজাকে ভরবিহ্বল করিয়া নিশেষে করিতে পারে, বিবিধ কুটিল কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহার জ্ঞানবীৰ্য্য হরণ করিয়া তাহাকে অসাড় পুত্তলিকার পরিণত করিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক, তাহার আত্মকুল্যাভ না করিলে কিছুতেই আপনার প্রভুশক্তিকে স্থির রাখিতে পারে না।

এমত্রে আসিয়া অবধি ইংরেজ ও বিবিধ

কারণে প্রকৃতিপুঞ্জের আত্মকুলাভ করিয়া আসিয়াছিল। দিল্লির সিংহাসন ভাঙিয়া পড়িলে দেশময় একটা প্রবল শক্তিসম্বল উপস্থিত হয়। সেই ভীষণ শক্তিসংঘর্ষের মধ্যে প্রকৃতিপুঞ্জের ধনপ্রাণ রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে এবং জনমণ্ডলী একটা দুর্ভিক্ষ-চাকলা ও আতঙ্কের মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করে। ইংরেজ নানা ছলে-বলে কোণসে দেশমধ্যে আপনার প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমে সে চাকলা ও সে আতঙ্ক নিবারণ করে এবং বহুলাষ্ট্র-বিপ্লববিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষে শান্তিস্থাপন করিয়া প্রথম হইতেই প্রজাবর্গের আন্তরিক আত্মকূল্য লাভ করিতে আরম্ভ করে। দেশীয় দুর্গতিবর্গের সঙ্গে নানা ছল খরিয়। পুসঃপুসঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, তখন হইতেই দেশীয় সিপাহীর সাহায্যে, আপনার অসাধারণ কুটিলবুদ্ধিবলে ইংরেজ এক অদ্ভুত ঐক্য-জালিক প্রস্তাপ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে বিষয়ে স্তম্ভিত ও ভয়ে অভিভূত করিয়া ফেলে, এবং এই অদ্ভুত মায়াপ্রভাবেও, অস্তিত্ব হইতে, ভারতের তরবিষয়বিসূচ প্রজাপুঞ্জের আত্মকুলাভ করে। এইরূপে প্রথম হইতেই ভারতের প্রজাসাধারণের নীরব আত্মকূল্যের উপরেই ইংরেজের প্রভুশক্তি এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

ইংরেজ তখনো মোহাজির হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় নাই; ভারতের প্রজামণ্ডলীও তখনো পর্য্যন্ত নিরস্ত ও নির্বীৰ্য্য হইয়া নূতন রাজপুত্রের অনিষ্টসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়ে নাই। ইংরেজ এইজন্য সেই সময়ে প্রজারাজনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিত।

আপনার স্বার্থ : সে আজও পারিলে ছাড়ে না, তখনো ছাড়িত না, কিন্তু প্রজার মন-স্তম্ভিতসম্পাদনের উপরেই যে তাহার সর্ববিধ স্বার্থসাধন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, এই জ্ঞান তখন তাহার অন্তরে নিরন্তর আগুরুক ছিল। এইজন্যই সে তখন সর্বদা প্রজাবর্গের সমক্ষে আপনার উদার কল্যাণনীতি প্রকট করিবার জন্য ব্যস্ত ছিল।

ইংরেজ-রাজনীতি তখন গতাস্যতাই অনেকটা উদার হইয়া উঠিয়াছিল। করাসী-বিপ্লব পাশ্চাত্যজগতের সমক্ষে যে এক উচ্চ, দিব্য, বিশ্বজনীন স্বাধীনতা ও কল্যাণের আদর্শ ধারণ করিয়াছিল, রণিকবৃত্ত ইংরেজও একেবারে তাহার প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে পারে নাই। অজ্ঞানে হটক সজ্ঞানে হটক, ইংরেজও সে উদার ভাব ও আদর্শ, অতি সামান্যমাত্রায় হইলেও, গ্রহণ করিয়াছিল। জনমণ্ডলীর স্বাধীনতাবিস্তার এবং বিশ্বমানবের সেবার জন্য ইংরেজের মনেও তখন একটা সাময়িক আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছিল। সুতরাং সে সময়ে ভারতে ইংরেজ-রাজনীতিও কিছুদিনের জন্য একটা উদার কল্যাণোচ্ছল বিশ্বপ্রেমের বেশ পরিধান করিয়া আমাদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই মোহিনী সূতি প্রকাশ করিয়াই ইংরেজ ভারতের প্রজামণ্ডলীর সরল চিত্ত হরণ করিয়াছিল। ইংরেজের রাজবিধি ও দণ্ডবিধি প্রাচীন ও চিরাগত বিবিধৈবধ্যম্পূর্ণ ভারতবর্ষে এক সর্বজনীন সামান্য প্রচার করিতে লাগিল। ইংরেজের ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে জমিদার-রায়, ধনি-নিধন,

ব্রাহ্মণ-শূত্র, সকলই সমান হইয়া গেল। এমন কি, প্রজাও রাজার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ আনিয়া জারিবিচার প্রার্থা হইবার অজ্ঞাতপূর্ব্ব অধিকার পাইয়া রাজাপ্রজার বিশাল ভেদ পর্য্যন্ত কিয়ৎপরিমাণে বিম্বিত হইতে লাগিল। এইরূপে একদিকে যেমন ইংরেজের দণ্ডপ্রতাপে, সেইরূপ অন্যদিকে তাহার এই উদার বিশ্বজনীন সত্য ও স্বাধীনতার আদর্শে অভিভূত হইয়া এদেশের নেতৃবর্গ ইংরেজকে বেছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনাদের নবোন্মেষিত জাতীয়জীবনের নেতৃত্বে বরণ করিয়া, পরিণামে জাতীয় স্বাধীনতালভের লোভে, স্বাধীনভাবে তাহার আত্মগত্যা স্বীকার করিয়াছিলেন।

পণ্ডবল-প্ররোণে ইংরেজ বিশালসাগরোপম ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের উপরে একপ অপ্রতিহত ও অনন্তপ্রতিযোগী প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত না। ভারতে শৌর্যবীর্যের একান্ত অভাব এখনো নাট, তখন তো আরো ছিল না। আজও গোরা-সৈন্ত অপেক্ষা দেশীয় সিপাহীগণই ইংরেজ-রাজের প্রধানতম সেনাশল হইয়া রহিয়াছে। যে দেশের লোক প্রায়ই বিশ্বাস করে, নিয়তির হুল্লভ্যা বিধান সর্বদা স্বীকার করে, তাহার মূহুর্ত্তর জানে না,—তাহারা বেছায় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ পণ্ডবলে আবদ্ধ হয় না। কলত শুদ্ধ পণ্ডবলতির উপরে ভারতে ইংরেজের প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, সিপাহীবিদ্রোহের 'এলরক্কার' তাহা কখনো রক্ষা পাইত না। সিপাহীরাই তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, সাধারণ প্রজাবর্গ তাহার প্রতি তখনো বিশ্বাস

হয় নাই। তাহার। যদি একটু বিশ্বাস হইয়া দাঁড়াইত, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের ইতিহাসে এক মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত। সে দেশ-বাপী দাবানল নির্ঝাঁপ করা ইংরেজের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হইত না। ভারতের প্রজামণ্ডলীর আত্মকুলোই সেই দুর্দিনে এদেশে ইংরেজ আগনার প্রভুশক্তিকে অটুট রাখিতে পারিয়াছিল। দুদিনে লোকে তদিনের কথা ভুলিয়া যায়, ইংরেজও সে সকল কথা আজ ভুলিয়া বাইতে পারে, কিন্তু ইতিহাস তাহা ভুলিবে না।

প্রজার আত্মকুলোর মূল্য তখন বস্তুতই ইংরেজ বেশ ভাল করিয়া বুঝিত। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে খেতাব নরনারী ও অপোগণ্ড শিশুদিগের প্রতিও যে নির্মম নির্বাতন হইয়াছিল, তাহা ইংরেজ বহুদিন ভুলিতে পারিবে না। কি জানি ভুলিয়া যায়, এই-জন্ত সে যত্নপূর্ব্বক স্থানে স্থানে তাহার স্মৃতি-চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই সকল নৃশংস ব্যাপারের প্রথম তীব্রযাতনা কিকিয়াজ্ঞ ও প্রশমিত হইতে না হইতেই, ইংরেজ ভারতের প্রজাসাধারণের প্রতি যে সত্কাব ও উদারতা প্রকাশ করিয়াছিল, মানুষের কথা দূরে থাকুক, দেবতার পক্ষেও তাহা হুসাধ্য বলিয়াই মর্মে হয়। সেই তীব্র-বিদ্রোহাবসানে, ইংলণ্ডের রাষ্ট্র বণিক-কোম্পানীর হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার সময়, প্রজার আত্মকূল্য ব্যতীত রাজ্যরক্ষা অসাধ্য ভাবিয়াই, ভার ও সাম্য-নীতির উপরেই ভারতে ব্রিটিশপ্রভুশক্তি চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, জৈবর সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞার বদ্ধ হইয়াছিলেন।

সেই উদারনীতির গুণেই ভারতে ইংরেজ-প্রকৃতি এতটা-পরিমাণে প্রজাসাধারণের আত্মকল্যাণে করিয়া আসিয়াছে।

ক্রমে ইংরেজ সে উদারনীতি বর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে ইংরেজের কোনই অপরাধ আছে বলিয়া মনে করি না। ইংরেজের সে উদারনীতি ধর্মের দ্বারা প্রণোদিত হয় নাই, সর্বাঙ্গ স্বার্থেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজও যদি আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্ত সে উদারতা আবশ্যক মনে করিত, ইংরেজ প্রাণপণে তাহা অবলম্বন করিয়া চলিত। কিন্তু আজ ইংরেজ ভারতে অভয়পদ পাইয়াছে। প্রজা-মণ্ডলী হুর্দল, নিঃশ্র, নিরস্ত্র ও নিবীৰ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজের সামান্যনীতি শ্রেত-কৃষকের ভেদ নষ্ট করিতে পারে নাই, কিন্তু জমিদার ও প্রজার প্রাচীন পরস্পরমুখাপেক্ষী সম্বন্ধকে চিরদিনের ঋন্ত ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রজার উপরে জমিদারের আর তেমন অধিকার নাই। ইংরেজরাজত্বে জমিদার অপেক্ষা জমাদার প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজের শিকার ইতরভক্তের মধ্য প্রাচীন বনিষ্ঠতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। বাহারা প্রাচীনকালে প্রকৃতিপুঞ্জের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাদের সে প্রভাব আজ নামশেষবাক্যেও বিদ্যমান নাই। বাহাদের পিতৃপুরুষদিগের পশ্চাতে সহস্র সহস্র লোক বাইরা দাঁড়াইত, আজ তাহারা অশেষ অহুস করিয়াও ছচারিটি প্রকৃত অহুসের প্রাণ হন না। ভারতের জনমণ্ডলী হীনবল, হীনবীৰ্য, নিরস্ত্র, বিচ্ছিন্ন, আত্ম-বিস্মৃত ও নেতৃবিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

ইংরেজ আজ তাহাদের হইতে আর বিশেষ কোন বিপদ আশঙ্কা করে না।

প্রজা বেথানেই হুর্দল, বিচ্ছিন্ন ও অনিষ্ট-সাধনে-অক্ষম হইয়া উঠে, সেখানেই রাজা প্রজারজনে বিমুগ্ধ হইয়া অত্যাচারপ্রবণ হয়। ইহা রাজনীতির সার্বভৌমিক অজিততা। ইংরেজের আধুনিক অত্যাচারপ্রবণতা ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের নিশ্চেষ্টতা ও বীৰ্য-হীনতারই প্রতিকল। ইংরেজ নহে, কিন্তু আমরাই ইহার জন্ত দায়ী।

এখনো কিন্তু আমরা এইটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। এইজন্তই ইংরেজের নিন্দাবাদ ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের নিত্যকৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। নিন্দার নিন্দুকের প্রাণে একটা কৃত্রিম আয়াম অহু-ভূত হয় বটে, কিন্তু নিন্দিতের প্রকৃতি কখনো পরিবর্তিত হয় না। ইংরেজ আজ বাহা-কিছু করিতেছে, তাহার মূল মানবপ্রকৃতির মধ্যে। ইংরেজ আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে, তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলে, আমরাও আমাদের অধীনস্থ জনমণ্ডলীর প্রতি ঠিক তাহাই করিতাম। আপনার মনুষ্য, আপনার সংঘমে ও আত্মত্যাগে, আপনার ধর্মতীকৃত্যের আজ জগৎ বিমুগ্ধ, বিস্মিত, নতশির হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ করিতেছে। কিন্তু এই জাপান যদি বিশত-বর্ষাধিক কাল ইংরেজের মত একটা বিরাট-কার নিবীৰ্য জাতির উপরে অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজনৈতিক অধিকার ও আদি-পত্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার এ সকল সঙ্কণ বৈশিষ্ট্য কখনই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। প্রজা ও রাজা

পরম্পরে সর্বদাই ঠিক পরম্পরের উপযোগী হইয়া থাকে। বিধাতা এ ক্ষেত্রে সর্বদাই 'যোগ্য বোগ্যন' যোজন্য করিয়া থাকেন। শক্তিশালী, সম্মিলনক্ষম, বীৰ্যবান, স্বদেশ-হিতৈষী, স্বজাতিভক্ত প্রজামণ্ডলী যে রাজার অধীনে বাস করে, আপনাদিগের শক্তি ও সাধনাবলেই তাহাকে উদার, জ্ঞানপরাগ, প্রজাবৎসল ও ধর্মভীরু করিয়া তোলে। ইংলণ্ডের প্রজাপুঞ্জ শক্তিশালী, স্বাধীনতা-প্রিয় ও সম্মিলনক্ষম বলিয়া, ইংলণ্ডের রাজা প্রজাহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। প্রাচীনকাল হইতেই ইংরেজ নীরবে ও নিশ্চেষ্টভাবে কদাপি রাজকীয় অত্যাচার বহন করে নাই। অত্যাচারী, প্রজারঞ্জনবিমুখ ও প্রজার বার্ষন্যস্বাধীনতাসংরক্ষণে উদাসীন রাজার বিরুদ্ধে ইংরেজ সর্বদাই অস্ত্রধারণ করিয়াছে। ইংরেজপ্রজাপুঞ্জ যদি নীরবে রাজকীয় অত্যাচার সহ করিয়া আসিত,—সশস্ত্র হইয়া রাজা জোহনকে বেটন করিয়া রাগিষিড়্কেজে যদি তাহার সন্তানের অগ্রভাগে আপনাদের আবেদন রাজার হস্তে অর্পণ না করিত, তাহার কদাপি ম্যাগ্নাকার্টা লাভ করিতে পারিত না। আবার প্রথম চার্লসের সময়ে, আপনাদিগের স্বাধীনতা ও ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজপ্রজামণ্ডলী যদি অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে আপনাদিগের সংহত শক্তিরূপিক প্রবলবেগে প্রয়োগ না করিত, এবং প্রজাদ্রোহিতা-অভিবোধে রাজাকে অভিযুক্ত করিয়া প্রকটভাবে তাহাকে আপদে দগ্ধিত না করিত, তবে আজ

ইংরেজ সভ্যজগতে স্বাধীনজাতিরূপে এমন গৌরবলাভ করিতে পারিত না। ইংলণ্ডে আজ যে প্রকৃতিপুঞ্জের স্বাভাবিক স্বাধীনতা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে ও রাজকীয় অধিকার যে পদে পদে প্রজাপুঞ্জের বার্ষ ও স্বাভিমতের অঙ্গুযায়ী হইয়া চলিতেছে, ইহা কেবল ইংরেজপ্রজাসাধারণের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরের ফল। যেমন ইংলণ্ডে, সেইরূপ অপর সর্বত্রই, প্রজামণ্ডলীর শক্তিপ্রয়োগে রাজনৈতিক অধিকার প্রসারিত ও রাজকীয় শক্তি ও স্বৈচ্ছাচারিতা সংবত হইয়াছে। ভারতের প্রজামণ্ডলী যদি সংযোগক্ষম, স্বদেশহিতৈষী, স্বজাতিভক্ত, বীৰ্যবান ও শক্তিশালী হইয়া উঠে, ভারতের রাজশক্তি অপরিহার্যরূপে উদার ও কল্যাণকারিণী হইয়া উঠিবে।

অতএব ইংরেজকে যেমন বুঝিতে হইবে যে, প্রজাশক্তির আনুকূল্যলাভ ব্যতীত ভারতে তাহার প্রভু হারী হইতে পারিবে না, সেইরূপ ভারতের প্রজাসাধারণকেও ইহা বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের আত্মশক্তি জাগ্রত, সংহত ও যথাযোগ্য বিষয়ে প্রযুক্ত না হইলে, এদেশে ইংরেজপ্রভুশক্তি কদাপি জাতীয়জীবনের চরিতার্থতাসম্পাদনের সহায় হইতে পারিবে না। হুংখের বিষয় এই যে, আমাদের রাজাও 'আপনার প্রকৃত কল্যাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, প্রজামণ্ডলীও আজ পর্যন্ত যথাবিহিতরূপে আপনার কর্তব্যপথ অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় নাই।

আধুনিক ভারতবর্ষে প্রজানীতি এইজন্য রাজার অল্পপ্রভুত্বাধার বিদ্যুৎ হইয়া

কেবলই রাজদ্বারে হত্যা দিরা পড়িয়া রহিয়াছে। আবেদন, প্রার্থনা ও বিধিগত আন্দোলনের নিফল প্রয়াসেই আজ পর্যন্ত আপনাদিগের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ আপনাদিগের ও স্বদেশবাসীদিগের সমুদায় শক্তি ও সময় প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে প্রজাসাধারণের আত্মশক্তি যাহাতে জাগ্রত হয়, তৎপ্রতি অগ্রদূত মনোনিবেশ করেন নাই। প্রজাশক্তি জাগ্রত হইয়া আপনাকে রাজনীতিকক্ষেত্রে যথাযোগ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে পর, এ সকল আন্দোলন-আবেদনের দ্বারা রাজনৈতিক অধিকার প্রসারপ্রাপ্ত হইতে পারে,—হইয়া থাকে, স্বীকার করি। কিন্তু ইংলণ্ড ও মার্কিনে প্রজাশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে রাজনৈতিক অগ্রদূত ও প্রতিষ্ঠানাদিতে প্রজাসাধারণের মতামত আপনাদের অন্তঃপ্রতিযোগী প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। সে সকল দেশে প্রজাশক্তিই সাক্ষাৎভাবে রাজশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করে, প্রজাপ্রতিনিধিগণই সে দেশে রাজকীয় অধিকার ও শাসনসংরক্ষণের সমুদায় ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। সে সকল দেশে প্রজার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে গবর্নমেন্টের সমুদায় কার্য স্বরবিস্তার নির্ভর করে। সুতরাং সেখানে প্রজামণ্ডলীকে কোন একটা বিষয়ে প্রণোদিত করিতে পারিলে, সহজেই তদ্বারা রাজকীয় ব্যাপারকে নিরস্ত্র ও সংবত করিতে পারা যায়। রাজ-মন্ত্রিগণ প্রজামণ্ডলীর অভিমতানুযায়ী কার্য না করিলে পদচ্যুত হইয়া থাকেন বলিয়া, বাহ্য-কিছুতে তাঁহাদের প্রতি প্রজাবর্ণের বিরুদ্ধত বা বিরুদ্ধতাব জাগ্রত হয়, তাহাকে

তাঁহারা সহজেই সর্বদা ভয় করিয়া চলেন। এইজন্য সে সকল দেশে আন্দোলন-আবেদনাদি সর্বদাই জীপ্সিতকলদানে সমর্থ হয় এবং সে সকল দেশে এই প্রণালীর রাজনৈতিক আন্দোলন তিক্কাবৃত্তির সমপর্যায়-ভূক্ত হয় না। কিন্তু এদেশে 'প্রজাশক্তি এখনো জাগ্রত হয় নাই।' রাজকীয় অগ্রদূত ও প্রতিষ্ঠানাদিতে প্রজামণ্ডলীর যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা এখনো হয় নাই। এখানে রাজা বা রাজমন্ত্রী বা রাজকর্মচারিগণ কেহই প্রজামুখাপেক্ষী নহেন, প্রজার মতামতের উপরে তাঁহাদের পদের ও কর্মের স্থায়িত্ব নির্ভর করে না। বিলাতের প্রজাবর্ণ আপনাদিগের প্রতিনিধিসভার সাহায্যে ভারতের শাসনসংরক্ষণাদির সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বড়লাট, ছোটলাট, জুডী-লাট, এ সকলই ভারতের প্রজামণ্ডলীর মতামতনিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বিলাতের লোকের নিকটে ইহারা আপনাদিগের কর্মের জন্ত দায়ী, আমাদিগের দেশের প্রজামণ্ডলীর নিকটে নহেন। সুতরাং এখানে রাজনৈতিক আন্দোলন ও আবেদনাদি অনভ্যোগ্য হইয়াই সর্বদা তিক্কাচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে। এতকাল ধরিয়া আমাদের সমুদায় রাজনৈতিক চেষ্টা ও অগ্রদূতাদি এইজন্যই তিক্কাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

তিক্কাবৃত্তি দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে উদরারের সংস্থান হইলেও, কখনো কুজাপি তিক্কাবৃত্তির চরিত্রে শক্তিসঞ্চয় হয় না। কিন্তু রাজনীতি কেবল যেন-কেন-প্রকারেণ জীবনোপায় সংগ্রহ করা নহে। রাজনীতি

ক্ষেত্রে প্রজাশক্তি ও রাজশক্তি পরস্পরের , সম্মুখীন হইয়া, এক- মহামল্লযুদ্ধে নিরন্তর নিযুক্ত হইয়া থাকে । যেখানে প্রজা আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, সেখানে রাজশক্তি নিরঙ্কুশভাবে আপনাকে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রজাবর্গের ধনমান সকলই আত্মসাৎ করিয়া লয় এবং প্রকৃতিপুঞ্জকে নির্ধন, নির্বীণ্য, হীনমতি ও হীনবৃত্ত এবং মনুষ্যবৃন্দের সমুদায় উচ্চতর অধিকার ও গৌরব হইতে বঞ্চিত করিয়া পণ্ডত্যাগ করিয়া রাখে । এখানে ভিক্ষাবৃত্তি আর আত্মহত্যা একই কথা ।

ভিক্ষার ধর্মই এই যে, তাহা ভিক্ষুককে সর্বদাই অশক্ত ও নির্বীণ্য করিয়া তোলে । ভিক্ষুকের সকলতা আপনার শক্তিপ্রয়োগের উপরে নির্ভর করে না, অপরের অমুগ্রহের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে । ভিক্ষার আত্মশক্তির উদ্বোধন অনাবশ্যক, দাতার অনুকম্পার উদ্রেক করিতে পারিলেই হইল । আমরাও এতকাল ধরিয়া রাতনৈতিক ব্যাপারে তাহাই করিয়া আসিয়াছি । আমরা আপনাদিগের শক্তিসাধন অপেক্ষা ইংরেজের অনুকম্পার উদ্দীপনকেই আমাদিগের সমুদায় রাজনৈতিক প্রয়াসের প্রধান লক্ষ্য ধরিয়া, বিপুল অর্থব্যয় করিয়া এদেশে ও বিশেষত বিলাতে তুমুল আন্দোলন করিয়া আসিয়াছি । এতদিন ধরিয়া যদি আমরা এই শক্তি ও এই অর্থ দেশের প্রজাসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ও সংযোগসাধনের জন্ত ব্যয় করিতাম, আজ আমাদের মধ্যে এমন এক প্রবল শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিত যে, সেই শক্তিকে

উপেক্ষা করিয়া ইংরেজের সাধ্য ও সাহস হইত না যে, একমুহূর্তের জন্তও এদেশের রাজশক্তিকে শুদ্ধ আপনার স্বজাতীয়ের বিবিধ স্বার্থসাধনে নিযুক্ত করে ।

এতদিন এইরূপ আন্দোলনের একটা সামান্য বৌদ্ধিকতাও ছিল । আমরা এতকাল ইংরেজকে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি । ইংরেজও এতকাল বলিয়া আসিয়াছিল যে, ভারতের প্রজাপুঞ্জের সর্ববিধ কল্যাণসাধনই তাহার একমাত্র লক্ষ্য । এই প্রাচীনজাতিকে জীবনতির নিম্নতম স্তরে প্রাপ্ত হইয়া হাতে ধরিয়া জাতীয়জীবনের উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই সে কৃতার্থ হইবে । চিরদিন ভারতকে আপনার পদলগ্ন করিয়া রাখা ইংরেজশাসনের লক্ষ্য নহে, কিন্তু শিক্ষা ও স্বাধীনতা, বিস্তার করিয়া ক্রমে জগতের শ্রেষ্ঠজাতিসকলের সমকক্ষ করিয়া এই দেশের প্রকৃতিপুঞ্জকে সভ্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাহার চরম লক্ষ্য । এই সকল স্তোভবাক্যে ইংরেজ এতকাল আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, হয় ত এক সময়ে তাহার আন্তরিক ভাবও এইরূপই ছিল । বতদিন আমরা ইংরেজকে বিশ্বাস করিতাম, ততদিন ইংরেজের নিকটে আত্মনিবেদন এতটা হীনকাৰ্য্য ছিল না । কিন্তু এই প্রাচীন আদর্শ ইংরেজ এখন প্রকাশ্যভাবে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । বতদিন ভারতে ব্রিটিশ-প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততকাল ভারতের প্রজাপুঞ্জকে সর্ববিধে আপনাদিগের স্বদেশে ইংরেজের পদানত থাকিতে

হইবে, ইংরেজ ইহা অগত্যা আজ বলিতে, তবেই আমাদের জাতীয়জীবনের
 আরম্ভ করিয়াছে। ঘোর দুর্দিনে, সিপাহী-সার্থকতা সম্ভব হইবে; অস্তথা নহে।
 বিজ্রোহের অবসানে ইংরেজরাজমহিবী আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন-
 বে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-মন্ত্র উচ্চারণ আলোচনাকে এইজন্ত এখন অন্তর্দুর্ধীন
 করিয়া ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ হইতে হইবে। ইংরেজের অহুকম্পার
 করিয়াছিলেন, বর্তমান ইংরেজরাজপুরুষ আশা পরিত্যাগ করিয়া, আমাদেরকে এখন
 টাকাটিগলনী করিয়া কার্যত তাহাকে আত্মশক্তি জাগ্রত করিবার জন্ত সচেষ্ট হইতে
 বর্জন করিয়াছেন। এই সকল কারণে হইবে। যদি আপনারা আপনাদিগের
 এখন আর প্রাচীন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন উদ্ধারপথ খুঁজিয়া লইতে পারি, তবেই
 করিলে চলিবে না। এখন দেশের প্রজা- আমাদের মুক্তি আছে—নান্যঃ পদ্ম
 শক্তিকে যদি জাগ্রত করিতে পারা যায়, বিভ্রতেহরনার—মুক্তির অন্য কোন পথ নাই।
 শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্ভাগ্য ।



তোমার এ পুণ্যস্থল জাহ্নবীর তীরে
 হে বঙ্গজননি তব কুটীরে ফুটীরে
 যে পুরাণো শাস্ত শক্তি ছিল সজোপনে,
 আজি কোন্ বায়ুবেগে কোন্ তুতক্ষণে
 এ ধ্মাক নগরীর বাতায়নপথে
 প্রবেশিল তারি কণা আজি কোনমতে ।
 সস্তানের মৃতদেহে করেছ সঞ্চার
 জীবৎ চেতনা, তাই আশা বাঁচিবার ।
 নাহি তবু বল মনে নাহি বীৰ্য্য দেহে,
 তাই আজি নাহি আশা এ দরিদ্রগেহে ।
 হিংসার প্রলয়বাণ চাছে ত্যজিবারে
 পরেরে নাশিতে ; তবু হুঁতগা না পারে
 মঙ্গল-শান্তির তরে দিতে বলিদান
 আপনার স্বার্থপূষ্ট দীনহীন প্রাণ ।

শ্রীধীনেশনাথ ঠাকুর ।

অবস্থা ও ব্যবস্থা ।*

(৯ই ভাদ্র শুক্রবার টাউনহলে পঠিত)

আজ বাংলাদেশে উদ্ভেজনার অভাব নাই, সুতরাং উদ্ভেজনার ভার কাহাকেও লইতে হইবে না। উপদেশেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা আমি মনে করি না। বসন্ত-কালের ঝড়ে যখন রাশিরাশি আমের বোল ঝরিয়া পড়ে, তখন সে বোলগুলি কেবলি মাটি হয়, তাহা হইতে গাছ বাহির হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তেমনি দেখা গেছে, সংসারে উপদেশের বোল অজস্র বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না, সমস্ত মাটি হইতে থাকে।

তবু ইহা নিঃসন্দেহ যে, যখন বোল ঝরিতে, আরম্ভ করে, তখন ব্যুত্থিতে হইবে, ফল ফলিবার সময় সুদূরে নাই। আমাদের দেশেও কিছুদিন চটতে বলা হইতেছিল যে, নিজের দেশের অভাবমোচন দেশের লোকের নিজের চেষ্টার দ্বারাষ্ট সম্ভবপর, দেশের লোকট দেশের চরম অপলখন, বিদেশী কদাচ নহে, - ইত্যাদি ; নানা মুখ হইতে এই যে বোলগুলি ঝরিতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা উপস্থিতমত মাটি হইতেছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভূমিকে নিশ্চয়ই উর্বরা করিতেছিল এবং একটুকু সফলতার সময় যে আসিতেছে, তাহারও সূচনা করিয়াছিল।

অবশেষে আজ বিধাতা, তীব্র উত্তাপে একটি উপদেশ স্বয়ং পাকাইয়া তুলিয়াছেন। দেশ গতকল্যাণে যে সকল কথা কর্ণপাত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে নাই, আজ তাহা অতি অনায়াসেই চিরন্তন সত্যের জ্ঞান গ্রহণ করিতেছে। নিজেরা যে এক হইতে হইবে পরের দ্বারস্থ হইবার জ্ঞান নহে, নিজেরের কাজ করিবার জ্ঞান, এ কথা আজ আমরা একদিনেই অতি সহজেই যেন অনুভব করিতেছি, বিধাতার বাণীকে অগ্রাহ্য কবিবার জো নাই।

অতএব আমার মুখে আজ উদ্ভেজনা ও উপদেশ অনাবশ্যক হইয়াছে—ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইঞ্জিতের দ্বারা চালনা করেন, তাঁহার অগ্নিময় তর্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

এখন এই সময়টাকে বুঝা নষ্ট হইতে দিতে পারি না। কপালক্রমে অনেক ধোঁয়ার পরে ভিজা-কাঠ যদি ধরিয়া থাকে, তবে তাহা পুড়িয়া ছাই হওয়ার পূর্বে রান্না চড়াইতে হইবে ; শুধু শুধু শূন্য চুলার আগুনে খোঁচার উপর খোঁচা দিতে থাকিলে আমোদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ছাই হওয়ার কালটাও

* গতবর্ষের জ্যৈষ্ঠমাসের বঙ্গবর্ধনে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব উপলক্ষে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোনো কোনো অংশ বর্তমান প্রবন্ধে পুনরুক্ত হইয়াছে।

নিকটে অগ্রসর হয় এবং অগ্নের আশা স্মদ্রবস্তী হইতে থাকে ।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে যখন সমস্ত দেশের লোকের ভাবনাকে একসঙ্গে জাগাইয়া তুলিয়াছে, তখন কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত না হইয়া কতকগুলি গোড়াকার কথা স্পষ্টরূপে ভাবিয়া লইতে হইবে ।

প্রথম কথা এই যে, আমরা স্বদেশের চিত্ত-সাধনলক্ষ্যে নিজের কাছে যে সকল আশা করি না, পরের কাছ হইতে সেই সকল আশা করিতেছিলাম । এমন অবস্থায় নিরাশ হওরাই স্বাভাবিক এবং তাহাই মঙ্গলকর । নিরাশ হইবার মত আঘাত বারবার পাইয়াছি, কিন্তু চেতনা হয় নাই । এবারে ঈশ্বরের প্রসাদে আর একটা আঘাত পাইয়াছি, চেতনা হইয়াছে কি না, তাহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে ।

“আমাদিগকে তোমরা সম্মান দাও, তোমরা শক্তি দাও, তোমরা নিজের সমান অধিকার দাও”—এই যে সকল দাবী আমরা বিদেশী রাজার কাছে নিঃসঙ্কোচে উপস্থিত করিয়াছি, ইহার মূলে একটা বিশ্বাস আমাদের মনে ছিল । আমরা কেতাব পড়িয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম যে, মানুষমাত্রেরই অধিকার সমান, এই সাম্যনীতি আমাদের রাজার জ্ঞাতি ।

কিন্তু সাম্যনীতি সেইখানেই খাটে, যেখানে সাম্য আছে । যেখানে আমারও শক্তি আছে, তোমার শক্তি সেখানে সাম্যনীতি অবলম্বন করে । যুরোপীয়ের প্রতি যুরোপীয়ের মনোহর সাম্যনীতি দেখিতে পাই, তাহা দেখিয়া আশাবিত্ত হইয়া উঠা অঙ্গমের লুক্কামাত্র । অশক্তের প্রতি শক্ত যদি সাম্যনীতি

অবলম্বন করে, তবে সেই প্রশ্ন কি অশক্তের পক্ষে কোনোমতে শ্রেয়স্কর হইতে পারে ? সে প্রশ্ন কি অশক্তের পক্ষে সম্মানকর ? অতএব সাম্যের দরবার করিবার পূর্বে সাম্যের চেষ্টা করাই মানুষমাত্রের কর্তব্য । তাহার অত্রাণ করা কাপুরুষতা ।

ইহা আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি, যে সকল জাতি ইংরেজের সঙ্গে বর্ণে, ধর্মে, প্রথায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাদিগকে ইহারা নিজের পার্শ্বে স্বচ্ছন্দবিহারের স্থান দিয়াছেন, এমন ইহাদের ইতিহাসে কোথাও নাই । এমন কি, তাহারা ইহাদের সংঘর্ষে লোপ পাইয়াছে ও পাইতেছে, এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে । একবার চিন্তা করিয়া দেখ, ভারতবর্ষের রাজাদের যখন স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, তখন তাহারা বিদেশের অপরিচিত লোকসমুলীকে স্বরাজ্যে বসবাসের বিরূপ স্বচ্ছন্দ অধিকার দিয়াছিলেন—তাহার প্রমাণ এই পার্শ্বজাতি । ইহারা গোহত্যা প্রভৃতি দুইএকটি বিষয়ে হিন্দুদের বিধিনিষেধ মানিয়া, নিজের ধর্ম, সমাজ অঙ্গুর রাখিয়া, নিজের স্বাভাব্য কোনো অংশে বিসর্জন না দিয়া হিন্দুদের অতিথিরূপে প্রতিবেশিরূপে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়া আসিয়াছে, রাজা বা জনসমাজের হস্তে পরাজিত বলিয়া উৎপীড়ন সহ্য করে নাই । ইহার সহিত ইংরেজ-উপনিবেশগুলির ব্যবহার তুলনা করিয়া দেখিলে পূর্বদেশের এবং পশ্চিমদেশের সাম্যবাদের প্রভেদটা অলোচনা করিবার সুযোগ হইবে ।

সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকায় বিলাতী উপনিবেশীদের একটি সভা বসিয়াছিল, তাহার বিবরণ হয় ত অনেকে টেইন্সম্যানপত্রে পড়িয়া থাকিবেন । তাহারা একবাক্যে সকলে ঈশ্বর

করিতাছেন যে, এশিয়ার লোকদিগকে তাঁহারা কোনো প্রকারেই আশ্রয় দিবেন না। ব্যবসায় অথবা বাসের জন্ত তাহাদিগকে ঘরভাড়া দেওয়া হইবে না, যদি কেহ দেয়, তাহার প্রতি বিশেষরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হইবে। বর্তমানে যে সকল বাড়ী এশিয়ার লোকদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই তাহা ছাড়াইয়া লওয়া হইবে। যে সকল হোস্ট্রি এশিয়ার লোকদিগকে কোনো প্রকারে সাহায্য করে, খুচরা ব্যবসায়ী ও পাঠকেরগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে এই নিয়মগুলি পালিত হয় এবং যাহাতে সভ্যগণ এশিয়ার লোকদিগকে বা মহাজনদের কাছ হইতে কিছু না কেনে বা তাহাদিগকে কোনো প্রকার সাহায্য না করে, সেজন্ত একটা Vigilance Association বা চৌকিদারদল গঠিত হইবে। সভ্য বক্তৃতাকালে একজন সভ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আমাদের সহরের মধ্যে এশিয়ার ব্যবসায়ীদিগকে যেমন করিয়া আড্ডা গাড়িতে দেওয়া হইয়াছে, এমন কি ইংলণ্ডের কোনো সহরে দেওয়া সম্ভব হইত? ইহার উত্তরে এক ব্যক্তি কহিল, না, সেখানে তাহাদিগকে “লিঙ্ক” করা হইত। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিল, এখানেও কুলাদিগকে “লিঙ্ক” করাই শ্রেয়।

এশিয়ার প্রতি যুরোপের মনোভাবের এই যে সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহা লইয়া আমরা যেন অবোধের মত উত্তেজিত হইতে না থাকি। এগুলি স্বভাবতই বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। যাহা স্বভাবতই ঘটিতেছে, যাহা বাস্তবিক সত্য, তাহা

লইয়া রাগা রাগি করিয়া কোনো ফল দেখি না। কিন্তু তাহার সঙ্গে যদি ঘর করিতে হয়, তবে প্রকৃত অবস্থাটা ভুল বুঝিলে কাজ চলিবে না। ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে, এশিয়াকে যুরোপ কেবলমাত্র পৃথক বলিয়া জ্ঞান করে না, তাহাকে হয় বলিয়াই জানে।

এ সম্বন্ধে যুরোপের সঙ্গে আমাদের একটা প্রভেদ আছে। আমরা যাহাকে হয়জ্ঞানও করি, নিজের গণ্ডির মধ্যে তাহার যে গ্লোব আছে, সেটুকু আমরা অস্বীকার করি না। সে তাহার নিজের মণ্ডলীতে স্বাধীন; তাহার ধর্ম, তাহার আচার, তাহার বিধিব্যবহার মধ্যে তাহার স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে; আমার মণ্ডলী আমার পক্ষে যেমন, তাহার মণ্ডলী তাহার পক্ষে ঠিক সেইরূপ,—এ কথা আমরা কখনো ভুলি না। এইজন্ত যে সকল জাতিকে আমরা অনার্য্য বলিয়া ঘৃণাও করি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে আমরা তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করি না। এই কারণে, আমাদের সমাজের মাঝখানেই হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল স্বস্থানে আপন প্রাধান্য রক্ষা করিয়াই চিরদিন বজায় আছে।

পশুদিগকে আমরা নিকৃষ্ট জীব বলিয়াই জানি, কিন্তু তবু বলিয়াছি—আমরাও আছি, তাহারাও থাক; বলিয়াছি—প্রাণিত্যা করিয়া আহাৰ করাটা “প্রবৃত্তিরেবা ভূতানাং, নিবৃত্তিস্ত মহাকলা”—সেটা একটা প্রবৃত্তি, কিন্তু নিবৃত্তিটাই ভাল। যুরোপ বলে, জন্তুকে থাইবার অধিকার জ্বর আমাদের দান করিয়াছেন। যুরোপের শ্রেষ্ঠতার অভিমান ইতরকে যে কেবল ঘৃণা করে, তাহা নহে,

তাহাকে নষ্ট করিবার বেলা ঈশ্বরকে নিজের দলভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না ।

যুরোপের শ্রেষ্ঠতা নিজের জাহির করা এবং বজায় রাখাকেই চরম কর্তব্য বলিয়া জানে । অত্ৰকে রক্ষা করা যদি তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়া যায়, তবেই অত্ৰের পক্ষে বাঁচোয়া, যে অংশে লেশমাত্র খাপ না খাইবে, সে অংশে দগ্ধমায়া-বাচবিচার নাই । হাতের কাছে ইহার যে দুই একটা প্রমাণ আছে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি ।

বাঙালি যে একদিন এমন জাহাজ তৈরি করিতে পারিত, বাহা দেখিয়া ইংরেজ ঈর্ষা অনুভব করিয়াছে, আজ বাঙালির ছেলে তাহা স্বপ্নেও জানে না । ইংরেজ যে কেমন করিয়া এই জাহাজনিষ্কাশের বিদ্যা বিশেষ চেষ্টায় বাঙলাদেশ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা ঐযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্বর মহাশয়ের “দেশের কথা” নামক বইখানি পড়িলে সকলে জানিতে পারিবেন । একটা জাতিকে, যে-কোনো দিকেই হোক, একেবারে সক্ষম পদ করিয়া দিতে এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সঙ্কোচ অনুভব করে নাই ।

ইংরেজ আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে বলপূর্ব্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে, অথচ ইহার নিদারুণতা তাহার অন্তরের মধ্যে একবার অনুভব করে নাই । ভারতবর্ষ একটি ছোট দেশ নহে, একটি মহাদেশবিশেষ । এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে চিরদিনের জ্ঞাত পুরুষানুক্রমে অস্ত্রধারণে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া তোলা যে কত-বড় অধ্যর্থ, বাহারা এককালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল, তাহা-দিগকে সামান্ত একটা হিংস্রপশুর নিকট

শক্তি নিরূপায় করিয়া রাখা যে কিরূপ বীভৎস অত্যাচার, সে চিন্তা ইহাদিগকে কিছুমাত্র পীড়া দেয় না । এখানে ধর্ম্মের দোহাই একেবারেই নিষ্ফল—কারণ জগতে অ্যাংলো-স্যাক্সন্ জাতির মাহাত্ম্যকে বিঘ্নিত ও স্তম্ভিত করাই ইহার চরম ধর্ম্ম জানে, সেজ্ঞাত ভারতবাসীকে যদি অস্ত্রত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতলে চিরদিনের মত নিঃজীব নিঃসহায় পৌরুষবিহীন হইতে হয়, তবে সে পক্ষে তাহাদের কোনো দয়ামায়া নাই ।

অ্যাংলোস্যাক্সন্ যে শক্তিকে সকলের চেয়ে পূজা করে, ভারতবর্ষ হইতে সেই শক্তিকে প্রত্যহ সে অপহরণ করিয়া এদেশকে উত্তরোত্তর নিজের কাছে অধিকতর হেয় করিয়া তুলিতেছে, আমাদিগকে ভীক বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে—অথচ একবার চিন্তা করিয়া দেখে না, এই ভীকতাকে জন্ম দিয়া তাহাদের দলবদ্ধ ভীকতা পশ্চাতে গড়াইয়া আছে ।

অতএব অনেকদিন হইতে ইহা দেখা গাইতেছে যে, অ্যাংলোস্যাক্সন্-মহিমাকে সম্পূর্ণ নিরূপদ্রব করিবার পক্ষে দূরতম ব্যাঘাতটি যদি আমাদের দেশের পক্ষে মহত্তম দুঃখলাবস্তা হয়, তবে তাহাকে দলিয়া সমভূম করিয়া দিতে ইহার বিচারমাত্র করে না ।

এই সত্যটি ক্রমে ক্রমে ভিতরে ভিতরে আমাদের কাছেও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ গবর্মেণ্টের প্রত্যেক নড়াচড়ায় আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে, তাহার সুখের কথায় যতই আশ্বাস দিতেছেন, আমাদের সন্দেহ ততই বাড়িয়া উঠিতেছে ।

কিন্তু আমাদের পক্ষে অজুত ব্যাপার এই যে, আমাদের সন্দেহেরও অন্ত নাই, আমাদের

নির্ভরেরও সীমা নাই। বিশ্বাসও করিব না, প্রার্থনাও করিব। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এমন করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ কেন, তবে উত্তর পাইবে, এক দলের দয়া না যদি হয় ত আর এক দলের দয়া হইতে পারে, প্রাতঃকালে যদি অনুগ্রহ না পাওয়া যায় ত যথেষ্ট অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে সন্ধ্যাকালে অনুগ্রহ পাওয়া যাইতে পারে। রাজা, ত আমাদের একটি নয়, এইজন্য বারবার সহস্রবার তাড়া গাইলেও আমাদের আশা কোনোক্রমেই মরিতে চায় না—এমনি আমাদের মুঞ্চিল হইয়াছে।

কথাটা ঠিক। আমাদের একজন রাজা নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের ভাগে একটা অপূর্ণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। একটা বিদেশী জাতি আমাদের উপরে রাজত্ব করিতেছে,— একজন বিদেশী রাজা নহে। একটা দূরবর্তী সমগ্র জাতির কর্তৃত্বভার আমাদের পক্ষে এই অবস্থাটাই কি এত অনুকূল? প্রবাদ আছে যে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভাগের কুপোষাট কি মাছের মুড়া এবং দুধের সর পায়?

অবিশ্বাস করিবার একটা শক্তি মানুষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহা কেবল একটা নেতিবাচক গুণ নহে, ইহা কর্তৃত্বাবক। মানুষকে রক্ষা করিতে হইলে এই অবিশ্বাসের ক্ষমতাকে নিজের শক্তির দ্বারা খাড়া করিয়া রাখিতে হয়। যিনি বিজ্ঞানচর্চায় প্রবৃত্ত, তাহাকে অনেক জনশ্রুতি, অনেক প্রমাণহীন প্রচলিত ধারণাকে অবিশ্বাসের জোরে খেদাইয়া রাখিতে হয়, নহিলে তাহার বিজ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। যিনি কন্দ করিতে চান, অবি-

শ্বাসের নিড়ানির দ্বারা তাহাকে কণ্ঠক্ষেত্র নিকটক রাখিতে হয়। এই যে অবিশ্বাস, ইহা অন্তের উপরে অবজ্ঞা বা ঈর্ষাবশত নহে, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি, নিজের কর্তব্যসাধনার প্রতি সম্মানবশত।

আমাদের দেশে ইংরেজ-রাজনীতিতে অবিশ্বাস যে কিরূপ প্রবল সতর্কতার সঙ্গে কাজ করিতেছে এবং সেই অবিশ্বাস যে কিরূপ নিয়মভাবে আপনার লক্ষ্যসাধন করিতেছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। উচ্চ ধর্মনীতির নহে, কিন্তু সাধারণ রাজনীতির দিক্ দিয়া দেখিলে এত কঠিন অটল অবিশ্বাসের জগৎ ইংরেজকে দোষ দেওয়া যায় না। ঐক্যের যে কি শক্তি, কি মাহাত্ম্য, তাহা ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানে। ইংরেজ জানে, ঐক্যের অনুভূতির মধ্যে কেবল একটা শক্তিমাত্র নহে, পরন্তু এমন একটা আনন্দ আছে যে, সেই অনুভূতির আবেগে মানুষ সমস্ত দুঃখ ও ক্ষতি তুচ্ছ করিয়া অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানে যে, ক্ষমতা-অনুভূতির ক্ষুধি মানুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে। উচ্চ অধিকার লাভ করিয়া রক্ষা করিতে পারিলে সেইখানেই তাহা আমাদের পক্ষে থাকিতে দেয় না—উচ্চতর অধিকারলাভের জগৎ আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উন্মুখ হইয়া উঠে। আমাদের শক্তি নাই, আমরা পারি না, এই মোহই সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর মোহ। যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার পায় নাই, সে আপনার শক্তির স্বাদ জানে না; সে নিজেই নিজের পরম শত্রু। সে জানে যে, আমি অক্ষম, এবং এইরূপ জানাই তাহার দারুণ দুর্বলতার

কারণ। এরূপ অবস্থায় ইংরেজ যে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পোলিটিকাল-হিসাবে আনন্দবোধ করিবে না, আমাদের হাতে উচ্চ অধিকার দিয়া আমাদের ক্ষমতার অনুভূতিকে উত্তরোত্তর স বল করিয়া তুলিবার জন্য আগ্রহ অনুভব করিবে না, এ কথা বৃথিতে অধিক মননশক্তির প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে যে সকল পোলিটিকাল প্রার্থনাসভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা যদি ভিক্ষকের রীতিতেই ভিক্ষা করিত, তাহা হইলেও হয় ত মাঝে মাঝে দরখাস্ত মঞ্জুর হইত—কিন্তু তাহারা গর্জন করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা দেশবিদেশের লোক একত্র করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিকে একটা শক্তি করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, সুতরাং এই শক্তিকে প্রশ্রয় দিতে ইংরেজ রাজা সাহস করে না। ইহার প্রার্থনা পূরণ করিলেই

- ইহার শক্তির স্পর্শকে লালন করা হয়— এইজন্য ইংরেজ-রাজনীতি আড়ম্বরসহকারে ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ইহার গর্জকে থরু করিয়া রাখিতে চান। এমন অবস্থায় এই সকল পোলিটিকাল সভা কৃত-কার্যতার বল লাভ করিতে পারে না;— একত্র হইবার যে শক্তি, তাহা কণকালের জন্য পায় বটে, কিন্তু সেই শক্তিকে একটা যথার্থ সার্থকতার দিকে প্রয়োগ করিবার যে ক্ষমতা, তাহা পায় না। সুতরাং নিম্নলিখিত চেষ্টার প্রবৃত্ত শক্তি ভিন্ন হইতে অকালে জাত অরুণের মত পঙ্গু হইয়াই থাকে—সে কেবল পয়ের রথেই জোড়া থাকিবার উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে, তাহার নিজের উড়িবার কোনো উদ্যম থাকে না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষের পলি-
'টিক্সে অবিখ্যাসনীতি রাজার তরফে অত্যন্ত সুদৃঢ়, অথচ আমাদের তরফে তাহা একান্ত শিথিল। আমরা একই কালে অবিখ্যাস প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করি না। ইহাকেই বলে ওরিয়েণ্টাল— এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। যুরোপ কারমনোবাক্যে অবিখ্যাস করিতে জানে—আর, যোলো-আনা অবি-
খ্যাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে কঠিন শক্তি, তাহা আমাদের নাই—আমরা তুলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই, আমরা কোনোক্রমে বিশ্বাস করিতে পারিলে বাচি। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা অপ্রয়ো-
জ্য তাহাকেও গ্রহণ করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহা-
কেও অঙ্গীভূত করিবার জন্য আমরা চিরদিন প্রস্তুত হইয়া আছি।

যুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে, তাহা বিরোধ করিয়াই পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি, তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন বিরোধ-
পরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুকিল হইয়াছে। স্বভাববিরোধী স্বভাববিশ্বাসীকে প্রকাই করে না।

যাহাই হউক, চিরন্তন প্রকৃতিবশত আমা-
দের ব্যবহারে যাহাই প্রকাশ পাইক, ইংরেজ রাজা স্বভাবতই যে আমাদের ঐক্যের সহায় নহেন, আমাদের ক্ষমতালাভের অস্বপ্ন নহেন, এ কথা আমাদের মনকে অধিকার করিয়াছে। 'সেইজন্যই যুনিভার্সিটি-সংশোধন, বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি গগনমোচনের ব্যবস্থাসুলভিকে আমাদের শক্তি থরু করিবার সঙ্কল্প বলিয়া কল্পনা করিয়াছি।

এমনভর সন্ধি অবস্থার স্বাভাবিক গতি হওয়া উচিত—আমাদের স্বদেশহিতকর সমস্ত চেষ্টাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া আনা। আমাদের অবিবাদের মধ্যে এইটুকুই আমাদের লাতের বিষয়। পরের নিকট আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে বন্ধ করিয়া রাখিলে কেবল সে ফল পাওয়া যায় না, তাহা নহে, তাহাতে আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত আত্মশক্তির মাতাত্মা চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এইটাই আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। ইংরেজ আমাদের প্রার্থনাপূরণ করিবে না, অতএব আমরা তাহাদের কাছে যাইব না, এ সুবুদ্ধিটা লক্ষ্য কর। বস্তুত এই কথাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে—অধিকাংশস্থলেই প্রার্থনাপূরণটাই আমাদের লোকসান। নিজের চেষ্টার দ্বারা যতটুকু ফল পাই, তাহাতে ফলও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, সোনাও পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমপাথরও পাওয়া যায়। পরের দ্বারা কক হইয়াছে বলিয়াই ভিক্ষাবৃত্তি হইতে যদি নিরস্ত হইতে হয়, পৌরুষবশত, মনুষ্যবশত, নিজের প্রতি, নিজের অন্তর্দ্বারী পুরুষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয়, তবে এই ভিক্ষা-বৈরাগ্যের প্রতি আমি কোনো ভরসা রাখি না।

বস্তুত ইংরেজের উপরে রাগ করিয়া নিজের দেশের উপর হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগ দিতে আরম্ভ করা কেমন—যেমন স্বামীর উপরে অভিমান করিয়া সবেগে বাপের বাড়ী যাওয়া। সে বেগের হাস হইতে বেশিক্ষণ লাগে না, আবার বিগুণ আগ্রহে সেই স্বপ্ন-বাড়ীতেই ফিরিতে হয়। দেশের প্রতি

আমাদের যে সকল কর্তব্য আজ আমরা স্থির করিয়াছি, সে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই তাহার গৌরব এবং স্থায়িত্ব, ইংরেজের প্রতি রাগের উপরে যদি তাহার নির্ভর হয়, তবে তাহার উপরে ভরসা রাখা বড় কঠিন। ডাক্তার অসম্ভব ভিজিট বাড়াইয়াছে বলিয়া তাহার উপরে রাগ করিয়া যদি শরীর ভালো করিতে চেষ্টা করি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শরীরের প্রতি মমতা করিয়া যদি এ কাজে প্রবৃত্ত হই, তবেই কাজটা যথার্থভাবে সম্পন্ন হইবার এবং উৎসাহ স্থায়ীভাবে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তবে কিনা, যেমন ঘড়ির কল কোনো একটা আকস্মিক বাধায় বন্ধ হইয়া থাকিলে তাহাকে প্রথমে একটা নাড়া দেওয়া যায়, তাহার পরেই সে আর দ্বিতীয় কাঁকানির অপেক্ষা না করিয়া নিজের দমেই নিজে চলিতে থাকে—তেমনি স্বদেশের প্রতি কর্তব্য-পরতাও হয় ত আমাদের সমাজে একটা বড়-রকমের কাঁকানির অপেক্ষায় ছিল—হয় ত স্বদেশের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি এই কাঁকানির পর হইতে নিজের আভ্যন্তরিক শক্তিতেই আবার কিছুকাল সঞ্জে চলিতে থাকিবে। অতএব এই কাঁকানিটা যাহাতে আমাদের মনের উপরে বেশ রীতিমত লাগে, সে পক্ষেও আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। যদি সাময়িক আন্দোলনের সাহায্যে আমাদের নিত্য জীবনী ক্রিয়া সজাগ হইয়া উঠে, তবে এই সুযোগটা ছাড়িয়া দেওয়া কিছু নয়।

এখন তবে কথা এই যে, আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতী জিনিষ-কেনা বন্ধ করিয়া দেশী

জিনিষ কিনিবার জন্ত যে সঙ্কল্প করিয়াছি, সেই সঙ্কল্পটিকে স্তব্ধভাবে, থাৱীভাবে স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্তমান উদ্দেশ্যটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি, তবে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে, তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে—এ সমস্ত লাভক্ষতি নানা বাহিরের অবস্থার উপরে নির্ভর করে—সে সমস্ত মুক্তভাবে বিচার করিয়া দেখা আমার ক্ষমতায় নাই। আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিকটা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশীজিনিষ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে জিনিষটা দেশী নহে, তাহার ব্যবহারে বাধা হইতে হটলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশীজিনিষ-ব্যবহারের গতিতে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি সে-জন্ত মাঝে মাঝে স্বদেশের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হই, তবে স্বদেশ আমাদের ক্ষমতাকে অধিকার করিতে পারিবে। এট উপলক্ষ্যে আমাদের চিন্তা সর্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিবে। আমরা ত্যাগের দ্বারা, হুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনায় করিয়া লইব। আমাদের আরাম, বিলাস, আশ্রয়স্থল, আশ্রয়স্থলকে প্রত্যহ স্বদেশ হইতে দূরে লইয়া বাইতেছিল, প্রত্যহ আমাদের পরবশ করিয়া লোকহিতব্রতের জন্ত অক্ষম করিতেছিল—আজ আমরা সকলে মিলিয়া যদি নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেশের দিকে তাকা-

ইয়া ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছুপরিমাণও পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে সেই ত্যাগের ঐক্যদ্বারা আমরা পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব। দেশীজিনিষ ব্যবহার করার ইহাই যথার্থ সার্থকতা—ইহা দেশের পুজা, ইহা একটি মহান সঙ্কল্পের নিকটে আত্মনিবেদন।

এইরূপে কোনো একটা কণ্ঠের দ্বারা, কাঠিন্তের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা আত্মনিবেদনের জন্ত আমাদের অন্তঃকরণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিয়া আছে—আমরা কেবলমাত্র সভা ডাকিয়া, কথা কহিয়া, আবেদন করিয়া নিশ্চয়ই তৃপ্তিলাভ করি নাট। কখনো ভ্রমেও মনে করি নাই, ইহার দ্বারা আমাদের জীবন সার্থক হইতেছে—ইহার দ্বারা আমরা নিজের একটা শক্তি উপলব্ধি করিতে পারি নাই—ইহা আমাদের চিন্তকে, আমাদের পূজার বাগ্মতাকে, আমাদের হুঃখঃখনিরপেক্ষ, ফলাফলবিচারবিহীন আত্মদানের ব্যাঘাতকে চিনিবারবেগে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে নাই। কি আমাদের প্রত্যেকের বাস্তবিক প্রকৃতিতে, কি জাতির প্রকৃতিতে কোনো একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে বাহিরে নিবেদন করিবার জন্ত প্রতীক্ষা অন্তরের অন্তরে বাস করিতেছে—সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে বা না পড়ে, তাহার নির্দোষ প্রতীক জ্বলিতেছে। যখন কোনো বৃহৎ আকর্ষণে আমরা আপনাদের আরামের, আপনাদের স্বার্থের গম্বীর ছাড়িয়া আপনাকে যেন আপনায় বাহিরে প্রবলভাবে সমর্পণ করিতে পারি, তখন আমাদের ভয় থাকে না, দ্বিধা থাকে না,

তখনি আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অসুস্থ শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারি—নিজেকে আর দীনহীন দুর্বল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে নিজের অন্তরের শক্তিকে এবং সেই শক্তির যোগে বৃহৎ বাহিরের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং জাতিগত সত্তার একমাত্র চরিতার্থতা।

নিশ্চয় জানি, এই বিপুল সার্থকতার জন্য আমরা সকলেই অপেক্ষা করিয়া আছি। ইহারই অভাবে আজ আমাদের সমস্ত দেশকে বিষাদে আচ্ছন্ন ও অবসাদে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহারই অভাবে আমাদের মজাগত দৌর্বল্য যায় না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ঘোচে না, আমাদের আত্মাভিমানের চপলতা কিছুতেই দূর হয় না। ইহারই অভাবে আমরা দুঃখবহন করিতে, বিলাস-ত্যাগ করিতে, কতিবীকার করিতে অসম্মত। ইহারই অভাবে আমরা প্রাণটাকে ভয়মুগ্ধ, শিশুর ধাত্রীর মত একান্ত আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি, মৃত্যুকে নিঃশঙ্ক বৌর্যের সহিত বরণ করিতে পারিতেছি না। যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদের পিতামহদের একমুত্রে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে সিদ্ধিমান করিবার পথ মুক্ত করিতেছেন, যিনি আমাদের এই স্বর্গ্যালোকদীপ্ত নীলাকাশের নিম্নে যুগে যুগে সকলকে একত্র করিয়া এক বিশেষ বাস্তব দ্বারা আমাদের সকলের চিত্তকে এক বিশেষভাবে উদ্বোধিত করিতেছেন—আমাদের চিরপরিচিত ছায়ালোক-বিচিত্র অরণ্য-প্রান্তর-শতক্ষেত্র বাহার বিশেষ

মূর্তিকে পুরুষাত্মকভাবে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশমান করিয়া রাখিয়াছে—আমাদের পুণ্য-নদীসকল বাহার পানোদকরূপে আমাদের গৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়া বাইতেছে, যিনি জাতিনির্বিশেষে হিন্দুমুসলমানখৃষ্টানকে এক মহাযজ্ঞে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বসাইয়া সকলেরই অন্নের থালায় স্বহস্তে পরিবেষণ করিয়া আসিতেছেন, দেশের অন্তর্গামী সেই দেবতাকে, আমাদের সেই চিরন্তন অধিপতিকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। যদি অকস্মাৎ কোনো বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান্ আবেগের ঝড়ে পর্দা একবার একটু উড়িয়া যায়, তবে এই দেবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইব, আমরা কেহই স্বতন্ত্র নহি, বিচ্ছিন্ন নহি—দেখিতে পাইব, যিনি যুগযুগান্তর হইতে আমাদের পিতৃ-সমুদ্রবিধৌত হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে এক ধনধান্য, এক সুখদুঃখ, এক বিরাত প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরন্তর এক করিয়া তুলিতেছেন, সেই দেশের দেবতা জর্জের, তাঁহাকে কোনোদিন কেহই অদীন করে নাই, তিনি ইংরেজীকুলের ছাত্র নহেন, তিনি ইংরেজ রাজার প্রজা নহেন, আমাদের বহুতর দুর্গতি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, তিনি প্রবল, তিনি চিরজাগ্রত, ইহার এই সহজমুক্ত স্বরূপ দেখিতে পাইলে তখনই আনন্দের প্রাচুর্য্যবেগে আমরা অনায়াসেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্মসমর্পণ করিব, কোন উপদেশের অপেক্ষা থাকিবে না। তখন দুর্গম পথকে পরিহার করিব না, তখন পথের প্রসাদকেই জাতীয় উন্নতিলাভের চরম সম্বল মনে করাকে পরিহাস করিব এবং

অপমানের মূল্যে আশু কললাভের উৎসবৃত্তিকে
অস্ত্রের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিব।

আজ একটি আকস্মিক ঘটনার সমস্ত
বাঙালিকে একই বেদনার আঘাত করাতে
আমরা বেন ক্ষণকালের জন্তও আমাদের এই
স্বদেশের অন্তর্ধামী দেবতার আভাস পাইয়াছি।
সেইজন্ত যাহারা কোনোদিন চিন্তা করিত না,
তাহারা চিন্তা করিতেছে; যাহারা পরিহাস
করিত, তাহারা স্তব্ধ হইয়াছে; যাহারা কোনো
মহান্ সঙ্কল্পের দিকে তাকাইয়া কোনোরূপ ত্যাগ-
স্বীকার করিতে জানিত না, তাহারাও যেন
কিছু অমুবিধা ভোগ করিবার জন্ত উদ্যম
অনুভব করিতেছে এবং যাহারা প্রত্যেক
কথাতেই পরের দ্বারে ছুটিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত,
তাহারাও আজ কিঞ্চিৎ দ্বিধার সহিত নিজের
শক্তি সন্দান করিতেছে।

একবার এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা ভাল
করিয়া মনের মধ্যে অনুভব করিয়া দেখুন।
ইতিপূর্বে রাজার কোনো অপ্রিয় বাবসারে
বা কোনো অনভিমত আইনে আঘাত পাইয়া
আমরা অনেকবার অনেক কক্ষকৌশল,
অনেক কোলাহল, অনেক সভা আহ্বান
করিয়াছি, কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ বল
পায় নাই, আমরা নিজের চেষ্টাকে নিজে
সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, এইজন্ত সহস্র
অত্যাতিয়ারাও রাজার প্রত্যয় আকর্ষণ
করিতে পারি নাই, দেশেরও ঔদাসীন্য় দূর
করিতে পারি নাই। আজ অসম্ভব বঙ্গবিভাগের
উদ্দেশ্য বাঙালির পক্ষে পরম শোকের কারণ
হইলেও এই শোক আমাদের নিরুপায়
অবস্থাদে অভিব্যক্ত করে নাই। বস্তুত বেদনার
মধ্যে আমরা একটা আনন্দই অনুভব

করিতেছি। আনন্দের কারণ, এই বেদনার
মধ্যে আমরা নিজেকে অনুভব করিতেছি,—
পরকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি না। আনন্দের
কারণ, আমরা আভাস পাইয়াছি আমাদের
নিজের একটা শক্তি আছে, সেই শক্তির
প্রভাবে আজ আমরা ত্যাগ করিবার, হুঃখ-
ভোগ করিবার পরম অধিকার লাভ করি-
য়াছি। আজ আমাদের বালকেরাও বলি-
তেছে—পরিত্যাগ কর, বিদেশের বেশভূষা,
বিদেশের বিলাস পরিহার কর—সে কথা
শুনিয়া বৃদ্ধেরাও তাহাদিগকে ভৎসনা করি-
তেছে না, বিজ্ঞেরাও তাহাদিগকে পরিহাস
করিতেছে না;—এই কথা নিঃসঙ্কোচে বলিবার
এবং এই কথা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিবার বল
আমরা কোথা হইতে পাইলাম! সুখেই
হউক আর দুঃখেই হউক, সম্পদেই হউক
আর বিপদেই হউক, হৃদয়ে হৃদয়ে যথার্থভাবে
মিলন হইলেই যাহার আবির্ভাব আর মুহূর্ত্তকাল
গোপন থাকে না, তিনি আমাদের দিগকে বিপদের
দিনে এই বল দিয়াছেন,—দুঃখের দিনে এই
আনন্দ দিয়াছেন। আজ দুঃখের দিনে যে
বিদ্যাতের আলোক চকিত হইতেছে, সেই
আলোকে যদি আমরা রাজশাসাদের সচিব-
দেরই মুখমণ্ডল দেখিতে থাকিতাম তবে
আমাদের অন্তরের এই উদার উত্তমটুকু
কখনই থাকিত না। এই আলোকে আমা-
দের দেবালয়ের দেবতাকে, আমাদের ঐক্যাধি-
ষ্ঠাত্রী অভয়াকে দেখিতেছি—সেইজন্তই আজ
আমাদের উৎসাহ এমন সজীব হইয়া উঠিল।
সম্পদের দিন নহে, কিন্তু সঙ্কটের দিনেই
বাংলাদেশ আপন জন্মের মধ্যে এই প্রাণ
লাভ করিল। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, জন্মের

শক্তি যে কেবল সম্ভবের পথ দিয়াই কাজ ' করিয়াছি,—আমরা হিন্দু-মুসলমান, ধনি-দরিদ্র, করে, তাহা নহে; ইহাতেই বুঝিতে হইবে, দুর্বলেরও বল আছে, দরিদ্রেরও সম্পদ আছে, এবং দুর্ভাগ্যকেই সৌভাগ্য করিয়া তুলিতে পারেন যিনি, সেই জাগ্রত পুরুষ, কেবল আমাদের জাগরণের প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধ আছেন। তাঁহার অনুশাসন এ নয় যে, গবর্নেন্ট তোমাদের মানচিত্রের মাঝখানে যে একটা কৃত্রিম রেখা টানিয়া দিতেছেন, তোমরা তাঁহাদিগকে বলিয়া-কহিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া, বিলাতি-জিনিষ-কেনা রহিত করিয়া, বিলাতে টেলিগ্রাম ও দূত পাঠাইয়া তাঁহাদের অনুগ্রহে সেই রেখা মুছিয়া লও। তাঁহার অনুশাসন এই যে, বাংলার মাঝখানে যে রাজাই যতগুলি রেখাই টানিয়া দিই, তোমাদিগকে এক থাকিতে হইবে—আবেদন-নিবেদনের জোরে নয়, নিজের শক্তিতে এক থাকিতে হইবে, নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে। রাজার দ্বারা বহু-বিভাগ ঘটতেও পারে, না-ও ঘটতে পারে—তাহাতে অতিমাত্র বিষম বা উল্লাসিত হইয়ো না—তোমরা যে আজ একই আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছ, ইহাতেই আনন্দিত হও এবং সেই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য সকলের মনে একই উত্তম জন্মিয়াছে, ইহার দ্বারাই সার্থকতা লাভ কর!

অতএব এখন কিছুদিনের জন্য কেবল-মাত্র একটা ক্ষমতায় আশ্রয় লইয়া ভোগ করিয়া এই শুভ সুযোগকে নষ্ট করিয়া কেলিলে চলিবে না। আপনাকে সংযত করিয়া, সংযত করিয়া এই আবেগকে নিভা করিতে হইবে। আমাদের যে ঐক্যকে একটা আঘাতের সাহায্যে দেশের আন্তঃমধ্যে আমরা একসঙ্গে সকলে অনুভব

করিয়াছি,—আমরা হিন্দু-মুসলমান, ধনি-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই বাঙালী বলিয়া যে এক বাংলার বেদনা অনুভব করিতে পারিয়াছি, আঘাতের কারণ দূর হইলেই বা বিস্মৃত হইলেই সেই ঐক্যের চেতনা যদি দূর হইয় যায়, তবে আমাদের মত দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই। এখন হইতে আমাদের ঐক্যকে নানা উপলক্ষ্যে নানা আকারে স্বীকার ও সম্মান করিতে হইবে। এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান, সহর-বাসী ও পল্লিবাসী, পূর্ব ও পশ্চিম, পরস্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন প্রতিক্ষণে অনুভব করিতে থাকিব। বিচ্ছেদের প্রেমকে ঘনিষ্ঠ করে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের মধ্য দিয়া যে প্রবল মিলন সম্ভব হইতে থাকে, তাহা সচেষ্ট, জাগ্রত, বৈদ্যুতশক্তিতে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের বঙ্গভূমি রাজকীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নই হয়, তবে সেই বিচ্ছেদবেদনার উত্তেজনায় আমাদের সামাজিক সম্ভাবে আরো দৃঢ়রূপে মিলিত হইতে হইবে, আমাদের নিজেদের চেষ্টায় ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, সেই চেষ্টার উদ্বুদ্ধকই আমাদের পরম লাভ।

কিন্তু অনির্দিষ্টভাবে, সাধারণভাবে এ কথা বলিলে চলিবে না। মিলন কেমন করিয়া ঘটতে পারে? একত্রে মিলিয়া কাজ করিলেই মিলন ঘটে, তাহা ছাড়া যথার্থ মিলনের আর কোনো উপায় নাই।

দেশের কার্য বলিতে আর ভুল বুঝিলে চলিবে না—এখন সে দিন নাই,—আমি যাঁহা বলিতেছি, তাহার অর্থ এই, সাধ্যমত নিজেদের অভাবমোচন করা, নিজেদের কর্তব্য নিজে সাধন করা।

এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তঁাহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব—তঁাহাদিগকে কর দান করিব, তঁাহাদের আদেশ পালন করিব, নির্কিচারে তঁাহাদের শাসন মানিয়া চলিব—তঁাহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।

‘আমি জানি, আমরা এই প্রস্তাবকে আমাদের বিবেচক ব্যক্তিগণ অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। যাহা নিতান্তই সহজ, যাহাতে হুঃখ নাই, ত্যাগ নাই, অথচ আড়ম্বর আছে, উদ্দীপনা আছে, তাহা ছাড়া আর কিছুকেই আমাদের স্বাদেশিকগণ সাধ্য বলিয়া গণ্যই করেন না। কিন্তু সম্প্রতি নাকি বাংলার একটা দেশব্যাপী কোভ জন্মিয়াছে, সেইজন্তই আমি বিরক্তি ও বিক্রম উদ্বেকের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রস্তাবটি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি এবং সকলকে আশস্ত করিবার জন্ত একটা ঐতিহাসিক নজিরও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। আমি যে বিবরণটি পাঠ করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছি, তাহা কৃষ্ণী গবর্মেন্টের অধীনস্থ বাহুলীকপ্রদেশীয়। ইহা কিছুকাল পূর্বে টেটস্‌ম্যানপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বাহুলীকপ্রদেশে জজীয় ও আশ্মাগিগণ যে চেষ্টার প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা যে কেন আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে না, তাহা জানি না! সেখানে “সকার্‌টুভেলিটি” নামধারী একটি জজীয় “জাশনালিষ্ট” সম্প্রদায় গঠিত

হইয়াছে—ইহার “কাস” প্রদেশে প্রত্যেক গ্রাম্যজিলার স্বদেশীয় বিচারকদের দ্বারা গোপনবিচারশালা স্থাপন করিয়া রাজকীয় বিচারালয়কে নিশ্চত করিয়া দিয়াছেন।

The peasants aver that these secret courts work with much greater expedition, accuracy and fairness than the Crown Courts, and that the Judges have the invaluable characteristic of incorruptibility. The Drozhakisti, or Armenian Nationalist party, had previously established a similar system of justice in the rural districts of the province of Erwan and more than that, they had practically supplanted the whole of the Government system of rural administration and were employing agricultural experts, teachers and physicians of their own choosing. It has long been a matter of notoriety that ever since the suppression of Armenian schools by the Russian minister of Education Delyanoff, who by the way, was himself an Armenian, the Armenian population of the Caucasus has maintained clandestine national schools of its own.

আমি কেবল এই বৃত্তান্তটি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছি—অর্থাৎ ইহার মধ্যে এইটুকুই জটিল যে, স্বদেশের কর্মভার দেশের লোকের নিজদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাগলামী নহে—বলন্ত দেশের হিতৈষী ব্যক্তিদের এইরূপ চেষ্টাই একমাত্র স্বাভাবিক।

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত

লোক যে গবর্নমেন্টের চাকরীতে মাথা বিকাইয়া রাখিয়াছেন, ইহার শোচনীয়তা কি আমরা চিন্তা করিব না, কেবল চাকরীর পথ আরো প্রশস্ত করিয়া দিবার জন্ত প্রার্থনা করিব? চাকরীর খাতিরে আমাদের দুর্বলতা কতদূর বাড়িতেছে, তাহা কি আমরা জানি না? আমরা মনিবকে খুসি করিবার জন্য গুপ্তচরের কাজ করিতেছি, মাতৃভূমির বিরুদ্ধে হাত তুলিতেছি এবং যে মনিব আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা করে, তাহার পৌরুষক্ষয়কর অপমানজনক আদেশও প্রফুল্লমুখে পালন করিতেছি—এই চাকরী আরো বিস্তার করিতে হইবে? দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করিতে হইবে? আমরা যদি স্বদেশের কল্যাণের নিজে গ্রহণ করিতাম, তবে গবর্নমেন্টের আপস রাখসের মত আমাদের দেশের শিক্ষিত-লোকদিগকে কি এমন নিঃশেষে গ্রাস করিত? আবেদনের দ্বারা সরকারের চাকরী নহে, পৌরুষের দ্বারা স্বদেশের কল্যাণের বিস্তার করিতে হইবে! যাহাতে আমাদের ডাক্তার, আমাদের শিক্ষক, আমাদের এঞ্জিনিয়ারগণ দেশের অধীন থাকিয়া দেশের কাজেই আপনার যোগ্যতার ক্ষুদ্রীকরণ করিতে পারেন, আমাদের পক্ষে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নতুবা আমাদের যে কি শক্তি আছে, তাহার পরিচয়ই আমরা পাইব না। তা ছাড়া, একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সেবার অভ্যাসের দ্বারা ই প্রীতির উপচয় হয়; যদি আমরা শিক্ষিতগণ এমন কোথাও কাজ করিতাম, যেখানে দেশের কাজ করিতেছি, এই ধারণা সর্বদা স্পষ্টরূপে আগ্রহ থাকিত, তবে দেশকে ভালবাস, একথা নীতিশাস্ত্রের

সাহায্যে উপদেশ দিতে হইত না। তবে, একদিকে যোগ্যতার অভিমানে, অন্যদিকে প্রত্যেক অভাবের জন্য পরের সাহায্যের প্রার্থী হওয়া—এমনতর অদ্ভুত অশ্রদ্ধাকর আচরণে আমাদের পক্ষে প্রবৃত্ত হইতে হইত না, দেশের শিক্ষা স্বাধীন হইত এবং শিক্ষিত-সমাজের শক্তি বন্ধনমুক্ত হইত।

জজীয়গণ, আত্মনির্ভর, প্রবল জাতি নহে—ইহারা যে সকল কাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে, আমরা কি সেই সকল কাজেরই জন্ত দরবার করিতে দোড়াই না? কৃষিতত্ত্ব-পারদর্শীদের লইয়া আমরাও কি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না? আমাদের ডাক্তার লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধানচেষ্টা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব? আমাদের পল্লির শিক্ষিতের কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না? যাহাতে মামলায়-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিশ-নিষ্পত্তি দেশে চলে, তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত? সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই সকল স্বদেশী চেষ্টাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্ত একটা দল বাঁধিতে পারি। এই দল, এই কর্তৃসভা আমাদের পক্ষে স্থাপন করিতেই হইবে—নতুবা বলিব, আজ আমরা যে একটা উদ্বেজনা প্রকাশ করিতেছি, তাহা মাদকতামাত্র, তাহার অবসানে অবসাদের পঞ্চশয্যা লুপ্ত করিতে হইবে।

একটা কথা আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, পরের প্রদত্ত অধিকার আমাদের জাতীয়সম্পদরূপে গণ্য হইতে

পারে না—বরঞ্চ তাহার বিপরীত ! দৃষ্টান্ত-
স্বরূপে একবার পঞ্চায়েৎবিধির কথা ভাবিয়া
দেখুন । এক সময় পঞ্চায়েৎ আমাদের দেশের
জিনিষ ছিল, এখন পঞ্চায়েৎ গবর্মেণ্টের
আপিসে-গড়া জিনিষ হইতে চলিল । যদি ফল
বিচার করা যায়, তবে এই দুই পঞ্চায়েতের
প্রকৃতি একেবারে পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই
প্রতীত হইবে । যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের
লোকের স্বতঃপ্রসূত নহে, বাহা গবর্মেণ্টের
বল, তাহা বাহিরের জিনিষ হওয়াতেই গ্রামের
বক্ষে একটা অশান্তির মত চাপিয়া বসিবে—
তাহা ঈর্ষার সৃষ্টি করিবে—এই পঞ্চায়েৎপদ
লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন সকল
চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে, যাহাতে বিরোধ জন্মিতে
থকিবে—পঞ্চায়েৎ, ম্যাজিষ্ট্রেটবর্গকেই স্বপক্ষ
এবং গ্রামকে অপরপক্ষ বলিয়া জানিবে, এবং
ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যাহা পাইবার জন্য
গোপনে অথবা প্রকাশ্যে গ্রামের বিশ্বাস ভঙ্গ
করিবে—ইহারা গ্রামের লোক হইয়া গ্রামের
চরের কাজ করিতে বাধ্য হইবে এবং যে
পঞ্চায়েৎ এদেশে গ্রামের বলস্বরূপ ছিল, সেই
পঞ্চায়েৎই গ্রামের দুর্বলতার কারণ হইবে ।
ভারতবর্ষের যে সকল গ্রামে এখনো গ্রাম্য
পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্তমান আছে—যে পঞ্চা-
য়েৎ কালক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার
পরিবর্তন অনুসারে স্বভাবতই স্বাদেশিক
পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত—যে গ্রাম্য
পঞ্চায়েৎগণ একদিন স্বদেশের সাধারণকার্যে
পরস্পরের মধ্যে বোগ বাধিয়া দাঁড়াইবে এমন
আশা করা যায়, সেই সকল গ্রামের পঞ্চা-
য়েৎগণের মধ্যে একবার যদি গবর্মেণ্টের
বেনো-জল প্রবেশ করে, তবে পঞ্চায়েতের

পঞ্চায়তত্ব চিরদিনের মত বৃদ্ধিলা । দেশের
জিনিষ হইয়া তাহার। যে কাজ করিত,
গবর্মেণ্টের জিনিষ হইয়া তাহার সম্পূর্ণ
উন্টারকম কাজ করিবে ।

ইহা হইতে আমাদের কৈ বুঝিতে হইবে,
দেশের হাত হইতে আমরা যে ক্ষমতা পাই,
তাহার প্রকৃতি একরকম, আর পরের হাত
হইতে বাহা পাই, তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্ত-
রকম হইবেই । কারণ, মূল্য না দিয়া কোনো
জিনিষ আমরা পাইতেই পারি না । সুতরাং
দেশের কাছ হইতে আমরা বাহা পাইব, সে-
জন্য দেশের কাছেই আপনাকে বিকাইতে
হইবে—পরের কাছ হইতে বাহা পাইব,
সেজন্য পরের কাছে না বিকাইয়া উপায়
নাই । এইরূপ বিদ্রাশিকার অযোগ্য যদি
পরের কাছে মাগিয়া লইতে হয়, তবে শিক্ষাকে
পরের গোলামি করিতেই হইবে—বাহা
স্বাভাবিক, তাহার জন্য আমরা বুঝা চীৎকার
করিয়া মরি কেন ?

দৃষ্টান্তস্বরূপ আর একটা কথা বলি ।
মহাজনেরা চাষীদের অধিক শুদে কর্ত্ত
দিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিতেছে, আমরা
প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায় জানি না—
অতএব গবর্মেণ্টকেই অথবা বিদেশী মহা-
জনদিগকে যদি আমরা বলি যে, তোমরা
অল্পশুদে আমাদের গ্রামে গ্রামে কৃষিগোপ
স্থাপন কর, তবে নিজে খর্দের ডার্কিয়া-আনিয়া
আমাদের দেশের চাষীদিগকে নিঃশেষে
পরের হাতে বিকাইয়া দেওয়া হয় না ?
বাহারা যথার্থই দেশের বল, দেশের সম্পদ,
তাহাদের প্রত্যেকটিকে কি পরের হাতে
এমনি করিয়া বাধা রাখিতে হইবে ? আমরা

যে পরিমাণেই দেশের কাজ পরকে দিয়া
করাইব, সেই পরিমাণেই আমরা নিজের
শক্তিকেই বিকসিত করিব, দেশকে স্বচ্ছ-
কৃত অধীনতাপাশে উত্তরোত্তর অধিকতর
বাধিতে থাকিব, এ কথা কি বুঝা এতই
কঠিন? পনের প্রদত্ত ক্ষমতা আমাদের
পক্ষে উপস্থিত সুবিধার কারণ যেমনই হোক,
তাহা আমাদের পক্ষে ছদ্মবেশী অভিসম্পাত,
এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের যত বিলম্ব
হইবে, আমাদের মোহজাল ততই চূড়চূড়
হইয়া উঠিতে থাকিবে ।

অতএব আর দিখা না করিয়া আমাদের
গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য্য আমরাগকে
নিজের হাতে লইতেই হইবে । সরকারী
পঞ্চায়তের মূষ্টি আমাদের পক্ষীয় কণ্ঠে দৃঢ়
হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লিপঞ্চা-
য়েকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে । চাষীকে
আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সম্বন্ধনগকে
আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই
সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান
করিব এবং সর্ব্বমুখে মামলার হাত হইতে
আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই
বাচাইব । এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার
কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে—
কারণ, এখানে সাহায্য লইবার অর্থই দুর্ব্বলের
স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া
আনিয়া বসানো ।

একবার শিবেচনা করিয়া দেখিবেন,
বিদেশী শাসনকালে বাংলাদেশে যদি এমন
কোনো জিনিষের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যাহা
লইয়া বাঙালি স্বার্থ দৌরব করিতে পারে,
তাহা বাংলাসাহিত্য । তাহার একটা প্রধান

কারণ, বাংলাসাহিত্য সরকারের নৈমক
খায় নাই । পূর্বে প্রত্যেক বাংলাবই সর-
কার ডিনধানি করিয়া কিনিতেন, শুনিতে
পাই এখন মূল্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন ।
ভাগই করিয়াছেন । গবর্মেণ্টের উপাধি,
পুরস্কার, প্রসাদের প্রলোভন বাংলাসাহিত্যের
মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়াই,
এই সাহিত্য বাঙালির স্বাধীন আনন্দ-উৎস
হইতে উৎসারিত বলিয়াই, আমরা এই
সাহিত্যের মধ্য হইতে এমন বল পাইতেছি ।
হয় ত গণনায় বাংলাভাষায় উচ্চশ্রেণীর
গ্রন্থসংখ্যা অধিক না হইতে পারে, হয় ত
বিষয়বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য অন্তান্ত সম্পৎ-
শালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে, কিন্তু
তবু ইহাকে আমরা বর্তমান অসম্পূর্ণতা
অতিক্রম করিয়া বড় করিয়া দেখিতে পাই,
কারণ, ইহা আমাদের নিজের শক্তি হইতে,
নিজের অহংকার মধ্য হইতে উদ্ভূত হইতেছে ।
এ ধীর হউক দীন হউক, এ রাজার প্রত্নের
প্রতালী নহে, আমাদেরই প্রাণ ইহাকে প্রাণ
জোগাইতেছে । অপর পক্ষে, আমাদের
বাংলাবইগুলির প্রতি ন্যূনাত্মকপরিমাণে
অনেকদিন হইতেই সরকারের গুরুহস্তের
ভার পড়িয়াছে, এই রাজপ্রসাদের প্রভাবে
স্থলবইগুলির কিরূপ শ্রী বাহির হইতেছে,
তাহা কাহারো অগোচর নাই ।

এই যে স্বাধীন বাংলাসাহিত্য, যাহার
মধ্যে বাঙালী নিজের প্রকৃত শক্তি স্বার্থভাবে
অনুভব করিয়াছে, এই সাহিত্যই নাড়িজালের
মত বাংলার পূর্বপশ্চিম, উত্তরদক্ষিণকে
এক বন্ধনে বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে এক
চেতনা, এক প্রাণ সঞ্চার করিয়া রাখিতেছে ;

যদি আমাদের দেশে স্বদেশীসভাস্থাপন হয়, তবে বাংলাসাহিত্যের অভাবমোচন, বাংলা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন সভাগণের একটি বিশেষ কার্য্য হইবে। বাংলাভাষা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা তাঁহা-দিগকে করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বাংলাসাহিত্য যত উন্নত-সতেজ, ততই সম্পূর্ণ হইবে, ততই এই সাহিত্যই বাঙালীজাতিকে এক করিয়া ধারণ করিবার অনবরত আধার হইবে। বৈষ্ণবের গান, কৃষ্ণবাসের রামায়ণ, কাশিরামদাসের মহা-ভারত আজ পর্য্যন্ত এই কাজ করিয়া আসিয়াছে।

আমি জানি, সমস্ত বাংলাদেশ একমুহূর্তে একত্র হইয়া আপনাব নায়ক নির্দাচনপূর্ব্বক আপনাব কাজে প্রবৃত্ত হইবে, এমন আশা করা যায় না। এখন আর বাদবিবাদ-তর্ক-বিতর্ক না করিয়া আমরা যে কয়জনই উৎসাহ অনুভব করি, প্রয়োজন সৌকার করি, সেই পাঁচশ জনই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্দাচন করিব, তাঁহার নিয়োগ-ক্রমে জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব, কর্তব্য পালন করিব, এবং সাধ্যমতে আপনাব পরি-বার, প্রতিবেশী ও পল্লিকে লইয়া সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধানসম্বন্ধে একটি স্বকীয় শাসনজাল বিস্তার করিব। এই প্রত্যেক দলের নিজের পাঠশালা, পুস্তকালয়, ব্যায়ামাগার, বাসহার্য্য দ্রব্যাদির বিক্রয়ভাণ্ডার (Co-operative Store), ঔষধালয়, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক, সালিশ-মিস্ত্রির সভা ও নির্দোষ আমোদের মিলন-গৃহ থাকিবে।

এমনি করিয়া যদি আপাতত খণ্ডখণ্ড-ভাবে দেশের নানাস্থানে এইরূপ একএকটি কর্তৃসভা স্থাপিত হইতে থাকে, তবে ক্রমে একদিন এই সমস্ত খণ্ডসভাগুলিকে যোগ-স্থরে এক করিয়া তুলিয়া একটি বিশ্ববঙ্গ-প্রতিনিধিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষংকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেদের পরের কাছে প্রচার না করিয়া নিজের সাধ্যমত সদেশের পরিচরলাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করিতেছেন। এই পরিষংকে জেলায় জেলায় আপনাব শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে—এবং পর্য্যায়ক্রমে একএকটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার—এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন সাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষং গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে—এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনু-কূল্যে আহ্বান করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে সচেতন হইতে হইবে।

যখন দেখা যাইতেছে, বাহির হইতে আমাদের বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা নিরত সতর্ক রহিয়াছে, তখন তাহার প্রতিকারের জন্ত নামারূপে কেবলি দল নামিবার দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে।

যে গুণে মানুষকে একত্র করে, তাহার

মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা । কেবলি
অন্তকে খাটো করিবার চেষ্টা, তাহার ক্রটি
ধরা, নিজেকে কাহারো চেয়ে ন্যূন মনে না
করা, নিজের একটা মত অনাদৃত হইলেই
অথবা নিজের একটুখানি সুবিধার ব্যাঘাত
হইলেই দল ছাড়িয়া আসিয়া তাহার রিক্কা-
চরণ করিবার প্রয়াস—এইগুলিই সেই
সরতানের প্রদত্ত বিষ, যাহা মানুষকে বিস্মিত
করিয়া দেয়, যজ্ঞ নষ্ট করে, ঐক্যবন্ধন
জগৎ আমাদিগকে অব্যোপ্যের কর্তৃত্বও স্বীকার
করিতে হইবে—ইহাতে মহান্ সকলের নিকট
নত হওয়া হয়, অব্যোপ্যতার নিকট নহে ।
বাঙালীকে ক্ষুদ্র আত্মাভিমান দমন করিয়া
নানারূপে বাধ্যতার চর্চা করিতে হইবে,
নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা মন হঠাতে সম্পূর্ণ-
রূপে দূর করিয়া অন্তকে প্রধান করিবার চেষ্টা
করিতে হইবে । সর্বদাই অন্তকে সন্দেহ
করিয়া, অবিশ্বাস করিয়া, উপহাস করিয়া
তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিয়া বরঞ্চ নম্র-
ভাবে বিনা বাকাব্যয়ে ঠকিবার জন্তও প্রস্তুত
হইতে হইবে । সম্প্রতি এই কঠিন সাধনা
আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে—আপনাকে ধর্ম
করিয়া আপনাদিগকে বড় করিবার এই সাধন,
গর্বেকে বিসর্জন দিয়া গৌরবকে আশ্রয়
করিবার এই সাধনা—ইহা যখন আমাদের সিদ্ধ
হইবে, তখন আমরা সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের
যথার্থরূপে যোগ্য হইব । ইহাও নিশ্চিত,
যথার্থ যোগ্যতাকে পৃথিবীতে কোন শক্তিই
প্রতিরোধ করিতে পারে না । আমরা যখন
কর্তৃত্বের কমতা লাভ করিব, তখন আমরা
দাসত্ব করিব না—তা আমাদের প্রকৃত স্বভাব
প্রবল হউন । জল যখন জমিয়া কঠিন হয়,

তখন সে লোহার পাইপকেও কাটাইয়া ফেলে ।
আজ আমরা জলের মত ভরল আছি, যন্ত্রীর
ইচ্ছামত স্বতন্ত্রের তাড়নার লোহার কলের মধ্যে
শতশত শাখাপ্রশাখার দাবিত হইতেছি—
জমাট বাধিবার শক্তি জন্মিলেই লোহার
বাধনকে হার মানিতেই হইবে ।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ
ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্রের
লেশমাত্র কারণ দেখি না । বাহিরের কিছুতে
আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা
কোনোমতেই স্বীকার করিব না । কৃত্রিম
বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে,
তখনই আমরা সচেতনভাবে অসুভব করিব
যে, বাংলার পূর্বপশ্চিমকে চিরকাল একই
জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাধিয়াছেন,
একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে
গ্রহণ করিয়াছেন, এই পূর্বপশ্চিম, জুপিণ্ডের
দক্ষিণবাম অংশের স্তায়, একই পুরাতন
রক্তশ্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরার
প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে ; এই পূর্ব-
পশ্চিম, জননীর বামদক্ষিণ স্তনের স্তায়,
চিরদিন বাঙালির সন্তানকে পালন করিয়াছে ।
আমাদের কিছুতে পৃথক্ করিতে পারে,
এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের
কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং
তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা
ছাড়া আর কোন কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে
পারে না । কর্তৃপক্ষ আমাদের একটা-কিছু
করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমূল্য যদি
আমাদের সকলদিকে সর্বনাশ হইয়া পেল
বলিয়া আশঙ্কা করি, তবে কোন কৌশলকে
সুযোগে, কোন প্রাণনাশক অত্যাচারে

আমাদিগকে অধিকদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে বাহা দিয়াছেন, তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি, তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্ত গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন, যাহাতে বিধি-মত কর্ণ করিলে ফললাভ হইতে কখনই বঞ্চিত হইব না। বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন হাত বাড়াইলেই পাওয়া বাইবে না, তখনই ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু চিরন্তন প্রেম লক্ষীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্ত গোষ্ঠীর অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষার ভ্রাতৃ-গণের সহিত সুখদুঃখ-লাভকতি-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, তখনই ব্রিটিশ

শাসনকে বলিব ধন্য—তখনই অনুভব করিব, 'বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। আমরা যাচিত ও অযাচিত যে-কোনো অনুগ্রহ পাইয়াছি, তাহা যেন ক্রমে আমাদের অঞ্জলি হইতে স্থলিত হইয়া পড়ে এবং তাহা যেন স্বচেষ্টায় নিজে অর্জন করিয়া লইবার অবকাশ পাই। আমরা প্রার্থনা চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা কেহ করিয়ে না—আরাম আমাদের জন্ত নহে, পরবশতার অহিবেশের মাত্র। প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—বিধাতার রুদ্রমুর্ত্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ! জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।

প্রেমের কামনা ।

আমি ত বুঝি না, তারে কেন ভালবাসি,

সেই হাসি—সেই মুখ.

সেই প্রেমভরা বুক :

যে বলে বলুক রূপে নাহি জ্যোৎস্নাহাসি.

আমি ভালবাসি তার শ্রাম শোভারামি

২

চাহি না ফুলের রূপ, জ্যোৎস্না হাসিময়,

ফুল কেলে—জ্যোৎস্না কেলে,

ভালবাসি অবহেলে,

নব নীরদের ছবি, শ্রাম কিশলয়,

তাই ও রূপের কাছে কোন রূপ নয়।

৩

যত দেখি, রূপ তত উথলে নয়নে ;
 প্রেম যেন মূর্ত হ'য়ে,
 আছে তারি রূপ ল'য়ে,
 তাই সে আনন্দচ্ছবি সদা জাগে মনে,
 প্রীতির নিব্বার করে তার দরশনে ।

৪

চিরপরিচিত কোন সঙ্গীত মধুর—
 যেমন পাগল করে,
 যেমন মানস হরে,
 তেমনি সে রূপে বুঝি আছে কোন সুর,
 তিরপিত করে মোর পরাণ বিধুর ।

৫

যেমন বিশ্বের আলো, বাতাস যেমন,
 তেমনি গো রূপ তার
 ব্যাপি' মোর চারিধার,
 তেমনি উদার আর প্রশান্ত তেমন,
 তাই ভালবাসি তায় থাকিতে মগন ।

৬

সাধ যায়—ফুল হ'য়ে হই উপচার ;
 ফুটে থাকি তারি তরে,
 তেমনি আনন্দভরে ;
 আপনারে করে' রাখি পূজা-উপহার,
 তাতেই রুতার্থ করি জীবন আমার ।

শ্রীগিরিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ।

দেশের মাটি ।

(বাউলের স্বর)

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বমন্নার
(তোমাতে বিশ্বমান্নের)
অঁচল পাতা ।

তুমি . মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ স্তামলবরণ কোমলমুষ্টি
মন্থে গাঁথা—

তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে ।
তোমার 'পরেই থেলা আমার
হৃদয়ে স্থখে ।

তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা ।

অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু, জানিনে যে কিবা তোমার
দিয়েছি মা !

আমার জনম গেল মিছে কালে,
আমি কাটাই দিন অরের মাঝে,
ওমা বুধা আমার শক্তি দিলে শক্তিদাতা !

বঙ্গদর্শন ।

বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা ।

বাংলাদেশের প্রবল ও প্রচলিত রাজ-
নৈতিক আন্দোলন-আবেদনাদির আন্তরিক
অসারতা বর্তমান বঙ্গবিভাগস্বাক্ষর সাধারণ
বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে অতিশয় ক্রেশকররূপে
প্রকাশিত হইয়াছে। বহুকাল হইতে
রাজকীয়-শাসনসংরক্ষণ-বিষয়ে বাংলাদেশের
বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে একটা ঐক্যভাব
ও ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিয়াছে, যে ঐক্য
ও পরস্পরের সঙ্গে গভীর সহানুভূতি ও সতেজ
সহকারিতার সম্বন্ধ ইদানীন্তন রাজকীয় বিধি-
ব্যবস্থা ও আধুনিক শাসননীতির নিষেধণে
ও নিপীড়নে আরো ঘনীভূত ও ঘনিষ্ঠতর
হইয়া উঠিতেছিল, ইংরেজরাজ ইহা হইতে
কথঞ্চিৎপরিমাণে আপনায় ভবিষ্যৎ অমঙ্গল
বা অশান্তি আশঙ্কা করিয়া এই ঐক্যবন্ধন
ছিন্ন করিতে বহুপরিকর হইয়াছেন বলিয়া,
সংবাদপত্র ও বক্তৃতামধ্য হইতে ঘোষণা
বাহির হইয়াছে যে, বাংলাদেশের আপামর
সাধারণ সকলে যোরতর শোকাচ্ছন্ন হইয়া
পড়িয়াছে। বস্তুতই কি তাই হইয়াছে?
বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে একটা অতৃপ্তপূর্ব
ভাবে বক্তা ছুটিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা

যায় না। কিন্তু এ ভাবে কি শোকনামে
কদাপি অভিহিত করিতে পারা যায়? শোকা-
হত হইয়াই কি বাংলার ধনিবর্গ “প্রভো
সংহর সংহর” বলিয়া রাজদ্বারে তারতর
চীৎকার ও তারযোগে আবেদন-আর্জিনাদ
তুলিয়াছেন? শোকাচ্ছন্ন হইয়াই কি অজ্ঞান-
তিমিরাচ্ছন্ন ইংরেজের কোমল-কষল-লালিত
অনুপস্থিকে ভঙ্গ করিবার জ্ঞাত আমাদের রাজ-
নৈতিক নেতৃবর্গ সশরীরে বিলাতযাত্রা করিয়া
প্রবল ক্রন্দনের খোল তুলিবার বিপুল আয়ো-
জন করিতেছেন? যে ভাবে দেশ মাতিয়াছে,
তাহাকে কি শোক বলে? এ সকল প্রশ্ন
তুলিলেই আমাদের এই সকল আন্দোলন-
আফালনের আন্তরিক অসারতা প্রকাশিত
হইয়া পড়ে।

এ ভাবে আমরা শোক বলিতেছি শুদ্ধ
এইজন্য যে, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম ও সত্য প্রকৃতি
ব্যক্ত করিতে পারি, ইংরেজের লোহিত-
লোচনসম্মুখে আমাদের প্রাণে এমন সাহস
হয় না। গভীর বিরাগ, বিজাতীয় বিবেচ,
অপরিসীম সন্ধিহতা ও অবিধ্বাস, এ সকলেই
আমাদের প্রাণে ইংরেজরাজের এই অমঙ্গল-

সকল জাগিয়া উঠিয়াছে । ইংরেজের দণ্ডবিধির ভয়ে এ সকল ভাবে আমরা যথাসম্ভাব্যে ব্যক্ত করিতে সাহস পাই না । তাই বলিয়া আমরা আমাদের অমল লোচনকে কৃষ্ণ অব-
শুষ্ঠনে আবৃত করিয়া এই অলীক শোকের হাহাকার তুলিয়াছি । ইংরেজের চক্ষে ধূল দিবার ইচ্ছাতেই আমরা হাতে কালো ফিতা বাধিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলাম । তারই জন্ত আমরা আমাদের বিরাট সভার দিনে বহুল অর্থের অপব্যয় করিয়া সভাসম্পদকে কৃষ্ণবস্ত্রমণ্ডিত করিবার জন্ত এত ব্যয় হইয়া উঠিয়াছিলাম । তারই জন্ত আমরা এই অলীক শোকের কথা এমন তারতম্যে দেশ-
মধ্যে প্রচার করিতেছি । প্রকৃতপক্ষে যে, দেশে এই বঙ্গবিভাগ লইয়া একটা শোকের উদ্ভাস উঠিয়াছে, ইহা নহে ।

ফলত, ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে শোকের কারণই বা কি আছে ? ইংরেজ তাহার স্বার্থ-
সাধনের জন্তই এদেশে আসিয়াছে, আমা-
দিগের উদ্ধারসাধনের জন্ত নহে । এত-
দিনেও যদি আমরা এই সামান্ত কথাটা না বুঝিলাম, তবে আমাদের বিচারবুদ্ধিকে
ধিক,—শতধিক ধিক । আপনার স্বার্থসাধন
করিতে যাওয়া, আপনার শ্রেষ্ঠত্বপ্রয়োগে
ইংরেজ যদি আমাদের অনিষ্টসাধন করিতে
যায়, তাহাতে আমাদের কোতের কারণ
থাকিতে পারে, শোকের কারণ কি আছে,
বুঝি না । অন্তিমানেও একপ্রকার শোকের
উদ্বেগ হয়, কিন্তু ইংরেজ কি এতদিন ধরিয়া
আমাদিগকে এতটাই ভালবাসিয়া আসিয়াছে
যে, আজ সে সহসা বিষম হইল বলিয়া ক্রীড়ন-
ব্যবহুলত অভিমানভরে আমরা ক্রন্দন

করিতে বসিব ? ইংরেজ প্রেমের হাট বসা-
ইতে এদেশে আসে নাই, আপনার পণ্য-
বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল । এতই অতিশয়
জানা কথা । তবে, আমাদের হৃদয়
ও হীনবল করিয়া সে, আপনার প্রভুশক্তিকে
সর্ববিধ উপায়ে এদেশে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিতে
চাহিতেছে, ইহার জন্ত আমরা এত অধীর
হইয়া এরূপ শোকের অভিনয় করিব কেন ?
ইহাতে আমাদের অকল্যাণ ভিন্ন কদাপি
কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না ।

অলীক কথা লইয়া অতিশয় আলোচনা-
আন্দোলন করিলে, সেই শব্দের অন্তর্ভুক্তী
ভাব ও চরিত্র পর্য্যন্ত আন্দোলনকারীর স্বভাবে
হ্রস্ববস্তুর সংক্রমিত হইয়া থাকে, ইহা
মনস্তত্ত্বের একটা অতি স্থূল কথা । এই-
জন্তই এই শোকধ্বনিতে আমাদের বৈধা-
হানির বিশেষ আশঙ্কা করিতেছি । শোকে
লোককে অধীর করে,—আমরা চাই আজ
অশেষ বৈধা । শোকে লোককে ত্রিস্রয়
করে,—আমরা চাই আজ প্রবলজীবনের
অপরাজেয় নীধি । শোকে মানুষকে হতাশ
করে,—আমরা চাই আজ বিপুল বিশ্বের সমগ্র
আশাকে হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া বিশ্বমানবের
বিশাল কোড়ে বাঙালীজাতির জন্ত যে
বিধাতৃনির্দিষ্ট স্থান অনাদিকাল হইতে বিশ্বের
অবিরাম পরিণামের মধ্য দিয়া প্রসৃত হইয়া
আসিয়াছে, তাহাতে উপবেশন করিতে ।
জাতীয়জীবনের এই অভিনব উদ্বীপনাকালে
কি এই অলীক শোকের অভিনয় আমাদের
আর সাধে ? ইহাতে ইংরেজের প্রসাদলাভ
কেন হইবেই না, আমাদেরও শক্তি বা চরিত্র
লান হইবে না ।

আমরা আপনাদিগের অন্তরে শক্তি বা চরিত্র লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া, কেবল ইংরেজরাজের প্রসাদলাভের জন্য আকুল হইয়া এতকাল বিপুল অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিয়া আসিয়াছি । আমাদের প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলন-অনুষ্ঠানের দ্বারা এই-জন্তই আমরা ক্রমশঃ হতাশাস ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছি । ইংরেজরাজনীতি ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের কতকগুলি বাধা গত, সাধিরা সাধিরা আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা, আলোচনা ও চেষ্টার মৌলিকতা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা আজ পর্যন্ত তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, ইহারই জন্য আমাদের সমুদায় চেষ্টা এমন ব্যর্থ হইয়া গাইতেছে । এখনো যদি অবস্থা-অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে না পারি, বঙ্গবিভাগসম্বন্ধীয় যে আন্দোলন-আলোচনা হইতেছে, তাহাও নিশ্চয়ই একান্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে ।

এইজন্য সর্বপ্রথমে প্রকৃত অবস্থাটা যে কি, তাহা বিশদরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে ; অলীক শব্দসম্বন্ধে বাইরা শুদ্ধ পথভ্রান্ত হইয়া শক্তিকর করিলে চলিবে না । প্রথমতঃ ইংরেজ যদিই বা বাংলাদেশকে বিভাগ করিয়া ফেল, তাহাতে আমাদের প্রকৃত অনিষ্টসম্ভাবনা কি, ইহা বুঝিতে হইবে ; তার পর, সে কেন এ অনিষ্টসাধনে উদ্বৃত্ত হইয়াছে, তাহারই বা ইহাতে 'স্বার্থ বা সুবিধা কি, এ কথাও ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে হইবে । এইরূপ আমাদের দিক্ দিয়া ও ইংরেজের দিক্ দিয়া, এই উভয় দিক্ হইতে বীরভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিলে তাহার প্রকৃত

মর্থ উল্কাটিত হইয়া পড়িবে, এবং প্রকৃত অবস্থা একবার পরিষ্কৃষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইলে যথাবিহিত ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না ।

প্রথমতঃ বাংলাদেশ যদি সত্যসত্যই বিভক্ত হইয়া যায়, তাহাতে আমাদের কিরূপ অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা, ইহার আলোচনা করা যাউক । এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সত্যকথ্যুটী পরিষ্কার ভাষায় আজ পর্যন্ত অতি অল্প লোকেই ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় । সে কথাটা যে কেহ বোঝেন নাই, এমন মনে করি না । কথাটা এত জটিল নয় যে, তাহা অতি সামান্য বুদ্ধি লইয়াও কেহ বুঝিতে পারিবেন না । বিষয়টা চক্ষের উপরেই পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু পশুপাক্ষস্থ মৃতদেহ দেখিয়া ভীক লোকে যেমন চোক বুজিয়া সরিয়া যায়,—কি জানি তাহা দেখিলে ও তাহার কথা ব্যক্ত করিলে পরিণামে আপনাকেই খুনদারে পড়িতে হয়, সেইরূপ কি জানি এই বঙ্গ-বিভাগের মূল উদ্দেশ্যটা কি, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিলে রাজদ্বারে রাজভক্তহীনতা-অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া লাহিত হইতে হয়, এই ভয়ে বুঝিয়া-সুঝিয়াও অনেকে তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহসী হন নাই । গতবৎসর এই বিষয়ে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই এই মূল উদ্দেশ্যটাকে চাপা দিয়া, অবাস্তব বিষয়েরই আলোচনা ও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । এইজন্য এত সহজে লাট কার্জন তাহার ঢাকা, মৈমনসিং ও চট্টগ্রামের বঙ্গ-ভায়, বাংলাবিভাগের বিরুদ্ধে আমরা বা-কিছু আপত্তি তুলিয়াছিলাম, তাহা অমন করিয়া খণ্ডন করিতে পারিয়াছিলেন । সত্য কথাটা

একবার সাহস করিয়া যদি আমরা বলিতে পারিতাম, শাসনের সুবিধার জন্ত নহে, কিন্তু গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্ত যে এই বঙ্গবিভাগপ্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, এ কথা যদি স্পষ্ট করিয়া একবার বলিতাম, লাট কার্জন তাঁহার অসাধারণ বিচারশক্তি ও অলোককুটিল যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াও আমাদের আপত্তিখণ্ডন বা আমানিগের যুক্তিবলকে অপিতত, অধিকৃত ও পরাভূত করিতে পারিতেন না।

বাংলাবিভাগের বিরুদ্ধে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা অধিকাংশস্থলেই আমার নিকটে নিতান্ত অলীক ও অসার বলিয়া মনে হয়। সাক্ষাৎভাবে এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা আমাদের মানসিক বা নৈতিক, বা অর্থগত বা সমাজগত কোন বিশেষ অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা আছে, ইহা আমি মনে করি না। আমাদের মানসিক জীবন দেশের পাঠশালা, স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। শিক্ষাবিষয়ক এই সকল প্রতিষ্ঠান ইংরেজরাজের শিক্ষানীতি দ্বারা সর্বত্রই পরিচালিত হইতেছে। সে নীতি পূর্ববঙ্গে যেমন, পশ্চিমবঙ্গেও সেইরূপই সমভাবে কার্য্য করিবে। পূর্ব্বকার অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন, এখন যে একই শিক্ষানীতি দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষের লোক-শিক্ষার অগ্রদূতান ও প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালিত হইতেছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। বাংলা বিভক্ত হইয়া, পূর্ব্ব-পশ্চিম দুই ভাগ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেই যে এই শিক্ষানীতি দুই বিভাগে দুইরূপ হইবে,

তাহা নহে। সুতরাং এই বিভাগপ্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, আমাদের মানসিক জীবনে সাক্ষাৎরূপে যে কোনপ্রকারে বিশেষ বিসদৃশ ভাব বা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙালীজাতির বর্তমান মানসিক ঐক্যবন্ধন শিথিল বা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, এমন আশঙ্কা করিবার কিছু কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

রাজকীয় বিধিব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সমস্যার সমতা হইতে চিন্তা, ভাব ও আদর্শ বিষয়ে জাতীয়জীবনে যে মানসিক ঐক্য স্থাপিত হয়, একই শাসনাধীনে বাস করিয়া বাঙালীজাতির মধ্যে যে ঐক্যবন্ধন উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল, এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা তাহাও যে সাক্ষাৎভাবে শিথিল বা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, এমন আশঙ্কাও করি না। কারণ, রাজকীয় বিধিব্যবস্থা, নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনেও, প্রজামণ্ডলীয় অবস্থারই অনুসরণ করিয়া রচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। আর বাংলাদেশের প্রজাসাধারণের সর্ববিধ অবস্থা পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে যখন একইরূপ রহিয়াছে, ও মোটামুটি একইরূপ থাকিয়াও যাইবে, তখন বাংলার দুই বিভাগে যে রাজকীয়-বিধিব্যবস্থা-জনিত কোন একটা বিশেষ পার্থক্যের সৃষ্টি হইতে পারিবে, এমন ভাবিবার কোন উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গে যে সকল আইনকাঁড়ন সময়-সময় প্রচলিত হইবে, পূর্ব্ববঙ্গেও প্রায় তাহাই হইবে।

এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা যে বাংলা-সাহিত্যের কোন অনিষ্ট হইবে, এমনও সম্ভাবনা

দেখি না। বাংলাসাহিত্য ইংরেজের সংসর্গে অসাধারণ সজীবতা ও প্রসার লাভ করি-
 রাছে, সত্য ; কিন্তু তাহা ইংরেজের শাসন-
 নীতির দ্বারা হয় নাই, ইংরেজী ও পাশ্চাত্য
 দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যেরই দ্বারা
 হইয়াছে। বাংলা' বিভক্ত হইয়া গৈলে
 দেশমধ্যে পাশ্চাত্যসাধনার চর্চা ও প্রভাব
 যে কোনরূপে হ্রাস হইয়া যাইবে, তাহার
 কোন উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাইতেছি
 না। অতএব তদ্বারা যে বাংলাসাহিত্যের
 শক্তিহ্রাস বা অধিকার সঙ্গীর্ণক্ষেত্রে আবদ্ধ
 হইবে, এ আশঙ্কাও করি না। বাংলা-
 সাহিত্য বাঙালীজাতির সাধারণ সম্পত্তি।
 এই সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে পূর্বে যেমন
 পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গ যথাশক্তি সাহায্য করি-
 রাছে, বঙ্গদেশ যদি রাজ-আদেশে দ্বিধা বিভক্ত
 হইয়া যায়, তাহার পরেও সেইরূপ পূর্ব-
 পশ্চিম সম্মিলিত হইয়াই, এই সাধারণ
 সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টিসাধনে রত হইবে।
 স্কুলপাঠ্যের বাহিরে বাংলাসাহিত্যের উপরে
 বিদেশীয় ইংরেজরাজের হাত সাক্ষাৎভাবে
 আজ পর্যন্ত পড়ে নাই, কখনো পড়িতে
 পারিবেও না। আর স্কুলের পাঠ্যের দ্বারা
 সাহিত্যের বেহুষ্টি কোথাও হয় না, আমা-
 দের মধ্যেও হইবে না। এই সকল কারণে
 এই বঙ্গবিভাগপ্রস্তাব কার্য্যে পরিণত
 হইলেই যে অবশ্রম্ভাবিক্রমে বাংলাসাহিত্যের
 উপরে কোন বিশেষ অনিষ্টপাত হইবে,
 এইরূপ ভয় করিবার উপযুক্ত কারণ আছে,
 বলিয়া মনে হয় না।

এতদ্বারা যে আমাদের কোন অর্থগত
 অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, এ আশঙ্কাও

করি না। পণ্য ও বাণিজ্য, অর্থগতের এই
 প্রশস্ত পন্থা। এখন দেখে যে পরিমাণে
 পণ্য উৎপন্ন হইতেছে, বাংলাদেশে একজন
 লাটের স্থানে দুইজন লাট প্রতিষ্ঠিত হইলেই
 যে তাহাতে কোন হ্রাসবৃদ্ধি হইবে, এমন
 কল্পনা করাও সম্ভব নহে। গ্রাহকের
 প্রয়োজন দ্বারা সর্বত্রই পণ্যের পরিমাণ
 নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে,—রাজকীয় বিধিব্যবস্থার
 দ্বারা নহে। ভারতে ইংরেজরাজ্যে একটা
 সর্বজনীন অর্থনীতি বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত
 রহিয়াছে, তাহা ভারতের পণ্যবৃদ্ধিতে ভারত-
 বাসীর দৈন্যনিবারণের প্রতিরোধ করিয়া
 আসিয়াছে, সত্য। ভারতের পণ্য, এই
 ব্রিটিশ অর্থনীতিপ্রণাবে, ভারতসম্পদগণের
 দৈন্য দূর হয় নাই, হইতেছে না ; ব্রিটিশেরই
 ধনাগার পরিপূর্ণ ও ক্ষীণকায় হইয়া যাই-
 তেছে। বাংলাদেশের পূর্বপশ্চিমবিভাগ
 পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্তই থাকুক, আর পরস্পর
 হইতে নিচ্ছিন্নই হইয়া যাউক,—তাহা দ্বারা
 এই সর্বগ্রাসী ব্রিটিশ অর্থনীতির প্রকৃতি
 কিছুতেই পরিবর্তিত হইবে না। সুতরাং
 যতদিন এই অর্থনীতি রাজকীয় শাসনের
 অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকে, ততদিন কিছুতেই
 আমাদের এই নিদারুণ দৈন্য দূর হইবে না ;—
 বাংলা এক থাকুক আর দুই হউক, এ বিষয়ে
 আমাদের ভাগ্যপরিবর্তন করিতে পারিবে না।
 অত্মদিকে, বাংলার বাণিজ্যের লাভ যাহা-
 দেরই মুষ্টিগত হউক না কেন,—বাংলা-
 বিভাগের দ্বারা এই বাণিজ্যের পরিমাণের
 কিছুতেই হ্রাসবৃদ্ধি হইবে না। কলিকাতার
 ব্যবসায়িগণ ও ইংরেজ বণিকসম্প্রদায় এখন
 বাংলার সমুদায় বহির্বাণিজ্যকে আপনাদের

হস্তগত রাখিয়াছেন ; বঙ্গবিভাগপ্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে, এই বহির্বাণিজ্যস্রোত বিধা বিভক্ত হইয়া, এক ভাগ চট্টগ্রামে চলিয়া যাইবে, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে কলিকাতার যে ক্ষতি হইবে, চট্টগ্রামের সে-পরিমাণ শ্রীবৃদ্ধি হইবেই হইবে। বঙ্গবিভাগে কলিকাতার ব্যবসায়ী ও বণিকসম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কিন্তু সমষ্টিভাবে বিচার করিলে বাংলাদেশের বা বাঙালীজাতির অর্থগত লাভালাভ তদ্বারা বিশেষ কিছুই হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বরং চট্টগ্রামের শ্রীবৃদ্ধিতে মোটের উপরে যে বাণিজ্যবিস্তারের সম্ভাবনা আছে, তাহা দ্বারা কলিকাতা-বন্দরের বাণিজ্যের যতটুকু হ্রাস হইবার আশঙ্কা আছে, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎপরিমাণে অধিক হইবারই কথা। সে অংস্থায় চট্টগ্রাম কলিকাতার বাণিজ্য যতটা আশ্রয় করিবে, তদপেক্ষা যাকিছু নূতন পণ্য আমদানির প্রাধান্য করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে, এই নূতন বন্দরের প্রতিষ্ঠাদ্বারা সমগ্র বাংলাদেশের স্বল্পবিস্তর লাভবান হইবারই কথা।

সামাজিক বিষয়েও এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা আমাদের যে কোন গুরুতর অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, এমনও মনে হয় না। ইংরেজ আইনকানুন ও সিপাইসাজীরই বর্তা, আমাদের সমাজের প্রভু নহে। আমরা নিজের সামাজিক জীবন কাব্যত ইংরেজাদিকারের বাহিরে এখনো অনেকটাই পড়িয়া রুহিয়াছে। ইংরেজের প্রতি আমাদের বিশ্বাসভক্তি যে পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর যে কখনো আমরা যেচ্ছার তাহাকে আমরা নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের

স্বাভাব্য ও স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া আমাদের সামাজিক নেতৃত্বে বরণ করিব, এ আশা একদিন হয় ত আমরা কেহ কেহ করিতাম, এখন সে আশঙ্কা আর নাই। বিষম-উৎসাহ-গ্রস্ত সমাজসংস্কারকও এখন আর ইংরেজের হস্তে আপনাদের সামাজিক-কুরীতি-কুনীতি-সংশোধনের ভার কিঞ্চিৎপরিমাণেও অর্পণ করিতে সাহস পাইবে না। ইংরেজ দেশীয় জনসাধারণের এতটাই প্রজ্ঞাতাজন হইয়া উঠিয়াছে যে, সে যাহা স্পর্শ করিবে, তাহারই বিরুদ্ধে লোকের মন প্রবলভাবে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব ইংরেজ বাংলা-দেশকে দ্বিখণ্ডই করুক বা দ্বিশতখণ্ডই করুক, বাঙালী-হিন্দুসম্মাননের সামাজিক জীবন তদ্বারা কিছুতেই প্রত্যক্ষভাবে ভালমন্দ কোনদিকেই পরিবর্তিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

বর্তমান আলোচনে এ সকল মানসিক, নৈতিক, অর্থগত বা সামাজিক রীতিনীতিসম্বন্ধে বঙ্গবিভাগের দ্বারা যে অনিষ্টপাতের আশঙ্কা বর্ণিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অধিকাংশ-স্থলেই নিতান্ত অলীক ও অসার বলিয়া মনে হয়। এই সকল আপত্তির ও আশঙ্কার কোন মৌলিক শক্তি ও সারবত্তা নাই বলিয়াই ইংরেজ এই আলোচনকে নিতান্তই কল্পনাজড়িত ও শুদ্ধ ভাবুকাপ্রধান বা Sentimental বলিয়া মনে করিতেছে। কথাটাও তাহাই। এই বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবে আমাদের একটা বহুকাব্যোপবিত্ত ভাবে আঘাত লাগিয়াছে। আমরা বাঙালী সকলে এক হইয়া আছি, একই হইয়া থাকিতে চাই; আমাদের ভাষা এক, সাহিত্য এক, জাতীয় ইতিহাস এক;

ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক আধার ও আবেষ্টন, এক ; আমরা হিন্দু হই, মুসলমান হই,—মোটামুটি আমাদের পুরুষপুরুষপ্রাপ্ত প্রকৃতি ও কৌলিক জীবনপ্রবাহ একই মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া, গঙ্গাবিশ্বনাথারার স্তায়, একই জাতীয়জীবনধারার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। এই সকল প্রাচীন স্মৃতি ও সম্বন্ধকে ছিন্ন করিয়া সহস্র অকারণে এক অভিনব রাজ্য-কীর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংরেজ আমাদিগকে পূর্ব পশ্চিম এই দুই ভাগে বল-পূর্বক বিভক্ত করিলে, ইহা আমাদের মর্মে লাগে। এই মর্মে লাগটুকুই কেবল, এই Sentimental ভাবটাই কেবল, আমাদিগের আন্দোলন আবেদনের মধ্যে এককাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। যে বিধানের দ্বারা প্রজার কোন বাস্তবিক অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই,—কেবল তাহার একটা কল্পিত মন্থপীড়ামাত্র উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, প্রজারজনপ্রিয়সী রাজার পক্ষে সেরূপ বিধান প্রবর্তিত করাও অসম্ভব ও অসঙ্গত, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তাহাতে সভ্যসভ্যই রাজ্যের কোন বিশেষ ইষ্ট সাধিত হইবার স্থিরতা বা বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, তবে রাজাকে প্রজাবর্ণের কল্যাণার্থেই তাহাদের এইরূপ কল্পিত মন্থবেদনার প্রতি দৃকপাত না করিয়া, সেইরূপ বিধানকে প্রজামণ্ডলীর মতের বিরুদ্ধেও প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। ইংরেজ এই যুক্তি অঙ্গুলরণ করিয়াই এই বিষয়ের সমর্থন করিতেছে। আমাদের যুক্তিকে সবল ও ইংরেজের এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য, এই বঙ্গবিভাগের কথা উদ্দেশ্য কি, ইহা একটু

গভীরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথমত, আমাদের আপত্তি যে কেবলই বা মুখ্যত ভাবুকতাপ্রধান বা Sentimental এবং আমাদের অনিষ্টাশঙ্কা যে কেবলই কল্পিত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্ম ইংরেজও ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, আমরাও প্রকাশ করিয়া বলিতে বা আলোচনা করিতে অগ্র পর্য্যন্ত সাহস পাই নাই। তারই জন্য কেহ বুঝিয়াও, কেহ বা বস্তুতই না বুঝিতে পারিয়া, আমাদিগের এই আপত্তি ও আন্দোলনকে কেবলই Sentimental বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বা ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সত্য কথা এ নয়।

এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা আমাদের মানসিক জীবনের, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের, আমাদের আর্থিক বা সামাজিক বিশেষ অনিষ্ট হইবে, এ কথাটা কখনো আমরা ইহা জানি, ইংরেজও ইহা বিলক্ষণই বোঝে। আসল কথাটা এই যে, ইহা দ্বারা ইংরেজ এমন এক স্থানে কুঠারঘাত করিতে উদ্রত হইয়াছে, যাহার উপরে আমাদের সকল ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মুক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এই প্রস্তাবের দ্বারা ইংরেজরাজ আমাদের নবোন্মোচিত জাতীয়জীবনের, কেবল যে পেলব-পন্নবে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু তাহার মূলে একেবারে আপনায় স্থতীকৃত ছুরিকা ঢালাইবার চেষ্টা করিতেছে। যাহার উপরে আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি, সাহিত্যের সম্প্রসারণ, আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ও সামাজিক শক্তিসঞ্চার ও রাজনৈতিক মুক্তি-

লাভ, সকলই একান্ত নির্ভর করিতেছে, ইংরেজ এই প্রস্তাব করিয়া সেই বস্তুর আমূল উৎপাটিত ও বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ইহাই আমাদের আপত্তির কারণ।

প্রথমত আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের সর্ববিষয়ে সার্থকতালাভ আত্যন্তিকভাবে রাজনৈতিক স্বাভাব্যতা ও স্বাধীনতা লাভের উপরে নির্ভর করিতেছে। মানসিক উন্নতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের অবাধ চর্চা দ্বারা জাতির উদ্ভাবনী শক্তিকে ফুটাইয়া তোলা, প্রথমত শিক্ষার ও দ্বিতীয়ত সেই শিক্ষা হাতে-কলমে—কার্যে, জীবনে, চরিত্রে—মূর্ত্তিমত্তী করিয়া তুলিবার সুযোগ ও অবসরের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। শিক্ষা প্রণালী যদি এমন হয় যে, তাহার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও বৃত্তির যথাযথ বিকাশসাধন করা নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে ধর্ম বা সমাজ বা রাজ্যশাসনবিষয়ে কতকগুলি মত, ভাব ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা, তবে সে শিক্ষাদ্বারা শিক্ষার্থীর মানসিক বৃত্তির যথাযথ বিকাশসাধন কদাপি সম্ভব হয় না। ইংরেজের আধুনিক শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য আমাদের মানসিক উন্নতি-সাধনের সহায়তা করা নহে, কিন্তু ভারতে ইংরেজ-প্রভুশক্তির স্থায়িত্ব রক্ষা করা। এই-জন্ত এই শিক্ষা আমাদের জাতীয়জীবনের প্রাচীন গৌরবকাহিনীকে ঢাকিয়া রাখিয়া আমাদের চিরন্তন হীনতা ও বর্তমান বিদেশীয় রাজ্যজাতির শক্তি ও মহিমা দ্বারা আমাদের সর্বদা চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিবার জন্ত এমন অপরিণীত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে ;—যে সকল উপায়ে আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি ফুটিয়া উঠিতে পারে, সর্বদা

সশক্তিতে, নানা কৌশল অবলম্বনে তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে। রাজকার্যে ও স্বদেশের শিক্ষা, সম্পদ, সৌন্দর্য ও শক্তি-বিধানের শত্রুসুখ পছন্দ মানসিক শক্তি নিয়োগ ও মৌলিক গবেষণা করিবার অবাধ সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায়,—ইংরেজ সেগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সকল ক্ষেত্রে, সর্ববিধ বিষয়ে, দেশের রাজশক্তি তাহার হস্তগত আছে বলিয়া, ইংরেজ এদেশে হুকুমবরদার হইয়া রহিয়াছে ;—দেশের গণ্যমান্য, শিক্ষিত ও শক্তিশালী যে যেখানে আছে, হয় বিজনে পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণতা ও নির্জীবতার মধ্যে পড়িয়া আপনাদের স্বাভাবিক শক্তিরশির অপচর করিতেছে, অথবা ইংরেজের তাবদার হইয়া দাসের উপজীবিকা সংগ্রহ করিয়া স্বল্পবিস্তরপরিমাণে ইংরেজের প্রসাদভোগ করিতেছে। আপিসে ইংরেজ কর্তা, এদেশীয়গণ তাহার ভৃত্য। ব্যবসায়বাণিজ্যে ইংরেজ ধনী, এদেশীয়েরা কেবল জন খাটিয়া জীবনধারণ করিতেছে। জাতীয়জীবনের বিশাল কর্মভূমিতে যথাযোগ্য কর্তৃত্ব, সুযোগ ও অবসর আমাদের ভাগ্যে কদাপি লাভ হয় না। এ অবস্থায় আমাদের মানসিক, নৈতিক, আর্থিক বা সামাজিক কোনপ্রকারের উন্নতিলাভের আশা অলীক কল্পনামাত্র।

অগ্রে অগ্রে আমরা এইটুকু বুঝিয়া উঠিতে-ছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমাদের নবোন্মোচিত জাতীয়জীবনকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। ইংরেজ শাসনক্ষেত্রে অধিকার করিয়া আছে, থাকুক। পুলিশ-

পাহারার ভার এবং এই পুলিশ-পাহারার জন্তই রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করিবার ভারও সে আপনার হাতে রাখিবে, তাহাও রাখুক। আইনকানুন বাহা করিতে হয়, সে করুক। এ সকল বিষয়ে আমরা এখন তাহাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, আমাদের সে শক্তি নাই। কিন্তু এই সকলের বাহিরে যে বিশাল কর্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে, যথাসাধ্য আমরা অগ্রে সে ক্ষেত্র অধিকার করিতে চেষ্টা করিব। দেশের লোকের শিক্ষার ভার আমরা স্বহস্তে যথাসাধ্য গ্রহণ করিব। দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার যথাবিহিত উপায় রাজশাসননিরপেক্ষ হইয়া যতটা অবলম্বন করা সম্ভব, আমরা স্বয়ং তাহা করিব। দেশের শিক্ষিতদের সঙ্গে আপামর সাধারণের স্বাভাবিক নেতৃত্ব-সম্বন্ধ যতটা বর্তমান-অবস্থায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব, ইংরেজের শাসননীতির কুটল গতির প্রতি বিন্দুমাত্রও ক্রক্ষেপ না করিয়া, আমরা তাহার যথাযোগ্য উপায় উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা করিব। এইরূপে বিবিধ ক্ষেত্রে, বিবিধ উপায়ে স্বজাতির আভ্যন্তরীণ প্রজা-শক্তিকে উৎসুক করিয়া, জাতীয়জীবনের প্রতি-ষ্ঠার চেষ্টা চারিদিকেই হইতেছিল। এই চেষ্টার সঙ্গে ইংরেজরাজের সঙ্ঘর্ষ স্বার্থের একটা সহজ বিরোধ রহিয়াছে। আমাদের এই চেষ্টা যে পরিমাণে ফলবতী হইবে, ভারত-শাসনের দ্বারা ইংরেজের সঙ্ঘর্ষ স্বার্থসাধনের পন্থা সেই পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে। ইংরেজের সঙ্গে এখন এমনই এক বিপরীত সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, আমাদের প্রভাবে তাহার পরাভব, আমাদের ধনাগমে তাহার অর্থহানি, আমাদের শক্তিবিকাশে তাহার

শক্তিচালনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইবেই হইবে। এ অবস্থায় ইংরেজ দেবতা হইলেও আমাদের কল্যাণকামনা করিতে পারিত কি না, সন্দেহের কথা। ইংরেজ সামান্য মানুষ, আত্মস্বার্থ নষ্ট করিয়া আমাদের স্বার্থ সে সাধন করিতে যাইবে, এ অদ্ভুত আশা করা বাতুলতামাত্র। অতঃ কোন জাতি আমাদের উপর এরূপ অনন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুশক্তি লাভ করিলে আমা-দিগকে বহুদিন পূর্বে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিত, সন্দেহ নাই। এই নিষ্পেষণে হয় আমাদের জাতীয়শক্তি অরবি-গর্ভস্থ অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িত, নতুনা এই প্রাচীন জাতিও অপরাপর প্রাচীন জাতিসকলের ন্যায় পৃথিবীবক্ষ হইতে একে-বারে চিরদিনের জন্য বিলোপ পাইত। ইংরেজ আমাদের প্রাণে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; যাহাতে আমরা তাহার উন্নত সভ্যতার ভার বহন করিবার উপযোগী বল লাভ করি, তাহারও চেষ্টা করিয়াছে। জুই-পুই-ভুই বলীবর্দের মত বহুকরার শ্রীম্পংশক্তিকর্ষণে তাহার সহকারিতা করিয়া আপনাদের অকিঞ্চিৎকর জীবনকে সার্থক করি, ইংরেজ আমাদের জন্য এ আয়োজনও করিয়া রাখিয়াছে। অতঃ কোন জাতি ইহাও করিত কি না, সন্দেহ। মানুষে যতটা মহত্ব ও উদারতা সম্ভব, ইংরেজ তাহা দেখাইয়াছে। এর বেশী করিতে পারিলে ইংরেজ দেবতা হইত। দেবতা নয় বলিয়া তাহার নিন্দা করিতে পারি না।

ইংরেজের কোন দোষ ইহাতে নাই—ইংরেজকে ইহার জন্য দায়ী করি না। কিন্তু বিষয়টা এই যে, ইংরেজের স্বার্থের সঙ্গে, বর্তমান অবস্থায়, আমাদের জাতীয় স্বার্থের সম্মিলন ও

সামঞ্জস্য কদাপি সম্ভব নহে । আমরা যে ভাবে আমাদের জাতীয়শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাই, সেভাবে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়, ইংরেজ ইহা ইচ্ছা করিতে পারে না । রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমাদের অশক্তি করিয়া রাখিতে পারিলেই, এদেশে তাহার নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে, অশুভ নহে । এইটাই ইংরেজ বিলক্ষণ বোঝে, এবং বোঝে বলিয়াই বাঙালীর জাতীয়জীবনের এই অভিনব অঙ্কুরোদগম দর্শন করিয়া আপনার স্বার্থ ও প্রভুত্বের অনিষ্টাশঙ্কায় অধীর হইয়া, বাংলাদেশকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙালীজাতির এই বিকাশোন্মুখ রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাবকে ভাঙিয়া দিবার জন্য উদ্বৃত্ত হইয়াছে ।

বর্তমান ভারতবর্ষে যে অভিনব রাজনৈতিক আন্দোলনশ্রোত প্রবাহিত হইয়া ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবনকে উর্বর ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সেই পূণ্যধারার পবিত্র গোমুখী, ভারতভাগ্যবিধাতা, বহুশতাব্দী হইতে বিষমসম্পাতগ্রস্ত ভ্রমাবশিষ্ট ভারত-বাসীর উদ্ধারের জন্য, এই মুখমর্যস্ব বাঙালীর মুখ হইতেই প্রবাহিত করাইয়াছেন । বোম্বাই, মাদ্রাজে, পঞ্জাবে, আগ্রা ও অযোধ্যায় যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা আজ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে এই অশম বাঙালীজাতির রাজনৈতিক আন্দোলন-আলোচনা প্রত্যক্ষ-ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে । বাঙালী কার্যক্রম নহে, কিন্তু অবলাজনের জ্ঞান তাহার হৃদয় হৃদয়ের সংস্পর্শে ভারতের কর্মঠ ও বীৰ্যবান্ জাতিসকলের জীবনে, তাহা, চরিত্রে ও চেষ্টায় এক অলৌকিক বল সঞ্চার করিয়া দিয়াছে ।

এখনো ভারতের অন্তর্য লোকে রাজনীতিক্ষেত্রে যে সংসাহসের পরিচয় দিতে পারে না,— বাঙালী প্রতিদিন তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে । বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে এমন একটা মুখরতা ও প্রগলভতা, ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অন্য প্রদেশে এখনো দেখা যায় নাই । এ মুখরতা নিরর্থক ও নিরস্ত ও রমণীয়ভাবে বাঙালীর মধ্যে কোন বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে, ইংবেজ এ ঘাশঙ্কা করে না । কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত যদি অন্ত্রে অনুলম্বণ করিতে আরম্ভ করে, বাংলার সংবাদপত্রে ও বক্তৃতা-ক্ষেত্রে যে নির্ভীকতার পরিচয় ক্রমশই পাওয়া যাইতেছে,—পঞ্জাবে, অযোধ্যায় ও মহারাষ্ট্রে যদি সে নির্ভীকতা একবার ফুটিয়া উঠে, এমন ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে, যাহা রাজা প্রজা উভয়েরই মহা অকল্যাণের কারণ হইয়া উঠিবে । গোমুখীতে গঙ্গার ক্রীণ নির্যকে যদি বদ্ধ করিতে পাওয়া যায়, তবে গঙ্গা-পদ্মা, সকলের শক্তি যেক্রপ ক্রীণ হইয়া যাইবে, সেইরূপ বাঙালীর রাজনৈতিক জীবনকে যদি ভাঙিয়া দিতে পারা যায়, তবে ভারতবর্ষের সর্বত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভাপ ও বেগ নিশ্চয়ই কমিয়া আসিবে । এইজন্যই, আপনার ভবিষ্যৎ অকল্যাণের আশঙ্কা সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য ইংরেজ এই বঙ্গবিভাগব্যাপার হস্তক্ষেপ করিয়াছে ।

বাংলার রাজনৈতিক শক্তি বাঙালী-হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে । বাঙালী-হিন্দুদিগের ঐক্য ও উপচীরমান প্রভুত্বকে যদি বিদ্বাদ করিতে পারা যায়, বাংলার রাজনৈতিক জীবন ও শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে । এই বঙ্গবিভাগের

দ্বারা ইংরেজ তাহারই চেষ্টা করিতেছে। পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। এই মুসলমানগণ স্বরণাতীত কাল হইতে আপনাদিগের হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীদর সঙ্গে সর্ববিষয়ে অভ্যস্ত সদ্ভাব বাস করিয়া আসিতেছেন। বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই কলত আদিতে হিন্দুসন্তান ছিলেন। হিন্দুদিগের সঙ্গে কুলগত বা ethnological কোন বিশেষ পার্থক্য ইহাদিগের নাই। হিন্দুমুসলমানের বিবাদ বাংলার কখনো শোনা যায় নাই। ইংরেজের কুটিল রাজনীতি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে,—আগ্রা ও অযোধ্যায়—হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছে, বাংলাতেও এই বঙ্গবিভাগের পরে, তাহা করিতে চেষ্টা করিবে। মুসলমানসম্প্রদায় নানা কারণে এখনো ইংরেজের মুখাপেক্ষী হইয়া চলাকেই শ্রেয়স্কর মনে করেন। পূর্ববঙ্গে মুসলমানসম্প্রদায়ের কোন কোন নেতা ইতিমধ্যেই, এই বঙ্গবিভাগবিষয়েই, ইংরেজনীতির সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল অমুচরের সাহায্যে আপনার কুটিল ভেদনীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ইংরেজ বঙ্গবিভাগ হইয়া গেলে

, পূর্ববঙ্গে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিবিধ রাজকীর ব্যাপারে ঈর্ষাঘেয উৎপাদন ও পরিপোষণ করা ইয়া, বাঙালীর রাজনৈতিক শক্তিকে অক্ষম করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। পশ্চিমবঙ্গে সেইরূপ ভেদনীতি প্রচার করিয়া উড়িষ্যাবাসী ও বেহারাবাসীদিগের সাহায্যে মুষ্টিমেয় বাঙালীকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং পূর্ববঙ্গে চা-কর-সম্প্রদায় ও পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজ বণিকমণ্ডলী ও বেহারের নীলকরদল, উভয়ই হিন্দুমুসলমানকে চাপিয়া রাখিবে। এইভাবে, এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা, বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক শক্তিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা হইবে। এই আমাদের প্রধান আশঙ্কা। ইহাই আমাদের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি। এই-জন্তই আমি মনে করি যে, বঙ্গবিভাগ কেবল বাংলার নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের নবোন্মোচিত জাতীয়জীবনের উপরে বিধম কুঠাণাবাত করিতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই-জন্তই ইংরেজ যাই করুক না কেন, আমাদের দিগকে এই প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, অল্পরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ।

নূতন গুরুমহাশয় ।

বৈশাখমাস,—প্রায়ঃকাল,—স্থায়ী উঠিয়াছে। খননপ্রবৃত্তির প্রকটকরণের নটবর দস্ত তাহার পাঠশালায় বসিয়া ছাত্রদিগকে

পড়াইতেছেন। এই পাঠশালা গুরুমহাশয়ের নিজ বাড়ীতেই স্থাপিত। তাহার পূর্বদিকে উত্তান। অনেকদিন বৃষ্টি হয় নাই, সেজন্য

মাঠের দ্বার ও বাগানের পাছপালা যোজ্জে
বলসিঁচা গিয়াছে । মাটি শক্ত হইয়া
পড়িয়াছে । কৃষকগণের চাষ বন্ধ হইয়াছে ।

ধনঞ্জয়পুর একটি বড় গ্রাম । এখানে
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈবর্ত, গোয়াল, মুসলমান
প্রভৃতি নানা জাতির বাস । এ গ্রামে আগে
স্কুল ছিল না, তাই পেড্‌লারসাহেবের
নবশিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত হওয়ার কিছুদিন
পরেই নটবর দত্ত এই পাঠশালাটি স্থাপন
করিয়াছেন ।

এস্থলে এই গুরুমহাশয়ের কিকিৎ
পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক । ইনি বর্তমান-
জেলার কোন এন্ট্রান্সস্কুলে তৃতীয়শ্রেণী
পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন । সে আঙ্গ ১৫ বৎসরের
কথা । তিনি যখন গ্রামে আসিয়া গল্প
করিতেন—“পৃথিবীর আকার গোল—কমলা-
লেবুর মত”—“ইংরেজিতে নাম লিখিতে
হইলে খ্রী দিতে হয় না”—“ইংরেজদের
দেশে সাহেবরা জমি চাষ করে”—ইত্যাদি
ইত্যাদি—তখন গ্রামের চাষাগণ অতি
সন্ধিগুচিতে তাঁহার সেই সমস্ত জ্ঞানগরিমা-
সূচক কথা কান পাতিয়া শুনিত, কেহ বা
তাঁহাকে পরিহাস করিত । পরে একদিন
পরীক্ষা দিতে বসিয়া জুতার মধ্যে একখানা
কাগজে প্রদত্ত উত্তর লিখিয়া রাখিয়াছিলেন,
এই অভিযোগে তিনি স্কুলগৃহ হইতে বহিষ্কৃত
হন । তাহার পর কতকদিন কলিকাতায়
গিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, পড়ার
আর কোন সুবিধা হইল না, পড়াশুনা করার
প্রবৃত্তিও বোধ হয় বেশী ছিল না । তাঁহার
এক আত্মীয় বিখ্যাত সরকার গৌহাটি-
চা-বাগানে কাজ করিত । নটবর তাহার

শরণাপন্ন হইলেন । তিনি নটবরকে কুলা
সংগ্রহ করিবার জন্ত সর্দার আড়কাড়ীর পদে
অভিযুক্ত করিয়া মেদিনীপুরজেলার পাঠাই-
লেন । সেখানে ৩৬২সরকাল অনেক
নিরীহ ভালমানুষকে, কুলি করিয়া চালাই
দিলেন, বৈধ-অবৈধ উপায়ে অনেক টাকা
রোজগার করিলেন, অনেক টাকা বন্ধুখোলা
করিয়া উড়াইলেন । অবশেষে দুইজন
সাঁওতালকে ফাঁকি দিয়া কুলা করিয়া
চালান দেওয়া-অপরোধে তাঁহার তিনমাস
শ্রীষরবাসের হুকুম হইল এবং হাতে যে-কিছু
টাকা ছিল, তাহা সেই পূর্বপাপের প্রায়-
শ্চিত্তের দক্ষিণাশ্রুপ একজন উকিল ও
দুইজন মোক্তারের উদরে স্থান পাইল ।

জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নটবর
মনে করিলেন, “না—আমি ও পথে যাব
না । এখন সহপায়ে অর্থোপার্জন করা
যায় কি না, তাহাই একবার দেখিব ।”
সহপায়ে অর্থোপার্জন কিসে হয় ? ভাল
চাকুরী ?—সেরূপ বিজ্ঞা নাই । ব্যবসা-
বাণিজ্য ?—তাহার মূলধন নাই । কৃষিকার্য ?—
একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে জ্ঞতি নাই ।
যদি কৃষিকার্য করিতে হয়, তবে দেশে গিয়াই
করা ভাল, ইহা মনে করিয়া তিনি ধনঞ্জয়পুরে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহার পৈতৃক
ভিটা জঙ্গলময় হইয়া ছিল । তিনি সেই জঙ্গল
কাটাইয়া বাসোপযোগী কয়েকখানা খড়ের ঘর
তুলিলেন । তাঁহার পৈতৃক যে-কিছু জমি
ছিল, তাহাতেই একখানা লাঙল এবং একজন
চাকরের সাহায্যে চাষ আরম্ভ করিলেন ।
ঠিক এই সময়ে পেড্‌লারসাহেবের নৃতন
শিক্ষাপ্রণালী বঙ্গদেশে প্রচলিত হইল ।

নটবর মনে করিলেন, এ গ্রামে অনেকগুলি ছেলে আছে, ইহাদের লইয়া একটা পাঠশালা খুলি না কেন? তাহা হইলে আমার কৃষিকার্যেরও অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া তিনি নূতন শিক্ষাপ্রণালীর নিয়মাবলী খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। পরে একদিন ডেপুটি ইন্সপেক্টর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নবপ্রণালীতে স্থল খুলিবার অমুমতিপত্র বাহির করিলেন। ডেপুটি ইন্সপেক্টর দেখিলেন, এ লোকটার বুদ্ধি আছে, বেশ কাগের লোক। হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী বেশ বুঝিয়াছে এবং ইহার নানা-বিষয়গী অভিজ্ঞতাও আছে। ইহা ধারাই নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদান আরম্ভ করা যাক। আগে শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া পরে স্থলস্থাপন করা অনেক বিলম্বের কথা। সরকারী কার্যে এত বিলম্ব সহ্য হয় না, কারণ “ভুতস্ত নীত্ৰম্!”

নটবর বাড়ী আসিয়া ৪০ জন ছাত্র সংগ্রহ করিয়া স্থল খুলিলেন। তাঁহার বাহিরের চৌচালা-ঘরে স্থল বসিল। তাহার পার্শ্বেই বাগান। তিনি ছাত্রগণকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু গ্রাম্য অশিক্ষিত বর্ষীয় লোকেরা তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীতে নানাপ্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। মূৰ্খলোকে নূতন শিক্ষাপ্রণালীর মাংসাত্মক বুঝিবে কিরূপে?

এখন বাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। গুরুমহাশয় পাঠশালার আসিয়াই ছাত্রদিগের রেখেটরি বন্ধ করিয়া তাহাদের নাম ডাকিলেন। ছাত্রগণ একে একে নামের লাড়া

দিল। পরে তিনি এইরূপে পড়ান আরম্ভ করিলেন।

“রহিম বিশ্বাস?”

“উপস্থিত।”

“কাল তোমাকে গরুর কথা শিখাইয়াছি—গরুর কয় পা?”

“চারি পা।”

“বেশ—বেশ। তোমার খুব পর্যবেক্ষণ-শক্তি! কয়টা শিং?”

“দুটা।”

“বেশ—খুব ভাল।”

এখানে আর একটা ছেলে হাসিয়া বলিল—
“আচ্ছ, এ সব কথা ত আমরা আপনাই জানি। এজন্য বই পড়ার দরকার কি?”

“তুই বড় পণ্ডিত হয়েছিস্ কিনা! বেয়াদপ—পাজি,—নছার!”

এই বলিয়া গুরুমহাশয় তাহার পৃষ্ঠে এক বা বেত মারিলেন। পরে রহিম বিশ্বাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—“গরুর খুর কিরকম?”

“নিভরু।”

“বেশ। তোমার বেশ শিক্ষা হইয়াছে—তুমি যাও, এখন নিজে ভাল করিয়া গরু দেখ গিয়া। আমার গোয়ালে যে কয়টা গরু আছে, তাহাদিগকে লইয়া মাঠে যাও। গরু ছাড়িয়া-দিয়া বদিয়া সম্মুখ নষ্ট করিও না, খুব ভাল করিয়া তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণ করিবে। আর দেখিও, যেন অস্ত্রের কসল নষ্ট না করে।”

রহিমবিশ্বাস আদেশমত গরু লইয়া মাঠে গেল।

তখন শিক্ষকমহাশয় আর একটি ছাত্রকে ডাকিলেন—“সতীশচন্দ্র দরকার?”

“উপস্থিত।”

“শ্রুত বিঠাকে কি বলে?”

“গোবর বা গোময়।”

“বেশ—গোবরে কি হয়?”

একটি বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র বলিল—“পদ্মকুল হয়।”

অমনি গুরুমহাশয় ভয়ানক গরম হইয়া পড়িলেন এবং তাহার চুল ধরিয়। খুব কয়েকটা কিল তাহার পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া দিলেন।

সতীশ বলিল—“আজ্ঞে, গোবর দিয়া ঘর নিকান হয়।”

“আর কি হয়?”

“যদি প্রস্তুত হয়।”

“আর কি হয়?”

“জমিতে সার দেওয়া হয়।”

“বেশ—বেশ—তুমি খুব ভাল ছেলে। তোমার খুব বিদ্যা হইবে। আজ্ঞা, এখন আমি যাহা বলি, তাহাই কর। জ্ঞান ও বিদ্যা হাতে-কলমে—experiment করিয়া শিখিতে হয়। মুখ্যবিদ্যাকে আমরা একেবারে বর্জন করিব। তুমি যাও, আমার পোয়ালে যে সব গোবর পড়িয়া আছে, সেগুলি একটি খুড়িতে করিয়া ঐ বাগানে নিয়া রাখ। পরে সেখানে থাকিয়া উহা পচিলে ভাল সার হইবে। তখন উহা কেঁতে দিয়া দেখিবে, কেমন ভাল ফল উৎপন্ন হইয়াছে। পোয়াল ভাল করিয়া পরিষ্কার করিও, যেন হর্গন্ধ না থাকে।”

সতীশ এই কার্যে প্রস্থান করিল। তখন গুরুমহাশয় বহুনাথ দাস নামক একটি ছাত্রকে ঘর নিকানর উপকারিতা কি দুকাইয়া-দিয়া তাহাকে ঘর নিকাইতে পাঠাইলেন।

পরে গুরুমহাশয় বিত্তীয়প্রবীণ ছাত্র-দিগকে বলিলেন—“তোমরা অবশ্যই গাছ কাহাকে বলে জান। ঐ বাগানে দেখ কতরকম গাছ আছে—আমগাছ, কাঁঠাল-গাছ, নেবুগাছ, কুলগাছ ইত্যাদি। একটি গাছের কয়টা অংশ?”

একটি ছাত্র। “দুই অংশ।”

“কি?”

“শিকড় ও কাণ্ড।”

“বেশ—শিকড় দিয়া কি হয়?”

“গাছ রস শুষিয়া যায়।”

“বেশ—বেশ। আর পাতা দিয়া কি হয়?”

“কলার পাতায় ভাত ধায়, তালপাতায় লেখে—”

“আরে আমি তা চাই না। পাতা দিয়া গাছের কি উপকার হয়?”

“গাছের রুটিনিবারণ হয়।”

“না—তা নয়। পাতা বায়ু হইতে গ্যাস্ টানিয়া লয়, তাহাও গাছের আহার।”

“আজ্ঞে গ্যাস্ কি?”

“গ্যাস্—গ্যাস্ জানিস্ না? পাথুরে করলা পোড়াইলে গ্যাস্ বাহির হয়। আমি রানীগঞ্জে তাহা খচকে দেখিয়াছি।”

“আজ্ঞে, এখানে পাথুরে করলা কোথায়?”

“আরে বোকা জানিস্ না? পাথুরে করলা সর্বত্রই আছে, মাটি খুঁড়িলেই বাহির হয়, নতুনা এখানে গ্যাস্ থাকিবে কেন? যাক সে সব কথা। এই যে সকল গাছ দেখিতেছ, বল ত উহাদের গোড়ায় আগাছা জমিলে তাহাতে গাছের কি হয়?”

একটি ছাত্র। “জন্ম হয়।”

আর একটি ছাত্র। “তাহাতে পাবীর বাগা করে।”

গুরু। তুমি কেবল পাবীর বাসাই চেন? আগাছা জন্মিলে গাছ বাড়ে না। সেইজন্য আগাছা কাটায়া ফেলা কর্তব্য। বুঝিলে?

ছাত্রগণ। “হাঁ, বুঝিলাম।”

“জাচ্ছা, বিনোদ, হরি, কালাচাঁদ, রাখাল—তোমরা কয়জনে না লইয়া ঐ বাগানে যাও, আর যত আগাছা দেখিবে, সব কাটায়া ফেলিবে। পবে তোমরা দেখিতে পাইবে, এই সকল আম, কাঁঠাল ও অন্যান্য ফলবান রুকে কত ফল ধরিয়াকে।”

একটি ছাত্র। “সে ত আর এবার না?”

“এবারই ধরিবে—তোমার নিজের চক্ষেই দেখিতে পাইবে। বিয়া নিম্ন নিম্ন চক্ষে দেখিয়া শিক্ষা করাই কর্তব্য। বুঝিলে?”

উল্লিখিত ছাত্রগণ তখন জঙ্গল কাটিতে গেল।

এইরূপে গুরুমহাশয় তাঁহার ছাত্রদিগকে নানা বিভাগে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। জলের গুণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য দুইজন ছাত্রকে কূপ হইতে জল তুলিয়া তাঁহার বাগানে ও ক্ষেত্রে জলসেচ করিতে নিযুক্ত করিলেন। নাঁশের উপকারিতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৩টি বালকে নাঁশ চিরিয়া নাঁশারি প্রস্তুত করিতে দিলেন, তাহা দিয়া বাগানের বেড়া দেওয়া হইবে। একটি ছাত্র নাঁশের যেতি তুলিয়া গুরুমহাশয়ের জন্য একটি খুচুনি প্রস্তুত করিতে লাগিল।

এই সময়ে হঠাৎ একটি খোল উঠিল। গ্রামের ভদ্র-অভদ্র অনেকগুলি লোকের সঙ্গে

স্বয়ং ডেপুটি ইন্সপেক্টর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের শরণবাবু ডেপুটিবাবুকে বলিলেন—“এই দেখুন মশাই! আমরা বাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক কি না! গুরুমহাশয় ছেলের দিয়া ক্রীড়নে নিজের সব কাজ করাইতেছেন। যত চাষার কাজ, ভদ্রলোকের ছেলের দিয়া করাইতেছেন,—এ ভারি অন্তায়!”

এই কথা বলিতে বলিতে, গুরুমহাশয়ের ইঙ্গিতমতে সব ছেলে আসিয়া যথাস্থানে বসিল—কেবল আসিল না রহিম বিশ্বাস। তাহার বাপ কেফাতুল্লা সঙ্গ আসিয়াছিল। সে গুরুমহাশয়কে বলিল—“বাবু, আমার ছেলেকে কোথায় পেঠিয়েছেন?”

একটি ছেলে বলিল—“সে গুরুমহাশয়ের গরু চরাইতে মাঠে গিয়াছে।”

গুরুমহাশয় তাহার দিকে রোষভারিত-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—“তাহাকে গরুর সমস্ত অবয়ব পর্য্যবেক্ষণ করিতে পাঠাইয়াছি।”

কেফা। গুরুমহাশয়, আমরা চাষালোক—আমাদের মোটাবুদ্ধি। আমরা তোমার ও সব দোমবাজির কোন এলাকা রাখি না। আপনি যদি তারে মাঠে গরু চরাতি পেঠাইলেন, তবে আমি বরের গরু রাখতি না দিই তাহা কেন? এখানে দিইলাম? বাবু, এ কথাটার বিচার করেন।

ইহা বলিয়া ডেপুটিবাবু দিকে মিনতি-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ডেপুটিবাবু এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। এখন গভীরভাবে বিরক্তিপূর্ণস্বরে গুরুমহাশয়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “এ সব কি হচ্ছে?”

নটবর জোড়হস্তে বলিলেন—“হজুর, এ ঠিকমত কাজ হইতেছে। আপনারা বেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, আমি তার একচূনও এদিক-ওদিক করি নাই। যাহাকে হাতে-কলমে শিখা দেওয়া বলে, আমি ঠিক তাহাই দিতেছি।”

শরৎবাবু কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “না—কখনই না—গবর্ষেষ্টের অভি-প্রায় কখনই এরূপ নহে। গ্রামের সব ছেলে আসিয়া তোমার মুনিষ খাটিবে, ইহা কখনই গবর্ষেষ্টের কল নহে।”

নটবর। আপনি হাল-আইনের শিক্ষা-প্রণালীর কল কি তাহা জানেন না। ছেলে-দিগকে মাটী, জল, পাছ প্রভৃতি দ্রব্যের গুণ শিখা দিতে হইবে—তাহারা নিজের চক্ষে এগুলি দেখিয়া শিখিতে অভ্যস্ত হইবে, ইহাই হইতেছে কল। আমি ত ঠিক তাহাই করিতেছি। তবে প্রভেদঃ মধ্যে এই, আমি এ সকল জিনিষ নিজের বাড়ী হইতে দিতেছি, এজন্য স্কুলের কোন অতিরিক্ত খরচ হইতেছে না। হজুর কি বলেন ?

ইহা বলিয়া ডেপুটিবাবুর দিকে একবার কাঁধের দৃষ্টিপাত করিলেন।

ডেপুটিবাবু বলিলেন—“আচ্ছা, তুমি কিপ্রকারে এ সকল শিখা দিতেছ, আমাকে দেখাও।”

তখন নটবর ছাত্রদিগকে পূর্বে বেরূপ পড়াইতেছিলেন, সেইরূপ পড়ান আরম্ভ করিলেন। তবে গল্প-চরান, লঙ্গলকাটা প্রভৃতি উপদেশগুলি বাদ দিলেন।

ডেপুটিবাবু এই শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া বলিলেন, “হা,—আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী এই-

রূপই বটে। তুমি ইহার principle বেশ grasp করিয়াছ, তবে practically কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছ, তাহা আর করিও না।”

শরৎবাবু বলিলেন—“মহাশয়, এই শিক্ষাপ্রণালীর principle বাহাই থাকুক, আমরা practically বাহা দেখিতেছি, তাহা কখনও অমুমোদন করিতে পারি না। শিক্ক-মহাশয় এই সকল বালককে কেন চা-বাগানের কুলি করিয়া তুলিয়াছেন, ইহার বিচার করুন। আমরা এরূপ পাঠশালা চাই না।”

ডেপুট ইন্স্পেক্টর এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া ছাত্রদিগের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি একটি ছেলেকে “নিম্ন গ্রাই-মেরী রিডার” পড়িতে বলিলেন। সে পড়িল—“গরুর প্রধান আহার ঘাস। উহার মাঠে চরে। জিহ্বা, ঠোঁট ও চুয়ালের সাহায্যে ঘাস কাটিয়া মুণের ভিতরে লয় এবং না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলে। উহাদের উদর চারি-কুঠারি-বিশিষ্ট।”

ডেপুটি। আচ্ছা বল দেখি, গরুর পেটে যে চারিটা কুঠারি আছে, তাহাদের কিপ্রকার ক্রিয়া হয় ?

একটি বালক দাঁড়াইয়া সেই পুস্তকের কথা অবিকল মুখস্থ বলিল—“প্রথমে গরু চর-বার সময় ঘাস খাস পায়ে, প্রথম কুঠারি দ্বিতীয় কুঠারিতে পাঠায়। দ্বিতীয় কুঠারি ভরিয়া গেলে, চরা বন্ধ করে, পরে ইচ্ছামত দ্বিতীয় কুঠারি হইতে ঘাস বাহির করিয়া আনিয়া চিবায়, চিবান হইলে উহা আবার গিলে ; কিন্তু সে গিলিত ঘাস দ্বিতীয় কুঠারিতে না গিয়া তৃতীয় কুঠারি দ্বিয়া চতুর্থ কুঠারিতে গিয়া পৌঁছায়। ইহাকে আবরকাটা বলে।”

ডেপুটি। আচ্ছা, বল ত, গরুর এই জাবরকাটার অভ্যাস কিরকমে হইল ?

আর একটি ছেলে দাঁড়াইয়া আবার সেই বই মুখস্থ বলিতে লাগিল—“বস্ত্র অবস্থায় গোজাতি সিংহব্যাজ্রাদির ভয়ে বড় ভীত থাকিত। সেজন্য হুবিধা হইলেই ভাড়া-ভাড়ি স্বত্ব হাস পারিত, পেটের মধ্যে ভরিয়া পলাইত, পরে অস্ত্র সময়ে আন্তে আন্তে উহা চিটাইয়া গিলিত।”

ডেপুটি। বেশ। ঠিক হইয়াছে। আচ্ছা, তুমি কি পড় ?

একটি উচ্চপ্রাইমেরী শ্রেণীর নবমবর্ষীয় শিশু দাঁড়াইয়া বলিল—“আজ্ঞে, আমি পড়ি আদর্শপাঠ, বিজ্ঞানপাঠ, শিশুব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোলপাঠ, ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি, পাটীগণিত, Infant Reader, ডুইং।”

শরৎবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া স্তব্ধ ছিলেন, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া ডেপুটিবাবুকে বলিলেন—“স্বাশয়, আমার একটা জিজ্ঞাস্ত আছে। আপনাদের নূতন শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা ভাল বুঝি না। শুধিতে পাই, আপনারা নাকি মুখস্থবিদ্যার উপর ভরানক চটা। মুখস্থবিদ্যাকে (Cramming) আপনারা পাঠশালার জিনিসমানার মধ্যেও আসিতে দিতে চাহেন না। জামাইর বিশ্বাস, সেই মুখস্থ-বিদ্যাটা যদি মানুষের মত কোন প্রত্যক্ষ প্রাণী হইত, তবে গবর্নমেন্ট ডাকাকে এত দিন আগাধানবীনে পাঠাইতেন। কিন্তু ঐ নিয়মপ্রাইমেরী শ্রেণীতে আপনি যে পরীক্ষা করিলেন, ইহাতে কি বুঝিলেন ? আমি ত

দেখিলাম, ছেলেরা আগাগোড়া সেই মুখস্থ কথাই বলিয়া গেল। আর সে বেচারীদেরই বা দোষ কি ? আপনারা হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে চান, আচ্ছা, গরুর পেটে কয়টা কুঠারি আছে, তাহা গরুর পেট চিরিয়া না দেখাইলে ছেলেরা কিপ্রকারে স্বচক্ষে দেখিয়া শিখিতে পারে ? সেরূপ পেট চিরিয়া শিক্ষা দেওয়াটা Medical Collegeএর anatomy বিভাগের অস্ত্র মূলত্ববি রাখিলে ভাল হয় নাকি ? এই ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের পাঠশালায় সেরূপ শিক্ষা সম্ভবপর হইতে পারে কি ? তাহা যদি না হয়, তবে অবশ্যই ছেলেরা পুস্তকে যাহা পড়িবে, তাহাই মুখস্থ করিয়া রাখিবে। সুতরাং ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই মুখস্থকেই আপনারা প্রাশ্রয় দিতেছেন। আরও দেখুন, এই নবমবর্ষীয় শিশু উচ্চপ্রাইমেরী ক্লাসে পড়িতেছে। ইহাকে কতগুলি নূতন নূতন বিষয় পড়িতে হইতেছে, তাহা ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। এই সকল স্কুলমার শিশুদের মস্তিষ্কে এতগুলি কঠিন বিষয় চাপাইয়া দিলে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হইবে, না বিনাশ হইবে ?”

ডেপুটিন কেন, তাহারা বুঝিয়া পড়িবে।

শরৎ। এ সকল কঠিন কঠিন বিষয় আমরাই কি সব বুঝিতে পারি ? আমরাও দেখিতে পাই, ছাত্রগণ কিছুই না বুঝিয়া এই সকল বই আগাগোড়া মুখস্থ করিতেছে। আপনি পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আর যদি আমার বেরা-দপি মাগ করেন, তবে একটা কথা বলি। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী একশত বৎসর এদেশে চলিলে, আপনারা স্কুলব্যাজটিকে ধোঁয়াতে পরিবর্ত করিবেন।

ডেপুটি । সে কেমন ?

শব্দঃ । এই যে গুরুদিগের “সিনিত চর্কণের” কথা শুনিলাম, শিশুগণও পাঠ্য-বিষয়ের সেইরূপ সিনিত চর্কণ আরম্ভ করিবে, এবং ক্রমে তাহাদের পেটে—ঠিক পেটে না হউক—মস্তিষ্কের মধ্যে চারিটি কুঠারি প্রস্তুত হইবে—এই উচ্চপ্রাইমেরী ক্লাসে বিজ্ঞান-পাঠ, জ্যামিতি, পরিমিতি প্রভৃতি বিদ্যা প্রথম কুঠারিতে বোঝাই হইয়া থাকিবে, পরে বি. এ. কিংবা এম্. এ. ক্লাসে গেলে তাহার জায়-কাটা আরম্ভ হইবে । কিন্তু আমার একটা বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে । পুরাকালে সিংহব্যাভ্রাদি জন্তুর ভয়ে যেন গোজাতি

অতি অসুসময়ের মধ্যে বড় ঘাস পারিত, পেটের মধ্যে বোঝাই করিয়া লইয়া পলাইত, কিন্তু এখন এই শিশুগণ কাহার ভয়ে তদনুরূপ আচরণ করিতে বাধ্য হইতেছে ?”

ছাত্রদিগের মধ্য হইতে অমনি একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—“পেড়লারসাহেবের ভয়ে ।”

ইহার পরেই একটা মহা গুণ্ডোল উপস্থিত হইল—“ধরু ধরু, মারু মারু ।” সে ছেলেটি চম্পট দিল । সেইদিন হইতে নটবর দত্তের সাধের পাঠশালা ভাঙিয়া গেল । তাঁহাকে জীবিকানির্ভারের জন্য নতুন ক্ষেত্রের অনুসন্ধান বাহির হইতে হইল ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ ।

কোচিন ।

১২

প্রভাতে রক্তিমতাম্র আবার বধন উদ্ভিত হইল, দেখিলাম—বৃহৎ পোপানের তলদেশে আমার নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে । নৌকায় উঠিয়া, বিলের মধ্য দিয়া, মাতাকেরি-নগরের অভিমুখে চলিলাম । অবশেষে সহরের ইহুদি-বিভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । অষ্টম শতাব্দীতে, জেরুশালেমের দ্বিতীয় মন্দিরটি বধন ধ্বংস হইয়া যায়, সেই সময়ে প্রায় দশ-সহস্র ইহুদি ও ইহুদিনী এই মালাবার-প্রদেশে আসিয়া, ক্রোড়ানোরে (তৎকালীন নাম “মহোদ্রপত্না”) বাসস্থাপন করে । পরধর্মগৃহিণী হিন্দুরা উহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল । এখনও পর্য্যন্ত এই দুই উপ-

নিবেশিকমণ্ডলী, পার্শ্ববর্তী হিন্দুগণ হইতে—সমস্ত জনং হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া, পুরুষ-পরম্পরাগত স্বকীয় ঐতিহ্য ও কুলপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে । মনে হয়, যেন উহারা কোন জাহ্নবীর সংস্কৃত ঐতিহাসিক কোঠুক-সামগ্রী ।

মাতাকেরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া, এখনেই “শাদা-ইহুদি”দিগের সহরে (এ দেশে উহাদিগকে “শাদা-ইহুদি” বলে) উপনীত হইলাম । মাতাকেরি—একটি বৃহৎ বিপণি বলিলেও হয়—খাঁটি দেশীয় বিপণি,—বেখানকার সমস্ত মানবসৃষ্টি—সমস্ত মানবদেহ বিস্তৃত পিতল-

বর্ণের; সমস্ত দোকানগুলি কাঠের,—বার-
তার পশ্চাতে মুক্ত পরিদূর—সেই উত্তম স্নান্য
তালভরুর তলদেশে অবস্থিত। ক্রোশখানেক
ধরিয়া এইরূপ বাজার চলিয়াছে। এইরূপ
ভারতীয় দৃষ্টে চক্ষু-বধন অনেকরূপ অভ্যস্ত
হইয়াছে—এমন সময়ে, একটা বাক কিরিয়াই
একটা পুণ্ডন “অন্ধকরে” রাস্তায় হঠাৎ
আসিয়া পড়িলাম; যেন ইহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া
কোনপ্রকারে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে।
কোন স্থানচ্যুত জিনিষ দেখিলে মনে যেমন
একপ্রকার অশান্তি উপস্থিত হয়, আমার
মনে সেইরূপ অশান্তি উপস্থিত হইল। খুব
বেঁধা বেঁধি সারি-সারি পাথরের বাড়ী। নীত-
প্রধান দেশের জায়, বাড়ীর সমুখভাগের
মুখশ্রী বিবাদনয়, প্রবেশপথগুলি সঙ্কীর্ণ।
তাতে আবার, প্রত্যেক গৃহের দ্বারদেশে,
গবাক্ষে, বিবাদতমসাক্ষর এই ক্ষুদ্র রাজপথে,
সর্বত্রই ইহুদিমুখ দেখা যাইতেছে। এই
আকস্মিক দৃষ্টপরিবর্তনের জায় ইহুদিমুখও
আমার চিত্তকে উবেজিত করিয়া তুলিল।
এই বিবাদময় জীবনশা, এখানকার এই সমস্ত
পরিদৃষ্ট,—পার্ববর্তী তালপুঞ্জের সহিত, আকা-
শের সহিত, যেন একটুও খাপ খায় না। এই
অপ্রত্যাশিত রাস্তাটিতে সহসা আসিয়া, মনে
হয় যেন আমি এখন আর ভারতের মধ্যে
নাই;—এমন কি, মনে হয়, প্রাচ্যভাব যেন
এখান হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে।
যেন, লাইড্ কিংবা আমষ্টার্ডামের রাস্তায়
একটা টুকরা স্থানচ্যুত হইয়া এখানে আসিয়া
পড়িয়াছে;—কেবল, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের
প্রথম উত্তাপে উহা তাপদগ্ধ হইয়াছে,—
কাটিয়া গিয়াছে। বেশ মনে হয়, ওলন্দাজে-

রাই সহরের এই ভাগটি নির্মাণ করিয়াছে;
কেন না, সেই যুগের ওলন্দাজেরা, আপনাদের
নিজের দেশেও, জলবায়ুভেদে কিরূপ গৃহ
নির্মাণ করিতে হয়, তাহা জানিত না। তাহার
পর, ওলন্দাজেরা এ দেশ হইতে চলিয়া গেলে,
ক্রোশানোরের ইহুদিরা সেই সব শূন্তগৃহ
অধিকার করে। এখানে কেবলি ইহুদি—
ইহুদি ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সব
ইহুদিদের রং ফ্যাশনে; ভারতের জল-
বায়ুপ্রভাবে এবং খুব-বেঁধা বেঁধি বাড়ীতে
বাস-করা-প্রযুক্ত, ইহারি রক্তহীন হইয়া পড়ি-
য়াছে। কিন্তু বিসহস্রবৎসর কাল ম্যালাবার-
প্রদেশে বাস করিয়াও উহাদের মৌলিক
ছাঁচ কিছুমাত্র রূপান্তরিত হয় নাই;—এমন
কি, (প্রচলিত মতের উল্টা) উহাদের মুখ
তাপদগ্ধ হইয়া একটুও মলিন হয় নাই।
জেরুশালেমে, কিংবা তিবেরিয়াদে বেক্রপ
মূর্তি—বেক্রপ লম্বা আলবালা সচরাচর দেখা
যায়,—এখানেও ঠিক তাই। যুবতীদের সূক্ষ্ম-
চাকু মুখশ্রী; দীনদর্শন বৃদ্ধদিগের শুকচকুৎসবৎ
বক্র নাসিকা; শিশুদিগের শাদা ও গোলাপি
রং; রসপ্রধান দৈহিক প্রকৃতি—মুখে একটু
ধূর্তামির ভাব পরিস্ফুট,—“কানানে”র জাত-
তাইদিগের মত, ইহাদেরও কানের উপর
চুল-কোঁকড়াইবার কাগজ রহিয়াছে।

রাস্তা দিয়া যদি কোন বিদেশী পথিক
চলিয়া যায়, অমনি তাহাকে দেখিবার জন্ত,
এই সকল লোক দ্বারদেশে নামিয়া আসে;
কেন না, মাভাকেরিতে বিদেশী লোক প্রায়
কখন আইসে না। বিদেশী দেখিলেই,
উহাদের মুখে স্মিতহাস্ত ও আতিথ্যের ভাব
ফুটিয়া উঠে। যে-কোন গৃহেই আমি প্রবেশ

করি না কেন—প্রায় সকল গৃহেই উহার। সৌজন্যসহকারে আমাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

এইরূপ কিংবদন্তী—পূর্বে দশমহশ ইহুদি এখানে আইসে; তন্মধ্যে এখন কয়েকশত মাত্র অবশিষ্ট। দ্বিসংস্রবৎসর কাল অব-সাদজনক উত্তাপের মধ্যে বাস করায়, এই চিরস্থায়ী ইহুদিজাতি ক্রমশই বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। বোধ হয়, ইহার। এখন গুপ্ত ব্যবসায়ের দ্বারা—কুমৌদবৃত্তির দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে; এবং যখন উহার। ধনাঢ্য হইয়া উঠে—তখন, যেন ধনশালী নহে—এইরূপ ভাণ করিয়া থাকে। হুইতিনজন বিশিষ্ট ইহুদির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, কিয়ৎকাল আমি তাহাদের গৃহে বসিয়াছিলাম। সেই সব গৃহের আভ্যন্তরিক অবস্থা এইরূপ :—অন্ধ-অন্ধকারের মধ্যে একটা হুঁড়িপথ; পচাধসা জিনিষপত্র এলোমেলোভাবে ছড়ান রহিয়াছে; কতকগুলি পুরাতন কীটদষ্ট আস-বাব—প্রায় সমস্তই যুরোপীয়—বোধ হয়, ওলন্দাজদিগের আমল হইতেই চলিয়া আসি-তেছে। দেয়ালে মুশার কতকগুলি প্রতি-কৃতি ও কতকগুলি উৎকীর্ণ-লিপি বিলম্বিত।

রাস্তার প্রান্তভাগে ইহুদি-গির্জা; বটী-ঘরটির অভ্যন্তর শৌচনীর অবস্থা;—গ্রীষ্মে সূর্যের উত্তাপে ফাটিয়া গিয়াছে;—বয়ঃপ্রভাবে বাকিয়া গিয়াছে। প্রথম-দরজা পার হইয়াই একটা প্রাঙ্গণের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম;—প্রাচীর খুল এবং কারাগারের প্রাচীরের ভাঙ্গ উঠে। পবিত্র বেদিটি মধ্যস্থলে রহি-য়াছে;—অষ্টষটিকার প্রাচীর-স্থলের বিমল আলোকে পরিপ্লাবিত; এবং ঐ স্থানটি

বেদি হইতে খবল কিরণ বিকীর্ণ হইয়া নেত্র ঝলসিয়া দিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও এরূপ একটি ইহুদি-গির্জা দেখা যায় না—বাহ্যর সাজসজ্জা এত পুরাতন এবং সাজাইবার ধরণটিও এরূপ অপূর্ণ—এরূপ নূতন। এখানকার বিচিত্র বর্ণবিভাস কালপ্রভাবে ক্রীণ ও রান্না হইয়া, অপূর্ণ সৌন্দর্যে চিত্তকে মুগ্ধ করে। সবুজ দরজা—তাহাতে অদ্রুত পুষ্পসকল চিত্রিত; গৃহের কুটুমটি চমৎকার—নীল চৌনে মাটি দিয়া ঝাধানো; দেয়ালগুলি হৃদয়ের মত শাদা। গির্জার অভ্যন্তরে লালরঙের—সোনালি রঙের আস্তন যেন চাহিদিকে আলিয়া উঠি-য়াছে। কতই আমার ধাম—কতই আমার পরাদে—তার আর অস্ত্র নাই;—মানব-হস্তের স্বর্ষণে উহা নগ্নবৎ মন্মথ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকগুলি বিচিত্র রঙের বহ-পুরাতন কাড়লঠান চাঁদোরা-ছাদ হইতে লম্বমান;—এইগুলি, বোধ হয়, সেই ঔপনি-বেশিক যুগে যুরোপ হইতে আনিয়াছিল।

পাণ্ডুমুখী, আলখান্না-পরিধান, দীর্ঘ-নাসিক কতিপয় ব্যক্তি বিড়বিড় করিয়া কি প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিতেছিল,—হস্তে তিক্রগ্রন্থ;—আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত হঠাৎ থামিল। একজন পুরোহিত,—মনে হয়, শতবর্ষ বয়ঃক্রম—কাপিতে-কাপিতে আমাকে সংবর্দ্ধনা করিলেন, অভিস্ম-ধোদাই-কাজ-করা সেই ভাস্কর্যগুলি-আমাকে দেখাইলেন, এবং উহা কিরণ মন্মথ, স্পর্শ করিয়া দেখিবার জন্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন; তাহার পর, নীল চৌনে-মাটিতে বাধানো কুটুমের সমস্ত হস্ত

আমার নিকট বিবৃত করিলেন । কুটুম্বটি, বাতবিকই অমূল্য—এত দুর্লভ জিনিষ যে, উহাতে পা রাখিতে ভয় হয় । প্রায় দশসহস্র বৎসর হইল, এই চীনে-মাটি চীনদেশ হইতে কৰ্মাস দিয়া আনানো হয়, ইহার জাহাজ-ভাড়া বহু অর্থব্যয় হইয়াছিল । তাহার পর, আমাকে পুণ্য-মন্দিরটি (Tabernacle) দেখাইলেন; উহা একধণ্ডা জরির-পাড়-লাগানো যন্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল । উহার অভ্যন্তরে কতকগুলি রত্নচিহ্নিত মুকুট রহিত, —যাহার নকুন-কল্পনা সলোমন-রাজার মুকুট-নক্সার স্তায় অতীব আদমিকালের । অবস্থাবিশেষে শতবর্ষব্যয়ক বর্ষায়ান পুরো-হিতদিগকে এই মুকুটে বিভূষিত করিবার জন্যই ঐগুলি রক্ষিত হইয়াছে । তা ছাড়া, উহার মধ্যে কতকগুলি ধর্মগ্রন্থ আছে;—অনির্দেশ্য অতীতের কতকগুলি গোটানো পার্চমেন্ট-কাগজ,—রূপালি-জরির পাড়ওয়ালা কালা রেশমি কাপড়ে আচ্ছাদিত ।

অবশেষে, উহাদের যেটি বহু আদরের পবিত্র স্মৃতিসামগ্রী—সেইটি আমার নিকট লইয়া আসিল । ইহা একটি বহুমূল্য দলিল; তাম্রকলকে উৎকীর্ণ লিপিসালা । ইহুদি-দিগের ভারতবর্ষে আগিবাত্র প্রায় চারিশত বৎসর পরে, ৩১৯ খ্রিষ্টাব্দে, মালাবারের অধিপতি এই শাসনপত্রে লিখিত কতকগুলি অধিকার উহাদিগকে প্রদান করেন ।

এই তাম্রকলকে এই মর্মেণ কথ্যগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে :—

যিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি রাজাদিগকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন—সেই পরমেশ্বরের প্রদানে, আমি রবিবর্মা, মালাবারের সম্রাট, আমার

৩৬ বৎসরের রাজত্বকালে, রাজ্যানোরহ মাহেরকাথলা-হুর্গের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, সচরিত্র জোসেফ-রকনকে নিম্নলিখিত স্বত্ব ও অধিকার প্রদান করিলাম :—

১। পবিত্রবর্ণের লোকদিগের মধ্যে তিনি নিজ-ধর্ম প্রচার করিতে পারিবেন ।

২। তিনি সর্বপ্রকার সম্মান সম্ভোগ করিতে পারিবেন; তিনি অথারোহণ ও গজারোহণ করিতে পারিবেন; সমারোহপূর্বক নগরযাত্রা করিতে পারিবেন; নকিবেরা তাঁহার পদবী উচ্চারণ সমুখে ফুকরাইতে পারিবে; দিবান্তাগেও তিনি আলোক ব্যবহার করিতে পারিবেন—তিনি সর্বপ্রকার সজীত করিতে পারিবেন; ২২৭ ছত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন; এবং তাঁহার সমুখে প্রদারিত শাদা গালিচার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন । তিনি চতুর্দোলা-সিংহাসনে বসিয়া, লোকজন সমুখে রাখিয়া সর্বৈশ্বরে যাত্রা করিতে পারিবেন ।

জোসেফ-রকন এবং ৬২ জন ইহুদি ভূম্যধিকারীকে এই সকল অধিকার আমি প্রদান করিলাম । জোসেফ-রকন নিজ অধীনস্থ প্রজাদিগকে শাসন করিতে পারিবেন; এবং যতদিন অগতে দিবাকরের উদয় হইবে, ততদিন ঐ প্রজারা তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের আদেশপালন করিতে বাধ্য ।

জিবজুর, ডেসেনোর, কজোর, কালিকিলোন, ক্রেস্ট-জামোহিন্, পালিমাচেন, ও কালিগ্রিয়া—এই সকল রাজাদের সমুখে এই শাসনপত্র আমি লিখিয়া দিলাম ।

লেখক কলম্বী-কেলাপুরের হস্তাক্ষরে এই শাসনপত্র লিখিত লইল । এবং যেহেতু কোচিনের রাজা পরম্পরপা আমার উত্তরাধিকারী—সেইজন্য এই রাজাদিগের মধ্যে তাঁহার নাম ধরা হইল না ।

বাক্যকৃত :—

চেন্দ্রমু প্রমল্ রবিবর্মা—

মালাবারেশ্বর ।

ইহুদিদিগের উপরে, ফাটা খণ্ডাধরের পার্শ্বে, উহারা আমাকে একটা উচ্চ ঘর

দেখাইল। ষাট বার-পর-নাই জীব ও ভগ্নদশাপন্ন,—দেয়াল খুঁকিয়া পড়িয়াছে ও লোহার কড়িগুলো ভাঙ'চোরা; ভক্তার গর্ভ; কালো চাঁদোরা-ছাদে বাহুড়-চাম্‌চিকারা বুমাইতেছে। হুর্গপ্রাকারের রক্তের ভায়, প্রাচীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ;—তাহার মধ্য দিয়া গুলন্দাজসহরের কিয়দংশ পরিলক্ষিত হয়—সেই অংশটি এখন ইহুদিদিগের হস্তগত;—সমস্তই ধ্বংসাবশেষ, বিবাদমগ্ন ও ছতসার—মহাশয়াল তালপুঞ্জের নীচে অধিষ্ঠিত। এই শননিবিষ্ট তালপুঞ্জের বিশাল চূড়াগুলি সুদূর পর্যন্ত প্রসারিত;—সহসা একস্থানে অরণ্যের আকার ধারণ করিয়াছে;—উহাদের স্থির-মুদ্ধ শ্রামলশোভায় দিগন্ত আচ্ছন্ন। আবার, অপর দিকে দেখা যায়,—একটা পুরাতন দেবমন্দিরের সুখালিপ্ত ছাদ, বৃহৎ ও নিম্ন তাত্রগম্বুজ,—মনে হয়, যেন উত্তপ্ত ধরাতলের উপর ভাঁড়িয়া পড়িয়াছে।

এই উচ্চ ষাট—এই লুণ্ঠিতসমাকীর্ণ ভগ্নাবশেষটি শাদা-ইহুদি-শিশুদিগের পাঠ-শালা। এই অনুক্ষ মধুর প্রভাতে, ২০ জন শিশু হিক্র পড়িতেছে। সিদ্ধপুরুষ (Elie) এলির মত দেখিতে একজন ইহুদি-পুরোহিত একটা ফলকের উপর হিক্র-বাক্য লিখিয়া উহাদিগকে দেখাইতেছে। উহাদের পাশ্চাত্য ভ্রাতৃগণ আজকাল যে হিক্রভাবকে অবহেলা করে, সেই হিক্রভাবতেই এই প্রবাসী শিশুরা এখনো কথা কহে।

শাদা-ইহুদি-অঞ্চলের গরেই, কালো-ইহুদি-টোলা। এই কালো-ইহুদিরা শাদা-ইহুদিদিগের প্রতিদ্বন্দী। আমাকে জানাইয়া ছিল—ইহার পর যদি আমি কালো-ইহুদি

ও তাগাদের গির্জা দেখিতে না যাই, তাহা হইলে উহারা মনঃক্ষুব্ধ হইবে। আমি উহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই কি না, দেবিবার জন্ত এখনি কতকগুলি কালো-ইহুদি রাস্তার মাথায় দাঁড়াইয়া আছে। আবার, উর্কে গবাক্ষ-দেশে, অর্ধোত্তোলিত “শ্রাকড়া-কানি”র পর্দার পিছনে কতকগুলি শাদা-ইহুদি-যুগও দেখা যাইতেছে;—একটু যেন বেশি শীর্ণ, কিন্তু সুশ্রী। উহারাও কোঁতুলের সহিত দেখিতেছে—আমি কোন্ দিকে যাই।

কালো-ইহুদি-বেচারাদিগের ওখানেই তবে বাওয়া থাকে। কালো-ইহুদিরা বলে, শাদা-ইহুদিদিগের আসিবার কিয়ৎ-শতাব্দী পূর্বে তাহারা জুড়িয়া হইতে এদেশে আসিয়াছে। আবার, শাদা ইহুদিরা অবজ্ঞাসহ-কারে এই কথা বলে যে, কালো-ইহুদিরা আদিমনিবাসী পারিয়া-জাতির অন্তর্ভুক্ত, শাদা-ইহুদিরা এদেশে ধর্মপ্রচার কবিয়া উহাদিগকে স্বধর্মভুক্ত করিয়াছে।

শাদা প্রতিবেশীদিগের অপেক্ষা ইহাদের রং একটু মলিন বটে, কিন্তু একেবারে কালো নহে। আসলে উহারা ভারতীয় ও ইহুদির সংমিশ্রণজাত “মেটে ফিরিজি”। উহারা আমাকে আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিল। উহাদের গির্জা অনেকটা প্রতিদ্বন্দী গির্জা-টিরই অনুরূপ;—কিন্তু তেমন সমৃদ্ধ নহে। সেই স্থলর তাত্রময় স্তম্ভশ্রেণী এখানে নাই; বিশেষতঃ এগ্নানকার কুটিম সেই চমৎকার চীনে-মাটিতে বাধানো নহে। এই সময়ে শিশুদের জন্ত কি-একটা অনুষ্ঠান হইতেছিল। সমবেত শিশুগণ ধর্মগ্রন্থের মধ্যে লাক ভঁজিয়া তলুকের মত দাঁড়াইয়া, শরীর

পাৰ্বেই কোচিন-ৰাজ্যনিগ্ৰহ পুৰাতন
 আশাদ। সৰু-সৰু দীৰ্ঘ ঢাকা-বাৰাণস
 পথ দিয়া মন্দিরের মধ্যে বাওয়া যায়। কিছু-
 কাল হইল, কোচিন-ৰাজ্য এই আশাদ
 ভ্যাগ করিয়া, অপূৰকলহ এৰুনা কুলমের

বরের চাঁদোয়া-ছাদগুলা খুব নীচু—খুব
 কাজ-করা—হুগুগু কাঠে নির্মিত ;—কোথাও
 বর-কাটা নক্সা, কোথাও গোলাপপাড়ির
 নক্সা, কোথাও খিলান-কাটা নক্সা—
 সমস্তই মলিন, কোন-কোন অংশ রং দিয়া
 চিত্রিত। 'আবার এদিকে দেয়ালগুলা একে-
 বারে সমতল—এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত
 পর্যন্ত একসমান ;—অর্ধ-মহাকারের মধ্যে
 ঐখমতদৃষ্টিতে মনে হয়, দেয়ালগুলা বুঝি
 নানারঙের রঙিন কাপড়ে মোড়া ; কিন্তু

আসলে তাহা নহে,—উহাতে নানা রঙের ছবি চিত্রিত হইয়াছে। প্রাসাদের সর্বত্রই, দেয়ালের পায়ে এইরূপ বর্ণচিত্র ;—কোথাও বা কালপ্রভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—কোথাও বা সমাধিমন্দিরস্থ বর্ণচিত্রের স্তায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

দেয়ালের এই বর্ণচিত্রগুলি দেখিলে বিন্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয় ;—উহাতে একটি বিশেষ কলানৈপুণ্য প্রকাশ পায়। কি শাখাবহল প্রাচুর্য ! কি উদ্যম বিলাসলীলা ! রাশি-রাশি নগমূর্তি,—ভারতরমণীর রূপ অভিরঞ্জিতভাবে চিত্রিত হইলেও, মানবদেহ-পঙ্কজের সমস্ত খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কটিদেশ অতীব স্নীগ্ধ, বক্ষোদেশ অতীব পরিপুষ্ট ও প্রলম্বিত। সুগোল বাঁহ, সুবক্র নিভন্ন, অতি পীন পরোধর—এই সমস্তের ছড়াছড়ি—জড়াজড়ি ;—উহার মধ্যে কোনপ্রকার শৃঙ্খলা নাই। হস্ত বলয়, পায়ে নুপুর ; ললাটে সিঁথি, কণ্ঠে হার। এই সব মূর্তির সহিত পদ্মমূর্তিও মিশ্রিত।

কোথাও একটি আসবাব নাই ;—সমস্তই শূন্য। সমস্ত দেয়াল বর্ণচিত্রে আচ্ছন্ন—এ ছাড়া আর কিছুই নাই। যে ঘরগুলি পরি-ত্যক্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন—সেখানেও এই মানবমূর্তি ও পদ্মমূর্তি ছড়াছড়ি। মাকের ঘরটি খুব বিশাল—খুব উচ্চ ; এইখানে রাজা-দিগের অভিব্যেক-অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই ঘরের দেয়ালে যে-সব কিরণমণ্ডলভূষিত সারি-সারি দেবীমূর্তি—উহার আসন্নপ্রসবা এবং অসংখ্য বিনন্দ দর্শকের মধ্যে অবস্থিত।

রাজাদের শয়নকক্ষটিতে এখনো কিছু কিছু আসবাব আছে—নৌকা-আকৃতি, হুল্লু

চাক্রে নিশ্চিত একটি পর্য্যক,—তাহাতে জ্বরির রেশ্মি গদি—লাল রেশ্মি রজ্জু দিয়া চাদোয়া-ছাদে লটকানো। ভোজনান্তে রাজাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য ডৃত্যোয়া এই পর্য্যকটি দোলাইয়া থাকে। এষ্ট রাজ-শয্যার চতুর্দিকে, প্রাচীরের বর্ণচিত্রগুলিতে নিরঙ্কুশ লাম্পাটালীলা প্রকটিত। দেবদেবী, মানব, পক্ষ, বানর, ভদ্রক, হরিণ—সকলেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কামাবেশে সবেগে আকৃষ্ট, চক্ষু উন্মেষের স্তায় বিস্ফারিত, আবেশভরে পরস্পরকে জাপটাইয়া ধরিয়াছে—পরস্পরের সহিত জড়াজড়ি করিয়া আছে। একটা পিছনের ঘর—অতিবাহারে মলিন ও হতশ্রী—সেখানে দিবারাত্রি একটা পিতলের দীপ জলিতেছে ও ধুমায়িত হইতেছে... এ ঘরটিতে আমার পদার্পণ করিবার অনুমতি নাই—কেন না, উহারি প্রাস্তভাগ—বেধানটা অন্ধকার—সেইখান দিয়া মন্দিরে যাইবার পথ ...

মধ্যাহ্ন আসন্ন। এখন একটা গৃহের মধ্যে আশ্রয় লওয়া নিতান্তই আবশ্যক। আমার ছায়াচ্ছন্ন বীপটি এখন হইতে বেশী দূরে। এখন আমি কোচিনে গিয়া কোনো পান্থশালার আশ্রয় লইব।

দুইটি চটল-অব-বোজিত একটা ক্ষুদ্র ভাড়াটে গাড়ি করিয়া আবার আমি মাতা-ফেরির ভারতীয়-ধরণের রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। ‘আজ প্রাতে বেখানে ম্যালারিয়ার বিভিন্নবেশধারী নানাজাতীয় লোক পিপী-লিকার সারির স্তায় চলিতেছে দেখিয়া-ছিলাম—সেইখানে এখন মধ্যাহ্নের নিপাকতা। সেখান হইতে শীঘ্রই কোচিনে পৌছি-

লাম । এক দিকে বিল, অপর দিকে সমুদ্র— ইহারই মাঝখানে, বালুভূমির উপর, কোচিন স্থাপিত ;—পুরাতন ঔপনিবেশিক নগর— একটু স্থাবরভাবাপন্ন—এখনো যেন সেখানে ওলন্দাজি ছাপ্ মুদ্রিত । যে ক্ষুদ্র গৃহে আমি আশ্রয় লইয়াছি, সেখান হইতে সমুদ্রের বেলাভূমি পরিদৃশ্যমান—বরাট্ অনন্ত পরিদৃশ্যমান ।

আমার সম্মুখে সেই নীল মহাসমুদ্র,— আরবসাগর । মাথার উপর মধ্যাহ্নস্থর্য্য— তাহার প্রথর কিরণে বালুকারণি ও তটভূমি একপ্রকার শুভ্র ও গোলাপি রঙে উদ্ভাসিত । কাকচীলেরা চীৎকার করিয়া আকাশে উড়িতেছে । নিয়মিত সময়ান্তরে, তরঙ্গমালা ক্ষীত হইয়া, তটভূমির উপর সবেগে ভাঙিয়া পড়িতেছে । বহিঃসমুদ্রের স্থনীল মন্থণ কিকিমিকি জলের মধ্য হইতে শিকার-অশেষী দ্রবৃত্ত হাঙরদিগের ডানা ও পৃষ্ঠদেশের কিয়-দংশ উঁকি মারিতেছে । নেত্রাভিষাতি দীপ্ত প্রভার মধ্যে দিগন্ত মিলাইয়া গিয়াছে । যে আবাসগৃহে আমি আজ নিদ্রা যাইব—তাহার কোনো দিক্ বন্ধ নহে ; ইহার পশ্চাত্তাপে, নারিকেলবন যেন হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছে ; আমার ঘরের জান্না দিয়া, যেন একপ্রকার সবুজ আলোকে সমস্ত নিম্নদেশ দেখা যাইতেছে । উচ্চ তালতরুর খিলান-আকৃতি স্বদীর্ঘ সবুজ-পত্রগুলি স্বচ্ছ প্রভার উদ্ভাসিত

এবং তালীবনের গভীর প্রদেশে হরিষর্গ যেন ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে । ঐ'দেখ, একজন ভারতীয় যুবক একপ্রকার পানীয় আহরণ করিবার জন্ত পদাঙ্গুলির সাহায্যে ক্ষতবৎ মন্থণ তালতরু বাহিয়া কপিশূলভ চটুলতা ও ক্ষততা সহকারে নিঃশব্দে উপরে উঠিতেছে । যে শেষ প্রতিবিন্দুটি গ্রহণ করিয়া আমার নেত্র নিম্নীলিত হইল, সেটি ঐ চতুর্ভুজপ্রায় মনুষ্যমূর্ত্তির প্রতিবিন্দু । স্নেহকটা এত নীচ্র গাছের উপর উঠিয়া গেল যে, তাহার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ।...

এই সমুদ্রটি এমন ভাস্বর, এমন গভীর— ইহাকে আজ আমি নিকটে পাইয়াছি, হৃদয়ের মধ্যে যেন অনুভব করিতেছি ; ইহার বিপুল স্পন্দন শুনিতে পাইয়া আজ আমার কি আনন্দ ! ... এই সেই অব্যবহিত মার্গ, যেখান দিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করা যায় ; সেই মার্গ, যেখান হইতে ক্ষুদ্র পরিলক্ষিত হয় ; যেখান প্রতি নিশ্বাসে মুক্তবায়ু গ্রহণ করা যায় ; সেই মার্গ, যাহা আমার চিরপরিচিত । বাস্তবিক, ইহার সান্নিধ্যে আমার জীবন যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠে ; উহাকে পাইলে আমি যেন আপনাকে কিরিয়া পাই ; মনে হয়, যেন এই হৃক্ষৌধ্য দ্রববর্ণ্মহ ভারত হইতে— এই ছায়াচ্ছন্ন তরুশ্রমাকীর্ণ বন্ধ ভারত হইতে কণেকের জন্ত বাহির হইয়াছি ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

জাপান ও হিন্দু-আশিয় সাধনা ।

জাপান রুকের সঙ্গে যে সর্ভে সন্ধি করিয়াছে, তাহাতে শত্রু-মিত্র সকলেই বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হইয়াছে। যুরোপীয় ইতিহাসে এরূপ ঔদার্যের দৃষ্টান্ত কখনো দৃষ্ট হয় নাই। যুরোপীয় সাধনায় এমন সংঘের আজিও শিক্ষা হয় নাই। যুরোপ জাপানের এ অদ্ভুত আশ্রয়ত্যাগে ভূমিত হইবে, কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু জাপানও যে ভাল করিয়া এ ব্যাপারের মর্ম ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, ইহাই আশ্চর্যের কথা।

জাপান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রবল শত্রুর নিকটে সন্ধিভিক্ষা করিতে যায় নাই, আপনাদের বিজয়পতাকা হস্তে লইয়া সন্ধিসভায় সোজা মাথায় প্রবেশ করিয়াছে। দেড়-বৎসর কাল জাপান যেরূপ দৃঢ়ভাবে এই সর্বশেষ সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে জাপানের অর্থ ও সামর্থ্যের বণ্ণেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জাপান আরো বহুদিন ধরিয়া স্বল্পে এই সংগ্রাম চালাইতে পারিবে, তাহার তদন্তরূপ ধনবল ও জনবল উভয়ই আছে, ইহা একরূপ সর্ববাদিসম্মত। এ অবস্থায় জাপান সন্ধিপ্ৰস্তাবে যথাযোগ্যভাবে আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া এতটা আশ্রয়ত্যাগ করিয়াছে, ইহার মর্ম স্বার্থপর যুরোপ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না,—জাপানের রূপস্বত্ব

গর্ভাক প্রকৃতিপুঞ্জও ভাল করিয়া হৃদয় করিতে পারিতেছে না। এর অর্থ কি ?

ইহার অর্থ এই যে, কি যুরোপ, কি জাপান, কেহই এখনো ভাল করিয়া জাপানের সভ্যতা ও সাধনার বিশেষ ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সে সাধনার সংবাদ যুরোপ রাখে না : সে সাধনার গভীর তত্ত্ব বর্তমানের প্রবলতর সাধনা হৃদয় করিতেও পারিবে না। আর জাপানও আধুনিক যুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার দ্বারা এতটাই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতের মত সেও আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

এ সাধনা অতি জটিল বস্তু। ইহা জাপানের নিত্য নিজস্ব সম্পত্তি নহে, ইহার উপরে সমগ্র পূর্ব-আশিয়ার সাধারণ অধিকার রহিয়াছে। বিশিষ্টভাবে বর্ণনা করিতে হইলে, এই সাধনাকে হিন্দু-আশিয় সাধনা বা Indo-Asiatic culture নামে অভিহিত করিতে হয়। হিন্দু-আর্য ও মোঙ্গলীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে এ সাধনার উৎপত্তি। বৌদ্ধ, কনফুসীয় ও শিন্টো, এই ত্রিবিধ ধারা মিলিত হইয়া এই অশেষশৌর্যবীৰ্য্যসৌন্দর্য-সংঘমশালী অদ্ভুত সাধনা রচনা করিয়াছে। বর্তমান জাপানবাসকের, ও ভূতপূর্বে এই

সন্ধিযাপারে জাপান এই বিচিত্রশক্তি-সম্পৎসম্পন্ন সাধনারই পরিচয় দিরাছে ।

হিন্দু-আশিয় কথাটা নূতন । এই কথা যে বস্তুকে নির্দেশ করিতেছে, তাহাও অতি অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে । হিন্দু-ইউরোপীয় বা Indo-European সাধনার কথা বহুদিন হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি । সংস্কৃতের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই সাধনার সংবাদ সভ্যজগতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে । ইউরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যের সম্বন্ধ পাইয়া তাহার আলোচনা আরম্ভ করিলে, গ্রীক ও ল্যাটিনের সঙ্গে এই নব্য-বিষ্কৃত ভাষার মৌলিক প্রকৃতি ও গঠনরীতির আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বিশায়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন । ক্রমে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তুলনার প্রণালী বা comparative method প্রযুক্ত হইতে লাগিল, এবং এই অভিনব-প্রণালী-অনুযায়ী ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বর্তমান ইউরোপীয় ও প্রাচীন ভারতীয়দিগের মধ্যে একটা কৌলিক সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়িল । তখন হইতেই হিন্দু ও ইউরোপীয় সাধনার প্রাচীন, ঐতিহাসিক, মৌলিক সম্বন্ধ নির্দেশ করিবার জন্য হিন্দু-ইউরোপীয় শব্দের সৃষ্টি হইল । ভারতের হিন্দু ও ইউরোপের জর্মান, ইংরেজ, রুশ প্রভৃতি জাতি-সকল যে এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার সকলে অতি প্রাচীনকালে যে একই দেশে বাস করিত, একই ভাষা ব্যবহার করিত, একই দেবতায় ভজনা করিত, সংস্কৃত-আবিষ্কারের সঙ্গে এই প্রস্তাব

প্রকাশিত হইয়া পড়ে । হিন্দু ও ইউরোপীয় সাধনার উৎপত্তি সেই মৌলিক আধ্যসাধনা হইতে, ইহার একই প্রাচীন কাণ্ডের দুইটি বৃহৎ প্রকাণ্ডমাত্র । সেই প্রাচীন কাণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইবার পূর্বে যেসকল ছিল, হিন্দু ও ইউরোপীয়দিগের সেই প্রাচীন সাধারণ সভ্যতাকেই পণ্ডিতেরা হিন্দু-ইউরোপীয় নামে অভিহিত করিয়াছেন । এ প্রাচীন সাধনার সংবাদ আমরা বহুদিন পাইয়াছি ।

হিন্দু-ইউরোপীয় সাধনা বলিয়া পণ্ডিতেরা যাহার বর্ণনা করেন, তাহা অতি প্রাচীন বস্তু । বেদের প্রাচীনতম সূক্তাদিতে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । তৎপরে ভারতীয় আধ্যদল এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বহুসংখ্যক বৎসর ধরিয়া অশেষ যত্নে ও তপস্যায় যে বিচিত্র সাধনা গড়িয়া তুলিয়াছেন, বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশে, তৎপরে নিক্কাদি বেদাঙ্গে, ক্রমে উপনিষদে, পুরাণে, তন্ত্রে, ইতিহাসে যে সাধনা কুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই হিন্দুর নিজস্ব সাধনা । ইহার জন্য হিন্দু গৌরব করিতে পারে, কিন্তু পণ্ডিতেরা যাহাকে হিন্দু-ইউরোপীয় সাধনা নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা হিন্দু, গ্রীক, রোমক, জর্মান, ফ্রান্স, সকল আধ্যাত্মিক সাধারণ সম্পত্তি, তাহাতে হিন্দুর কোনো বিশেষ অধিকার নাই । হিন্দু তাহা কইয়া কোনো গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না ।

কিন্তু এক সময়ে আমরা হিন্দু-ইউরোপীয়-সভ্যতাক্ত বলিয়া আপনাদিগকে কথঞ্চিৎ গৌরবান্বিত মনে করিতাম, ইহা সত্য । কিন্তু এ গৌরব আমাদের হীনতাই ঘোষণা করিত । আমরা ইউরোপকে কিছু শিক্ষাদীক্ষা দান

করিয়াছি, বাহার গুণে যুরোপীয় সাধনার বিশেষ অঙ্গপুষ্টি সাধিত হইয়াছে, হিন্দু-য়ুরোপীয় সাধনার ইতিহাসে তাহার কোনো উল্লেখ নাই। ফলত হিন্দু-য়ুরোপীয় সাধনা যে প্রাচীন যুগের বস্তু, তখনো হিন্দু-য়ুরোপীয়ের বিতর্কে উৎপন্ন হয় নাই, তখন উভয় দলই একত্রে বাস করিতেন। আমরা যে মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, যুরোপের সভ্যজাতি-সকলও সেই মূল হইতে জন্মিয়াছে, হিন্দু-য়ুরোপীয় বা Indo-European শব্দে কেবল তাহাই নির্দেশ করে, অল্প কিছু নহে। যুরোপকে পঁচিশবৎসর পূর্বে আমরা অত্যধিক প্রজ্জ্বল চক্ষে দেখিতাম। তখন তাহার সঙ্গে কোনোপ্রকারের 'একটা সম্বন্ধ পাতাইতে পারিলে, আমাদের আশ্চর্য্য। অত্যন্ত চরিতার্থতা অনুভব করিত, ইহা তো সত্য কথা। এই হিন্দু-য়ুরোপীয়-সাধনাসূত্রে আমরা পশ্চিমের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাইতে পারিতেছি বলিয়াই, ইহার আবিষ্কারে আমরা এতটা গর্ভিতানন্দ ভোগ করিয়াছিলাম। বড় মানুষের সঙ্গে পায়ে পড়িয়া একটা সম্বন্ধ পাতাইবার চেষ্টা যে আপনার নিতান্ত হীনতার পরিচায়ক, ইহা তখনো বুঝি নাই।

ক্রমে সে জ্ঞান জন্মিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃত মর্ম্মও আমরা বুঝিয়া উঠিতেছি।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতেছি। যে, এ জগতে জাতিধর্ম্ম বলিয়া একটা বস্তু আছে। সমুদায় মানবমণ্ডলী অতি প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হইয়া আছে। আদিতে এক মানুষ-

মিথুন হইতে সমুদায় মানুষমণ্ডলীর উৎপত্তি হইয়াছিল, না ভিন্ন ভিন্ন মিথুন হইতে হইয়াছিল, এ প্রশ্ন তোলা বুঝা, কারণ তাহার মীমাংসা অসম্ভব। আদিতে বাহাই হউক না কেন, স্বরণাভীত কাল হইতে মানুষ যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া এ জগতে বাস করিতেছে, ইহা অস্বীকার করা অসাধ্য। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে অতি প্রাচীন ও মৌলিক পার্থক্যও দৃষ্ট হয়। এ পার্থক্য কেবল তাহাদের নৈসর্গিক আবেষ্টনের বিভিন্নতা হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে, এমনও মনে করা যায় না। নৈসর্গিক আবেষ্টনে এই মৌলিক বিভিন্নতাকে পরিস্ফুট করিয়াছে সত্য, কিন্তু সৃষ্টি করিয়াছে, এ কথা যথাশ্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে মৌলিক, চিরাগত এক-একটা বিশেষত্ব দেখিতে পাই, তাহাই জাতিধর্ম্ম।

সকল মানুষই এক দিক্ দিয়া দেখিলে এক। মানবের গঠন, মানবের ইন্দ্রিয়াদি, মানবের প্রকৃতি সাধারণভাবে সর্বত্রই সমান। কিন্তু এই সমানতার মধ্যেও একটা বিশেষত্বও সর্বদাট থাকিয়া যায়। চরণের সাধারণ উপাদান সকল মানুষেরই এক, কিন্তু চলনের ধরণ প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই স্বতন্ত্র ও পৃথক্। সেইরূপ একই উপাদানে মানুষের বাক্যের নির্মিত, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন লোকের গলায় স্বর কত-না বিভিন্ন হয়। শারীরিক ব্যাপারে চলনের ধরণ, গলায় স্বর, হৃদয়-চাহনির ভাব, এ সকলের দ্বারাই আমরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্ব নির্দেশ করি। বাসনিক ব্যাপারেও মানুষ

মানুষে এইরূপ একটা মৌলিক পার্থক্য আছে, তাহারই দ্বারা তাহাদের চরিত্রের পার্থক্য জানা যায় ।

যেমন মানুষে মানুষে, সেইরূপ এক জাতির সঙ্গে অপর জাতিরও একটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দেহের গঠন ও চর্মের বর্ণ-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে, ইহা প্রত্যক্ষ ও সূর্যবাদিসম্মত। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান মনোমানসাহায্যে বিভিন্ন জাতির এই পার্থক্য বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই Psychometrical (psycho—মন, meter—মান) আলোচনার ফলে আৰ্য্য, মোঙ্গলীয়, নিগ্রো প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে দেহগঠনসম্বন্ধে যে মৌলিক বিভিন্নতা আছে, তাহা অকাট্যপ্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যেমন দেহগঠনসম্বন্ধে সেইরূপ চিন্তার গতি এবং সমাজবন্ধনের মূলপ্রকৃতি সম্বন্ধেও এই সকল বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটা মৌলিক ভেদ দৃষ্ট হয়।

মানুষের চিন্তার প্রধান বিষয় দুই,— অহং ও ইদং; এক সে স্বয়ং, আর এক যে নৈসর্গিক ও সামাজিক আবেষ্টন ও প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে সে বাস করে, তাহা। আর জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিভিন্নচক্ষে অহংকে, ইদংকে, এবং অহং-ইদংএর বিচিত্র সম্বন্ধকে ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। চিন্তার সঙ্গে ভাষার অতি ঘনিষ্ঠযোগ। ভাষা চিন্তার অনুগামিনী হয়। ভাষাতে বাহ্য ব্যক্ত হয় নাই, চিন্তাতেও তাহা অভিব্যক্ত হয় নাই, ধরিয়া লইতে পারা যায়। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির চিন্তার মৌলিক প্রকৃতির

প্রমাণ তত্ত্বজ্ঞাতির জাতীয় ভাষাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোনো জাতি অতি প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতেই অহংকে কর্তারূপে ধরিয়াছে, বিষয়রূপে অহংকে প্রত্যক্ষ করিয়া ইদংকে তাহার বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই জাতির ভাষায় এই জাতির চিন্তা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া, তাহাদের ব্যাকরণে, জাতীয়-ভাষার পদযোজনায়, কর্তা ও কর্ম এবং কর্তাকর্মের সম্বন্ধপ্রকাশের ব্যবস্থা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। রাম অনন্তকণ করিতেছে, গাম বৃক্ষে আরোহণ করিতেছে, এইরূপ পদযোজনা এই সকল জাতির ভাষায় দৃষ্ট হয়। এই পদযোজনায় কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম, বিষয়ী ও বিষয়, এ সকলের জ্ঞান যে পরিস্ফুট, ইহার অকাট্যপ্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অস্ত জাতির ভাষায় তাহা পাওয়া যায় না। সে ভাষায় অন্ন ভুক্ত হইতেছে, বৃক্ষ আকুত হইয়াছে, এইরূপ পদযোজনাই কেবল হয়। ইহার অর্থ এই যে, যে জাতির ব্যাকরণে এইরূপ পদযোজনাই কেবল সম্ভব, তাহাদের চিন্তায় অহংজ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই, অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাহাদের চিন্তা ইদংএর দ্বারা অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষার পদযোজনায় কর্তা ও কর্ম এবং কর্তাকর্মের সম্বন্ধ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আৰ্য্যভাষামাত্রই এই ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই সকল ভাষায় কেবলমাত্র অস্তিত্বব্যঞ্জক পদযোজনা হইয়া থাকে। আমি আছি, অহমস্মি, I am, এ সকল পদ অস্ত ভাষায় সিদ্ধ হয় না। সে

সকল ভাষার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে গেলে, অবস্থা ব্যক্ত করিতে হয়। সংস্কৃতে বা অন্যান্য আৰ্য্যভাষার বেধানে অহম্মি পদ ব্যবহৃত হয়, অনার্য্য কোনো কোনো ভাষার সেখানে আমি বসিয়াছি, আমি দাঁড়াইয়াছি, ইত্যাদি কোনো-না-কোনো অবস্থা বা ক্রিয়া-বাচক শব্দের সঙ্গে “আমার” যোগ করিয়া তবে অস্তিত্ব ব্যক্ত করিতে হয়। ইহার অর্থ এই যে, আমাদের জাতীয়চিত্তার ছাঁচে অহংএর জ্ঞান প্রাঐগতিহাসিক কাল হইতে যতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অশ্রু জাতির চিত্তার ছাঁচে ততটা পরিষ্কৃত হয় নাই। আমরা কর্তার ভিতর দিয়া ‘কৰ্ম্মকে দেখিয়াছি, তাঁগরা কর্মের ভিতর দিয়া কর্তাকে দেখিয়াছেন ; এইজন্য কর্ম ব্যতিরেকে কর্তার সত্ত্ব ও সাধীন অনস্থান ব্যক্ত করিবার উপযোগী উপাদান তাঁগাদের ভাষার মৌলিক গঠনপ্রণালীতে বিচ্ছিন্ন নাই।

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মৌলিক চিত্তার ছাঁচ যেমন বিভিন্ন, তাগাদের সমাজের ছাঁচও সেইরূপ বিভিন্ন হইয়া থাকে। কোনো কোনো জাতির মধ্যে সমাজগঠন সামগ্রিক আদর্শ অনুসারে রচিত হইয়াছে। সমরক্ষেত্রে যেমন সর্কবিষয়ে সেনাপতির অনন্তপ্রতিবাদী অধিকার, তাঁহার ইচ্ছাই অবশ্যপ্রতিপাল্য, সেইরূপ সমাজেও সমাজ-পতির ইচ্ছাই সমাজের একমাত্র প্রতিপাল্য বিধান। এই সকল জাতির মধ্যে রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সামাজিক জীবনে পঞ্চায়তের স্থান হয় নাই। ইংরেজিতে বাহাকে constitutional শাসনপ্রণালী বলে, এই সকল

জাতির মৌলিক ও প্রাচীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিব্যবহার তাহার কোনো অবসর হয় নাই। ইহাদের সমাজের ছাঁচ স্বৈচ্ছাচারিতা বা despotismএর দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে। আবার অপর কোনো কোনো জাতির মধ্যে প্রাচীনতম কাল হইতেই দেশের শাসনকার্য্য দেশের একটা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। আৰ্য্যজাতিসকলের মধ্যে রাজা অতি প্রাচীনকাল হইতেই দশ-জনের প্রতিনিধি হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। দশপতি দলের দশ-জনের প্রতিনিধি, সমাজপতি সমাজের দশ-জনের মুখপাত্র, ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের কর্তা-গণ তাঁহাকে নির্বাচিত করিয়া থাকেন। আৰ্য্যজাতির সমাজগঠনপ্রণালীতে প্রাঐগতি-হাসিক কাল হইতেই এই সাধারণতত্ত্ব ভাব ছিল বলিয়া ইহাদের মধ্যে কি ভারতে, কি জন্মানিতে, সর্কত্রই গ্রাম্য পঞ্চায়তপ্রথা সূক্ষ্ম বিদ্যমান।

মনোরাজ্যে চিত্তার মৌলিক-ছাঁচ-সম্বন্ধে, এবং সমাজজীবনে সমাজনীতি ও রাজনীতির মৌলিক প্রকৃতিবিষয়ে আৰ্য্যজাতি জগতে অপরাপর জাতি হইতে প্রাচীনকাল হইতেই বিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যুরোপীয় আৰ্য্যগণ অহংকে যে চক্ষু দেখিয়াছেন, ইহংকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সমাজকে যে ছাঁচে গড়িয়াছেন, ভারতীয় হিন্দুগণও মূলত সেই ভাবেই দেখিয়াছেন, গড়িয়াছেন ও গড়িয়াছেন। হিন্দু ও যুরোপীয়দিগের মধ্যে এই সামান্য পার্থক্য ও এই মৌলিক সম্বন্ধকে নির্দেশ করিবার জন্যই হিন্দু-যুরোপীয় সাধনা—Indo-European culture—এই শব্দের সৃষ্টি হই-

রাছে । আমরা যে অতি প্রাচীনকালে এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলাম, Indo-European শব্দে কেবল তাহাই ব্যক্ত করে । যুরোপের উপরে কখনো, যে হিন্দু আপনার শ্রেষ্ঠসাধনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যুরোপীয়সাধনার পরিপূষ্টি সম্পাদন করিয়াছে, এমন কিছুই তাহাতে বোঝার না ।

ভারতীয় আৰ্য্যপণ যুরোপীয় আৰ্য্যপণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পরেই, ফলত আপনাদিগের একটা বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, হিন্দুসাধনা বলিতে আমরা তাহাই বুঝিয়া থাকি । অহংএর জ্ঞান হিন্দুদেরও ছিল, গ্রীকদিগেরও ছিল । বিস্ময়রূপে অহংকে যাহারা যখনই ধরিতে পারিয়াছে, তখনই তাগাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী এক একত্বের জ্ঞান জাগিয়া উঠিয়াছে । এই একত্ববোধ গ্রীক-হিন্দু উভয়ের মধ্যেই আছে । কিন্তু গ্রীস এক ভাবে এই একত্ব সাধন করিয়াছে, হিন্দু স্থান অল্প ভাবে করিয়াছে । একত্ব ও বহুত্ব লইয়াই এই বিচিত্র জগৎ । একত্বজ্ঞানের মধ্যে বহুত্বকেও স্থান দিতে হয় । গ্রীক একের মধ্যে বহুকে তাহার আদিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, হিন্দু বহুর মধ্যে এককে তাহাদের শ্রাণ ও সত্তা ও পরমার্থরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছে । একের মধ্যে বহুকে দেখিলেই, বহুর পরম্পরের যে সম্বন্ধ, তাহারই মধ্যে এককে ব্যাঙ্গ করিয়া দেখিতে হয় । অজ্ঞানভাবে বহু ও একের জ্ঞান লাভ করিতে হয় । বহু অঙ্গ, এক অঙ্গী । অঙ্গের বিকাশে অঙ্গীর বিকাশ, অঙ্গের পরম্পরের সম্বন্ধকে পাকাইয়া তুলিলে তবে অঙ্গী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় । গ্রীক একের মধ্যে বহুকে দেখিয়াছে

বলিয়া তাহার সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, চিত্রশিল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য বিকাশ প্রাপ্ত হয় । হিন্দু বহুর মধ্যে এককে দেখিয়াছে, অর্থাৎ বহুর বহুত্বের মধ্যে যে সাধারণ একত্ব আছে, তাহাই ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে । অতএব যে বিশেষত্বকে ফুটাইয়া-তুলিয়া তাহারই সাহায্যে বিশিষ্টের মধ্যেই নির্কিশেষকে দেখিবার জন্ত গ্রীকসাধনা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, হিন্দু সেই বিশেষত্বকে বর্জন ও উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করিয়া, তাহাকে মার্সা বলিয়া উড়াইয়া-দিয়া, তাহার মূলস্থিত সাধারণ নির্কিশেষ একত্বকেই ধরিতে আজীবন প্রাণপণ যত্ন করিয়াছে । ইহা ভাল হউক মন্দ হউক, ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব । এই মূল হইতেই হিন্দুর আধ্যাত্মিক আদর্শসকল বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে । ইহাই হিন্দুসাধনার অন্তর্মুখীনতার মুখ্য কারণ । ইহাই হিন্দুর আত্মস্থিতি ও আত্মরতির উৎপত্তি ও সম্ভবস্থান ।

যুরোপ অহং ও ইদংকে অজ্ঞানভাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে । অঙ্গী অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনেহু নাই, কিন্তু অঙ্গনিরপেক্ষ নহেন । অতএব আত্মা ও অনাত্মা পরম্পরের উপরে নির্ভর, পরম্পরের অপেক্ষা রাখিয়া চলে । অনাত্মাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলা আত্মার পক্ষে, অঙ্গীভাবের আত্মা ও অনাত্মাকে দেখিলে, আত্মবাহী ব্যাপার হইয়া উঠে । এইজন্য যুরোপ আত্মার প্রাধান্ত মানিয়াও অনাত্মাকে একেবারে আত্মবাহীন করিতে পারে নাই । হিন্দুও তাহা পারে নাই । কিন্তু হিন্দু অনাত্মাকে বর্জন করিতে চেষ্টা করিয়া, আর কিছু পারক আর না পারক, এমন একটা বিশাল নির্দিষ্ট ও

নিমুক্ত ভাব সাধন করিতে পারিয়াছে, যাহা
অপর জাতি এখনো সাধন করিতে পারে
নাই ;—এমন একটা দুর্গের। সন্ধান পাইয়াছে,
যেখানে বিষয়সম্বন্ধজনিত সর্বপ্রকারের ভয়-
লোভ-হর্ষামর্ষের অতীত হইয়া সে আত্মসংস্থ
হইতে পারে, যাহার সংবাদ এখনো পর্য্যন্ত
য়ুরোপ ভাল করিয়া পায় নাই ।

এই যে আত্মসংস্থের আদর্শ, ইহাই হিন্দুর
বিশেষত্ব । হিন্দু-য়ুরোপীয় সাধনা ইহার
সংবাদ রাখে না ; হিন্দু-আশিয় যে সাধনা,
তাহা এই আত্মজ্ঞান, আত্মরতি ও আত্ম-
স্থিতিরই উপরে প্রতিষ্ঠিত ।

এই আদর্শের সন্ধান যাহারা পাইয়াছে,
তাহারা সর্বদাই ভিতর দিয়া বাহিরকে দেখে,
আত্মা দ্বারা অনাত্মার বিচার করে ;—অন্তরের
অনুভূতি ও ভাবের দ্বারা বাহিরের অভিজ্ঞ-
তার মূল্য নিরূপণ করিয়া থাকে । যুরোপ
বাহাকে আশিয়ার অতিরঞ্জনপ্রবৃত্তি বলিয়া
ধূণী করে, তাহা ফলত অতিরঞ্জন নহে, আত্ম-
রঞ্জনমাত্র । একটা বস্তু দেখিলে আমরা
তাহার বাহিরের মাপ ও ওজন করিতে ব্যস্ত
হই না, কিন্তু তদর্শনে অন্তরে যে রসের সঞ্চার
হয়, তাহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই বাহ্য-
বস্তুর বর্ণনা করি । যুরোপ চো'ন ফেলিয়া
পথের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে, আমরা আমাদের
পায়ের বল কতটা কমিল, তাহা দেখিয়া, পথ-
ক্রান্তির পরিমাণ দিয়া, পথের পরিমাণ নির্ধারণ
করিয়া থাকি । যুরোপ বলে, পথের মাপ পথ ;
আশিয়া বলে, পথের মাপ পথিক । এই-
রূপে ডলাদিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে,
য়ুরোপ বাহাকে আশিয়ার অত্যাতি বলে, তাহা
অত্যাতি নহে, আত্মোক্তিমাত্র ।

এই আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্মুখীনতা হিন্দু-
আশিয় সাধনার প্রধান লক্ষণ । ইহা পূর্ব-
আশিয়ার সর্বত্রই স্বল্পবিস্তর আপনায় প্রভাব
বিস্তার করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা মূলত ও
প্রধানত হিন্দুরই নিজস্ব সম্পত্তি । হিন্দু-
সাধনার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আশিয়ার অজ্ঞাত
জাতিসকলের, মধ্যে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে ।

জাপান বর্তমান সময়ে যে অতুত আত্ম-
সংস্থ ভাব দেখাইয়াছে, তাহা এই হিন্দু-আশিয়
সাধনারই ফল ।

জাপান রাষ্ট্রলোভে বা অর্থলোভে নহে,
কিন্তু শুদ্ধ আত্মরক্ষার্থে এই ভীষণ সংগ্রামে
প্রবৃত্ত হইয়াছিল । কৃষিয়া মাঝুরিয়াকে
বিবিধ ছলে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে-
ছিল । কোরিয়ার উপরেও তাহার লোলুপ-
দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল । আর্থারবন্দরের
সাহায্যে প্রশান্তমহাসাগরে প্রবেশের পথ
সে ক্রমে পরিষ্কার করিয়া গইতেছিল ।
কোরিয়া হস্তগত হইলে, মাঝুরিয়ার তাহার
প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিলে পর, ক্রমের
পক্ষে জাপানের উপরে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত
অসম্ভব বা একান্ত অসাধ্য হইত না । ফলত
ক্রম চীনের উপরে যে লোলুপ দৃষ্টিপাত
করিতেছিল, তাহাতে জাপানকে বিনাশ
করিতে না পারিলে তাহার সমগ্র আশা সে-
দিকে যে একেবারে নিষ্ফল হইয়া যাইবে,
ইহাও সে জানিত । এইজন্য জাপানের
উচ্ছেদসাধন কবনীতির যে লক্ষ্যবাহিত
ছিল, এমনও বলে করা যায় না । জাপান
ক্রমের চরিতসন্ধি বুঝিতে পারিয়াই আত্মরক্ষার
জন্য এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় ।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা উদ্দেশ্যও জাপানের অন্তরে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়। সেটি চীনের স্বাভাব্য অক্ষুণ্ণ রাখা। যুরোপ যখন চীনের উপরে আপনাদের সমবেতশক্তি প্রয়োগ করে, জাপান সেই শত্রুদলের সঙ্গে মিলিত হইয়া আপনাদের হুম্ম ও দূরদর্শী রাজনীতিপ্রভাবে চীনকে যুরোপীয়ের গ্রাস হইতে রক্ষা করে। জাপান সমগ্র যুরোপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া চীনকে বাঁচাইতে পারিত না; কিন্তু যুরোপের সঙ্গে চীনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়া চীনকে বাঁচাইয়াছে। যুরোপ জাপানের কোশল বুঝিয়াছিল, কিন্তু জাপানের বল কত, তাহা দেখে নাই। জাপানের পক্ষে চীনকে বাঁচাইবার জন্তও যুরোপের সমক্ষে একবার আত্মশক্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছিল। অতএব রুষের ভবিষ্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও সমগ্র যুরোপের সমক্ষে আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠা করা, এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া জাপান এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। বিধাতার রূপায় এই উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে। রুষ মাফুরিয়া হইতে তড়িত হইয়াছে; কোরিয়ায় জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সমগ্র যুরোপের সমক্ষে জাপানের অলোক-সামান্য প্রভাপ প্রদর্শিত হইয়াছে। যুরোপ জাপানকে আর হেরজান করিতে সাহসী হইবে না; জাপানের ভয়ে চীনের উপরেও হস্তক্ষেপ করিবার লোভকে এখন সাবধানে সংযত করিয়া রাখিবে। জাপানের স্বাভাব্য ও চীনের ভবিষ্যৎ উভয়ই সুরক্ষিত হইয়াছে। এখন আর বুকের প্রয়োজন কি ?

এইজন্যই জাপান আপনাদের অর্থহানি

করিয়াও রুষের প্রভাবিত সন্ধির সর্ব্ব দৃষ্ট-চিন্তে গ্রহণ করিয়াছে।

যুরোপ অর্থের মাখে সকল বিষয়ের মূল্য-নির্ধারণ করে। দেহ, মন, মান, ধর্ম, সকলেরই একটা আর্থিক মূল্য আছে। মানের ক্ষতি, ধর্মের ক্ষতি, সকলই অর্থে পূর্ণ হয়। আশিরার মানদণ্ড অর্থ নহে, আধ্যাত্মিক শক্তি ও কল্যাণ। আধ্যাত্মিক শক্তি, ও কল্যাণের দিক্ দিয়া দেখিলে, এই সময়ে জাপান সর্ব্ব-বিষয়ে লাভবান হইয়াছে। এই শক্তি ও কল্যাণের জন্তই জাপান এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সুতরাং ইহাতে তাহার কোনো ক্ষতি হয় নাই। এখন সেই ক্ষতিপূরণের জন্ত রুষের নিকট হইতে অর্থ দাবি করিয়া জাপান অকল্যাণের পন্থা অবলম্বন করিতে চাহে নাই। ইহা হিন্দু-আশির সাধনারই ফল।

এই জাপ-রুষ-সংগ্রামে জাপান কেবল আপনাদের অসাধারণ শক্তি ও অলোকসামান্য সংযম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু হিন্দু-আশির সাধনা বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, বাহা খৃষ্ট-যুরোপীয় সাধনা হইতে নিকৃষ্ট নহে, বিশ্বমানবের অঙ্গপুষ্টির জন্ত যে সাধনার প্রতিষ্ঠাও অত্যাৱশ্যক, যে সাধনা অকালে নিষ্পূর্ণ হইলে বিশ্বমানবের অঙ্গহানি হইবে,—তাহাও জাপান বর্তমান সময়ে প্রমাণিত করিয়াছে। ইহাই জাপ-রুষ-সময়ে বিধাতার লীলা। ইহারই জন্ত আমরাও সভ্যভাবেই জাপানের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা গভীর আত্মপ্রসাদ সন্তোষ করিতে পারি। আর জাপানের প্রতিষ্ঠার হিন্দু-আশির সাধনার প্রতিষ্ঠা হইতেছে দেখিয়া আমাদের প্রাণেও নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে।

ত্রিবিপিনচন্দ্র পাল ।

মর্শ্বেদ ।

অন্ধ্রক্ষেদে সকল সময়ে জীবনহানির আশঙ্কা উপস্থিত হয় না। বাহার অঙ্গুলি “উরগ-কত”, তাহার পক্ষে অন্ধ্রক্ষেদই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। কিন্তু মর্শ্বেদে কাহারও কল্যাণ হয় না; সকলেরই জীবনহানির আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

বঙ্গের অন্ধ্রক্ষেদ অগণক। বাঙালীর মর্শ্বেদেই অধিক বারম্বার ব্যাপার! তাহার জন্যই বাঙালী দিনদিন এত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। সেকালের ভুলনার একালের বাঙালী জীবন্ত;—আত্মরক্ষার নিত্য অসমর্থ।

আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি জীবজগতের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পণ্ডপক্ষী, কীটপতঙ্গ, এমন কি উদ্ভিদ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর জীব এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে। বাহারা এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে না, তাহারা মৃত অথবা মৃতকর। মর্শ্বেদে ভিন্ন জীবজগতে এরূপ মৃতকর অবস্থা উপস্থিত হয় না।

বাঙালীর মৃতকর অবস্থারও একমাত্র কারণ—মর্শ্বেদ। মর্শ্বাহত বাঙালী তাহার হৃৎপিণ্ডের প্রকৃত কারণ হৃদয়রক্ষা করিতেও অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে! বাঙালী যদি আত্মরক্ষার জন্য কায়মনোবাক্যে লালারিত হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বাঙালী হইয়াই আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে; অন্য কোন উপায়ে তাহা সকল হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই সহজ এবং সরল কথাও হৃৎপিণ্ড হইয়া উঠিয়াছে! বাঙালী আর বাঙালী নাই; সে তাহার স্বাভাবিক আদর্শ হইতে অলিঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে;—ইহাই বাঙালীর মর্শ্বেদ,—ইহাই মৃতকর অবস্থার মূল কারণ। সাহেব সাজিতে গিয়া বাঙালীর চূর্ণতির একশেষ হইয়াছে।

বাঙালী পরিব্রাজক ছিল। নিত্য অনিবার্য কারণ উপস্থিত না হইলে, বাঙালী কখন নগরদর্শনের জন্য লালারিত হইত না;—পল্লিনিকেতনে বাস করিয়া পরস্পরকে চিনিবার অবসর লাভ করিত; সকলে মিলিয়া সুখে-দুখে এক পরিবারের মত পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইত। ইহাই বাঙালীর পুরাতন পরিজীবনের একতার মূল। এই মূল একেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে!

ধনি দরিদ্র, পণ্ডিত-মর্শ্ব, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এখনকার মত তখনও অর্ধগত, বিভাগত, ধর্মগত পার্থক্য বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এখনকার মত হৃদয়গত পার্থক্য বিদ্যমান না থাকায়, ধনি-দরিদ্র, পণ্ডিত-মর্শ্ব, হিন্দু-মুসলমান সহজে একতাহুজে আবদ্ধ হইয়া রেতঃপূর্বক আত্মপালন করিতে পারিত। আত্মরক্ষার তাহাই মূলশক্তি। সে শক্তি দিনদিন কীণ হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কাহারও নেতৃত্বধীন না করিলে, একতা সংস্থাপিত হইতে পারে না। হৃদয়

বল ভিন্ন বাধ্যবলে নেতৃত্বলাভ করা যায় না । এইজন্য বাঙালী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে !

গ্রামের লোকে গ্রামের কৃষিশিল্পের উপর নির্ভর করিত ; সকলেই অন্নব্যয়ে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিত ; একালের মত এত দেশবাসী হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিত না ! সকলেই অবসরসময়ে কোন-না-কোন শিল্পচর্চায় অতিনিবিষ্ট হইত ; • কাহাকেও বৃত্তির অভাবে অনশন অভ্যাস করিতে হইত না ! এখন পল্লিবাসীর পক্ষে একমাত্র কৃষি-কার্য ভিন্ন অল্প বৃত্তি অবলম্বন করিবার উপায় নাই ;—গ্রামের লোকে আর গ্রামের শিল্প লইয়া সম্বন্ধ হইতে সম্মত হয় না । গ্রামে যাহা উৎপন্ন হইতে পারে, গ্রামবাসী তাহা প্রার্থনা করে না ; গ্রামবাসী যাহা প্রার্থনা করে, গ্রামে কেন—সমগ্র দেশেও—তাহা উৎপন্ন হইবার উপায় নাই !

পল্লিজীবনই বাঙালীর সকল শক্তির মূল । যাহা বাঙালীর স্বাভাবিক শক্তি, পল্লিজীবনেই • তাহা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল । সাহস ছিল, বাহুবল ছিল, সরলতা ছিল, সত্যনিষ্ঠা ছিল,—কর্তব্যপালনে অসাধারণ অধ্যবসায় ছিল ! যে সকল গুণ থাকিলে মানবসমাজ অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে, পল্লিবাসী বাঙালীর মধ্যে তাহার কোন গুণেরই অভাব ছিল না । এখন বাঙালীর এই স্বাভাবিক শক্তি নানা কারণে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে । কেহ কাহাকেও জানে না ; কেহ কাহাকেও মানে না ;—কেহ কাহারও উচ্ছৃঙ্খল কার্যের শাসন করিতে পারে না ! যাহারা এইরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা সহস্র উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না ।

নগরবাসী হইয়া বাঙালী তাহার স্বাভাবিক শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে ! নাগরিক-গণের কুণ্ঠাস্ত্রে প্রলুব্ধ হইয়া, অন্নকালের মধ্যেই বাঙালী অত্যন্ত বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে । দরিদ্রের বিলাসবাসনা বিড়ম্বনার নামান্তর মাত্র ; দরিদ্র বাঙালী বিলাসী হইয়া, কত-না বিড়ম্বিত হইতেছে !

আত্মস্বার্থই বাঙালীর সর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে । দেশের কথা চিন্তা করিবার অবসর নাই । যাহারা বাধ্য হইয়া পল্লিগ্রামে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা নগ্নকহীন হইয়া, কাল-শ্রোতে তৃণখণ্ডের ভাৱ বিচ্ছিন্নভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে । এই মর্মান্বিতই বাঙালী এত মৃতকল্প ! তাহার নৈতিক সাহস তিরোহিত হইয়া গিয়াছে ; তাহার বাহুবল অবসর হইয়া পড়িয়াছে ; তাহার সরলতা এবং সত্যনিষ্ঠা কথামাত্রের পর্য্যবসিত হইয়াছে ; কর্তব্যপালনের অকৃত্রিম • অধ্যবসায় এখন কেবল কর্তব্যপালনের ভাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ! এরূপ মৃতকল্প ছত্রভঙ্গ মানবসমাজের পক্ষে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা অসম্ভব বলিলেও অতুক্তি হয় না ।

ইংরেজ সওদাগরগণ এ দেশে প্রথম পদা-র্পণ করিবার সময়ে, বাঙালীর অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল না । তাহারা তখনও আত্ম-রক্ষা করিতে পারিত । • তাহারা ইংরেজের নিকট বিবিধ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া অর্থো-পার্জন করিত ; কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য লালারিত হইত না । ইংরেজদিগের পক্ষে বিক্রয় করিবার চেষ্টার জটিল ছিল না ; দেশের লোকে তাহা ক্রয় করিতে না পারিলে, জীবন বিযমর বোধ করিত না ।

ইংরেজ দোকান সাজাইয়া বলিয়া থাকিত; ইংরেজ ভিন্ন বাঙালী সে দোকানে কিছু বাধাইবার জন্ত উর্দ্ধ্বাসে ধাবমান হইত না। এখন আর সে অবস্থা বর্তমান নাই। এখন ইংরেজের দোকান উঠিয়া গেলে, বাঙালী-জীবন বিঘ্নিত হইয়া উঠিবে। যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল না, তাহা দেশে উৎপন্ন হইত না। এখন তাহার প্রয়োজন অল্পত্ব হইয়াছে বলিয়াই ইংরেজের নিকট তাহা ক্রয় করিতে হয়। এখন আর সহসা সেই সকল দ্রব্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করা সহজ নহে;—অত্যাশু এখন “মৌতাতে” পরিত্যক্ত হইয়াছে! তখন “বিদেশীর দ্রব্য ব্যবহার করিব না” বলিয়া সভা করিবার প্রয়োজন ছিল না; এখন সভা করিয়া,—বক্তৃতা করিয়া,—দেবমন্দির স্পর্শ করিয়া ধর্মপ্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইয়াও,—বিদেশীর দ্রব্যের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবার উপায় নাই। তাহা করিতে হইলেই, এদেশের লোককে আবার বাঙালী হইতে হইবে;—তাহারা বাঙালী হইতে সম্মত হইবে কি? ইংরেজ সাজিতে গিয়া, বাঙালী তাহার আশ্রয়কার শক্তি হারাইয়া-ফেলিয়া, জীবন-বাজানির্কাহের জন্ত ইংরেজের নিকট আশ্রয়-বিক্রয় করিয়াছেন। বাঙালীকে আবার বাঙালী করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে বিদেশীর দ্রব্য পরিহার করিবার জন্ত উত্তেজনা করিলে, সে চেষ্টা কদাচ গুল হইবার আশা নাই।

বাঙালীর পক্ষে বিদেশীর দ্রব্যের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক বলিয়া স্বীকার করা বাধ্য। প্রায়প্রধান দেশে ভ্রমগ্রহণ করিয়া

বাঙালী যে ইংরেজ সাজিয়া অকারণে গল্প-বর্ষ হইতেছে, তাহা স্বকৃত পাণের প্রত্যক্ষ প্রায়শ্চিত্ত। তাহার পক্ষে ঐ সকল দ্রব্যের প্রয়োজন স্বাভাবিক নহে। স্বদেশে বাহা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাতেই বাঙালীর দিন চলিয়া বাইতে পারে; কিন্তু বাঙালী এখন আর তাহা লইয়া দিন চালাইতে পারিতেছে না;—ইহাই বাঙালীর মর্ম্মচ্ছেদ।

সংসম্মত মানবসভ্যতার একমাত্র সমুন্নত আদর্শ। এই আদর্শ সংস্থাপিত করিয়া, পুরাতন প্রাচ্যশিক্ষা মানবসমাজের ইতিহাসে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে। সে শিক্ষা বঙ্গদেশেও প্রচলিত ছিল। তাহার প্রভাবে বাঙালী আশ্রয়স্থলে অলাভালি দিয়া, পরের সুখের জন্ত অকাতরে আত্মত্যাগ করিয়াছে। প্রতি গ্রামের পুরাতন দেব-মন্দির, অতিথিশালা, দীর্ঘিকা ও সরোবর অত্যাশু তাহার সাক্ষ্যদান করিয়া থাকে।

ইংরেজশিক্ষা বাঙালীর মর্ম্মচ্ছেদ সুসম্পন্ন করিয়া সভ্যপক্ষেই সভ্যতার প্রকৃত আদর্শ বলিয়া সর্বত্র প্রচারিত করিয়া দিয়াছে। বাঙালীর শিক্ষার মধ্যে এরূপ উপদেশ নিহিত ছিল না; বাঙালীর পারিবারিক বা সামাজিক নীতিনীতির মধ্যেও এরূপ উপদেশ বর্তমান ছিল না। ইংরেজ-শিক্ষাই ইহাকে এদেশে এত প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। তাহাতে প্রভাবিত হইয়া, অনেক চিন্তাহীন লেখক বাঙালীর পারিবারিক ব্যবস্থাকেই বাঙালীর অধঃপতনের মূলকারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। বাঙালীর অধঃপতনের মূলকারণ কি, ধীর-ভাবে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার

সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে আলোচনার প্রবৃত্ত না হইলে, রোগের মূল অজ্ঞাত থাকিবে ;—চিকিৎসা বিফল হইয়া পড়িবে ।

যে জাতি যে তাবে অনাদিকাল হইতে ধীরে ধীরে পড়িয়া উঠিয়াছে, সেই জাতির ইতিহাসে তাহার জীবনগঠনের নিয়মাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই জাতি অল্প নিম্নে সহসা উন্নতিলাভ করিতে পারে না। জীবজগতের সর্বত্র ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশ্বখ অশ্বখের চিরপ্রচলিত নিয়মের অধীন হইয়াই সমুন্নতি লাভ করিতে পারে ; অল্প বৃক্ষের নিয়মের অধীন হইয়া সমুন্নতি লাভ করিতে পারে না ! বাঙালী বাঙালীর চিরপ্রচলিত নিয়মের অধীন হইয়াই সমুন্নতি লাভ করিতে পারিবে ;—তাহাই বিশ্ববিধাতার বিধান। তাহাকে অতিক্রম করিলেই মর্শ্বেদন উপস্থিত হইবে। বাঙালী না বুঝিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া, বড় হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল ; তাহাতেই বাঙালীর মর্শ্বেদন সংঘটিত হইয়াছে। বাঁচিতে হইলে, বাঙালীকে আবার বাঙালী হইতে হইবে।

শিক্ষিত-বাঙালীর সহিত নির্ধন, নিরক্ষর, পল্লিবাসী বাঙালীর আন্তরিক আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাহারা নির্ধন, বাহারা নিরক্ষর, বাহারা পল্লিবাসী, তাহারাই সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগের সহিত সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের পরিচয় ও আত্মীয়তা থাকার, সেকালের সমগ্র বাঙালীজাতির পক্ষে সকল কার্যেই একতালাভের সম্ভাবনা ছিল। উপযুক্ত নারক প্রাপ্ত হইলে, তাহারা একমন একপ্রাণ হইয়া

নানা কার্য সাধন করিতে পারিত ;—ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এখন এই শ্রেণীর বাঙালী শিক্ষিত-বাঙালী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আশাদিগকে জানে না, আমরাও তাহাদিগকে জানি না ;—এই কারণে তাহারা আশাদিগকে আর পূর্ববৎ একমন একপ্রাণ হইয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। আমরা এতকাল তাহাদিগকে ছাড়িয়া, স্বদেশের উন্নতিসাধনের সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া, কললাভ করিতে পারি নাই। তাহাদিগকে আবার আপনাদিগের করিয়া লইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। কৃত্রিম উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইবে না ; সময়ে সময়ে জনসমাজের বৃহৎ-সমিতি গঠিত করিলেও, তাহা সিদ্ধ হইবে না। তাহারা কোতূহলপরবশ হইয়া দেখিতে আসিয়া, কোতূহল চরিতার্থ করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিবে। বাহারা পল্লিবাসী, তাহারা আবার বাঙালী হইয়া জনসাধারণের সহিত পূর্ববৎ আন্তরিক আত্মীয়তা সংস্থাপিত করিতে না পারিলে, বাঙালী শক্তিস্থাপন করিতে পারিবে না। গবর্নেন্ট বঙ্গবিচ্ছেদে বতটুকু বিচ্ছেদ সাধন করিতেছেন, এই মর্শ্বেদনে তাহা অপেক্ষা অধিক বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছে। তাহা দূর করিতেই হইবে। আন্তরিক অমুরাগ তির তাহা কদাচ সফল হইবে না।

কোন্ শ্রেণীর শিক্ষিত-বাঙালীর অহু-রাগে এই মর্শ্বেদন সহজে বিদূরিত হইতে পারে, সে কথা চিন্তা করিবারাজ দেশের অধিদায়ককেই সর্বাপ্রাণে স্মরণ করিতে হয়। তাহারাই বাঙালীর বল, তাহারাই বাঙালীর

ভরসা, তাঁহারা ই বাঙালীর প্রকৃত নায়ক। তাঁহাদিগকে ধরিয়াই বাঙালী একদিন শিক্ষার, শিল্পের, বাণিজ্যের, সাহসের, বাহুবলের, সভ্যনিষ্ঠার, কর্তব্যপালনের অধ্যবসারে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহাদিগকে ধরিয়াই আবার বড় হইয়া উঠিতে পারিবে। ইহার জন্য জমিদারদলকে ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে;—তাঁহাদিগকে বাঙালী হইতে হইবে। যে শ্রেণীর আচারব্যবহার ইংরেজের পক্ষে ঘোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হয় না, বাঙালীর পক্ষে তাহাই অত্যন্ত দোষাবহ। জমিদার-দলের মধ্যে এই শ্রেণীর আচারব্যবহারের অভাব নাই। তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষিতসমাজে মিশিবার বাধা হয় না; কিন্তু অশিক্ষিতসমাজে মিশিবার পক্ষে তাহাই প্রধান অন্তরায়। তাহারা সাহেবী-আনা দেখিলে, আপনাদের লোক বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না! এই একমাত্র অপরাধে অনেক জমিদার আপন প্রজাবর্গের পক্ষে পর হইয়া উঠিয়াছেন! একটু ত্যাগ-স্বীকার করিবামাত্র তাঁহারা আবার আপন হইতে পারেন।

অত্যাশ্রিত শিক্ষিত-বাঙালীও অস্বাভাবিক-মাত্রায় সাহেবী-আনা ধরিয়া স্বদেশের জন-সমাজের নিকট পর হইয়া উঠিয়াছেন। সাহেবী-আনার প্রধান দোষ এই যে,—তাহা আমাদিগকে স্বতন্ত্র ও স্বার্থপর করিয়া দেশের লোকের সহিত আন্তরিক সংযোগ-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। নিরক্ষর লোককে পণ্ডিত বত-ভাবে ও পণ্ডিত বত ব্যবহার করিতে শিখাইয়া, ইংরেজি-শিক্ষা অন্নদিনের মধ্যেই শিক্ষিত ভ্রমসভানকেও অতন্ন করিয়া তুলি-

য়াছে! বাহা বাঙালী জনসাধারণের নিকট অতন্ত্রব্যবহার বলিয়া সুপরিচিত, সেদ্রুপ ব্যবহার শিক্ষিত-বাঙালীকেও আক্রমণ করিয়াছে। নিরক্ষর ও নিধন স্টেটমন্ডারের সহিত সাহেব ও শিক্ষিত বাঙালীর ব্যবহার প্রায় একরূপ হইয়া উঠিয়াছে;—হঠকারিতার, অবজ্ঞার, অত্যাচারের শিক্ষিত-বাঙালী সাহেবদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন! প্রভুত্বভ্যর্থের মধ্যে যে ঘেহের সম্বন্ধ বিস্তারিত ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; ধনিদরিজের মধ্যে যে মিলনক্ষেত্র বর্তমান ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। এখন আর আমাদের সুখদুঃখের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই। আমরা যখন বঙ্গবিচ্ছেদে হাহাকার করি, তাহারা তখন আমাদের আন্তরিক শোকের প্রকৃত মৰ্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে না। আমরা যখন স্বদেশশিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশ বিতরণ করি, তাহারা তখন প্রকৃতভাবে আমাদের আন্তরিকতার আহ্বানাপন করিতে পারে না। আমরা সর্বপ্রায়ে বিদেশীয়জব্যে আসক্ত হইয়া স্বদেশশিল্পের সর্বনাশ করিয়াছি; আমাদের বিদেশমোহ বিদূরিত হইয়াছে কি না, তাহাতে জনসাধারণের মনে সন্দেহের অভাব নাই!

ইংরেজিশিক্ষার যে বঙ্গবিচ্ছেদ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার তুলনার ইংরেজশাসনের বঙ্গবিচ্ছেদ বিশেষ মারাত্মক নহে। শাসন-নীতি সুসংবত করিবার অধিকার আমাদের অনারত্ত। আমরা প্রতিবাদ করিতে পারি;—আবেদন করিতে পারি,—আন্দোলনে

অলঙ্ঘনযোগ্য করিয়া তুলিতে পারি;—
শাসনশক্তিকে কণাচ হুগংবত করিতে পারি
না। সুতরাং ইংরেজশাসনে যে বঙ্গবিচ্ছেদ
উপস্থিত হইতেছে, তাহা অনিবার্য।
তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিবে, অনেক
অকল্যাণ হইবে, অনেক অসুখ উপস্থিত হইবে;
—প্রাণহানি ঘটিবে না। কিন্তু ইংরেজ-
শিক্ষার যে মর্শ্জেন্দ সংঘটিত হইয়াছে,
তাহাতেই বাঙালীর প্রাণহানির সূত্রপাত
হইয়াছে। তাহার গতিরোধের উপায়
আবিষ্কার করিতে না পারিলে, কীণ প্রাণের
কীণ স্পন্দন ক্রমেই অবসর হইয়া পড়িবে;
এখনও আশ্রয়কার সময় আছে;—অল্পদিনের
মধ্যে তাহা একেবারেই অস্তিত্ব হইবে।

বাঙালীর ইতিহাসে অনেক রাজনৈতিক
সন্ধিকাল উপস্থিত হইয়াছিল। বাঙালী
সেই সন্ধিকালে আত্মনির্ভর না করিয়া,
পরম্পরাগত হইয়াই, রাজনৈতিক অভ্যুদয়
লাভ করিতে পারে নাই। বাঙালীর ইতি-
হাসে আবার একটি সন্ধিকাল উপস্থিত
হইয়াছে। ইহা রাজনৈতিক সন্ধিকাল না
হইলেও, জাতীয়জীবনের ইতিহাসে ইহাই
সর্বাপেক্ষা প্রধান সন্ধিকাল। সন্ধিকাল
সমস্তার কাল; সেই কালে যে জাতি যেরূপ
ভাবে সমস্তার সীমাংসা করিয়া গর, তাহার
ভবিষ্যৎ সেইরূপ তাহেই গঠিত হইয়া থাকে।
এখনকার সমস্তা বিবম সমস্তা। মর্শ্জেন্দে
বাঙালীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া
উঠিয়াছে, তাহা অনেকেই অস্বীকার্য।
কি উপায়ে ইহার গতিরোধ করা যাইতে পারে? এই
সমস্তার সীমাংসার লক্ষ্যস্ফট হইলে, বাঙালীর

ভবিষ্যৎ আশাতরঙ্গা চিরদিনের মত বিলুপ্ত
হইয়া পড়িবে।

আত্মমর্যাদাবোধ প্রবুদ্ধ না হইলে,
কোন জাতিই অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে
না। বাঙালী বাঙালী না হইলে, তাহার
আত্মমর্যাদাবোধ প্রবুদ্ধ হইবার উপায় নাই।
সকল দেশের ইতিহাসই এই সরল সিদ্ধান্তের
পক্ষসমর্থন করিয়া থাকে। আমাদের
ইতিহাসে ইহার কোন নূতন সিদ্ধান্ত
আবিষ্কৃত হইবার আশা নাই। বাঙালীকে
আবার বাঙালী হইতে হইবে;—তাহাই
একমাত্র পথ।

আত্মমর্যাদাবোধ প্রবুদ্ধ হইবামাত্র
স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া থাকে।
স্বাবলম্বনই অভ্যুদয়লাভের মূলমন্ত্র। স্বাবলম্বন
অকুতোভয়তার, অধ্যবসারে জাতীয়জীবনে
শক্তিসঞ্চার করে। ভারতবর্ষের দিকে
দৃষ্টিপাত করিলে, স্বাবলম্বনবিচ্যুত ভারত-
বাসীর দুর্দশার কাহিনী কাহারও চিত্তে
সমবেদনার উদ্রেক করিতে পারে না।
যাহাদের জন্মভূমি রক্তপ্রসবিনী, তাহারা
স্বাবলম্বনবিচ্যুত হইয়া অনশনে ক্লিষ্ট হইলে,
কে তাহার জন্ত হাহাকার করিবে?

আমরা আমাদের শিশুবাণিজ্য রক্ষা
করিব;—যতদিন তাহাতে কৃতকার্য না
হই, ততদিন অস্ত্র চিন্তা বিসর্জন দিব;—
ইহাই স্বাবলম্বনের প্রথম শিক্ষা। প্রথম
শিক্ষা বড় কষ্টকর;—বালককে তাহা আরম্ভ
করিতে বহু বেজালাত সহ করিতে হয়।
আমাদিগকেও বহু বেজালাত সহ করিয়া,
এই প্রথমশিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে।
তাহাতে পরাধীন হইলে, আমাদের

ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন কেবল কল্পনারাজ্যেই কুহক বিস্তার করিবে!

এক দিকে অকুতোভয়তা, অল্প দিকে অধ্যবসায়, এই দুইটি চিত্তবল না থাকিলে, আবলঘন আরম্ভ হয় না;—তাহা কেবল ঐহিকত কথার কথাই থাকিয়া যায়। বাঙালীর পক্ষে অকুতোভয়তা হ্রাস হইয়া উঠিয়াছে। ঐহিকতাংশ বাঙালী জুজুর ভয়ে লুপ্ত। কাল্পনিক ভয়ের নাম জুজুর ভয়। তাহাতে চিত্তবৃত্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে; চিন্তার স্বাধীনতা দুরীভূত হইয়া যায়, কার্যের স্বাধীনতা বিকশিত হইতে পারে না।

রাজপুরুষগণ যখন কোন বিষয়ে দেশের গণ্যমান্ত লোকের মতামত জিজ্ঞাসা করেন, তখনই বাঙালীর চিত্তহীনতার নিকট পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে;—বাহারা পদস্থ বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা জুজুর ভয়ে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না! পদস্থ ব্যক্তিগণ একবার সাহস করিয়া জুজুর ভয় পরিত্যাগ করিতে পারিলে, বাঙালীর চিত্ত-হীনতা দূর হইতে পারে। যে কার্যে অধ্যবসায় আবশ্যক, বাঙালী তাহাতে জরাজীর্ণ করিতে পারে না বলিয়া বোধ হয় না। আবেদন-মিবেদনে বাঙালীর অধ্যবসায় এক্ষণে অগরিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এই অধ্যবসায় পরামলঘনকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে;—ইহাকে একবার আবলঘন আশ্রয় করাইতে পারিলে, বাঙালীর আত্মোন্নতির চেষ্টা সকল হইতে পারে।

কি করিতে হইবে, কেমন করিয়া করিতে হইবে, তাহার পূর্বনির্দেশের জন্য সভ্য-সমাজের ইতিহাস মানবজাতিকে নিরন্তর উৎসাহদান করিতেছে। কে কি ছিল, কি হইয়াছে,—তাহা কাহারও অবিজ্ঞাত নাই। আবলঘনে হ্রাস সবল হইয়াছে; দরিদ্র ধনশালী হইয়াছে; বর্ষের সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিয়াছে। আবলঘনের অভাবে সবল হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে; ধন-শালী কাঙাল হইয়া হাহাকার করিতেছে; সুসভ্য মানবসমাজ বর্ষরতার কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইয়া বাইতেছে! বাঙালীর সম্মুখে ইহার উত্তর দৃষ্টান্তই দেদীপমান।

তথাপি বাঙালী কেবল দাস্তবৃত্তিতেই আত্মোন্নতিসাধনের আরোহণ করিতেছে। দাস্তবৃত্তিতে কোন জাতিই অত্যাধরলাভ করিতে পারে নাই।

বাঙালী অর্থোপার্জননের জন্যই বিভ্রাটিকা করে। তথাপি বাঙালী অর্থোপার্জননের প্রকৃত পথে অগ্রসর না হইয়া, রাজদ্বারে কোলাহল করিয়া জীবনক্ষয় করিয়া থাকে! রাজপুরুষগণ আমাদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন না,—ইহাই বাঙালীর সর্বপ্রধান আর্জন্য! আমরা আমাদিগকে যে সকল উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে পারি, তাহার জন্য যথাযোগ্য ব্যাকুলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেকালে রাজপদলাভের জন্য এরূপ প্রবল পিপাসায় বাঙালী নিরন্তর এরূপ যত্ননাভোগ করে নাই।

বাঙালীকে আবার বাঙালী হইতে হইলে, আবলঘন শিক্ষা করিতে হইবে। তাহাতেই মর্শ্জের বিমুক্ত হইতে পারে।

কিন্তু স্বাবলম্বন শিক্ষা করিবার পক্ষে অনেক বাধাবিঘ্ন বর্তমান আছে। প্রথম ও প্রধান বাধা—আদর্শের বাধা। সকলেই সাম্যমত্রে উন্নত হইয়া একাকার হইবার জন্ত লালারিত। এই অর্থে . পুরাকালে সাম্যমত ব্যবহৃত হইত না। জগতের সকল ব্যাপারেই বৈষম্য দেখা পায়মান ;—মানবসমাজেও বিবিধ বৈষম্য চিরদিন বর্তমান থাকিবে। বৈষম্যের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনের নামই সাম্য। বৈষম্য বিদূরিত করিবার নাম সাম্য নহে। বাঙালী পুরাতন কথার নূতন অর্থ কল্পনা করিয়া, বৈষম্য বিদূরিত করিবার জন্তই লালারিত হইয়া উঠিয়াছে। মানব-হস্তের অনুলিনিচরের মধ্যে প্রকৃতিপ্রদত্ত যে প্রত্যক বৈষম্য বর্তমান আছে, আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসাবলে সেই পুরাতন বৈষম্য বিদূরিত করিয়া দিলে, মানবহস্ত তাহার সর্ব-প্রকার প্রয়োজনসাধনের অযোগ্য হইয়া উঠিবে। মানবসমাজের নরনারীর অবস্থাও সেইরূপ। দেশের সকল শ্রেণীর লোকেই ভ্রলোক সাজিবার আশায় এক পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। কৃষকের সন্তান কৃষিকার্য্য পরি-ত্যাগ করিয়াছে, তাঁতি-কর্ম্মকার বস্ত্রশালা হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছে ; সকলেই ভ্রলোক সাজিবার জন্ত আবেদনপত্র লইয়া কর্ম্ম-খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঘারে ঘারে পরি-ভ্রমণ করিতেছে। এই সাম্যমত্রে যে কত অনর্থের মূল, কেহ তাহা চিন্তা করিয়া দেখি-তেছেন না। স্বদেশশিল্পের উন্নতিসাধনের জন্ত লালারিত হইলে কি হইবে? কে তাহার উন্নতিসাধন করিবে? বাহারা শিল্পগৌরবে অগবিন্দ্য হইয়াছিল, তাহাদের বর্তমান

বংশধরগণ সাম্যমত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভ্রলোক সাজিয়া, জনসমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে ; —শিল্পী নাই ;—শিল্পীর সন্তানকে শিল্প-চর্চায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিবামাত্র সে তাহাকে নিতান্ত মানিজনক অনুরোধ মনে করিয়া নিরতিশয় উত্থিত হইয়া উঠিবে। বাহারা শিল্পচর্চা করিলে অনায়াসে স্বদেশ-শিল্পের সমুন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা-দিগকে শিল্পচর্চায় নিযুক্ত করিতে না পারিলে, স্বদেশশিল্পের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু বাহারা ইহাতে নিযুক্ত হইবার যোগ্যপাত্র, মর্শ্বেদের অনিবার্য্য অত্যাচারে তাহারা বাবু সাজিয়া জনসমাজে মিশিয়া পড়িয়াছে ; অনেকে পুরাতন কুলোপাধি পর্য্যন্ত পরিবর্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙালী পিতৃপুরুষের নামে লজ্জিত হইত না ; এখন অনেক বাঙালী সে নাম গোপন করিবার জন্তই লালারিত। এই মর্শ্বেদ বিদূরিত না হইলে, শিল্পচর্চায় আধুনিক আয়োজন-আন্দোলন বিফল হইয়া পড়িবে। বাহারা স্বদেশশিল্পের উন্নতি-সাধনের জন্ত বহুপরিকর হইয়াছেন, তাহারা একবার স্বদেশের পুরাতন শিল্পগোষ্ঠীর বর্তমান বংশধরগণকে শিল্পচর্চায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিবামাত্র বুঝিতে পারিবেন, —মর্শ্বেদ বাঙালীকে কতদূর অধঃপাতিত করিয়াছে !

কাহার কথা বলিব? উচ্চনীচ সকল শ্রেণীর লোকেরই আদর্শ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতিকার সাধন করিতে না পারিলে, বাঙালীর অভ্যুদয়লাভের আশা নাই। মনে করিলে বাঙালী আবার মাছুষ

হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু মনে করিলেই, বাঙালী তাহাতে নিতান্ত অসম্মত। ইহাই
বাঙালীকে আবার বাঙালী হইতে হইবে;— বাঙালীর প্রকৃত মর্ম্মক্ষেপ !

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

হবেই হবে।

বাউলের সুর।



নিশিদিন ভরসা রাখিস্

ওরে মন হবেই হবে

যদি পণ করে' থাকিস্

সে পণ তোমার হবেই হবে

ওরে মন হবেই হবে।

পাষণসম্মান আছে পড়ে'

প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে

আছে বারা বোবার মত্তন

তারাত কথা হবেই হবে।

ওরে মন হবেই হবে।

সমর হলো সমর হলো

যে যার আপন বোঝা তোলো

ছঃখ যদি মাথার ধরিস্

সে ছঃখ তোর হবেই হবে।

ওরে মন হবেই হবে।

যষ্ঠা যখন উঠবে বেজে

দেখু'বি সবাই আসবে সেজে

এক'সাথে সব রাজী যত

একই'রাস্তা হবেই হবে।

ওরে মন হবেই হবে।

দ্বিধা ।



বেহাগ—একতালা ।

বুক বেঁধে তুই পাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিস্নে ভাই ।
তুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লম্বা ঠেলিস্নে ভাই ॥
একটা কিছু করেনে ঠিক,
ভেসে কেঁরা মরার অধিক,
বারেক এ দিক্ বারেক ও দিক্
এ খেলা আর খেলিস্নে ভাই ॥
যেলে কি না মেলে রতন
করুতে তবু হবে যতন,
না যদি হয় মনের মতন
চোখের জলটা ফেলিস্নে ভাই ।
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা,
করিস্নে আর হেলাফেলা,
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা
তখন আঁখি মেলিস্নে ভাই ॥

অভয় ।



ভূপালি—একতালা ।

আমি ভয় করব না, ভয় করব না ।
হু বেলা মরার আগে
মরব না ভাই মরব না
ভয়খানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে ফুকান মেলে
ভাই বলে' হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধরব না ॥

শক্ত বা তাই সাধুতে হবে,
মাথা তুলে রইব তবে,
সহজ পথে চলব তবে
পাঁকের 'পরে পড়'ব না ॥
ধর্ম আমার মাথার রেখে,
চলব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সরব না ॥

১

অবেশ ।



বেদনার মাঝে আজি জেগেছে চেতনা,
পেরেছি তোমার দেখা হে মোর অবশ !
নত-অঁখি জল-ভরা ছিন্নচীরবেশ
শিররে দাঁড়ারে আছ কথা কহিছ না ।
উদাসী প্রবাসী তুমি ঘরে আপনায়,
'যথার্থ্য তথা গৃহ' কুণ্ডলের মাঝে ।
অচেতন পশ্চিমের সূতীর সুরায়
মত্ততার সঁজানেনরা, লজ্জাহীন সাজে
লুপ্তিত ধূলার, বুধে শৌভিকের ভাষা,
তোমার অমৃতবাণী লুপ্ত রসনার ।
অতীত গৌরব তব, ভবিষ্যের আশা,
আজিকার বাহা-কিছু—বিশেষীর পায়
নিঃশেষ দিরাছি ঢেলে । একি হেরি আন,
ভিখারীর বেশে তুমি ওগো রাজরাজ !

ব্রত ।



ওগো বঙ্গকুলাননা সতীলক্ষ্মীগণ,
আজি বলমাতা কাঁদি তোমাদের ঘারে
হানিছেন কর । নিরাশ কোরো না তাঁরে,
ভিখারিণী জন্মভূমি, তবু মা যে হন
তোমাদের । শুন তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা ।
আর কিছু নয়, শুধু চাহিছেন তিনি
রমণীর সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত-উদ্ঘাপনা
তোমাদের ঘরে, যার পূণ্যফলে তিনি
লবে পৌরুষ-রতন— হত কোহিনূর
ভারতের । দেশহিতব্রতধারিণীর
কল্যাণীর বরমাণ্যে দৈন্ত হ'বে দূর
পুরুষের, শুভ্রে তাঁর শিশু হ'বে বীর,
রাখী তাঁর ব্রাহ্মহস্তে বল দিবে আনি,
তবে ভুলিবেন মাতা সৰ্ব্ব দুঃখগানি ।

ভিখারী ।



সৰ্ব্বাঙ্গে বিভূতি-মাখা কণ্ঠে ভিক্ষাবুলি,
কিরিতেছ ঘারে ঘারে কে তুমি সন্ন্যাসী
ভিখারী শিবের সম ! আজি পুরবাসী
বিশ্বরে হেরিছে সবে । বাতায়ন খুলি
অন্তঃপুরলক্ষ্মীগণ অপূৰ্ণ সঙ্গীত
ভনিছেন তব । করুণার—বেদনার

শত উৎসাহারা বকে বকে উৎসারিত ।
 গাহিতে ছ বৈরাগ্যের গান বারংবার
 মৌনব্রত কন্দরত নবজীবনের
 উদ্বোধনগীতি । মাঙিতেছ প্রীতিভিক্ষা
 শুধু, চাহিতেছ স্বার্থত্যাগ, সংঘের
 অজিন-কোপীন-বাস রিক্ত সজ্জা, দীক্ষা
 অগ্নিমন্ড্রে তব । স্মৃৎ-স্বার্থ-হিংসা-দেব
 গীতে তব ভুলে যাই হে মোর বদেশ !

8

উপনয়ন ।

আজি তব ভগ্ন-দেবালয়ে হোমানল
 ভাল করি জ্বাল ওগো তাপস মহান !
 বাজাও তোমার শব্দ বাজাও বিধাণ,
 তারত্বের কর উচ্চারণ অবিরল
 বীজময় তব । এসেছি আমরা আজ
 ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, বাল-বৃদ্ধ, যুবা-নারী
 তব ভক্তদল—দাও দীক্ষা, দাও সাজ
 বৈরাগ্যের পবিত্র গৈরিক । ব্রহ্মচারী
 আজি হ'তে মোরা ; লভি নবজীবনের
 বিজয় নবীন শূদ্র-বিপ্র জী-পুরুষে ।
 দাও কণ্ঠে বজ্র-উপবীত সকলের
 নিরুচ্চিচায়ে । আজি এই মঙ্গলপ্রত্যয়ে
 তব বজ্রকূণ হ'তে বজ্রানল ল'য়ে
 গৃহে কিরি যাই সবে অগ্নিহোত্ৰী হ'য়ে ।

আগ্নেয়গিরি ।

গভীর অভ্যন্তরীণ হৃদয়ের তলে
 আগ্নেয়গিরির সম ধরিছ অনল ।
 আজি ভস্মধূমাক্কর তুমি অচঞ্চল
 হে মোর স্বদেশ ! শুধু ধক্ধক্ জলে
 রাবণের চিতা বক্ষ্যোমাঝে রাজিদিন ।
 প্রমোদপ্রাসাদ রচি' স্নেহের শয়নে
 আলস্তে-বিলাসে কাটি গেছে কৰ্মহীন
 দীর্ঘদিবা । নিদ্রা আজি নাহিক নয়নে
 ভোগ-অবসাদ-ক্লিষ্ট জর্জরিত হিয়া ।
 নিশীথশয়ন তাজি আজি এ আঁধারে
 তব পৃথ্বীতলে তপ্ত বক্ষ পাতি দিয়া
 তুলিলাম কম্পমান মন্মথের মাথারে
 অব্যক্ত ক্রন্দন তব গুমরি গুমরি
 উঠিতেছে মুহূর্হ । উঠিও শিহরি !

৬

প্রলয় ।

কতদিন বল আর রাখিবে সধরি
 বক্ষ্যোমাঝে রক্তাশ্রু, বেদনা গভীর,
 সন্তানের অবহেলা, ঘৃণা বিদেশীর
 সহিবে নীরবে ? কবে উঠিবে বিদ্রুপ
 মেদিনী-অবরতল ক্রন্দনের স্বরে
 ঢালি দিবে উজ্জ্বলিত যুগযুগান্তের
 অগ্নিপ্রশ্রবণ, হৃদয়ের স্তরে স্তরে
 হতেছে সঞ্চিত নিত্য যাহা । প্রলয়ের

এবল আঘাতে বিলাসের কারাগার
 নিমেষে ভাঙিয়া দিবে, দিবে চূর্ণ করি
 বিলাসসম্ভার বত পণ্যবীথিকার ।
 সেই দিন ভারতের চিরবিভাবরী
 হ'বে সুপ্রভাত, দ্বাদশ আদিত্যগণ
 আনিবেন ভারতের মহাভাগরণ ।

বঙ্গবিভাগে ।



রাজার শাণিতখড়্গ নিষ্ঠুর আঘাতে
 পারেনি করিতে দ্বিধা তোমারে স্বদেশ !
 শুধু ভাঙিয়াছে তব নিজ্রার আবেশ,
 দিয়াছে চেতনা । আজি নবীন প্রভাতে
 সুগম্ভীরের স্তম্ভ নিরীলিত আঁধি
 মেলিয়াছ, হেরিতেছ তরবারি-লেখা
 বিদারণ-রেখাগুলি স্থিরদৃষ্টি রাখি
 কধিরাক্ত-বক্ষোপরি । শুধু কুণ্ডল রেখা,
 ছিন্ন করে গাধা কার পুত্রেদেহ তব
 কুলশকটোর ? এই ব্যবচ্ছেদ-খাদ
 ভরিয়া বহিরা যাক্ তরঙ্গ তৈরব
 বঙ্গবক্ষঃকতবিগলিত মেঘনাদ,
 'রক্তগঙ্গা—পুণ্যস্পর্শ যার দিবে প্রাণ
 সহস্র সন্তানে, দিবে বরাভয়দান ।

শ্রীঃ—

রাখি-বন্ধনের উৎসব।



আগামী ৩০শে আখিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিতর্ক হইবে। কিন্তু জৈমর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখি-বন্ধনের দিন করিয়া পরম্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূতা বাধিয়া দিব। রাখি-বন্ধনের মন্ত্রটি এই :—ভাই ভাই একটাই। বিজয়াদশমীর দিনে যেমন বাঙালী আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়া প্রণাম নমস্কার কোলাকুলি করিয়া আসে সেইরূপ প্রতি বৎসরে এই ৩০শে আখিনের তিথিতে আমরা বাংলাদেশের সকল বিভাগেরই আত্মীয় বন্ধুবর্গের দক্ষিণ হস্তে এই মিলনের রাখি বাধিয়া আসিব। সে দিন বাঙালার পূর্ব বিভাগের সহিত পশ্চিম বিভাগের, উচ্চশ্রেণীর সহিত নিম্ন-শ্রেণীর, খৃষ্টান মুসলমানের সহিত হিন্দুর

মিলনস্মরণের দিন—অতএব সেদিন প্রভু ও ভৃত্য ধনী ও দরিদ্র জাতিবর্ণ নির্বিশেষে পরম্পরের হস্তে রাখি বাধিয়া দিবে। বর্তমান বৎসরে এই ৩০শে আখিনে শুক্ল তৃতীয়া তিথি পড়িবে—এই তিথিকে আমরা রাখী তৃতীয়া নাম দিয়া উক্ত তিথিতে-প্রতিবর্ষে বাঙালির মিলনোৎসব সম্পন্ন করিব। উক্ত দিনে সংযমস্বরূপ আমাদের অরক্ষণ হইবে—চুলি না আলিয়া আমরা ফল দ্রব্য প্রভৃতি আহার করিব। উক্তদিনে বাঙালার পূর্ব-বিভাগের লোকেরা পশ্চিমবিভাগের নিকট ও পশ্চিমবিভাগের লোকেরা পূর্ববিভাগের নিকট “ভাই ভাই একটাই” এই লিখিত মন্ত্র-সহ রাখীসূত্র পাঠাইয়া দিবে। রাজার খড়া যে বিধাতার বন্ধনকে ছিন্ন করিতে পারে না ইহাই উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের এই রাখীবন্ধনের উৎসব।

অনন্ততা।



তোমারে বরণ করি নিরেছি যখন,
আর কারে নাহি খুঁজি ; পাই বা না পাই
কোন প্রতিদান, তাহে নাহি আকিঞ্চন !
হৃদয়-কুসুম-রাশি শুধু দিতে চাই
দেবতারে ! থাকে দৈন্ত, করিয়া গোপন
পূর্ণ করি' ল'ব প্রেমে ; কোন দ্রুপ নাই—
ব্যর্থ যদি হয় সাধ ; নিগূঢ় বেদন
তুলিবে প্রগাঢ় করি প্রেম আরো ; তাই,
খুঁজি নাই অবগাহি' হৃদয়ের তল
কি যে চাই ! শুধু বোর নিতৃত অন্তরে

রেখেছি একটি দীপ-কিরিয়া উজ্জল,

দিবা-সন্ধ্যা দেবতার আরতির ভরে ।

ভালবাসি—তাই মম জীবন সকল,

এতটুকু দৈন্তরুখ নাই মোর ঘরে !

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ।

রথ ।



কাননের কোলে শ্রামল কোমল পথটি—

তাহারি উপরে চলিয়াছে ধীরে রথটি,

সমুখে স্তম্ভেরে উদিকে প্রভাতরবি,

হাসিছে অগং মধুর-সোনালি-ছবি,

পথতরুসারি ভরিয়া রয়েছে ফুলে,

শাখার শাখার দোয়েল-পাণিরা বুলে ;

নব উৎসাহে চলেছে নূতন রথটি,—

শান্ত-সরল, আলোক-উজল পথটি ।

নগরের মাঝে রক্তপাটল পথটি—

তারি 'পর দিয়া ছুটিয়া চলেছে রথটি,

মাথার উপর অগ্নিছে প্রথররবি,

ধূলার ধূসর পিঙ্গ অগংছবি,

পথঘাটবাট মাছুষে মাছুষে ভরা,

কল কোলাহলে কাঁপিরা উঠিছে ধরা ;

অধীর আবেগে চলেছে ছুটিয়া রথটি—

ঘুরিয়া-কিরিয়া চলিয়াছে বাকা পথটি ।

সাগরের কূলে বালুকাধূসর পথটি—

তারি 'পরে এসে থামিরা আসিল রথটি ।

অন্ত-অচলে ডুবিছে ক্লান্ত রবি,

মৌন-বহাদ্রে অগং ভাসসছবি,

প্রান্তরপথে নাহি চলে অনশ্রুণী ;

নিভৃত আকাশে ধসিছে যুগের বাণী ;

সহরগতি থামিল জীর্ণ রথটি,—

সাগরে আসিরা বিলাইয়া গেল পথটি ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

বঙ্গদর্শন ।

বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা ।

ইংরেজ অকারণে বাংলাদেশকে বিভক্ত করিতে উদ্যত হয় নাই। প্রকাশ্যে যে কারণ দেখাইতেছে, তাহাই যে এই ব্যাপারের মুখ্য হেতু, ইহাও সহজে বিশ্বাস করা যায় না। দেশটা অতি বড় হইয়া পড়িয়াছে, লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, শাসন-যন্ত্রের অটলতাও তার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছে;—এত বড় দেশ, এতগুলি লোক, এমন জটিল শাসনযন্ত্রের উপরে বণাবধ দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে যথানিয়মে পরিচালিত করা একজন লোকের পক্ষে অসাধ্য,—এ কথায় কোনো সন্দেহ নাই। কিছুদিন হইতে বাংলাশাসনে বাহাদুরের অভিজ্ঞতা নাই, এমন রাজপুরুষ বাংলার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইতেছেন, এই কারণে তাঁহাদের পক্ষে শাসনভার কিঞ্চিৎ-পরিমাণে গুরুতর হইতে পারে। কিন্তু এ রোগের ঔষধ যথাসম্ভব বাংলার রাজপুরুষ-গণের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নির্বাচন করিয়া বাংলার স্বাধীনতার পথে প্রতিষ্ঠিত করা, বাংলাকে বিধগু করা নহে। আর দেশের প্রধানতম রাজপুরুষকে সাধারণভাবে শাসননীতির তত্ত্বাবধানই করিতে হয়, পুথাপুথরূপে ক্র-ব্রহ্ম প্রভৃতি বিষয়ের

অনুসন্ধান করা ও প্রত্যেক কার্যের পর্যবেক্ষণ করা তাঁহার সম্ভব কর্তব্য নহে। এ সকল ভার স্থানীয় শাসনকর্তাদিগের উপরেই ব্রত আছে। তবে আর'লার্টের ভার এত গুরু হইল কিরূপে? বাংলার ছোটলাট বাহিরের অনেক কার্য সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার এক বাণাসিক শফরে যে শক্তিকর হয়, তাহা দেখিয়াও এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, বাংলার লাট বস্তুতই অতি গুরুভারে নিপীড়িত হইতেছেন। বর্তমান লাটবাহাদুর ধর্মব্যবসায়ীর পুত্র, ধর্মপ্রচারে বৈজ্ঞানিক প্রভাবে বিশেষ অনুরক্ত। তিনি তো কদাপি পাত্রিসভার সভাপতিত্বগ্রহণে অবসরভাব অনুভব করেন না! তবে কি করিয়া বলি, তিনি শাসনকার্য সম্বন্ধ-রূপে পরিদর্শন করিয়া উঠিতে পারেন না? মোট কথা এই, শাসনভারের গুরুত্ব একটা ছুতোমাত্র, ইহা বাংলাবিভাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। ইহার মূলে গভীর, জটিল রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরেজ এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সহজে কদাপি ইহা হইতে বিরত হইবে না।

বাংলাদেশ বিভক্ত হইবে, ইহা প্রথম হইতেই অনিত্য। বাংলার রাজনৈতিক শক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ইংরেজ ইহা বহুকাল হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। এই রাজনৈতিক শক্তিকে ইংরেজ ভয়ের চক্ষে দেখিতেছিল। বহুদিন হইতে নানা উপায়ে এই শক্তিকে সংযত করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। ক্যাথলীশাসনে উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে এতদর্থেই সংগ্রামবোধণা হয়। উড়িষ্যা ও বেহারে বাঙালী বাহাতে কোনো-প্রকারে প্রভাববিস্তার, করিবার অবসর না পায়, তজ্জন্তও বহুকাল হইতেই বিশেষ চেষ্টা হইতেছিল। এই ভেদনীতি নূতন নহে। এই নীতিপ্রসাদে বেহারে বাঙালীর প্রতি সৌহার্দ্যহীন হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইংরেজের কুটিলনীতি মূর্তিমতী হইয়া উড়িষ্যার একটা কপট, সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর স্বদেশহিষ্টতার জাল পাতিয়া উৎকলীয়দিগের প্রাণে বাঙালীবিরোধ জালিতেছে। এই নীতিই আসামে আসামী ও বাঙালীর মধ্যে বিষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়া জাতীয় একতাসাধনের অভিনব অন্তরায় উৎপাদন করিতেছে। এই ভেদনীতিপ্রতিষ্ঠার দ্বারা ইংরেজ এদেশ অধিকার করিয়াছিল; এই ভেদনীতি প্রচার করিয়াই দেশমধ্যে সে আপনার বর্তমান অসংবত অধিকারকে অনুরূপ রাখিতে চাহিতেছে। এই ভেদনীতির সকলরূপ উপরেই, ইংরেজ মনে করে, ভারতে তাহার প্রভুশক্তি চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আশ্চর্য্যকারণে সে এই ভেদনীতি অবলম্বন করিয়াছে,—আমাদের নিম্নাঙ্গভিতে, আমাদের নিবেদন-আবেদনে

বা আন্দোলন-আর্জনারে সে কদাপি ইহা পরিত্যাগ করিবে না, করিতে পারে না।

নিগূঢ় স্বার্থের প্রেরণায় ইংরেজ বাংলাকে বিভক্ত করিতে উদ্যত হয়, আমাদের চীৎকারে যে সে তাহা হইতে বিরত হইবে, এ কল্পনা আমি কদাপি করি নাই। আর এই স্বার্থ যেমন এদেশের রাজপুরুষদিগের, তেমনি সমগ্র ইংরেজজাতির। বিলাতের লোকে বা বিলাতের মন্ত্রিদল আমাদের মুখ চাহিয়া এ ভেদনীতি বর্জন করিতে যে ভারতের রাজপুরুষদিগকে কদাপি অমুরোধ করিবেন, এ কল্পনাও আমি কখনো করি নাই। আমরা এদেশের রাজপুরুষ ও বিলাতের ইংরেজমণ্ডলীর মধ্যে ভাবগত, আদর্শগত ও চরিত্রগত যতটা প্রভেদ আছে বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি, বাস্তবিক তাহাদের মধ্যে সে প্রভেদ নাই। এখানকার অবহা-জ্ঞানে ইংরেজের আচার-আচরণ কতকটা পরিবর্তিত হইয়া যায় সত্য,—কিন্তু সেটা কেবল বাহ্যব্যাপার মাত্র। ইংরেজ এদেশে আপনার ভৃত্যকে গালি দিয়া বা প্রহার করিয়া আপনার প্রভুত্ব রক্ষা করে, স্বদেশে কথায় কথায় তাহাকে ধন্যবাদ করিয়া ভৃত্যের পরিচর্যা লইতে হয়। ইহা এজ্ঞ নহে যে, এদেশে আসিয়া সে মন্দলোক হইয়া যায়, কিন্তু কেবল এই কারণে যে, বিলাতে ভৃত্যের সঙ্গে হাত তুলিলে তাহার আপনার গৃষ্ঠ নিরাপদ থাকে না,—এখানে কৃককার ভৃত্যকে গদ-দলিত করিলেও সে কদাপি তাহার প্রতি-শোধ নিতে চায় না। এদেশে ইংরেজের

চরিত্র যদি বিকৃত হয়, তাহা আমাদের গুণে,^১ তাহার আপনার দোষে নহে ।

কলত ইংরেজ কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সর্বত্রই আপনার স্বার্থটা পূর্ণমাত্রায় বোঝে এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য সদস্য সর্ব-বিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে । উদার-নীতিকই হউক বা রক্ষণশীলই হউক, ইংরেজ সর্বত্রই ইংরেজ । ইংরেজকে বজায় রাখিয়া তবে সে উদারমতি বা রক্ষণ-শীল হইয়া থাকে । এইজন্য ইংরেজের স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থের যখনই বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই সে স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য উদারমতিও রক্ষণশীল হয়, রক্ষণশীলও উদারমতি হইয়া উঠে । সেখানে ইংরেজ এক । বাহিরে উদারমতি ও রক্ষণশীলে যতই বিরোধ হউক না কেন,—উদারনীতি ও রক্ষণনীতির উপরে ও অন্তরালে একটা সাধারণ ব্রিটিশনীতি বিদ্যমান আছে । ঐ নীতিই ইংরেজের ইতিহাসকে বিরলে বসিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে ! মন্ত্রিপরিবর্তন, মত-পরিবর্তন, রাজনৈতিক দলাদলির খাতপ্রতি-ষাতের অবিরাম আন্দোলন ও আবর্তনের মধ্যে ঐ সনাতন ব্রিটিশনীতিই সাক্ষী ও আদর্শ হইয়া রহিয়াছে । তাহারই উপরে ইংরেজরাজনীতির একমাত্র প্রতিষ্ঠিত । একদল মন্ত্রী যায়, আর একদল আসে, কিন্তু এই সনাতন নীতির অঙ্গে কেহ হস্তক্ষেপ করে না । এইজন্য একদল পররাষ্ট্র হরণ করে ও হরণকালে বিপক্ষদলের নিকট বর্ষেট লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু হস্তরাষ্ট্র আত্মসাৎ করিবার সময় কোনো দলেরই আপত্তি থাকে না । যুরবিগ্রহকালে উদারমতিদল বর্তমান মন্ত্রি-

সমাজের বিরুদ্ধে কি আন্দোলনই না করিয়া-ছিল ; কিন্তু চারিষংসর পূর্বে যদি উদারমতিগণ মন্ত্রিষ প্রাপ্ত হইত, এই অভ্যাসসমরলক ট্র্যান্সড্যান ও অরেন্স রিভার রিপব্লিককেও আত্মসাৎ করিতে তাহারা কিঞ্চিৎমাত্রও কুণ্ঠিত হইত না । বিপক্ষের চৌর্য্যাপরাধের প্রতিবাদ করিতে উত্তর পক্ষই পটু, কিন্তু চৌর্য্যলক পরধম স্বজাতিসাৎ করিবার সময়ে কেহই কঁদাপি পরাঘুণ হন না । ইহারই নাম ইংরেজনীতি, এতদ্বারাই সনাতন ব্রিটিশনীতির পরিচয় ও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

এই সনাতন ব্রিটিশনীতির তথ্য বাঁহারা অবগত আছেন, বিলাতের রাজপুরুষেরা বা প্রজাসাধারণে যে কখনো বাংলাবিভাগের প্রস্তাব রদ করিবেন, তাঁহারা কখনো এ কল্পনা করেন নাই । এ বিষয়ে এদেশে আন্দোলন যেমন নিফল হইয়াছে, বিলাতের আন্দোলনও সেইরূপ নিশ্চয় নিফল হইয়া যাইবে ; ইহা অভিজ্ঞ লোকে অনেকেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন । উদারমতিদল এই সনাতন ব্রিটিশনীতির বিরুদ্ধে ভারতের হিতকামনায় যে আজ পর্য্যন্ত কোনো সাধুকার্য্য করিয়াছেন, ইতিহাসের স্মৃতিতে তাহা অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না । রিপন্-আমলে ইহার লীটন্-প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রসম্বন্ধীয় কঠিন বিধি রদ করিয়াছিলেন বলিয়া, এতদ্বারাও যে মন্ত্রিষ পাইলেই বাংলাবিভাগের ব্যবস্থাও বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবেন, এ কল্পনাও নিতান্তই অসার ও অলীক । লীটন্-আমলে কেবল মুদ্রাযন্ত্র-বিধিই যে প্রজার স্বার্থ ও স্বাধীনতাকে সঙ্ক-

চিত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা নহে। কলকাতা লীটন-দরবারে যত রাজবিধি প্রচলিত হয়, তদ্ব্যতীত ভারতের জাতীয়জীবনের পক্ষে অন্ত্রবিধিই সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক ছিল। ইতিপূর্বে ভারতের সমগ্র প্রজামণ্ডলকে ইংরেজ কখনো একবারে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হয় নাই। বৈধভাবে অন্ত্রধারণ ও আত্মরক্ষার্থ অন্ত্রচালনা করিবার অধিকার প্রজার মৌলিক অধিকার। এ অধিকার হইতে যে দেশের প্রজামণ্ডলী বঞ্চিত হয়, কেবল তাহাদের রাজনৈতিক জীবন নহে, কিন্তু মনুষ্যত্ব পর্যন্ত হেয় ও হীন হইয়া পড়ে। ইংরেজরাজ লীটন-আমলে ভারতের মনুষ্যত্বের মূলে এই বিধম আঘাত করেন। বিদেশীয় প্রজাকে নিরস্ত্র ও নিরক্ষীয়া করিয়া রাখা সনাতন ব্রিটিশনীতির অন্তর্ভূত। ইহার উপরে স্বজাতির যথেষ্ট-অধিকার পররাষ্ট্রে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইংরেজ ইহা মনে করে। অন্ত্র-আইনের সঙ্গে ইংরেজের জাতীয়স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এইজন্য উদারমতি রিপন এই বিধানের প্রতিবিধানের জন্য কিছুকিছাও চেষ্টা করিলেন না; কিন্তু স্বদেশের ঔদার্য্যপ্রভাবে মুজাব্বতবিষয়ক বিধানটি তুলিয়া দিলেন। কলকাতা মুজাব্বতবিষয়ক বিধানের দ্বারা ইংরেজ আপনার উপরে আপনি বিপদ ডাকিয়া আনিতেছিল। এই বিদেশী প্রজামণ্ডলীয় গোপনীয় - মনোভাব ইংরেজ কেবল মুজাব্বতের সাহায্যেই অবগত হইতে পারে। এইজন্য মুজাব্বতের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা ইংরেজের আত্মরক্ষার নিমিত্তই আবশ্যিক। আত্মপ্রয়োজনেই রিপন-

শাসনে ইংরেজ লীটনের অদূরদর্শী বিপৎ-সমুদ্র মুজাব্বতনীতিককে বর্জন করিয়া প্রজামণ্ডলীয় স্বাধীনভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিবার হৃত অধিকার তাহাদিগকে পুনরর্পণ করে, আমাদের বিশেষ কল্যাণকামনা নহে। ইংরেজ যদি বোঝে যে, বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে তাহার কোনো বিশেষ বিপৎপাতের আশঙ্কা আছে, সে সোৎসাহে অতিশয় ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া ইহা পরিত্যাগ করিবার জন্য ভারতের শাসনকর্তাদিগকে অবিলম্বে অনুরোধ করিবে। অন্ত্রধা আমরা যতই আন্দোলন-আর্জিনাদ করি না কেন, সে তৎপ্রতি কদাপি কর্পণাত করিবে না।

এদেশের আন্দোলন যেমন নিফল হইয়াছে, এইজন্য বিলাতের আন্দোলনও সেইরূপ নিশ্চয়ই নিফল হইয়া বাইবে। এই সকল নিফল আন্দোলনে শক্তিকর না করিয়া, এখন আমাদের আপনাদিগের শক্তিসংগ্রহ করিয়া, আত্মশক্তিপ্রয়োগে এই অনিষ্টনিবারণের আরোজন করিতে হইবে।

আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ইংরেজ আপনিই আমাদের বিলাতী আন্দোলনের পথ একরূপ বদ্ধ করিয়া দিয়াছে। বঙ্গবিভাগের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, নূতন স্বেচ্ছাশ্রমের জন্ত অভিনব রাজবিধি প্রণীত হইয়া লীটনদরবারে পেশ করা হইয়াছে, সম্বন্ধেই তাহা পাস হইয়াও বাইবে। এখন আর এজন্য বিলাতে আন্দোলনের আরোজন আছে বলিয়া আমাদের রাজভক্ত স্বদেশহিতৈষিণও মনে

করবেন, এমন বোধ হয় না। বিশেষতঃ আমরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রবল আন্দোলন করিয়াছি ও করিতেছি, তাহাতেই ইহার রদের পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে।

কার্জনবাহাদুর এরূপভাবে তাড়াতাড়ি বাংলাবিভাগের আদেশ প্রচার করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন কি না, জানি না। তিনি আমাদের বিচার্যাদীন নহেন; ইতিহাস প্রত্যক্ষ প্রমাণে তাহার ভারতশাসনের যথাযথ বিচার করিবে। কিন্তু কাজটা ভালই হউক আর মন্দই হউক, ইহা দ্বারা বর্তমান রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে ভবিষ্যৎ সন্ধির সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা যদি, যেভাবে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছি, তাহা না করিতাম,—শিষ্টসম্প্রদায়ের ভাষ্য কঠোর বিমাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া যদি কেবল অশ্রদ্ধাশ্রমেই আমাদের মনোবেদনা নিঃশেষ নির্দোষিত করিতাম, তবেও বা হয় ত ইংরেজ কখনো আমাদের দুঃখমোচনার্থ ইচ্ছুক হইতে পারিত। কিন্তু আমরা এই আন্দোলনে অভিনব ও অজ্ঞাতপূর্ব অস্ত্র ধারণ করিয়াছি। ইংরেজের প্রত্যাধারকে পরিত্যাগ করিয়া, আমরা তাহার অধাধারের উপর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রাচীন আত্মনিবেদনের পন্থা নিষ্ফল জ্ঞানে বর্জন করিয়া, এখন আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা-বৃত্ত প্রবর্তন করিয়াছি। ইংরেজ আমাদের আবেদন-আর্জনাতে কান দেয় নাই, এখন যদি আমরা তাহার বিরুদ্ধে পণ্যসংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছি বলিয়া আমাদের অতি-

যোগে মনোনিবেশ করে ও আমাদেরকে ঈপ্সিতকলদানে শাস্ত করিতে উত্তত হয়, যে-কুহকজালে তাহার প্রভুশক্তি এককাল ভারতের অমিতসংখ্য প্রজামণ্ডলীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িতে আরম্ভ করিবে। পূর্বে আমাদের আর্জনাদে এই অনিষ্টাপাত নিবারণ করা ইংরেজের পক্ষে বুদ্ধির কার্য্য হইত; এখন, এই আধুনিক রাজাজ্ঞাপ্রচারের পর, এই প্রস্তাব প্রত্যা-হার করা, সাংঘাতিক দুর্কলতার পরিচায়ক হইবে। লর্ড কার্জন ইংরেজরাজের প্রত্যা-বর্তনের পথ স্বয়ং রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

তিনি আমাদের প্রত্যা-বর্তনের পথ নষ্ট করিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় আমরা যদি রণে ভঙ্গ দিই, ভারতের প্রজামণ্ডলীর পক্ষে আর বহুকালমধ্যে রাজনৈতিক অধিকারপ্রতিষ্ঠার কোনোই সম্ভাবনা থাকিবে না।

অবস্থা এমনি দাঁড়াইয়াছে যে, ইংরেজকেও এখন বাংলাবিভাগ করিতেই হইবে; আমাদেরকেও তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিতে হইবে। বাংলাদেশ বিভক্ত হইলেও আমাদের এই আন্দোলন ও চেষ্টা নিবৃত্ত হইতে পারিবে না। তবে এখন বিলাত-আপিল, পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশীয় প্রজাসাধারণের নিকটে ইংরেজ-রাজের এই কু-অভিসন্ধির বিরুদ্ধে আবেদন-অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে হইবে।

ইংরেজ আপনার সঙ্গীর্ণ স্বার্থের জন্ত বাংলাকে অবধা কারণে বিভাগ করিতেছে; আমরা আমাদের জাতীয়স্বার্থস্বার্থে যথাসম্ভব বাংলাকে একত্র করিয়া রাখিতে

চেটা করিব। এইজন্য বাংলার একটা জাতীয়সমিতি গঠন করিতে হইবে। এই সমিতি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ, উভয় বিভাগের সর্বপ্রকার স্বদেশী অমুষ্ঠানকে একই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ও একই উপায়ে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করিবে। ইংরেজরবারে যদি কখনো কোনো আবেদন-আন্দোলন উপস্থিত করিতে হয়, তাহা পূর্ববঙ্গের শাসনাদি-সম্বন্ধেই হউক, আর পশ্চিমবঙ্গের শাসনাদি-সম্বন্ধেই হউক, এই সমিতিতেই করিতে হইবে। ইংরেজরাজ বাংলাকে দ্বিভাগ করিয়াছেন, করুন; রাজপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তনাদি তাঁহারা যে ভাবে হউক যত্নে বিহিত করুন; আইনকানুন বখন যে রূপে ইচ্ছা, এই দুই ভাগে বিধিবদ্ধ করুন, কিন্তু আমরা একের কর্তব্যকে উভয়ের কর্তব্য মনে করিয়া, কার্য্যত যুক্তভাবে তাহা সাধন করিব। পূর্ববঙ্গে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিব না, পশ্চিমবঙ্গেও করিব না,—আমাদের বেসরকারী স্বায়ত্তশাসন উভয় ভাগে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিব ও প্রতিষ্ঠিত করিব। এই বাংলা জাতীয়সমিতির অধীনে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেক জেলার জেলাসমিতি, ও জেলাসমিতির অধীনে প্রত্যেক সবাডিসনে সবাডিসনসমিতি, ও তাহার অধীনে গ্রাম্যসমিতিসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সমগ্র বাংলাদেশকে, রাজশাসনবিভাগ-নির্ধারণে, লাটভুক্তি ও লাটবিভুক্তি উভয়কে উপেক্ষা করিয়া, এক বিশাল, স্বাধীন, সবল, স্বদেশসেবাহুপ্রাণিত,

রাজাতিহিতরত, আত্মশাসনজালে আবদ্ধ করিবে। এই সকল সমিতি স্বদেশচর্য্যায় জন্ত আপনারা আপনাদিগের উপরে ইচ্ছাকৃত নির্দ্ধারিত করিবে; আপনারা আপনাদের শাসনাদির ব্যবস্থা করিয়া লইবে; আপনারা দেশের সর্ববিধ-অভাব-মোচনে রাজকীয় প্রসাদকে বিব্রবৎ বর্জন করিয়া, আপনাদের শক্তি, অর্থ ও সর্ববিধ চেষ্টা নিয়োগ করিবে। এইরূপ একটা বিরাট বাংলা জাতীয়সমিতি গঠন করা, বর্তমান অবস্থায়, আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

ইংরেজ আমাদের রাজনৈতিক একতাকে ভাঙিয়া দিতে উদ্ভত হইয়াছে, আমরা তাহা ভাঙিতে দিব না। যাহাতে ইংরেজ এ অনিষ্টাপাতে অক্ষম হয়, যাহাতে বাংলার প্রজাশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া একই যত্নসাহায্যে সমগ্র বাংলার হিতসাধনে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার জন্ত এই সমিতি গঠন করিতে হইবে। সেইরূপ ইংরেজ বাংলা ভাগ করিয়া দিয়া, এদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগাইবার আয়োজন করিতেছে; তাহার প্রতিবিধানের জন্ত বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এদেশে বহুকালাবধি অপূর্ণ সৌহার্দ বিস্তারিত রহিয়াছে। ইদানীন্তন কালে ইংরেজের ইচ্ছিতে, রাজকীয় ভিকার লোভে, কোনো কোনো স্থলে মুসলমানহিন্দু এই প্রাচীন সৌখ্য নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ সকল চেষ্টা এখনো অতি সর্পিণী সীমাতেই আবদ্ধ রহিয়াছে। বাংলাবিভাগ করিয়া এই চেষ্টাকে বলবতী করিয়া তোলা

হইবে। আমাদিগকে এই চেষ্টার প্রতিরোধ করিতে হইবে।

প্রথমত যে স্থলে হিন্দুমুসলমানে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, তাহা নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। ইহার এক স্থলে সরকারী চাকুরী, অপর সরকারী অবৈতনিক সম্মানার্থ পদ ও খ্যাতি। এই দুই লোভ যদি জর করিতে পারি, তবে ইংরেজ শত চেষ্টা করিয়াও আমাদিগের মধ্যে কোনো বিরোধ উৎপাদন করিতে পারিবে না। কুকুর ঘেমন পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট মাংসখণ্ড লইয়া পরস্পরের সঙ্গে বিবম কলহে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ ইংরেজের উচ্ছিষ্ট সামাজ্য রাজকর্ষের লোভে হিন্দু-মুসলমানে বিবম কলহ উপস্থিত হইবে। এই অনিষ্টাশঙ্কা নিবারণ করিতে হইলে সরকারী কার্যের প্রতি দেশের লোকের মনে ঘৃণা ও উপেক্ষা উৎপাদন করিতে হইবে; যথাসম্ভব ইংরেজের দাসত্ব হইতে বিরত থাকিতে হইবে; এবং বাহারা অনভ্যাপার হইয়া উদরারের অন্ত এই দাসত্ব গ্রহণ করিবে, স্বদেশের জনসাধারণের চক্ষে তাহারা হীনবৃত্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। রাজা বাহাকে সম্মান করিবে, আমরা সে সম্মান স্বীকার করিব না। রাজা বাহাকে মাজ করিবে, আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিব। রাজার খেলাতখেতাব আমরা দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিব। এই ভাব প্রাণপণে স্বদেশীয় জনগণের মধ্যে প্রদীপ্ত করিয়া দিতে হইবে। এই উপায়ে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিবাদের কারণ সমূলে বিনাশ করিয়া দিলে, ইংরেজ আর এই বিভাগের দ্বারা আমাদিগের জাতীয়-

জীবনকে হীনবল করিতে পারিবে না।

এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের মধ্যে মুসলমানের ও মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর সাহিত্য ও সাধনার সম্যক প্রচার করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত তদ্রমণীকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান করিতে হইবে। হিন্দু বিশ্বমানবের সাধনভাণ্ডারে যেকোন আপনার মহার্ঘ সাধনধন প্রদান করিয়াছে, মুসলমানও সেইরূপই করিয়াছে। মুসলমানও একদিন যুরোপের গুরু ছিল, মুসলমানও জগৎকে অনেক শিক্ষাদীক্ষা দান করিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে মুসলমান অক্ষয়কীর্তি রাখিয়াছে। বর্তমান ভারতীয়সভ্যতা ঘেমন হিন্দুর নিকটে, সেইরূপ মুসলমানের নিকটেও অশেষপ্রকারে ঋণী রহিয়াছে। উদারভাবে, মনস্তৎক্ষের দিক্ দিয়া, জাতীয়জীবনের বিবর্তনের বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের ইতিহাসের অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া ভারতের ইতিহাসকে পুনর্গঠন করিতে হইবে। এই সকল উপায়ে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া নবভারতের জাতীয় একতাসাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপেও বাংলা-বিভাগের দ্বারা যে অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা আছে, তাহা নিবারণ করিতে পারা যাইবে।

বিদেশীয়-পণ্য-ব্যবহার হইতে বিরত হইয়া বঙ্গবিভাগনিবারণের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাকে সর্বপ্রথমে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। এই চেষ্টা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ্যে প্রবল হইয়াছে মাত্র, মূলত বঙ্গবিভাগের সঙ্গে ইহার কোনো সাক্ষাৎসংঘর্ষ নাই। বঙ্গবিভাগ

না হইলেও এই চেষ্টাকে বলবতী করিয়া রাখিতে হইত; বঙ্গবিভাগ হইয়া গেলেও এই চেষ্টাকে বলবতী করিয়া রাখিতে হইবে; কারণ, এই চেষ্টার উপরে আমাদের সমগ্র জাতীয়জীবনের শক্তি ও মুক্তিসাধন নির্ভর

করিতেছে। বিদেশীপাশাপরিস্কারের সঙ্কল্প হইয়াছে, বঙ্গবিভাগের সঙ্গে তাহার কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নাই; স্বতন্ত্রভাবেই এই বিষয়ের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সময়াস্তরে ইহার স্বতন্ত্র আলোচনা করিব।

ত্রিবিপিনচন্দ্র পাল।

মার্যাবাদ।*



বাস্তবিক জগৎ আছে কি নাই, তাহার মীমাংসা করা বিশেষ আবশ্যক। যখন জগৎই সৃষ্টির জলন্ত পরিচয়, তখন বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কিছু আছে কি না, তাহা অবগত হওয়া চাই। জগৎসম্বন্ধে অনেক বাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে মার্যাবাদ অন্যতম। বহুশতাব্দী পূর্বে যখন আর্ধ্যজাতির সভ্যতার, কিরণ দিগ্দিগন্তব্যাপ্ত হইয়াছিল, যখন আর্ধ্যজাতি উন্নতমস্তিকের পরিচালনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ভারতকে সর্ববিভাগ আধারভূমি করিয়াছিলেন, যখন বেদান্ত, সাংখ্য ইত্যাদি দর্শনসমূহ জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল, তখন আর্ধ্যজাতি পৃথিবীর সমুখে মার্যাবাদের সুমহৎ সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা; তাহার পর কত দেশ সত্য হইয়াছে, কত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু তত্ত্বদর্শী প্রাচ্যজাতি বাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর আর কেহ পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাহার বলিয়া গিয়াছেন যে, এই সৃষ্টি মার্য

ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিষ্ণু বল, ব্রহ্মা বল, রুদ্র বল, সূর্য্য বল, অগ্নি বল, বায়ু বল, চন্দ্র বল, যম বল, এই সমস্ত দেবগণ, ইহারাও মার্য। এ সংসারে বাহা-কিছু মহিমময় বলিয়া দেখিতেছি, কিংবা বাহাকে তুচ্ছ ঘৃণিত কীটের মত মনে করিতেছি, অধিক কি, তোমার চক্ষে বা অন্তরে বাহা-কিছুই সত্যবোধ হইতেছে, সে সমস্তই একমাত্র পরমেশ্বরের মার্য।

মার্যাসম্বন্ধে অনেকেরই এইরূপ ধারণা আছে যে, মার্য বস্তু অনিষ্টের মূল। কিন্তু যিনি মার্যরূপে বিবাজ করিতেছেন, তিনি যে মাতৃরূপে আমাদের পালন করিতেছেন, তাহা অজ্ঞতব করিতে পারিলে মার্যাসম্বন্ধে পূর্বোক্ত ভ্রান্তসংস্কার দূর হইবে। মার্য কাহাকে বলে, তাহা আমাদের অবগত হইতে হইবে।

শাস্ত্র আমাদেরকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন যে, প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। প্রকৃতির বিবিধ রূপ আছে—মার্য ও অবিত্য। যে প্রকৃতির ধর্ম শুদ্ধস্বপণ, তাহাই মার্য

* প্রথমটি গীতা-সোসাইটির মাসিক অবিশেষে প্রস্তুত হইয়াছিল। লেখক।

এবং বাহ্যিক ধর্ম রক্তমোমলিনীকৃত সঙ্কলন, তাহাই অবিজ্ঞা। মার্না ও অবিজ্ঞার পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে, নতুবা মার্নাবাদ সম্পূর্ণরূপে জদয়দম হইবে না এবং উক্ত ভ্রান্তসংস্কারও দূর হইবে না।

মার্নাকে পরমেশ্বরের শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মার্না পরমেশ্বরের কিরূপ শক্তি, তাহা অবগত হওয়া উচিত। নিম্নে একটি উদাহরণের দ্বারা এ বিষয় বিশদীকৃত হইল। এক ব্যক্তি আলোক (light) লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছে। নানা-বিধ-যন্ত্রসাহায্যে এবং নানাবিধ উপায়ে সে ব্যক্তি আলোকের আলোচনা ও বহু গবেষণা করিয়াছে। তাহার ভূয়োদর্শনের ফলে সে ব্যক্তি ‘চাক্ষুষমোহের’ নিয়মসকল (Laws of optical illusion) শিক্ষা করিয়াছে। তাহার ভূয়োদর্শন হইতে সে ব্যক্তি ঐ জ্ঞান লাভ করিয়া অজ্ঞাত ব্যক্তিদের সম্মুখে আলোক লইয়া এমন খেলা খেলিল, অর্থাৎ আলোকের এমন কৌশল প্রদর্শন করিল যে, উহার ফলে ‘চাক্ষুষমোহ’ (optical illusion) উৎপন্ন হইল এবং দর্শকেরা বিস্মিত হইয়া যাদুবিজ্ঞার কার্য অথবা ভোজবাজি বলিয়া অশ্রুতব করিল। এখানে আমরা দেখিতেছি যে, ঐ ব্যক্তির ভূয়োদর্শন জ্ঞানে (wisdom) পরিণত হইয়াছে। পরে ঐ ব্যক্তি সেই জ্ঞানকে শক্তিতে পরিণত করিয়াছে এবং অবশেষে সেই শক্তিকে কার্যে পরিণত করিয়া ‘চাক্ষুষমোহ’ (optical illusion) উৎপন্ন করিল। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা যদি ঐশ্বরিক মনুষ্য (Divine man) বলিয়া কল্পনা করি, তাহা

হইলে তাঁহার সম্বন্ধেও ঠিক এইপ্রকার কথা বলা হইতে পারে যে, ব্যয়ংবার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া তাঁহার ভূয়োদর্শন জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। পরে সেই জ্ঞান শক্তিতে পরিণত এবং অবশেষে সেই শক্তি কার্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁহার জ্ঞানও অনন্ত, সুতরাং সাধারণ মনুষ্যের দ্বারা তাঁহাকে ভূয়োদর্শন সংগ্রহ করিতে হয় না। তিনি অসীমজ্ঞানবান। তাঁহার সেই জ্ঞানের ফলকেই (Result) মার্না বলে। এই জ্ঞান শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বর বধন মনে করেন, তখনই তাঁহার শক্তিপ্রয়োগে সৃষ্টি-স্থিতিলয় সাধিত করিতে পারেন। আমরা যেমন এমন খেলা করিতে পারি, বাহাতে অপরের নিকট ‘চাক্ষুষমোহ’ (optical illusion) বলিয়া বোধ হয়, ‘ভগবান’ও সেইরূপ এমন খেলা খেলিতেছেন, বাহা আমাদের নিকট সৃষ্টি ও সৃষ্টির কার্য জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

পূর্বোক্ত উদাহরণ হইতে আমরা মার্নার তিনটি ক্রম দেখিতে পাইতেছি, যথা—(১) জ্ঞান, (২) শক্তি, (৩) কার্য। মার্না ঈশ্বরের বশবর্ত্তিনী বলিয়া ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সর্বৈশ্বর্যশালী। মার্না ঈশ্বরের বশবর্ত্তিনী বলিয়া, ঈশ্বরকে মার্নী বা মার্নাধীশ বলা হয়। ঈশ্বরের মার্নার উপর যে সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে, তাহা অবগত হওয়া উচিত। সেই মার্নাক্রমেই বিজ্ঞা বা জ্ঞানের ফল বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা শুদ্ধসঙ্কলনময়ী। আমরা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব আলোচনা করিলে অবগত হই যে, ঈশ্বরের শক্তি বিভিন্ন প্রকারে উপহিত হইয়া তত্ত্বসকল উদ্ভূত

করিলে অভিশাপ হয়; সেই অভিশাপ কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ আসিয়া আক্রমণ করে। ক্রোধ হইতে মোহ হয়; মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম জন্মে; স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হইয়া থাকে এবং বুদ্ধিবিনাশ হইলে আপনাকে বিনষ্ট হইতে হয়।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, মায়া আমাদেরকে বন্ধন করে না, অবিজ্ঞাই আমাদেরকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। জীবনের মায়ার উপর সম্পূর্ণ বলিষ্ঠ আছে। কিন্তু জীবের সেরূপ নাই, জীব অবিজ্ঞার বশীভূত। মায়াদ্বারা জীবর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতের প্রতি আসক্ত হইলে, অর্থাৎ মায়ার সহিত আসক্তি মিশ্রিত থাকিলে অবিজ্ঞা উপন্ন হয়, উহার দ্বারা জীব বন্ধভাবে পন্ন হইয়া থাকে।

অবিজ্ঞা দ্বারা আমরা আবদ্ধ হইলেও, ইহা দ্বারা আমাদের যে ইষ্ট সাধিত হইয়া থাকে, তাহা উল্লেখ করা আবশ্যিক। অবিজ্ঞা দ্বারা মনুষ্যের পার্থক্যভাব (separated sense) এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার (self-assertion) চেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছে। মনুষ্য স্বভাবত জ্ঞান বা সংবিৎ (consciousness) সম্পন্ন জীব। কিন্তু সে অবিজ্ঞার সাহায্যে বহু আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তত তাহার আত্মজ্ঞান (self-consciousness) ক্রমিতে থাকে। উক্ত আত্মজ্ঞান এই মূল জগতে মূল দেহানুবাদজ্ঞানে পরিণত হইয়া জীবকে সুখদুঃখ প্রদান করিতেছে। জীব অবিজ্ঞার প্রভাবে এই মায়াময় জগৎকে সত্য মনে করিয়া বদ্ধ হইতেছে।

এইজন্ত শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে আসক্তিকে সংসারচক্রের নেমিস্বরূপ। এই আসক্তিকে নষ্ট করিতে পারিলে জীব অজ্ঞানের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে। তখন তাহার আর জন্মমৃত্যু হইবে না। অবিজ্ঞার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলে জীব বিজ্ঞার বা মায়ার স্বরূপ অবগত হইবে। এইজন্ত ঋষি বলিয়াছেন যে—

“অবিদ্যায় মৃত্যুং তীক্ষ্ণা বিদ্যায়মৃতমমৃতং।”

ঈশোপনিষৎ।

অর্থাৎ অবিজ্ঞা দ্বারা মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া বিজ্ঞা দ্বারা অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।

অবিজ্ঞাই জীবের বন্ধের কারণ এবং বিজ্ঞা বা মায়া মোক্ষের কারণ। যে দেবী মহামায়ারূপে সর্বভূতে বিরাজিত, যাহাকে বেদ হিরণ্যগর্ভের জননিত্রী বলিয়াছেন, সেই আত্মা শক্তিই সংবিকল্পপিনী এবং মোক্ষ-প্রদায়িনী। তন্ত্রশাস্ত্র এই আত্মা শক্তিরই উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মোক্ষ লাভ করিবার জন্ত ভক্ত এই শক্তিরই আরাধনা করেন এবং ভক্তিগদ্যাকর্ষে বলিয়া থাকেন—

“নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ।

বা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংহিতা।”

যখন ভক্তগণ তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পান, তখন দেখেন যে, জগৎ বলিয়া আর কিছুই অস্তিত্ব নাই। উহা আত্মা শক্তিরই স্বরূপে নিমজ্জিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের শক্তির নামই আত্মা শক্তি। সেই শক্তির স্বরূপ অবগত হইলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে। তখন জীব অবৈতজ্ঞানে জ্ঞানী হয়।

পঞ্চমী বলিয়াছেন যে, সৃষ্টিস্বৰূপে

বিভিন্নবাদীদের মধ্যে উক্তমাধম ভাব দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতেই বা কি, যেহেতু স্বল্পদৃষ্ট রাজ্যলাভ বা ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয়পূর্ব্বক অধিকার করিতে পারে না। অর্থাৎ সৃষ্টি-সম্বন্ধে বিভিন্নবাদ বর্ত্তমান থাকিলেও অবৈত-জ্ঞানীদের তাহাতে কিছু আসে-যায় না। এইরূপ অবৈতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিলে, জীব ভগবানে সর্ব্বভূত কিরূপে বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা অবগত হইয়া থাকে।

মার্যাবাদের নৈতিকফলসম্বন্ধে এইবার কিছু আলোচনা করা যাউক। পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে ভবিষ্যৎ জীবনকে বাস্তব সত্য অবস্থা এবং এই জীবনকে কণহারী ছারাক্রপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য ঋষিদিগের মতে যে-কোন প্রকাশমান অবস্থাকে মারা বলা যায়, এমন কি, দেবতারাও স্বয়ং সেই এক সত্যের কণহারী বিকাশমাত্র। সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে এইখানেই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য মতের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়; প্রাচ্য-মতানুসারে বাহ্যকে নীতি বলা যায়, তাহা নীতি, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সমন্বয়-মাত্র। এই সংসার যে একটি বিস্তৃত নাট্যশালা এবং প্রত্যেক লোকে যে অভিনেতারূপ—এইরূপ ধারণা হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদিগের নিকট কোন রূপক নহে; বরঞ্চ ক্রমসত্য। যে সকল রিপূর অভিনয় করিতে হয়, সেই রিপূরণকে সত্য ভাবিয়া যদি কোন অভিনেতা তাহাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, আমরা যেমন সেই অভিনেতাকে উন্নত বলিয়া থাকি, সেইরূপ যে সকল লোক এই অসার সংসারের পরিবারাদি ক্রীড়নককে

আপনার ভাবিয়া অভিভূত হয়, প্রাচ্য মনীষিগণ তাহাদিগকে উন্নত বলিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহারা আমাদের সতর্ক করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, তোমাদের অভিনয়ের অংশ ভাল করিয়া শিক্কা কর এবং তোমাদের যথাসক্তি ভাল করিয়া অভিনয় করিতে চেষ্টা কর; কিন্তু মূর্খের দ্বারা তোমাদিগকে বথার্থ রাজা কিংবা বথার্থ ভিখারী, বথার্থ সাধু কিংবা বথার্থ পাপী বলিয়া কল্পনা করিও না; তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, জীবনের এই মিলনবিয়োগান্ত নাটক অভিনয়ের জন্য তোমাদিগকে ঐরূপ অংশসকল দেওয়া হইয়াছে।

এই সংসারের সমুদয় বস্তুর বাস্তববে-
বিশ্বাস আছে বলিয়াই লোকে এত কার্য্যক্রম,
বাস্ত, লোভী, অহঙ্কারী এবং স্বার্থপর হই-
য়াছে, সেইজন্য কার্য্যতঃ আমরা এত জড়-
বাদী হইয়াছি এবং এত সভ্যতার বিস্তার
হইয়াছে; যদি আমরা আমাদের অস্তিত্বের
মায়িক বা স্বপ্নবৎ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতাম,
তাহা হইলে আমরা আমাদের উৎসাহ,
আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের গর্ব্ব
হারাইয়া ফেলিতাম এবং অসত্য-বস্তুরূপ-
মধ্যে পরিপণিত হইতাম। সময়ে সময়ে
যেহে জড়বাদীও অস্তিত্বের বৃথাভিমান দ্বারা
ব্যথিত হইয়া উঠে। ইহজীবনে কোন
বিষয়ের সারস্বজ্ঞান, অন্তঃপ্রবাহিত অসার-
জ্ঞানের দ্বারা ক্রমাগত প্রতিহত হইয়া হির-
ভাব ধারণ করিতেছে। ইহজীবনে এই
ভাবের মিশ্রণের দ্বারা আমাদের প্রকৃতিস্থ
রাখিয়াছে। যে দেবী মহামার্য্যরূপে এই
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন,

কেবলমাত্র মহাপুরুষেরাই অপ্রকৃতিহ না হইয়া সেই দেবীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হন।

প্রকৃতির স্রমহান্ নিয়মই এইরূপ যে, লোকে যত বার্কিক্যে উপনীত হইতে থাকে, ততই এই সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়। যতই বুঝিতে পারে, ততই লোক ধর্মের প্রতি আসক্ত হয়, ততই ভবিষ্যৎ জীবনে বিশ্বাস করিতে থাকে এবং জেয় হইতে অজেয়কে বুঝিতে চেষ্টা করে। প্রতীচ্য দেশসকল “স্বাধীন ইচ্ছার” এবং এই ইঞ্জিরগ্রাহ্য বিশ্বের চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিজের কার্যে নিজের দারিত্র্য আছে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া এই পৃথিবীতে যেকোন কার্য করা যায়, সেই অমুখ্যারীও ভবিষ্যৎজীবনে পুরস্কৃত কিংবা দণ্ডিত হইতে হয়, এইরূপ ধারণা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রচ্য বুধগণ অস্ত্রপ্রকার নির্ণয় করিয়াছেন,—তাহারা জানেন যে, তাহারা জীবনরূপ নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতা মাত্র; তাহারা নিজেরা অংশসকল বিভাগ করেন না, দৃষ্টাবলী চিত্রিত করেন না, কিংবা সাজসজ্জাদিও প্রস্তুত করেন না; তাহারা ভাবেন যে, তাহাদের কেবল এই-মাত্র দারিত্র্য আছে যে, তাহাদের যে অংশ অভিনয় করিতে হইবে, তাহা যেন বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনীত হয়। এই স্থানে কর্তব্যবাদ, জ্ঞানান্তরবাদ এবং মারামাদের এক-সঙ্গে অপূর্ণ মিলন হইয়াছে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কর্তব্যবাদমতে, আমাদের ইহজীবনের কর্মের ফল এই জন্মেই হউক, কিংবা ভবিষ্যৎ জন্মেই হউক, এই

পৃথিবীতেই ভোগ করিতে হইবে। প্রাচ্য মনীষিগণ বলেন যে, যেমন কোন লোক স্বপ্নে যদি কাহাকে হত্যা করে, তবে সেই হত্যার জন্ত তাহাকে ফাঁসি দেওয়া যেকোন অস্ত্রায় ও বুখা, ইহজীবনের কর্মের জন্ত সংবিতের অস্ত্র অবস্থায় আমাদের শাস্তি দেওয়া সেইরূপ অস্ত্রায় ও বুখা।

হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদিগের স্বর্গ ও নরক আর কিছুই নহে, কেবল অলসত্ব স্বপ্নমাত্র,—যাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহাদিগের নিকট উহা ‘বাস্তব’; আমরা ইহজীবনে যে সকল মানসচ্ছবি (mental image) সৃষ্টি করিয়া থাকি, যখন আমরা ইহলোক ত্যাগ করি, তখন সেই সকল ছবি আমাদের স্মৃতিতে অঙ্কিত করিয়া লইয়া যাই। এই সকল মানসচ্ছবি পরে প্রতিকলিত হয় এবং আমাদের নিকট বাহ্যজগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে; এবং ইহজীবনে মন যেকোন এক চিন্তা হইতে অস্ত্রচিন্তায়, এক বস্তু হইতে অস্ত্র বস্তুতে ধাবমান হয়, সেইরূপ পরজীবনেও মন অনিয়ম অমুসারে বাহ্যপ্রতিকলিত এক প্রতিবিম্ব হইতে অস্ত্র প্রতিবিম্বে ধাবমান হইতে থাকে। স্তত্রাং ভবিষ্যৎ জীবন এই জীবনেরই প্রতিকল্পন মাত্র, এই জীবনই যেন পরজন্মে অভ্যদিক হইতে বহির্দিকে বাহির হইয়া আইসে,—যে সকল বিষয় সংস্কারভূত (Subjective) ছিল, তাহা ফলোন্মুখ (Objective) হয়। প্রাচ্যদেরক আমাদের দিগকে এইভাবে দৃষ্ট করি যে, আমরা যে স্থানে বাইতেছি, যদি না দেখিয়া চলি, তবে সেই স্থানে আমাদের যতক পৃথকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইবে, যদি তুমি

মূর্খের জ্ঞান মনুষ্যদিগকে ইহজন্মে শত্রু কর, তবে তোমার মৃত্যুর পর দেখিবে যে, তাহাদের ছবিসকল তোমার অন্ত অপেক্ষা করিতেছে,—তখন তোমার কাছে তাঁহার আর মানসচ্ছবিমাত্র নহে, কিন্তু ভয়ঙ্কর সত্য, জীবন্ত ও শত্রুতার অলস্তুমুষ্টি বলিয়া বোধ হইবে; সেই সময়ে তোমার পার্শ্ববর্ত্যের স্থিতি তোমার লক্ষ্যে উদয় হইবে এবং তোমার বিবেক যদি তোমার দোষী স্থির করে, তবে তোমার দৈত্যরূপী শত্রুসকল তোমার বারংবার হত্যা করিবে, কিংবা অগস্ত হুদে নিক্ষেপ করিবে। যদি তুমি জ্ঞানীর জ্ঞান ইহজন্মে মনোরম প্রতিবিম্বসকল প্রস্তুত করিয়া রাখ, তবে যে সকল বন্ধু তোমার পূর্বে লোকান্তরগত হইরাছেন,

তাঁহারা তোমার চতুর্দিকে স্বর্গোপম মেঘ ও ভালবাসা বিস্তার করিয়া তোমার অভ্যর্থনা করিবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই, মারাবাদ হইতে এই উপদেশলাভ হয় যে, পরমেশ্বর জগৎ লইয়া এক খেলা খেলিতেছেন। এই জগৎ তাঁহারই মায়ী, তাঁহারই শক্তির বিকার বা কার্য্য। এই মায়ী তাঁহার বিস্তার এবং বিপুল জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমরা বখন তাঁহার মায়ার আসক্ত হইয়া পড়ি, তখন বদ্ধজীবরূপে সুখদুঃখ ভোগ করিতে থাকি। কিন্তু অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করিলে আমাদের বন্ধভাব দূর হয়, আমরা তখন তাঁহার বিস্তার স্বরূপ অবগত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হই।

শ্রী:—

কাকদাস ।

পাটনাজেলার পশ্চিম দিকে এবং বারাগসীর নিকটবর্তী মইনোয়া মহাপুর গ্রাম গোপ-জাতির একটি ভীষণহান। কাকদাস নামে আদীরবুবক ষাটশব্দকাল সেখানে থেহু চরাইয়া শেষে সন্ন্যাসিকীর হইরাছিল। তাহার বৈরাগ্যের সঙ্গেই ইহার ভীষণহিমা জড়িত। গোপজাতির জাতিগত পার্থক্য, তাহাদের উৎসবসীতে বেক্রম স্পষ্টীকৃত, আর কিছুতে ভেদন নহ। বীরাচিহ্ন সহজ-সরল স্বভাব এবং আপদ-বিপদে নির্ভীকতার

ভিতর কেমন-একটা কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত ভাব তাহাদের জাতির নিজস্ব। সম্ভবত এই চরিত্র এবং ভাব আদিম পশুচারণ-ব্যবসায়ী ভ্রমণশীল জাতিমাজেরই একটা ন্যূনাধিক বিশেষত্ব।

কাকদাস গ্রাম বারবছর গাই চরাইয়া সন্তোষ ও শান্তিতে কাটাইয়া আসিতেছিল; এমন সময়ে একটা অতুতরকমের খেয়াল তাহার স্বপ্নে আবিস্কৃত হইল। সন্ন্যাসীর মনের সুখে “মেদুনীকুলা তাহ” অর্থাৎ

গঞ্জিকা সেবন করে, স্বয়ং দেবাদিদেব
মহাদেব সে আনন্দে ভোর, কেবল কারুদাসের
জীবনটাই বুধার গেল, আজ পর্য্যন্ত এক-
হিলিম গাঁজাও তাহার কপালে জুটিল না !

বারবরিং চরাইলু মইনোরা মহাপুর গাই
কতি নেই শিলে । যেদ্বীকুলা ভাঙ্ ।

বইলো সিংহেশ্বরবাবাকে সিসি চচে
অনেক, হান্ হইবো বোগী ককীর ।

সিংহেশ্বরবাবা কিনা মহাদেব স্থির
হইয়া বসিয়া আছেন, তথাপি পুত্ৰসলিল
নদনদীসমূহের জলপূর্ণ সিসি ভক্তেরা তাঁহার
পূজার অর্পণ করে, অতএব আমিও যোগি-
ককীর হইব ।

তখন সাধুসন্ন্যাসীর ভেক ধরিয়া
কারুদাস মাতার কাছে বিদায় লইতে গেল ।
এবং তাঁহার “ভরমুখ আশিষ” প্রার্থনা
করিল ।

গোতি কাড়কে কারুদাস লেজঠ চঢ়ায়া,
ঔর দোহর কাড়কে ধোকরি বনায়া,
ঔর লাঠি কাটিকে ডাণ্টা সেলেক বানা ।
হঁরাসে কারুদাস মারারামকে আইলো ভিড় ।
তনসে মাই মারারাম ভরমুখ সে আশিষ,
হান্ ভেলো বোগী ককীর ।

ধুতি কাড়িয়া কারুদাস কোপীন পরিল,
পাজবজ্র বা দোহর হিঁড়িয়া কুলি প্রস্তুত
করিল, আর লাঠি কাটিয়া ডাণ্টা বানাইয়া
লইল । দেখিয়া-ভনিয়া মা বলিগেন,

কেয়া খটলো হো কারুদাস আনখন

ঔর কেয়া খটলো দুখভাত খোরি
সে ডুব্ ভেলা বোগিয়া ককীর ।

কেকরা পর সঁপলে বাহ মইনোরা মহাপুরমে গাই,
ঔর কেকরা পর সঁপলে বাহ হান্

ঔর কেকরা পর সঁপলে বাহ পরকে জেইলী
বড়া হোতো অপরাধ ।

বাপ, তোর কি সম্পদহানি হইয়াছে, না
যরে ঝালাপূর্ণ দুখভাতের অভাব ঘটিল যে,
তুই যোগি-ককীর হইলি ? যদি যর ছাড়িয়া
বাইবি, এই মইনোরা মহাপুরে কাহার উপর
গাইবাছুরের তার দিয়া বাইবি, আর আমার
এবং পরের মেরেকেই বা কাহার হাতে
সমর্পণ করিয়া বাইতে চাসু ? এমন কাজ
করিসু না, বড় অপরাধ হইবে ।

উত্তরে কারুদাস মাতাকে বুঝাইল যে,
তাহার ছোটভাই লঙ্কন তো যরে রহিল ।
সে-ই সব দেখিবে-ভনিবে । কিন্তু গঞ্জিকা-
সংগ্রহের জন্ত তাহার সন্ন্যাস ও সিংহেশ্বর-
বাবার আশ্রয়গ্রহণ অনিবার্য্য ।

এতনা কহকে কারুদাস চলা সিংহেশ্বর-আস্থান ।

সাতরাত সাতদিন তপসিয়া কিরা

তইও না সিংহেশ্বরবাবা দেলা মোলাকাং ।

তবু কারুদাস চলা বসাহা বয়েলকে পান্

যা করকে কারুদাস পিরপড়া বসাহা বয়েলকে গোর
পর

পহরো শরীর সিব্লে রহে কারুদাস ।

তবু বোলে বসাহা বয়েল ।

কি বরু মানে কারুদাস সে হাষ দেখী ।

তবু কারুদাস বোলে সে হাষ সাতরাত

সাতদিন তপত্ৰা কৈলে । সিংহেশ্বর-আস্থান

তইয়ো না সিংহেশ্বরবাবা দেলেন মোলাকাং ।

একর ভেদ বাতায়ে দেও কি কোন্ হুরতসে

সিংহেশ্বরবাবাসে মোলাকাং হোর ।

তখন কারুদাস সিংহেশ্বরবাবার মন্দিরে
গেল, এবং সাতরাত্রি সাতদিন ক্রমাগত
তপত্ৰা করিল । কিন্তু তথাপি তাঁহার
দর্শনলাভ করিতে পারিল না । আজি-

কালিকার দিনে কড়ালোকদের সঙ্গে দেখা-
সাক্ষাতের আয়োজন হইলে কোন একজন
মধ্যস্থের পরামর্শ হইতে হয়। সেকালে
গল্পকাণ্ডেমোহিত কাকদাস তাবিরা-চিন্তিত
যে শেষে সিংহেশ্বরবাবার সচল বানটিকে
ধরিয়া বলিরাছিল, ইহাতে তাহার বুদ্ধির
প্রশংসা করিতে হয়। শিবের বলীবর্ধ
মন্ত্রীদের মতই চক্ৰ বুদ্ধির পরিপাকের
বন্দোবস্ত করেন বটে, কিন্তু তাহার মন্ত্রণা-
কুশল্য শাস্ত্রে কোথাও বোধ করি কীর্তিত হয়
নাই। কাকদাস ঠাহরাইরাছিল ভাল, সে একে-
বারে “বসাহা বয়েল”টির পাতের উপর
পড়িল। প্রহরখানেক সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া
সেই ভাবে পড়িয়া রহিল। তাহাতে বক্তৃ-
তাকুরটির করুণা উজ্জ্বল হইল, এবং তিনি যে
পরামর্শ দিলেন, তাহা কখন নিতান্ত নিফল
হয় না।

তবু বোলে বসাহা বয়েল—

এই সে সিংহেশ্বরবাবা নেহী নেভো মোলাকাৎ
বা করকে কামরখু নেও রোখ, তবু,
সিংহেশ্বরবাবা নেভো মোলাকাৎ।

বৃষভবর বলিলেন—কি ছাই ভিখারীর
মত যাক্সা করিতেছ? এমন করিয়া কি
সিংহেশ্বরবাবার দর্শন মিলিবে? তাঁর
“কামরখু”—পূজার্থীদের রোখ, তখন অবস্ত
দেখা দিবেন।

অতএব দেখা বাইতেছে, গো এবং
গোপজাতিরাও আন্দোলনের সূত্রস্থ বুকে।

এত্না ওনকে কাকদাস ইঁদাসে চলা।

বীচু জল আছে কাকদাস রাত্তার

ঠাঠা হোর উর খানি আদার বিকুমহারাজপার

যে যে কিছুমহাশয় ন হই তাহার গুণ মাহো

সে কামরখু আওরে দেবরা মোদি
সে হাধারা বাধ রাখে।

এমন গুরুতর ব্যাপারে কাকদাস
সম্পূর্ণভাবে নিজের উপর নির্ভর করিতে
পারিল না। সে জঙ্গলের মধ্যস্থলে রাত্তার উপর
দাঁড়াইয়া বিকুমহারাজকে ধ্যানে প্রাণত
করিল যে, শিবের বত পূজার্থী আসিলে,
সকলেই বেন তাহার কথার নিবৃত্ত হয়।

এত্না টেক লাগারকে কাকদাস ঠাঠা তেল।

বেত্না কামরখু আওরে ডেভনাকে রোখনে চলাবার।

এক কামরখু পার নেহি হোর ও আদাসে।

তবু সিংহেশ্বরবাবাকে মিলিলে

আগকে সমান বা ছুট্টেন লাগা।

তবু পাণ্ডা সব বোলে কি একসিহি জলতি

নেহী চল সিংহেশ্বরবাবাকে আহান

এহিসে বা ছুটেহে আগকে সমান।

কাকদাসের প্রাণনা জরবস্ত হইল।

“বত “কামরখু” সে পথে আসিল, সকলেই
তাহার কথার সেখানে দাঁড়াইল, আর
অগ্রসর হয় না। তখন সিংহেশ্বরবাবার
মন্দির হইতে আগুনের মত উত্তাপ বাহির
হইতে লাগিল। পাণ্ডারা বলিল যে,
দেবতার মাথার একসিহি জলও চড়িল না,
কাজেই এই বিষম তাণের উত্তব হইয়াছে।
তখন তাহার সকলে মিলিয়া সিংহেশ্ব-
র মাথার জল ঢালিল।

তবু পাণ্ডা সব মিল করকে জল ভর করকে
চড়াওরে লাগলো।

তবু সিংহেশ্বরবাবা ব্রাহ্মণকে রূপ হোকে

একসিহি জল লেকে ঠাঠা তেল মিলিলে

আর কহে পাণ্ডাকে বুঝার।

সাত গো কামরখু আদার রোখনে এক

সে একো কামরখু নেহী পার হোজে দেহে।

তব্বা বোলা সে আত বে বর মাদে
সে সিংহেশ্বরবাবা সেন।

তব্বৎসল সিংহেশ্বরবাবা আর থাকিতে
পারিলেন না, তিনি একসিগি জল হস্তে
জানপের বেশে মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।
পাণ্ডাদের বুঝাইরা বলিলেন যে, একটা
আবীর সাতশ কামরথুকে রুখিয়া রাখিয়াছে,
একজনকেও আসিতে দিতেছে না। তোমরা
গিয়া উতাকে লইয়া এসো, যে বর চার,
মহাদেব তাহাই দিবেন।

তব্ব পাণ্ডা হ'রাসে চলা।

আত আত ব্রাহ্মণ—আর পিছু পিছু পাণ্ডা।

খোঁজ খুঁজ বকে ব্রাহ্মণ লোপ হো গিয়া।

তব্ব পাণ্ডা বকে কারুদাসকে নজর পৌছ।

তব্ব পাণ্ডা বোলে কারুদাসকে বুঝা

কি সাতশো কামরথু তু কাহে রোখলে হো

সো বর মাদ সো বর দেব

সিংহেশ্বরবাবাসে দেলা।

এতনা শুনকে কারুদাস কহে পাণ্ডাকে বুঝা

কি সিংহেশ্বরবাবা হামসে মোলাকাং মেতো

তব্ব হোড়বো সাতশো কামরথু।

পাণ্ডা সেখান হইতে চলিল, আগে
ব্রাহ্মণ, পশ্চাতে পাণ্ডাজী। কিন্তু কিছুদূর
গিয়াই ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন। কারু-
দাসকে পাণ্ডা অরুণোৎসব করিলেন, কেন সে
সাতশত পুন্ডারীকে আটকাইয়া রাখিয়াছে।
যে বর সে চার, সিংহেশ্বরবাবার দ্বারা
তাহাই দেওয়ার হইবে। কিন্তু কারুদাস
তখন বিজয় বলে বলয়ান্ হইয়াছে,
পাণ্ডাজীকে বড় আশঙ্ক দিল না। বলিল
যে, বাবা আমার যদি দেখা দেন, তবেই
সাতশো কামরথুকে ছাড়িয়া দিব, নহিলে
নাহে।

তব্ব হ'রাসে কারুদাস চলা উর সাতশো কামরথু।

মন্দিরকে দুয়ারিগর বেকেকে খাড়া তেল কারুদাস।

একো কামরথুকে মন্দির নেই হেলে বেঙ।

তব্ব সিংহেশ্বরবাবা নিকলকে দর্শন সেলেন।

কারুদাস বেথুকে পারের পর পিছু গড়া।

তখন কারুদাসের নেত্রে সাতশত
কামরথু মন্দিরাভিমুখে চলিল। সে গিয়া
দ্বাররোধ করিয়া দাঁড়াইল, একটি পুন্ডারীও
মন্দিরে প্রবেশ করিতে পার না। কাজেই
নিরুপায় হইয়া সিংহেশ্বরবাবা তাঁহার
অবরুদ্ধ ভক্তটিকে দেখা দিলেন। কারুদাস
তাঁহার পদতলে পড়িল।

তব্ব সিংহেশ্বরবাবা কহে কারুদাসকে বুঝা

যোন বর মাদবে তোন্ বর হাম দেব।

তব্ব কারুদাস বোলে সিংহেশ্বরবাবাকে সমঝা

বাঝা হাম এহী বর মাদে যে হম্

মেদনী ফুল ভাঙ খোজি তে জে হম্ভা মিল বাই।

তব্ব সিংহেশ্বরবাবা কহে কারুদাসকে বুঝা

এ বরতো বহৎ কটিন হৈ কারুদাস

আপনা মাতারি সে ভিজা সে আও মাদকে

বোগীক বরুপ হোকর তব্ব এ বর হম্ দেব।

উর আপনা তিরিগকে বুঝা বকে আও।

নেহী ত এই সে বর হম্ দেব তোরা বহৎ

অপরাধ হোতো।

তার পর সিংহেশ্বরবাবা কারুদাসকে-
কোন বর প্রার্থনা করে, তাহাই দিতে
চাহিলেন। তাহাতে গোপনম্বন জানাইল,
এমন বরে তার দরকার যে, দেখানেই সে
গজিকা চার, সেখানেই বেলু পাইতে পারে।
দেবতা কি তাহিলেন বলা যায় না, তবে
প্রকারে বলিলেন, এটি কিছুই কটিন বর।
তুমি বোগিবেশে আপনার জননী ও বরপীর
লিকট মাঝে, মাদ কাহে ভিজা লইয়া

এবং ত্রীকে বুঝাইয়া এলো, নহিলে আবার
নত বর লইলে তোমার বড় অপরাধ হইবে।
কাজেই কারকে আবার ঘরে কিয়তিত
হইল।

এত্না শুন্কে কারদাস চলা যোগীকে বরণ হোক
মইনোরা মহাপুর। গহিকে বাখান ঠার ভেল কারদাস
বরবর কীমে গাই বাখান ধরতি খোলটা
বে হে কারদাস হামরা নং ছোড়।
নেহী তো হু প্রাণ তেরাঙ্গ দেব।
এত্না শুন্কে কারদাস গাইকে কহে বুঝার
বে হে গাই হামরা নিরড় বহৎ পোরখিরা মিলগে
হামরা দে আশীর্বাদ কি হামরা যোগীক।

তপস্তা রয়ে।

এত্না কহকে কারদাস ঠার ভেল আপন চুরারি।
বোলে কারদাস বে মাতা বে ভিচ্ছা।
ভিতর ভেল বোলে মায়ায়ান লছনকে বুঝার
বে হে বুঝা লছন কোন্ তো যোগী তপসিরা
আল হৈ

সো ভিচ্ছা বে দেও। এই সে হামরা বেটা কারদাস
গলি গলি ভিচ্ছা মাঙ্গলে বুলং হোর।
এত্না শুন্কে লছন ভিচ্ছা বে বেলকো।
তব্ হ'রাসে কারদাস চললো।

যোগীর বেশে কারদাস অন্তর্ভূমিতে
কিরিয়া গেল। বাখানে পাতীরা তাহাকে
দেখিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল,— হে
কারদাস, তুমি আমাদের ছাড়িয়া যেও না,
কথা না শুন তো প্রাণভ্যাগ করিব। এই
বৃন্তে বৈষ্ণবকবির গোষ্ঠবিহার মনে পড়ে, তবে
আলোচ্য ভেমন মাতিত নহে। শুনিয়া কার
দাস তাহাদের আশীর্বাদ তিকা করিল, আবার
যত “গোরখিয়া” ভোমাদের অনেক মিলাবে,
দেখিও আবার তপস্তা যেন সকল হয়।
আপন ঘারে উপনীত হইয়া মাতার উদ্দেশে
তিকা চাহিল। মা তখন ভিকারে ছিলেন,

তাহার কাক ঘরে কিয়তিত বৃন্তে পারি-
লেন না। পুত্র লছনকে ডাকিয়া বলিলেন,
“বাগ্, দেখ, কে বোগিতপতী আসিয়াছে,
তাহাকে তিকা দে। আবার কারদাস
ঐভাবে তিকা মাগিয়া গলি গলি কিরি-
তেছে।” এই সামান্ত করটি পংক্তিভে কেশর
সুকোশলে মাতৃহৃদয় চিত্তিত হইয়াছে। লছন
তাইকে চিনিতে পারিল না, তিকা দিল।
কারদাস অস্ত্র চলিল।

আগনে গ্নী মেল মেল কারদাসকো।

কারদাসকে বহৎ কহে বুঝার—

বে হে খাসি হামরা বহৎ অপরাধ হোতা
কুহ হামরা বর দে দেও তো হামরা পরভীত হোতা।
উর নেহী তো হামরা সজ বে দেও চলো সাং।
এত্না শুন্কে কারদাস বোলে ত্রীকে বুঝার
ইন্দারাপর তুলসী-চত্তরা হৈ, হ'রাগর
চল্, তোরা দিও পরভীত।

পথে দ্বীয় সহিত দেখা হইল। সে
হাড়ে না, সঙ্গে যাইতে চাহে। তাহাতে
কারদাস তাহাকে অনেক বুঝাইল এবং
ইন্দারার ধারে তুলসীচত্তরে বর দিতে প্রতি-
শ্রুত হইল।

তব্ হ'রা ইন্দারাপর বাড়ী হোক হামরে
বাবা সিংহেবরক।

এ বাবা সিংহেবর এহী বড়ী হামরা বর্শন দেও,
উর দেও কুহ বর এ বড়ী হামরা
মহান্নন খটতো। তব্, সিংহেবরবাবা
সাধুরূপ হোক চন্ড ইন্দারাপর
ঠাফ ভেলা কারদাসকে ভিড়।
বোল ত বাবা সিংহেবর কারদাসকে বুঝার
কি তুলসীকে পাতা তোড়কে খিলায় দে
অপ্না তিরিগাকো। ওহী যে তুলসীমাল
বেটা ইলুকে পরমা দে জো।

তব কারদাস পাতা ভোজকে তিরিহকে
জলকে দিয়ার ।

কারদাসের বিবস পরীক্ষা উপস্থিত,
জীকে কি বর দিবে, নিজে তখনও সিদ্ধিলাভ
করে নাই । ইন্দারার ধারে দাঁড়াইয়া
বীকুলভিত্তে সিংহেশ্বরবাবাকে স্মরণ করিল ।
ঠাকুর, এ বুদ্ধিতে কিছু একটা বর আমার
দাত, নহিলে আমার মাহাত্ম্য লোপ পায় ।
দেবাদিদেব সঞ্চয় রূপ ধরিয়া সেখানে
অবতীর্ণ হইলেন । কারদাসকে শিখাইয়া
দিলেন যে, তুলসীর পাতা তুলিয়া জীকে
খাওয়াইয়া দে । উহাতে উহার তুলসীদাস
নামে পুত্র জন্মিবে । এই আজ্ঞা কার
পালন করিল ।

তব হ'রাসে কারদাস চললো

আপুনা খালা । ডারার চুন চুন

কারদাস লাগায় ধুনী । জমা করকে

তব কারদাস কহে সিংহেশ্বরবাবাকে বুঝায়

যাবা সিংহেশ্বর হামকে । অব বর দেও

হমু তো ভিজ্জা মাককে লেইলি মারসে ।

বিলা আনিনকে ধুনী জল বার

চুটকী মাজতে গাঁতা হো বার ।

সেবার হইতে কারদাস আপনীর ক্ষেত্রে
গেল এবং তত্ৰ গোময় সংগ্রহ করিয়া ধুনী
শ্রদ্ধত করিল । তখন সিংহেশ্বরকে বলিল,

বাবা, আমি ত মাতার নিকট হইতে ভিক্ষা
আনিয়াছি, এইবার আমার বর দাঁও, যেন
অগ্নি বিনা আমার ধুনী জলিয়া উঠে, আর
আমি করতল মলিলেই যেন গাঁতা শ্রদ্ধত
হয় । তখাত্ত ! তাহাই হইল, কারদাসের
তপস্তা ফলিয়া গেল ।

তব ধুনী লহর গেল । তব কারদাস

চুটকী মলে লাগা,

তব চুটকী মাজেকো মাং গাঁতা হো গেল

তব কারদাসকে ভেল পরতীত ।

গজিকাধুম সেবন করিয়া কারদাস
সিংহেশ্বরবাবার মন্দিরে অতঃপর আড্ডা
লইল । আর সিংহেশ্বরকে বুঝায় বালল
যে, সে সেইখানে থাকিয়া "বসাহা বয়েল"কে
ধাস ছিলিয়া খাওয়াইবে । ঠাকুর সন্তত
হইলেন । বলিয়া দিলেন যে, ভোরদিন
যোগিতপন্থীর বেশে ভিক্ষা করিও, রাজে
আমার শরণাপন্ন হইও ।

গাঁতা পি করকে কারদাস বা করকে

সিংহেশ্বরবাবাকে আহান ডেরা বেলকো ।

উর কহে সিংহেশ্বরবাবাকে বুঝায়

হে বাবা সিংহেশ্বর হমু হিরা রহব

বসাহা বয়েলকে ধাস পাড়কে খিলাইখো ।

তব সিংহেশ্বরবাবা কহে কারদাসকে বুঝায়

দিনন্তর যোগী তপসীরা হো কর ভিজ্জা মাল

উর রাতকো হামারা শরণয়ে রহ ।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ।

দুর্গোৎসব ।



হিন্দুশাস্ত্রে দুইখানি ক্ষুদ্রকলেবর গ্রহ আছে। সমস্ত শাস্ত্রপারাবার মনন করিয়া এই দুইটি রত্নের লাভ হইয়াছে। ইহাদের একটির নাম 'গীতা', অপরটির 'চণ্ডী'। উভয়ই সপ্তশত শ্লোকে নির্মিত। এইজন্ত গীতার অপর নাম 'গীতাসপ্তশতী' ও চণ্ডীর অস্ত্র অভিধেয় 'দুর্গাসপ্তশতী'।

গীতার বাহুদেব সমস্ত উপনিষৎ ও সমস্ত দর্শনশাস্ত্র ভূয়োভূয় মনন করিয়া প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উত্তরলক্ষণ ধর্মের চরমতত্ত্ব মহামপাণ্ডব অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করেন; চণ্ডীতে মেধোমুনি পরমপুরুষার্থ-প্রযোজক আত্মবিজ্ঞা ও লৌকিককুশলের উপায়ভূত সাধারণাত্মকের রাজনীতিবিজ্ঞার নিগূঢ় তাৎপর্য একই কথার সমাধি ও সুরধকে শুনাইয়াছিলেন।

রাজনীতিসম্বল বুদ্ধবটনাই গীতার মূল, কিন্তু তাহাতে আত্মবিজ্ঞা বেক্লপ আলোচিত হইয়াছে, রাজনীতি সেক্লপ হয় নাই। কলত গীতার মূলে বুদ্ধকাণ্ড থাকিলেও, তাহাতে মূখ্যভাবে জ্ঞানকাণ্ডই আলোচিত হইয়াছে; জ্ঞান সেখানে মূখ্য, রাজনীতি গৌণ। অপর-পক্ষে চণ্ডীর মূলে আত্মজ্ঞানের প্রস্তাবনা থাকিলেও, কলত বোধ হয়, রাজনীতিই সবিস্তর চিত্তিত হইয়াছে; আত্মবিজ্ঞার আলোচনা ততদূর হয় নাই। অতএব চণ্ডীতে রাজনীতি প্রধান, আত্মবিজ্ঞা

অপ্রধান। বর্তমান প্রবন্ধেই ইহা ক্রমশ পরিষ্কৃত হইবে।

দুর্গোৎসবে দেবীর যে সূক্তির আরাধনা করা হয়, তাহা দেখিলেই তাহাকে বুদ্ধোচিত বলিয়া সকলেরই মনে হইতে পারে। আদি যতদূর বুদ্ধিতে পারিয়াছি, তাহাতে তিনি যে বুদ্ধদেবতা এবং পুরাকালে তিনি যে কেবল বুদ্ধবিজিগীষু রাজগণদ্বারা পূজিত হইতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তী কালে এই বুদ্ধদেবতার পূজা বুদ্ধজরাধী ভিন্নও অপর লোকের মধ্যে কেন প্রবর্তিত হইল, তাহা পরে বলা যাইবে।

আমাদের শাস্ত্রেই অমুসন্ধান করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্বকালে ইন্দ্র এই দেবতার উদ্বোধন করিয়া রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন ও রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য ইহার পূজা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, রামচন্দ্র তাহাতে দক্ষলমনোরথ হন। অতাপি এই দুর্গাদেবীর 'বোধন' করিবার শঙ্কনাই প্রয়োজন বলিয়া কথিত হইয়াছে। দেবীর বোধনে প্রযুক্ত নিরলিখিত মন্ত্রকরেকটিতে ইহাই বলিতেছে—

রাবণত বধার্থ্য্য রামতাহুগ্রহাং চ ।

অকালং ব্রজ্য বোণো দেবাত্য বৃত্তং পুং ।

অহমপ্যাহিনে তববোধনানি হরেবরীন্দ্র ।*

পূজাং গৃহাণ হবুধি নকতে শকরঞ্জিত ।

শক্রের সংবোধ্য চ রাজ্যমাণ্ড
বধা, তথাহং * বাং প্রতিবোধরাসি।
বৈধব রাসেন হতো বশাস্য-
গুধৈব শত্রু নিনিপাতরাসি।

পুরাকালে শক্রবধই বেহুর্গাপূজার প্রধান
প্রয়োজন ছিল, নিম্নোক্ত চণ্ডীর বচনগুলিও
তাহা প্রমাণিত করিবে।

“যুদ্ধে চরিতং যন্তে দুষ্টকৈক্যনিবর্হণম্।

তস্মিন্ ক্রতে নৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে ॥”

“কৃদা মমৈতন্মাহাশ্মাং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।

পরাক্রমক যুদ্ধে জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্।

রিপবঃ সংক্রমং বাস্তি কল্যাণকোপপদ্যতে ॥” ইত্যাদি।

যুদ্ধজিগীষু রাজমণ্ডল সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী,
এই দিনত্রয়ে যুদ্ধদেবতার পরমসমারোহে
অর্চনা করিয়া দশমীর দিন শক্রবিজয়ে অভি-
যান করিতেন। এইজন্ত সেই তিথির নাম
‘বিজয়া’ দশমী। বিজয়া দশমীকে উল্লঙ্ঘন
করিয়া গমন করিলে, বর্ষমধ্যে ঐ রাজার
আর বিজয়লাভের সম্ভাবনা থাকে না—

“দশমীং যঃ সমুদ্রম্ভ্য এহানং কুরুতে নৃপঃ।

তস্ত সংবৎসরং রাজ্যঃ ন কাপি বিজয়ো ভবেৎ ॥”

এই নিয়মের কখন অস্ত্রথা হইত না।
যদি কার্যাগোরবে কোন নৃপতি অভিযান
করিতে অসমর্থ হইতেন, তবে তিনি কেবল
“ঐ নিয়মের রক্ষার জন্ত নিজের হস্ত ও আয়ুধ
প্রতীতি মঙ্গলবস্ত্র বিজয়ার দিন বাহির করি-
তেন। শাস্ত্রকার বলিতেছেন—

“কার্যবশাৎ স্বয়মগমে কৃত্ত্বঃ কেচিহ্মাহরাচাধ্যাঃ।

হব্যায়ুধাঘনিষ্টে বৈজয়িকং নির্গমে কুর্ধ্যাৎ ॥”

রাজমার্ত্তভঃ।

এই বিজয়বাজার অব্যবহিত পূর্বে ও
যুদ্ধদেবতা চণ্ডী-হুর্গার পূজার অব্যবহিত
পরে রাজগণ “অপরাজিতা” নামে আর
এক . যুদ্ধদেবতার পূজা করিতেন। এই
দেবীর উপরিস্থিত হস্তদ্বয়ের দক্ষিণে খড়্গা,
বামে চর্ম্ম; নিম্নস্থিত হস্তদ্বয়ের দক্ষিণে বর ও
বামে অভয়। ইহার নিকট প্রার্থনা করা
হয়—

“শরীরারোগ্যমৈবব্যাং গ্রহানে সংপ্রবচ্ছ মে।”

তদনন্তর এই “অপরাজিতা” দেবীর মূর্ত্তি-
স্বরূপ “অপরাজিতা” লতার † বলয় হস্তে
ধারণ করিবার নিয়ম আছে; তাহার মন্ত
এই—

“জয়দে বরদে দেবি দশম্যামপরাজিতে।

ধারয়ামি ভুজে দক্ষে জয়লাভাতিযুদ্ধয়ে ॥”

নৃপতিবৃন্দের বিজয়গ্রহানের পূর্বে
প্রাপ্ত মহিষাসুরমর্দিনী যুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী দেবতার
অর্চনার প্রথম (?) প্রবর্ত্তনিতার নাম রাজা
স্বরথ। এই যুদ্ধদেবতা চণ্ডী কে ও স্বরথ
কিজন্ত তাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন, তাহা
‘চণ্ডী’নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে, বলা
হইয়াছে। আমরা আরও বলিয়াছি যে, ঐ
পুস্তকে আত্মবিজ্ঞা ও রাজনীতিবিজ্ঞা উভয়ই
উক্ত হইয়াছে, এবং ইহাদের মধ্যে রাজ-
নীতিই যেন মুখ্যভাবে চিত্তিত হইয়াছে।
এ কথার সমর্থন জন্ত আমরা আপাতত
কয়েকটি কথা বলিয়া, চণ্ডী কে ও কেন
তাঁহাকে রাজগণ নির্বন্ধসহকারে পূজা
করিতেন, তাহা বলিব।

* “তন্মাহং” ইতি পাঠান্তরম্।

† ‘অপরাজিতা’ লতার গুণ আয়ুর্ক্রেমে এইরূপ লিখিত আছে—

“গিভ্যাপজব-বিব-নাশং, চন্দ্রহস্তম্, জিহ্বাশলমতাকারিষক ॥” ইতি রাজনিধিঃ

রাজনীতি ও আত্মবিশ্বাস এই উভয় তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে বলিয়া, চণ্ডীতে সুরথ ও সমাধি এই দুই অধিকারীকে গ্রহের প্রারম্ভেই দেখিতে পাই। মেধোমুনিকথিত বচনগুলি ঐ উভয় অর্থ প্রকাশ করে বলিয়াই রাজ্য-প্রার্থী সুরথ রাজ্য ও জ্ঞানার্থী সমাধি জ্ঞানের প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

“ততো বরে নৃণা রাজ্যমবিস্রাজ্জগমুনি।

অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ ॥”

“সোহপি বৈশ্রুততো জ্ঞানং বরে নির্নিরমানসঃ।

মমোহমহিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্ ॥”

যেমন ‘সূর্য্য অস্ত হইয়াছে’ এই কথা শ্রবণ করিয়া তত্ত্বর চৌর্য্যসময়, ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দন-কাল ও পরদারলম্পট শ্রেয়স্চরিতার্থতার অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অর্থ গ্রহণ করে— যদিও তৎকালক বাক্যটি পুণক্ নহে; সেইরূপ যদিও মেধোমুনি সুরথ ও সমাধিকে পুণক্ পুণক্ উপদেশ প্রদান করেন নাই, তথাপি সুরথ ও সমাধির জদয়বৃত্তি বা বাসনা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার, তাঁহারা প্রত্যেকে ঐ বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্তই চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে যে, সেই দেবী পদয়া হইয়া ‘বিজ্ঞান’ ও ‘বুদ্ধি’—ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন—

“সি যাচিতি চ বিজ্ঞানং তুষ্টা কচ্চি প্রযচ্ছতি।”

সুরথ ও সমাধি নিজ নিজ কৃতি অনুসারে বাহ্য প্রার্থনা করিলেন, তাহাই পাইলেন; দেবী তাঁহাদিগের প্রার্থনানুসারেই স্বর প্রদান করিয়াছিলেন। সমাধি ও সুরথ বধন মেধোমুনির সহিত

কথোপকথন করেন, * তিনি তখন ব্রহ্মিতে পারিয়াছিলেন যে, বৈশ্রু সমাধির সত্যসত্যই সংসারে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সুরথের জদরে তখন বিবরভোগলালসা বলবতী রহিয়াছে। বিবরভোগে বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান দূর্লভ। তাই ভগবান্ মুনি রাজ্যনাশে ক্লিষ্টহৃদয় সুরথকে কোশলে রাজনীতি ও প্রাপ্তিনির্বেদ সমাধিকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন।

“একবাহঃ জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা সমাপরা।”

ইত্যাদি বচনদ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য “একমেবাধিতীয়ম্” এই আত্মতত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের হুর্গোৎসবে অর্চনীয় দেবীমূর্ত্তির সহিত এই আত্মতত্ত্বের দূর সম্বন্ধ, তাই ‘হুর্গোৎসব’ প্রবন্ধে আমরা তাহার অবতারণা না করিয়া, যাহার সহিত নিকট সম্বন্ধ, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব।

মুনিকথিত রাজনীতি অনুসরণ করিয়াই সুরথ পুনর্বার স্বরাজ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ও সেই দৃষ্টান্তেই পরবর্তী নৃপতিগণ সেই রাজনীতি সেবন করিয়া আসিতেছেন।

চণ্ডী আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই দেখা যাইবে যে, সুরথ রাজনীতিনিপুণ ছিলেন না—যদিও তিনি পুত্রের জ্ঞান প্রদান করিতেন। তিনি সমস্ত পৃথিবী-মণ্ডলের রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনি অভিনূনবল-কর্ণলাবধঃসি-শত্রুগণ-কর্তৃক বুদ্ধে পরাজিত হইলেন; তাঁহার অমাত্যগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিল;

যখন সেই হুঃশীল অমাত্যগণ পুরস্থিত কোষ ও বল অপহরণ করিল, তখন সুরথ নিক-পার হইয়া একাকী অস্বাভাবিক গহনবনে প্রবেশ করেন। সে স্থানে এক প্রশান্ত আশ্রম তাঁহার নয়নগোচর হয়, আশ্রমাধ্যক্ষ মুনির সংসারে কয়েকদিন সেই স্থানেই অভিযাহিত হইল, কিন্তু তাঁহার মন রাজ্য-চিন্তায় নিমগ্ন; তিনি ভাবিতে লাগিলেন—“তাঁহার পূর্বপূর্ব পুরুষের পরিপালিত সেই নগর আজ অসম্ভব ভৃত্যগণ ধর্ম্মানুসারে পালন করিতেছে কি না? সেই নিয়ত মহমত্ত প্রধান হস্তী বৈরিহস্তগত হইয়া কোন্ ভোগই বা প্রাপ্ত হইবে?—যে সমস্ত লোক আমার প্রসাদ, ধন ও ভোজনে আমার অহু-গত হইয়া ছিল, নিশ্চয় তাহারা মত্ত শত্রুর অহু-বৃত্তি করিতেছে। অতি হুঃখের সহিত মজ্বিত সেই কোষকে তাহারা নিয়ত অহু-চিত বায় করিয়া ক্ষয় করিয়া ফেলিবে!” সুরথ এতাদৃশ চিন্তায় দিনযাপন করিতে করিতে একদিন সহসা সমাধি নামে এক বৈশ্বক দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে হর্মনায়মান দেখিয়া সুরথ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার ধনলোলুপ স্ত্রী ও পুত্রগণ সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিভাঙিত করিয়া দিয়াছে; তিনি স্ত্রী, পুত্র ও ধন বিহীন হইয়া বনে আগমন করিয়াছেন; তিনি জানেন না যে, যে সকল ধনলুভ, পিতৃশ্রেয়সীনা পুত্র তাঁহাকে নিরাকৃত করিয়াছে, তাহাদের জন্ত কেন তাঁহার হৃদয়ে বাধা লাগে,—তিনি বলিতে পারেন না যে, সেই হুঃখ পুত্রগণ

তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিলেও, সেই প্রতিকূল বহুবাক্যের প্রতি তাঁহার হৃদয় প্রীতিপ্রবণ কেন।

অন্তঃপর সুরথ ও সমাধি আশ্রমাধ্যক্ষ মেধোমুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, বিষয়-ভোগের দোষ স্পষ্টত দেখা গেলেনও আবার তাহাতে হৃদয় আকৃষ্ট হয় কেন—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, মুনি তৎক্ষণাৎ দেবী-মাহাত্ম্য বলিতে উপক্রম করিলেন। চণ্ডীর প্রারম্ভ এইরূপ। সমস্তকিতিমত্তলেশ্বর* সুরথ যৈ ভাবে গহনবনে প্রবেশ করেন, তাহাতে তাঁহার রাজনীতিতে পটুতা ছিল না, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অপর-পক্ষে সমাধির হৃদয়ে বৈরাগ্যের ছবি সূচিত হইয়াছে। সুরথের মোটেই বিষয়বিতৃষ্ণা ছিল না, আমরা তাহা বলিতেছি না; কিন্তু যাহা ছিল, তাহা সমাধির নিকট তাঁহার বৃত্তান্ত প্রবণ করিয়া; তা ছাড়া, ঐ বিতৃষ্ণার মূল দৃঢ় ছিল না। যদি তাহাই হইত, তবে সমাধির জ্ঞান সুরথও দেবীর নিকট রাজ্য-প্রার্থনা না করিয়া জ্ঞানপ্রার্থনাই করিতেন। আর হয় ত সমাধির অভিলষিত “বিজ্ঞান”কে বহু যুদ্ধঘটনার অবতারণা না করিয়া মেধো-মুনি বিভিন্নপ্রকারে বলিতেন।

আমরা স্রুতিতে দেখিতে পাই—

“প্রমাদং বৈ বৃত্ত্যবহং ব্রবীমি,”

“সদাঃপ্রমাদসম্বৃতং ব্রবীমি।”†

পরমনীতিরসজ্ঞ বৌদ্ধাচার্যগণও এই কথা বলিয়াছেন—

* “সুরথো নাম রাজানুৎ সমস্তে কিত্তিমত্তলে।”

† বেদান্তদর্পণের রামানুজভাষ্য, তুমিক।।

“অন্নমাদো অন্নতপস্যে, পন্নাদো মদ্রুণো পন্নঃ ।

অন্নমত্তা ন বীর্যন্তি, যে পন্নত্তা যথা মত্তা ॥” *

অন্নপন্নং, ১।

বস্তুতঃ প্রমাদ—অনবধানতা যে সূত্রার স্থান, তাহা কাহাকেও বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে না; অন্তের পক্ষে বাহাই হউক, রাজগণ যে অত্যন্ন অনবধানতাতেই অত্যন্ত বিপন্ন হন, ভগবান্ মেধোমুনি দুর্গাসপ্তশতিকার মধুকৈটভযুদ্ধবর্ণনস্থলে তাহাই অপজ্ঞতরাজ্য অমৃতপ্ত নৃপতি সুরপক্ষে বুঝাইয়া দিয়াছেন; সুরধ প্রবল নরপতি হইলেও রাজকার্য্যে সাবধান ছিলেন না, থাকিলে তাঁহার তাদৃশ দুর্গতি হইত না।

ত্রিভুবনরাজ্যার্থীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু পরিশ্রান্তচিত্তসুস্তির জ্ঞায় যখন শেষশরনোপরি ‘তামসী’ + নিদ্রার মগ্ন ছিলেন; যখন তাঁহার বহির্জগৎপ্রপঞ্চের কোন জ্ঞান ছিল না; যখন তিনি নিসর্গশত্রু দানবগণ পুনর্বার ভুবনকোষ উৎপাদন করিতেছে কি না, ইহা জানিবার যেন কোন আবশ্যকতা নাই বিবেচনা করিয়া বহির্জগতের কোন শব্দ গ্রহণ করিতেন না; তখন যুক্ততম অভিযান-সময়ে দুর্কারভূজবীৰ্য্য মধুকৈটভ নামে দানবরাজদ্বয় বিষ্ণুর অতি সন্নিহিত ও অন্তরঙ্গ হইলেও ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্ত উদ্যত হয়। মধুকৈটভের উৎপত্তিসম্বন্ধে বলা

হইয়াছে যে—“বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতো,”—বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন। ইহারও অর্থ তাহাই যে, যখন ভগবান্ বহির্দেশের কোন সংবাদ রাখিতেন না, কেবল শেষ-শরনোপরি শয়ন করিয়া তামসী নিদ্রার বিলাসস্থখামৃতবে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন তাঁহার কর্ণবিবর প্রভূত মলদ্বারা যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; মধুকৈটভও তাদৃশ যোগ্য অবসর লাভ করিয়া যুদ্ধে অভ্যাসিত হয়। ইহাই অবলম্বন করিয়া মেধোমুনি উৎপ্রেক্ষায় বলিয়াছেন—

“বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতো।”

মধুকৈটভ তাদৃশ প্রবলবেগে ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিলেও, ভগবানের সেই দরস্ত নিদ্রার অপগম ও চৈতন্ত্যোদয় হয় নাই। এতদ্ভ্রম-ব্রহ্মাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাহার পর সেই নিদ্রাভঙ্গ হইলেও বিষ্ণু শস্ত্র-সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন নাই; শস্ত্র-অংশজের মধ্যে তাঁহার বাহাই কেবল সন্নিহিত ছিল। “বাহুপ্রহরণো বিষ্ণুঃ” এই কথার দ্বারা ভগবানের বীৰ্য্যাতিশয় প্রদর্শিত হয় নাই। ইহার অব্যবহিত পরেই আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি ঐ দানবদ্বয়কে চক্রদ্বারা ছিন্ন করিলেন,—

“কৃদ্বা চক্রেন বৈ ছিন্নে।”

* সংস্কৃত :—অন্নমাদোহন্নতপস্যে, পন্নাদো মৃত্যোঃ পন্নঃ

অন্নমত্তা ন ত্রিহস্তে, যে পন্নত্তা যথা মত্তা: ॥

+ “এবং মত্তা ভদ্রা দেবী তামসী তত্র বেধসা।

মেঘাতনাসিকাবাহুদ্বয়েরভাষ্যখোরসঃ ।

নির্গম্য কর্ণেন তদ্বৌ ব্রহ্মণোহব্যাক্রময়ঃ ॥”

ইহা যাহা যুঝা বাইতেছে যে, পূর্বে তাঁহার
অন্তঃপ্রাণ ছিল না, পরে কোনরূপে অন্তঃ
সংগ্রহ করেন। অন্তর্থা বিষ্ণুর চক্রধারণ
করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।
মধুকৈটভ স্বয়ং বিষ্ণুকে নিজ মৃত্যুবৎ প্রদান
করে। এ অবস্থায় অন্ত না থাকিলেও
‘বাহুগ্রহণ’ বিষ্ণু তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে
পারিতেন। অতঃপর এতাদৃশ প্রমত্ত
অনবস্থিত, অরক্ষিতবুদ্ধোপকরণ বাজারও
রাজা যদি শত্রুরা আক্রান্ত না হয়, তবে
কাহার হইবে।

এবংবিধ রাজার কেবল যে রাজ্যনাশ
হয়, তাহা নহে; রাজ্যরক্ষার্থ ঐ সকল
রাজাকে বুদ্ধে অধর্মোচরণও করিতে হয়।
মধুকৈটভের সচিব বিষ্ণুর কথোপকথনই
ইহা প্রকাশ করিতেছে। বিষ্ণুর বুদ্ধকৌশল
দর্শন করিয়া আনন্দিতচিত্ত বীবেশ্রেষ্ঠ মধু-
কৈটভ যখন বীরের জ্ঞায় তাঁহাকে ইচ্ছামত
বর প্রার্থনা কবিত্তে বলিলেন, তখন ভগবান্
কাপুরুষের জ্ঞায়, ভীকর জ্ঞায়, হর্ষলের জ্ঞায়,
অনার্যাসে নির্লজ্জভাবে তাহাদের নিজ
নিজ মৃত্যুর প্রার্থনা করিলেন -

“ভবেতান্য মে ভূষ্টো মম বধ্যাবুভাবি।

কিমন্তেন বরণোজ এতাবন্ধি বৃত্তং মম।”

বীরজনসংবাদে কেন্দন বীরশ্রম্যা ব্যক্তি
এক্সপ নীচ প্রস্তাব করিতে পারে, তাহা
উদারজদয় মধুকৈটভের জদয়ে পূর্বে স্থান
পায় নাই। ভগবান্ তাহাদিগকে বকনা
করিয়া বধ করিলেন। বকনা করা যে
অধর্ম, তাহা সর্বসম্মত। “বক্তিত্যামিতি
ভবা” এই বলিয়া স্বয়ং দুনি ভগবানের
বকনা করা স্বীকার করিয়াছেন।

অতঃপর মধুকৈটভমৃত্যুবৃত্তান্ত যাহা
দুনি রাজা স্বয়ংকে এই উপদেশ দিয়াছেন
যে, রাজা সর্বদা ‘বুদ্ধোপকরণ’ সংগৃহীত
রাখিয়া ও অপ্রমত্ত থাকিয়া নিরন্ত নিপুণভাবে
রাজকর্ম পর্যালোচনা করিবেন,—বাহাতে
শত্রুপক্ষ স্বয়ংমাত্রও প্রবেশ করিবার চিত্ত
না পায়।

অতঃপর বাহাতে দৃঢ়ভাবে রাজাবক্ষা
করিতে পারা যায় ও বাহাতে চতুর্দিক শত্রুও
বিনাশ হইতে পারে, ভগবান্ মেধোমুনি
মহিষাসুরবৃদ্ধরত্নাস্বের অবতারণা করিয়া
তাঁহাই বলিয়া দিয়াছেন। এই মহিষাসুর-
বৃদ্ধরত্নাস্বই চণ্ডীর প্রধান মর্শস্তান;
মহিষাসুরবৃদ্ধোপলদ্ধ রাজনোত্তিতস্বই আজ
পর্গান্ত পৃথিবীর সমস্ত জাতিকর্তৃক অনুসৃত
হইয়া আসিতেছে। যে শক্তি মহিষাসুরকে
বিনষ্ট করিয়াছে, বিভিন্নধর্মাবলম্বী হইলেও
ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসিগণ সেই শক্তিরই
উপাসনা করিতেছেন। পৃথিবীর বড়-কিছু
সংকার্য আছে, তাহার ভিত্ত ঐ শক্তিকেই
আশ্রয় করিতে হইবে। তাহার জ্ঞায় পরম
মঙ্গলনিধান আর কিছু আছে বলিয়া
লেখকের বিশ্বাস নাই। পাঠকবর্গ স্বয়ং
তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

হুয়ান্সা মহিষাসুর বলবীৰ্য্যোন্নত দেবতা-
দিগের কি না করিয়াছিল? তাহার
প্রভাবে দেবগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত;
সমস্ত লোক জয় করিয়া স্বয়ং মহিষাসুর
ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত; ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি,
যম, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ স্বাবিকার-
বঞ্চিত; আজ তাঁহাদের পদে মহিষাসুর।
হুলত হই বিজেতা বিভিন্নধর্মের উপর বাহুশ

সদাচার প্রদর্শন করেন, মহিষাশুর দেবদেবের প্রতি তৎসমুদায় প্রদর্শন করিতে বিরত হয় নাই। বতসুর হইতে পারে, পরপদানত দেবগণকে কষ্ট সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার একেবারে হতাশ হন নাই। যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলেও, তাঁহার চিরকালের জন্য স্বর্গস্থংসস্তোগ কুলিতে পারেন নাই।

মহিষাসুরকৃত পরাভব একজনের, দুই-জনের বা তিনজনের ছিল না। তাহা জাতীয় পরাভব বলিয়া গণ্য হইয়াছিল; সমস্ত দেবজাতিই তাহাতে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইন্দ্র-চন্দ্র, যম-বরুণ, সূর্য্য-মারুত প্রভৃতি দেবগণ প্রথমে সকলেই পৃথক পৃথক যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও হতাশীকৃত হন। অতএব তখন স্বাধিকারপাভে কোন উপায় গ্রহীত হইবে, ইহা তাঁহাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। যখন তাঁহার্য্য অবস্থিতে ঐ উপায় আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন মহাজনের উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক ঐকমত্যে সেই বিষয়কে পুনর্বার বিচার করিয়া দেখাই দ্বিতীকৃত হইল। অনন্তর দেবগণ সকলদেব-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া মহিষাসুরবর্জিত নিখিল বৃত্তান্তের প্রকাশ করিয়া তাহার পরাভব জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সেই মহামন্ত্রণাপরিষদে ভগবান্ বিষ্ণু প্রথমে স্বমত প্রকাশ করিলেন যে, শত্রু মহিষাসুরের প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধাভি-যানই বিধেয়; ব্রহ্মা ও মহেশ্বর তাহা সমর্থিত করিলে, একবাক্যে ঐ মত পরি-গ্রহীত হইল।

এই উদ্দিষ্ট পথে—চতুর্থ উপায় দত্ত—যুদ্ধপ্রয়োগ করিয়া দেবগণ পূর্ব্বক বহুবার পরাজিত হইলেও, কিপ্রকারে তাঁহার্য্য পুনর্বার ঐ চতুর্থ উপায়কেই বিধেয় বলিয়া নির্ণয় করিলেন? ইহার সমাধানই আমা-দের পরম মঙ্গলময় পথ, ইহা লৌকিক ও পারলৌকিক কুশললাভের একমাত্র উপায়। মহামন্ত্রণাপরিষৎ এ প্রশ্নের হুচিস্তিত উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তাহা এইরূপ :—মহিষাসুরের প্রতি চতুর্থ উপায় দত্তই প্রযোজ্য, কিন্তু তাহা পৃথক পৃথক নহে, সকলে একত্র সম্মিলিত হও; সকলে হৃদয়ের ভিন্নভাবে পরিত্যাগ কর; সকলে ঐক্য অবলম্বন কর; সকলের শক্তি, সকলের তেজ একত্র সংযুক্ত হউক; সকলে মিলিয়া একত্র চেষ্টা কর; আর কিছুই করিতে হইবে না, আর কিছু অশেষণ করিতে হইবে না, আর কোন প্রতীকার-চিন্তা করিতে হইবে না। সত্য কথা, পূর্ব্বক মহিষাসুরের প্রতি প্রযুক্ত দত্ত বিফল হইয়া গিয়াছিল; ইহা সেই উপায়—দত্তের অপরাধ নহে, প্রয়োগানভিক্ষ-দত্ত-প্রযোক্তার অপরাধ। এই যে সমষ্টিশক্তি-রূপ উপায় উপাদষ্ট হইতেছে, তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর। ব্যষ্টিশক্তি অতি দুর্ব্বল হইক, কিন্তু ঐ ব্যষ্টিশক্তি যদি সমষ্টিরূপে পারণত হয়, তাহা ইহলে বিধকেও বিনাশ করিতে পারে, ব্রহ্মাওকেও চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে, সামান্য ভূগর্ভভোপম শত্রুর কথা ত আসিতেই পারে না। অতএব সমষ্টিশক্তির উপাসনা কর, তাহাই প্রবল বৈরীর প্রতি সমুচিত চতুর্থ উপায় দত্ত,

এবং ইহাই অন্তঃসময়ে চিরলক্ষ্মীলাভের একমাত্র উপায়; ইহাই সংসারের পরম-শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির পথ। যতদিন সর্ববিধ কার্য্যে এই সমষ্টিরূপা মহাশক্তির আরাধনা না হইবে, ততদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ করিলে অতিলব্ধিসিদ্ধির ত কোন আশা নাই, প্রত্যুত প্রতি চরণক্ষেপে বিপন্ন হইতে হইবে।

শক্তির প্রতিই হটক বা আর যে কোন কার্য্যেই হটক, অলংসভাবে বসিয়া কালক্ষেপ করিলে চলিবে না; যত সম্ভব সম্ভব, ঐ শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে। বদ্ধমূল তরুণকে সহজে উৎপাটিত করিতে পারা যায় না; বায়ুপ্রবাহে দেশ প্রাণিত হইয়া গেলে সেতুবন্ধনের আর প্রয়োজন কি? এই কথাটি দেবীমাহাত্ম্যবক্তা মুনিবর, মহামন্ত্রপারিষদে প্রতীকারার্থ সমাগত দেবতাবৃন্দের বচনশ্রবণান্তরই বিষ্ণুর তেজোনির্গমনঘটনা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কর্তব্য বলিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া কেলাই শ্রেয়স্কর।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সহিত মহিষা-সুরের কোন বিবাদ হয় নাই। মহিষাসুর-কৃত ইন্দ্রাদির পরাতর্কে, তাঁহারা ইন্দ্রাদির পক্ষ অবলম্বন করিয়া সম্যকরূপে স্বজাতি-বৎসলতা দেখাইয়াছেন। দেবগণের সেই বিবসাবহার তাঁহারা যদি মহিষাসুরের পক্ষ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বজাতিদ্রোহপাতক হইতে মুক্তলাভ করিতে পারিতেন না, আর মহিষাসুরও

নিহত হইত না। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যে মহাশক্তির সৃষ্টি করিয়া অগতের লোককে অভ্যাদয়ের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও হইত না। আর এই যে আমরা বর্ষে বর্ষে পরমানন্দে হুগোৎসবে মত্ত হইয়া সেই শক্তির আরাধনা করিতেছি, তাহাও সম্ভাবিত হইত না। যেমন মহিষের পক্ষ অবলম্বন করিলে এতগুলি অভাব উপস্থিত হইত, সেইরূপ যদি তাঁহারা কোন পক্ষই গ্রহণ না করিয়া উদাসীন থাকিতেন, তাহা হইলেও ঐ সমস্ত দোষ হইত। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া-ছিলেন, জাতীয় পরাভব বা জাতীয় অভ্যাদয়ের সময়ে কাহারও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। সকলকেই য য সামর্থ্যানুসারে অগ্রসর হইতে হইবে।

যখন দেবতাবৃন্দের মহতা সভার পূর্বো-ল্লিখিত পন্থাই অনুসরণীয় বলিয়া নির্ণীত হইল, তখন বাহা হইল, মুনিবরের বচন উদাহৃত করিয়া আমরা তাহা দেখাইতেছি—

‘ততোহন্তিকোপপূর্ণ চক্রিণো বদনাং ততঃ।

নিশ্চক্রাঃ মহন্তেজো ব্রহ্মণঃ শকরন্ত চ।

অন্তোবাকৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।

নির্গতঃ স্তমহং তেজস্তেজস্য সমগচ্ছত।’

‘অনন্তর অতি কোপপূর্ণ চক্রী, ব্রহ্মা ও শকরের বদন হইতে মহৎ তেজ নির্গত হইল। এইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি অপরাপর দেবতাদের শরীর হইতেও স্তমহং তেজ নির্গত হইল এবং সেই সমস্ত তেজ ঐক্যপ্রাপ্ত হইল।’

দেবতাদের ব্যতিকৃত যে তেজ একদিন হীনপ্রভ ও নিম্নল হইয়াছিল, সেই সমস্ত তেজই আজ কেবল একত্ব অবলম্বন করিয়া—সমষ্টিভূত হইয়া অপূর্ণ মহিমা গোবর্ণ

করিতে লাগিল । যাহার প্রভাবে দেখিতে
দেখিতেই—

‘চক্ষুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে ।
চচাল বহুধা, চেলুঃ সকলান্চ মহৌধরাঃ ॥’

‘সমস্ত লোক ক্ষুদ্র হইয়া উঠিল, সমুদ্রসকল
কম্পিত হইল, পৃথিবী ও পর্বতসমুদায়
বিচলিত হইল ।’

সেই ‘জালাবাপ্তদিগন্তর’, ‘সর্বদেব-
শরীরজ’ ‘অতুল তেজ’কে অগমধ্যেই
“জলন্তমিব পর্বতঃ” দেখিয়া ভঃস্থিত দেবগণ
সোঃসাঃহে ও সোঃসাঃহে ‘জয় জয়’ শব্দে
অসকলং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ।

দেবগণের শরীর হইতে পূর্বকণিত যে
তেজ বহির্গত হইয়া একত্র মিশ্রিত হইয়া-
ছিল—তাঃহাদের ব্যক্তিগত যে শক্তি
একত্র সমষ্টিরূপে পরিণত হইয়াছিল,—
সেই মহাশক্তিই মহিষাসুরনাশিনী এবং
সেই মহাশক্তিই দুর্গোৎসবের দুর্গামূর্তি ।
মহামনোবী মুনিবর তাঃহাই স্পষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে
বোঃধা করিয়াছেন—

“অন্যোব্যাকৈব দেবানাঃ শক্রাদীনাঃ শরীরতঃ ।

নির্গতঃ হুমহং তেজস্তৈক্যঃ সমগচ্ছত ॥

অতীব তেজসঃ কূটং জলন্তমিব পর্বতম্ ।

দৃশ্যন্তে সুরাস্তত্র জালাবাপ্তদিগন্তরম্ ।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরতম্ ।

একম্ তদভূরারী ব্যাপ্তং লোকত্রয়ং ত্রিবা ।

যদ্বৃক্ষাভবঃ তেজঃসেনাজারত তথুখম্ ।

যামোন চাতবন্ কেশা বাঃহবো বিকূতেজসা ।

সৌম্যেণ শুনয়োবুধঃ, মধ্যং চৈত্রেণ চাতবৎ ।

বাক্ষেণ চ জজ্ঞোঃ, নিতম্বশ্চৈতজসা জুযঃ ।

ব্রহ্মশ্চৈতজসা পাতৌ, তদঙ্গুলোহর্কতেজসা ।

বহুবাঃ করাঙ্গুল্যঃ, কোবেরেণ চ নাসিকা ।

তস্তাস্ত দন্তাঃ সজুতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা ।

নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা ॥

জ্ববো চ সন্ধ্যাঃশেষেজঃ শ্রবণাবিনলম্ চ ।

অস্ত্রোব্যাকৈব দেবানাঃ সন্তবশ্চৈতসাং শিবা ॥

ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্ ।

তাং বিলোকা মৃদং প্রাপুরমরা মহিষাক্দিতাঃ ॥”

‘ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের ত্রায় শব্দে প্রভৃতি
অপরাপর দেবগণেরও শরীর হইতে হুমহং

তেজ নির্গত হইয়া একত্র হইল । দেবগণ

দর্শন করিলেন যে, ঐ মহাতৈজঃকূট জলন্ত

পর্বতের ত্রায় জালাকলাপদ্বারা দিগন্তরকে

ব্যাপ্ত করিয়াছে । সর্বদেবশরীরোৎপন্ন

সেই নিরুপম তেজ একমু হইয়া নারীমূর্তি

ধারণ করিল ও তাহার দীপ্তিতে লোকত্রয়

ব্যাপ্ত হইল । শব্দুর শরীর হইতে যে

তেজ নির্গত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা

ঐ নারীমূর্তির বদনমণ্ডল গঠিত হয় । এইরূপ

যমের তেজে তাহার কেশকলাপ, বিষ্ণুর

তেজে বাহু, চন্দের তেজে স্তনদ্বয়, ইন্দের

তেজে মধ্যদেশ, বরুণের তেজে জজ্বা ও

উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে

চরণদ্বয়, সৃগোর তেজে পাদাঙ্গুলি, বহুগণের

তেজে করাঙ্গুলি, কুবেরের তেজে নাসিকা,

প্রজাপতির তেজে দশনপংক্তি, বহুর

তেজে নয়নত্রয়, পূর্ব ও পশ্চিম এই উভয়

সন্ধ্যার তেজে ক্রমুগল, পবনতেজে শ্রবণদ্বয়

এবং সেই ‘শিবা’—কল্যাণকারিণী দেবীর

অতুল অবয়ব অপরাপর দেবভাগণের

তেজে উৎপন্ন হয় । মহিষাসুরনিপীড়িত

অমরগণ সেই সমস্ত দেবতার ‘তেজোরাশি-

সমুদ্ভবা’ নারীকে দর্শন করিয়া আনন্দলাভ

করিয়াছিলেন ।*

* এই অঙ্গসংহোদ দেখিয়া বোধ হয়, সেই মহাশক্তির যেখানে শক্তির বিনিয়োগ অঙ্গকুল, হাই করিতে হইবে ।

আমাদের পাঠকবর্গের হৃদয়ে, বোধ হয়, আর কোন আশঙ্কাই নাই যে, দেবগণের একত্র সম্মিলিত শক্তিকেই নারীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সেই সম্মিলিত শক্তির মহোপকারিণী দেখিয়াই সর্বত্র তাহার প্রচলনোদ্দেশ্যে দুর্গোৎসবে তদুপাসনার প্রবর্তন হইয়াছে।

দেবগণের মহামন্ত্রণাপরিষদের পরামর্শে সমুৎপন্ন ‘সমস্তদেবানাং তেজোরশি-সমুদ্ভবা’ দেবী অতঃপর তাঁহাদের কৌশল উপকার সাধন করিয়াছিলেন, একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

যখন দেবগণের ব্যষ্টিশক্তি সমষ্টিশক্তিরূপে পরিণত হইল, তখন তাঁহারা শত্রুকর্তৃক পরাভূত হইয়া রহিয়াছেন, তখন তাঁহাদের শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান অনিবার্য, এবং প্রধানত মূলে এইজন্যই তাঁহারা সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা সেই মহাশক্তির অপর কোন কার্যে বিনিয়োগ না করিয়া যুদ্ধোৎসবেই করিয়া-ছিলেন।

যুদ্ধ করিতে হইলে অস্ত্রের সংগ্রহ সর্বপ্রথমে আবশ্যক। তাঁহারা সে অস্ত্রের ‘জন্ত অস্ত্র’ যান নাই; বাহার নিকট যাহা ছিল, তাহাই তিনি সেই মহাশক্তিকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সম্মাননা করিলেন—

“মূলং মূল্যবিনিময়্য দদৌ তস্যৈ পিণাকখং ।

চক্রং দত্তবান্ কৃকঃ সমুৎপাদ্য যচক্রতঃ ।”

* * * *

অন্যেরূপি হরৈর্দেবী ভূমণৈরাবুধৈস্তথা ।

সম্মানিতা নুনামোহিঃ গতিহাসং মুহুঃ

‘পিণাকপাণি মহেশ্বর নিজের মূল হইতে অপর একখানি মূল নিকাশন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন; কৃক নিজ চক্র হইতে অপর চক্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন। * * * এইরূপ অস্ত্রাস্ত্র সুরগণও ভূষণ ও আয়ুধ দ্বারা তাঁহার সম্মাননা করিলে তিনি মুহমুহ অট্টহাসে ও উচ্চৈশ্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।’

এতাদৃশ সমষ্টিশক্তির প্রভাব সুহৃৎসহ। স্বয়ং মহিষাসুরের ভূমবীৰ্য্য হুর্কার হইলেও, তাহার চিকুর-চামর, বাহুল-বিড়ালাদি বহু বহু রণকুশল সেনানী থাকিলেও, এবং অগণ্য সৈন্তবাহু প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেও, মহিষাসুরকে বিজয়লক্ষ্যভোগের আশা ত্যাগ করিয়া শোণিতধারার সমরাজন সুরক্ষিত করিতে হইয়াছিল; দৈত্যসৈন্ত হাহাকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল; দেবতারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন; দেবতবনে বিজয়োৎসব চলিতে লাগিল।

অতঃপর শক্রাদি দেবগণ বাহার প্রভাবে হুর্দ্বর্ষ মহিষাসুরের কবল হইতে রক্ষা পাইলেন, তত্ত্বিপূর্ণহৃদয়ে তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। চতীর এ অংশ অতি মনোরম। দেবতারা বুঝিয়াছিলেন—কেবল যুদ্ধবিগ্রহ নহে, সর্বত্রই এই শক্তির উপাসনার আবশ্যকতা আছে, এবং তাহা না করিলে মহাবিপত্তি হইবেই হইবে। বিশেষত বিপৎকালে ইনিই একমাত্র ‘আদরণীয়’। ইনিই বিপদ বিনাশ করিয়া কল্যাণ আনয়ন করিতে পারেন। চতীর পরম বিচকণ সুনি শক্রাদি দেবগণের মুখে এই কথাই বলাইয়াছেন—

“দেব্যাখ্যাত ।

ত্রিরতাং ত্রিদশাঃ সর্বকং বদন্তোহতিবাচিতম্ ।

দদামাহমতিজ্ঞীতা তবৈরেতিঃ হুপূজিতা ।

সেবা উচুঃ ।

ভগবত্যা কৃতং সর্বকং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে ।

বদন্তঃ নিবৃত্তঃ শক্ররস্মাকং মহিষাশুরঃ ।

যদি চাপি বরো দেহন্তরাস্মাকং মহেশ্বরি ।

সংসৃত্তা সংসৃত্তা স্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ ॥*

বন্দ “মর্ত্যঃ” তবৈরেতিজ্ঞাং তোমাত্যমলাননে ।

তস্য বিত্তজিবিবিতবৈধনদারাদিসম্পদাম্ ।

বুদ্ধয়েঃ স্রং প্রসন্ন্য স্বং ভবেথাঃ সর্বদাখিকে ॥”

‘দেবী বলিয়াছিলেন—দেবগণ, তোমাদের আমার নিকটে বাহা অভিলষিত থাকে, প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের এই সকল তবে হুপূজিত হইয়া অতি প্রীতিসহকারে তাহা প্রদান করিব ।

দেবগণ বলিয়াছিলেন—ভগবতি, যখন মহিষাশুর বিনষ্ট হইয়াছে, তখন আপনি আমাদের সমস্তই সম্পন্ন করিয়াছেন, আর কিছু অবশিষ্ট নাই ; তবে যদি, হে মহেশ্বরি, আপনি আমাদের বরপ্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদের এই প্রার্থনা যে, যখন যখন আমরা আপনাকে স্মরণ করিব, আপনি সেই সেই সময়ে সমাগত হইয়া আমাদের পরম বিপত্তির বিনাশসাধন করিবেন ; আর ‘বে-কোন মর্ত্য এই সকল তোমাদ্বারা, হে অমলাননে, হে অখিকে, তোমার স্তুতি করিবে, তাহার বিত্ত ও লক্ষ্মীর প্রাচুর্য্যবিধান করিয়া ধন ও জ্ঞী প্রভৃতি

সম্পদের সর্বদা অভ্যর্থনিতর জন্ত আমাদের প্রতি আপনি প্রসন্ন হইবেন ।’

বলা বাহুল্য, দেবী ইহাদিগকে ঐ বরই দিয়াছিলেন ।

এই শক্তি যে দেবগণের জ্ঞার মনুষ্য-সমাজেরও উপকারসাধন করেন, তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্ত মহামুনি ‘বন্দ মর্ত্যঃ তবৈরেতিঃ’ ইত্যাদি পুৰ্ব্বোক্ত বরদান-কথার অবতারণা করিয়াছেন ।

ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যে পর্য্যন্ত যে বস্তুর গুণাগৌরব বিশেষভাবে জানা না যায়, তাৎকাল তাহার প্রতি লোকের গাঢ় অমুরাগ বা বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না । বস্তুর গুণ যতই অধিক অধিক প্রতিগোচর হয়, তাহার প্রতি প্রবৃত্তিও ততই অধিকরূপে জন্মে । এই ভাবিয়া দেবীমাহাত্ম্যকার সেই মহাশক্তির গুণবর্ণন করিবার জন্ত—

“না দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্যরূপেণ সংহিতা ।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥”

ইত্যাদি বিবিধমাহাত্ম্যসূচক স্তোত্রসমূহ উপনিবদ্ধ করিয়াছেন ।

যেমন তালবৃক্ষে একটি কাক আগিয়া উপবিষ্ট হইবার পর একটি তাল পড়িয়া গেলে, ঐ তালের পতনের প্রতি তৎপাতনা-সমর্থ কাককে আমরা কারণ বলিয়া মনে করিতে পারি না, সেইরূপ হয় ত কেহ ভাবিতে পারেন যে, বস্তুত ঐ মহাশক্তি মহিষাশুরকে বধ করিতে পারেন নাই,

* এই কথাটি আরও একবার উক্ত হইয়াছে—

“বরাশ্রাকং বরো দত্তো বধাপংসু দ্বুতাবিলাঃ ।

ভবতাং দাপরিব্যাদি তৎকথাং পরমাপদঃ ॥”

অত্যা কায়গাভরে বিনষ্ট হইয়াছে। লোকের
এই ভয়-অপনোদনের জন্ত ও মহাশক্তির
শক্তিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া
দেখাইবার জন্ত শুভ ও নিশুভ নামক অপর
হই মহাবল দানবরাজের বধবৃত্তান্ত বর্ণিত
হইয়াছে। এই প্রস্তাবে আমাদের শিবিবার
মূলত দুইটি বিষয় দেখিতে পাই। যথা—

প্রথম।—স্রীলোকের পতি অত্যাচার
বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে কল্যাণ হয়
না। দৈবীমাহাত্ম্যো বর্ণিত আছে—মহাশক্তি
পার্বতী স্তচাক্ষুশে, মনোরম হিমাচল-
শিখরে বিহরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার
রূপে মুগ্ধ হইয়া চণ্ড ও মুণ্ড নামে শুভ-
নিশুভের দুই ভ্রাতা তাঁহাকে গ্রহণ করিবার
জন্ত প্রভুর নিকট নিবেদন করে। শুভ-
নিশুভ তদনুসারে প্রথমত লোভপ্রদর্শনে
কৃতকাৰ্য্য না হইয়া বলাৎকারে গ্রহণ
করিবার চেষ্টা করে, ও তদনন্তর নিহত হয়।

ভারতবাসী সমস্ত সহ্য করিতে পারে,
কিন্তু স্রীলোকের প্রতি অত্যাচার কিছুতেই
সহ্য করিতে পারে না। ভারতীয় সাহিত্যে
রমণীর প্রতি অত্যাচারকারীর চরম পরিণাম
প্রদর্শিত হইয়াছে। রামায়ণের দিকে দৃষ্টি-
নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই, সীতার প্রতি
অত্যাচার করিয়া রাবণ স্বর্গে নিহত।
মহাভারতেও তাই—দ্রৌপদীর পীড়নকারী
কৌরবগণ সমূলে বিনষ্ট। শুনিয়াছি, বঙ্গের
প্রভাপাদিত্য কোন রমণীর স্তনচ্ছদ করার
পর ক্রমশ অধঃপতিত হন। ভারতীয়
ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে এ দৃষ্টান্ত বহুল-
পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয়।—রোগশেষ ও ঋণশেষের জ্ঞান

শত্রুর শেষ রাখিলে কিরূপ বিপদ উপস্থিত
হয়, তাহার দৃষ্টান্ত। ইহা রক্তবীজের বৃদ্ধ-
বৃত্তান্ত হইতে পাওয়া যায়। রক্তবীজ শুভ ও
নিশুভের অত্যন্ত প্রধান সেনাপতি। দেবী-
মাহাত্ম্যাবলী বলিয়াছেন—রক্তবীজের শরীর
হইতে যত-বিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হইবে,
সঙ্গে সঙ্গেই আবার তদন্তুলি রক্তবীজ জন্ম-
গ্রহণ করিবে; এইরূপ ইহাদেরও শরীর
হইতে রক্তবিন্দু ভূপতিত হইলে তদনুরূপ
রক্তবীজের উৎপত্তি হইবে। যখন ইহার
সহিত বুদ্ধ চলিল, তখন রক্তবীজের রক্তোৎ-
পন্ন অপর্যাপ্ত রক্তবীজে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত
হইয়া পড়িল। তখন কালিকা বদনবিস্তার
করিয়া জিহ্বা বহির্গত করিলে, একএকটি
রক্তবীজাক ধরিয়' ঐ জিহ্বার উপর চেনন
করিতে আরম্ভ করার পৃথিবীর সহিত তাহার
রক্তের যোগ হইল না এবং উক্তনিরমাত্মসারে
নূতন রক্তবীজও সৃষ্ট হইতে পারিল না। এই
প্রণালীতে একটির পর একটি করিয়া সমস্ত
রক্তবীজের বধ হয়। এই ঘটনাধারা
আমরা এটুকু ভিন্ন অপর কিছুই বুঝিতে
পারি না যে, সমাক্রমিক শত্রুর মূল উৎ-
পাটন করিয়া ফেলিবে, তাহা না হইলে
সেই শত্রু পুনর্বার নূতন বলে বলীয়ান হইয়া
আক্রমণ করিতে পারে।

শুভনিশুভযাভিনী দেবী যে মহিষাসুর-
মর্দিনীর জ্ঞান দেবসমূহের সম্মিলিত-শক্তি-
স্বরূপা ও তাহা হইতে অর্ভিন্ন, ইহা পূর্বে
সামান্যত বলিয়া মোক্ষমুনি আবার স্পষ্টরূপে
বিশেষভাবে বলিয়াছেন—

“এতশ্রিরন্তরে ভূপ বিনাশার সুরধিবাৎ।

ভবারামরসিদ্ধানামভিবীর্ণবল্যাবিতাঃ।

কল্পেণৈবৈক নার কল্পেণৈবৈক চন্দ্রাঃ ।

শরীরেভ্যাঃ বিনিকৃতাঃ কল্পেণৈবৈকৈকাঃ বহুঃ ।

বস্যা দেবস্যা বজ্রপং বখাভূতপবাহনম্ ।

তদমেব হি তচ্ছক্তিরহরান্ হস্তমাখলৌ ।”

‘হে রাজন, এই সময়ে অমরদিগের বিনাশার্থ ও অমরশ্রেষ্ঠগণের কল্যাণের জন্য ব্রহ্মা, শঙ্কর, কালিকেশ্বর, বিষ্ণু ও ঈশ্বরের অতিবীৰ্য্যবলাদ্বিত শক্তিসকল তাঁহাদের শরীর হইতে বিনিষ্কাশ হইয়া স্ব স্ব রূপে চণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। যে দেবতার বাণেশ্বর রূপ, ভূবণ ও বাহন, তাঁহাদের শক্তি সেই প্রকারই রূপাদি গ্রহণ করিয়া অমরবধে আগমন করিয়াছিলেন।’

শক্তিনিগূঢ়ত্ববধের পর দেবীমাহাত্ম্যে সেই মহাশক্তির পুনরুন্নয়ন স্তুতি করিয়া তাঁহার মহোপকারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা সে সমস্ত অনুবাদ করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। এই শক্তি পূর্বে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে যে তিনি “সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যা,” “সর্বার্থপাটিকা,” “সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতা,” তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব দেবতাদিগের কঠোর সহিত আমরাও বলি—

বিবেচনী হং, পরিপাসি বিবং

বিবাসিকা ধারয়সীতি বিবম্ ।

বিবেশবন্দ্যা ভবতী, ভবতি—

বিবাস্ত্রা যে বসি ভক্তিময়াঃ ।”

এই শক্তির প্রভাব এতাদৃশ অদ্ভুত বলিয়াই ইহার চরিত্র—

“কৃত্যং হরতি পাপানি, তথারোগ্যং প্রবচ্ছতি ।”

এইজন্যই তদ্ব্যবহিত বুদ্ধবৃত্তান্ত প্রবণ করিলে—

“বৈরিকৃত্যং ভয়ং পুনঃ ন জায়তে ।”

দেবীর এই চরিত্র প্রবণ করিলে বজ্র-বতাই চিত্র ঐক্যের দিকে—সমষ্টিশক্তির অঙ্গ-কূলে ধাবিত হয় বলিয়াই, তাঁহার এই চরিত্র নৃপতিগণের পরস্পর সংঘর্ষজনক হইলে আবার স্বন্দররূপে মৈত্রী উৎপাদন করিয়া দিতে পারে। ইহাই লিখিত হইয়াছে—

“সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্ ।”

এই দেবীর এত গুণ আছে বলিয়াই—মধ্যে মধ্যে (অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশীতে) “দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডী”পাঠের বিধান হইয়াছে; অসমর্থ লোকেরা অদ্ভুত বৎসরান্তেও যেন একবার ঐ দেবীমাহাত্ম্য আলোচনা করে। এইজন্য মূনি লিখিয়াছেন—

“শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে বা চ বার্ষিকী ।

তস্যাঃ মমৈতদ্মাহাত্ম্যং শ্রদ্ধা ভক্তিসমবিত্তম্ ।

সর্ববাধাবিনিমুক্তৌ ধনধান্যসুখভাষিতঃ ।

মমুযোগ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

কিন্তু হার! লোকে বৎসরান্তেও একবার দেবীমাহাত্ম্য আলোচনা করে না, করিলেও হয় ত তাহার তাৎপর্য্য অবহেলা করে না। এইজন্যই সেই শক্তি ‘কষ্টা’ হইয়া ‘সকলান্ অতীষ্টান্ প্রেতিহতি।’ আমরা অত্যন্ত দুঃ, তাই পুরস্তিত রত্নকে দেখিতেছি না, দেখিলেও হয় ত গ্রহণ করিতেছি না, গ্রহণ করিলেও হয় ত দ্বন্দ্বের ধারণা করিয়া তাহার সদাবহার করিতে পারিতেছি না।

এই শক্তি যে সাধারণের লক্ষ্যপ্রদা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার বিনিয়োগে কাল ও স্থান বিবেচনা করিতে হয়। যেমন অগ্নি আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য পরমোপকারী হইলেও অসাধবানে স্থাপিত হইলে অগ্নিরে সমস্ত ভস্মীভূত করিয়া দেলে,

এই শক্তিও সেইরূপ জুহানে ও জুহালে
প্রযুক্ত হইলে প্রকৃতিপকার করিতে পারে,
অতীত মহান্ অনর্থের উৎপত্তি হয়। ইহাই
কথিত হইয়াছে—

“সেব কালে মহামারী সৈব যষ্টীর্ভবত্যজা ।

স্থিতিং ক্রোড়ি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ।

ভবকালে সৈব যুগাং লক্ষ্মীর্ভূত্বিপ্রা গৃহে ।

ঐসবাতাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশারোগজারতে ।*

দুর্ন্যেৎসবে উপাস্তা দেবী কে, তাহা প্র-
সিদ্ধি* হইল। এখন পাঠকগণ বিবেচনা
করিলে দেখুন, এই পুনার কতদূর আবশ্যকতা
আছে। এই মহাশক্তি দেবীর সর্বত্রই
প্রয়োজন আছে বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে শিশুপাঠ্য
গ্রন্থ হইতে বেদ পৰ্য্যন্ত ঐ যন্ত্রোপদেশই
প্রদত্ত হইয়াছে। হিতোপদেশ খুলিলেই
দেখিতে পাইব, গ্রন্থকার শিক্ষা দিতেছেন—

অমানাবপি বত্ন নাং সহতিঃ কার্ধ্যসাধিকা ।

ভূপৈত্ত্বর্গদ্ব্যপারৈর্বধ্যতে নতদন্তিনঃ ।

সহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরন্নকৈরপি ।

ভুবেপাপি পরিত্যক্তা ন প্রয়োহতি তত্থাঃ ।†

বালাকালে বাহা সূত্রগ্রন্থে পাঠ করিয়াছি,
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারই মূলচিত্র আমাদের
পরমপরিচিত বেদের উজ্জ্বলাকরে, সন্নিবেশিত
দেখিতে পাই। অথেষ্টের গ্রন্থনকর্তা আমা-
দিগকে সমস্ত বেদ শুনাইয়া সর্বশেষে ঐ

মহাশক্তির উপাসনাত্রেতেই আমাদিগকে
দীক্ষিত হইতে বলিয়াছেন—

“সকলজ্ঞঃ, সবেদজ্ঞঃ, সা যো মনাসি জানতান্ ।”*

“তোমরা একত্ব মিলিত হও, তোমরা
একই বাক্য উচ্চারণ কর এবং তোমাদের
মন এক হউক ।”

এই ঐক্যরূপা মহাশক্তি বিবিধ কষ্ট
বিনাশ করেন বলিয়া তাঁহার নাম ‘হুর্গা’।
শাস্ত্রকারগণ হুর্গানামের এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি
প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

বিপত্তিবাচকো হুর্গশ্চাকারো নানবাচকঃ ।

তং ননান পুত্রা তেন বুধেহুর্গা প্রকীর্ষিতা ।

শব্দকল্পদ্রুম ।

‘হুর্গশব্দের অর্থ বিপত্তি ও আকারের অর্থ
নাশ; পুরাকালে হুর্গকে বিনাশ করিয়া-
ছিলেন বলিয়া, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ‘হুর্গা’
নামে কীর্ষিত করিয়াছেন ।

দেবীমাহাত্ম্যে দেখিতে পাই, ‘হুর্গম’ নামক
অশুরকে বধ করার তাঁহার নাম হুর্গা—

তত্রৈব চ বধিয্যামি হুর্গমাখ্যং মহাহুর্গম্ ।

হুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মৈ নাম ভবিষ্যতি ।*

পূর্বোক্ত বচনের সহিত ইহার সামঞ্জস্য
করিলে বলিতে হইবে, ‘হুর্গ’ ও ‘হুর্গম’ একই,
এবং তাহা পরবর্তী শ্লোকে হঃখকারণ
বলিয়া অশুররূপে কথিত হইয়াছে ।*

* অথেষ্ট দশমমণ্ডলের পঞ্চমস্তোত্র এই কথাই বহুপ্রকারে উক্ত হইয়াছে ।

† হুর্গানামের ব্যুৎপত্তি বহুপ্রকার আছে, কিন্তু তাহার তাৎপৰ্য্য সর্বত্রই একরূপ প্রতীত হয়। যথা—

দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্ষিতঃ ।

উকারো বিদ্যনাশস্য বাচকো দেবসম্রতঃ ।

রৌকো রোগন্যবচনো গুণত পাণদ্ববাচকঃ ।

ভরশক্ত্যবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ষিতঃ ।

স্বভূত্যাভিব্যাপ্যক্যা এতে নতত্তি নিশ্চিতম্ ।

ভতো হুর্গা হয়েঃ পণ্ডির্ভবিণাং পরিকীর্ষিতা ।

অতীত নির্করসের ভক্ত শব্দকল্পদ্রুম ভ্রষ্টব্য ।

পাঠকগণ এখন অনার্যসেই বুঝিতে পারিয়াছেন, হুর্গোৎসবের এত আকর্ষণ কেন ও কিমন্তই বা শাস্ত্রবিহীন। ইহাকে নিত্য ও কাম্য এই উভয়বিধ কর্মমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। হুর্গোৎসব বাহ্যতে সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে পারে, তজ্জন্ত শাস্ত্রজ্ঞ-গণ বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বহুদূর পারিয়াছিলেন, সেই শক্তির সৃষ্টিনির্মাণ ও তাঁহার সাজসজ্জা ও অর্চনাদির বহুবিধ প্রকার নির্দেশ করিয়া তাঁহার গুরুতরত্ব-সাধনে প্রয়াসী ছিলেন।

হুর্গোৎসবের তার আড়ম্বরবহুল পূজা আর নাই। হুর্গার সহিত কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নন্দী, ভৃগু, শিব ও গঙ্গা প্রভৃতির সৃষ্টিনির্মাণে হুর্গাপূজা আরও মহত্তর হইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়াছি, কোন কোন স্থানে উল্লিখিত সৃষ্টি ভিন্ন কালী ও নরসিংহ-সৃষ্টিও হুর্গাপ্রতিমামূলে স্থানলাভ করিয়াছে। সৃষ্টি নির্মিত না হইলেও, হুর্গোৎসবে

অস্তুত গুরুপূজারীও পূজিত না হন, এমন দেবতার সংখ্যা নিত্যই অল্পই আছে। হুর্গোৎসবপূজাপদ্ধতিতে বহু বহু দেবতার পূজার বিধান দেখা যায়। খুব সম্ভব, হুর্গা-পূজার গৌরববর্ধনের জন্ত এইরূপ আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু হুঃখের বিষয়, কালপ্রত্যাবে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি এই সমস্ত বাহ্য আড়ম্বরে এতদূর আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, আমরা তাঁহার আবরণ ভেদ করিয়া স্বার্থ বস্ত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। ভগবান্, প্রেমের হউন, আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হউক,— যেন আমরা সেই মহাশক্তি হুর্গাদেবীকে পরম-বস্ত্রে আবাহন করিয়া, বৎসরান্তে তিনচারি-দিনের জন্ত নহে,—সর্বক্ষেত্রেই তত্ত্বপূর্ণহৃদয়ে অর্চনা করিয়া স্তুতি করিতে পারি—

“দেবি প্রপন্নাস্তিহরে প্রসীদ .
প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলজ্ঞ।
প্রসীদ বিবেচয়ি পাহি বিশ্বা
বদীশ্বরী দেবি চর্যচর্য।”

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী ।

শুভক্ষণ ।

১

ভগো বা—

রাজার ছলাল বাবে আজি মোর

ঘরের সমুখপথে,

আজি এ প্রত্যতে গৃহকাল ল'য়ে

রহিব বল কি মতে ?

বলে' যে আমার কি করিব সাজ,

কি হাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,

পরিব আছে ফেরত ভরে

কোন বরণের বাস ?

মাগো, কি হ'ল তোমার, অবাক্‌নরনে

সুখপানে কেন চাস ?

আমি দাঁড়াব বেথার বাতায়নকোণে

সে চাবে না সেখা আনি তাহা' মনে,

কেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ .

যাবে সে অহর পুরে ; —

তধু সন্দের বাঁশী কোন্ মাঠ হ'তে

বাজিবে ব্যাকুল সুরে !

তবু রাজার হুলাল যাবে আজি মোর

ঘরের সমুখপথে,

তধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ

রহিব বল কি মতে ?

ত্যাগ ।

১

ওগো মা,

রাজার হুলাল গেল চলি মোর

ঘরের সমুখপথে,

প্রভাতের আলো কলিল তাহার

অর্ণশিখর রথে ।

ঘোমটা খসারে বাতায়নে থেকে

নিমেষের লাগি নিরেছি না মেখে,

ছিঁড়ি অগ্নিহার কেলেছি তাহার

পথের ধূলার 'পরে ।

মাগো কি হ'ল তোমার, অবাক্‌নরনে

চাহিন্ কিসের ভরে ।

যোর হার-হেঁকা মণি নের নি কুড়ারে
 রথের চাকার গেছে সে কুড়ারে,
 চাকার চিত্র ঘরের সমুখে
 পড়ে' আছে শুধু আঁকা।
 আমি কি দিলেম কারে জান না সে কেউ
 ধুলার রহিল ঢাকা।
 তবু রাজার ছলল গেল চলি মোর
 ঘরের সমুখপথে—
 মোর বন্ধের মণি না ফেলিয়া দিয়া
 রহিব বল কি মতে ?

কোচিন।

১৩

কিয়ংকাল বিশ্রামের পর, আমি আবার
 সেই ঘোঁপটির মধ্যে—সেই আমার স্মৃতি
 প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

যখন সূর্য্য অস্তপ্রায়, সেই সময়ে এখান
 হইতে চিরবিদায় লইবার জন্য আমি উদ্দেশ্য
 করিলাম। সেই ৪০ দাঁড়ের নৌকার
 উঠিয়া কোচিনরাজ্যের দক্ষিণতম নগর
 “জিচুড”—অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এখান
 হইতে আরো একরাজ্যের পথ বাইতে হইবে।

প্রত্যেক জলযাত্রার আরম্ভে, আমার
 নৌকা ইতঃপূর্বে বেঙ্গল বেগে চলিয়াছিল,
 এবারও সেইরূপ বেগে চলিল। বিশ্রামের
 পর দাঁড়ীরা নববলে বলীমান হইয়া,
 কোদালি-কোদালি মাটি উঠাইবার মত,
 প্রত্যেক দাঁড়ের আঘাতে রাশি-রাশি জল
 উঠাইয়া চলিতে লাগিল। দাঁড়ীঘের সাহা-
 য়ার্থে আমরা গাল ফুলিয়া দিলাম। ভালী-

বনসমাচ্ছন্ন ছই কুলের মধ্য দিয়া বিলের
 মধ্যে আবার প্রবেশ করিলাম।

বলা বাহুল্য—আমাদের অন্তর্গামী সূর্য্য
 রক্তিম স্বর্ণ-আভার মধ্যে অবতরণ করিয়া
 নির্দীপিত হইল; এবং পরক্ষণেই, ঐ অধুরে,
 চির উজ্জ্বলের পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল।
 আমাদের এই প্রশান্ত জগতের উপর, অতীব
 মধুর বর্ণে রঞ্জিত নির্মল অমল আকাশ
 প্রসারিত। আমরা এখন মৎস্যজীবীর
 রাজ্য—জেল-নৌকার মধ্যে—মৎস্যজালের
 মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এই ভারতীয়
 বিলের চারিদিকে, ভালীঘনের পক্ষা ধাকার
 সেই আদিমকালের হৃদবাসী মৎস্যজীবীর
 জীবন এখানে বেশ সুরক্ষিত রহিয়াছে।

কল্যকার মত আজও আমার মাঝি-
 মাল্যরা মুখ বুজিয়া সমস্তই তান ধরিয়াছে;
 এই তান,—এই প্রশান্ত সময়ের সহিত বেশ

থাপু খাইরাছে। পবনদেবের কুপায় আমাদের নৌকা পালভরে চলিতেছে; দাঁড়ীরা ঔদাস্তের সহিত অলসভাবে দাঁড় কেলিতেছে। অস্ত্র নৌকাতেও জেলেরা গান ধরিরাহে; যে স্বরে গান গাইতেছে, তাহা মানবকণ্ঠস্বর বলিয়া মনে হয় না,— মনে হয় যেন, গির্জাঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি ঘুর হইতে ও চারিদিক হইতে এই শব্দযোনি জল-রাশির উপর আছিয়া পৌছিতেছে।...

কেসব সাদাসিধা সরলপ্রাণ বিশ্বতচিহ্ন অসংখ্য লোক আমাকে ঘিরিয়া আছে—মনে হয় যেন উহার। হরিৎ-শ্রামল তালীবনের ছায়াময় সমাধিগর্ভ হইতে সশরীরে পুন-রুত্থান করিয়া, এই “ধররাৎ-ডাঙা”র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।—বিভিন্ন পুরাতন আচার-অনুষ্ঠানে আবদ্ধ খুঁটানু, হিন্দু কিংবা ইহুদি; কিন্তু ইহারা সকলেই সমান শ্রদ্ধার পাত্র, একই সত্য উহাদের সকলেরই পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।...যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম এমন কঠোরভাবে রক্ষিত, তাহারও মধ্য হইতে যদি আমি ছুরিগম্য সত্যের ছই এক টুকরা পাইতে পারি—এই শিশুস্বলভ আশা আমার চিত্তকে অধিকার করিরছিল!... কিন্তু না;—যেমন অস্ত্রজ, তেমনি এখানেও, চিরবিদেশী ও চিরপাহ হইরাই আমাকে থাকিতে হইল;—প্রাণী ও পদার্থসমূহের বাহ্যভাবদর্শনে নেত্রের তৃপ্তিসাধন ভিন্ন আমি আর কিছুই করিতে পারিলাম না। তা ছাড়া, আমার রাজা শেব হইরাছে—আমি চলিলাম; গান গাইতে-গাইতে ও দোলাইতে-দোলাইতে, একখানি স্তম্ভের নৌকা করিয়া আমাকে লইয়া চলিল। ইহাতেও আমার

আনন্দ; এইটুকুই আমার সৌভাগ্য; ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।...

দিগ্বলয়ের চারিদিকে অরণ্যের নীল যবনিকা;—এই নীলিমা ক্রমশ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিল; অন্তাচলদিগন্তের কণস্থায়ী নীলিমা ক্রমে ধোর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইল। ইতস্তত, অপেক্ষাকৃত বিশাল এক একটি তালবৃক্ষের নিঃসঙ্গ ছায়াচিত্র বৈচিত্র্য-হীন অরণ্যেরাশির উপরিভাগে পরিস্ফুট-রূপে অঙ্কিত। সম্মুখে তারকাবলী। সুসূর্য সোনালি-গোলাপি আভার মধ্যে শুক্রগ্রহ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; এবং তাহার পার্শ্বে নব-ইন্দু সমুদিত। একপ চন্দ্র সব-সময়ে দেখা যায় না;—কোন বিশেষ সময়ে, গ্রীষ্মপ্রধান মেশের বিমল-বহু নভোমণ্ডলেই দৃষ্ট হয়;—একটি ভাবের শীর্ণস্বজ বক্রাকারে অঙ্কিত; কিন্তু সমস্তই বেশ পরিস্ফুট ও দৃষ্টি-গ্রাহ্য;—মনে হয় যেন পশ্চাৎ হইতে আলোকিত; বেশ বুঝা যায়, উহা একটা সামান্ত চক্রমাত্র নহে, পঁরন্ত এমন একটি গোলক, বাহা নিরাধার হইয়া মহাশূন্যে ঝুলিতেছে। কোন-একটা পদার্থ বিনা-অবলম্বনে রহিয়াছে—মনে করিতে গেলে,—আমাদের অঙ্কিত সংস্কার বাহাই হউক—তারসাম্য ও শুক্লবের যে স্বাভাবিক সংস্কার আমাদের মনোমধ্যে নিহিত আছে, সেই স্বাভাবিক সংস্কারের বেশে আমাদের চিত্ত একটু আকুল হইয়া উঠে।

অন্ধকার হইয়া আসিল। মন্ত্রদিগকে আকষণ করিবার জন্য জেলেরা তাহাদের মশাল জালিল; গান ধামিল; এবং সমস্তই নিদ্রাময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

কেবল, আমার ৪০ জন দাঁড়ীর দাঁড়ী অলের উপর বসবৎ অবস্থান পড়িতেছে ;—প্রত্যন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহারা আমাকে ক্রমাগত উত্তরাত্তিরূপে লইয়া বাইতেছে ।

১৪.

ভালীবনের পশ্চাতে হঠাৎ বেন একটা আগুন অলিয়া উঠিল ;—ইহা সূর্য্যের উদয় । সারারাত্রি আমার নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া-ঠেকিয়া অবশেষে লালমাটির একটি ছোট পাহাড়ের নীচে আসিয়া লাগিল । এইখানে বিল শেষ হইয়াছে । ইহাই ত্রিচূড়ের ঘাট ;—শতশত নৌকার সমাচ্ছন্ন । উহাদের সমুখভাগ “গণ্ডোলা” মত । এই নৌকাগুলি এখনও নিদ্রাভঙ্গ ।

রাত্র্যধ্যক্ষের অতীত নির্ভাবন ও অতীত বৃক্ষশ্রেণী ত্রিচূড়নগর এখন হইতে আরো অন্ধকোণ দূরে—তরুপুঞ্জের মধ্যে নিমজ্জিত । বরেন-গাড়ি করিয়া যখন আমি সেখানে পৌছিলাম, তখন সেখানকার লোকেরা সবে-মাত্র জাগিয়াছে । এই সব চুনকামকরা কাঠের বাড়ীর উর্দ্ধে ভালবৃক্ষসকল বায়ু-বেগে আন্দোলিত হইতেছে । একটা ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস উঠিয়া, রক্তিম মেঘপুঞ্জের স্তায় ধুলিরাশি উড়াইয়া, গাছপালাদিগকে বাঁকাইতেছে । পেটাই আমার—শতদানার ছোট-ছোট দোকান ; আলুলিতকুন্তল বট-বৃক্ষশ্রেণী,—সমস্তই মালাবারপ্রদেশের অস্তিত্ব নগরেরই মত । এই সকল নগর,—আধুনিক পদার্থসমূহ হইতে বহু দূরে—তরু-পুঞ্জের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া, বহুকাল হইতে বাকীর জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছে । বিহুকের বন্ধিরটি অতীত প্রাকৃত ও ভীষণ-

দর্শন । এই ত্রিচূড়নগরের অপর নাম—“তিবু-শিবায়-পেরিয়া-বুর”—অর্থাৎ শিবের পবিত্র মহানগরী ।

এই মন্দিরের সমুখস্থ ভূমিতে আমি অবতরণ করিলাম । ইহা মন্দিরও বটে, হর্গও বটে । এক সময়ে ইহা সেই ছদ্মস্ত মহিশূরস্বনুতান টিপূর অবরোধ সহ করিয়া-ছিল । হর্গের চালুমাটির উপর দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয় । এখন এই ভূমির উপর অলস মেঘদল ও গবয়াদি নিদ্রা বাইতেছে । আশ্বপেরা মন্দিরের একটা দ্বারদেখে বসিয়া ধ্যান ও প্রাতঃসূর্য্যের উদয় নিরীক্ষণ করিতেছে । আমি আসিতেছি দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উহারা আমার দিকে অগ্রসর হইল । এই বিদেশী না-জানি কি মনে করিয়া এখানে আসিতেছে !...কিন্তু আমি তাহা-দিগকে বলিলাম,—আমি সব জানি, আমি কেবল মন্দিরচূড়ার কারুকার্য দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি ;—যথাযোগ্য দূর হইতে আমি উহা দর্শন করিব । তখন তাহারা হাসিমুখে আমাকে অভিবাदन করিল এবং নিশ্চিতমনে আমার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল । গুরুতার প্রাচীরগুলি সুধালেপের দ্বারা ধবলীকৃত ; কিন্তু বাহার উপর খোদাই-কাজ-করা চারিটা চূড়া আছে,—চারিদিকের সেই চারিটা দ্বার, ভারতীয় প্রস্তরের স্তায় শ্রামণবর্ণ । দূর-অতীতের এই পুরাতন শ্রামণ চূড়াগুলি প্রচুর অলঙ্কারে ভূষিত ;—বহল ক্ষুদ্রস্তম্ভ ও বর্ষর মূর্তিসমূহে পরিপূর্ণ ।

এই বৈশীতকালের ঝড়ঝটিকা এখান-কার সকল পদার্থকেই উৎপীড়ন করে—আলুলিতকুন্তল বৃহৎ বটবৃক্ষদিগকে বাঁকা-

ইরা দেব—পথে-বাটে লাল ধূলা উড়াইরা
দেব—ইহাঙ্ক প্রভাব কি এই শিবপুরীতে
কিছুমান প্রকটিত হয় নাই? পথের ধারে-
ধারে সর্বত্রই বর্ষারান্ তরুণের তলদেশে
পূজা-অর্চনার অস্ত্র এক-একটি শাস্ত্রিময় নিভৃত
স্থান রহিয়াছে। আমাদের দেশে, যেখানে
মৃত্তিকাতূপের উপর কুণ-দণ্ড স্থাপিত হয়—
সেই সব চত্বরভূমির উপর—চৌমাথা রাস্তার
উপর, এখানে ছোট-ছোট প্রস্তরবেদিকা,
বিগ্রহশিলা, প্রতিমাদি প্রতিষ্ঠিত।

রাস্তার পশ্চিম ধুই-কম। স্বকীয় নগ্নতার
সৌন্দর্য্যে গর্ভিত,—কেশগুচ্ছ আকটিবিলম্বিত
—শিব কিংবা বিষ্ণুর তিলকচিহ্নে ললাট চিহ্নিত
—স্বপ্নময় ঢুলুঢুলু নৈত্র—এইরূপ কতকগুলি
লোক মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে; প্রায় সক-
লেরই বকোঁদে উচ্চবর্ণের চিহ্নস্বরূপ উপবীত
রহিয়াছে। কতকগুলি রমণী ইন্দারায় অল
মইতে আসিয়াছে। তাহাদের বস্ত্র দেহভঙ্গী;
—বকের উপর বক্বকে তাঁবার কলস
রহিয়াছে। স্তনযুগলের একটিতে বকের বসন
ফুলিয়া উঠিয়াছে;—অপরটি (প্রায়ই ডান-
বিক্কার) নগ্ন রহিয়াছে। এই সব তরুণীর
তরুণ বকোঁদে যুরোপীয় জাতিদিগের অপেক্ষা
একটু বেশি পরিপুষ্ট,—নিতম্বের তুলনায় একটু
বেশি অতিরিক্ত;—কিন্তু উহার গঠন অনিন্দ্য-
সুন্দর। বহু পুরাকাল হইতে হিন্দুরা তাহা-
দের প্রস্তর ও ধাতুয় মূর্তিসকল বেক্রপ-
ভাবে গঠন করে—উহাতে নারীসৌন্দর্য্যের
উপকরণগুলি বেক্রপ অতিরঞ্জিত করে—এই

রমণীরাই সেই-সব প্রতিমূর্তির জীবন্ত আদর্শ।
পশ্চিমধ্যে তাহাদের সহিত কখন সাক্ষাৎ হইলে,
তাহাদের নরনকোণের চোরা-চাহনি ভোমার
দৃষ্টির উপর নিপতিত হয়;—তাহাদের সেই
দৃষ্টি বড়ই মধুর, কিন্তু নিতান্ত উদাসীন—
নিতান্ত অন্তর্ধারণের;—বেন উহা কালো
বিদ্যাতের অনিচ্ছাকৃত সোহাগ-আলিঙ্গন; কিন্তু
পরক্ষণেই সেই দৃষ্টি আবার নিরমিকে নত হইয়া
পড়ে। বিদেশী পশিকের নিকট এদেশের বৃহৎ
মন্দির যেরূপ চুক্তের, সমস্ত পদার্থই যেরূপ
চুক্তের—এই রমণীরাও সেইরূপ চুক্তের।

সৌম্যদেশে পৌছান পর্যন্ত আমি
কোচিনরায়ে অতিথি হইয়া ছিলাম;—
তিনি আমাকে যেখানে লইয়া গিয়াছেন,
আমি সেইখানেই গিয়াছি। প্রভাতে জিচুড়
দিয়া বাজা করিবার সময়, তিনি কুপা করিয়া
সমস্তই পূর্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া-
ছিলেন; আমার পণ প্রদর্শক, আমার আহার-
সামগ্রী—সমস্তই প্রস্তুত ছিল। এমন কি, যে
তিনঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া, গ্রাম-জঙ্গল-
বনের মধ্য দিয়া, বরেল-গাড়িতে আমার
“সোর-সুরে” বাইতে হইবে—সেই গাড়িরও
বন্দোবস্ত তিনি করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বিদেশী পর্যটকেরা যেখানে কখনই যার
না,—সোরাহুর ছাড়াইলেই—আহা! আমি
সেই চিত্তবিমোহন ভারতবর্ষের বাহিরে
চলিয়া বাইব; রাজ্য বাইবার অস্ত্র, আবার
সেই সাধারণ রেলপথ ধরিয়া ডাকগাড়ির
টেপে আমার উঠিতে হইবে।*

ক্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* পূর্বসংখ্যার ভ্রমসংশোধন।

৩৯ পৃষ্ঠার শেষে যেখানে “ইহাঙ্কর উপরে” আছে, সেই স্থলে “ইহাঙ্কর উপরে” হইবে।

স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ।

[স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এখনও কাল্পনিক পদার্থ; নিম্নোক্ত কথাগুলি পড়িবার সময় বর্তমান বাস্তবিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধ-কল্পনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।]

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কেবল উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। নিম্নশিক্ষা (primary education) সম্পূর্ণভাবে গবর্নমেন্টের হাতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাহার সম্পর্কমাত্র নাই। মধ্যশিক্ষার সহিতও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সম্পর্ক নাই; কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা কোন্ বিষয়ে কতটুকু অভিজ্ঞতা থাকিলে কালেজে উচ্চশিক্ষালভের অধিকার পাইবে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাই দেখেন। উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি ও বেসরকারি কালেজ আছে; উহাতে পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যপুস্তক নির্দেশ করিয়া ও পরীক্ষাতে উপাধিপ্রদান দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাপ্রবেশের বস্ত্রমাত্র; শিক্ষাদান তাহার কাজ নহে। ভবিষ্যতে কিঞ্চিৎ শিক্ষাতার গ্রহণ করিতে পারেন, এইরূপ একটা কথা উঠিয়াছে মাত্র।

উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রতি বিশেষ কিছু নাই; সরকার কয়েকটি post-graduate research scholarship দিয়া থাকেন, আর গ্রেমটানবৃত্তি আছে; এতদ্বারা কালেজছাড়ার পর করেকবৎসর বৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাচর্চা চলে যাইবে।

কলে নিম্নশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। বাংলা পাঠশালার নিম্নশিক্ষা পাঠরা বাহারা ইংরাজী-স্কুলে মধ্যশিক্ষার জন্য প্রবেশ করে, তাহাদিগকে নুতন করিয়া লেখাপড়া আরম্ভ করিতে হয়। পূর্বার্জিত বিদ্যা বড় কালে লাগে না। কিছুদিন হটল, গবর্নমেন্ট নিম্নশিক্ষার সহিত মধ্যশিক্ষার বিশাইবার বে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা সকলে গ্রহণ করে নাই; গ্রহণ করিলেও উহা বিশেষ আশা প্রদ নহে। আবার মধ্যশিক্ষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃত্ব না থাকার বাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কালেজে প্রবেশ করে, তাহারা কালেজে প্রবেশের উপযুক্ত হয় না। ছাত্রেরা এক-এ. পরীক্ষাটা একরকমে উত্তীর্ণ হয়; কিন্তু বি. এ. পরীক্ষার পিরা ঘরা পড়ে। শতকরা বিশজন উত্তীর্ণ হইলেই যথেষ্ট হয়।

অধিকাংশ শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য জীবিকার সংস্থান; কাজেই বি.এ.-পরীক্ষাতে এম্. এ. হইবার জন্য অধিক লোক অপেক্ষা করে না, বি. এ. পরীক্ষাতেই শিক্ষার সমাপ্তি হয়।

এতদ্বিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং, এই তিন ব্যবসায়শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার্থীর এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য জীবিকা-সংস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনধীন ভতিশর টেকনিকাল স্কুল আছে;

সকলিত কৃষিকালেক এখনও কার্যনিক বহু।

অন্ত কোন ব্যবসায়শিকার কর্তৃক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাই।

অতএব বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর যোব—

(১) নিম্নশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা পরস্পর অসংঘট ও বিচ্ছিন্ন; এতদ্বারা শক্তির ও সময়ের অপচয় ঘটে।

(২) উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা নাই।

(৩) বিবিধ শিল্পবিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষার আবশ্যিকমত ব্যবস্থা নাই।

(৪) পাণ্ডিত্যলাভের জন্য অল্প লোকেই শিক্ষার্থী হয়; যাহারা পাণ্ডিত্য-লাভের ইচ্ছা রাখেন, তাহাদেরও অর্জিত বিজ্ঞা তেমন ফলপ্রসূ হয় না।

(৫) সমুদয় শিক্ষাপ্রণালী বিদেশের আদর্শানি; জাতীয়প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যের অভাবে শিক্ষা প্রায় বার্থ হয়।

প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এই যোবগুলি পরিহারের চেষ্টা করিতে হইবে।

(১) নিম্নতম হইতে উচ্চতম শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) জীবিকার্থীর জন্য ও দেশের ধনাগরের জন্য শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) শিক্ষা যাহাতে জাতীয়প্রকৃতির অনুযায়ী হইয়া ফলপ্রসূ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এখানে শিক্ষার ফল অর্থে জ্ঞানচর্চা, জ্ঞানবর্ধন ও জ্ঞানপ্রচার।

নিম্নশিক্ষা ও মধ্যশিক্ষা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন ও মধ্য শিক্ষার জন্য নিজস্বায়ে একটি আদর্শস্কুল স্থাপন করিবেন, উহার নিম্নের শ্রেণীতে নিম্নশিক্ষা ও উচ্চতর শ্রেণীতে মধ্যশিক্ষা প্রদত্ত হইবে। উভয়ের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ রহিবে না। মোটামুটি পাঁচ হইতে বোল বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ছাত্রেরা এখানে অধ্যয়ন করিবে। বিশ্ববিদ্যালয় এই আদর্শস্কুলের পাঠানির্দেশ করিবেন ও শিক্ষকনিয়োগাদি দ্বারা স্কুলে আদর্শশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। এই বিদ্যালয়ের সমুদয় ব্যয়ভার বিশ্ববিদ্যালয় বহন করিবেন।

সহর ও মক্কাবলের যে সকল স্কুল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা স্বীকার করিবেন, তাহারা সর্বতোভাবে এই আদর্শবিদ্যালয়ের অনুসরণ করিবেন। এইরূপ স্কুল দেশ ছড়াইয়া থাকিতে পারে।

এইরূপ আদর্শস্কুল পরিচালনার অত্যধিক ব্যয়ের আশঙ্কা নাই। তবে সহর-মক্কাবলের অন্যান্য স্কুলগুলি আদর্শস্কুলরূপে চালিত হইতেছে কি না, তাহার পরিদর্শনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা পরিদর্শকনিয়োগ আবশ্যক হইতে পারে। তাহাও ভবিষ্যতে।

এই সকল স্কুলে শিক্ষান্তে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রেরা কালেজে প্রবেশের অধিকার পাইবে।

উচ্চশিক্ষা।

উচ্চশিক্ষার জন্য আদর্শকালেজস্থাপনের আবশ্যিকতা এখন নাই। সহর-মক্কাবলের বেসরকারি তৈয়ারি কালেজগুলির মধ্যে যদি কেহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা

বীকার করিতে চাহেন, তাঁহারা ইহা সন্তোষিত
উচ্চশিক্ষার তার গ্রহণ করিতে পারেন।
তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় কালেজ চালাইবার
ব্যয়ভার হইতে আপাতত নিষ্কৃতি পাইবেন।
পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ ও পরীক্ষা-
গ্রহণান্তে প্রশংসাপত্রদান ও আবশ্যিকমত
কালেজগুলির পরিদর্শন কেবল বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের কর্তব্যমধ্যে থাকিবে।
পরীক্ষার্থীদের প্রবৃত্তি ফী দ্বারা ব্যয়ের
অধিকাংশ চলিতে পারে। এখানেও
প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা বর্তমান
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ পরীক্ষাভিত্তিক হইবে
মাত্র। কিন্তু এই বন্দোবস্ত এখন কিছুদিনের
জন্ত।

নিজ কৃতি ও ক্ষমতা অনুসারে পাঠ্যবিষয়-
নির্ধারনে ছাত্রদিগকে অধিকতর স্বাধীনতা
দেওয়া আবশ্যিক। তাহা হইলে ও শিক্ষা-
পদ্ধতি প্রকৃষ্ট হইলে ও প্রবেশিকার
standard উচ্চ থাকিলে এখনকার কালেজে
চারিবেংসরের অধ্যয়নের ফল তিনবেংসরে
পাওয়া যাইতে পারে। কালেজে অধ্যয়ন-
সমাপ্তির পর বাহারা বাহির হইবেন,
তাঁহাদের মর্যাদা বর্তমান বি.-এ.-উপাধি-
ধারীর অনুরূপ হইতে পারে। যদি কোন
বেংসরকারি কালেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
সহকৃত্যগ না করেন, তাহা হইলে অবশ্য
অনুরূপ বন্দোবস্তের দরকার হইবে।

অধিকাংশ ছাত্রই এই স্থলে উচ্চশিক্ষা
সমাপ্ত করিয়া ব্যবসায় ও শিল্পশিক্ষার
প্রবৃত্তি হইতে পারে অথবা গৃহস্থে প্রবৃত্তি
হইতে পারে। বাহারা উচ্চতর শিক্ষা
ও বিদ্যার্জনের পক্ষপাতী, তাঁহাদের জন্ত

বত্বর ব্যবস্থা আবশ্যিক। বলা বাহুল্য,
তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হইবে না।

উচ্চতর শিক্ষা।

এই অল্পসংখ্যক জ্ঞানার্থী ছাত্রের জন্ত
প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানার্জনের পথ
প্রদত্ত করিয়া দিতে হইবে ও তৎসমস্ত
যথোচিত ব্যয়ভারস্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে
হইবে। সংখ্যায় অল্প হইলেও, এই সকল
জ্ঞানার্থী ছাত্রই দেশের শিরোভূষণ হইয়া
জাতীয়প্রকৃতিগঠনে ও জাতির উন্নতিবিধানে
সমর্থ হইবেন।

ইহাদের জন্ত উপযুক্ত ব্যয়ে laboratory,
museum, library সমন্বিত পাঠশালা স্থাপন
আবশ্যিক এবং সেইখানে বঙ্গদেশী ও আবশ্যিক
হইলে বিদেশ হইতে আনৌত জ্ঞানিসমাজে
প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নিয়োগ করিতে হইবে।
ইহারা অধ্যাপনা করিবেন ও ছাত্রদিগের
জ্ঞানার্জনে ও নূতনসত্যাবিষ্কারে পথপ্রদর্শন
ও সাহায্য করিবেন। অধ্যাপকেরা স্বয়ং
জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানপ্রচারে নিযুক্ত
থাকিবেন। এই পাঠাগারে শিক্ষার দুইটা
স্তর হইতে পারে।

(১) প্রথম দুইবেংসর ছাত্রেরা
অধ্যাপকের অধীন থাকিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ
করিবেন। দুইবেংসর পরে পরীক্ষার উত্তীর্ণ
হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে
পারিবেন। ইহাদের মর্যাদা বর্তমান
M.-A.-পণের অনুরূপ হইবে, কিন্তু শিক্ষার
standard উচ্চতর হওয়া উচিত।

(২) যে কতিপয় ব্যক্তি জ্ঞানচর্চার
জীবনবাণন করিতে চাহেন, তাঁহারা
অধ্যাপকগণকর্তৃক নির্ধারিত হইয়া

জীবনযাত্রার জ্ঞানচর্চার সুবিধা ও অবসর পাইবেন। তাঁহাদের জীবিকার জন্য যথোচিত বৃত্তি বা বেতনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এক এক ব্যক্তি কেবল এক এক বিষয় লইয়া নিযুক্ত থাকিবেন। বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র ব্যতীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি ইহাদের আলোচ্য বিষয় হইবে। এই পাঠাগারের ব্যবস্থা এরূপ হইবে, বাহাতে দেশে বর্তমান টোল এবং রাজ্যের প্রভৃতির কৃতবিদ্য ছাত্রগণ বা অধ্যাপকগণও এখানে আসিয়া জ্ঞানচর্চার সুযোগ পাইতে পারেন।

ব্যাবহারিক শিক্ষা।

(১) দেশের ধনাগমের পথ প্রশস্ত করা আবশ্যিক। (২) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সরকারি চাকরির বা সরকারি আদালতে ওকালতি প্রভৃতির আশা রাখিবেন না; অতএব তাঁহাদের জীবিকার সংস্থান আবশ্যিক। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর ছাত্রের সংখ্যাই বেশী।

বৈয়্যিক শিক্ষা।—অসিদ্ধারী বা মহাজনী কার্যের জন্য বৈয়্যিক শিক্ষার প্রয়োজন। সম্রাতি কর্তৃক পাইবার ঐ একটা প্রধান পথ হইবে। ইহাতে আইনের জ্ঞান হইতে অরিপ-পরিমিতির জ্ঞান পর্যন্ত আবশ্যিক। হিসাব-রাখা হইতে shorthand ও type-writing পর্যন্ত দরকার।

আইনশিক্ষা।—ওকালতির পথ বন্ধ; অতএব আইনশিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রহণ করিতে হইবে না। তবে Jurisprudence ও law of the land যেটুকু

জানি আবশ্যিক, ততকর ব্যবস্থা liberal education এর অন্তর্ভুক্ত করিয়া সাধারণ শিক্ষার মধ্যেই কোলাচনিবে।

চিকিৎসা।—বেসরকারি চিকিৎসা-বিদ্যালয় বাহা আছে বা স্থাপিত হইবে, সেগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে আনিয়া তদ্বারা চালান বাইতে পারে।

অস্ত্রাস্ত্র ব্যবসায়।—এখানে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া শিল্পা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য দুইটা কিংবা তিনটা স্তরনির্দেশ আবশ্যিক।

নিরন্তরে কৃষি ও দেশে প্রচলিত ব্যবসায়-গুলির (তাঁতি, কামার, কুমার প্রভৃতির) উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যিক। সহরে ও মকনুলে ছোট ছোট স্কুল সাধারণের খরচে স্থাপিত হইতে পারে। এইরূপ কয়েকটি স্কুল এখনও বর্তমান আছে।

উচ্চস্তরে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান (mechanics, physics, chemistry, political economy, geography) প্রভৃতির ভিত্তির উপর বিবিধ শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যিক হইবে। এখানেও বিবেচন হইতে আনাত অথবা বিদেশে শিক্ষিত শিল্পক আবশ্যিক। দেশে যে সকল শিল্প নাই, তাহার প্রবর্তনা ও বাহা আছে, তাহার উন্নতি সুখা উদ্দেশ্য হইবে।

অস্ত্রাস্ত্র।

ব্যায়াম।—শিক্ষার ও পরীক্ষার প্রণালীর উৎকর্ষসাধন করিলে ছাত্রদিগকে কেবল পুষ্টির উপর সমস্ত সময় দিতে হইবে না, আন্তরিকতার ব্যবহার তাহারো মধ্যেই অবসর

পাইবে। অল্পবয়সে সাধারণ শিক্ষার উপযোগী ব্যারামচার অবসর বেতন উচিত।

৭র্থ.—আর্থিক। ধর্মশিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন রাখা উচিত। ছাত্রদিগকে আপন ধর্মচারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হইবে।

নোতি।—পুঁথিখানা, নোতিশিক্ষা হয় না। শুকশিষ্যের মধ্যে দেশের পুরাতন সম্বন্ধ-স্থাপন আবশ্যিক। উহাই প্রশস্ত পথ। ছাত্রদিগকে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষকের অনুচর্যে বা ক্ষুদ্রতবে নিযুক্ত করা বাইতে পারে। পুঁথিতে বহুদেশের ও বিদেশের মহাপুরুষদের উত্তরচরিত্রের উদাহরণ দেখান বাইতে পারে।

বদেশী ভাষা।—বিভিন্নরকম হইতেই অল্পে অল্পে ছাত্রদিগকে সাধ্যমত স্বাক্ষরিতসেবা নিযুক্ত করা আবশ্যিক। সেবাকর্ম দ্বারা বদেশী ভাষা প্রচলিত করিতে হইবে।

বর্তমানে কর্তব্য।

(১) নিম্ন ও মধ্যশিক্ষার জন্য আদর্শবিভাগ স্থাপনা ও পরিচালনা। এই আদর্শ পরিচালিত সহরের ও মকবলের অন্তর্গত স্থানের পরিদর্শনের ব্যবস্থা। এই কার্যের স্তম্ভ ব্যয় আবশ্যিক।

(২) উচ্চশিক্ষার জন্য আদর্শকলেজ স্থাপনা সম্প্রতি আবশ্যিক নাই। যে সকল বেসরকারি কলেজ ইচ্ছাপূর্বক বা কোন কারণে বাদ্য হইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা স্বীকার করিবেন, তাঁহারা উচ্চশিক্ষার তার লইতে পারেন। তাঁহাদের জন্য পাঠানির্দেশ ও পরীক্ষাগ্রহণাদির ব্যবস্থা করিতে অল্পই ব্যয় হইবে।

যদি কোন বেসরকারি কলেজ সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ছাড়িয়া না আসিতে চাহেন, তাহা হইলেও সম্প্রতি কলেজস্থাপনের আবশ্যিকতা দেখি না। তবে যদি অধিক ছাত্র পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও ছাত্রদত্ত বেতনে কলেজের কার্য-নির্বাহের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কলেজপ্রতিষ্ঠা বিবেচনাধীন হইবে। বদেশী স্থানের উত্তীর্ণ ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। উহাদের কিয়দংশ technical school বা collegeএ যাইবে। অপর অংশ বেসরকারি কলেজে ex-student রূপে ভর্তি হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষালাভ করিবে। তাহাদের স্বতন্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে মাত্র।

(৩) উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাঠাগার ও তৎসংসৃষ্ট library, laboratory, museum প্রভৃতির স্থাপনা। তজ্জন্য অধ্যাপকনিয়োগ ও জ্ঞানার্থী ব্যক্তিগণের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা। এই কর্ম বহুবায়সাহ্য্য। আর্থিক অবস্থা বিবেচনার ক্রমশ অগ্রসর হওয়া বাইতে পারে, কিন্তু ইহাকে সর্বপ্রধান লক্ষ্যমধ্যে রাখিতে হইবে।

(৪) নিম্ন ও উচ্চ স্তরের ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা। ইহার জন্যও প্রচুর ব্যয় আবশ্যিক। এখানেও আর্থিক অবস্থা বিবেচনার ক্রমশ অগ্রসর হইতে হইবে।

অতএব (১), (৩) ও (৪) এর জন্য আপাতত ব্যয় আবশ্যিক। বেঙ্গল অর্থ-সংগ্রহের আশা পাওয়া বাইতেছে, তাহাতে

এই তিন কার্যই আরও করা বাইতে পারে।

শেষ কথা।

সম্প্রতি তিনটা বৃহৎ ব্যাপার আমরা হাতে লইয়াছি। (১) শিক্ষা ও শিল্পের উন্নতির জন্য National Fund ; (২) Federation Hall ; (৩) National University। তিনটা বৃহৎ কার্য এক বৃহত্তর কার্যের অঙ্গ করিয়া লইতে পারিলে ব্যয়লক্ষ্যেপ ও শক্তির অপচয়নাশ ঘটিতে পারে।

National Fundএর সংগৃহীত অর্থ

জাতীয় বিভাগের ব্যবহারিক শিক্ষাশিক্ষার জন্য ব্যয়ে খাটা যেখি না। উক্ত Fundএর কর্তৃপক্ষ পরামর্শ করিয়া ঐকমত্যে উপস্থিত হইতে পারেন।

Liberal ও technical শিক্ষার জন্য যে পাঠাগার, library, museum, laboratory, workshop প্রভৃতি হইবে, তাহা Federation Hallএর কিয়দংশে স্থান পাইতে পারে। তদন্ত বস্তুর গৃহনির্মাণ আবশ্যক না হইতেও পারে।

এই তিন কাজকে এক কাজের অঙ্গ

করিয়া লওয়া আবশ্যক।

শ্রীরাধেন্দ্রপ্রসন্ন ত্রিবেদী।

দান।

ভেবেছিলাম চেয়ে নেব—

চাই নি সাহস করে’—

সন্ধ্যাবেলায় যে মালাটি

গলায় ছিলে পরে—

আমি চাই নি সাহস করে’।

ভেবেছিলাম সকাল হ’লে

বধন পারে যাবে চলে’

ছিন্নমালা লম্বাভালে

রুইবে বুঝি পড়ে’।

তাই আমি কাঁচালের মত

এসেছিলাম তোরে—

তবু চাই নি সাহস করে’।

এ ত মালা সরসো, এ যে

তোমার তরুণারি।

অলে, ওঠে আশ্রয় কেন,

বজ-হেন তারি—

এ বে. তোমার তরবারি !

ভরুণ আলো জালনা বেয়ে

পড়ল তোমার শরন ছেয়ে,

তোরের পাখী শুধার দেয়ে

“কি পেলি তুই নারি ?”

নয় এ ঝালা, নয় এ ধালা,

গন্ধজলের কারি,

এ বে. তীব্র তরবারি !

তাই ত আমি তাবি বসে’

এ কি তোমার দান !

কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি

নাই যে হেন হান !

ওগো এ কি তোমার দান !

শক্তিহীনা মরি লাভে,

এ ভূষণ কি আমার সাথে ?

রাখতে গেলে বুকের মাঝে

ব্যথা যে পায় প্রাণ !

তবু আমি বইব বুকে

এই বেদনার দান—

মিছে তোমারি এই দান !

আজকে হ’তে অগ্ন্যধিক

ছাড়ব আমি তর,

আজ হ’তে মোর সকল কাজে

তোমার হবে অর—

আমি ছাড়ব সকল তর !

মরণকে মোর দোসর করে’

রেখে গেছ আমার ঘরে,

আমি তারে বরণ করে’

রাখ্য পরাণধর ।

তোমার তরবারি আমায়

করবে বাঁধনকর ।

আমি চাড়'ব সকল তর ।

তোমার লাগি অজ তরি'

করব না আর সাজ—

নাই বা তুমি কিরে এলে

ওগো জদররাজ !

আমি করবনা আর সাজ ।

ধুলোর বসে' তোমার তরে

কানব না আর একলা ঘরে,

তোমার লাগি ঘরে-পরে

মান'ব না আর লাজ ।

তোমার তরবারি আমায়

সাজিয়ে দিল আজ

আমি করব না আর সাজ ।

দীনবন্ধু মিত্র ।

খৃঃ ১৮৩১ সনের জুলাইমাসে আমি হেরার-
কুলের পঞ্চমশ্রেণীতে পড়িতাম। তখন
কুলের নাম ছিল “কলুটোলা ব্রাহ্ম কুল”,
কিন্তু সাধারণত লোকে মানবহিতৈষী
ডেভিড হেরার সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া
উহাকে “হেরারকুল” বলিত। মার্চ ১৮৩৭
সনের ১৮৩৭ সনে কুল দেখিতে আসেন
। এবং কুলের শিক্ষকগণের অনুরোধে তিনি
“কলুটোলা ব্রাহ্ম কুল” নামের পরিবর্তে
“হেরারকুল” নাম দিবার আদেশ দেন।
১৮৩৭ সন হইতে সরকারী কাগজপত্রের
কুলের নাম “হেরারকুল” হইয়াছে।

তিনিরাচি, দীনবন্ধুবাবু হেরারকুলে ইংরাজি-
শিক্ষা আরম্ভ করেন। দীনবন্ধুবাবু ১৮৩১
সনে শুভকণে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া
১৮৫৫ সনে হিন্দুকলেজে পাঠসমাপনাধে
চাকুরী গ্রহণ করেন। আমি তাঁহার অপেক্ষা
১৮ বৎসরের ছোট ; আমি ১৮৫৭ সনে
হেরারকুলে ইংরাজিপাঠ আরম্ভ করি।
তখন দীনবন্ধুবাবুর প্রতিষ্ঠার সাধারণজের
কোন চিহ্ন দৃষ্টমান হয় নাই ; তাঁহাকে
প্রথমশিক্ষা দিয়া হেরারকুলের বেপৌরব,
তাহা তখনও আজলামান হেরার সময়
আইসে নাই। ১৮৬১ সনে প্রথম সকলে

জানিতে পারিল যে, দীনবন্ধু হেয়ারস্কুলের
গৌরবের এক অবিভীত মূল,—তিনি হেয়ার-
স্কুলের শিক্ষিতছাত্রমধ্যে একটি অমূল্য
রত্ন। ১৮৬১ সনেই আমরা শুনিলাম যে,
“নীলদর্পণের” রচয়িতা দীনবন্ধু। কলিকাতার
সুপ্রিমকোর্টের বিচারে লংসাহেবের এক-
হাজার টাকা জরিমানা ও একমাস
কারাবাস নীলদর্পণপ্রচার ও নীলকরদিগের
অত্যাচারের বিবরণ সর্জনসাধারণের নিকট
জ্ঞাপনের কানগীত হইল। আমি তখন
স্কুলের নিয়ন্ত্রণীভূত পড়িতাম, রাজনৈতিক
বা আইন আদালত-সম্বন্ধীয় বিষয়ের ধার
ধরিতাম না। স্কুলের পাঠ্য পড়িতাম ও
খেলাধুলা করিতাম; কৃত্তিবাসের রামায়ণ
ও কাশীদাসের মহাত্ম্যের প্রভৃতি ছই-
চারিখানি বাঙলাপুস্তকই তখন আমাদের
বাহিরের পড়ার বাঙলাপুস্তক ছিল।
তখন আমাদের পাঠ্য অল্প কোন বাঙলা-
পুস্তক—নাটক বা উপক্ৰাম—ছিল না বলিতে
পারা যার। অন্তত আমি তখনও মদন-
মোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের পুস্তক ভিন্ন অল্প
কোন পুস্তক পড়ি নাই। কাদম্বরী ও
রাসলেসের ভাষার গুরুত্ব আমাদের পাঠের
প্রতিবন্ধক ছিল। বিভাগাগরের বেঙালপঞ্চ-
বিংশতি ও শকুন্তলা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু
গীতার বনবাস তখনও প্রকাশিত হয় নাই।
অক্ষয়কুমারের ধর্মনীতি ও বাহুবল্লভ সহিত
“দীনবন্ধুপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার: অনার্যসপাঠ্য ছিল
না। তখন বহুস্বয়ং ও বণোমার্গে পদার্পণ
করেন নাই। পাঁচালী শুনিয়াই দাঁশরথি
রায়ের ও ঈশ্বর চন্দ্রের গুণাবলীর ব্যংগিক
আভাস পাইতাম। আর্জাকালের মত

“বদেশী” ও “বিদেশী” কোন কথাই সহিত
আমরা তখন সংশ্লিষ্ট থাকিতাম না। কিন্তু
তখন নীলদর্পণ ও লংসাহেবের বিচারের
কথা শুনা বালকগণেরও অপরিহার্য ছিল।
নীলদর্পণ ও তাহার প্রণেতার উপর সহজেই
আমার শ্রদ্ধা হইল। বিশেষত দীনবন্ধু ও
আমরা বাঙালী, দীনবন্ধু আমাদের স্বজাতি
স্বপ্রেমী এবং দীনবন্ধু ও আমরা কালিদাস
মিত্রের সম্মান। আবার তিনি ও আমাদের
পরিবারস্থ অনেকেই হেয়ারস্কুলের ছাত্র।
১৮৬১ সনে দীনবন্ধু আমাদের, প্রাথমিক
পাত্র হইলেন।

তখন অনেকেই খবরের কাগজ পড়িত
না; আমাদের মত বালকদের ত কথাই
নাই। বস্তুত পড়িবার মত বাঙলা
খবরের কাগজও ছিল না। হরিশ্চন্দ্রের
প্রসিদ্ধ Hindu Patriot ইংরাজিতে;
আমরা পড়িতে পারিতাম না। তখন
প্রতি ঘটনার বটতলা হইতে ছড়ার পুস্তকও
প্রকাশিত হইত না। বিভাগাগরের বিধবা-
বিবাহগান দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,
শান্তিপুরে ধৃতীর পাড়েও উঠিয়াছিল। কিন্তু
বিধবার বিবাহ লইয়া দেশ ভোলপাড় হইয়া-
ছিল; তাহাই তাহার দেশপ্রসিদ্ধির প্রধান
কারণ; বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়
ও উপক্ৰমণিকা ব্যাকরণ দ্বিতীয় কারণ।
নীলদর্পণের ও লংসাহেবের বিচারের কথা
প্রচারের কারণ কমই ছিল। তাহাতে
আবার আমরা বালক ছিলাম। “প্রতাকরের”
অনেকাংশ ও “রসরাজ” ও “পরিদর্শন”
বালকদের অপাঠ্য ছিল। বহুস্বয়ং নিকট
অনেক কথা শুনা যাইত। লংসাহেবের

বিচার বা অবিচার, ওয়েলসলাহেবের হুর্নাম, তাঁহার বিরুদ্ধে শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে মহাসভা, মহাতারতের অহুবাদপ্রকাশদ্বারা চিরস্মরণীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের লংসাহেবের জরিমানার ১০০০ টাকা দেওয়া, এই সকল কথা লইয়া সহরে চলুচলু পড়িয়াছিল। আমি বালক হইলেও অনেক কথা শুনিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে “নীলদর্পণ” পড়িবার আমার অভ্যাস সাধ হইল। ধার করিয়া লইয়া “নীলদর্পণ” পড়িলাম। আমারও নীলকরদের উপর ঘৃণার আধিক্য ও গ্রহকারের উপর সমধিক প্রচা অশ্লিল।

১৮৬১ সনের নীলদর্পণবিষয়ক বৃত্তান্ত আমাদের জানিবার আর একটি মূল—“ধীরাজ”। ধীরাজ রসাল হাত্তোদীপক গান বাঁধিয়া তত্ত্রমণ্ডলীমাজেই গাইতে লাগিলেন। আমাদের মত বালকদের সে গান শুনিবার বাধা ছিল না; আমি অনেকবার সেই গান শুনিয়াছিলাম। তখন তাঁহার গান সুখ হইয়াছিল, কারণ কবিত্ব থাকুক বা না থাকুক, তাঁহার গানে হস্ত ও কল্প রস উদ্দীপনের অনেক কণা ছিল। কিন্তু এখন সব ভুলিয়া গিয়াছি, অনেকেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন; গানগুলি ছাপা আছে কি না, জানি না। ধীরাজের গানের “হুইন্ হুইন্ হ’ল তোমার সোনার ইণ্ডিয়া” এই একছন্দমাত্র এখন মনে আছে। আমি গান গাহিতে পারি না, গানও মনে থাকে না।

১৮৬১ সনে আগ্রহের সহিত “নীলদর্পণ” পড়িয়াছিলাম, কিন্তু তখন আমি নীলদর্পণের

রসাস্বাদন করিতে পারিয়াছিলাম মনে হয় না। স্থানে স্থানে খুব হাসিয়াছিলাম, কাঁদিয়াছিলাম ও ক্রোধে আলোড়িত হইয়াছিলাম, কিন্তু পড়িতে ভাল লাগা ও প্রকৃত রসাস্বাদন দুইটি পৃথক্ পদার্থ। এ কথা সত্য, গ্রন্থের কোন একটি গুণ না থাকিলে তাহা মানবহৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু কেবল সুন্দর গল্প একটি সামান্য পদার্থ; রসের পরিপূতি পৃথক্ পদার্থ। আমার এখন বিশ্বাস যে, প্রথম যখন নীলদর্পণ পড়ি, তখন কেবল গল্পদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম,—তখন কেবল রোষ, হস্ত ও কল্পনার উদ্বেগ হইয়াছিল। নীলদর্পণের প্রকৃত রস প্রায় পনের বৎসর পরে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিয়া আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু “পারিয়াছিলাম” বলাও অহঙ্কারের কথা। অনেক সময়ে আমরা মনে করি যে, কবির কবিত্ত্ব প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা পারি নাই। কলেজে দিল্টন, শেক্সপীয়ার প্রভৃতি পড়িয়াছিলাম। এখনও সময়ে সময়ে পড়ি। সেকালের ও একালের পড়াতে অনেক প্রভেদ। এখনকার শকুন্তলা ও তখনকার শকুন্তলা বেন দুইটি পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। বাহা হউক, ১৮৬১ সন হইতে দীনবন্ধুর গ্রন্থ পড়িবার ইচ্ছা প্রবল হইল এবং ক্রমাগত “নবীন তপস্বিনী”, “বিরেপাগলা বুড়ো” এবং “সধবার একাদশী” পড়িলাম। “সধবার একাদশী” আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। তাহাতে কি দোষ আছে, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই, আর কখন বিচারচক্ষে দোষ দেখিবার নিমিত্ত আয়াসও করি নাই। বক্তব্যবান্ বলিয়াছেন, তাহাতে

ওগ অনেক, দোষও অনেক। “সধবার একাদশী” তাত্‌কালিক “ইয়ং বেঙ্গলের” চিত্র। চিত্রটি অতিরঞ্জিত হইতে পারে; কবির হতে কেনই বা অতিরঞ্জিত হইবে না? কিন্তু দোষ যতই থাকুক না কেন, “সধবার একাদশী”কে আমি কখন দুঃখীরা গ্রহণ মনে করি নাই। “সধবার একাদশী”র অনেক কথা মনে হইলে এখনও আমার খুব হাসি পায়। যখন “লীলাবতী” প্রকাশিত হয়, তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত ছিলাম; তখন উহা পড়িতে পারি নাই, অনেক পরে পড়িয়াছিলাম; বেশ ভালও লাগিয়াছিল।

১৮৭০ সনের কেম্‌ব্রিজের সপ্তমতী-পূজার রাজ্যে কলিকাতার শ্রামবাজারে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটিতে আমি “সধবার একাদশী”র অভিনয় প্রথম দেখি। সেই দিন আমাদের এম্. এ. পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। প্রথমত বি. এ., তাহার পরমাণেই এম্. এ. পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ক্রমাগত কয়েকমাস পরিশ্রম করার, সপ্তমতী-পূজার দিনও কলম বন্ধ হওয়ার কারণে “ইউস্ এণ্ড অ্যাবুজ্ অফ্ সেটায়ার” (Use and abuse of satire) বিষয়ক একদে বাটলায়ের হুডিব্রাস্ (Hudibras), ড্রাইডেনের The Hind and the Panther, Absalom and Achitophel প্রভৃতির, গোপের Dunciad, বাইরনের English Bards and Scotch Reviewers, এবং ল্যাটিন কবি হরেন ও জুভিনেলের অনূর্ল কবিতাসমূহে মাথাযুও লিখিয়া দিনপাতান্তে রাজিকালে নিজায় খুব প্রয়োজন। কিন্তু

দিনবন্ধুর “সধবার একাদশী”র অভিনয় দেখিবার ইচ্ছা নিজা অপেক্ষা অনেক প্রবল হইয়াছিল। দিনের বেলায় বেরস আমাকে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবৃত্ত করিয়াছিল, তাহা নিজাদেবীকেও তাড়াইয়া দিল। বিক্রপের (Satire) বন্দীভূত হইয়া আমি সমাজ-বিষয়ক হাস্যোদ্দীপক নাটকের অভিনয় দেখিতে চলিলাম। নিজাদেবীর আরাধনা ত্যাগ করিয়া আমি রামবাহুর বাটিতে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বাঙলার নব্যধরণের নাটকের সৃষ্টিকর্তা; সেদিন কবির “গিরিশ” স্বয়ং—নিমচাঁদ। “সধবার একাদশী” পূর্বে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, বিশেষত “নিমচাঁদের” অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্ত হইলাম। . . .

বয়োবৃদ্ধিবশত ক্রমশ অনেক জিনিষ ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব, ইংরাজি, বাঙলা, সংস্কৃত, অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নামমাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাজ্যের নিমচাঁদের অভিনয় বোধ হয় কখন ভুলিব না। সেই রাজি হইতে কবি দীনবন্ধুর উপর আমার ঐক্যতক্তি পূর্বাশ্রয় অনেক বেশী হইল; অভিনয়ের নৈপুণ্যজন্য গিরিশের উপরও বিশেষ শ্রদ্ধা হইল। গিরিশবাহুর ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ আমার সহাধারী ও চিরবন্ধু, সুতরাং অনতিপরেই আমি গিরিশবাহুর সুপরিচিত হইলাম। গিরিশবাবু এখন আমার প্রিয় পরমবন্ধু। কিন্তু বিশেষ আগ্রহসত্ত্বেও দীনবন্ধুর সহিত আলাপ-পরিচয়ে কিছু বিলম্ব হইল।

হুইতিনমাস পরেই শোভাবাজারের

রাজবাটীতে কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষের বৈঠকখানার আমার সু-অনুভবশত দীনবন্ধুর দর্শন পাইলাম। নীলদর্পণ ও সধবার একাদশীর রচয়িতাকে দেখিবার জন্ত, তাঁহার সহিত কথাবার্তার জন্ত যে মহান্ আগ্রহ হইরাছিল, তাহা সেই দিন তৃপ্ত হইল। তাঁহার পরিচিত হইলাম, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য মনে করিলাম; কিন্তু দীনবন্ধুর কথা-বার্তার, অসাময়িকতা ও সরলতার, বিশেষতঃ বাক্গুণ্ঠতার ও রসিকতার আমি এক্রপ আকৃষ্ট হইলাম যে, বরসু ও অজ্ঞাত অনেক বিষয়ে পার্থক্যসত্ত্বেও আমি তদবধি অনেক সময়ই তাঁহার নিকট থাকিতাম। স্কুলে ও কলেজে শিক্ষকদিগের আদেশে কবিতা লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সংস্কৃতপরীক্ষার অনুষ্টুপুঙ্খরচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, তদতিরিক্ত কখন কবিতা লিখি নাই, নাটকের কথা ঘুরে থাকুক। কবিত্বশিকার জন্ত নহে, কেবল কবির প্রতি প্রচার জন্ত ও দীনবন্ধুবাবুর অসীম আকর্ষণশক্তির প্রভাবে আমি তাঁহাকে ছায়ার স্তার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। প্রায়ই সন্ধ্যার পর কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণের বৈঠকখানায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং আমিও অজ্ঞ কর্ম ভাগ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইতাম। আমাদের স্তার ছাত্রদের তথায় যাওয়ার অনেক প্রতিবন্ধক ছিল; এমন কি, দীনবন্ধুবাবু এবং শঙ্কুচক্র সুখোপাধ্যায় ও কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং আমাদের সময়ে সময়ে সতর্ক করিয়া দিতেন। কিন্তু সে সকল বিষয় বিয়-বিস্ময় মনে করিতাম না। তখন দীনবন্ধুবাবু

কলিকাতার সুশরনিউমেরি ইন্সপেক্টর পোষ্টমাষ্টার। বরজিণাকার তখন তাঁহার বাসা এবং সময়ে সময়ে প্রাতঃকালে আমি তাঁহার বাসায় যাইতাম। এই সময়ে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

দীনবন্ধুবাবু আমাদের কি চক্ষে দেখিয়া ছিলেন, তাহা জানি না, জানিবার ইচ্ছাও হয় নাই, বিশেষ অবকাশ ও হয় নাই। তাদৃশ ব্যক্তির ভালবাসা প্রার্থনীয় হইলেও, আমার এমন কোন গুণ ছিল না যে, তিনি আমাকে ভালবাসেন। আমি তাঁহার পরিচয়প্রার্থী ছিলাম। যখন আমাকে তিনি সুরধুনীকাব্যের প্রেক্ষীটু দেখিতে দিলেন, তখন আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। সুরধুনীকাব্যের প্রথমভাগের প্রেক্ষীটু আমি একবার আভোপান্ত দেখিয়াছিলাম। কাব্যে কবির কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় আছে এবং অনেকস্থলের বর্ণনা জীবন্ত বলিলে অত্যাতি হয় না। প্রেক্ষীটু দেখিবার সময় কাব্য আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। “বাক্য রসাত্মকং কাব্যং,” সুরধুনীকাব্যে কাব্যের এই লক্ষণের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। এক্রপ কাব্যে মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ থাকিতে পারে না, দীনবন্ধুবাবু মহাকাব্যও লিখিতে চেষ্টাও করেন নাই। এই কাব্যে রসাত্মক বর্ণনার কিছুই অভাব দেখিতে পাই না।

১৮৭১ সনের কেন্দ্রসারিমাঙ্গে প্রেসটান রায়চাঁদ ট্রুডেন্টশিপ পরীক্ষার পর দীনবন্ধুবাবুর সহিত মিশিবার আমার অবকাশ বাড়িল। আমাদের দেশের তখন নিরম ছিল যে, কি স্কুলে কি কলেজে, বহুদিন পঠ-দশা, ততদিন আমরা বালক। আমি

১৮৭১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং বীণবন্ধুবাবুও বোধ হয় আমাকে ভিন্নভাবে দেখিতে লাগিলেন। তিনি লুইসবুকের ডাকের বন্দোবস্ত করিয়া কিরিয়া আসিলে এবং আমারও অবকাশবুদ্ধি হইলে আমাদের ঘনিষ্ঠতাও বৃদ্ধি পাইল। আমি সর্বদাই তাঁহার বরজিপিড়ার বাসার বাইতাম। তাঁহার প্রকৃত সুখ, হাস্যোদ্দীপক সরস কথা কেহই ভুলিতে পারে না, আমিও কখন ভুলিব না। হৃৎকের বিষয় এই যে, আমি তাঁহার কথা কিছুই লিখিয়া রাখি নাই; তখন মনে করি নাই যে, ভবিষ্যতে দীনবন্ধুবাবুর কোন কথা আমি লিখিব। বোধ হয় লিখিয়া রাখার উপকারিতাও তখন বুঝি নাই। বসুওয়েল্ জন্সনের অনেক কথাই লিখিয়া রাখিয়া পরে প্রকাশ করার অগতে একটি সুপাঠ্য জীবনী প্রকাশ করিতে সমর্থ হন; কিন্তু আমাদের দেশে সে রীতি নাই। বিভাগাগরমহাশয়েরও কথা লিখিয়া রাখিব অনেকবার মনে করিয়াও লিখিয়া রাখি নাই। এখন সেই অপরাধের জন্য অনেকসময় আত্মশাস্তি হয়। বাঁহাদের “সদসি বাক্পটুতা” অসামান্য, বাঁহাদের কথা তুলিতে তুলিতে বাহুজগৎ ভুলিয়া যাইতে হয়, তাঁহাদের কথা সংগ্রহ করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। যিনি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি সাহিত্যজগতের পয়স হিতকারী। আমি অবকাশ পাইয়াও সাহিত্যজগতের সে উপকার করিতে পারিলাম না।

হরধুনীকাব্যের বিতরণভাগ হস্ত-
দেখার ১৮৭২ কি ১৮৭৩ সনে দেখি। দীন-
বন্ধুবাবু সপ্তমসর্গটি আমাকে ভাল করিয়া

দেখিতে বলেন। আমি উহার একশীট দেখিয়াছিলাম কি না স্মরণ নাই, কিন্তু সপ্তম-
সর্গের আলোচিত বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্তা হইরাছিল। আমি সেই সময়ে বিভাগপতির পদ সংগ্রহ করিতেছিলাম। দীনবন্ধুবাবু তাহা জানিতেন, তিনি আমাকে সকলবিষয়ে সময়ে সময়ে উপদেশ দিতেন এবং তজ্জগৎই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, আমাকে সপ্তমসর্গ শ্রুত করিয়া দেখিতে বলেন। বিভাগপতি বাঙালার একজন আদিকবি বলিয়া সকলের তৎকালে সংস্কার ছিল, আমারও তখন সেই সংস্কার ছিল। পাঁচছয়বৎসর পরে রাজকৃষ্ণবাবুর পবেষণার জানা যায় যে, বিভাগপতি মৈথিল কবি। সুতরাং ১৮৭২ ও ১৮৭৩ সনে বিভাগপতির পদের সকলনকর্তার নবদ্বীপের সংস্কৃতি দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। নবদ্বীপচন্দ্রের জন্মভূমি বলিয়া ও তাঁহার সময়ের নবদ্বীপে স্মৃতি ও দর্শনের প্রভার আতিশয্য বলিয়া বাঙালীমাজেই নবদ্বীপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দীনবন্ধুবাবুও আকৃষ্ট হইরাছিলেন, আমিও আকৃষ্ট হইরা-
ছিলাম।

আমি পূর্বে জানিতাম না যে, হুইতিন-
বৎসর হইতে দীনবন্ধুবাবু বহুমুদ্ররোগে
আক্রান্ত হইরাছিলেন। ১৮৭৩ সনের জুন-
মাসে আমি প্রথম তনি যে, এই ভয়ানক
রোগে তিনি আক্রান্ত। কিন্তু তিনি রোগের
ভয়ে কাব্যরচনা ত্যাগ করেন নাই। পীড়া
ওরতাব অবলম্বন করিলেও তাঁহার রচনা ও
হস্ত কাব্যরস বিকীর্ণ করিতে ছাড়ে নাই।
বাঙালার হরধুনীকায় ৪৩বৎসর বয়সে দীনবন্ধু

এ জীবন ত্যাগ করিলেন। আমি তখন আমি তাঁহার অতীব সখ্যই দেখি
বিভাপতিসকলনে ব্যাপ্ত। সে কার্যে পাইলাম।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র ।

রামায়ণের রচনাকাল ।

শব্দার্থবিচার ।

“ভাবান্তিঃ কান্তিগতীরঃ কাঃ সন্দমতিতঃ ।

হাতাপানুপহাভং বাস্তামি পিতৃনামনাং ।”

মহাভারত পাঠ করিবার সময়ে শব্দার্থ-
বিচারপদ্ধতির আলোচনা না করিয়া,
পাঠকবর্গ অনেকস্থলে “ব্যাসকূট” নামক
রচনাকাণ্ডিতের কল্পনা করিয়া থাকেন।
রামায়ণেও সেরূপ রচনাকাণ্ডিতের অभाव
নাই। এক রচনাযুগের এই অল্প রচনাযুগে
নানা রচনাকাণ্ডিতের পরিচয় প্রদান
করে। শব্দার্থবিচারপদ্ধতির অভাবে
নিতান্ত সরল রচনাও কঠিন বলিয়া প্রতীতাত
হয়। রামায়ণ কোন্ পুরাতন সাহিত্যযুগের
গ্রন্থ, তাহার আর একটি প্রমাণের অবতারণা
করিয়া, শব্দার্থবিচারে হস্তক্ষেপ করিব।

সীতাহরণের পূর্বে, মারীচের সাহচর্য-
লাভের আশায়, রাবণ মারীচের নিকট উপ-
নীত হইয়াছিলেন। মারীচ তৎকালে স্বভা-
জুলত হিংস্রস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, চিত্ত-
তদ্ভিন্দিতার্থ তপশ্চরণে নিযুক্ত ছিলেন।
রাবণ তাঁহাকে স্বাক্ষসোচিত অসাধুকার্যে
প্রবৃত্ত হইবার জন্য পুনঃপুনঃ প্রবৃত্তিদান
করিলে, মারীচ তাঁহার সন্ধ্যাসংগ্রহের
স্বল্যোদঘাটন করিয়াছিলেন। রামজই

মারীচের সন্ধ্যাসংগ্রহের একমাত্র কারণ
তিনি তাড়কাবধের সময়ে মারীচকে
নিষ্কাশন তাড়না করেন, তাহাতে অতিমাত্রা
সত্ত্ব হইয়াই মারীচ চরিত্রসংশোধনে প্রবৃত্ত
হইয়াছিলেন। তিনি যে রামভয়ে কতদূ-
রীত, তাহা বুঝাইবার জন্য রাবণকে
বলিয়াছিলেন—

“রকারাদীনি নামানি রামভয়তয়া রাবণ ।

রহ্মানি চ রথাস্থৈব সন্ধ্যাসংগ্রহং জনয়তি মে ।” (৩৩০)

‘হে রাবণ! অধিক আর কি বলিব? আমি
এতদূর রামভয়ত ‘মে, বাহাতে র-বর্ণের
সংস্রব আছে, এমন শব্দের উচ্চারণেও সন্ধ্যা
উপস্থিত হয়। রত্ন এবং রথ ঐশ্বর্যবিজ্ঞাপন
হইলেও, আমার পক্ষে সন্ধ্যাসংগ্রহাদিক!’

এই শ্লোকের “র-কারাদীনি” শব্দ রামা-
য়ণের রচনাকালনির্ণয়ের একটি উৎকৃষ্ট
প্রমাণ। সংস্কৃতসাহিত্যে বর্ণের উচ্চা-
“কার”-প্রত্যয় কল্পনা করিয়া, অ-কার,
ক-কার ইত্যাদি শব্দগঠনের রীতি দেখিতে
পাওয়া যায়। সকল বর্ণেই কার-প্রত্যয়
সংযুক্ত হইত। কাভ্যারনের সমস্ত বর্ণই
পরিবর্তন সংঘটিত হয়,—কিন্তু র-বর্ণে
পরিবর্তন সংঘটিত হয়। কাভ্যারন এই

পাণ্ডিত্যের অবতারণা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

“কর্মাৎ কারঃ । রাৎ ইকঃ ।”

সকল বর্ণেই “কার”-প্রত্যয় সংযুক্ত হইয়া থাকে ; কেবল র-বর্ণে হয় না । র-বর্ণে “ইক”-প্রত্যয় সংযুক্ত হইয়া থাকে । তদনুসারে “র-কার” না বলিয়া, “রেক” বলিতে হয় । * উত্তরকালের সংস্কৃতসাহিত্যে রেকশব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে ; র-কারের ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । কেহ তাহার ব্যবহার করেন নাই । পতঞ্জলির “ব্যাকরণমহাভাষ্যে” বহুবার র-কার বলিবার প্রয়োজন ছিল ; তিনি একবারও র-কারশব্দের ব্যবহার করেন নাই ; সকল স্থলেই রেক-শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন । † রামায়ণের “রকারাদীনি”-শব্দের ব্যবহার রামায়ণের অতি প্রাচীনতাই সূচিত করিতেছে ;—তাহা যে কাত্যায়নের বহুপূর্ব-কালবর্তী পুরাতন গ্রন্থ, তাহারই পরিচয় প্রকাশিত করিতেছে । শব্দার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলেও, এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।

* উপকৃপ্তঃ বসন্তঃ অভিব্যেকাৰ্হনুভবঃ ।

সর্গঃ নিবর্ত্তঃ কিংবা কুরু কার্ধ্যঃ নিরব্যয়ঃ । “২.২.৩৪

এই শ্লোক রামায়ণের রচনাকাঠিকের উদাহরণরূপে উল্লিখিত হইতে পারে । “কুরু কার্ধ্যঃ নিরব্যয়ঃ” বলিতে কিরূপ কার্ধ্য সূচিত হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত বোধগম্য হয় না । নিরব্যয়” শব্দের অর্থ কি ? দুইটি নিবেদ্যাত্মক

উপসর্গই বা দুগুণং ব্যবহৃত হইয়াছে কেন ? সংস্কৃতসাহিত্যে এরূপ রচনারীতির অধিক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না । রামায়ণের টীকাকারগণ এই রচনাকাঠিকের টীকা করেন নাই ; নিরব্যয়শব্দেরও ব্যাখ্যা করেন নাই । শব্দের অর্থ কালক্রমে কত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান না করিলে, ইহাকে রচনাকাঠিক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে ।

বাহা “ব্যয়” নহে, তাহার নাম “অব্যয় ।” বাহা “অব্যয়” নহে, তাহারই নাম “নিরব্যয় ।” সুতরাং “ব্যয়” এবং “নিরব্যয়” একই অর্থ সূচিত করিতেছে । তথাপি “ব্যয়” না বলিয়া, “নিরব্যয়” বলিবার উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য আছে । “ব্যয়” বলিলে বাহা ব্যয়, “নিরব্যয়” বলিলে তাহা অপেক্ষা অধিক ভাব ব্যক্ত হয় । দুইটি নিবেদ্যাত্মক উপসর্গের ব্যবহারে একটি ভাবাত্মক অর্থ ব্যক্ত করা রচনাকৌশলের পরাকাষ্ঠা ।

সংস্কৃত এবং বঙ্গীর সাহিত্যে ব্যয় এবং অপব্যয় নামক দুইটি শব্দ প্রচলিত আছে,—একটির অর্থ অপরটির বিপরীত ! বাহা ব্যয় নহে, তাহারই নাম অপব্যয় । সঙ্গত কার্ধ্যে ব্যয়ের নাম ব্যয় ; অসঙ্গত কার্ধ্যে ব্যয়ের নাম অপব্যয় । গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ের নাম ব্যয় ; তাহার বাহুল্যের নাম অপব্যয় । এক্ষেপে এইরূপ অর্থই সর্বত্র সুপরিচিত । অমরকোষে “অর্থতাপগমে ব্যয়ঃ” এই সংক্ষিপ্ত অর্থই উল্লিখিত ।

পাণিনিমুখে র-পর, ব-পর ইত্যাদি শব্দে রকার পর, বকার পর ইত্যাদি ব্যক্ত হইয়াছে । তৎকালে কার-প্রত্যয় করিত হইয়াছিল কি না, পাণিনিমুখে তাহার উল্লেখ নাই । কিন্তু কাত্যায়ন বার্তিক রমায়ণে উপস্থিত হয় । ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়াই, বার্তিক সংযুক্ত হইয়া থাকিবে ।

রেকস্য... পরোপদেশেঃ পুনানিকর্ষিতমপরসর্বপ্রতিষেধঃ । ইতিঃসহাভাষ্যঃ ।

তদনুসারে অর্ধের সর্বপ্রকার “অপগমকেই” ব্যয় বলা বাইতে পারে;— বে বিবরে ব্যয় করিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। কিন্তু অর্ধের সর্বপ্রকার “অপগমকেই” কি ব্যয় বলা বাইতে পারে? তাহাই কি আর্থাগম্যের মত ও বিশ্বাসের উৎকর্ষবিজ্ঞাপক? ইহাই কি ব্যয়শব্দের চিরপরিচিত অর্থ?

“কাত্যায়ন বলেন, তাহা নহে। কেবল “ধর্মার্থে বিনিয়োগের” নামই ব্যয়; আর সর্বপ্রকারের “অর্থাগমের” নাম অপব্যয়।* গ্রীসাজ্জাদনের জন্ত অর্থব্যয় করাও ব্যয় নহে; তাহারও নাম অপব্যয়। রামায়ণে এই পুরাতন অর্থেই ব্যয়শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

রামবনবাসের কথা ব্যক্ত হইবার পূর্বে, লক্ষ্মণ অভিষেকানন্দে নিমগ্ন হইয়া, বিবিধ রাজনিক ব্যাপারের অস্থূর্তানে ব্যাপৃত ছিলেন। সেদিন রামাহুত তক্ত ত্রাতার বড় আনন্দের দিন;—আকাশে আনন্দ-কিরণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; নগরতোরণে আনন্দবাদিত্ত বাদিত হইয়া উঠিয়াছে;—নাগরিকগণের হর্ষোৎফুল্ল বদনশৃঙ্গে আনন্দের হাতছটা উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে;—তাহাতে লক্ষ্মণের আনন্দই যেন বস্ত্রাজ্যোত্তের জ্বার দিগ্দিগন্তে প্রবাহিত। এই আনন্দ শিরিশশোভার জ্বার দেখিতে না দেখিতে বিদীর্ণ হইয়া গেল! রামচন্দ্র যখন পিতার

নিকট হইতে কোশল্যার নিকটে গমন করেন, তখন কোষে লক্ষ্মণের বাক-কৃষ্টি তিরোহিত হইয়া দিয়াছিল;—লোচনমুগ্ধ বাস্পপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল,—তিনি কেবল অভ্যাগমশব্দেই নীরবে রামচন্দ্রের অঙ্গগমন করিলেন। রামচন্দ্র তখনও সেই রামচন্দ্র,—আর্থাগম্যের আদর্শপুত্র,—শান্ত, সুধীর, সুশীল বালকের জ্ঞান অতিবেচনতাও প্রদক্ষিণ করিয়া, বিপ্রগণকে প্রণাম করিয়া, বালক-বৃদ্ধ ও পুররক্ষীগণকে সম্মিতবদনে সুসিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করিতে করিতে, ধীরপদবিক্ষেপে মাতৃভবনান্তিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কোশল্যামন্দিরে উপনীত হইবার পর, কোশল্যার আর্ন্তনাদ লক্ষ্মণকে সহসা মুখর করিয়া তুলিল। সমরোচিত উত্তেজনায় আশ্রয়গিরির গলিত গৈরিকপ্রস্রবণ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল! লক্ষ্মণ বুঝিলেন—এ সংসারে মুহূর্ত্তাব লোকেরাই পদে পদে পরাতুত হইয়া থাকুক;—“মূহূর্হি পরিতুষ্টে”! এই চিত্তহর্ষলতা পরিহার করিয়া বাহবলে সিংহাসন অধিকার করিবার জন্ত লক্ষ্মণ কত কথা বলিলেন; তাহার সকল কথা উল্লেখযোগ্য নহে! সমরোচিত বলিয়াই, সে সকল কথা কাব্যমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণকে শান্ত করিতে বিলক্ষণ আয়াস স্বীকার করিতে হইল, তাঁহাকে নানা কথায় আশ্বস্ত করিয়া, বিবরান্ত্রে ব্যাপৃত করিবার আশায়, রাম কহিলেন,—অভিষেকার্থ বে

* ব্যায়ে ধর্মার্থি বিনিয়োগ:। ১।৩।৩৩

ব্যয়শব্দে যে পুরাকালে অর্ধের সর্বপ্রকার অপগম সূচিত হইত না, কেবল “ধর্মার্থি বিনিয়োগ” বুঝাইত, তাহা প্রসঙ্গক্রমে কাত্যায়নকর্তৃক উল্লিখিত না হইলে, রামায়ণোক্ত শিরশ্রাবণের একান্তব্যর্থ গ্রহণ করা কঠিন হইত। রামায়ণের কোন টীকাকারই এই শব্দের ব্যাখ্যা করেন নাই।

দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই নিবর্তিত কর—

“সৰ্ব্বা নিবর্তয় কিংপ্রাং।”

আর কিছু না বলিলে, লক্ষ্মণ হয় ত তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে অভিষেচনভাণ্ডকেই সৰ্ব্বাশ্রে চূর্ণ করিতেন ; পূর্ণরাশি আবর্জনার মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন ;—দধিচূড় শৃগাল-কুকুরকে উৎসর্গ করিয়া দিতেন ! সেই আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য, রামচন্দ্র উপর্যুপরি ছুটি বাক্যের প্রয়োগ করিলেন ;—দ্বিতীয়বাক্য প্রথমবাক্যের ভাবমাত্র ।

“সৰ্ব্বা নিবর্তয় কিংপ্রাং।”

অর্থাৎ—

“কুরু কার্য্য নিরব্যয়ম্।”

অভিষেকের প্রয়োজন তিরোহিত হইয়াছে । বাহা অভিষেকার্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাকে নিবর্তিত কর,—বিষয়ান্তরে বিনিবৃত্ত কর ; —কিন্তু সাবধান, বাহাতে ধর্ম্মার্থে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভার কোনরূপ অধর্ম্মা ব্যাপারে বিনিবৃত্ত না হয়, সেইরূপ করিয়াই নিবর্তিত করিও । উপর্যুপরি ছুটি নিবেদ্যক উপসর্গের প্রয়োগ তির এই ভাব এত সংক্ষেপে, এত সুকোশলে, এত বিশদভাবে ব্যক্ত হইত না ।

ইহাতে লক্ষ্মণ আপাতত হঠকারিতা পরিচ্যাপ করিতেন ; কি করিতে হইবে না এবং কি করিতে হইবে, তাহার আভাস প্রাপ্ত হইতেন ; কিন্তু কেমন করিয়া আজ্ঞা-পালন করিতে হইবে, সহসা তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা ছিল না । তখন তাহার হিতাহিত-জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল,—সদস্যদ্বাখিকা বুদ্ধি বামোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল ; তিনি কেবল

ভক্ত ভ্রাতার জ্ঞান নিয়োগপালনের জন্য প্রস্তুত থাকিলেও, মনে মনে বলিতেছিলেন—

“বুদ্ধিঃ পরিত্যজতে !”

রামচন্দ্র বুঝাইয়া বলিলেন,—অভিষেক হইল না বলিয়াই যে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম নিরস্ত হইয়া গেল, তাহা নহে । অভিষেক হইল না বলিয়া, অভিষেকমূলক ধর্ম্মকর্ম্মের প্রয়োজন তিরোহিত হইল । কিন্তু বনগমনের পূর্বে কল্যাণকামনায় যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক, তাহার প্রয়োজন উপস্থিত হইল । এই কথা বুঝাইবার জন্য রামচন্দ্র পুনরপি কহিলেন—

সৌমিত্রে যোহতিসেকাৰ্ধে মম সম্ভারসম্ভারঃ ।

অভিষেকনিবৃত্তার্থে সৌমিত্র সম্ভারসম্ভারঃ । ২।২২।৫

প্রথম বাক্যের পর লক্ষ্মণ যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন । “কুরু কার্য্য নিরব্যয়ম্” এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া, কিরূপে তাহা করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া, লক্ষ্মণ যেন অন্তমনস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন । সেইজন্য, কিংকর্তব্যবিমূঢ়কে প্রবুদ্ধ করিবার আশায়, দ্বিতীয় বাক্যের আরম্ভেই রামচন্দ্র স্নেহে সন্মোদন করিলেন,—“সৌমিত্রে !” এইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া, লক্ষ্মণ বুঝিলেন—তাহাকে কি করিতে হইবে । একটিনাড়া স্নেহে সন্মোদনে এই ভাব কত পরিস্ফুট হইয়াছে !

ব্যয়শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা জানিবামাত্র রচনাকাঠিন্য দূরীভূত হইয়া যায় । না জানিলে, এমন সরল রচনাও কত কঠিন,—কত অসংবদ্ধ,—কত প্রলাপপূর্ণ বলিয়া প্রতীতাত হয় ! রামায়ণে এরূপ রচনাকাঠিন্যের অভাব নাই ।

“কৃতোবাহুঃ দেবেণ গজেন্দ্র সমরঙ্গগণম্ ।

বর্ণনাবান হুর্নবা হুতুত মহান্ননা ।” ১১৭৩১১

এই শ্লোকের “উবাহ” শব্দ অর্থবোধের
বাধা উপস্থিত করে। পাঠ করিবামাত্র
মনে হয়,—বেশে বৃষ্টি বিবাহ করিয়া
সকলগণের সহিত গমন করিবার সময়েই
ধ্বিৎ হইয়া, হুকার করিয়া উঠিয়াছিলেন।
ইহা রামায়ণোক্ত মদনভঙ্গকাহিনীর একটি
শ্লোক। আভ্যন্তের বিচার করিয়া, ইহার
মধ্যে ‘মহেশ্বরের বিবাহের কথা বাহির
করিবার উপায় নাই। উবাহশব্দ একে
কেবল বিবাহব্যাপারকেই স্মরণ করাইয়া
থাকে। ইহা উবাহশব্দের যোগার্থ নহে,
কৃত্যর্থমাত্র! এক সময়ে যোগার্থমাত্রই
প্রচলিত ছিল; তাহার সহিত কালক্রমে
কৃত্যর্থ সংযুক্ত থাকিয়া, (পরে যোগার্থ লুপ্ত
হইলে) কেবল কৃত্যর্থই প্রবল হইয়া উঠি-
য়াছে। পানিনিবুৎ “বকরণ” শব্দে বিবাহ
বুঝাইত।* এই শব্দের ব্যবহার অপ্রচলিত
হইয়া গিয়াছে। রামায়ণের রচনাকালে
উবাহশব্দে উত্থান এবং বিবাহ, এই দুইটি
অর্থই ব্যক্ত হইত। তখনও উত্থান-অর্থ
একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই বলিয়া, এই শ্লোকে
“কৃতোবাহন” বুঝাইবার ভ্রম “কৃতোবাহ”
ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাতন একেবারে
অভ্যহিত হয় নাই; নূতনও ধীরে ধীরে
অগ্রসর হইয়াছে;—রামায়ণ সেই পরিবর্তন-
বৃক্ষের গ্রহ!

“বসিহোমার্জিতা পুণ্যং ব্রজবাসিনীমাক্তিম্ ।

পুশ্পশটায়্যঃ পরিকিণ্ডং পরিত্তা চ সপদ্মরাঃ” ৩১১৬

রামলক্ষ্মণদ্বীপ দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া
যে সকল দৃশ্য দর্শন করিয়া নৈসর্গিক
সৌন্দর্য্যে পুলকিত হইয়াছিলেন, তাহার
বর্ণনা করিতে গিয়া কবিশঙ্কর এই শ্লোক
রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে “পদ্মিত্তা
চ সপদ্মরা” বলিয়া যে বর্ণনা রহিয়াছে,
তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—পদ্মিনী-
শব্দের অর্থ সরোবর,—টীকাকারও
তাহারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেবল
পদ্মিনী কেন, নলিনীশব্দও রামায়ণে কেবল
সরোবর-অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পদ্মিনী
—নলিনী—পুষ্করিণী—এই সকল শব্দের
মধ্যে কেবল পুষ্করিণীশব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে
পরিবর্তিত হয় নাই। বাহাতে পুষ্কর আছে,
তাহারই নাম পুষ্করিণী;—সরোবর;—এই
অর্থই অত্যাগি পুষ্করিণীশব্দের একমাত্র
অর্থ। কিন্তু পদ্মিনী ও নলিনী শব্দের
পুরাতন অর্থ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে!
অমরকোষে পদ্মিনীশব্দ উল্লিখিত আছে;—
তাহার অর্থ সরোবর নহে। অমরসিংহের
সময়ে সরোবর অর্থ বিলুপ্ত হইলেও, পদ্ম-অর্থ
বিকশিত হয় নাই! উত্তরকালে পদ্ম-অর্থও
পদ্মিনীশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।†

বাহাতে পুষ্কর থাকিত, সেইরূপ
সরোবরই পুষ্করিণী নামে কথিত হইত।
পদ্মিনী ও নলিনী শব্দেরও পুরাতন অর্থ

* উপাং বনঃ বকরণে। ১১৭.১৬ পাণিগ্রন্থবিশিষ্টনিহ বকরণং পুত্রে, ন বকরণমাত্রম্। তথাপি
উপকল্পতে। বকরণমিতি কিম্? সেবমন্তো বজ্রদন্তস্য ভাষ্যাসুপবচ্ছতি।” কালিকা ভূক্তির এই ব্যাখ্যায় স্তূৰ্থার্থ
স্বাক্ষত হইয়াছে। বিবাহ বুঝাইলেই উপপূর্বক বন্ধ-ধাতুর আশ্রয়ন হয়; অতঃপরে বাক্য হইত না।

† পদ্ম-অর্থে পদ্মিনীশব্দের ব্যবহার মেদিনীকোষে ও আধুনিক সংস্কৃত কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। সেই
অর্থই একে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

সেইরূপ। ক্রমে এই অর্থের পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। প্রথমে পুষ্করিণীমাজেই পদ্মিনী—নলিনী—পুষ্করিণী—নামে কথিত হইত; পরে পদ্মিনী এবং নলিনী শব্দের এই অর্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—পুষ্করিণীশব্দই প্রচলিত আছে।

“পদ্মিষ্ঠা চ সপদ্মরা”—

“পদ্মযুক্ত পদ্মিনী” বলার বুঝাইতেছে যে—রামায়ণের রচনাকালে পদ্মিনীশব্দে পুষ্করিণী বুঝাইলেও, পদ্মসরোবর বুঝাইত না; পুরাতন অর্থ কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। পদ্মিনী বলিতে পদ্মযুক্ত সরোবর বুঝাইলে, “সপদ্মরা”-বিশেষণটি পুনরুক্তিদোষের কারণ বলিয়া নিষিদ্ধ হইত! এখন যেমন পুষ্করিণী বলিতে যে-কোন সরোবরকে বুঝায়, রামায়ণের রচনাকালে পদ্মিনী বলিতে সেইরূপ যে-কোন সরোবরকে বুঝাইত; বিশেষ করিয়া বলিবার জন্যই সপদ্মরা-বিশেষণটি ব্যবহৃত হইয়াছে। পুষ্করিণী ধনন করিবার নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল; পদ্ম রক্ষা করিবারও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল;—এখন সে পরিমাণের প্রতি কৃষ্টি রাখিয়া সরোবর ধনিত হই না; অথচ লোকে তাহাকে পুষ্করিণী বলিতে ক্রটি করে না। তাহার উৎসর্গব্যাপারে সূত্রপাত করিবার সময়ে, তাহাকে পুষ্করিণীনামে অভিহিত করা যায় না বলিয়াই, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অস্ত্রাণি সকল-বাচনে জলাশয়শব্দের উল্লেখ করেন;

পুষ্করিণীশব্দের উল্লেখ করেন না। এই উৎসর্গযোজিতর মধ্যেও পুষ্করিণীশব্দের পুরাতন অর্থের আভাস প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

পদ্ম ভারতবর্ষের চিরপরিচিত পুষ্প। তাহার অনেক প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে পদ্মিনীশব্দও স্থানলাভ করিয়াছে। পদ্ম জাতিবাচক সাধারণ নাম। সকল-প্রকার পদ্মই পদ্মনামে কথিত হইতে পারে। কিন্তু খেতররক্তভেদে পদ্ম বিবিধ;—নীল-পদ্মের কথা অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা কবিকল্পিত বলিয়াই বোধ হয়। অমরকোষে দেখিতে পাওয়া যায়—

“বা পুংসি পদ্মং নলিনম্ অরধিমাং মহোৎপলম্।

সহস্রপত্রং কমলং শতপত্রং কুশেশরম্।

পদ্মেরূপং ভানরসং সারসং সরসীরহম্।

বিসপ্রস্থনরাজীবপুষ্করাতোরহাণি চ।”

টীকাকার ভাস্করীকৃত এই সকল প্রতিশব্দকে “বোড়শ পদ্মসামান্ত” বলিয়া গিয়াছেন; এবং “ষে ত্তরু কমলত” বলিয়া “পুণ্ডরীক-সিতাতোজ”শব্দের পরিচয় এমনি করিয়া, “রক্তসরোরুহ—রক্তোৎপল—কোকনদ”শব্দের ব্যাখ্যায় “ত্রিণি রক্ত-কমলত” বলিয়া গিয়াছেন। খেতররক্ত উভয় শ্রেণীর পদ্মই “কমল”নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

“কমলাস্তবরজন্তী পুষ্করাণি চ ভামিনী।” ২।৩৫।১০

অযোধ্যাকাণ্ডের এই শ্লোকটিকে কমল ও পুষ্কর শব্দ দুগুণে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ

* পুষ্করিণী একটি সুবৃহৎ সরোবর। তাহার আরতন নির্দিষ্ট ছিল। রামায়ণের রচনাকালেও পুষ্করিণীর আরতন বৃহৎ ছিল। তাহার কথা বখানানে আলোচিত হইবে। এক্ষণে যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ কত পরিবর্তনের অধীন হইয়া বর্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছে, এই প্রসঙ্গে কেবল তাহারই বৎসানান্ত পক্ষের প্রস্তাব হইল।

পার্থক্য না থাকিলে, ইহাকে পুনরুজ্জীবিত-
দোষের দৃষ্টান্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে
হইবে। টীকাকারগণ তাহা স্বীকার করেন
নাই। তাহার।

“কমলপুঙ্খের রক্তসিতপদ্মে”

বলিয়া পুরাতন অর্থের উল্লেখ করিয়া
বুঝাইয়াছেন,—রক্তপদ্মের নাম কমল; শ্বেত-
পদ্মের নাম পুঙ্খ। অমরকোষমাত্র সম্বল
করিয়া রামায়ণ অধ্যয়ন করিতে হইলে,
ইহাকে পুনরুজ্জীবিতদোষের দৃষ্টান্ত বলিয়াই
স্বীকার করিতে হইত। রামায়ণে যে সকল
বৃক্ষগতাদির উল্লেখ আছে, তাহার।ও
রামায়ণের রচনাকালক্রে সমধিক পুরাতন
বলিয়াই সাক্ষ্যদান করে। তাহার বিশেষ
বিচার বখান্নানে উল্লিখিত হইবে।

পাণিনিহ্মত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—
পাণিনিযুগের প্রচলিত সাহিত্যে শব্দার্থের
স্থানান্তর পার্থক্যবিচার প্রচলিত ছিল;
তাহা ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার
উদাহরণ “মতি” শব্দে প্রাপ্ত হওয়া যায়।
অমরকোষে দেখিতে পাওয়া যায়,—বুদ্ধি-
শব্দের চতুর্দশ প্রতিশব্দের মধ্যে “মতি”
একটি প্রতিশব্দমাত্র। পাণিনিযুগে মতি-

শব্দে কেবল সঙ্কল্পাত্মিকা বুদ্ধিই স্মৃতি
হইত। রামায়ণে সেই পুরাতন অর্থই
মতিশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বখা—

“তদর্থঃ হরমধেন যক্ষ্যামিতি মতির্মম।” ১৮।৮

এক সময়ে যে সকল শব্দে যোগার্থ-
মাত্রই ব্যক্ত হইত, উত্তরকালে তাহাতে
কেবল ক্র্যার্থ ব্যক্ত হইতেছে;—যোগার্থ
বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বৰূপে তাহার
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক সময়ে
যে সকল শব্দ কেবল ক্র্যার্থই প্রকাশিত
করিত, উত্তরকালে সেসকল শব্দের ক্র্যার্থ লুপ্ত
হইয়া যোগার্থ প্রবল হইয়াছে;—সংস্কৃত-
সাহিত্যে তাহার।ও নানা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া
যায়। এই শ্রেণীর শব্দার্থবিচারেও রামা-
য়ণের প্রাচীনত্ব স্মৃতি হইয়া থাকে।

“ইহ বর্ষসংপ্রাপ্তি বহুনি নিবসিষ্যসি।

বাততক্ষ্য নিরাহারা তপ্যন্তী ভবশাশ্বিনী।” ১।৪৮।৩০

অহল্যার প্রতি গৌতমের এই অভিশাপবাক্যে
“বাততক্ষ্য” এবং “নিরাহারা” শব্দে কিরূপ
অর্থ স্মৃতি হইতেছে, তাহার বিচার
আবশ্যক। বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে,
এই দুইটি শব্দ কিতাবে আধুনিক অভিধানে
ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার। অঙ্গুল্যদান

* পাণিনিহ্মত্রে ৩.২।১৮৮

রামায়ণে মতিশব্দ বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল স্থলেই সঙ্কল্পাত্মিকা বুদ্ধি স্মৃতি হইয়াছে; কোন কোন
স্থলে “নিশ্চিন্তা”-বিশেষণও ব্যবহৃত হইয়াছে।

“মুনিবৎসঃ সহস্রাক্ষঃ বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।

মতিশব্দকার দুর্ধেধা সেবরাজকুতুহলাৎ।” ১।৪৮।১২

এই প্রোকেও মতিশব্দ সঙ্কল্পাত্মিকা বুদ্ধিই ব্যক্ত করিতেছে। শব্দার্থের স্থানান্তর পার্থক্যবিচার উত্তরকালে
ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অমরকোষ সম্বলিত হইবার সময়ে সেসকল অর্থপার্থক্য প্রচলিত থাকিলে, মতিশব্দের
ব্যাখ্যায় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইতাম; একপার্থ্যায়কৃত্ত বিবিধ শব্দের মধ্যে যে অর্থপার্থক্য প্রচলিত ছিল, কালে
তাহা বিলুপ্ত হইবার পর, সংস্কৃতসাহিত্যের রচনা ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা
যক্ষ্যাকরনিবন্ধ, প্রাক্কল ও স্থললিত। তাহার প্রধান কারণ শব্দপ্রয়োগকৌশল। যে শব্দে যে ভাব সঙ্গোপক
স্বব্যক্ত হইতে পারে, সেই শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহাকে পরিবর্তন করিবার। রচনালালিত্য বিনষ্ট হইয়া যায়।
ইহাই কবিগুরু প্রধান দৌরব্য।

জাবতক । “শব্দকল্পদ্রুমে” বাতভক্ষ্যশব্দের উল্লেখ নাই ; নিরাহারশব্দের উল্লেখ আছে । নিরাহারশব্দ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইরাছে, যথা—

“নির্গত আহারো যত । আহাররহিতঃ ।”

যথা,—

“নিরাহারাক্ষ যে জীবাঃ পাশে ধর্মে রতাক্ষ যে ।”

— ইতি তর্পণপ্রকরণীয়াত্মিকারমৃতবচনম্ ।

ইহাই কি নিরাহারশব্দের প্রকৃত অর্থ ? ইহাই প্রকৃত অর্থ হইলে, অহল্যার পক্ষে শাপাত্তকাল পর্যন্ত জীবনধারণের সম্ভাবনা থাকে না ; অতুতপ্ত হইবার পক্ষেও অধিক অবসর উপস্থিত হয় না ! রামায়ণের টীকার কিছ্র এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । যথা—

“নিরাহারো অন্নপানাদিরহিতা ।”

এরূপ অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ আছে । এরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে, পদ্মপুরাণের অহল্যাকাহিনীর সহিত রামায়ণের অহল্যাকাহিনীর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না । রামায়ণের অহল্যা মানবী—ভদ্রশারিনী—প্রারচিত্তচারিণী ! পদ্মপুরাণের অহল্যা পাবাগী,—একেবারে অভূপিণ্ড ! নিরাহারো বলিতে আহাররুদ্ধতা বুঝাইলে, পৌরাণিক কাহিনী খণ্ডিত হইয়া যায় ! যে পাবাগী, তাহার আবার আহার কি, আহাররুদ্ধতাই বা কি ? সুতরাং উত্তর কাহিনীর সামঞ্জস্য-

রক্ষার্থ টীকাকার নিরাহারশব্দে অনাহারই ধরিয়া লইয়াছেন ।*

রামায়ণে বাতভক্ষ্য ও নিরাহার শব্দ অনেকবার ব্যবহৃত হইরাছে । সকল স্থলেই এই সকল শব্দ সংজ্ঞাশব্দরূপে ক্লান্ত্যর্থ প্রকাশিত করিতেছে ; কোন স্থলেই বোগার্থ প্রকাশিত করিবার ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় নাই ।

“স হি তেপে তপতীত্রঃ বাওকর্ষির্মহামুনিঃ ।

, ৭ম বর্ষমহত্যাগি বায়ুভক্ষ্যো জলাশয়ে ।” ৩।১১।১২

তথাহি—

“মুনয়ঃ সলিলাহারো বায়ুভক্ষ্যাস্তথাপরে ।:

আকাশনিলম্রাশ্চৈব তথা হৃদিলশারিনঃ ।” ৩।৬।৪

এই সকল শ্লোকেও ক্লান্ত্যর্থ প্রকাশিত হইতেছে । সে অর্থ কালক্রমে বিলুপ্ত হইবার পর আধুনিক অর্থ প্রচলিত হইয়া থাকিবে । নিরাহারশব্দে যে অনাহার বুঝাইত না, তাহার একটি সুপরিচিত উদাহরণ—

“নিরাহারো যতাহারো”

নিরাহারশব্দে অনাহার বুঝাইলে, এই দুইটি বিশেষণ একত্র ব্যবহৃত হইতে পারিত না । রামায়ণের ভ্রাতৃ মহাতারতেও এই শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হইরাছে । মহাতারতের সুবিখ্যাত টীকাকার নিরাহারশব্দের ব্যাখ্যায় পুরাতন অর্থেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ।

“বায়ুভক্ষ্যো নিরাহারঃ শুভ্যন্ননিমিষো মুনিঃ ।

ইত্যন্ততঃ পরিচরন্ দীপ্তপায়কসম্রতঃ ।” ১।১৩।১৪

মহাতারতের এই শ্লোকে একজন মুনিই

* “এক ব্যক্তকরা বায়ুকিচরনে হ্রিতে শৈলী ভবেতি শাপো রামপাদস্পর্শাৎ শিলাবহুভিরিতি পুরাণকথা কল্যাণরমসুভ্যতা ইতি বোধাম্ ।” ইতি ভূতপ-টীকা ।

রামায়ণের টীকাকারগণ রামায়ণসম্প্রদায়ভুক্ত—রামায়ণরক্ত । তাঁহারা সাম্প্রদায়িক-মতসংস্থাপন-কামবার বসম্প্রদায়ভুক্ত পাঠকগণের চিত্তবিনোদনের জন্য টীকা রচনা করিয়াছিলেন । তাহাতে অনেক শব্দার্থই স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যায় অধীন হইরাছে । নিরাহারশব্দে অনাহার বুঝিলে, পুরাণকথার সহিত সামঞ্জস্যকার চেষ্টা করা যায়—এই পথত লিখিয়াই টীকাকার পরিতুষ্ট হইয়াছেন ; নিরাহারশব্দের অন্য কোন অর্থ আছে কি না, তাহার পয়স্ধান করেন নাই । মহাতারতের টীকাকার এরূপ সাম্প্রদায়িক সর্পিণ্ডতার পরিচয় প্রদান করেন নাই ।

বায়ুভক্ষ্য এবং নিরাহার বলিয়া কথিত হইয়াছেন; তিনিই আবার ইতস্তত “পরিচরণ” করিতেন বলিয়া উল্লিখিত। নিরাহার-শব্দে অনাহার বুঝাইলে, এরূপ বর্ণনা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠিত। যিনি বায়ুমাত্র আহার করেন, তিনি নিরাহার বলিয়া কথিত হইতে পারেন না; তাঁহার পক্ষে ইতস্তত “পরিচরণ” করিবারও প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। মহাত্মার্তের সুবিজ্ঞ টাকাকার সেক্ষপ অসম্ভবত বাখ্যার অবতারণা করেন নাই। তিনি এই সকল শব্দকে পারিত্যাহিক-অর্থ-বিজ্ঞাপক সংজ্ঞাশব্দরূপেই ব্যাখ্যাত করিয়া গিয়াছেন; তাহাতেই ব্যাসবিরচিত মহাকাব্যের প্রকৃত মর্ম্ম সুব্যক্ত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ বলেন,—“যিনি দেহস্থ বায়ুসকলকে জ্বর করিয়াছেন, তাঁহার নাম বায়ুভক্ষ্য।” “যিনি বিলাসভোগ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন”—এমন কি, প্রাণধারণের জন্তও কোন জ্বরের “আহরণ” করেন না,—“তাঁহারই নাম নিরাহার।” তিনি ভোজন-কালে ইতস্তত “পরিচরণ” অথাৎ “যথাপ্রাপ্ত ভোজ্যজ্বা গ্রহণ করিয়া থাকেন।” এই অর্থ গ্রহণ করিলে, রামায়ণে এবং মহাভারতে

ব্যবহৃত এই সকল শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়া গেল। গ্রহণ না করিলে, প্রতিপদে অসঙ্গতির মধ্যে নিপতিত হইতে হয়।*

ভোজ্য এবং ভোগ্য নামক দুইটি শব্দ বঙ্গসাহিত্যেও সুপরিচিত। কাহাকে ভোজ্য বলিব, কাহাকেই বা ভোগ্য বলিব, তাহার অনুশাসন ব্যক্ত করিবার জন্ত পাণিনি একটি সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় পর্য্যন্ত বে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহার রচনারীতির আলোচনা করিয়াই এই সূত্র বিরচিত হয়। সূত্রটি এই—

“ভোজ্যঃ ভক্ষ্যে।” ৭।৩।৩০

ভোজ্য এবং ভোগ্য এই উত্তর শব্দই উপভোগার্থ ব্যক্ত করে। উপভোগের উপায় ও প্রকার ভেদে কোন জ্বা বা বিষয় ভোজ্য নামে, কোন জ্বা বা বিষয় ভোগ্যনামে কথিত হয়। পাণিনি বলেন,—বাহা ভক্ষ্য, তাহাকেই ভোজ্য বলা হয়; বাহা ভক্ষ্য নহে, তাহা ভোগ্য।

ভোজ্য বুঝাইবার জন্ত ভক্ষ্যশব্দের ব্যবহার করার, কাব্যায়ন পাণিনির দোষ-প্রদর্শনের চেষ্টার বলিয়াছিলেন;—এখানে ভক্ষ্য ন; বলিয়া, “অভ্যবহার” বলিতে

* বায়ুভক্ষ্যো জিতপবনঃ। আহরণম্ আহারঃ, বিষয়ভোগঃ, তচ্ছন্যো নিরাহারঃ। অমিমেহো জিতনিরঃ। ইতস্ততো বুদ্ধাদিত্যঃ দীর্ঘঃ পর্ণাদিকঃ পরিত্তঃ কালে সর্ব্বদা চরন অজন্। ইতি নীলকণ্ঠঃ।—মহাভারতের সুবিজ্ঞ টাকাকার এই লোকের ব্যাখ্যায় পুরাতন কৃচ্ছ সাধনের নিয়ম স্মরণ করিয়াই, পারিত্যাহিক অর্থের সন্ধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যাপবাসশব্দে যে আদৌ উপবাস বুঝাইত না, কেবল আহারসংযমে একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি স্থচিত করিত, মহাভারতেই তাহার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মবাক্যে ভীষ্মদেব এই শব্দের পারিত্যাহিক অর্থই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বধা—

“অন্তরা প্রাতরাশক সায়মাশং তথৈব চ।

সন্ধ্যাপবাসী স ভবেৎ যো ন ভুংক্তেহন্তরা পুনঃ।” শান্তি ২২।১০

এই সকল প্রমাণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—উপবাস, নিরাহার ইত্যাদি শব্দ পারিত্যাহিক অর্থই ব্যক্ত করিত, তাহাদের যোগার্থ গৃহীত হইত না। উত্তরকালের আখ্যসমাজ যোগার্থ গ্রহণ করিয়া, নানারূপ মিথ্যুর দেশাচার প্রবর্তিত করিয়াছে।

হইবে; বাহ্যিক অভ্যবহারের পলায়ন-
করণ করিতে হয় না, তাহাকে ভক্ষ্য বলা
সঙ্গত ।*

কাত্যায়নের এই বার্তিক সুসঙ্গত হইলে,
“অবভক্ষ্য,” “বায়ুভক্ষ্য” ইত্যাদি কথা অশিষ্ট
হইয়া পড়ে । কারণ তাহাতে অভ্যবহার
নাই । পতঞ্জলি ইহা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া,
কাত্যায়নের বার্তিককে সমীচীন বলিয়া
স্বীকার করেন নাই । তিনি “অবভক্ষ্য-
বায়ুভক্ষ্য”-শব্দের উল্লেখ করিয়াই বলিয়া
গিয়াছেন—ভোজ্য এবং ভক্ষ্যের মধ্যে
পার্থক্য নাই ।

ত্রিাণিব্যাকরণের এই বিচারবিতর্কের
মধ্যেই ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া
রহিয়াছে । পাণিনিযুগে ভোজ্যশব্দ
ভক্ষ্যার্থেই ব্যবহৃত হইত; তখনও ভক্ষ্য
বলিতে কেবল অভ্যবহারকেই বুঝাইত না ।
কাত্যায়নযুগে এই অর্থ কিয়দংশে পরিবর্তিত
হইয়াছিল । পতঞ্জলি তাহা স্বরণ করিয়া,
দৃষ্টান্তের উল্লেখে কাত্যায়নের বার্তিকের
সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন । কাত্যায়নের
সময় হইতেই যে বায়ুভক্ষ্যশব্দের রূঢ়ার্থ
বিলুপ্ত হইয়া তাহাতে অনাহার সূচিত
হইতে আরম্ভ করে, তাহাই সুব্যক্ত হই-
তেছে । রামায়ণের বাততক্ষ্য ও নিরাহার
শব্দে অনাহার বুঝাইলে, রামায়ণকে কাত্যা-
য়নযুগের গ্রন্থ—বা তাহারও পরবর্তী
সাহিত্যযুগের গ্রন্থ—বলিয়া স্বীকার করিতে
হইত । কিন্তু রামায়ণে ও মহাভারতে এই
সকল শব্দ বেতাবে ব্যবহৃত হইয়াছে,

তাহাতে এই সকল শব্দের অনাহার-
বিজ্ঞাপক আধুনিক অর্থ গ্রহণ করা যায় না ;
তাহাতে মহাকবির রচনা অসঙ্গত ও দোষ-
দুষ্ট হইয়া পড়ে ।

রামায়ণের রচনাকালে ভোজ্য এবং
ভক্ষ্য শব্দের পুরাতন প্রয়োগরীতির পরি-
বর্তন প্রবর্তিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া
যায় । তখনও পুরাতন একেবারে বিলুপ্ত
হয় নাই; নূতন আসিয়া সম্পূর্ণরূপে পুরা-
তনের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই ।
পাণিনিযুগে যাহা ভক্ষ্য, তাহাই ভোজ্য
বলিয়া কথিত হইত; কাত্যায়নযুগে কেবল
অভ্যবহারের বোধ্য পদার্থই ভক্ষ্য বলিয়া
কথিত হইত । সুতরাং পাণিনিযুগে ভোজ্য-
ভক্ষ্যের অর্থপার্থক্য ছিল না; কাত্যায়নযুগে
অর্থপার্থক্য প্রচলিত হইয়াছিল ।* ইহা
অবশ্যই সহসা সংঘটিত হয় নাই । যখন এই
পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়, তখন কিছুদিন
উভয় প্রয়োগরীতিই প্রচলিত ছিল । পরে
পুরাতন বিলুপ্ত হইয়া, নূতন প্রবল হইয়াছে ।
রামায়ণ সেই পরিবর্তনযুগের গ্রন্থ ।

“ব্রাহ্মণ্যবসনধাশ্চিব কৰ্ত্তব্যঃ শতশঃ স্তভাঃ ।

ভক্ষ্যায়নপানৈবহৰ্ভিঃ সমুপেতাঃ অনিষ্ঠিতাঃ ॥” ১।১৩।১০

এই শ্লোকে ভক্ষ্যশব্দে অন্ন এবং পানীয়
তুল্যভাবে বিবক্ষিত হইয়াছে;—অন্নও
ভক্ষ্য, পানীয়ও ভক্ষ্য ।

“স দূরে চাশ্রমং গতা তাড়কেরমুপাগমং ।

মারীচেনাচ্চিত্তে রাজা ভক্ষ্যভোজ্যৈরমাহুযৈঃ ॥” ৩.৩১।৩৬

এই শ্লোকে, পার্থক্যসূচনার্থ ভোজ্য এবং
ভক্ষ্য উভয় শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে । রামা-

* ভোজ্য এবং ভোজ্য এই দুইটি প্রচলিত শব্দের প্রয়োগরীতি বিচার করিবার জন্যই পাণিনিযুগে রচিত
হইয়াছিল । অন্যদিকে ভক্ষ্যশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে নাই

রণে এরূপ প্রয়োগের অভাব নাই। এই সকল প্রয়োগের তুলনার সমালোচনা করিলে, শকার্ধের ক্রমবিবর্তনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাহ্যল্যভয়ে অধিক উদাহরণ উদ্ধৃত হইল না।

“চিত্রাশট্টাপদাকারং বরনারীগণায়ুতাম্।” ১।৫।১৬

সর্বরত্নসমাকীর্ণং বিমানগৃহশোভিতাম্।” ১।৫।১৬

অবোধাবর্ণনার এই শ্লোকে যে বিমানশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে পুরাকালের অট্টালিকারচনারীতির একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষণ প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। বিমান-শব্দের পুরাতন অর্থ—সপ্তভূমিগৃহ—তাহা “বালুকনির” নামে সেকালের অট্টালিকার শোভাবর্দ্ধন করিয়া, সমুন্নত রচনারূপের পরিচয় প্রদান করিত। নিম্নলিখিত বিমান-শব্দের দুইটিমাত্র অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

“বিনোদিত্য যোমবানে সপ্তভূমৌ চ সন্নমি।”

গৃহের “সপ্তভূমি” এবং দেবদান, এই উভয় পদার্থই বিমানশব্দে ব্যক্ত হইত। অমর-কোষে কেবল যোমদানই বিমানশব্দের একমাত্র অর্থ বলিয়া উল্লিখিত।

“তত্র নানাশ্রকারেণ বিমানেন বলকৃতাঃ।

স্পর্শমানাতদাত্তোক্তং নিম্নে। সর্বপার্শ্বিবাঃ।” ১।১৮।১২৬

তথা—

“তানি ভগ্নবিমানানি নিপেতুং শক্তলে।” ৫।৫৪।২০

এই সকল স্থলে, বিমানশব্দে সপ্তভূমিগৃহই ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ রামায়ণের শকার্ধবিচারে প্রবৃত্ত হইলে, রামায়ণের রচনাকাল যে কত পুরাতন, তাহা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শকার্ধের পরিবর্তন সহসা সংঘটিত হয় না; সুতরাং শকার্ধবিচারের ক্রেশমীকার করিলে, পরিশ্রম ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা নাই। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করা যায়, অল্প কোন উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

তীর্থযাত্রী।



হে অদৃষ্ট হে সুদূর সুন্দর আমার,
পরম আকাজ্ঞা তুমি অন্তরমাবার।
তোমা-পানে লক্ষ্য রাখি শান্তনব্রহ্মিণী
বিরহ অতৃপ্তিঃখ চলেছি বহিরা—
দূরন্তীর্থযাত্রি-সম মহাপ্রাকৃততার
চলেছি বহিরা যেন আনন্দ অপার।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বঙ্গদর্শন ।

ঈশ্বর ও পূর্বমীমাংসা ।

আমাদের প্রসিদ্ধ ছয়টি দার্শনিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈদান্তিক ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বর স্বীকার করিবার দুইটি প্রয়োজন দেখা যায় ; প্রথম—জগতের উৎপত্তিসম্বন্ধে, • দ্বিতীয়—বেদের প্রামাণ্য-রক্ষা + । নৈয়ায়িকেরা বেদের প্রামাণ্য-রক্ষার জন্য ঈশ্বরস্বীকার করেন না : অগৎ • নির্ধারণ করিবার জন্য । ‡ পাতঞ্জলমতে পূর্বোক্ত প্রয়োজনদ্বয়ের একটিও নহে, কিন্তু সমাধিসাধনের জন্য § কাপিল বা সাংখ্যাবিদগণের মতে ঈশ্বরসিদ্ধির প্রমাণই পাওয়া যায় না • • । পূর্বমীমাংসক-মতে ঈশ্বরের কোন প্রমাণ নাই এবং তাঁহার কোন প্রয়োজনও নাই ।

পূর্বমীমাংসকগণ কোন যুক্তি ও তর্কবলে ঈশ্বরের অপলাপ করিয়াছেন, দর্শনপ্রিয় পাঠকগণের কৌতূহলনিবারণ জন্য, বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই নাতিবিস্তররূপে নিবদ্ধ হইবে ।

ঐ সমস্ত যুক্তিতর্ক প্রদর্শনের পূর্বে আনাদিগকে সংক্ষেপে একটি কথায় আলোচনা করিয়া লইতে হইবে* । কেহ কেহ বলেন, মীমাংসকেরা ঈশ্বর স্বীকারই করিয়া থাকেন, অস্বীকার করেন না । পূর্বস্বলোনিবাসী পরমশ্রদ্ধাল্পদ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ভাষ্যপঞ্চানন মহাশয়ও স্বকৃত মীমাংসা-ভাষ্যপ্রকাশের টীকায় এই মতই প্রকাশ

* “জম্মাদাত্ত বতঃ” বেদান্তবর্ণন, ১অ, ১পা, ২২ ও বৈশেষিকদর্শনের প্রশস্তপাদকৃত ভাব্যের নৃসিংহায়-প্রক্রিয়া জটব্য ।

+ “শাস্ত্রযোনিব্যাং” (বেদান্তবর্ণন, ১অ, ১পা, ৩২) “তদ্বচনাদান্যায়ন্ত প্রামাণ্যম্” (বৈশেষিকদর্শন, ১অ, ১আ, ৩২) ।

‡ “অপোপাদেশঃ শব্দঃ” (ভাষ্যবর্ণন ১অ, ১আ, ৭২) এই সূত্রদ্বারা আপোপাদেশহেতুই শব্দের প্রামাণ্য, ইহা বুঝা বাইতেছে : “মন্ত্যদ্বৈবদ্যপ্রামাণ্যবক্ত তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যং” (ভাষ্যবর্ণন ২অ, ১আ, ৬৮ ২২) এই সূত্রদ্বারাও ঐ কথা পাওয়া বাইতেছে । “আপ্তাঃ সাক্ষাৎকৃতধর্মণঃ”—বাৎস্তায়নের এই কথায় বুঝিরাই “আপ্ত” বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । অতএব এই • • • বুঝিরা উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া বেদের প্রামাণ্য । পূর্বোক্ত সূত্রদ্বয়ের বাৎস্তায়নভাষ্য জটব্য ।

§ “ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাকল্যাদর্শনাৎ”, “তৎকারিত্বাদবাহতুঃ” ইত্যাদি (ন্য। দ-৪অ, ১আ, ১২—২১) যেরূপ ঈশ্বরের জগৎকর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

§ “ঈশ্বরপ্রতিপাদনং”, যোগবর্ণন, ১পা, ২৩ ২২ : “পৌচসভোবতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রতিপাদনানি নিরূপাঃ” ২পা, ৩১ ২ ।

* * “ঈশ্বরাসিদ্ধোঃ”, “সুতবন্ধুরায়নাত্মভাবার তৎসিদ্ধিঃ”, ইত্যাদি সূত্র জটব্য (সা. দ-১অ, ৯২—৯৩) ।

করিয়া গিয়াছেন। অতএব এ কথাটা
পরিকার করিয়া লওয়ার দরকার।

লৌগিকভিত্তকবিরচিত মীমাংসার্ব-

সংগ্রহে লিখিত আছে—

“ঈশ্বরার্ণববুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্ত (ধর্মঃ) নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।”

আপোদেবপ্রণীত মীমাংসাত্তারপ্রকাশেও
এই কথাই আছে—

“ঈশোবিশ্বার্ণববুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্ত (ধর্মঃ) নিঃশ্রেয়স-
হেতুঃ।”

ঐযুক্ত ভারতপকাননমহাশয় ইহাই
স্ববিশ্ববন করিয়া এবং জৈমিনিযুজ্ঞে ও শবর-
যুজ্ঞে—
অর্থ—সংস্কৃতপ্রত্যাখ্যান
কৃত ভাবো স্পষ্টবাক্যে।
দেখিতে না পাইরা মীমাংসকমতেও ঈশ্বর
স্বীকৃত হয় বলিয়াছেন।

অতঃপক্ষে আমরা বেদান্তদর্শনের তৃতীয়
অধ্যায়ে দেখিতে পাই, বাদরায়ণ প্রথমে “কল-
মত উপপত্তেঃ” (২পা, ২৮ হ্র) এই সূত্রদ্বারা
“ঈশ্বরই কর্মকলদাতা”—নিজের এই মত
সংস্থাপিত করিয়াছেন; তদনন্তর ‘কর্মই
কর্মের কলদান করে, ঈশ্বর নহেন’—জৈমি-
নির এই মত “ধর্মঃ জৈমিনিরতএব” (৩অ,
২পা, ৪০ হ্র) এই সূত্রদ্বারা উপস্থাপিত করিয়া
“পূর্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ” (৩অ,
২পা, ৪১ হ্র) এই সূত্রে বুদ্ধিদ্বারা খণ্ডিত
করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে
যে, জৈমিনি ঈশ্বরস্বীকার করেন না।
শঙ্করাচার্য্য পূর্বোক্ত ব্যাসসূত্রগুলির ঐক্যপই
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতঃস্ত উপনিষদের
ভাবোও তিনি বলিয়া গিয়াছেন ‘যে, মীমাং-
সকেরা ঈশ্বরস্বীকার করেন না। দৃষ্টান্তরূপে
বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ উপস্থিত করিতে পারা
যায়; যথা—

“তথাচ ভারবিনঃ সাধ্যামীমাংসকাবরোহিসসোরিণঃ
(ঈশ্বরত) অত্যাং যুক্তিপতৈঃ প্রতিপাদয়ন্তি।”

২য় অধ্যায়, ঐশ্বর্য্যব্রাহ্মণ।

ঐমতঃগবত প্রভৃতি পুরাণ হইতেও
এ কথা প্রমাণিত করিতে পারা যায়।
ব্যাকটাক্ষরিকৃত বিখণ্ডপাদর্শেও এই মত দেখা
যায়। বাহুল্যভয়ে আমরা সে সমস্ত উদ্ধৃত
করিতে পারিলাম না।

এদিকে মীমাংসকদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলে তাহাদের মতে ঈশ্বর নাই বলিয়াই
উত্তর পাই। কুমারিলভট্টের শ্লোকবার্ত্তিকে
ও পার্শ্বসারথিমিশ্রের শাস্ত্রলীপিদ্ধার ঈশ্বরের
প্রাচ্য হইয়াছে।
অভাববিষয়ে বহু বুক্তি ও তর্ক দেখিজে
পাওয়া যায়। নিয়ে আমরা প্রধানত এই
দুই গ্রন্থ হইতেই তাহা উদ্ধৃত করিব।
শবরস্বামী স্পষ্টবাক্যে “ঈশ্বর নাই” এ কথা
না বলিলেও বলিয়াছেন—

“তন্মাৎ (পূর্বপ্রদর্শিতাৎ) কারণানবগচ্ছামো
ন কৃত্বা সমকঃ ব্যবহারার্থং কেনচিৎবেদাঃ প্রণীতা ইতি।”

‘সেইজন্য আমরা জানিতেছি যে,
ব্যবহারসিদ্ধির জন্য শব্বের সহিত অর্থের
সম্বন্ধ করিয়া কেহ বেদসকল প্রণয়ন করে
নাই।’

বেদান্তী প্রভৃতি দার্শনিকের মতে বেদ
নিত্য নহে, তাহা ঈশ্বরনামে প্রসিদ্ধ পরম-
পুরুষ দ্বারা বিরচিত। শবরস্বামী পূর্বোক্ত
কথাদ্বারা তাহাই খণ্ডিত করিয়া বলিয়াছেন
যে, বেদ কেহ রচনা করে নাই। হিন্দু
‘দার্শনিকগণ প্রধানত দুই কারণে ঈশ্বর-
স্বীকার করেন—প্রথম জগৎসৃষ্টি, দ্বিতীয়
বেদপ্রণয়ন। মীমাংসকেরা সৃষ্টিপ্রণয়
স্বীকার করেন না, সুতরাং সেজন্য ঈশ্বরের

অপেক্ষা নাই; বেদও তাঁহাদের মতে নিত্য (নিরে কিছুকিৎ সৃষ্টি প্রদর্শিত হইবে)। অতএব সেজন্যও ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। জৈমিনিও “ঔৎপত্তিকস্ত শব্দস্ত অর্থেন সম্বন্ধঃ” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বেদের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়া ভঙ্গীতে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন নাই। কুমারিলভট্ট প্রভৃতি বেদের এই নিত্যত্ব আরও বিশদরূপে স্থাপন করিতে গিয়া সূত্রকার ও ভাষ্যকারের সৃচিত ঈশ্বরাত্মব সৃষ্টিদ্বারা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

লৌগাঙ্কিভাস্কর ও আপোদেবের উদ্ধৃত ব্যাকরণের এই তাৎপর্য যে, কামনাপূর্বক ধর্ম অমুষ্ঠান করিলে তাহা দ্বারা সংসারবন্ধন এবং কামনাশূন্য হইয়া অমুষ্ঠান করিলে তাহা সৃষ্টির জন্ত হয়। বার্তিককার বলিয়াছেন—

“প্রার্থমানঃ কলং জাতং ন চানিচ্ছোভবিষ্যতীতি ।”

মীমাংসাকোষাবৃত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপণবিহার, ১১১ শ্লোক। পার্শ্বসারথিমিশ্রও তাঁহার ভ্রাতৃরত্নে নিম্নলিখিত গীতার বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমর্থন করিয়াছেন—

“অনামিতঃ কর্তৃকলং কার্য্যং কর্তৃ কয়োতি যঃ” ইত্যাদি।

এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা আমরা প্রবন্ধের উপসংহারে বলিব।

ঈশ্বরের কথা মীমাংসানর্শনে এই প্রসঙ্গে উঠিয়াছে :—অগ্নিহোতাদি বাগ ধর্ম ও হিংসাদি অধর্ম, ইহা কেবল বেদই আমাদের কাছে বলিয়া দিতে পারেন। অতএব ধর্মার্থার্থে বেদই একমাত্র প্রমাণ, অন্য প্রমাণের এখানে গতি নাই। বেদার্থমীমাংসার জন্তই জৈমিনীয়দর্শনের ঔৎপত্তি, অতএব বেদের প্রামাণ্যই এই দর্শনের প্রামাণ্য।

বেদের প্রামাণ্য না থাকিলে জৈমিনীয়দর্শনেরও প্রামাণ্য থাকিবে না। এইজন্য পরমর্ষি জৈমিনি “চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ” (মী. দ. ১ অ, ২ সূ) এই সূত্রে ‘এক বেদই ধর্মে প্রমাণ’ ইহা সামান্তরূপে বলিয়া ও “তত্ত নিমিত্তপরীক্ষিঃ” (১ অ, ৩ সূ) এই সূত্রে ‘বেদই যে ধর্মে প্রমাণ, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত’ ইহা কহিয়া “ঔৎপত্তিকস্ত শব্দস্ত অর্থেন সম্বন্ধঃ” ইত্যাদি (১ অ, ৪ সূ) সূত্রদ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া অব্যাহতরূপে বেদের প্রামাণ্য রক্ষা করিয়াছেন; এবং ইহার মধ্যে শব্দের সহিত অর্থের নিত্যসম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইয়া ঈশ্বরকেও অসিদ্ধ করিয়াছেন।

মীমাংসকদিগের অতিপ্রায় এই— শব্দ উচ্চারণ করিলে অর্থের জ্ঞান হয়, অতএব শব্দ জ্ঞাপক ও অর্থ জ্ঞাপ্য। স্তূতরাং শব্দ ও অর্থের মধ্যে জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকলক্ষণ সম্বন্ধ। এখন দেখিতে হইবে, শব্দার্থের এই সম্বন্ধটিকে কোন পুরুষে স্থাপিত করিয়াছে কি না?—অর্থাৎ তাহা পুরুষকৃত— পৌরুষেয়, বা স্বাভাবিক। শব্দার্থের এই তত্ত্বটি নির্ণীত হইলে বেদেরও প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য নিশ্চিত হইবে; কেন না, বেদ শব্দময়, অর্থের সহিত ঐ শব্দের সম্বন্ধ আছে। এখন এই সম্বন্ধ যদি পুরুষকৃত—পৌরুষেয় হয়, তবে পুরুষের স্বভাবমূলত ভ্রমপ্রমাদাদিদোষের সম্ভাবনা থাকায় বেদের প্রামাণ্য নিরবস্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। অতএব ঐ সম্বন্ধটি পৌরুষেয় কি স্বাভাবিক— অপৌরুষেয়, তাহার নির্ণয় আবশ্যক। এখন যদি ঐ সম্বন্ধটিকে পৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার

করা যায়, তবে সেই সম্বন্ধকারী পুরুষ সাধারণ মানব হইতে পারেন না, এইজন্য কোনপ্রকারে ঈশ্বরকে স্বীকার করিলেও করিতে পারা যাইত; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ অপৌরুষেয়—স্বাভাবিক—নিত্য; বেদের সহিত তদর্থের সম্বন্ধও এইপ্রকার, ইহা ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ঈশ্বর স্বীকার করিতে পারা যায় না। তার পর, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তরূপে ঈশ্বর থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাও হইতে পারে না; কেন না, সৃষ্টি বা প্রলয় নামে কিছু আছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে—শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যদি স্বাভাবিক হয়, তবে শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্রই সকল শব্দের অর্থ-প্রতীতি হওয়া আবশ্যক; কিন্তু বস্তুত তাহা হয় না; শব্দ উচ্চারিত হইলেও, অনেক সময়ে অর্থবোধ হয় না। তার পর দেখিতে পাওয়া যায়, বক্তা যদি বলিয়া দেয়—অনুক শব্দের অনুক অর্থ, তখন অর্থবোধ হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বক্তা শব্দের সহিত স্বয়ং অর্থের সম্বন্ধ করিয়া ঐ শব্দ উচ্চারণ করে। অতএব শব্দার্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বলা যায়—‘অনুক শব্দের অনুক অর্থ’ ইহা বলিয়া বক্তা স্বয়ং শব্দার্থের সম্বন্ধ করে না; কিন্তু পূর্ক হইতেই প্রসিদ্ধ সম্বন্ধকে বলিয়া দেয় মাত্র। এইজন্যই, যদি কেহ গো-পদের অর্থ অশ চান, তবে তাঁহাকে অপর ব্যক্তি নিবেদ করিয়া বলে—‘না, গো-

পদের অর্থ অশ নহে।’ যদি পুরুষ স্বয়ং শব্দার্থের সম্বন্ধকর্ত্তা হইত, তবে সে যে পদের যে অর্থ মলিত, সে পদের তাহাই অর্থ হইত। এই নিয়মানুসারে গো-পদের অর্থও অর্থ হইতে পারে; কিন্তু বস্তুত তাহা হয় না। শব্দার্থ-সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইলেও কখন-কখন উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই শব্দের অর্থবোধ না হইতেও পারে; কারণ শব্দার্থসম্বন্ধ জাত হইয়াই অর্থের বোধ উৎপাদন করে; বতকণ ঐ সম্বন্ধ জাত না হয়, ততকণ অর্থবোধ হয় না। অতএব যে ব্যক্তি যে শব্দের সহিত তদর্থের সম্বন্ধ জানে না, তাহার সেই শব্দের যে অর্থবোধ হইবে না, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

আর এক কথা—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের মধ্যে এতাদৃশ কোন কাল নাই, বধন কোন শব্দের সহিত তদর্থের সম্বন্ধ ছিল না। যদি তোমার মতে থাকে, তবে তোমারই অভিলষিত শব্দার্থের সম্বন্ধকরণ হইতে পারে না। কেন না, বধন কেহ কোন শব্দের সহিত কোন অর্থের সম্বন্ধ করিবে, তখন তাহাকে অবশ্যই ঐ সম্বন্ধ কোন শব্দদ্বারা করিতে হইবে;—যে-কোন শব্দ উচ্চারণ না করিয়া কাহাকেও বলিয়া দিতে পারিবে না যে, অনুক শব্দের অনুক অর্থ। এখন এই সম্বন্ধকারী পুরুষ যে শব্দদ্বারা একটি শব্দের সহিত একটি অর্থের সম্বন্ধ করিল, সেটি শব্দের সহিত তাহার অর্থের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা করিবার জন্য অবশ্য একটি শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল; আবার এই শব্দের অর্থসম্বন্ধ করিতে আর একটি শব্দ আবশ্যক হইয়াছিল; এইরূপ বলিলে অবসরহানোব

আদিয়া পড়ে—একটির পর একটি, তার পর জড়টি, এইরূপে আমরা কোনপ্রকারেই কোন একটি শেষস্থানে উপস্থিত হইতে পারি না। এই দোষ নিবারণের জন্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ বাতাবিক। এ বিষয়ে কুমারিলভট্ট শ্লোক-বার্ত্তিকের ‘সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার’নামক অংশে বহুপ্রকার বিচারভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে অনাবশ্যকবোধে আমরা সে সমস্ত প্রদর্শন না করিয়া, কেবল ঐ সম্বন্ধ যে ঈশ্বরকৃত নহে, তাহাই উদ্ধৃত করিব; কেন না, এই প্রশ্নেই ঈশ্বরের সম্ভাব্য নিষিদ্ধ হইরাছে।

ঈশ্বরবাদিগণ বলেন—সৃষ্টির আদিসময়ে ভগবান্ সর্ব্বশ্রুতি প্রজাপতি স্বাবরজমরুপ জগৎ ও ধর্ম্মার্থস্বরূপ সৃষ্টি করিয়া এবং ব্যবহার-সিদ্ধির জন্ত শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত কৃতসম্বন্ধ শব্দদ্বারা বেদ রচনা করিয়া য়রীচি প্রকৃৃতিকে প্রদান করেন; যথা—

“প্রজাপতির্বা ইমমেক এবাং আগাং”;

প্রজাপতির্বৈদ্যানস্বয়ং” ইত্যাদি।

অতএব শব্দার্থসম্বন্ধ বাতাবিক হইতে পারে না।

সীমাংসকগণ ইহার উত্তরে বলেন—সৃষ্টির ‘আদিসময়’ নামে কোন সময় আছে বলিয়া কল্পনাই করিতে পারা যায় না, তাহার নির্ণয় ত হুয়ের কথা। তুমি* যে সর্ব্বশ্রুতি প্রজাপতির উল্লেখ করিতেছ, সে সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন? তাহার আধার কি ছিল? তখনও ত পৃথিবী প্রকৃতির সৃষ্টি হয় নাই, বাহাতে তিনি থাকিতে পারিতেন। সে

সময়ে তাহার আকৃতিই বা কিরূপ ছিল? তিনি অনরীর, এ কথা বলিতে পার না, কেন না, তাহা হইলে সৃষ্টির ইচ্ছার তাহার প্রবলই হইতে পারে না। শরীর না থাকিলে প্রবল হয় না। তিনি শরীর, এ কথাও বলিতে পারা যায় না; কেন না, শরীরভৌতিক ও ভূতগণের (পৃথিব্যাতির) তখনও সৃষ্টি হয় নাই।

সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়াবস্থা, এই প্রশ্নে তোমরা সমস্ত বস্তুরই অভাব স্বীকার কর। এখন বল, সেই সময়ে যে প্রজাপতি বিদ্যমান ছিলেন, ইহা কে জানিল, যে ব্যক্তি অন্তকেও ঐ কথা বলিয়া দিতে পারে? ইহার সম্বন্ধ না পাইলে নিশ্চয় করা যায় না যে, সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতি ছিলেন। তার পর, প্রশ্নে যদি কিছুই না থাকে, তবে প্রজাপতির জগন্নির্মাণে ইচ্ছাই হইতে পারে না; যেহেতু বাহার সাহায্যে তিনি জগৎ নির্মাণ করিবেন, প্রশ্নে তাহার কিছুই নাই; দেখিতে পাওয়া যায়, সহায়সাধন থাকিলেই লোকে কোন কর্ম্ম প্রযুক্ত হয়, না থাকিলে হয় না। তুমি এ কথা বলিতে পার না যে, ভগবানের ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া বাইবে, তাহার আবার প্রযুক্তির আবশ্যকতা কি। ঈশ্বর যখন শরীরহীন, তখন যে তাহার ইচ্ছাই হইতে পারে না; শরীর থাকিলেই ইচ্ছা হয়, অন্তথা হয় না। তুমি যদি আবার বল—ঈশ্বরের শরীর আছে; তাহা হইলেও তোমার নিস্তার নাই। তুমি উত্তর দাও—যে শরীর গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর শরীর হইলেন, তাহার সেই শরীরের নির্মাণ কে? তিনি

নিজেই তাহা নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না; কেন না, নিজের শরীর নিজে নির্মাণ করিতে পারা যায়, ইহা আমরা কোথাও দেখি নাই, আর তার প্রমাণও নাই। যদি বল, ঈশ্বরের ঐ শরীর আর কেহ নির্মাণ করিয়াছে, তবে এই নির্মাতার শরীরকে কে উৎপাদিত করিল, এবং সেই উৎপাদিত শরীরের কে স্রষ্টা হইল? এইরূপে অনন্তকাল চলিলেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না।

স্রষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায়, এই সংসার হুঃখআলাপূর্ণ। অতঃপক্ষে, তোমরা বলিয়া থাক, ঈশ্বর পরমকৰুণাকর। যদি সত্য-সত্যই ঈশ্বর কৰুণার্ক হন, তবে তিনি সংসারকে প্রাণীদের হুঃখগ্রস্ত করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? অতএব বলিতে হয়, তিনি নির্দয়। জীবের কৰ্ম্মরূপ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মও সে সময়ে ছিল না, বাহার অহুসরণে সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর নিজের ঐ নির্দয়রূপ দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। অতএব তোমরা যে বলিয়া থাক, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপ সাধন গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর জগদ্বিনাশে প্রবৃত্ত হন, তাহাও হইতে পারে না; কেন না, সে সময়ে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মই থাকে না। উৰ্ণনাতিও নিঃসাধন হইয়া স্বকোশ-নির্মাণে প্রবৃত্ত হয় না, ক্ষুদ্রজন্তুতরুণজনিত প্রবর্তমান লালাই তাহার সাধন হয়।

তুমি এ কথাও বলিতে পার না যে, অহুসরণ করিয়া ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করেন। যেহেতু সে- সময়ে অহুসরণাপাত্তেরই অভাব। হুঃখদর্শন করিলে অহুসরণ হয়, কিন্তু সে সময়ে সুকৃপকৃৎসনের দ্বারা শরীর-বীজ জন্মায় হুঃখই থাকে না, বাহা

দেখিলে অহুসরণ হইতে পারে। যদি বল— সৃষ্টির আদিকালে যেমন হুঃখের অভাব আছে, তদ্রূপ, সৃষ্টিরও অভাব আছে, ঐ সৃষ্টির অভাব দেখিলে অবশ্যই ঈশ্বরের অহুসরণ হইতে পারে; তবে আমরা বলিব— তাহা হইলে অহুসরণাপ্রবৃত্ত ঈশ্বর সমস্ত সংসারকে সৃষ্ট করিয়াই সৃষ্টি করিতেন, হুঃখের লেশও থাকিত না; কিন্তু বস্তুত তাহা হয় নাই। ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, হুঃখ বিনা সৃষ্টকে কোনরূপেই সৃষ্টি করিতে পারা যায় না, তাই ঈশ্বর হুঃখেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। কেন না, বাহার নিখিল সাধন-সহায় স্বায়ত্ত, তাহার পক্ষে কোন কৰ্ম্ম ছুঃখ হয় বলিয়া সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি ঈশ্বরকেও অন্যায় হইতে সাধন সংগ্রহ করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, আমাদের দ্বায় তিনিও পরাধীন।

ঈশ্বরবাদিগণকে একটি প্রশ্ন করিতেছি, তাহার উত্তরপ্রদান করুন— সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের কোন্ প্রয়োজনটি অসিদ্ধ ছিল, বাহা তিনি সৃষ্টি করিয়া পূর্ণ করিলেন? সকলেই জানেন—

“প্রয়োজনমহুদ্ভিত ম মদোহপি প্রবর্ততে।”

শ্রীকবীর্ষিক।

জগদ্বিনাশে ঈশ্বরপ্রবৃত্তি কোন প্রয়োজনকে অহুসরণ করে নাই, ইহা বলিতে পারা যায় না। কারণ তাহা হইলে, বলিতে হইবে, — অচেতন হইতে ঈশ্বরের কোন ভেদ নাই। তোমরা বলিয়া থাক, তগবান্ লীলাভারে জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও সম্ভব হয় না। লীলা হইলেও তাহা বিনোদনহুঃখের অন্ত অহুঃখিত হয়। তোমরা

দের মতে ঈশ্বর পূর্ণকাম—পূর্ণস্বয়ং; এখন বল, যদি ঈশ্বর লীলাখেলার জন্তই অগ্নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, তবে অগ্নিরীক্ষণের পূর্বে ঈশ্বরের তাদৃশ লীলাজনা-স্বপ্নের অভাব ছিল, বাহা তিরিখাণের পরে পূর্ণ হইল। ইহা তোমাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় কি না? স্বীকার করিলেই ঈশ্বরকে যে তোমরা পূর্ণকাম, পূর্ণস্বয়ং বল, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। আরও, লীলাখেলা স্বল্পমাত্রায় হইলেই তাহা প্রীতিকর হয়, কিন্তু এই ভূধর-সমুদ্রাদিসৃষ্টিকল্প মহাব্যাপার লীলাখেলা না হইয়া বরং তাহার প্রভূত কষ্টই উৎপাদন করে, স্বপ্নের কথা তু দূরে!

এইরূপে যেমন অগতের সৃষ্টি সম্ভাবিত হয় না, প্রলয় বা সংহারেও তদ্রূপ কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। কিজনা ঈশ্বরের সংহারে ইচ্ছা হইবে, বুঝা যায় না। পরমেশ্বর সাক্ষর, তাহার সমস্ত কার্যই করুণানিমিত্ত, অতএব সংহারও তাহার করুণানিমিত্ত,— ইহা বলিতে পার না। সৃষ্টি ও সংহার দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ কার্য, ইহার করুণারূপ এক কারণে উৎপন্ন হইতে পারে না। আরও, সংহারসময়ে কোন্ ব্যক্তি জীবিত থাকে, যে অন্যকে শুনাইতে পারে যে, ঈশ্বর সংহার করিয়াছেন। তুমি বলিতে পার—সৃষ্টির অনন্তরই উৎপন্ন পুরুষ যেমন পুরুষাস্তরকে দেখিতে পার, তেমন ঈশ্বরকেও সে দেখিতে পারে, সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের কার্য অন্যকে বলিতে পারে। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত নয়; সে সময়ে ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলেও, ঈশ্বর যে তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, তাহা সে দেখিতে পার না, নিজের জন্ম

নিজে দেখা যায় না। যখন ঐ ব্যক্তি নিজের জন্মবৃত্তান্তই জানিতে পারে না, তখন যে অগতের জন্ম জানিবে না, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যদি বল—ঈশ্বরের বাক্যে সে জানিতে পারিবে যে, তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাও হইতে পারে না; যদি ঈশ্বর তাহাকে বলিয়া দেন যে, ‘আমি তোমাকে উৎপাদিত করিয়াছি,’ তবে ঈশ্বরের নিজের ঐশ্বর্য্য নিজে প্রকাশ করা হইবে। যে ব্যক্তি নিজের ঐশ্বর্য্য এইরূপে প্রকাশ করে, তাহার কথার বিশ্বাস কি? বেদবাক্যাবারাও তাহার অগৎসৃষ্টিকারিত্ব জানা যায় না; সত্য কথা, বেদে দেখিতে পাওয়া যায়—

“প্রজাপতির্বা ইদমেক এবাত্র আসীৎ, সোহকামরত প্রজাঃ পশুন স্বরেষু, ... ততো বৈ স প্রজাঃ পশুনস্বজৎ” ইত্যাদি।

কিন্তু আমরা ভিজাসা করি—বেদ প্রজাপতি-বিরচিত কি না? যদি হয়, তবে প্রজাপতির কথায় বিশ্বাস কি?—যিনি স্বয়ং নিজের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন! আর যদি প্রজাপতি বেদ রচনা না করিয়া থাকেন, তবে বেদের নিত্যই আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে যে বেদ সৃষ্টির পূর্বেও ছিল, তাহাতে “প্রজাঃ পশুনস্বজৎ” ইত্যাদি সৃষ্টিবিবরক যে সকল কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের বখাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে কিরূপে বেদের প্রামাণ্য রক্ষিত হইবে। এইজন্য তাদৃশ বচনসমূহের বখাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা চলে না। ইহাদের তাৎপর্য্য অজ্ঞাত,—ইহার বস্তুত সৃষ্টি বা প্রলয় প্রকাশ না করিয়া বিভাস্তরের প্রয়োচনামাত্র উৎপাদন করে।

ঋতি, বৃত্তি ও ইতিহাসে সৃষ্টি ও প্রলয়ের
প্রসিদ্ধি থাকিলেও, ঐ প্রসিদ্ধি বাধিত হয়।
যে সকল প্রসিদ্ধি প্রমাণমূলক, তাহাদের
বাধ হয় না। কিন্তু সৃষ্টিসংহারবিষয়ক
প্রসিদ্ধি তাদৃশ নহে। অর্থবাদবাক্যের
স্বত্তিতেই তাৎপর্য্য;—বধাক্রম অর্থের
প্রমাণ্য নাই; তাহারা কোন প্রকৃত বিষয়ের
নিজা বা প্রমাণ্য মাত্র প্রকাশ করে ১০
এতাদৃশ কতকগুলি অর্থবাদবাক্যের তাৎ-
পর্য্য বুঝিতে না পারাতেই সৃষ্টি ও সংহার
বস্তুত 'আছে বলিয়া' লোকের বুদ্ধিবিভ্রম
উপস্থিত হইয়াছে। গ্রন্থের পৌরোপরি
আলোচনা না করিলে এরূপ ভ্রম অতি
সুলভ। মহাত্মার প্রভৃতিতেও ধর্ম্মে প্রবৃত্তি
ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি শিক্ষা দিবার জন্য
সৃষ্টিসংহারের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে;
বস্তুত সৃষ্টি ও সংহার নামে কিছু নাই।—

* সৃষ্টিবাক্যকৃতকৈব জনানাং স্তিবিভ্রমঃ ।

পৌরোপরিপারম্বটঃ শব্দোহস্তাং কুরতে স্তিৎ ৷ ৩০

উপাখ্যানাদিমাত্রেণ বৃত্তিবেদবদেব নঃ ।

বর্ষাসৌ ভারতাদীনঃ ত্রাভিত্তেভ্যোহপত্যো ভবেৎ ৷ ৩১

আখ্যানানুগোনিভ্যং তেহু সর্বেষু বিদ্যতে ।

স্তিতিনিবাস্ত্রঃ কচ্চিদবেদস্তচ্ছোদিতোহপি বা ৷ ৩২

শ্রোকবার্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার ।

বহি বল—আমাদের এই সৃষ্টিপ্রলয়-
প্রবাহ অনাদি, বেন প্রতি সৃষ্টিতে ভিন্ন

হইলেও প্রবাহরূপে তাহাও অনাদি,
ঈশ্বরও অনাদি, সৃষ্টিকালে পরমাণু থাকার
অগন্তের উপাদানেরও অভাব নাই, অতএব
সৃষ্টি হইতে পারে। তবে আমরাও বলি—
লোকে বেরূপ সৃষ্টিপ্রলয় দৃষ্ট হয়, সেইরূপই
কল্পনা করা উচিত। প্রতিজনই কিছু
উৎপন্ন হইতেছে,—ইহাই সৃষ্টি; অতিক্রমই
কিছু বিলীন হইতেছে,—ইহাই প্রলয়।
সুগপং সমস্ত সৃষ্টি বা বিলীন হয় বলিয়া
কল্পনা করিলে তাহা দৃষ্টান্তসারী হয় না।
সর্বোচ্ছিন্নরূপ প্রলয়ে কোন প্রমাণ নাই।
ঈশ্বরের যে তাহার দ্বারা কোন প্রয়োজন
সিদ্ধ হইবে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়
না। প্রলয়ে সমস্ত পদার্থের অভাব হয়
বলিয়া তখন আত্মার কোনরূপ স্থখঃখ-
ভোগ হইতে পারে না, বলিতে
হইবে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না,
কেন না, কর্ম্মযুক্ত আত্মার ভোগহীন স্থিতি
বৃত্তিযুক্ত হয় না। এক এক আত্মার
পূর্ব্বপূর্ব্বসৃষ্টিত বহু কর্ম্ম থাকিতে পারে;
তাহাদের মধ্যে যখন একটি কর্ম্মের ফল
প্রাপ্ত হয়, তখন অপর কর্ম্মফল নিকট
থাকে;—অর্থাৎ ঠিক সেই সময়েই অপর
একটি কর্ম্ম ফলপ্রসব করে না। কিন্তু প্রলয়-
বস্থার কর্ম্মফল কেন যে নিকট হইয়া থাকিবে,

* বেদবাক্য পঞ্চা বিভক্ত, যথা—বিধি, মন্ত্র, নামধের, নিষেধ ও অর্থবাদ। অর্থবাদ বিধি—বিধিগণ ও নিষেধগণ। বিধিগণঃ অর্থবাদ বিধের বস্তুর স্তিতি এবং নিষেধগণ অর্থবাদ নিষিদ্ধ বস্তুর নিম্না প্রকাশ করে। যথা—“বায়বায় বেতমালভেতঃ”—[বায়ুবেততার জন্য বেত-(ছাপল) বধ করিবে]—এই বিধিবাক্যের শেষে অর্থবাদ পঠিত হইয়াছে :—“বায়ুর্বে কেপিঠা সেবতা, বায়ুবেত যেন ভাগধেয়েন উপধাবতি, স এনং ভুতিং পময়তি,” ১- (বায়ু অতি ক্রিশ্মারিনী সেবতা, বেতমালভনকারী যতাস্য বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু তাহাকে ঐখর্য্য প্রদান করেন)। এই অর্থবাদবাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য যে, যেহেতু বায়ুবেততা দ্বারা ফলপ্রদান করেন, তজ্জন্য তাহার উদ্দেশে বেত-
মালভন প্রাপ্ত। ঐ অর্থবাদবাক্যের বধাক্রম অর্থের প্রমাণ্য স্বীকৃত হয় না। বিধিবাক্যের সহিত একসমাধান
করিয়া উহাদের প্রমাণ্য রক্ষিত হয়। অর্থবাদসম্বন্ধে বহু বক্তব্য আছে। প্রবন্ধান্তরে তাহা প্রকাশ করিবার
ইচ্ছা থাকিল।

তাহার কারণ পাওয়া যায় না। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেই যে ঐ সমস্ত কর্মকল নিরুদ্ধ থাকিবে, তাহাও সম্ভব নহে। প্রলয়কালে সর্বকর্মের কলের অঙ্গুপভোগ কোন কর্মেরও কল নহে। এমনও কোন প্রমাণ নাই যে, সে সময়ে সমস্ত কর্মই বিনষ্ট হয়। যদি সত্যসত্যই বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে পুনর্সার সৃষ্টির আশা পরিত্যাগ করিতে হয়; কেন না, কর্মই সৃষ্টির কারণ। যদি বল—প্রলয়কালে কর্মসকল তিরোহিত থাকিয়া তদনন্তর অভিব্যক্ত হয় ও তাহা দ্বারা ভূতসৃষ্টি আরম্ভ হয়; তবে আমরাও বলিতেছি—উত্তর কর—প্রলয়ানন্তর কর্ম যে অভিব্যক্ত হয়, তাহার কারণ কি? ঈশ্বরেচ্ছা কারণ হইতে পারে না, তাহা হইলে ঈশ্বরেচ্ছাদ্বারাই সৃষ্টি হইয়া যাউক, তাহাব মধ্যে আবার কর্মকে প্রবেশ করাষ্টয়া লাভ কি? আর যদি-বা ঈশ্বরেচ্ছাই কারণ হয়, তবুও সম্ভব নাই; ঐ ঈশ্বরেচ্ছা যে উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ কি? অকারণই তাহা হয়, বলিতে পারা যায় না। ঈশ্বরেচ্ছার উৎপত্তিতে কর্মও কারণ হইতে পারে না, কেন না, তখন সেই কর্ম প্রতিবদ্ধ—তাহার তখন কার্যকারিত্ব নাই। কর্মকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও দোষোক্তার হইল না;—‘ঈশ্বরেচ্ছার কারণ কর্মপ্রতিব্যক্তি ও কর্মপ্রতিব্যক্তির কারণ ঈশ্বরেচ্ছা’—এই অভ্যন্তরীণপ্রদোষ উপস্থিত হয়। আবার যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, বাহ্যি হউক, ঈশ্বরেচ্ছার কোন কারণ আছে; তবে আর একটি দোষ আনিয়া পড়ে;—ঐ কারণটি নিত্য কি অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তবে

তাহার কার্যও নিত্য হইবে, অতএব ঈশ্বরেচ্ছাও নিত্য হইল, সুতরাং সর্বদাই সৃষ্টি হউক। যদি কারণটি অনিত্য হয়, তাহা হইলে যখন ঐ কারণ উপস্থিত হইবে, তখন তাহা আবার কোন কারণকে অবলম্বন করিবে? এইরূপ একের পর অপর কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে অনবস্থা উপস্থিত হইবে। যদি-বা তোমাদের মতে ধরিয়াই লওয়া যায় যে, ঈশ্বরেচ্ছার কোন একটি উপযুক্ত কারণ আছে, তবে তাহাতেই ভূতসৃষ্টি হউক না কেন, আবার ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতিকে স্বীকার করা কিজন্য? অতএব সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়ই প্রমাণশূন্য।

যখন সৃষ্টি ও প্রলয়ই থাকিল না, তখন তৎকর্তৃত্বরূপে ঈশ্বরও নাই, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এস্থানেও ঈশ্বরের অভাবসম্বন্ধে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। আমাদের প্রতি কার্যো ভিন্ন ভিন্ন প্রযত্ন দেখা যায়;—পদসঞ্চারণে ভিন্ন প্রযত্ন এবং হস্তসঞ্চালনে ভিন্ন প্রযত্ন। যদি সৃষ্টিবিষয়ে ঈশ্বরের প্রযত্ন নিত্য হয় (তোমাদের মতে), তবে ঐ প্রযত্ন এক কি অনেক? যদি একটিন্যস্ত প্রযত্ন থাকে, তবে তাহা দ্বারা বিবিধ কার্য করা যাইতে পারে না। আর যদি বল, ঈশ্বরের প্রযত্ন অনেক এবং তাহার নিত্য, তবে প্রলয়কারণভূত পরমাণুবিপ্লবক প্রযত্নের সৃষ্টিসময়েও, এবং সৃষ্টিকারণভূত পরমাণুসংযোজক প্রযত্নের প্রলয়কালেও অবস্থিতিহেতু উভয় প্রযত্নের পরস্পর বিরোধ থাকার সৃষ্টি বা প্রলয় কিছুই হইতে পারে না।

ভোমরা অনুমান করিয়া থাক—যে যে পদার্থ সাবয়ব, তাহার সকলই কার্য্য; এই পৃথিবী প্রভৃতিও সাবয়ব, অতএব ইহারও কার্য্য; কার্য্যের অবশ্য একজন কর্তা থাকিবে, অতএব এই পৃথিবাদির যে কর্তা, সেই আমাদের ঈশ্বর। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নহে। পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ইচ্ছা-প্রযত্নাদি যে সমস্ত গুণ কর্তার থাক্। আবশ্যক, ঈশ্বরের তাহা সম্ভাবিত হয় না। যখন তাহাই না হইল, তখন কি-প্রকারে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইবে এবং কিরূপেই পৃথিবাদির কর্তৃত্ব আমাদের সম্ভব হয় না বলিয়া ঈশ্বর বলিয়া আর একটি পদার্থ সিদ্ধ হইবে? * অতএব সৃষ্টি ও প্রলয়ের ন্যায় ঈশ্বরের কোন প্রমাণ নাই।

ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজনও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের এমন কি অনুপপন্ন রহিয়াছে, যাহা ঈশ্বরশক্তি দ্বারা উপপন্ন হইবে। যাহারা শব্দার্থের পৌর্কায়িকা আলোচনা না করিয়া ও স্ববিকল্প মুক্তিতর্কসমূহে কর্ণপাত না করিয়া মুগ্ধবুদ্ধিতে সৃষ্টি ও প্রলয় স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহার ঐ সৃষ্টিপ্রলয় সম্পাদনের জন্ত ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে পারেন। আমাদের মতে যখন সৃষ্টিপ্রলয়ই নাই, তখন ঈশ্বরস্বীকারের আর কোন প্রয়োজন নাই। বেদপ্রামাণ্যরক্ষার জন্ত কেহ কেহ ঈশ্বরস্বীকার করেন, সেজন্যও আমাদের ঈশ্বরের অপেক্ষা নাই। শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যত্ব-

বাবস্থাপন দ্বারাই বেদে পুরুষমূলত্ব অমপ্রমাদ-প্রবন্ধনাদির অনবকাশ প্রতিপাদিত ও তাহা দ্বারাই প্রামাণ্য রক্ষিত হইয়াছে। কর্ম্মফলপ্রদানের জন্তও ঈশ্বরস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। বেদ বলিতেছেন—“জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজ্ঞেত” -- ‘স্বর্গেচ্ছু জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে।’ ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, জ্যোতিষ্টোমযাগরূপ ধর্ম্মদ্বারাই স্বর্গফল হয়; ঈশ্বরকে ইহার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে না। তুমি হয় ত বলিবে—যাগ ত দেখিতে দেখিতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা হইতে বহুকাল পরে কিরূপে ফল পাওয়া যাইতে পারে। মৃতদণ্ডপতির পুত্রোৎপত্তি ত কখন শুনা যায় নি! তাহার উত্তর এই—যদি বেদকে আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, তবে বাহাতে বেদের প্রামাণ্য রক্ষিত হয়, তাহা আমাদের উত্তরকেই করিতে হইবে। যাগ ক্রম মধ্যে বিনষ্ট হইলেও, তাহার একটি ব্যাপার বা শক্তি অবস্থান করে, ইহা আমরা স্বীকার করি। যেমন অকার শব্দ হইলেও তজ্জন্ত উচ্চতা জলে অনুবৃত্ত হয়, সেইরূপ যাগ বিনষ্ট হইলেও যাগজন্ত একটি শক্তি (অপূর্ণ) আঘাতে অনুবৃত্ত হয় এবং কালান্তরে তাহা হইতেই ফলপ্রাপ্তি হয়, এজন্য ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। সৃষ্টি, সংহার ও কর্ম্মফলপ্রাপ্তি, এই তিনটি ভিন্ন অপর্য্যকান দুই কার্য্য সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না; বাহ্যের জন্ত ঈশ্বর স্বীকার

* নৈয়ারিক ও বৈশেষিকগণ বেদে অনুমানদ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, নীমাংসকগণও সেইরূপ অনুমানদ্বারাও ঈশ্বরকে সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাহ্য ও নীম হইবে মনে করিয়া আমরা নীমাংসকগণের অনুমানব্যাক্যের অনুবাদ করিতে বিরত থাকিলাম। শাস্ত্রদীপিকার সৃষ্টিনংহারবাদ ও লোকবার্ত্তী-কের সম্বন্ধাক্ষেপণবিহার অংশ, দ্রষ্টব্য।

করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরে যেমন কোন প্রমাণ নাই, তদ্রূপ তাঁহার কোন প্রয়োজনও নাই।

ঈশ্বরসম্বন্ধে সীমাংসকেরা কি বলেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে জানাইলাম। সম্প্রতি, ঈশ্বরস্বীকার করিলে সীমাংসকগণের কি ক্ষতি হইত বা ঈশ্বরস্বীকার না করিয়াই বা তাঁহাদের কি লাভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

লৌকিকের জ্ঞান পারলৌকিক কার্য্যসমূহেও কালবিশেষে কোন একটি প্রবল ভাব সমাজে আদৃত হয় ও অপরগুলি তৎকালে মলিন হইয়া যায়। যে কালে যে ধর্ম্ম সমীচীন বলিয়া গৃহীত হয়, তখন তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে উদ্বোধিত করিবার জন্ত তদবলম্বিগণের স্বভাবতই প্রযত্ন হইয়া থাকে। সে সময়ে যদি কেহ ‘অধর্ম্ম’ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে অনর্থ প্রাপ্ত হইল বলিয়া সকল মনীষিগণের হৃদয় কাতর হয়; তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যান, যাহাতে লোকে সেই শ্রেয়ঃপথ হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়। আর্থাদের মধ্যে যখন এক কর্ম্মবিধিই অভ্যুদয়জনক—নিঃশ্রেয়সপ্রদ বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, প্রধান প্রধান লোকসমূহ যখন কর্ম্মবিধিকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন, সীমাংসাদর্শনের তখনই আবশ্যকতা হইয়াছিল। যদি এক কর্ম্মবিধিই পরমপুরুষার্থপ্রদ বলিয়া সীমাংসকগণের ধারণা হইয়া থাকে, তবে

যাহাতে সকলেই সেই মত গ্রহণ করে, তদ্বিষয়ে যে তাঁহারা যথোচিত চেষ্টা করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সীমাংসকেরা যখন ঈশ্বরবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের পূর্বে ঈশ্বরোপাসনা বিশেষ প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, কর্ম্মবিধিই শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরোপাসনা নিষ্ফল; তজ্জন্ত নিঃসন্দেহে সকলকে কর্ম্মকাণ্ডে প্রবর্তিত করিবার জন্ত, তাঁহারা পূর্ব্বপ্রচলিত ঈশ্বরবাদকে খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন; ‘অন্তথা লোকে হয় ত কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণ করিত না বা করিলেও তাহাতে হির থাকিতে পারিত না। বিশ্ব-গুণাদর্শে ব্যাকটাক্ষরিত এই কথা বলিয়া গিয়াছেন—

“ভগবদনুপাসনমঃ দৈবতচিহ্নাদিনিবৃত্তবাক্যম্।

কর্ম্মশ্রদ্ধাবিবর্জকতৎপ্রাধান্তপ্রদর্শনার্থম্॥”*

ঈশ্বরোপাসনার জ্ঞান কর্ম্মবিধিও নিঃশ্রেয়সপ্রদ। অতএব ঈশ্বর না থাকিলেও যদি অভিলষিতসিদ্ধি হইয়া যায়, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিবার আর আবশ্যকতা থাকে না। আমরা বাল্যকাল হইতে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া আসিতেছি, তাই সহসা ঈশ্বরভাব তুলিলে আমাদের হৃদয় কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে; কিন্তু যাহাদের বাল্যকাল হইতে কর্ম্মবিধি পরিচিত, ঈশ্বর-অস্বীকারে তাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত হয় না।

কর্ম্ম ও ঈশ্বর এই উভয়ের উপাসনাকেই যাহারা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন,

* সীমাংসকেরা দেবতার মূর্ত্তিও স্বীকার করেন না। সীমাংসাদর্শনের নবমাধ্যারে দেবতার মূর্ত্তি খণ্ডিত হইয়াছে।

তাহারা উভয় উপাসনা হইতেই নিজের প্রাপ্তি মীমাংসার্থংগ্রহাদিকার তাঁহাদেরই
অনুকূলরূপে অংশবিশেষের গ্রহণ অত্যন্তম । এইজন্যই তাহারা লিখিয়াছেন—
ও পরিত্যাগ করিয়া অভিনব মত আবিষ্কার “ঈশ্বরানুগ্রহানুগ্রহমানন্ত নিঃশেষসহেতুঃ ।”
করিয়া যুগপৎ উভয় পথকেই আশ্রয় বস্তুত যথার্থ মীমাংসকেরা যে ঈশ্বরস্বীকার
করিয়াছেন । বাহারা এই মতানুবর্তী, করেন না, তাহা দৈখ্যন হইয়াছে ।
শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী ।

নবজীবন ।



We await the flashing sword of the lightning which shall cleave the darkness. For the terrible husk must be broken, and the rain-drops of a new vigour must refresh the earth before new flowers can spring up to cover it with their bloom. But it must be from Asia herself, along the ancient roadways of the race, that the Great Voice shall be heard—victory from within, or a mighty death without.—*Ideals of the East.*

বাঙালী নবজীবন লাভ করিয়াছে । বহু-শতাব্দীর পরাধীনতার নিরন্তর পরপদপীড়িত হইয়া বাহা হেলায় হারাইয়া ফেলিয়াছিল, বাঙালী আবার সেই দেবদুর্লভ মহারত কুড়াইয়া পাইয়াছে । ইংলণ্ডের শাসন এবং ইংলণ্ডের শিক্ষা যে নবশক্তি স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছে, বিশ্ববিধাতার আলীকাদে তাহাই বাঙালীকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করিয়া তুলিবে । তাহার প্রথম প্রকাশ প্রভাতের কনককিরণের মত ধীরে ধীরে অপূর্ণশোভার ফুটিয়া উঠিতেছে ।

এখনও অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই । এখনও বিভীষিকা সম্পূর্ণরূপে পলায়ন করে নাই । এখনও পেচকর

সম্পূর্ণরূপে নিরন্তর হয় নাই । এখনও কোন কোন বিলাসী বাঙালী বিলাসনিদ্রার শেব-মুহূর্তের সুখস্বপ্নের প্রলোভন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই । তথাপি অনেকেই জাগিয়া উঠিয়াছে । তাহাদের কলরবে গ্রাম-নগর-রাজধানী পুলকিত-কলেবরে সুধারিত হইয়া উঠিতেছে ।

এই জাগরণ সহসা সংঘটিত হয় নাই । আঘাতের পর আঘাতে,—আলোড়নের পর আলোড়নে,—আত্মানের পর আত্মানে,—বহুদিনের অব্যাহত আন্দোলনের পর আন্দোলনে এই জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে । সেইজন্যই ইতিহাস ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না ।

যাহা এতদিন নিফল চেঁচা বলিয়া স্বদেশ-বিদেশে প্রতিনিরত উপহাস সহ করিয়া নীরবে কর্তব্যপালনে নিযুক্ত ছিল, সেই স্বদেশেবার পুণ্যত্রয় সময় পাইয়া সাক্ষা-লাভের পথ প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা এতদিন কবিকল্পনার ভিতর দিয়া অব্যক্তবেদনারূপে হুটরা উঠিতে গিয়া স্বদেশ-বিদেশে দুর্বোধ বলিয়া তিরস্কার সহ করিতে অভ্যস্ত ছিল, সেই স্বদেশপ্রীতি সময় পাইয়া সকল ক্ষম্যকে অধিকার করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। যাহা এতদিন বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের ভিতর দিয়া বাঙালীকে তাহার সুখঃখের মূলকারণ বুঝাইতে গিয়া স্বদেশ-বিদেশে ইতিহাসলেখককে ভীতভাঙনার বাতিবাস্ত করিত, সেই স্বদেশশক্তি সময় পাইয়া সকলকেই কর্তব্যপালনের জ্ঞান অকুতোভয়ে আহ্বান করিতেছে।

একের চিন্তা অনেকের চিন্তায়,—অনেকের চিন্তা সকলের চিন্তায়—পরিণত হইয়াছে। একের লক্ষ্য অনেকের লক্ষ্যে,—অনেকের লক্ষ্য সকলের লক্ষ্যে—পরিণত হইয়াছে। একের আহ্বান অনেকের আহ্বানে,—অনেকের আহ্বান সকলের আহ্বানে—পরিণত হইয়াছে। তাহাতেই গ্রাম-নগর-রাজধানী পুলকিতকলেবরে সুধরিত হইয়া উঠিতেছে।

বাঁহারা ইহাকে অস্বীকার করিয়া স্বদেশ-জোহে লিপ্ত হইতেছেন,—বাঁহারা ইহাকে পদদলিত করিবার চেঁচা করিয়া রাজধর্ষে পতিত হইতেছেন,—ইতিহাস তাহাদের কণায় এবং কার্যের সত্যায়ন করিতে পারিবে না। ইংলণ্ডের ইতিহাস বেক্স চরিত্রবলের

মহাত্মা ঘোষণা করে, বাঙালীর মধ্যে সেইরূপ চরিত্রবলই বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ডের শাসন এবং ইংলণ্ডের শিক্ষা সাক্ষা-লাভ করিবার সময় প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই আগরণ মহাদাহরণ,—বাঙালীর ইতিহাসের অশ্রুতপূর্ব অভিনব ঘটনা। ইহাতেই বাঙালীর ললাটকলক অপমৃত হইবার সুসময় উপস্থিত হইবে। “অন্নমারম্ভঃ শুভায় ভবতু”—বলিয়া স্বদেশের বিশ্রবর্গ মন্দিরে মন্দিরে শুভ শব্দনাদ করিয়া যে শুভসংস্কারের মহামন্ত্র ধ্বনিত করিয়া তুলিতে-ছেন, তাহার সঙ্গে বহুগুণের অপরিমিত পুণ্যপিপাসা আকুলকণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে।

হঁহা কদাচ সহসা সংঘটিত হইতে পারে না। যে জীবজগতে নগণ্য ধূলিকণা নগণ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না,—যে জীবজগতে শিশিরবিন্দু ক্ষুদ্র বলিয়া তাচ্ছল্যলাভ করিতে পারে না,—যে জীবজগতে পদ-দলিত দুর্কামলও দুর্বল বলিয়া নিম্নিত হইতে পারে না,—সেই জীবজগতের কোন ঘটনাকেই ভুল বলিয়া উপহাস করিতে সাহস হয় না। বিধাতার মঙ্গলহস্তের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তুণের সহিত তুণ—শুষ্কের সহিত শুষ্ক—একজা মিলিয়া গুণগ্রাপ্ত হইবামাত্র মত্তহস্তীকেও নিগড়নিবদ্ধ করিবার শক্তিতে করিয়া থাকে।

মানবসমাজের অবস্থাও সেইরূপ। বিচ্ছেদে শক্তিকর,—মিলনে শক্তিসংকর। বিচ্ছেদে চিরপরাতপ—মিলনে বিশ্ববিজয়। বিচ্ছেদে চিরকলক,—মিলনে পরম গৌরব। স্বতাব-মূলত প্রবৃত্তিবলে মানবসমাজ শক্তিপ্রিয়,—

বিজয়প্রিয়,—গৌরবপ্রিয়,—তাহার জন্তই মানবসমাজ মিলনপ্রিয়। তাহার জন্তই মানবসমাজে পরিবারবন্ধনের ব্যবস্থা,—সমাজবন্ধনের ব্যবস্থা;—স্বজাতি, স্বধর্ম ও স্বদেশ নামক বিব্লিধ বন্ধনব্যবহার আড়ম্বর।

মিলনের শক্তিকেত্রের পরিচয়লাভ করিয়া, মানবসমাজ মিলনভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, শৈশবেই• বিজয়মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছিল। তপস্তার একনিষ্ঠার; উত্তরোত্তর শক্তিলাভ করিয়া কেহ সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে; কেহ বা তপস্তাবিচ্যুত হইয়া অকৃত্রিম উপহাসের পাত্র হইয়া রহিয়াছে। মূলপ্রবৃত্তি কোন সমাজ হইতেই একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। বাহারা তপস্তাজুট হইয়া বিনষ্ট হইবার পথে অধঃক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাদেরও অভ্যুত্থিত হইবার আশা আছে। শক্তিলাভ করিতে পারিলে, তাহারাও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু তাহার পূর্বে তাহাদিগকে আবার পুরাতন পূণ্যপথে আরোহণ করিতে হইবে।

এক দিনে বা একটি ঘটনায় তাহার জন্ত আন্তরিক আকাজ্জনা জাগিল; উঠিতে পারে না। বাহারা বহুযুগ নিদ্রামগ্ন, একদিনে বা একটি ঘটনায় তাহারা সহসা জাগিয়া-উঠিয়া বিশ্ববিভয়ে ধাবিত হইতে পারে না। বিশ্ববিজয়ের পূর্বে আত্মজয় সম্পন্ন করিতে হয়। আত্মজয়ের পূর্বে আত্মত্যাগ অভ্যাস করিতে হয়। আত্মত্যাগের পূর্বে হৃদয়বল সঞ্চিত করিতে হয়। হৃদয়বল সঞ্চিত করিবার পূর্বে আলোচনার-আন্দোলনে হৃদয়দৌর্য্যল্যের সুসংস্কার আবিষ্কৃত করিয়া তাহাকে সর্ব-

প্রবন্ধে পরিহার করিবার লজ্জা আত্মচেষ্টার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়। বাহারা এইরূপে বধাক্রমে সাধনপথে 'অগ্রগর' হইতে পারে, তাহারা অধঃপতিত হইয়া থাকিলেও পুনরায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতে পারে।

বাঙালীর আলোচনা-আন্দোলনের অভাব ছিল না; আত্মচেষ্টার অভাবেই বাঙালী জানিয়া-উনিয়াও হৃদয়দৌর্য্যল্য পরিহার করিতে পারে নাই। সেইজন্ত বাঙালীর আলোচনা-আন্দোলন প্রথমাঞ্জে পর্য্যবসিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা প্রতিদ্বিপের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, সত্যমণ্ডপকেই আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে তাহা এখন সভা ছাড়িয়া গৃহে গৃহে, হৃদয়ে হৃদয়ে, স্থান প্রাপ্ত হইতেছে; এক স্থান ছাড়িয়া অনেক স্থানে,—অনেক স্থান ছাড়িয়া সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহাতেই বাঙালীর আত্মচেষ্টা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবার আশা হইয়াছে।

বাঙালী বিজয় হইয়াই উৎসর্গে গিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা,—অনেক ঘটনার কথা,—অনেক অকথ্য কলঙ্কের কথা! বহু বিড়ম্বনা সহ করিয়া বাঙালী যেদিন আত্মশক্তি লাভ করিবার সন্ধিকাল প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেদিনও আত্মচেষ্টার উপর নির্ভর করিতে সাহস করে নাই। সেদিন বাঙালী কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আশার পরশক্তির কণ্ঠস্বর হইয়াছিল। বাহাদের সহায়তার বহু বিপ্লবের অবসানে বাঙালী শক্তিলাভ করিয়াছে, বাঙালী তাহাদিগকে আপন স্বত্ব বহন

করিয়া আনিয়াই রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছিল। প্রজার, বিশ্বাসে, ভক্তিতে বিগলিত হইয়া বাঙালী তাহাদের মন্ত্রী সাজিয়া, দালাল সাজিয়া, গোমস্তা সাজিয়া, লাঠিরাল সাজিয়া, ভারতবিজয়ের সমারোহ-সাধনের জন্ত অকাতরে আত্মবিসর্জন করিয়াছে ;—বদেশের ইতিহাসবিখ্যাত শিল্পবাণিজ্যের সর্বনাশ সাধিত করিয়াও বিদেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে ইতস্তত করে নাই! একদিনের জন্তও বাঙালীর প্রভুভক্তি পরাভূত হয় নাই; বরং রাজাকে অবতার জ্ঞান করিয়া বাঙালী কাতরনয়নে ভিক্ষাপাত্রহস্তে রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অধাবসারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে! মুষ্টিভিক্ষার আশা পাইলে, আশামাত্র লইয়াই বাঙালী কত উৎকুল হইয়া উঠিয়াছে ;—আত্মশক্তির ছায়া পাইলে, ছায়াই কায়াদান করিবার আশায় বাঙালী কত প্রাণপণে অবৈতনিক রাজকার্যের ভার বহন করিয়াছে! এক রাজপুরুষ বাহাদুর দান করেন, জন্ত রাজপুরুষ আসিয়া তাহার প্রত্যাহার করিলে, বাঙালী সেই হস্তবিচ্যুত অধিকারের উদ্ধারসাধনের আশায় পুনঃ-পুনঃ পরিশ্রান্ত হইয়াও রাজদ্বার পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করে নাই। অবশেষে আঘাতের পর স্তম্ভাবতে, রাজদ্বার উন্মুক্ত না হইয়া, মাতৃভূমির মঙ্গলদায়ক উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী বুঝিয়াছে,—বাঙালী বাহ্যিক জন্ত কাতরজ্ঞাননে রাজদ্বারে করাঘাত করিতে গিয়া কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ছাড়া,—অধিকার নহে ;—অধিকারের

ছদ্মবেশ! প্রধান রাজপুরুষ স্বয়ং আত্মসম্মতির করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন,—প্রান্তঃ-স্বরগীরা মহারাগীর ইতিহাসবিখ্যাত বোবণা-পত্রও ছাড়া ;—তাহাও—তাহাও—অধিকার-পত্র নহে, অধিকারপত্রের ছদ্মবেশ! ইহাতে বাঙালী বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল; প্রধান রাজপুরুষের ভ্রমপ্রদর্শনের জন্ত তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল। এমন সময়ে সকলেই চাহিয়া দেখিল,—স্বায়ত্তশাসন, উচ্চশিক্ষা, অভ্যুদয়সাধক মিলনক্ষেত্র,—সমস্তই একে ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে ;—জনসাধারণের কাতরজ্ঞাননে উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের পরাধীনতার কথা হাড়ে হাড়ে ক্ষোদিত করিয়া দিয়া, অকূলসাগরে ভাসিয়া চলিয়া যাটবেছে। পরশক্তির উপর বিশ্বাস এইরূপে একবার বিচলিত হইবামাত্র, আত্মশক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে।

এত কালের পর! তথাপি ইহাই পরম লাভ বলিয়া বাঙালী আত্মচেষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আত্মচেষ্টা ভিন্ন কোন জাতি অভ্যুদয়লাভ করিতে পারে না। তাহাই, আত্মশক্তির মূল। রাজভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, রাজশক্তির সুখাপেক্ষী না হইয়া, প্রজাশক্তি আত্মচেষ্টার কিরূপে অভ্যুদয়লাভ করিতে পারে, আধুনিক সভ্যসমাজ তাহার বিবিধ পথের সন্ধান প্রদান করিয়াছে। বাঙালী জাগিয়া উঠিয়া, সেই পথে ধাবিত হইবার জন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে। রাজপুরুষগণ না বুঝিয়া, ইহাকে রাজবিজ্ঞোহ ভাবিয়া, আত্মকে অধীর হইয়া, হাত্তান্দ হইতেছেন!

আবেদনে-আন্দোলনে রাজপ্রসাদ লাভ করিলেও, তাহা পুনরায় হস্তচ্যুত হইতে কতক্ষণ ? যাহা রাজপ্রসাদে বর্জিত হয় না,—রাজরোষেও বিনষ্ট হইতে পারে না, বাঙালী সেই প্রজ্ঞাশক্তি লাভ করিবার জন্যই লালসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ব্রিটিশসাম্রাজ্যের—সমগ্র সভ্যসমাজের—সর্ব্ববাদিসম্মত জ্ঞান-জ্ঞানোদিত অকুণ্ঠ অধিকার। তাহাকে রাজবিরোধ বলিয়া তিরস্কার করিবার উপায় নাই।

বাঙালী আর কখন এমন করিয়া এই মহারাজ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে নাই। এই ব্যাকুলতা একের নহে, অনেকের ;—অনেকের নহে, সকলের। ইহাই যে বাঙালীর আন্তরিক ব্যাকুলতা, তাহা বুঝিবার জন্য ধীরভাবে চেষ্টা না করিয়া, রাজপুরুষগণ অধীর হইয়া বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিতে গিয়া উত্তরোত্তর পরাভূত হইতেছেন। ইহা কোন অধিকার কাড়িয়া লইবার ধর্ম্ম নহে ; ইহা কেবল আত্মত্যাগের সরল ধর্ম্ম। আত্মত্যাগের সরল ধর্ম্ম একবার ত্যাগের লক্ষ্য পাইবামাত্র প্রবল হইয়া পড়ে। রাজরোষ যাহার মস্তকে পতিত হয়, সে অমর হইয়া যায় ;—একের দৃষ্টান্তে সহস্রের আত্মত্যাগের পপ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। রাজপুরুষগণ না বুঝিয়া রাজবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া এই নবধর্ম্মকে উত্তরোত্তর প্রবল করিয়া তুলিতেছেন।

এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, বাঙালী পার্ধক্যত্যাগ করিয়া এক হইয়া উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহা অসাধ্যসাধন নহে ;—ইহাই স্বাভাবিক। জাতিভেদে,

ধর্ম্মভেদে, বহুভাগে বিভক্ত বলিয়া, বাঙালীর পক্ষে একতালাভের সম্ভাবনা তিরোহিত হয় নাই। জাতিতে অনেক, ধর্ম্মে অনেক,—তাহা মানবসমাজের অনিবার্ধ্য পার্ধক্য। তথাপি এক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, এক দেশে বসতি করিতে গিয়া, এক স্মৃতিধর্ম্মে অধীন হইয়া, সকল বাঙালীই মাতৃভাষায়, মাতৃধর্ম্মে, মাতৃসেবায় এক। এই নবধর্ম্মই বাঙালীকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব গৌরব দান করিয়াছে। ইহাকে সকলে মিলিয়া প্রকৃতপথে পরিচালিত করিতে পারিলেই বাঙালী নবজীবনলাভের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিবে। তাহার জন্য শক্তিসঞ্চয় আবশ্যিক।

সে শক্তির নাম আত্মশক্তি। তাহা কদাচ বাহির হইতে আসিতে পারে না। তাহা কেবল অন্তরের অন্ততলেই জন্মগ্রহণ করে। একবার জন্মগ্রহণ করিলে, তাহা আর সহসা বিনষ্ট হইতে পারে না। কারণ, তাহা একের নহে, অনেকের ; অনেকের নহে, সকলের। এই শক্তি বাঙালীকে প্রকৃতপথে পরিচালিত করিলে, ধরাতল নীতল হইবে—পত্রপুষ্পবিকশিত হইয়া উঠিবে। ইহাকে উপেক্ষা করিলে, বাঙালীর অভ্যুদয়লাভের আশা চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইবে।

নবজীবনের প্রথম প্রভাতে সুবিমল সৌভাগ্যগগনের সুনীল চন্দ্রাতপতলে ঝাঁড়াইয়া অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ,—এত কালের এত ব্যর্থ চেষ্টা, কিছুই ব্যর্থ হয় নাই ; নিফল চেষ্টাই সাফল্যদান করিয়াছে। যাহা উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই প্রচার বিষয় হইয়া

উঠিয়াছে। যে আন্দোলন রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া লাহোর ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল, তাহাই মাতৃভাষায় আসিয়া বাঙালীর অশ্রুতপূর্ব্ব গৌরব ঘোষণা করিতেছে। রাজাজ্ঞায় বিধগ্নিত হইয়াও, বঙ্গভূমি পূর্বাশ্রয় লইয়া দৃঢ়সংবল হইয়াছে। উচ্ছ্বল রাজশক্তি সুসংযত প্রজাপতির সমক্ষে চিরগৌরবে মলিন হইয়া উঠিয়াছে। আত্মচেতা ভিন্ন পরামুগ্ধতার কেহ কখন এরূপ আত্মপ্রদান লাভ করিতে পারে না।

আত্মচেতাই আত্মশক্তিবিকাশের এক মাত্র সাধ্য। আত্মচেতা সর্বাশ্রয়তা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাহাই আবার সর্বাশ্রয়তা কঠিন। অমূল্য অবস্থার সত্যিকার এবং সহজঃ—প্রতিকূল অবস্থায় অস্বাভাবিক এবং কঠিন।

জন্মগ্রহণ করিবারাত্র শিশুসন্তান আত্মচেতার পরিচয়প্রদান করে। তাহা স্বাভাবিক এবং সহজ। সে তাহার ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারিত করিয়া, আহাব অথবা অসংযত বদনব্যাদান করে। শক্তির অভাব, আহাব সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া, বুদ্ধিজ্ঞাপন করিয়াই তাহাকে নিরস্ত হইতে হয়। মেহময়ী জননী আসিয়া তরল স্তনে ক্ষুধানিবারণ না করিলে, তাহাকে বুদ্ধিজ্ঞাপন করিয়াই জীবনবিমর্জন করিতে হয়। শিশু যেকোন লঘুপাক তরল খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক করিতে পারে, তাহার পরিবর্তে তাহাকে অল্পপাতি খাদ্য দান করিলে,—অথবা লঘুপাক তরল খাদ্য ও অপরিমিতমাত্রায় গলাধঃকরণ করাইয়া দিলে,—শিশুর পক্ষে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বাঙালীর বর্তমান অবস্থা শিশুর মতই অসহায়। বাঙালী আপাততঃ পরিমিত-মাত্রায় লঘুপাক তরল খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক করিতে পারিবে; কঠিন ও গুরুপাক দ্রব্য গলাধঃকরণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারিবে না। এরূপ অসহায় অবস্থায়,—আত্মচেতার প্রথম প্রভাতে,—যাহারা বাঙালীর জন্ত কঠিন ও গুরুপাক খাদ্যের ব্যবস্থা করিবেন, তাহারা হিতৈষী হইয়াও অজ্ঞাতদ্বারে বাঙালীর অকাঙ্ক্ষিত্যকে আহ্বান করিয়া আনিবেন। হিতৈষীর অভাব নাই। অনেক অকৃষিম হিতৈষী বাঙালীকে রাতারাতি মলুষ করিয়া তুলিবার আশায়, কত কঠিন ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করাইয়া বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহা হইতে বাঙালীকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এখন কিছুদিনের জন্ত ধনকুবেরগণের বিশেষ মেহদৃষ্টি আবশ্যক। তাহারা ই নিঃস্বল বাঙালীর প্রকৃত পিতামহ। তাহাদের আত্মকৃপালাভ করিতে না পারিলে, বাঙালী কেবল বুদ্ধিজ্ঞাপন কার্য্যেই অবসর হইয়া পড়িবে। এখন কিছুদিনের জন্ত অভিজ্ঞগণের বিশেষ মেহদৃষ্টি আবশ্যক। তাহারা ই অনভিজ্ঞ বাঙালীর প্রকৃত পরিচালক। তাহাদের সহপদেশ লাভ না করিলে, বাঙালী গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিয়া অজীর্ণরোগে ভরাজীর্ণ হইয়া পড়িবে।

বদেশ সকলের নিকটেই কিছু-না-কিছু সেবা প্রার্থনা করে;—সকলের নিকটে এক-শ্রেণীর সেবা প্রার্থনা করে না। শক্তিতেদে বদেশসেবার প্রকারভেদ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বাহার যে শ্রেণীর শক্তি, প্রয়োজন

উপস্থিত হইলে তাহাকে সেই শ্রেণীর সমস্ত শক্তি নিঃশেষে মাতৃসেবার উৎসর্গ করিয়া দিতে হয়। এইজন্য স্বদেশসেবা বীরের ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বীর যেমন স্বদেশসেবার জন্য ক্রেশকে ক্রেশ জ্ঞান করে না, সফটকে সফট জ্ঞান করে না, বরং প্রয়োজন হইলে অকাতরে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিয়া থাকে; বাহারা যুদ্ধ করে না, তাহাদিগকেও ঠিক সেই ভাবেই সকল ক্রেশ—সকল সফট তুচ্ছ করিয়া, প্রয়োজন হইলে স্বদেশসেবার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। দেশের সমস্ত নরনারী এই ভাবে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিলে, তাহার সমুখ হইতে পরিত-প্রমাণ বিয়বাধাও ধূলিকণার ভায় ফুৎকারে উড়িয়া চলিয়া যায়। ইহাই আত্মচেষ্টার পরিণত কল। ইহাকে লাভ করিতে না পারিলে, আত্মশক্তি প্রবুক হইয়া উঠিতে পারে না।

ভারতবাসীর নিকট একদিন এইরূপ আত্মোৎসর্গ সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া সুপরিচিত ছিল। মানবসমাজে বাহারার অকৃত্যময়লাভ করিয়াছে, তাহার সর্বশেষ এইরূপ আত্মোৎসর্গের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে। শক্তিলাতের অন্ত মন্ত্র ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতিহাস এ বিষয়ে তর্কের প্রশ্রয়দান করে না। পুরাকালের ভারতবর্ষের লোকেও এ বিষয়ে তর্কের প্রশ্রয় দান করিত না। পুরাণকাহিনী ইহারই মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিত; তাটগণ ইহারই মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া বীরগণকে উৎসাহদান করিত;

প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনার ইহারই মাহাত্ম্য সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

শিশু যখন আত্মচেষ্টার প্রথম পদবিক্ষেপ করিবার আয়োজন করে, তখন তাহাকে কত-না লাজনা ভোগ করিতে হয়! কতবার ভূপতিত হইয়া—কখন বা সর্বদা ক্ষতবিক্ত করিয়া,—তাহাকে মাৰ্জ্ব হইয়া উঠিতে হয়। মানবসমাজের অবস্থাও সেইরূপ। অনেক লাজনা ভোগ করিতে হয়,—অনেক বার্ষ্য-চেষ্টার অদৃষ্ট বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয়। সমুচিত জন্মগ্রহণ না থাকিলে, এই অবস্থায় মানবসমাজ সাধনমার্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। ইহা অগ্নিপরীক্ষা অপেক্ষাও কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, আত্মচেষ্টার আত্মশক্তি প্রবুক হইতে পারে না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রধান মন্ত্র অধ্যবসায়, তাহারই নাম তপস্বী।

উদ্বীপনার আত্মচেষ্টার আরম্ভ হইতে পারে, সমুচিত অধ্যবসায় না থাকিলে, আত্মচেষ্টা প্রতিহত করিতে পারে না। তাহাকে নিয়ত প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সমুখে অগ্রসর হইতে হয়, তাহার প্রধান বল অধ্যবসায়। মৌখিক উত্তেজনায় সে বল জন্মগ্রহণ করে না; তাহাতে লালসা জন্মগ্রহণ করিতে পারে,—শক্তি বিকশিত হয় না। দৃঢ়বিশ্বাস ভিন্ন অধ্যবসায়ের অন্ত উপায় নাই। যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, সেই পথই পথ, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসেই অধ্যবসায় লাভ করিতে পারা যায়। তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইলেই অধ্যবসায় অবসর হইয়া পড়ে!

পরাদীন জাতির পক্ষে অভ্যদয়সাধক অধাবসার লাভ করা অসম্ভবত কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, কঠিন নহে। কারণ, পরাদীন জাতির পক্ষে অভ্যদয়লাভের একটি ভিন্ন দুইটি পথ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা রাজাকুল্পার মূল সুবিস্তৃত রাজবর্ষ্য নহে; -তাহা আত্মচেষ্টার নতোরত বন্ধুর পরিপন্থ। বাহ্যিক সম্মুখে একটি ভিন্ন দুইটি পথ বর্তমান নাট, সংশয় আসিয়া তাহার অধাবসারকে অবসন্ন করিতে পারে না।

রাজাকুল্পা স্বতঃপ্রসূত হইয়া তাতে ধরিয়া উন্নতিসোপানে উত্তোলিত না করিয়া দিলে, পরাদীনের পক্ষে রাজাকে রাজধর্ম পালন করিবার জর বাধ্য করিবার উপায় নাই। স্বতরাং পরাদীন জাতি রাজাকুল্পাভ্যেতাের লুপ্তাবশেষে বসিয়া বসিয়া সমস্রক্ষণ করিতে পারে না; তাহাকে সমর থাকিতে আত্মচেষ্টার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়। সমর থাকিতে! কারণ,—সমর ফুটিয়া গেলে, আত্মচেষ্টার সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়।

বাঙালীর আত্মচেষ্টার সমর দায়-দায় হইয়া উঠিয়াছে! আদর্শ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; শিক্ষা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; সংস্কার পরিবর্তিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে; রাজশাসনে বাঙালীশাসিত ক্রমে ক্রমে অপদার্থ হইয়া উঠিতেছে! এখনও আত্মচেষ্টার শেষ অবসর; বুঝি-বা এখনও তাহা অনেকের পক্ষে কঠিন,—কাহারও কাহারও পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে! এখনও যে-পরিমাণ চরিত্রবল বর্তমান আছে, তাহা যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। এখনও যে-পরিমাণ আত্মত্যাগের সারথী আছে, অর-

দিনের মধ্যে তাহাও দূরীভূত হইবে। প্রতি দশবৎসরে অগ্রহীন বাঙালী রাজকার্যে নিয়োগলাভের আশায় অধিক আগ্রহে ধাবিত হইতেছে;—রাজপদ লাভ করিবার আশায়, রাজপুরুষগণের মনস্তৃষ্টিসাধন করিয়া রাজপদ রক্ষা করিবার আশায়, কখন বা কেবল রাজপুরুষগণের শুভদৃষ্টি-আকর্ষণের আয়োজনে, কত বাঙালী অবলীলাক্রমে বদেশের কথা বিস্মৃত হইয়া, কত অকার্য্য-কুর্য্যোগে লিপ্ত হইতেও লজ্জিত হইতেছে না! উপাদিলাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যাধির জ্বর সংক্রামকমুষ্টি পরিগ্রহ করিয়া ধনশালিগণকে অপদার্থ করিয়া তুলিতেছে। ছইদশজন ক্ষণিকের মহাপুরুষ ভিন্ন অনেকের নিকটেই উপাদিশ্রুত জীবন যেন দুর্লভ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই স্রোত প্রবাহিত থাকিলে, অল্পদিনের মধ্যেই ধনীরা সম্ভ্রান্ত উপাধি-শালসার, দরিদ্রের সম্ভ্রান্ত রাজপদশালসার রাজদ্বারে প্রণত হইয়া পড়িবে। তখন আর আত্মচেষ্টার নামগন্ধও বর্তমান থাকিবে না! তা গতে হয় ত এখনই,—আত্মসংশোধন করিতে হয় ত এখনই,—প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ত এখনই,—ইহার পর পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া বাঙালীকে একেবারে রসাতলগামী করবে!

কাহার অগ্রহণ্যভ্যেতাের আশায় বাঙালী আত্মচেষ্টার শেষ অবসর প্রত্যাখ্যান করিয়া নিশ্চিন্তমনে নীরবে দিন গণনা করিবে? রাজপুরুষগণ আর বাঙালীকে মানুষ বলিয়া মনে করেন না! তাহারা দেশের শাসনকর্তা, তাহারাও পদগৌরব বিস্মৃত হইয়া, বাঙালীকে একান্তভাবে অবমাননা করিবার

জন্মই অধীর হইয়া উঠিতেছেন। ভদ্রতা তিরোহিত হইয়া বাইতেছে; সম্ভাব ওলভ হইয়া উঠিতেছে; উদারনীতি স্বয়ং-প্রণালীতে নিমজ্জিত হইতেছে; ভারতবর্ষের কথা উপস্থিত হইলে, পার্লামেন্টের সভাগণ আসন ছাড়িয়া ক্রীড়াগৃহে পলায়ন করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন! একপ অবস্থায় বাঙালী তাহার স্বদেশের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদারীন থাকিতে পারিলে, তাহাকে কিছু করতে হইত না। কিন্তু স্বদেশের কথা চিন্তা করিতে হইলেই, বাঙালীকে আত্মচেষ্টার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রসাদ লাভ করিবার আশা দিনদিন তিরোহিত হইতেছে; বাহা লাভ করিয়া অধিকারলাভ করিল বলিয়া বাঙালী অক্ষম হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও দিনদিন হস্তচ্যুত হইয়া পড়িতেছে; রাজশক্তি জনহীন নৌবাহিনীর দ্বারা বাঙালীর আকুল আর্তনাদ উপেক্ষা করিয়া তাহার জন্মভূমিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে;—মহাসভায় তাহার বিচার হইবারও অবসর দান করেন নাই! শোকার্ত বাঙালীকে আশ্রয় করিবার আশায় রাজপুরুষগণ সর্বদা বাঙালীকে তিরস্কার করিয়া কহিতেছেন,—বাহা চটবার চটয়া গিয়াছে, ইহাকেই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে; ইহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিলে কোনস্থানেই আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না! পরাধীনকে তাহার অক্ষমতার কথা শ্রবণ করাইয়া দিলে, নিষ্ঠুরতার সঙ্গে অভদ্রতা মিশ্রিত হইয়া পড়ে! বাঙালী অক্ষম;—সে কথা বাঙালীর অপরিজ্ঞাত নাই। কিন্তু বাহারা শাসনকৌশলে বাঙালীকে এমন অক্ষম

করিয়া তুলিয়াছে, ইহা তাহাদের শাসননীতির কি শোচনীয় পরিণাম!

আধুনিক সভ্যসমাজে ইংরাজের নাম সর্বদা ভয়যুক্ত হইয়াছে। ইংরাজের বাহুবলকে তাহার কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; ইংরাজের উদারনীতিই তাহার একমাত্র কারণ। এই কারণে, যে দেশে বাহারা উদারনীতি প্রবর্তিত করিতে গিয়া উৎপীড়িত হইয়াছে, তাহারাই ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডের শাসননীতি প্রজার কল্যাণকামনাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে। কিন্তু সেই শাসননীতি ভারতবর্ষে আসিয়া কত না কলঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে! বক্তৃতায় ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের রাজমুকুটের সমুজ্জল রত্নপদক বলিয়া করতালি লাভ করিতেছে;—বাবহারে ভারতবর্ষ ইংরাজের গৃহপালিত কুকুরের মতও সমাদর লাভ করিতেছে না! ইহা অপেক্ষা ইংরাজশাসননীতির আর কি শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত হইতে পারে?

বাঙালী চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে;—ইংলণ্ডের এবং সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা মহাসভায় সভাগণকে ভারতবর্ষের কল্যাণসাধনের জন্য যথোপযুক্তভাবে জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই! বাঙালীর আত্মচেষ্টা এ পর্যন্ত যে সকল চিরপরিচিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কথা শ্রবণ করিলে বিষয়ে অভিকৃত হইতে হয়! দেশের অবস্থা,—দেশের আকাজকা,—দেশের অভাব,—রাজপুরুষগণের কর্ণগোচর করিবার প্রধান উপায় সংবাদপত্র এবং সভা। বাঙালী ইংরাজের

কাছেই তাহার শিক্ষালাভ করিয়া, সেই উপায় অবলম্বন করিতে গিয়া, ইংরাজের কাছেই উপহাস ও তিরস্কার লাভ করিয়াছে ! রাজপ্রতিনিধির শুভাগমনের সংবাদে দেশের লোকে টাঙ্গা তুলিয়া, তোরণ সাজাইয়া, বাতাস পোড়াইয়া, প্রদীপ জ্বলাইয়া, উপলোকনহস্তে রাজপ্রতিনিধির সমীপবর্তী হইয়া যখন তিরস্কার এবং উপহাস লাভ করে, তখন জনসাধারণ যে কি মর্ষবেদনা অনুভব করিয়া থাকে, তাহা মানবভাষায় বাক্য হয় না। বাঙালী বহুবার এরূপ বিভ্রমের ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছে !

উপর্যুপরি বিভ্রমের ভোগ করিয়া, বাঙালী এতদিনের পর বলিয়া উঠিয়াছে,—মার না—বধেষ্ঠ হইয়াছে,—এবার কেবল আশ্বচেটা। ইহা রাজবিদ্বেষ নহে : ইহা অমূল্যর শাসননীতির অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণাম ! চিকিৎসায় বার্ষমনোরব হইয়া, ব্যাধিগ্রস্ত মানবগণ শৈলে শৈলে পরিভ্রমণ করিয়া স্বাস্থ্যসঞ্চয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাও সেইরূপ আশ্বচেটা। ইহাই স্বাভাবিক পরিণাম,—রাজাশুঙ্কলাভের জন্ত অরণ্যে বৈদ্যন করিবার ইহাই স্বাভাবিক পরিণাম। এই পরিণাম বাঙালীর নিকট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ;—তাহাকে আর কষ্টবোধের পথ দেখাইয়া দিবার জন্ত উত্তেজনা করিবার প্রয়োজন নাই। এখন বাঙালী পথ পাইয়া সেই পথে ধাবিত হইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কোন্ পথে হয় না, তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কোন্ পথে হইতে পারে, তাহাই ধীরভাবে বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

আঘাতের পর আঘাতে পদে পদে বিপর্যাস্ত হইলে, একদিন না একদিন আত্মশক্তিনাভের জন্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা সহসা জাগিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সহসা আত্মশক্তি লাভ করা অসম্ভব। তাহা তপস্তালব্ধ অমৃতফল ;—তপস্তা ভিন্ন, চিহ্ন করিলেই, সহসা আত্মশক্তি লাভ করা যায় না। তপস্তায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সর্বাঙ্গে আত্মাকে লাভ করিতে হয়। কিন্তু—

“নারমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”—

বলহীন সহসা আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। বাঙালী বিচ্ছিন্ন বলিয়াই বলহীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এতকাল বাঙালী যে তাহার আত্মতত্ত্ব ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, কল্পনাবলে কবিকাহিনী রচনা করিয়া, নিরন্তর মৃগতৃষ্ণিকার বিভ্রমের ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে ;—বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া থাকিলে, কেহ কখন প্রকৃত আত্মতত্ত্বের সন্ধানলাভ করিতে পারে না !

এবার ঘটনাক্রমে বাঙালী একবার সন্নিধানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিবারাজ, আত্মতত্ত্বের সন্ধানলাভ করিয়াছে। বাঙালী দুর্বল,—বাঙালী পরাধীন,—বাঙালী কলহ-কোলাহলে বিচ্ছিন্ন,—বাঙালী দ্বিধাষেবে জরাজীর্ণ ;—এই সকল কারণেই বাঙালী আত্মতত্ত্বের সন্ধানলাভে অসমর্থ ছিল। এখন বাঙালী বুঝিয়াছে,—বিচ্ছিন্ন থাকিবার কারণ নাই ;—ধনিদরিদ্র এক ; পণ্ডিত-মূর্থ এক ; হিন্দু-মুসলমান এক। এক সূত্র-দ্বন্দ্ব, এক আশা-নিরাশা, এক ভাবা-সাহিত্য, এক জন্মভূমি সকলকেই এক সূত্রে বাধিয়া

রাখিয়াছে। বাঙালী পতিত; তথাপি উদ্ধিত হইতে পারে। বাঙালী বিচ্ছিন্ন; তথাপি সংযুক্ত হইতে পারে। বাঙালী বহুভাগে বিভক্ত; তথাপি এক হইয়া উঠিতে কতক্ষণ? এক হইয়া উঠিতে পারিলে, বাঙালীরও অত্যাচারলাভের আশা আছে। ইহাই বাঙালীর আত্মতত্ত্ব। না বুঝিয়া বাঙালীই বাঙালীর সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে; না জানিয়া বাঙালী তাহার মাতৃভূমির মঙ্গলহার ছাড়িয়া দূরে দূরে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া পরিশ্রান্ত হয়; না চিনিয়া বাঙালী তাহার আপন ভ্রাতাকে উপেক্ষা করিয়া, পরকে গ্রহণ করিতে গিয়া, নিরত আত্মবিস্ময়না সহ করে। আত্মতত্ত্বের সন্ধানলাভ করিয়া বাঙালী তাহার বর্ধিত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনও বাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থতত্ত্বে অন্ধ হইয়া বাঙালীর আত্মতত্ত্ব দর্শন করিতে পারিতেছে না, তাহারাও অন্নদিনের মধ্যেই বুদ্ধিতে পারিবে,—জাতিগত স্বার্থের তুলনায় ব্যক্তিগত স্বার্থ কত অকিঞ্চিৎকর। তাহা বুদ্ধিতে অধিক বিজ্ঞাবুদ্ধির প্রয়োজন হইবে না। বাহা সকলের স্বার্থ, তাহাই প্রত্যেকের স্বার্থ; বাহা সকলের সমষ্টিগত স্বার্থের অমঙ্গল আনয়ন করে, তাহা কাহারও প্রকৃত স্বার্থ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তাহা আত্মদ্রোহ;—তাহাই বদেশদ্রোহ। তাহার জন্মই বাঙালীর কত সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে! আবার কি বাঙালী বদেশদ্রোহে লিপ্ত হইবে?

বাঙালার রক্তশোধন করিয়া আত্মশোধন করা বাহাদের বাণিজ্যনীতি, তাহারা বাঙালীকে ভুলাইয়া রাখিয়া বদেশশিল্পের উন্নতি-

সাধনের চেষ্টায় প্রাণপণে বাধা প্রদান করিবে। ইহা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙালী বদেশশিল্পের উন্নতিসাধনে বাধা প্রদান করিলে, তাহা অস্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। বাহারা তাহাতে অগ্রসর হইবে, তাহারা অন্নকালের মধ্যেই আত্মভ্রম বুদ্ধিতে পারিবে। আত্মশক্তিই যে সকলের অত্যাচারলাভের একমাত্র পথ, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া, সকলকেই সমানভাবে তপস্তার নিযুক্ত হইতে হইবে।

আত্মশক্তি লাভ করিবার জন্য তপস্তার নিযুক্ত হইতে হইলে, দুই শ্রেণীর তপস্তার নিযুক্ত হইতে হয়। এক শ্রেণীর তপস্তার নাম সংযম; অপর শ্রেণীর তপস্তার নাম মনন। এই উভয় শ্রেণীর তপস্তার সাধারণ নাম সাধন। অভ্যাসে সাধিত হয় বলিয়াই তাহার নাম সাধন।

যে সকল কারণে, যে সকল কার্যে, যে সকল অভ্যাসে, আত্মশক্তির অপচয় সাধিত হইবার আশঙ্কা থাকে, সাধক তাহার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য সংযমের অভ্যাস করেন। সংযমে শক্তি বিকশিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা দূরীভূত হয়; সংযমে অপচয় অপসারিত হইয়া শক্তিসঞ্চয়ের সুত্রপাত হয়। সাধক তাহার জ্ঞান আত্মনিগ্রহ করিতেও ক্রটি করেন না। ব্রত, নিয়ম, উপবাস, ব্রহ্মচর্য, প্রায়শ্চিত্ত,—সমস্তই সংযমের অন্তর্গত। সংযমের প্রধান লক্ষ্য ত্যাগ;—সারাসারকে লাভ করিবার জন্য অপারের ত্যাগ। তাহা আপাতত কঠোর বলিয়া প্রতীত হইলেও, সত্য সত্যই কঠোর নহে। যে তাণ্ডে অমৃত সঞ্চিত হইবে, তাহার হিত্ররোধ করা কর্তব্য

কিনা, তাহাতে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না।

বাঙালী আত্মশক্তিসংগ্রামের জন্ত সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে সংঘম অবলম্বন করিয়া জাগরীকারের কঠোরতা সহ্য করিতে হইবে। তাহার প্রধানপুরুষ,—যাহাদের দৃষ্টান্ত অজ্ঞাতসারে শনৈঃশনৈঃ জনসাধারণের অণুকরণীয় হইয়া উঠিবার সম্ভাবন, তাঁহারা জ্ঞানবলে আত্মশক্তিসংগ্রামে সমর্থ হইলেও, তাঁহাদিগকেও লোকশিক্ষার্থ আচারে ব্যবহারে, কথায়-কার্যে সংঘমের কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। বিলাসেই বাঙালী এত শক্তিশীল হইয়া পড়িয়াছে! যে সকল দ্রব্যের আদৌ প্রয়োজন ছিল না, অভ্যাসে সেগুলি তাহারও প্রয়োজন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে তাগণ করিবার জন্য সকলকেই যথাসাধ্য যত্ন করিতে হইবে। ব্যহার আদৌ প্রয়োজন ছিল না, তাহাকে তাগণ করা কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে।

অর্থাৎ বাঙালীর নিকট পরমার্থ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। তাহাতে সংঘম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সম্ভোগ প্রবলপন্থাপে জাগিয়া উঠিয়াছে! সংঘম কঠোর; সম্ভোগ প্রলোভনময়। প্রলুব্ধ বাঙালী যে-কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করিবার জন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! অতি অল্পদিনের মধ্যে অর্থোপার্জনের নিকট পন্থাকে অধিক আগ্রহে অবলম্বন করিতে গিয়া, বাঙালী তাহার সাহস, সতানিষ্ঠা এবং আত্মসম্মান অতলভাবে বিসর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যে সমাজে ধনের সম্মানই যথার্থ সম্মান বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে, সে সমাজের

নির্ধনেরাও সম্মানলালসায় ধনী সাজিবার জন্ত বাহ্যভূষণ প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। জ্বরপথে থাকিয়া যে অর্থ উপার্জিত হইতে পারে, তাহাতে ধনী সাজিবার সুবিধা না হইলে, অজ্বরপথেও অর্থোপার্জনের সূত্রপাত হয়! ক্রমে চরিত্রবল বিনষ্ট হইয়া যায়, মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হইয়া পশুত্বের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এক্ষণ অবস্থায় ধর্মশাস্ত্র, ধর্মপ্রচারক অথবা ধর্মাদিকরণ লোকসমাজের অধঃপতনের গতিরোধ করিতে পারে না। জনসমাজ কেবল প্রার্থনাকার্য ধর্ম স্বীকার করে; কেবল দণ্ডভয়েই ধর্মাদিকরণ স্বীকার করে; কিন্তু ধর্ম এবং ধর্মাদিকরণকে গোপনে পদদলিত করিয়া অজ্ঞার উপায়ে অর্থোপার্জন করিতে বিরত হয় না।

তাহার অর্থ নাই, সে সমাজে হেয় হইয়া পড়ে! তাহার সকল গুণ একমাত্র দারিদ্র্য-দোষেই বিস্তৃত হইয়া যায়। ধনি-দারিদ্রের জন্মবন্ধন এইরূপেই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। বাঙালীর মধ্যেও তাহারই সূত্রপাত হইয়াছে। যে দেশে ধন কখনও সম্মানের পরিমাপক বলিয়া পরিচিত ছিল না, সে দেশ হইতেও আত্মরক্ষা অস্ত্রহীন হইয়া গিয়াছে;—কেবল বাহ্যভূষণই তাহার শূন্যস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে!

হিন্দুর সহিত সন্তোষে ও সমাদরে একত্র বসতি করিয়া মুসলমান তাহার হিন্দু প্রতিবেশীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে জাতিভেদ এবং ধর্মভেদ থাকিতেও, হৃদয়ভেদ ছিল না। ক্রমে হিন্দুমুসলমান কি শিক্ষা শিখিল,—তাহারা নিরক্ষর এবং নির্ধন স্বদেশবাসীকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল!

যাহারা ঝড়বৃষ্টি মাখায় করিয়া শত উৎসব করে,—যাহারা প্রাণ বিসর্জন করিয়া ধনীর ধনমান রক্ষা করিয়া থাকে,—যাহারা বিনিময়নয়নে রজনীষাপন করিয়া লোকসমাজের দম্ভভয় নিবারণ করে,—অভ্যাসদোষে ধনকুবেরগণ তাহাদিগকেই অবজ্ঞা করিতে শিখিয়া আত্মাবমাননা করিতেছে! এই অভ্যাসদোষ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

হিন্দুমুসলমানের সাম্রাজ্যকলহ এখন ইতিহাসের জীর্ণদগুণে নীরবে কীটদষ্ট হইতেছে। মোগলপাঠানের গৃহকলহের জ্বালা তাহাও সাম্রাজ্যকলহ মাত্র। সে কলহের অবসানে, হিন্দুমুসলমান এক হইয়া উঠিবে একত্র জন্মভূমির সেবা করিয়া আসিয়াছে। আজ যে সকল মুসলমান ব্যক্তিগত স্বার্থ-চিন্তায় মতিভ্রান্ত হইয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে হৃদয়গতপার্থক্যস্থিতির চেষ্টা করিতেছে, তাহারা অজ্ঞাতসারে স্বদেশদ্রোহ লিপ্ত হইতেছে। আজ বাংলাদেশে যতাদের স্বদেশ, তাহারা যে বাঙালীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছে, তহাকে স্বদেশদ্রোহ ভিন্ন আর কি বলিয়া অভিহিত করিব? সকল চিন্তা পরাধীন; সকল মুসলমান পরাধীন নহে। এখনও ভারতবর্ষের বাহিরে মুসলমানের স্বাধীন-রাজ্য বর্তমান আছে। তাহারা স্বদেশের জ্ঞা এখনও অকাতরে আত্মবিসর্জন করে; তাহাদের ধর্মের দোহাই দিয়া যাহারা বাংলাদেশে বাস করিয়া স্বদেশদ্রোহ লিপ্ত হইতেছে, তাহারা যে সমগ্র মুসলমানসমাজের অকৃত্রিম কৃপাপাত্র, তাহাতে সংশয় নাই। বাঙালী মুসলমানের হিন্দু ভিন্ন আত্মীয় নাই; বিপদে পড়িলে হিন্দু ভিন্ন দাঁড়াইবার স্থান নাই;

জীবিকার্জনের জন্ত হিন্দু ভিন্ন সহায় নাই; ঋণ গ্রহণ করিবার জন্ত হিন্দু ভিন্ন মহাজন নাই। সেই মুসলমানসমাজের এক শ্রেণীর লোক যখন হিন্দুমুসলমানের মধ্যে হৃদয়ভেদ উপস্থিত করিবার জন্ত যথাসাধ্য যত্ন করিতেছে, তখন তাহাদিগকে কৃপাপাত্র ভিন্ন কি বলিব? হিন্দুমুসলমান বঙ্গমাতার বমজসন্তান,—উভয়ের লক্ষা অভিন্ন; উভয়ের আশাভরসা এক হুত্রে গ্রথিত।

রাজদ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিবার আকাঙ্ক্ষাকে কাহারও পক্ষেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তথা সকল দেশেই অক্ষম অপদার্থ লোকের অন্তর্গতি বলিয়া স্থপরিচিত। স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া, স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করিবার আকাঙ্ক্ষাকেই সকল দেশের ইতিহাস প্রকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলিয়া ঘোষণা করে। যে সকল মতিভ্রান্ত মুসলমান গোলামীকেই মুসলমানসমাজের বদ হইয়া উঠিবার রাজপথ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, তাহাদের পুত্রপৌত্রগণ ইহার জ্ঞা তাহাদিগকে প্রশংসা করিতে পারিবে না। আত্ম-যাহারা স্বদেশদ্রোহ লিপ্ত হইতে লজ্জিত হইতেছে না, তাহাদের পুত্রপৌত্ররাই এ সকল কথা শ্রবণ করিয়া লজ্জায় নিয়মান হইয়া পড়িবে! এই সকল বিষয়ে সংঘম আবশ্যক। ইহা কি সত্য-সত্যই এত কঠিন যে, মাতৃভূমির মঙ্গলদ্বারে দাঁড়াইয়া ‘হিন্দুমুসলমান’ এই অকীটিকর স্বদেশদ্রোহ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না?

বিলাস ত্যাগ করিতে পারিলে, অসদ্ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারিলে, অভ্যাসদোষ ত্যাগ করিতে পারিলে, স্বদেশদ্রোহ ত্যাগ করিতে

পারিলে, বাঙালী অন্নদিনের মধ্যেই এক হইয়া উঠিয়া শক্তিশাল্য করিতে পারিবে। এইরূপে শক্তির অপচয়ের পথ রুদ্ধ হইলে বাঙালীই বাঙালীকে শক্তিদান করিতে পারিবে; একের দৃষ্টান্ত অনেককে,—অনেকের দৃষ্টান্ত সকলকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারিবে।

জনসাধারণ য হাকে গৌরবদান করে, রাজা তাহাকে দণ্ডদান করিলেও, তাহার গৌরব তিরোহিত হয় না। জনসাধারণ যাহাকে গৌরবদান করে না, রাজা তাহার অপাদমস্তক উপাদিবিজড়িত করিয়াও, যথার্থ গৌরবদান করিতে পারেন না। এই

ভাবে বাঙালীর মধ্যে ভাল করিয়া ছুটিয়া উঠিতেছে; ইহাতেই ধনকুবেরগণ স্বাহ্যলাভ করিয়া সবল হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা দেশের,—দেশ তাঁহাদের,—এই আশ্রিত-আশ্রয়দাতার চিরপরিচিত মেহের সম্বন্ধ ইতিহাসের সম্বন্ধ। রাজা কেবল সন্নেহে করমর্দন করিয়া আপ্যায়ন করিতে পারেন; দেশের লোকেই দেশের লোককে স্বন্ধে বহন করিয়া লইয়া স্বদেশের কীর্তিমন্দিরে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে পারে। ধনিদরিজের এই স্বপ্নের সম্বন্ধ পুনঃসংস্থাপিত হইবামাত্র, সকলেই আশ্রয়শক্তি লাভ করিতে পারিবে। তাহাই নবজীবনলাভের সুপরিপক্ক অমৃতকল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

ছুভিক্ষপীড়িত ভারতে ।

১

হৈদরাবাদের অভিমুখে ।

— কতকগুলি —

আর সে কৃণ্ডামল্য। তুমি নাই; আর সে তালভাতীর বৃক্ষাদি নাই; আর সে লাগ মাটি দেখা যায় না। বেশ একটু শীত পড়িয়াছে।...পশ্চিমে ও মাদ্রাজের হরিংস্ত্রামল প্রদেশ ছাড়িয়া আসিবার পর,—সমস্তরাজি ভ্রমণ করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। তখন এই সমস্ত পরিবর্তন লক্ষিত হইল। সেই “চিরকেনে” কাকদিগের কাকা-ধনি ছাড়া আর সমস্তই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। হাজাপোকা মাটি, ধূসর-বর্ণের মাঠ, জোয়াশিশুর কঁকড়, পর্ব্যার-

ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ‘নারিকেলের’ পরিবর্তে শুধু কতকগুলি বিয়ল মুসকর-তরু, শীর্ণকার তালতরু খর্জুরবৃক্ষ—গ্রাম-পল্লির চতুর্দিকে লক্ষিত হইতেছে। মনে হয়, এখানকার গ্রামগুলিও বেন একটা কৃত্রিম আবু-ভাব ধারণ করিয়াছে। অশ্লীল-শ্লীলবর্ষা-মহাভূমির সহিত, বিবাদময় প্রদেশ-সমূহের সহিত যে ইসলামআভির্ষ চিরসবন্ধ, সেই ইসলামআভি এখানে আসিয়া যেন তাহাদের আত্মীয়তাবন্ধি বুদ্ধিত করিয়া দিয়াছে।

পরিচ্ছদেরও পরিবর্তন। লোকদিগের
গায় আর সব দেখা যায় না, পরন্তু শুভ্র পরি-
চ্ছদে সর্বাঙ্গ আবৃত। আর সে দীর্ঘ-লম্বিত
কেশও দেখা যায় না, পরন্তু মস্তক
উকীলের দ্বারা আচ্ছাদিত।

মঠিময়দানের উপর দিয়া বতই অগ্রসর
হওয়া যায়, ততই দেখা যায়, ঘণ্টার-ঘণ্টার
যেন তক্তার বৃদ্ধি হইতেছে। বে-সব খাঙ্গ-
ক্ষেত্র উপর হৃৎকর্ণের রেখাচিত্র বিস্তারিত,
সেই ক্ষেত্রগুলি যেন আগুনে জলিয়া-পুড়িয়া
গিয়াছে। ঘোরারি-ক্ষেত্রগুলি অপেক্ষাকৃত
ভাষসহ হইলেও, তাহার অধিকাংশই
“হলুদে-বারিয়া” গিয়াছে। বে-সব ক্ষেত্র
এখনো ঠিকিয়া আছে, সেই সব ক্ষেত্রের বন্না-
বর্ণিত পত্র পাছে পাখী ও ইঁদুরে খাইয়া
ফেলে, সেইজন্য ক্রমক্রমে মাচার উপর বসিয়া
পাহারা দিতেছে। হায় হায়! বেচারী
সাহস, হৃৎকর্ণীভিত্ত হইয়া, ক্ষুধাক্লিষ্ট হঃসাহসী
পতঙ্গ প্রাণ হইতে ছইচারিহুঁটা পত্র বাঁচাই-
বার জন্য প্রাণপণে যুঝাযুঝি করিতেছে।

শীতরাজির অবসানে সূর্য্যদেব চুম্বি-
মূলত প্রথর তাপ ভূমির উপর নির্দয়ভাবে
চালিয়া গিলেন। আকাশ বহু নীলবর্ণ
ধারণ করিল। একটা বিশাল নীলকান্তমণির
ভায়ে প্রতীকমান হইতে লাগিল।

বিবাসনানে, এখানকার ভূতাপ, এক
অপূর্ণতার ধারণ করিল। অহরন্ত তাপমণ্ড
ঘোরারি-ক্ষেত্রের উপরে, তাপমণ্ড অঙ্গলের
মনো, একাঙ-একাঙ ভাবল পাঁচপত্নী, —
বিচিত্র আকারের, বহুপাশ, অঙ্গলের বড়-
বড় গণ্ডপৈল। মনে হয়—বতপ্রকার অকৃত
ভায়ে, —অকৃতভাবে—কোন-এক পদার্থকে

বসানো যাইতে পারে, সেইরূপ করিয়া
উহাদিগকে বসানো হইয়াছে। কোনোটা একে-
বারে খাড়া হইয়া আছে; কোনোটা ঝুঁকিয়া
আছে; এবং এই বিচিত্র-আকারের প্রস্তর-
গুলি একপড়াবে, পুঞ্জীভূত যে, উহাতে
কতকটা পর্কতের সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।
আবার উহাদের মধ্যে কতকগুলি বাতবিকই
পর্কতের ভায়ে উঠ।

অবশেষে, সূর্য্যাস্তসময়ে হৈদরাবাদ
দৃষ্টিগোচর হইল। শাদা ধুলার আচ্ছন্ন—সব
শাদা। সেই মুসলমানী-ধরণের দ্বারভা-
ঙালা ছাদ; সেই লম্বুগঠনের
ধ্বজচূড়াসমূহ (minaret)। চতুর্দিকস্থ
তরুণলব শুক ও মুমূ। মনে হয় যেন,
বহুনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটনাছে;—গ্রীষ্ম-
সাম্রাজ্যে যেন বিষম শরতের আবির্ভাব।
নগরের পাদদেশ দিয়া যে নদীটি বহিয়া
যাইতেছে, উহার তল-পরিসর বৃহৎ মূলদীর
ভায়ে; কিন্তু উহার জল প্রায় শুকাইয়া
গিয়াছে; উহার জল এত নিম্নতলে যে,
প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। হাতীরা দলে-দলে
(তটভূমিরই ভায়ে ধূসরবর্ণ) ধীরপদক্ষেপে
একেবারে নীচে নামিয়া যাইতেছে। নদীতে
অবতরণ করিয়া উহার জলপান করিবে—
জান করিবে।

বিবাসনানের সঙ্গে-সঙ্গে, নগরের
পশ্চাত্তাগে, পশ্চিমদিক্কা যেন আগুনের মত
লাল হইয়া উঠিল। ভূম্বাচ্ছন্ন নীলিমায়
নগরের সর্বস্ত ভঙ্গতা যেন নির্লিপিত হইল।
এ-হেন হৃদয় আকাশে, এই সময়ে
বাহুভেরা বিশেষে সঞ্চরণ করিতে
লাগিল।

২

হৈদরাবাদে।

কিছু বাহাই হটক, প্রতিবেশী রাজপুতের
ভাৱ, এই রাজ্যের লোকেরা এখনও ক্ষুধার
জালায় ততটা অভিভূত হয় নাই এবং পরী-
হানতুল্য উহাদের রাজধানীটি আজ উৎসব-
আনন্দে আকর্ষিত নিমগ্ন;—উহারা নিজামের
গুণাগমন প্রতীকা করিতেছে। সমস্ত
গৃহের পতাকার, এবং রাজপথে রেশম-
মথুল-মণ্ডিত যে-সব বিজয়তোরণ স্থাপিত
হইয়াছে তাহাদের শিরোদেশে, এই কথাগুলি
বড় বড় সোনালি অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে :
—“আমাদের নিজামবাহাহর দীর্ঘজীবী
হউন।”

গুণবর্ণ হৈদরাবাদ। একটি শুকপ্রায়
নদী সমুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে; হাতীরা
দলে-দলে নদীতে নাবিয়া উহার নীতল
জলে অবগাহন করিতেছে। এখনো কেন
নিজাম স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন না
—তাই, উৎসবমত্ত হৈদরাবাদ, —অজগতাকা-
ভূষিত হৈদরাবাদ, একসপ্তাহ ধরিয়া প্রতিদিন
উহার প্রতীকা করিতেছে।

যে বিশাল প্রান্তরসেতু দিয়া নগরে
প্রবেশ করিতে হয়, সেই সেতুর মুখে স্বর্ণপত্র-
খচিত লাল “ক্রেশ্”-বস্ত্রে মণ্ডিত একটি
“বারপ্রকোষ্ঠ” প্রসারিত;—তাহারি কাণ্ডে
লেখা রহিয়াছে;—“বাগত নিজাম-
বাহাহর।”

এই সেতুর উপর দিয়া কত বর্ণের কত
লোক পদব্রজে, কত লোক বানে, কত
লোক বাহনে চলিয়াছে;—কতপ্রকার বান,

কতপ্রকার বাহন, কতই সমারোহ, তাহার
আর ইয়ত্তা নাই! বিবাহবর বিজনতার বধ্য
দিয়া যখন আমি এখানে আসিয়া পৌছিলাম,
তখন প্রত্যাশা করি নাই, যে-নগর ক্ষেত্র-
ভূমির মধ্যে,—প্রান্তরময় ধূসর মাঠবরদানের
মধ্যে বিলীন, সেই নগরটিকে এমন জীবন-
উত্তমে পূর্ণ দেখিব, এমন উজ্জল বর্ণে রঞ্জিত
দেখিব, এমন উৎসবানন্দে মত্ত দেখিব।

শাদা-শাদা, সোজা-সোজা, “বড়-বড়
রাস্তা—লোকের জনতার সমাচ্ছন্ন। কুন্দের
রঙের আভার বেরপ নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ভেদ
লক্ষিত হয়, এই সব লোকদিগের মুখবর্ণেও
সেইরূপ সূক্ষ্ম ভেদ বিস্তারিত। নেত্র স্বলসিয়া
যার প্রথমই উজ্জ্বলের অনন্ত বৈজ্ঞান্য ও
বিলাসলীলা দেখিয়া; পাগড়ির-গোলাপি
রং,—“সামন্”—নাছের রং—শিচ-কুলের রং।
কোনোটার কুমুদকুলের, কোনোটার
“আমারান্ত”—কুলের, কোনোটার “নারিসান্-
কুলের, কোনোটার “বটবুকপ্”—কুলের রং।
পাগড়িগুলা প্রকাণ্ড-বড়;—ছোট-ছোট
একপ্রকার ছুঁচাল-মুখ ইগির চারিধারে
জড়াইয়া বাঁধা; এবং পাগড়ির আঁহলাটা,
পিছনদিকে, পরিচ্ছদের উপর স্থলিয়া
পড়িয়াছে।

কিকিং-কিকিং ব্যবধানে স্থাপিত রাজ-
পথের বিজয়তোরণগুলি গৃহসমূহের মাথা
ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তোরণের উপরে
সোনালি-“অর্ডেজ্”—সমবিত্ত মসৃণবি-ধরণের
ধ্বজচূড়া (minaret)। কোথাও বা, এই
তোরণের সহিত—রেশমমণ্ডিত ও বহু-
নির্মিত লম্বুধরণের বারপ্রকোষ্ঠ সংযোজিত
নিজামের বাগত-অভ্যর্থনার জন্য এই সমস্ত

স্থাপিত হইয়াছে। নগরের মধ্যস্থলে—রাজ-
পঞ্চসমূহের কেন্দ্রদেশে,—চৌমাথা রাস্তার
উপর, একটা বিরাট-প্রকাণ্ড “চোরমুখো”
জোরাধ,—বাহার ধলচূড়া সহরের সমস্ত
ধলচূড়া ছাড়াইরা, মসজিদের শীর্ণকার
ধলচূড়া ছাড়াইরা, হৈদরাবাদের শুভ্র
মুসারানি ছাড়াইরা, সুনির্মল এবং আকাশে
একেবারে সিঁধা উঠিয়াছে।

নীধানিধা চুঁচাল-মুখ আব্বো-খিলান-
গুলি ভারতে আসিয়া। একটু জটিলভাব
ধারণ করিয়াছে,—এখন উহাতে কোথাও
বা ফুলমালার কাজ—কোথাও বা খাঁজ-
কাটা কাজ দৃষ্ট হয়। ভারতীয় শিল্পীরা
মূল-আদর্শের নক্সাকে খ্রীসম্পদে আরো
যেন সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেক
গৃহের এখন-তলে কত যে বিচিত্রধরণের
ছোট-ছোট খিলান সারি-সারি চলিয়াছে,
তাহার আর অবশ্য নাই। খিলান-গুলি খুব
চুঁচাল অথবা খুব “খাবড়া”-ধরণের;
কোনোটা গোলাপ-পাপড়ির আকারে,—
কোনোটা বা জিপত্র কিংবা বহুপত্র তৃণের
আকারে গঠিত। বরাবর রাস্তার ধারে-
ধারে, খোলা বারগার নীচে, দোকানি-
দায়েরা গদি ও গালিচার উপর উপবিষ্ট।
দোকানের পশ্চাত্তানে, প্রাচীরের গায়ে বাহির-
খিলানের অঙ্ককরণে খিলানের একটা নক্সা
কাটা—সবুজ, নীল কিংবা সোনালি রঙে
বর্ণিত, এবং উহাতে প্রায়ই সমুদ্রাঙ্গির ভায়
কোন বৃহৎ পক্ষীর বিস্তারিত পুচ্ছের অঙ্ককৃতি
দৃষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন পণ্যজন্মের ভিন্ন ভিন্ন
বিভাগ। কোথাও রত্নাদির অলঙ্কার, কোথাও
মুক্তার কর্ভার, কোথাও বা বলরাবি বিক্রীত

হইতেছে। সকল দোকানেই,—বহুমূল্য
রত্নাদির পার্শ্বে কাচের জিনিষ, এবং খাট
সোনার পার্শ্বে খুঁটা-চুম্কির জিনিষ বিক্-
্রিক করিতেছে। সুগন্ধি-জন্মের দোকানে—
পুরাতন চীনের বুয়েমের মধ্যে বিবিধ ফুলের
আস্তর সংরক্ষিত। একটা দোকানে চুম্কি-
বসানো, জরির কাজ-করা স্বকমকে তুকি-
চটিকৃত রহিয়াছে। গণ্ডোলা-নৌকার
মুখের মত উহাদের অগ্রভাগ উপরদিকে
বাঁকানো। মধ্যে-মধ্যে ফুলের দোকান;
ছিন্নবৃত্ত গোলাপফুল ছোট-ছোট পাহাড়ের
মত স্তূপাকারে সজ্জিত; বালকেরা খুঁই-
ফুলের রানীকৃত স্তূপ হইতে ফুল উঠাইরা-
লইয়া মুক্কা গাঁথিবার মত মালা গাঁথিতেছে।
কোথাও বা মস্তাদি বিক্রীত হইতেছে;—
বর্ণা, ছুই-হাতে-ধরিবার বড়-বড় তলোয়ার,
একটা বিশেষ-আকারের বাঘ-মারা ছোরা।
যখন বাঘ মুখব্যাহান করিয়া সমুখ্যকে
আক্রমণ করে, তখন এই ছোরা তাহার
গলার বসাইয়া দেওয়া হয়। কোথাও বা
খুঁটা-জরির বরের পোষাক,—চুম্কি-বসানো
বর-কনের টোপের বিক্রীত হইতেছে। আর
এক স্থানে, (গৃহাদির সম্মুখে, খানিকটা
“পদ-পথ” জুড়িয়া) কতকগুলি লোক মিহি
কাপড়ের উপর নক্সা ছাপিতেছে। এই
কাপড়-গুলি বাসাবৎ স্বচ্ছ; লাল, সবুজ
কিংবা হলুদে জরির উপর,—রূপালি কিংবা
সোনালি রঙের ছোট-ছোট নক্সা; এই
নক্সাগুলি আদৌ স্থায়ী নহে; এককোঁটা
বুটের জলে সমস্তই ধুইয়া যায়; কিন্তু উহার
বর্ণবিভাগ অতি চমৎকার; এই সকল কাপড়
অতি “খেলো” হইলেও, যখন এই মুক্তবার-

সেবী শিল্পীদিগের হস্ত হইতে বাতির হইয়া আইসে, তখন যেন উহা কোন পরীর মোহন অবতারণা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সোনা, সোনা, এখানে সর্বত্রই সোনা; অথবা তাহার অভাবে খুঁটা-জরি, সোনালি পাত—এমন কোন-কিছু—বাহা দীপ্ত ভাষার উজ্জল কিরণে বিকসিষ্ট করে, কিংবা কুতূহলী দর্শকের নেত্ররঞ্জন করে।

এখানকার ধূলা গুত্র, গৃহগুলি গুত্র এবং লোকের পরিচ্ছদ গুত্র। তুবারবৎ গুত্রতা—রাজপথে, জনতার মধ্যে, দোকান-হাটে; এবং লোকদিগের অন্নান-গুত্র পরিচ্ছদের উপর—বৃহদাকার মলমল-পাগড়ির সমস্ত “সারিগম” মজ্জাগ্রাম হইতে তারাগ্রাম পর্যন্ত চলিয়াছে।

রমণীরা অদৃষ্ট; (কেন না, ইহা মুসলমান-রাজ্য) একটা শাখা ঘেরাটোপে উহাদের আশ্রয়মস্তক আবৃত; বিড়ালগর্ভের ভায় প্রায়ই উহাতে একএকটা ছিদ্র কাটা;—তাহার মধ্য হইতে, কোলের-শিশুর মত ছোট-ছোট অন্ধর মাথা বাহির হইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দীর্ঘপ্রবাসী নৃপতির মহিমা কীর্তন করিবার জন্য যে-সমস্ত রেশম, মলমল, মখমলের সাজসজ্জা স্থানে-স্থানে সজ্জিত রাখাছে, তাহার সর্বত্রই যেন নীরবতাবার বলিতেছে :—“নিজামের জয় হউক্।” সমস্ত বৈয়াক্য আত্ম উন্নয়নের নিজামের প্রতীকা করিতেছে। এক সপ্তাহ হইতে সমস্তই প্রস্তুত হইয়া আছে;—এমন কি, সজ্জিত পুষ্পগুলি সূর্যোদয়ে তকইয়া বাইতেছে। এখন নিজাম আশিরিক-আড়ম্বর-

সহকারে কলিকাতার রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন;—১২খানা সোনার গাড়ি তাঁহার পিছনে-পিছনে চলিয়াছে। তিনি বরাবো আর কিরিয়া আসেন না, কোন সংবাদ দেন না, বাহা খেয়াল হইতেছে তাহাই করিতেছেন। কিন্তু ভারতবাসীরা ইহাতে বিস্মিত নহে;—কেন না, তাহার সকলেই এইরূপ করিয়া থাকে। তাই, নিরাশ না হইয়া তাহার ক্রমাগত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তা ছাড়া, এই সকল লবুবস্ত্রের সাজসজ্জা যে বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাইবে, তাহারও কোন আশঙ্কা নাই; কেন না, আকাশ এখন একেবারেই নির্মেষ।

প্রতিদিন, যেমন বেলা অধিক হইতে থাকে—সেই পরিমাণে, সমস্ত নগরীর ধুলিরাশি, জনকোলাহল, সজীভাষিরও বৃদ্ধি হইতে থাকে; অবশেষে, রাজসভাগমে সমস্তই উপশান্ত হইয়া যায়।

ঘোড়ার গাড়ি, বলদের গাড়ি ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে। রহস্তময়ী পর্দা-মহিলাদের লজ্জা, ডিঙির আকারে বাধারি গাড়ি—পর্দার সমস্ত ঢাকা। পর্দার স্থানে-স্থানে ছিদ্র। সেই ছিদ্রের মধ্য হইতে রূপসীগণ অচিজিত “ডাগর আঁধির” তীক্ষ্ণ-বাণবর্ষণ জনতার উপর করিতেছেন। কোথাও কোন অগুরুব অখারোহী ছুঁচাল-টুপির চারিধারে-অড়ানো আলাদিন-বাঁচার পাগড়ি পরিয়া, জিনের পাশে বসম আই-কাইরা—খুব ছুটিয়া চলিয়াছে। বদিক-দলের উটুঙলা দীর্ঘরেখাকারে সারি-সারি চলিয়াছে। ধূলাহুলিত, কর্ণবলিত নবু-হাতীরা কর্ণান্তে ঘরে কিরিয়া আসিতেছে।

বিলাসী হাতীরা। সানাই-বাঁজ-সহকারে বর-
বাঁজীর সঙ্গে চলিয়াছে;—পৃষ্ঠের উপর,
বাঁশীচ্ছাদিত হাওদার মধ্যে—বর প্রচ্ছন্ন।

পাকীবাহকদের, মস্তপাঠের জ্ঞান,
একধেরে গুজনধ্বনি শুনা বাইতেছে; অগ্নির
কাজ-করা রাশি-রাশি তাকিয়া-বালিশের
উপর, চন্দ্রাবারী কোন বৃদ্ধকে, অথবা কোন
পত্তারমূর্তি মৌলিক চড়াইয়া, উহার চুঁল
পর্দাধিপে চলিয়াছে। ফকিরেরা কড়ি-
সমাচ্ছন্ন কাঁধা পরিয়া, পথে-পথে ভ্রমণ
করিতেছে;—এই সব আকুলচিত্ত উদ্ভাদ-
প্রভ লোকেরা সাধু বলিয়া সমাদৃত;—এখন
হইতেই উহাদের নেত্র অভ্রজ—পরলোকের
দিকে নিৰ্ভোজিত। বৃদ্ধ দরবেশদিগের সুদীর্ঘ
কেশকষাপ;—সমস্ত ভদ্ভাচ্ছন্ন। উহার
বঁটা নাড়িতে-নাড়িতে দ্রুতপদে চলিয়াছে।
ইরেমেন্দুবাণী আরবেলা দলে-দলে ভ্রমণ করি-
তেছে; নিজাম উহাদিগকে সমস্তে নিজ-
রাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন; উহার বাহাতে
হারী হইয়া প্রজাদের মধ্যে মিশিয়া বার—
ইহাই নিজামের মনোগত অভিপ্রায়। ঐ
দেখ, দূর-অঞ্চলের কোন অখারোহী সর্দার,
—জংলি-বৃদ্ধি, মহাকায়—ঘোড়াকে বিচিহ্ন-
ভঙ্গীতে ধোঁড় করাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।
তাহার পশ্চাতে কতকগুলি বরমধারী ঘোড়-
সওয়ার।

ধূপের সৌরভ,—সাজসজ্জার. ঘোকানে
পর্দাভায়ে সজ্জিত গোলাপফুলের সৌরভ,
—খুরিতরা শাবা জুঁয়ের সৌরভ, কুয়ার-
পাতের জ্ঞান রাস্তার ধুলির উপর আসিয়া
পড়িতেছে।...কে তবে বলিবে, পশ্চিমাঞ্চল
হইতে হৃতিক আসিয়াছে—বকীর বিকট

দশন বাহির করিয়া হৃতিক ইহারই মধ্যে
সীমান্তদেশ পার হইয়াছে। না-জানি তবে
কোন অলাশয়ের জনসৈকে,—কোন বিশেষ-
রক্ষিত উত্তানে এই সমস্ত ফুল ফুটানো
হইয়াছে!

অবশেষে, স্বর্গগন্তসময়ে, “সহস্র-এক
রজনীর” ব্যক্তিগণ গৃহ হইতে বাহির হইতে
লাগিল—সেই সব সৌধীন লোক, বাহাদের
নেত্র নীলাঞ্জন চিজিত, বাহাদের শ্রঙ্গমাল
সিন্দুর-রঙ্গে রঞ্জিত, বাহারা কিংবালের
পোষাক কিংবা অগ্নি-বসানো মধ্যমের
পোষাক পরিয়া বাহির হইয়াছে, কণ্ঠে
মণিযুক্তার কণ্ঠহার ধারণ করিয়াছে, এবং
বাহাদের বাহনভেদে বৃষ্টির উপর একএকটা
পোষাপাখী রহিয়াছে।

“বাগত নিজামবাহাদুর!”—এই কথা-
গুলি আবার একটা দ্বারপ্রকোষ্ঠের চূড়া-
দেশে লিখিত দেখিলাম; সেই চূড়াদেশে
নারাজি-রঙের একটা ক্রেপ-কাপড় টানা—
তাহাতে নেবু হুলদে ও গন্ধকি-হুলদে রঙের
কালর কুলিতেছে, কালরের উপর সবুজ-রঙের
চুম্বকি বসানো। এই দ্বারপ্রকোষ্ঠের পরেই
—স্বর্ণচূড়া ও স্বর্ণ-“অর্দ্ধচন্দ্র”-বিশিষ্ট, কুয়ার-
তল একটা মসজিদ। এই সাক্ষা-নবাবের
সময়ে, তক্ত ফুলসময়ের। এই মসজিদে
আসিয়া সমবেত হইয়াছে। উহাদের ওত্র
পরিচ্ছন্ন,—মাথার মসললের কাপড় অফানী
পাগড়ি;—দূর হইতে মনে হয়—বেন বিচিহ্ন-
রঙের একপ্রকার খুব বড়-বড় ফুল হফান
রহিয়াছে।...

কিন্তু এই সময়ে একটা জনময় উঠিল,—
নিজামের আসিতে এখনক বিলম্ব আছে;

রানাদানের মাস নিশ্চয়ই পার হইয়া বাইবে, আরো বিলম্ব হইতে পারে। কবে আসিবেন,
বোধ হয় আগামী মাসে আসিবেন, কিংবা আল্লাই জানেন।...

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

মুক্তিপাশ ।



ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি
 কখন যে গেঁছ বিহানে
তাহা কে জানে !
আমি চরণশব্দ পাই নি শুনিতে
 ছিলাম কিসের ধোয়ানে
তাহা কে জানে !
 বন্ধ আছিল আমার এ গেহ
 কতকাল আসে-যায় নাই কেহ,
 তাই মনে মনে ভাবিতেছিলাম
 এখনো রয়েছে যামিনী,—
 যেমন বন্ধ আছিল সকলি
 বুঝি বা রয়েছে তেমনি ।
 হে মোর গোপনবিহারি,
 ঘুমায়েছিলাম যখন, তুমি কি
 গিয়েছিলে মোরে নেহারি ?

আজ নয়ন মেলিয়া এ কি হেরিলাম
 বাধা নাই কোনো বাধা নাই—
আমি . বাধা নাই ।
ওগো যে আঁধার ছিল শয়ন ঘেরিয়া
 আধা নাই তার আধা নাই,
আমি বাধা নাই ।

তখনি উঠিয়া গেলেম ছুটিয়া,
 দেখিছু কে মোর আগল টুটিয়া
 ঘরে ঘরে যত ছন্নর-জালানা
 সকলি দিয়েছে খুলিয়া ;—
 আকাশ-বাতাস ঘরে আসে মোর
 বিজয়পতাকা তুলিয়া !
 হে বিজয়ি বীর অজানা,
 কখন যে তুমি জয় করে' যাও
 কে পায় তাহার ঠিকানা ।

আমি ঘরে বাঁধা ছিছু, এবার আন্নারে
 আকাশে রাখিলে ধরিয়া
 দৃঢ় করিয়া ।
 সব বাঁধা খুলে দিয়ে মুক্তিবান্দনে
 বাঁধিলে আমারে হরিয়া
 দৃঢ় করিয়া ।
 রক্তছন্নর ঘরে কতবার
 খুঁজেছিল মন পথ পালাবার
 এবার তোমার আশাপথ চাহি
 বসে' রব খোলা ছন্নারে,—
 তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
 ধরিয়া রাখিব আমারে ।
 হে মোর পরাগবঁধু হে—
 কখন যে তুমি দিয়ে চলে' যাও
 পরাগে পরশমধু হে ।

• বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা ।*

বন্দে মাতরম্। বাংলানামে দেশ; তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ব-বাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে' মা সেখানে শতমুখী হ'লেন। শতমুখী হ'য়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলাদেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে-ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরো-বরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি। লোকে পরমস্বখে বাস করতে লাগল।

এমনসময় মর্ত্যে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্মকর্ম ছাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হ'ল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চলা হ'লেন। লক্ষ্মী ভাবলেন—হায়, আমি বাংলার লক্ষ্মী; আমাকে বৃষি বাংলা ছাড়তে হ'ল। তখন বাংলাতে রাজা ছিলেন, তাঁর নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাংলার লক্ষ্মী; বাংলার অনাচার ঘটেছে; আমি বাংলা ছেড়ে চল্লেম। রাজা কেঁদে বললেন,—না মা, তুমি বাংলা ছেড়ে যেনো

না; যাতে বাংলায় সদাচার কীরে আসে, তা আমি করছি। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বসলেন। দরবারে বসে' পশ্চিমদেশে কনৌজে লোক পাঠালেন, কনোজ থেকে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনালেন। তাঁদের সঙ্গে গাঁচ-জন সজ্জন কায়েত এলেন। রাজা তাঁদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তাঁরা বাংলা-দেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে বাস করতে লাগল। তাঁদের দেখাদেখি দেশে বেদবিধি—সদাচার কীরে এল। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা জুড়ে বসলেন। ধনে-ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা, লক্ষ্মী আবার চঞ্চলা হ'লেন। বাংলার ধন দেখে, ধান দেখে মোছলমান বাংলায় এলেন। তখন বাংলার রাজা ছিলেন; তাঁর নাম ছিল লক্ষণ-সেন। তাঁর রাজ্য গেল। মোছলমান বাংলার রাজা হ'লেন। হিঁদুর জাতধর্ম নষ্ট হ'তে লাগল। হিঁদুর ঠাকুরঘর ভেঙে মোছলমান মসজিদ তুলতে লাগলেন। অর্ধেক হিঁদু মোছলমান হ'ল। হিঁদু-মোছলমানে এক-গাঁয়ে এক ঠায়ে বাস করে' মারামারি-কাটাকাটি করতে লাগল। লক্ষ্মী ভাবলেন—হায়, আমি বাংলার লক্ষ্মী, আমাকে বৃষি বাংলা ছাড়তে হ'ল। তখন বাংলাতে গোড়ের পাঠানবাদশা রাজা ছিলেন, তাঁর নাম

* গত ৩০-শে আশ্বিন ঈশ্বিনকোত্তরবিক্রম কোন পদ্মিনীয়ে অর্ধসহস্রাব্দিক পদ্মিনারীর সন্নিবন্ধনে অনুষ্ঠান-সংকারে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পঠিত হইয়াছিল।

ছিল হুসেনশাহ। লক্ষী তাঁকে বশ দিলেন—
আমি বাংলার লক্ষী, আমার হিঁহুও যেমন,
মোহলমানও তেমনি; হিঁহু-মোহলমান
জাই-জাই যখন মারামারি-কাটাকাটি করতে
লাগল, আমি বাংলা ছেড়ে চল্লেম। পাঠান
রাজ্য কেনে বলেন—না, তুমি যেতে পাবে না;
আমি হিঁহু-মোহলমান সমান দেখব; তাদের
জাই-জাই একটাই করব, তুমি বাংলা ছেড়ে
যেয়ো না। মালক্ষী বলেন—আচ্ছা, তাই
হবে; আমি এখন থাকুব; দিল্লীতে
মোগল বাদশা হবে; দিল্লীর বাদশা বাংলার
রাজা হবেন; সেই রাজা হিঁহু-মোহল-
মান সমান দেখবেন; তখন হিঁহু-
মোহলমান জাই-জাই হবে, বগড়া-
নিরান মিটে বাবে। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে
বসলেন। দরবারে ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে মহা-
ভারত শোনালে। মোহলমান রাজা ব্রাহ্মণকে মান
করে' রাজবন্দী করলেন। হিঁহু গিয়ে মোহল-
মানের পীরতনার সিরি দিতে লাগল। এমন-
সবর মহাপ্রভু নদীর অবতার হ'লেন। তিনি
বনব্রাহ্মণ সবাইকে ভেকে কোল দিলেন।
পাঠানের পর দিল্লীর মোগলবাদশা বাংলার রাজা
হ'লেন। তিনি হিঁহু-মোহলমানকে সমান
রোখে দেখতে লাগলেন। হিঁহু-মোহলমান
জাই-জাই হ'ল,—বগড়াবিবাদ মিটে গেল।
বাংলার লক্ষী বাংলা ছুড়ে বসলেন। খনে-খনে
কেন পূর্ণ হ'ল।

চিরদিন সমান যায় না। এইরূপে বহুদিন
গেল। লক্ষী চকলা, তিনি আবার চকলা
হ'লেন। দিল্লীর তখনকার বাদশা ছিলেন; তাঁর
নাম ছিল আলমগির। তিনি হিঁহু-মোহলমানে
তর্কিত করতে গেলেন। বগী এসে বাদশার

রাজ্য লুণ্ঠ করতে লাগল। সাতসমুদ্র পার
হ'রে খুষ্ঠান ইংরেজ-সদাগর বাংলার বাণিজ্য
করতে এলো। দিল্লীর বাদশা তাদের আদর
করে' নিজের রাজ্যমধ্যে জারগা দিলেন।
তাদের বাংলার দেওয়ান করে' দিলেন।
বাংলার ধন দেখে, ধান দেখে তাদের লোভ
হ'ল। লক্ষী তখন দিল্লীর বাদশাকে ছেড়ে-
ছেন। ইংরেজসদাগর হয়েছিল বাংলার
দেওয়ান, এখন তারাই হ'ল বাংলার রাজা।
তারা এসেছিল সদাগর, হয়েছিল বাদশার দেও-
য়ান, হ'রে গেল দেশের রাজা। রাজা হ'ল; কিন্তু
রাজ্যে বাস করল না। বাংলাদেশের ধন নিয়ে
সাতসমুদ্রপারে আপন দেশে নিয়ে চলল। সদা-
গরের জাত কিনা, খুব বুদ্ধি, মেজাজ ঠাণ্ডা,
একটু গোভী। তাঁরা চোরডাকাত দমন
করলেন, প্রজার নানান সুবিধা করে' দিলেন,
আবার নিজের দেশ হ'তে খেলেনা এনে, পুঁতুল
এনে প্রজার মন ভুলাতে লাগলেন। লক্ষী
যখন চকলা হন, তখন মাহুঘের বুদ্ধিলোপ
হয়। বাংলার লোকের বুদ্ধিলোপ হ'ল। বুড়া-
মাহুঘে শিশু সাজল; ইংরেজের খেলেনা-পুঁতুল
নিয়ে ছেলেখেলা করতে লাগল। সদাগর
রাজা কাঁচ এনে দিলেন। বাংলার প্রজা
কাকনবদলে সেই কাঁচ নিতে লাগল। দেশের
জিনিসে লোকের মন উঠে না। বিদেশের
বুটোমণির রঙের বাহার দেখে দেশের সাজা-
মাণিকে অনাদর করতে লাগল। রাজা যত
আদর দেন, সোহাগ করেন, দেশের লোক
ততই খোকা সাজতে লাগল। রাজা হাততালি
দিতে লাগলেন; দেশের বুড়োরা হামাগুড়ি দিয়ে
আধ-আধ কথা বলতে লাগল। লক্ষী,
বললেন—আর না, আমি বাংলার লক্ষী

আমার আর বাংলার থাকা চল্লে না।

লক্ষী চক্কা। বাংলার লক্ষী বাংলা ছেড়ে চল্লেন। আধার রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠল। তখন সাতকোটি বাঙালি কঁদে উঠল। রাজার দোষে লক্ষী আমাদের ছেড়ে চল্লেন বলে' রাজার দোষ দিয়ে সকলে কঁদে উঠল। ইংরেজ রাজা সেই কাদন শুনে বিরক্ত হ'লেন। ইংরেজ রাজার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল, সে ধরাকে সরা জান কর্ত। আলমগির-বাদশার তক্তে বসে' সে আপনাকে আলমগিরের নাতি-হেন ঠাওরা'ত। সে বললে—এরা বড় ঘ্যান্ঘ্যান করছে; সাতকোটির ঘ্যান্ঘ্যানানি শোনা যায় না; থাক্, এদের ছুসল করে' দিচ্ছি; এক দিকে থাক্ মোছলমান, এক দিকে থাক্ হিঁদু। এরা ভাই-ভাই একটাই থেকে বড় বিরক্ত করছে; এদের ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই করে' দাও, এদের জোট ভেঙে দাও। এই বলে' তিনি বাঙালীকে ছুসল করে' দিলেন,—এক দিকে গেল হিঁদু, এক দিকে গেল মোছলমান। পূবে-উত্তরে গেল মোছলমান, পশ্চিমে-দক্ষিণে থাক্ হিঁদু।

লক্ষী দেখলেন, আমি বাংলার লক্ষী; আর আমার নিতান্তই বাংলার থাকা চল্লে না। আমার হিঁদু যেমন, মোছলমান তেমনি। হিঁদু-মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হু'ল, তখন আর আমার বাংলার থাকা চল্লে না।

১৩১২ সাল, আশ্বিনবাসের তিরিশে, সোম-বার, কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সেদিন বড় ছুর্দিন, সেইদিন রাজার হুকুমে বাংলা ছুখান হবে। বাংলার লক্ষী বাংলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচকোটি

বাঙালি আছাড় খেয়ে ভূবে গড়াগড়ি দিয়ে ডাক্তে লাগল—মা, তুমি বাংলার লক্ষী, তুমি বাংলা ছেড়ে যেরো না, আমাদের অপরাধ কমা কর। বিদেশী রাজা আমাদের মন বোঁধেন না। তাই ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই কর্তে চাইলেন। আমরা ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হব না। মা, তুমি কৃপা কর। আমরা এখন থেকে মাহুঘের মত হব। আর পুঁতুলখেলা করব না, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিনব না। পরের ছুয়ারে ভিক্ষা করব না। মা, তুমি আমাদের ঘরে থাক। বাংলার লক্ষী বাঙালীকে দয়া করলেন। কালীঘাটের মাকালীতে তিনি আবির্ভাব হলেন। মাকালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। সেদিন আশ্বিনের অমাবস্তা, ঘোর দুর্যোগ। কন্কন্ কন্কন্ বৃষ্টি, হাছ করে' হাওয়া। পঞ্চাশহাজার বাঙালী মাকালীর কাছে ধরা দিয়ে পড়ল। বললে—মা, আমাদের রক্ষা কর। বাংলার লক্ষী যেন বাংলা ছেড়ে না যান। আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষীকে পারে তেলব না। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। ঘরের জিনিষ থাক্তে পরের জিনিষ নেবো না। মন্দির হ'তে মা বলে' উঠলেন—কন্ক হউক, কন্ক হউক;—ঘরের লক্ষী ঘরে থাক্বেম; বাংলার লক্ষী বাংলার থাক্বেম। তোমরা এতিজা ভুলো না। ঘরের থাক্তে পরের নিরো না। ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হরো না। তোমাদের “এক দেশ এক ভগবান, এক জাতি এক মনপ্রাণ” হোক। লক্ষী তোমাদের কৃপা করবেন। লক্ষী তোমাদের অচলা হবেন।

তিরিশে আশ্বিন, কোকাসগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাংলার লক্ষী

ঐদিন বাংলা ছাড়ছিলেন। ঐদিন বাংলার
লক্ষী বাংলায় অচলা হ'লেন। বাংলার হাট-
মাঠ-ঘাট জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের
ক্ষেতে লক্ষী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে-
ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে
উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল।
লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু,
গালভরা হাসি হ'ল।

বাংলার মেয়েরা ঐদিন বঙ্গলক্ষীর ব্রত
নিলে। ঘরে ঘরে সেদিন উত্থন জল না।
ঘট পেতে হরীতকীহাতে বঙ্গলক্ষীর কথা
তুলে। হাতে হাতে হৃদয়ে হৃদয়ের রাখী বাঁধে।
যে এই বঙ্গলক্ষীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষী
অচলা হন।

বঙ্গ-বঙ্গর ঐদিনে বাঙালীর মেয়েরা
এই ব্রত নেবে। বাঙালীর ঘরে ঐ-
দিন উত্থন জলবে না। হাতে হাতে হৃদয়ে
হৃদয়ের রাখী বাঁধবে। বঙ্গলক্ষীর কথা শুনে
বাঁধ বাজিবে ঘটে প্রণাম করে' পাটালিপ্রসাদ
পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষী অচলা হবেন। ঘরের
লক্ষী ঘরে থাকবেন। বাংলার লক্ষী বাংলায়
থাকবেন।

সবাই বল—

আমরা ভাই ভাই একঠাই।
ভেদ নাই ভেদ নাই ॥
ভাই ভাই একঠাই।
ভেদ নাই ভেদ নাই ॥
ভাই ভাই একঠাই।
ভেদ নাই ভেদ নাই ॥

মালিন্দি, কৃপা কর। কাকুন দিবে কাঁচ নেবো
না। ঘরের থাকতে গরের নেবো না।
পাঁখা থাকতে ছুড়ি পড়বে না। গরের

ছমারে ভিক্ষা করবো না। মোটা অন্ন
ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে
নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়-
লীকে খাইয়ে নিজের খাব। মোটা অন্ন অন্ন
হোক। মোটা বস্ত্র অন্ন হোক। ঘরের
লক্ষী ঘরে থাকুন। বাংলার লক্ষী বাংলায়
থাকুন।

বাংলার মাটি বাংলায় জল
বাংলার হাওয়া বাংলায় ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্।

বাংলার ঘর, বাংলায় মাঠ,
বাংলার বন, বাংলায় হাট,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান্।

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান্।

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে বসত তাইবোন্,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান্।

বন্দে মাতরম্।

অমৃতান।

প্রতিবৎসর আশ্বিনের সংক্রান্তিতে বঙ্গ-
বিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহস্থ নারীগণ বঙ্গলক্ষীর
ব্রত অমৃতান করিবেন। সেদিন অরক্ষন।
দেবসেবা ও রোগী ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য
উপলক্ষে গৃহে উত্থন জলিবে না। ফলশ্রুতি,

চিড়ামুড়ি অথবা পূর্বদিনের ভিজা-ভাত, কথা শুনিবেন। কথাশেষে শম্মতানির পর ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ ঘটস্থাপনা করিয়া হস্তের প্রেক্ষাতে হরিদ্রারঞ্জিত স্ত্রী পরস্পর ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা রাখী বাধিবেন। রাখিবন্ধনের সময় শম্মতানি ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দূর লইবেন। হইবে। তৎপরে পাটালিপ্রসাদ গ্রহণ হরীতকী বা সুপারি হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষীর করিবেন।

ত্রি:—

অজবিলাপ ।

মমসাপি ন বিপ্রিয়ঃ মদ্রা

কৃতপূর্ব্বঃ তব কিং জহাসি মাম্ ।

নহু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহঃ

ত্বরি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ ॥ ৫২ ॥

মনেও আনি মি তব অপ্রিয় কত,

মোরে ফেলে কেন চলে গেলো তুমি তবু !

পৃথিবীর আমি নামেই মাত্র পতি,

তোমাতেই মোর ভাবে নিবন্ধ রতি ।

কুসুমোৎখচিতান্ বলীকৃত-

শ্লগন্ ভঙ্গকচস্তবালকান্ ।

করভোর করোতি মারুত-

স্তুত্বপাবর্তনশক্তি মে মনঃ ॥ ৫৩ ॥

কুসুমে খচিত কুঙ্কিত কালো কেশে

বন্দপবন কাঁপায় যখন এসে,

হে স্তুত্ব তব প্রাণ কিরে এল বলে

থেকে থেকে মোর ছরাশায় ছিঁয়া দোলে

তমপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে

প্রতিবোধেন বিবাদমাত্ত মে ।

অলিতেন গুহাগতং তম-

ভহিনাশ্রেরিব নতমোবাধিঃ ॥ ৫৪ ॥

হে প্রেমসি, তবে উচিত তোমার করা
জাগিয়া আমার বিবাদ বিনাশ করা ।
সজনী আসিলে হিমাচলগুহাতলে
আঁধার নানিরা ওষধি যেমন জলে ।

ইদমুচ্ছসিতালকং সুখং
তব বিশ্রান্তকথং হৃনোতি মাম্ ।
নিশি স্তপ্তমিরৈকপঙ্কজং
বিরতাত্যস্তরবর্জিতপদধনম্ ॥ ৫৫ ॥

ও মুখে অলক দোলে মারুতভরে,
তবু কথা নাই বুক কাটে তারি তরে ;
যেমন নিশায় কমল ফুমায়ে রহে
অন্তরে তার ভ্রমর কথা না কহে ।

শশিমাং-পূমরেতি শর্করী
দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিশম্ ।
ইতি তৌ বিরহাত্তরুক্ষমৌ
কথমত্যস্তগজা ন মাং দধেঃ ॥ ৫৬ ॥

শর্করী পুন কিরে পার শশবরে,
চকাটকি পুন মিলে বিচ্ছেদপরে,
বিরহ ভাছারা মিলনের আশে সই,
চিরবিচ্ছেদ আমারে বে আজ দধে !

সমুচ্ছখস্থঃ সখীজনঃ
প্রতিপত্তপ্রনিতোহরমাস্তকঃ ।
অহরৈকরসস্তথাপি তে
ব্যবসারঃ প্রতিপত্তিনিহুরঃ ॥ ৫৭ ॥

সমুচ্ছখস্থ তব সখিনীজন,
প্রতিপদচাঁদ তব আশ্রয়জন,
তব রস'মোর জীবনে করেছি সার,
নিহুর, তবুও একি তব ব্যবহার !

হৃতিরত্নমিতা রত্নিত্যুভা
বিরতং প্রেমবৃক্ষনিরুৎসকঃ ।

গতমাতরণপ্রয়োজনঃ

পরিপূর্ণঃ শ্রুতীমদ্য মে ॥ ৬৬ ॥

হুতি হ'ল দূর, রতি শুধু স্বর্জিলীন,
গান হ'ল শেষ, ঋতু উৎসবহীন,
জ্ঞাতরণে মোর প্রয়োজন হ'ল গত,
শরন শূন্য চিরদিবসের মত ।

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ

প্রিয়শিষ্টা ললিতে কলাবিরোধে ।

কল্পণাবিস্মৃথেন মৃত্যুনা

হরতা স্বাং কঃ কিং ন মে দ্রুতম্ ॥ ৬৭ ॥

গৃহিণী, সচিব, রহস্তসখী মম,
ললিতকলার ছিলে যে শিষ্টাসম,
কল্পণাবিস্মৃথ মৃত্যু তোমাতে নিরে
বল গো আমার কি না সে হরিল, প্রিয়ে !

বিত্তবেহপি সতি স্বয়া বিনা

সুখমেতাবদজ্ঞস্ত গণ্যতাম্ ।

অদ্ব্যতস্ত বিলোভনাত্তরৈ-

র্মম সর্কে বিষয়াস্বদাশ্রয়াঃ ॥ ৬৮ ॥

তোমা বিনা আজ রাজসম্পদধনে
সুখ বলি' অজ গণ্য না করে মনে ।
কোনো প্রলোভন রোচে না আমার কাছে
আমার যা-কিছু তোমাতে জড়াবে আছে ।

উণাদি-তত্ত্ব ।

—

“উণাধরো বহনম্ ।”

সংস্কৃত-শব্দসাধনের জন্ত “উণ্-”-ইত্যাদি কতক-
গুলি প্রত্যয় প্রচলিত আছে। ধাতুর উত্তর
ঐ সকল প্রত্যয়যোগে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে
বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। প্রত্যয়গুলিকে
সংক্ষেপে “উণাদি” বলা হইয়া থাকে ;
“উণাদি”-প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দগুলিও “উণাদি”-
নামে কথিত হইয়া থাকে।

অতোক “উণাদি”-শব্দেই ধাতু এবং
প্রত্যয় উল্লিখিত হইয়া থাকে। ধাতুকে
“প্রকৃতি” এবং উণ্-ইত্যাদিকে “প্রত্যয়” বলা
হয়। প্রকৃতিপ্রত্যয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়-
ক্ষম করিতে হইলে, প্রাচীন মতের সমালোচনা
আবশ্যক।

বৈয়াকরণগণের মতে নরঃ নরৌ নরাঃ,
ভবতি, ভবতঃ, ভবন্তি, ইত্যাদি শব্দ নিত্য,—
স্বতঃসিদ্ধ,—চিরকাল ব্যবহৃত হইয়া আসি-
তেছে। বিভক্তিহীন নর-শব্দ হইতে নরঃ,
নরৌ, নরাঃ, এবং বিভক্তিহীন ভূ-ধাতু হইতে
ভবতি, ভবতঃ, ভবন্তি, উৎপন্ন হয় নাই।
ব্যাকরণে নর-শব্দের উত্তর স্ত-ও-জস্ এবং
ভূ-ধাতুর উত্তর তিপ্-তস্-অস্তি বিভক্তি
যোগ করিয়া পদ নিষ্পন্ন করিবার যে নিয়ম
প্রচলিত আছে, তাহা বিশেষ প্রয়োজনে সৃষ্টি
করা হইয়াছে। সেই প্রয়োজনসাধনের জন্তই
নিত্য শব্দগুলির অবরন কল্পনা করিতে
হইয়াছে। সেই অবরনের প্রথমংশের নাম
“প্রকৃতি”, শেষাংশের নাম “প্রত্যয়”।

প্রকৃতিপ্রত্যয় নিত্য নহে; তাহা শাস্ত্রের
কল্পনামাত্র।

আধুনিক লেখকগণের মধ্যে কাহারও
কাহারও এইরূপ ধারণা যে,—ভাষার শৈশব-
অবস্থায় লোকে বিভক্তিহীন প্রকৃতি—ভূ, কৃ,
অস্ ইত্যাদি—ব্যবহার করিত। তাহাই
সভ্যতার সমুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যয়যোগে
ভবতি, করোতি, অস্তি রূপে পূর্ণতালাভ করি-
য়াছে। প্রাচীন শব্দবিদগণ এরূপ অনুমানের
পক্ষসমর্থন করেন নাই।

যে সকল পুরাতন বৈয়াকরণের গ্রন্থ বর্ত-
মান আছে, তন্মধ্যে ভগবান্ পাণিনি সর্ব-
প্রাচীন বলিয়া পরিচিত। উত্তরকালেও
অনেক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণের আবির্ভাব হইয়া-
ছিল। সকলেই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন,
—প্রকৃতি ও প্রত্যয় কল্পনামাত্র; প্রচলিত
সকল শব্দই নিত্য,—স্বতঃসিদ্ধ,—চির-
প্রচলিত।

পাণিনিহস্তের প্রয়োজন কি, তাহা বুঝাই-
বার জন্ত, প্রথমেই “অথ শব্দানুশাসনং”
বলিয়া যে সূত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অর্থ
এই যে, এই ব্যাকরণে শব্দের অনুশাসন
করা হইবে। অনু-শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। শব্দ-
গুলি পূর্ক হইতেই বর্তমান আছে, তাহার
ব্যুৎপত্তিনির্দেশের নিয়ম উদ্ভাবনের জন্তই
ব্যাকরণশাস্ত্র রচিত হইবে—ইহাই ফলিতার্থ।
অজ্ঞাত বৈয়াকরণগণেরও এ বিষয়ে মতবৈধ

নাই। তাহাদিগের মতে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের
ব্যুৎপত্তি এইরূপ—

“প্রথমঃ ক্রিয়তে উচ্চারণে ইতি প্রকৃতির্থাবাদি।”

শব্দের অব্যবহিত্য করিবার জন্য প্রথমে যে
অংশ কল্পিত বা উচ্চারিত হইয়াছে, তাহারই
নাম প্রকৃতি। যথা নর, ভূ, ক ইত্যাদি।

“প্রত্যয়েত বিধীয়তে ইতি প্রত্যয়ঃ বাদি তাদি।”

প্রকৃতির উত্তর বিধান করা হয়, এইজন্যই
ইহাকে “প্রত্যয়” বলা হয়।

“প্রত্যয়ঃ পরক।” ৩.১.১—২।

এই দুইটি শব্দে প্রত্যয়ের স্থান প্রকৃতির পরে
নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।
কেবল বহুচ-প্রত্যয়, প্রত্যয় হইয়াও, প্রকৃতির
পরে সংযুক্ত না হইয়া, প্রকৃতির পূর্বে সংযুক্ত
হইয়া থাকে। যথা বহুপটুঃ, বহুমুতঃ,
বহুগুড়ঃ।*

বৈয়াকরণগণের প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সহিত
সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি ও পুরুষ নামক সুপরি-
চিত সংজ্ঞার সাদৃশ্য ও বৈষম্য দেখিতে পাওয়া
যায়। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি, পুরুষের
সাম্বোধে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া, সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন
করেন। ব্যাকরণের প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে
শব্দ নিষ্পন্ন করে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি নিত্য ;
শব্দবিদগণের প্রকৃতি কল্পিত। সাংখ্যমতে
পুরুষ নিত্য, অবিকৃত, উদাসীন। শব্দবিদ-
গণের প্রত্যয় কেবল প্রকৃতির বিকারসাধন
ক্রিয়ায়ই তৃপ্ত হয় না, নিজেও বিকৃতিপ্রাপ্ত
হইয়া থাকে।

অতীত ভাবার প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের
কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার

সহিত সংস্কৃতভাবার প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের
কল্পনার একত্রণ কারণ দেখিতে পাওয়া যায়
না। ভাবার শব্দসংখ্যার জাধিক্য ও সান্নি-
ভ্যের বিপুলতা উপস্থিত হইলে, অর্থবোধের
সুবিধার জন্য শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্দেশের
প্রয়োজন উপস্থিত হয়। তাহার অঙ্গুরোধেই
ভাবাকে নানা নিয়মের অধীন করিতে হয়।
এইরূপে নিয়মাবধীনে করিতে হইলে, প্রচলিত
শব্দগুলিকে নিত্য বা সিদ্ধ মনে করিয়া
স্মৃতিস্মরণ অনুসন্ধান দ্বারা ব্যুৎপত্তিনির্দেশের
নিয়ম লিপিবদ্ধ করিতে হয়। একবার
এইরূপে নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়া গেলে, ভাবার
পরিবর্তন নিরন্তর হইয়া থাকে। এইরূপ
নিয়ম নির্দিষ্ট হইবার পূর্বে ভাবা বৈবিকীর
জ্ঞার উচ্ছ্বল থাকিলেও, নিয়ম নির্দিষ্ট
হইবার পর সংযত হইতে বাধ্য হয়। কোন
সময়ে সংস্কৃতভাবা এইরূপে নিয়মাবধীনে
হইয়া সুসংযত হইয়াছিল, তাহার কথা
অতীতের স্বপ্ননাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

সংস্কৃতশব্দের ব্যুৎপত্তিই ইহার প্রধান
প্রমাণ। সম-পূর্ব্বক কৃ-ধাতুর যোগে সংস্কৃত-
শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভূষণ-
অথে স্রুটের অর্থঃ স- কারের আগম হইয়াছে।
সংস্কৃত বলিতে মার্জিত বুঝায়। পূর্বে যে
ভাবাই প্রচলিত থাকুক না কেন, তাহাই
মার্জিত ও সুসংযত হইয়া সংস্কৃত আকার প্রাপ্ত
হইয়াছে। ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্যের
উপক্রমণিকাতে এই কথা বিশদভাবে ব্যক্ত
করিবার জন্য প্রতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া
গিয়াছেন, ভাবা সক্রুর জ্ঞায় ব্যাক্তিতে ব্যাক্তিতে

সংস্কৃতসম্পন্ন হইয়া সংস্কৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার এই কার্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই নাম—বৈয়াকরণ। যথা—

“সত্যমিয তিতউনা পুনভো যত্র ধীরা বনসা
যাক্ষকত ।”*

অত্র কৈরটঃ।—“ধীরা ইতি বৈয়াকরণাঃ। বাচ-
য়রভেতি অপশব্দভ্যো বিবিক্তাঃ কৃতবন্তঃ ।”

সংস্কৃতভাষা বাহা হইতে সংস্কারসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা অসংস্কৃত ছিল। তাহার যে সকল শব্দ সংস্কারসম্পন্ন না হইয়া অসংস্কৃত রহিয়া গিয়াছে, তাহার নাম অপশব্দ। শব্দ-
শাসন করিবার সময়ে অপশব্দেরও কথা উল্লেখ করিতে হয়। ভগবান্ পতঞ্জলি তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

অপশব্দ অসাধু, প্রাকৃত, স্লেচ্ছ ইত্যাদি নামা নামে অভিহিত। জনসাধারণ তাহারই ব্যবহার করিত। শিক্ষিতসম্প্রদায় অপশব্দ পরিহার করিয়া সংস্কৃতশব্দেরই ব্যবহার করিতেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রেও কঠিন শাসন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহা ব্রাহ্মণকে অপশব্দ ব্যবহার করিতে নিবেদ্য করিত।

দাগভাষিতবৈ। ন স্লেচ্ছিতবৈ।

অপভাষা বা স্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করিবে না -
এইরূপ শাস্ত্রশাসন বর্তমান ছিল।

অতি পুরাকাল হইতেই আর্য্যসমাজে বেদের প্রচলন থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন্ পুরাকালে তাহা প্রথম উদ্ভূত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় না থাকার আধুনিক লেখকগণ নানা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বহু দিনের লিখিত

ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে বেদ ও আর্য্যসমাজ নিত্যসহচর বলিয়া প্রতিভাত হয়।

প্রাচীন আর্য্যসমাজ বেদসর্বস্ব। বাল্যে গুরুগৃহে উপনীত হইয়া দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার পর গৃহস্থাশ্রমে উত্তীর্ণ হইয়া আবার সেই বেদের সেবার সংসারধর্ম্ম সাধন করিয়া পরিণতজীবনে বান-প্রস্থ আশ্রমে ও জীবনসন্ধ্যায় বতিধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আর্য্যগণ আমরণ বেদের সেবার নিযুক্ত ছিলেন। কেহ কেহ সংসারার্শ্রমে প্রবেশ না করিয়া উপনয়নকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিরূপে আত্মীবন কেবল বেদের সেবার নিযুক্ত হইতেন। বেদবিরোধী শাস্ত্রের কেহ আদর করিতেন না।

বেদের ভাষা সংস্কৃতভাষা। তাহা জনসাধারণের ভাষা ছিল না। অধুনা কেহ কেহ বেদকে কৃষকসঙ্গীত বলিয়া অহুমান করিয়া থাকেন। অশিক্ষিত কৃষক যে বৈদিকভাষায় সঙ্গীতস্পৃহা চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হইবে, ইহা এক হাস্যস্পদ অহুমানমাত্র। সমুচিত শিক্ষা ভিন্ন বৈদিকভাষায় অধিকারলাভ করা দূরে থাকুক, একটি বর্ণও যথাযথ উচ্চারণ করিবার উপায় নাই। বেদে যে সকল তত্ত্ব-জ্ঞানের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা অশিক্ষিত কৃষকের চিন্তাক্ষেত্রে সমুদ্রতট হইতে পারে না। বেদে যে সকল যাত্রা, রীতিনীতি ও শিল্পাদির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অশিক্ষিত কৃষকসমাজের কল্পনার অতীত। তাহা সমুন্নত সভ্যবস্থাই অভিব্যক্ত করে। আর্য্যশব্দ

কৃষকরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে কেন ? ঋ-ধাতুর উত্তর গাৎ-প্রত্যয়-যোগে আৰ্য্যশব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।

বহুলোপ্যৎ : ৩।১।১২৪

পাণিনি এই ভাবেই আৰ্য্যশব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । ব্যাকরণের নানা সূত্র ধরিয়া একই শব্দের নানারূপ ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা অসম্ভব নহে । এক্ষণে স্থলে কোন ব্যুৎপত্তিকে প্রকৃত ব্যুৎপত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ? প্রাচীনগণ বলেন, শব্দার্থ অভিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট ; ব্যাকরণ কেবল তাহাকে পরিষ্কৃত করিবার জন্য ব্যুৎপত্তি-নির্দেশ করিয়া থাকে । সমস্ত প্রাচীন অভিধান পূজ্য এই অর্থেই আৰ্য্যশব্দের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছে । ঋ-ধাতু গমনার্থক—জ্ঞানার্থক—সুতরাং শ্রেষ্ঠার্থেই আৰ্য্যশব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাহাকে অন্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়া নূতন অভিধান রচনা করিবার অধিকার কোথায় ? ইহা আধুনিক প্রগল্ভতা-মাত্র ।

আৰ্য্যসমাজে বেদের পঠনপাঠন ও অর্থ-বোধ অবিকৃত ও চিরপ্রচলিত রাখিবার উদ্দেশে আৰ্য্য মনীষিগণ প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন । সেই প্রয়োজনসাধনের জন্য বেদের পদপাঠ ও সংহিতাপাঠ নির্দিষ্ট হইয়াছিল । প্রত্যেক বর্ষের প্রত্যেক স্বরের যৎযথ উচ্চারণ অবিকৃতভাবে চিরপ্রচলিত রাখিবার উদ্দেশে শিক্ষাসূত্র নির্দিষ্ট হইয়াছিল । বৈদিক ক্রিয়াকলাপের যথাযথ অনুষ্ঠান চিরপ্রচলিত রাখিবার উদ্দেশে কল্পসূত্র প্রচলিত হইয়াছিল । শব্দের ব্যুৎপত্তি ও স্থলবিশেষে স্বরের পরিবর্তনপ্রণালী চিরনির্দিষ্ট করিবার

উদ্দেশে ব্যাকরণসূত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । শব্দের প্রকৃত-অর্থ-রক্ষার্থ নিরুক্তি, ছন্দের প্রকৃতপ্রকৃতিজ্ঞাপনার্থ ছন্দ এবং ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতকালনির্ণয়ার্থ জ্যোতিষের উদ্ভব হইয়াছিল । এই সকল শাস্ত্র যত্নবশত সুপরিচিত । বেদরক্ষাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ।

বেদরক্ষার এই সকল আয়োজনের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বহু মনীষীর বহু গবেষণার ফলে এই সকল কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল । তাহাকে আকস্মিক বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না । বেদ যেমন নিত্য-সহচর ছিল, বেদাঙ্গও সেইরূপ বেদরক্ষার নিত্যরক্ষিবর্গরূপে আৰ্য্যসমাজে প্রহরীর স্থায় বিনির্জনয়নে দণ্ডায়মান ছিল । যথাযথ উচ্চারণবিহীন অর্থজ্ঞানশূন্য বেদপাঠ আৰ্য্যসমাজে অত্যন্ত নির্দিত ছিল । যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানশূন্য, তাহাকে প্রাচীনগণ “বৃষল” বলিতে ও ভারবাহী বলীবর্দের সহিত তুলনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না ।

“ন শূদ্রো বৃষলো নাম কেবো হি বৃষ উচ্যতে ।

যন্ত বিপ্রত ভেনালং স বৈ বৃষল উচ্যতে ।

তন্মাৎ বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন এবস্বতঃ ।

একদেশোঃপাধ্যাতব্যো বহি সর্বো ন শক্যতে ।” বহঃ ।

সংস্কৃতভাষা ছই শ্রেণীতে বিভক্ত । কেবল বেদেই বাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম বৈদিকসংস্কৃত । বাহা লৌকিক ও শিক্ষিত-সমাজের প্রচলিত ভাষা, তাহার নাম লৌকিক-সংস্কৃত বা ভাষা । পাণিনি এই উভয়শ্রেণীর সংস্কৃতশব্দেরই অনুশাসন করিয়া গিয়াছেন ।

সংস্কৃতশব্দের অনুশাসন কোন পুরাকালে আরক হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই ।

এথমে প্রত্যেক শব্দকে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা করিবার “প্রতিপদপাঠ” প্রণালী প্রচলিত থাকিবার কিংবদন্তী বর্তমান আছে। বোধ হয়, সেই অবস্থা বর্তমান থাকিবার সময়ে শব্দার্থশিক্ষার্থ বেদবাক্যের নিবন্ধ ও নিরুক্তি নির্ণীত হইয়াছিল। কিন্তু নিত্যশব্দ অসংখ্য বলিয়া ঐ উপারে শব্দজ্ঞান উপার্জন করিবার অসুবিধা শীঘ্রই অনুভূত হইয়া থাকিবে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্ত ব্যাকরণশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়া প্রকৃতিপ্রত্যয়ে পরিকল্পনা করিয়া সামান্য ও বিশেষ লক্ষণবৃত্ত স্বরূপে অসংখ্য শব্দব্যাখ্যার সংক্ষিপ্তপ্রণালীর উদ্ভাবনা করিয়াছে। প্রকৃতির সংখ্যা অনন্ত হইলেও প্রত্যয়ের সংখ্যা পরিমিত—এই কারণে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রত্যয় কল্পনা করিয়া, অসংখ্য শব্দের ব্যুৎপত্তিবিচার করা সহজ হইয়াছিল। ইহাই যে সংস্কৃতসাহিত্যের প্রকৃত ঐতিহাস, একটি পুরাতন আখ্যায়িকার তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। উগবান্ পতঞ্জলি সেই আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্র বৃহস্পতি দ্বাব্যবসহস্রকাল ইন্দ্রদেবকে পৃথকরূপে প্রত্যেক শব্দের শিক্ষাদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় স্বয়ং বৃহস্পতি, শিবা স্বয়ং দেবরাজ ইহু, শিক্ষাকাল দ্বাব্যবসহস্র-

বর্ষ। তথাপি কি ফল হইয়াছিল? শব্দ-শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই! আমাদের আয়ুষ্কাল কত? যে অধিক বাঁচে, তাহারও পরমায়ু শতবর্ষমাত্র। সুতরাং শব্দজ্ঞানলাভের সংক্ষিপ্ত উপায়ের উদ্ভাবনা আবশ্যক। এই উপায় উদ্ভাবনা করিবার জন্তই, সামান্য ও বিশেষ লক্ষণবৃত্ত ব্যাকরণস্থত্র রচিত হইয়াছিল। তথাপি প্রতিপদপাঠপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। উগাদিহুত্রে ও ব্যাকরণে যেখানে নিপাতের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, সেখানেই প্রকৃতপ্রত্যাবে প্রত্যেক শব্দকে পৃথকভাবে আলোচনা করিতে হইতেছে। তাহা প্রতিপদপাঠপ্রণালীর প্রকারান্তরমাত্র।*

ব্যাকরণশাস্ত্র উদ্ভূত হইবার পর প্রকৃতি-প্রত্যয় পরিকল্পিত হইয়া প্রকৃতিপ্রত্যয়ের শ্রেণীবিভাগ সাধিত হইয়াছিল। তদনুসারে প্রকৃতি নানাতাণে বিভক্ত, যথা—প্রাতিপদিক, ধাতু, অব্যয় ইত্যাদি। প্রত্যয়ও নানাতাণে বিভক্ত, যথা—সুপ, তিঙ, কৃৎ, তদ্ধিত, জী, বিকরণ ও আগম ইত্যাদি।

প্রাতিপদিকে বিভক্তি বৃত্ত হইলেও নিম্নর শব্দে প্রাতিপদিকের অর্থ সাধারণত বৃত্ত থাকে। ১) কেবল সমাসে কখন কখন সে অর্থ

* ঐতিহাসিক শব্দোপযোগে সতি, কিং শব্দান্যে প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ কর্তব্যঃ? পৌ-রবঃ-পুত্রমো-হতী-শব্দক্-বৃগো-ভ্রাক-ইত্যেবমানরঃ শব্দাঃ গঠিতব্যঃ? মেত্যাং। অবজ্ঞাপান্থ এষ শব্দান্যে প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ। এষাং হি ঐক্যতে। বৃহস্পতিরিয়ার দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দান্যে শব্দপার্যায়ণং প্রোবাচ। নাত্যং জগীৰ। বৃহস্পতিঃ এবভা, ইজ্ঞান অথোভা, দিব্যং বর্ষসহস্রং অধ্যয়নকালো ন চান্তং জগাম। কিং পুনরন্যে? ২) সর্বত্র চিত্রং জীবতি, স বৈ শতং জীবতি।

(১) যে সকল স্থলে বাহুব্যর্থ কথকিং রক্ষিত হইয়াছে, তাহার উদাহরণ যথা—

কাক (ক+উৎ—শব্দী) ১।১। কু কৃৎ, করণে।

বাহু (বা+উৎ, ১।১। বা গতিশব্দকরণে।

জাহ্নু (জি+উৎ—উৎপন্ন) ১।১। জি জিহবায়।

নুপু হইয়া পড়ে । ২ ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যুক্ত হইলে, নিম্ন শব্দে ধাতুর্ধ্ব বিলুপ্ত হয় না । ৩ ধাতুর উত্তর কোন কোন প্রত্যয় সংযুক্ত হইলে নিম্ন শব্দগুলি প্রাতিপদিকে পরিণত হইয়া পুনরায় প্রত্যয় গ্রহণ করে । ৪ সে অবস্থাতেও ধাতুর অর্থ পরিভাগ করে না । এই শ্রেণীর প্রত্যয়ের সাধারণ নাম কৃৎ ; কৃৎ-প্রত্যয়যোগে যে সকল শব্দ নিম্পন্ন হয়, তাহার সাধারণ নাম কৃদন্ত । ইহাষ্ট ব্যাকরণের নিয়ম ।

উপাদি-প্রত্যয়কেও বৈয়াকরণগণ কৃৎ-সংজ্ঞা প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং পাণিনি কৃৎ-প্রকরণেই তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু সাধারণ কৃৎ-প্রত্যয়ের সহিত উপাদির

অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও, বৈবক্ষ্যের অভাব নাই । অস্তান্ত কৃৎ-প্রত্যয়ের জ্ঞান উপাদি-প্রত্যয়ও ধাতুর উত্তর সংযুক্ত হইয়া থাকে । অস্তান্ত কৃদন্তশব্দের জ্ঞান উপাদি-প্রত্যয়নিম্পন্ন শব্দ প্রাতিপদিকের জ্ঞান ব্যবহৃত হইয়া প্রত্যয় গ্রহণ করিতে পারে । এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু কৃৎ-প্রত্যয়াস্ত শব্দ যেমন ধাতুর অর্থ পরিভাগ করে না, উপাদি-প্রত্যয়াস্ত শব্দ সেমত নহে । এই শ্রেণীর অধিকাংশ শব্দই ধাতুর্ধ্ব পরিভাগ করিয়া থাকে এবং ব্যাকরণের প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নূতন প্রণালীতে শব্দগঠনের পরিচয় প্রদান করে । উপাদি-প্রত্যয়াস্ত সকল শব্দই ক্রটি । *

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য ।

(২) যে সকল স্থলে ধাতুর্ধ্ব কিছুই রক্ষিত হয় নাই, তাহার উদাহরণ বহা—

ভবু (কৃৎ + উ) ১১১৭। কৃতি হেমনে (টাকুরা)

বাহু (বহু + উ) বন্দীক ১১১৯। বহু প্রহসে ।

আবিবহু (অব্ + উ + টি) বাস । অব্ রতৌ ১১৪৭।

কপিল (কপ্ + ইলচ্) ১১৫৬। কপু কাভৌ (বর্ণভেদঃ)

(৩) যে সকল স্থলে ধাতুর আকার সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার উদাহরণ বহা—

ভবু—টাকুরা ।

বাহু—বন্দীক ।

(৪) যে সকল স্থলে উপাদি-প্রত্যয়িত প্রত্যয় বোঝাই দিয়া প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে শব্দ নিম্পন্ন হয় না, তাহার উদাহরণ প্রায় অধিকাংশস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় ।

* এই সকল কারণে পাণিনি বিভিন্ন দিগন্তেছেন :—

“উপাদি-বহুত্বম্ ।” ৩.৩.১

বহুত্ব-শব্দের অর্থ এই যে—কোনস্থলে প্রবৃত্তি, কোনস্থলে অপ্রবৃত্তি, কোনস্থলে বিকল্প, কোনস্থলে অভিন্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

প্রেমের স্বরূপ ।

— never —

১

আখির পিপাসা যদি প্রেম হ'ত কভু—

রুধিতাম নয়ন ঢাকিয়া !

বাসনার নদী যদি প্রেম বুঝিতাম,

গতি তার দিতাম ফিরিয়া !

২

হ'ত যদি প্রেম—বঙ্কি, দিতাম তাহারে

আখিজলে নির্দোষিত করি ;

বুঝিতাম প্রেম যদি রক্ত-রবি-তাপ,

মেঘে তারে দিতাম আবরি' ।

৩

হ'ত যদি প্রেম শুধু পণ্য বিপণির,

যিনা পণে দিতাম বিক্রিয়া ।

নিশীথের স্বপ্ন যদি প্রেম বুঝিতাম,

দিনোদয়ে যেতাম ভুলিয়া !

৪

হ'ত যদি মারামুগ্রে মারামুগ প্রেম,

মাহি তার ছুটিতাম পাছে !

বুঝিতাম যদি প্রেম আকাশকুহর,

ছরাশর না যেতাম কাছে ।

৫

শিরার শোণিত প্রেম, নিবাসে সর্বদা,

দর্শনে আলোক হ'য়ে জাগে ;

পরশে পরশমণি, হৃৎখে অকল,

পুল-অর্ঘ্য সেবতার আগে !

ঐশ্বরিকানাম ব্রহ্মোপাখ্যায় ।

বঙ্গদর্শন

বিজ্ঞা এবং জ্ঞান ।*

বঙ্গ-৫ এক্ষণে আমার শরীর ইচ্ছাক্রমণ কঠোর দৌড় দেওয়াটোতে পারিবার মতো সবল নহে, তথাপি এই উপলক্ষে কয়েকটি ভাবিবার বিষয় দেশস্থ বিদ্বজ্জনের (বিশেষত অধ্যাপক-জনের) জ্ঞানগোচর করিবার প্রত্যাশায় বঙ্গদেশের পর আমি আজ এইরূপ কৃতবিদ্য-মণ্ডলীর মাঝখানে প্রবন্ধরূপে সমাগত হইয়াছি। আমার বক্তব্য বিষয়টির সংজ্ঞা-নির্দেশনের দায় এড়াইবার জন্য আমি সাজা কথা বাছিয়া-বাছিয়া বর্তমান প্রবন্ধের নাম দিয়াছি বিজ্ঞা এবং জ্ঞান। কিন্তু তবুও শ্রোতৃবর্গের মনোমধ্যে এইরূপ একটা তর্ক উদ্ভূত পাবে যে, বিজ্ঞা এবং জ্ঞান এক না হই! এ তর্কের সীমাসংকার্য লোকের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াই পরামর্শসিদ্ধ, কেন না, লোকের ভাবা লোকে যেমন জানে, এমন আর কেহই না। লোকে কি বলে?

যাঁহার বিজ্ঞাধনে ধনী, তাঁহাদিগকে বলে সুপণ্ডিত; যাঁহার জ্ঞানরত্নের খনি, তাঁহাদিগকে বলে পরম জানী; যাঁহার হুইই একাধারে, তাঁহাদিগকে বলে সোনার, সোহাগাণ ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিজ্ঞা এবং জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ অবশ্যই

কিছু-না-কিছু আছে। সেই প্রভেদটির গুরুত্বের প্রতি আমি আজ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব মনে করিয়াছি; আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞা এবং জ্ঞানের দুই বিভিন্ন পথের ঠিকানা নির্দেশ করিব, এটাও আমার একটা মনোগত অভিপ্রায়।

বিজ্ঞা নানা, আর, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন সত্যের অনুশীলনে ব্যাপৃত। জ্ঞান এক, আর, সেই এক জ্ঞানের লক্ষ্য এক অদ্বিতীয় সত্য। বিজ্ঞা এবং জ্ঞানের লক্ষ্য যেমন ভিন্ন—পথে তেমনি ভিন্ন। বিজ্ঞার পথ হ'লে অনুসন্ধানের পথ; জ্ঞানের পথ হ'লে যোগের পথ। বলিলাম “অনুসন্ধানের পথ”; তাহা পদার্থটা কি? পদার্থটা তাহা আর-কিছু না—জ্ঞাতব্য বস্তুতে স্বজাতীয়-লক্ষণের অনুসন্ধান (যেমন জলেতে তরঙ্গতা-লক্ষণের অনুসন্ধান), আর, সেই সঙ্গে তাহা হইতে বিজাতীয়-লক্ষণের বাতিরেক (যেমন জল হইতে কাঠিল-লক্ষণের বাতিরেক)। বিজ্ঞা এইরূপ অনুসন্ধানের প্রণালী অনুসারে আকাশ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বস্তু-সকল পৃথক পৃথক করিয়া অবধারণ করে।

একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, তদুপে

সহজেই বিজ্ঞা এবং জ্ঞানের বিবিধ পথের ঠিকানা পাওয়া বাইতে পারিবে।

বিজ্ঞাবিহীন মনোবৃত্তির নিকটে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকা, সবই সমান—সবই ষটিবাটির দ্বার প্রয়োজনমতে কাজ চালাইবার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই না। বিজ্ঞা কিন্তু গৃহিণী খুব গোড়ালো। বিজ্ঞা পাঁচ-রকমের পাক্‌ভৌতিক পদার্থ পৃষ্ঠ ইন্দ্রিয়দ্বারা বাধিয়া পৃথক পৃথক পাঁচ পাকে সাজাইয়া রাখে। উচ্চাতে ফল দাঁড়ায় চুট-দিকে চুট বিপরীত-ভাবে। এক দিকে ভিন্ন ভিন্ন আকাশপদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন বায়ুপদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন অগ্নিপদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন জলীয় পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তক পদার্থ, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতায় পদার্থের মধ্যে সাজাতোর বন্ধন আঁটিয়া যায়; এটা হয় অগ্নির গুণে আর-এক দিকে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকা, এই সকল বিজাতীয় পদার্থ পরস্পরের সংস্রব হইতে পৃথক্কৃত হয়; এটা হয় বাতিরেকের গুণে। এইরূপ একটা সমগ্র বস্তুকে ভাঙিয়া তাহাকে পৃথক পৃথক নানা অবস্থাবে বিভক্ত করিবার সময় বিজ্ঞা খুব সহজে ভাঙাতে কৃতকার্ণী হয়; কিন্তু তাহার পরে যখন সেই বিশ্লেষিত অবববঙলা জোড়াতাড়া দিয়া একটা সমগ্র বস্তু গড়িয়া দাঁড় করাইতে যায়, তখন বিচার-কর্তার স্মৃতিদৃষ্টিতে তাহার কৃত্রিমতা বাকির হইয়া পড়ে। বিচারকর্তা বিজ্ঞাকে বলেন এই যে, প্রথমে তুমি তুলা হইতে সহস্র সহস্র সহস্রা বিশ্লেষিত করিয়া তাহাদের মেলা-মেশার পথে কষ্টক নিক্ষেপ করিয়াছ; এখন বলিতেছ যে, সহস্র মিলিয়া এক

হইয়াছে—একটা পট হইয়াছে। উহার মধ্যে একত্রে যে কোনখানটার, তাহা তো আমি দেখিতে পাইতেছিলাম। বতই প্রথম হইতে প্রথমতর অনুবীক্ষণের প্রদীপ ধরিয়া উহার ভিতরে অল্পসন্ধান চালনা করা যায়, ততই অসংখ্য অসংখ্য ছিন্নের ভিতর ছিন্ন বাহির হইতে থাকে, এই তো আমি দেখিতেছি। তুমি যাহা করিতেছ, তাহাও আমি দেখিতেছি;—তুমি তোমার নিজের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের একতা'র প্রলেপ দিয়া ঐ কোণের বস্তুটার অসংখ্য ছিন্নজাল ভরাট করিয়া দিতেছ, আর, তাহাকেই বলিতেছ যোগ। যাহাকে তুমি বলিতেছ পাঁচের যোগ, তাহা তোমার কল্পনার যোগ; যাহাকে বলিতেছ পাঁচের একত্ব, তাহা তোমার অন্তর্নিহিত চৈতন্যের একত্ব। বিচারকর্তার এইরূপ নিক্রিয় ওজনের বিচারে দাঁড়াইতেছে এই যে, বিজ্ঞার একত্রিত যোগ একপ্রকার জোড়াতাড়া-দিয়া ষটাইয়া-তোলা যোগ, তা বটে তাহা প্রকৃত যোগ নহে। ওরূপ একটা কৃত্রিমধরণের যোগকে যোগ না বলিয়া বলা উচিত সংগ্রহ; বলিবও আমি তাই। ফলে, বিজ্ঞা প্রথমে বিশ্লেষণ এবং বিভিন্নতা হইতে যাত্রারম্ভ করে বলিয়া, পরে সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রকৃত যোগে পৌঁছিতে পারে না। জ্ঞান কিন্তু আর-এক প্রদেশ হইতে যাত্রারম্ভ করে। জ্ঞান গোড়াতেই এক অদ্বিতীয় বেধে সত্যের "প্রতি লক্ষ্য নির্বিষ্ট করে; আর, সেইজন্য, জ্ঞানচক্র অনিরুদ্ধ দৃষ্টিতে জল-ফল-আকাশ-অনিলানল, তৃত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, প্রাণ-মন-বুদ্ধি, দেহমহা, পঞ্চপাক-কীটপতঙ্গ, জগৎ-তরলতা,

গতুপ্রভর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তঃমধ্য
বৎ অন্তর-বাহির সমস্ত লইয়া এক অবিভীত
মত্যা বিরাটমান, আর, সেই অবিভীত সত্যের
একভাগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপাদমস্তক এবং
অন্তরবাহির যোগে-যোগে ওতপ্রোত । যে
যোগের কথা উল্লেখ করিয়া পূর্বে বলিয়াছি
যে, তাহা সংগ্রহেরই আর-এক নাম, এ যোগ
সে যোগ নহে ; এ যোগ প্রকৃতপক্ষেই যোগ ।
পূর্বে দেখা হইয়াছে যে, বিজ্ঞার পথ অসম-
ব্যতিরেকের পথ, এক্ষণে দেখা যাইতেছে
যে, জ্ঞানের পথ যোগের পথ । এ তো গেল
প্রবন্ধের ভূমিকা,—এখন কোন্ স্থান হইতে
যাত্রারম্ভ করা যাইবে, সেইটি বিবেচা ।
ভাবিয়া দেখিলাম যে, বিজ্ঞার পথ সকলেরই
নিকটে স্থাপরিচিত ; জ্ঞানের পথ অনেকের
নিকটে হয় তো অপরিচিত । এক্ষণে স্থলে
বিজ্ঞার বাঁধা-স্রাতার মধ্যস্থান হইতে যাত্রারম্ভ
করিয়া জ্ঞানের নিভৃত গুহাগহ্বরের পথা-
ভিমুখে দীর্ঘ-দীর্ঘের পা-বাড়ানোই পরামশ-
সিদ্ধ ; অতএব তাহারই চেষ্টা দেখা যাক্ ।

বিজ্ঞারাই নীতিজ্ঞা কম নহেন—যদি-চ
তাঁহার নীতি কলি'র শিখাইয়া-দেওয়া
একালের নীতি—একপ্রকার চাণক্যের
নীতি ! সে নীতির মন্ত্রকথা হ'লে
Divide & conquer—ভাগ-ভাগ কর,
আর জেতো । বিজ্ঞা যখন গণিতরাজ্য জয়
করিতে বাহির হ'ন, তখন তিনি পাটীগণিত,
বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি
গণিতের খণ্ডপ্রদেশগুলি পরম্পরের সংগ্রহ
হইতে বিরোধিতা করিয়া একে-একে
সেগুলিকে হাতের মুঠায় মধ্যে আনয়ন
করেন, এইরূপ করিয়া সমগ্র গণিতরাজ্য

অবলীলাক্রমে জয় করিয়া ক্যাপেন । কে-
কোনো বিজ্ঞা হউক না কেন, তাহা রীতিমত
উপার্জন করিতে হইলে তাহাকে আশ-
পাশের আর-আর সমস্ত বিজ্ঞা হইতে, বতব্বর
পারা যায়, পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহারই
উপরে মনোযোগের সমস্ত ভর সমর্পণ করা
কর্তব্য ; এইরূপ মনে করা কর্তব্য, যেন
উপার্জিতব্য বিজ্ঞার সঙ্গে আর-কোনো
বিজ্ঞার যুগাকরেও কোনো সম্পর্ক নাই ।
বীজগণিতও গণিত, জ্যামিতিও গণিত ;
কিন্তু তাহা সঙ্গেও জ্যামিতি অধ্যয়ন করিবার
সময় এক্ষণে অনন্তপরায়ণমানসে তাহাতে
প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য, যেন বীজগণিতের সঙ্গে
জ্যামিতির মূলেই কোনো সম্পর্ক নাই ।
বাল্যময় “কর্তব্য”—কিন্তু কাহার পক্ষে
কর্তব্য ? পঠদশায় বিদ্যালয়ের বালকদিগের
পক্ষে তাহা কর্তব্য—বিশেষত যাহারা
পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাহাদের
পক্ষে ! অসমব্যতিরেকের পথ বিজ্ঞা-
উপার্জনের প্রকৃষ্ট পথ, তাহাতে আর ভুল
নাই, কিন্তু তাহা জ্ঞানোদয়ের পথ নহে ।
জ্ঞানোদয়ের পথ ঠিক্ তাহার বিপরীত ।
জ্ঞানোদয়ের পথ যোগের পথ ।

উনবিংশতাব্দীর বিজ্ঞা'র, আদিভুক্ত
দেকষ্ঠা বীজগণিতের সমীকরণপদ্ধতি
জ্যামিতির অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া
গণিতের গৌরবমাহাত্ম্য কত যে উচ্চে
উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা বলা যায় না ।
তাঁহার পূর্বের আমলের বীজগণিত এবং
জ্যামিতির মাঝখানে প্রাচীর একটা
দাঁড়-করানো ছিল বিপর্যয়-কঠিন । দেকষ্ঠা
সেই বিচ্ছেদের প্রাচীরটা ভাঙিয়া-কেলিয়া

তাহার আরগার সৌহার্দ্যবিনিময়ের দ্বারা একটা সুগম পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। বিভিন্নশ্রেণীর বিজ্ঞান মধ্যে যোগের এইরূপ গোড়াপত্তন তাহার মতো জ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরই কাজ। তিনি যদি ঐ কার্যটিতে হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে গণিতবিজ্ঞান আজও ভূতলে হামাগুড়ি দিত। সাধারণত বলা বাইতে পারে যে, সকল বিজ্ঞানই নিগূঢ় মর্মহীন দিয়া আর-আর নানা বিজ্ঞানের সহিত সম্মিলনের নানা পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে, আর, সে-সকল সুড়ঙ্গপথের রহস্য-উদ্ঘাটন জ্ঞানোদয়েরই ফল, তা বই, তাহা-পাণ্ডিত্যের ফল নহে! ফলে, পণ্ডিত হইলেই কিছু আর জ্ঞানী হওয়া যায় না; জ্যোতিষ জানিলেই কিছু আর নিউটন হওয়া যায় না; কবিতা লিখিতে জানিলেই কিছু আর শেক্সপীয়ার হওয়া যায় না! এ তো দেখিতেই পাওয়া বাইতেছে যে, নিউটন-শেক্সপীয়ার প্রভৃতি প্রতিভাশালী মহাত্মাদিগকে অসামান্য বিদ্বান বা অসামান্য পণ্ডিত বলিলে তাঁহাদের প্রকৃত মর্যাদা মাটি করা হয়; কেন না, বিজ্ঞান বলিতে সচরাচর বাহ্যিক বুদ্ধির, তাহাদের বিজ্ঞান সেরকমের বিজ্ঞান নহে—শেখা বিজ্ঞান নহে! তাহাদের বিজ্ঞান একপ্রকার অশেখা বিজ্ঞান। তাহা অশিক্ষিত গোড়া'র জ্ঞানের উদ্বোধন—চৈতন্ত্যের উদয়! শেখা-বিজ্ঞানের নিকটে ভিন্ন-ভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় স্ব-স্ব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অধিকারের পণ্ডির মধ্যেই অব-রুদ্ধ; পরন্তু সে-সমস্তের মর্ম-মর্ম্য পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্যবিনিময়ের বেকরণ নানামুখ পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে, তাহার সন্ধান খুঁজিয়া-পাওয়া অশেখা-বিজ্ঞানেরই কাজ—মূল জ্ঞানেরই কাজ।

জ্যোতিষের সঙ্গে যন্ত্রবিজ্ঞান (Mechanics এর) যে বিশেষ কোনোপ্রকার সম্পর্ক থাকিতে পারে, এরূপ একটা কথা নিউটনের পুণের আমলের পণ্ডিতসমাজে উত্থাপনেরই যোগ্য ছিল না। নিউটন নুত্তম এই একটা বিষয়জনক সমাচার পণ্ডিতমণ্ডলীর মাঝখানে উপস্থিত করিলেন যে, যে কারণে বৃক্ষচূত ফল ভূতলে নিপতিত হয়, সেই কারণে গ্রহচন্দ্রাদি জ্যোতির্মণ্ডল স্ব-পরিধিপথে চলাকোরা করে। এরূপ একটা বিশাল অগতঃজোড়া কথা কে বলিতে পারে! সেই মহাপুরুষই বলিতে পারেন,—বাহ্যিক অপ্রতিহত জ্ঞানদৃষ্টিতে সুদূর নভোমণ্ডলের শতসহস্রযোজনব্যাপী গ্রহচন্দ্রাদি আপেল-ফলেরই জোষ্ঠভ্রাতা। এটা কি কম একটা কথা! ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, সব সত্যই এক সত্য! অতবধি একটা স্বর্গমর্ত্যপাতালব্যাপী কথা নিউটন কোথা হইতে পাইলেন? বাহির হইতে পা'ন নাই, তাহা দেখিতেই পাওয়া বাইতেছে। বাহির হইতে পাইবেন কেমন করিয়া? “সব সত্যই এক সত্য” এটা যে একটা অন্তরাঙ্গার নিগূঢ় কথা! অন্তরের কথা কি বাহির হইতে পাওয়া বাইতে পারে? তাহা যদি সম্ভব হইত, তবে মনুষ্য আপনার অন্তর্নিহিত চৈতন্ত্যও পথে-ঘাটে কুড়াইয়া পাইতে পারিত! ফল কথা এই যে, পাইরাছিলেন নিউটন তাহা অশেখা-বিজ্ঞানের হস্ত হইতে—বাটাই করিয়াছিলেন শেখা-বিজ্ঞানের বাজারে। বাটাই-কাঁচা আর-কিছু না—বাখার্যপরীক্ষা অর্থাৎ পান্ডিত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রে বাহ্যিক বলে

Verification । নিউটনের এই যে একটি প্রাণের কথা যে, সত্যের নিকটে বড়-ছোটো নাই—দূর-নিকট নাই ; পরন্তু যে সত্য মহাকাশের মহামহা জ্যোতির্মণ্ডলে বিরাজমান, সেই সত্যই ক্ষুদ্র একটা আপেক্ষিক মাথা জিজিয়া রহিয়াছে ; তাঁহার এই প্রাণের কথাটি বখন তাঁহার জ্ঞানের আলোকে মাধ্যাকর্ষণবেশে সাজিয়া বাহির হইল, আর, তাহার পরে বখন নানা প্রকার সুপরীক্ষিত বৃত্তান্তের প্রমাণবলে বলী হইয়া সেই কথাটি তাঁহার জ্ঞানের মধ্য হইতে পণ্ডিতসমাজে এবং পণ্ডিতসমাজের মধ্য হইতে সাধারণ লোকসমাজে উৎখা হইয়া পড়িল, তখন জ্যোতিষ এবং বস্তুবিজ্ঞানের মাঝখানে এতকাল ধরিয়া যে একটা বিচ্ছেদের প্রাচীর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সেই ছনিবার বানের ভোড়ে ভাঙিয়া চুরঝার হইয়া গেল ! তখন দেশবিদেশের পণ্ডিতবর্গের চক্ষু কুটিল, সকলেই তাঁহার। তখন জানিতে পারিলেন যে, জ্যোতিষ এবং বস্তুবিজ্ঞান হরিহরাত্মা । তার সাক্ষী নিউটনের উত্তরাধিকারী লাপ্লাস তাঁহার নবশ্রেণীত জ্যোতির্বিজ্ঞানের নাম দিলেন Celestial Mechanics—নাস্তিক বস্তুবিজ্ঞান । জ্ঞান তলে-তলে কাঁচা করিয়া বিজ্ঞানের বিশ্লেষিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যোগের কিরণ বহন আঁটিয়া দেয়, তাহার আর-একটি নহুনা বেধাই ।

“ অষ্টাদশ শতাব্দীর বড়-বড় জীবনব্যবিত্ত পণ্ডিতেরা এইরূপ একটা অকালপক মত বিচার বাজারে ঢালাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন জীবশ্রেণী পরস্পরের সংস্রব হইতে কঠিন প্রাচীর দিয়া আগুলানো

রহিয়াছে যে, কোনোগতিকই এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীতে পরিণত হইতে পারে না । ডার্বিন তাঁহাদের কথার কর্ণপাত না করিয়া এককোড়া লম্বপুচ্ছ পাররা লইয়া তাহাদের পরপরবর্তী বংশের মধ্য হইতে বেনী-বেনী লম্বপুচ্ছ-বাছিয়া-বাছিয়া কোড় মিলাইয়া অবশেষে একরূপ একর্যাক মাত্রাতীত লম্বপুচ্ছ ফলাইয়া তুলিলেন যে, তেমনতরো নূতন-সৃষ্টিগোচের পক্ষীকে দীর্ঘপুচ্ছ পাররা বলিলেও বলা যাইতে পারে, হ্রস্বপুচ্ছ-মধুর বলিলেও বলা যাইতে পারে ! ডার্বিনের পূর্বাচাৰ্যেরা সকলেই জানিতেন যে, প্রকৃতিরাজ্যে ঐরূপ মাঝামাঝিশ্রেণীর জীব অনেক আছে ; তার সাক্ষী—টেপারূ-কে বড় বরাহ বলিলেও হয়, ছোটো হস্তী বলিলেও হয় ; জেব্রা'কে উচ্চশ্রেণীর গাধা বলিলেও হয়, নিম্নশ্রেণীর ঘোড়া বলিলেও হয় ; তাহা জানিয়াও তাঁহার। বরাহ, টেপারূ, হস্তীকে, তথৈব পাখা, জেব্রা এবং ঘোড়া'কে তাহাদের স্বব শ্রেণীর প্রাচীর দিয়া ঘেরাও করিয়া প্রাণপণ বস্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আতিগত পার্থক্য সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন ! ডার্বিনের উদ্ভাবিত নূতন পাররা'র ঝাঁকের পাখা'র ঝাপটে সে সমস্ত প্রভেদের প্রাচীর চঁকিতের মধ্যে সমভূম হইয়া গেল । ডার্বিন অনেক-কাল ধরিয়া অসামান্য অধ্যবসায়ের সহিত দেশবিদেশের নানাপ্রাণীর জীবজন্তুর জাতিবৈচিত্র্যের গোড়া'র বৃত্তান্ত তত্ত্ব-তত্ত্ব করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, তিনি নিজে যেমন প্রাণীতে পাররার

কশে মনুষ্যবতার সমুদ্ভাবন করিয়া তুলিয়া-
ছেন, প্রকৃতিমাতা। হয়ং সেইরূপ প্রণালীতে
নিয় নিয় শ্রেণীর জীবের বংশে উচ্চ উচ্চ
শ্রেণীর জীব সমুদ্ভাবন করিয়া আসিয়াছেন।
সে প্রণালী আর-কিছু না—সুপাত্ত বাছিয়া-
বাছিয়া জোড়মিলানো। ডাবিন্ তাঁহার নিজের
কৃত পাত্তনির্কীচনের নাম দিয়াছেন Arti-
ficial Selection—কৃত্রিম পাত্তনির্কীচন;
আর প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্ত পাত্তনির্কীচনের
নাম দিয়াছেন Natural Selection—নৈস-
র্গিক পাত্তনির্কীচন। ইহা তিনরা শ্রোতার
মনে সহজেই এইরূপ একটি জিজ্ঞাসার উদয়
হইতে পারে যে, নৈসর্গিক পাত্তনির্কীচনের
গোড়া'র হুজুই বা কি, আর, চরমগতিই বা
কিরূপ? ডাবিন্ বলেন এই যে, জীবমাত্রই
আপনার সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার অস্ত্র চারি-
দিকের প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রামে
প্রবৃত্ত হয়, আর, যাহারা সংগ্রামে জয়ী হয়,
সেই যোগ্যতম জীবেরাই উদ্ভূত হয়। তবেই
হইতেছে যে, প্রকৃতিমাতা যোগ্যতম পাত্তের
নির্কীচনকর্তা। এইরূপ দেখা যাইতেছে
যে, নৈসর্গিক পাত্তনির্কীচনের গোড়া'র হুজু
হ'চ্ছে সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার অস্ত্র প্রাপণ
চেষ্টা, আর, তাহার চরমগতি হ'চ্ছে যোগ্য-
তমের উদ্ভব। অতএব জীবশ্রেণীর ক্রম-
বিকাশ অলঙ্ঘনীয়; কেন না, পূর্ব পূর্ব
যুগের জীবদিগের মধ্যে যে-যে-শ্রেণীর জীব
যোগ্যতম, সেই সেই শ্রেণীর জীবেরাই পর-
পরবর্তী যুগে উদ্ভূত হয়।

এই জালসাটিতে আমি একটি গল্প সাধা-
ইয়া তাহার সাহায্যে ডাবিন্দের সিদ্ধান্তের
একটা স্থল আদর্শ আপনাদের মনোনেত্রের

সম্মুখে দাঁড় করাইতেছি—ভাবা হইলেই
তাহার মুখ্য অবয়বগুলির মধ্যে, কোথায়
কিরূপ গ্রহিবন্ধনের তোড়নোক্ত, তাহা
সহজেই আপনাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে নিপতিত
হইবে। গল্পটি এই :—

ছয়সমুদ্রপারে সপ্তম সমুদ্রের মাঝখানে
একটি ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে; সেখানে মনুষ্য
বা অস্ত্র কোনো জীবজন্তুর উপস্থাব নাই,
কেবল একপাল শূন্যহীন গোক মুক্তভাবে
চরিয়া বেড়ায়। সেই উপদ্বীপের মধ্যস্থলে
ক্রোশখানেক বিস্তৃত একটি মাঠ আছে,
তাহাতেই কেবল তৃণ জন্মে; তা বই, উপ-
দ্বীপের অস্ত্র কোনো প্রদেশে তৃণ জন্মে না।
তবেই হইতেছে যে, সেই মাঠটাই গোক-
গুলার একমাত্র চরিবার স্থান। গোক-
গুলার দিবা সূখে খায়দার-থাকে—কাহারো সঙ্গে
কাহারো বিবাহ-বিসংবাদ নাই—সকলের
সঙ্গেই সকলের প্রাণে-প্রাণে ছদ্মতা—চরিবার
মাঠটি শান্তির আলয়। এইরূপে কিংকাল
নির্বিয়ে অতিবাহিত হইল। এই প্রথম
পর্যায়ের কালাংশটিকে বলা যাইতে পারে—
শূন্যহীন গোলাতির সত্যযুগ। পরযুগের
প্রারম্ভে অল্প-বংশবৃদ্ধি-গতিকে তাহাদের
ব্যক্তিসংখ্যা এরূপ মাজাতীত অধিক হইয়া
উঠিল যে, তাহারা সকলে মিলিয়া মাঠে
মধ্যাহ্নভোজন করিবার সময় তাহাদের
মাথার-মাথার ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল।
তাহাদের মধ্যে হইএকটি গোক এবং বাড়ীর
কপালের গ্রহিলপ্রদেশ অপেক্ষাকৃত কঠিন
ছিল বলিয়া তাহাদের প্রাত্যহিক মধ্যাহ্ন-
ভোজনের কোনো দ্ব্যমাত্ত ঘটিল না;
তাহারা সেইরূপ কপালভগ্নে ভিক্ষা চৈদ্যি

যুব বাড়াইয়া নির্ঝিয়ে তুলতুল করিতে লাগিল ; বাহাদের কপালের পাঁচি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, তাহারা হঠিয়া বাইতে থাকিল । বংশবৃদ্ধিগতিকে কঠিনমৌলি গোকুল্লার বড়ই সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই ভোজনকালে তাহাদের সহিত কপালের বলে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া কোমলমৌলি শ্রেণীর অধিকাধিকসংখ্যক গোকুল্লা হইতে বাহিরে পড়িয়া বাইতে লাগিল, আর, তাহার ফল হইল এই যে, সন্ন্যাস-গতিকে কোমলমৌলি গোকুল্লা দিনদিন অধিচর্ষণার হইয়া ক্রমশই জীবিকানির্ভার অধিকাধিক অপটু হইয়া পড়িতে লাগিল । কিয়ংকাল পরে যখন বংশবৃদ্ধিগতিকে কঠিনমৌলি গোকুল্লার দল মাঠের অর্দ্ধাংশ ছুড়িয়া চরিতে আরম্ভ করিল, তখন কোমলমৌলি গোকুল্লার দল-কে-দল অন্নভাবে শুকাইয়া মরিতে লাগিল । আরো কিছুকাল পরে যখন কঠিনমৌলি গোকুল্লার দল মাঠের বারো-আনা অংশ ছুড়িয়া চরিতে আরম্ভ করিল, তখন সারা উপদ্বীপে একটিও কোমলমৌলি গোকুল্ল অদৃশ্য রহিল না ; সকলেই তাহারা অন্নভাবে শুকাইয়া মরিল ।

গোবীপের সত্যযুগে কোমলমৌলি গোকুল্লদের বংশবৃদ্ধি হইয়া যখন তাহাদের মাথা-মাথা ঠোকাঠুকি আরম্ভ হইয়াছিল, তখনকার সেই অবস্থা struggle for existence এর অবস্থা—আত্মরক্ষার জন্য গোপন-পরিচ্ছিন্ন চেষ্টাপরায়ণতার অবস্থা । তাহার পরে যখন কঠিনমৌলি গোকুল্লের বংশ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর, সেই

সঙ্গে কোমলমৌলি গোকুল্লের বংশ ক্রমশই লোপ পাইতে লাগিল—তখনকার সেই যে অযোগ্য হইতে যোগ্যের পার্থক্যসংঘটন, তাহারই নাম Natural selection—নৈসর্গিক পাত্রনির্বাচন । আর, সেই নৈসর্গিক পাত্রনির্বাচনের অনিবার্য ফল বাহা পরিশেষে ফলিত হইল—কিনা কোমলমৌলি গোবংশের উচ্ছেদ এবং কঠিনমৌলি গোবংশের উদ্বর্তন, তাহারই নাম survival of the fittest—যোগ্যতমের উদ্বর্তন । গোবীপ-শাস্ত্রীয় সত্যযুগের অবসানকালে উপদ্বীপ-নিবাসী গোজাতি কঠিনমৌলি শ্রেণী পর্য্যন্ত আসিয়াই থাকিল । গোবীপের ত্রেতা-যুগে কঠিনমৌলি গোশ্রেণীর বংশবৃদ্ধি হইয়া এবারে তাহাদের মাথা-মাথা ঠোকাঠুকি শুধু নয়, কিন্তু রীতিমত ঠোকাঠুকি আরম্ভ হইল ; কেন না, ত্রেতাযুগের গোকুল্লের সবারই ললাটগ্রন্থি বিপর্য্য-কঠিন । তাহাদের মধ্যে যে-দুটি-একটি গোকুল্ল ললাটগ্রন্থি অত্যন্তক্ষুণ্ণ শৃঙ্খলার পরিণত হইয়াছিল, তাহারাই তাহাদের সময়ের যোগ্যতম পাত্র ; কাজেই ত্রেতাযুগের অবসানকালে তাহারাই উদ্বৃত্ত হইল । গোবীপের দ্বাপরযুগে যখন অত্যন্তক্ষুণ্ণ গোবংশ মাজাতীত পরিবর্তিত হইয়া তাহাদের মাথা-মাথা ঠোকাঠুকি শুধু নয়, কিন্তু বেধাবিধি এবং সেই সঙ্গে রক্তারক্তি কিয়ংপরিমাণে চলিতে থাকিল, তখন তাহাদের মধ্যে যে-দুটি-একটি গোকুল্ল শৃঙ্খলপরিণত হইয়াছিল, তাহারাই তাহাদের সময়ের যোগ্যতম পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, আর সেই কারণে শূলী গোবংশ দ্বাপরযুগে উদ্বৃত্ত হইয়া গোবীপের কলিযুগে সংক্রামিত

হইল। এখানে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, যেমন ঘোঁষ, তেমনি যুগ। আমাদের এই জঘন্য একটি কুজ পৃথিবী—গোঘোঁষ একটি কুজ উপঘোঁষ। কাজেই গোঘোঁষের এক যুগ, জঘন্যঘোঁষের এক শতাব্দীও নহে। এইখানে গল্প সমাপ্ত হইল—আমার কথাটি কুরাইল।

এ বাহা আমি এতক্ষণ ধরিয়া রাখিনিলাম, এটা যদি-চ কালনিক উপভাস বই নহে, কিন্তু ডারউইন্ বেরূপ অকাটা প্রমাণ দ্বারা উহার সম্ভাবনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ কৃত্রিম ঘটনাটি বাস্তবিক হইবার পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা দৃষ্ট হয় না।

ভার্বিনের এই নূতন সিদ্ধান্তটিকে জীব-জগতের গভীর অন্ততল পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া আধুনিক বিবর্তিবাদী পণ্ডিতেরা—Evolutionist গণ—এইরূপ একটি ব্যাপকরকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিভিন্নশ্রেণীর বিভিন্ন জীব একই জীবাঙ্কুরের (Protoplasm এর) তিরখা বিকাশ, আর, সেই তিরখা বিকাশের মূল-প্রবর্তক Struggle for existence—সম্ভা বাঁচাইরা রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। আধুনিক বিবর্তিবাদের এই মোট মন্তব্যকথাটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকটে খুবই নূতন, পরন্তু আমাদের দিক দিয়া আমরা দেখিতেছি যে, তাঁহাদের ঐ নূতন কথাটি বহু পুরাতন কথা; তার সাক্ষী—সাংখ্যদর্শনের একটি গোড়া'র কথা এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই মূলপ্রকৃতির তিরখা বিকাশ, আর, সেই তিরখা বিকাশের মূলপ্রবর্তক রজোগুণ। রজোগুণ পদার্থটা আর-কিছু না—হুঃখ এবং তিরস্কৃত কৰ্ম-

চেষ্টা। হুঃখ এবং কৰ্মচেষ্টাকে এক সঙ্গে জোড়া দিলেই হুঃখ মিলিয়া হইয়া বাঁচাইরা Struggle for existence—সম্ভা বাঁচাইরা রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। তবেই হইতেছে যে, Struggle for existence রজোগুণের আর-এক নাম। বলিতে কি—প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্তের দ্বার উন্মোচন করিবার অব্যর্থ চাবি ত্রিগুণতত্ত্বের দ্বার দ্বিতীয় আর-একটি খুঁজিয়া পাওয়া ভার! ত্রিধাতু-নির্মিত অমন একটি চমৎকার চাবি যখন আমাদের হাতের কাছে বক্বক্ব করিতেছে, তখন তাহাকে কাজে না খাটাইয়া কেমন করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? অতএব তাহার চেষ্টা দেখা যা'ক।

মনে কর, পুষ্করিণী তথাইরা গিয়াছে, আর, তাহার তলপক্ষে একটা মৎস্ত যুতবৎ পড়িয়া আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই যেমন ত্রিগুণাত্মক, বেচারী মৎস্তটিও তেমনি ত্রিগুণাত্মক! সখ, রক্ত এবং তম, এই তিন গুণ মৎস্তটির তিতরে পুঁটুলিবাঁধা রহিয়াছে;—আছে তিন গুণই পুঁটুলিবাঁধা, তবে কিনা মৎস্তটির একগুণকার অসাড় এবং নিশ্চেষ্ট শরীরে তমোগুণেরই সর্বশেষ প্রাক্‌জীব। তমোগুণ তো আর গাছে কলো না—অসাড়তা এবং নিশ্চেষ্টতার নামই তমোগুণ। কিন্তু মৎস্তটি কি একেবারেই অসাড়, একেবারেই নিশ্চেষ্ট? তাহা হইতে পারে না; কেন না, যদিও মৎস্তটি মড়া'র মতো পড়িয়া আছে, তথাপি সে বাঁচিয়া আছে—মরে নাই;—বাঁচিয়া যখন আছে, তখন, অবশ্যই তাহার তমোগুণের ঘন আ-কারে রজোগুণ কিনা হুঃখ এবং হুঃখ

চাপা পড়িয়া রহিয়াছে—যদি-চ সাতহাত
জলের নীচে । তা শুধু না—মৎস্তটির তমো-
গুণের আড়ালে যেমন রজোগুণ লুকাইয়া
আছে, রজোগুণের আড়ালে তেমনি সত্ত্বগুণ
লুকাইয়া আছে—হুঃখ এবং ছটুকটানির
জড়ালে হুঃখের ঔষধ লুকাইয়া আছে ।
হুঃখের ঔষধ সে যে কি তাহা জানিতে
হইলে, হুঃখের কারণ কি তাহা জানা আব-
শ্যক । হুঃখের কারণ হ'চ্ছে অভাববোধ ।
মৎস্তটির অভাববোধ হইতেছে কিসের
গতিকে ? অবশ্য জল হইতে বিযুক্ত-হওয়া-
গতিকে । “জল পাইলে বাঁচি” এই কথাটি
মৎস্তের অভাববোধের হাড়-হাড়ে জাগি-
তেছে । মৎস্তটির হুঃখের ঔষধ যে কি,
তাহা বোঝা গেল । সে ঔষধ আর-কিছু
না—জলের সংলগ্ন । জলের সংলগ্ন
ঘটিবে কেমন করিয়া—জল যে অনেকহাত
দূরে ! স্বপ্নে তাহা ঘটিতে পারিবার বাধা
নাই । মৎস্তটির অভাববোধের অন্ততলে
তাহার নৈসর্গিক সংস্কার, ইংরাজিতে বাহাকে
বলে instinct, সেই নৈসর্গিক সংস্কার জলের
স্বপ্ন দেখিতেছে, আর, মৎস্তটি সেই স্বপ্নের
জলে সাঁতার দিয়া কিয়ৎপরিমাণে সুখ
অনুভব করিতেছে—যদি-চ তাহা একপ্রকার
হুঃখের সাধ বোলে মেটানো । মৎস্তটি তুলিতে
পারে নাই—ঐ যে জলের প্রকাশ এবং
সত্ত্বগুণস্বপ্ন, উহাও প্রকাশ, উহাও স্বপ্ন ;
যদি-চ উহা স্বপ্নের প্রকাশ বই—স্বপ্নের স্বপ্ন
বই—জাগ্রত প্রকাশ নহে, জাগ্রত স্বপ্ন নহে ।
এখন ঐষ্টব্য এই যে, জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতা
যেমন তমোগুণের ধর্ম, হুঃখ এবং ছটুকটানি
[ন রজোগুণের ধর্ম, সুখ এবং প্রকাশ

তেমনি সত্ত্বগুণের ধর্ম । মৎস্তটির নিশ্চেষ্ট এবং
অসাড় শরীরে তমোগুণের খুবই প্রাধান্য,
তাহা তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে, তা
ছাড়া, উহার ভিতরে খানাতল্লাসি করিয়া
আর-ছটুকটানি নিগূঢ়রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল
এই যে, উহার তমোগুণের আড়ালে রজোগুণ
লুকাইয়া আছে, তথৈব রজোগুণের
আড়ালে সত্ত্বগুণ লুকাইয়া আছে । অতঃপর
মনে কর যে, মৎস্তটিকে পঞ্চ হইতে উঠাইয়া-
লইয়া একটা জলপূর্ণ পুকুরিগীর অনতিদূরে
তুকডাঙার ছাড়িয়া দেওয়া হইল । মৎস্তটির
রজোগুণ বাহা এ দীর্ঘকাল তমোগুণের ঘন
পরিচ্ছদে মুখ মুড়িহুড়ি দিয়া লুকাইয়া
ছিল, এক্ষণে তাহা একান্তে গা-ঝাড়া দিয়া
উঠিল, আর, সেই-গতিকে মৎস্তটির লাকানি-
কাঁপানি আরম্ভ হইল ; ইহারই নাম
Struggle for existence—সত্তা বাঁচাইয়া
রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা । এই সময়ে
মৎস্তের ভিতরে আর-একটি ব্যাপার আরম্ভ
হইল—সত্ত্বগুণের প্রভাব অন্ন-মন্ন করিয়া
জানানু দিতে লাগিল । মৎস্তটির হাড়-হাড়ে
জাগিতেছে সেই যে স্বপ্নরূপী জলের প্রকাশ
এবং সত্ত্বগুণস্বপ্ন, বাহা মৎস্তটির নৈসর্গিক
সংস্কারের (instinctএর) অবিচ্ছেদ্য সহচর,
সেই সত্ত্বগুণের ব্যাপারটি অন্নকারের প্রাণীপ
হইয়া মৎস্তটিকে ক্রমাগতই জলপূর্ণ পুকুরিগীর
অভিমুখবর্তী পথ দেখাইতে লাগিল ।
মৎস্তটি সেই ‘নৈসর্গিকসংস্কাররূপী সত্ত্বগুণের
আলোকে পঞ্চ চিনিয়া-চিনিয়া’ লাকাইতে-
লাকাইতে পুকুরিগীর পাড়ের নিকটবর্তী
হইতে লাগিল । তাহার আর-কিছুকাল
পরে তাহার চকের সামনে পুকুরিগীতে

জল ধইধই করিতে লাগিল। ইতিপূর্বে যে-জল তাহার সুবন্ধে ঝাপসা-ঝাপসা প্রকাশ পাইতেছিল, এক্ষণে সেই জল তাহার চক্ষের সম্মুখে দেখাপমান। এই সময়ে মংস্তটির অন্তরের সুবন্ধ বাহিরের জলপ্রকাশে তন্ময়ীভূত হইয়া আনন্দে পরিণত হইল। এইরূপ প্রকাশ এবং আনন্দেব অভিব্যক্তির নামই সঙ্গুণের প্রাকৃত্যব। সঙ্গুণের আলোক উদ্ভাসিত হইয়া মংস্তটিকে সীধা রাস্তা দেখাইয়া দিল, অ'র অ'র তৎক্ষণাৎ মংস্তটি জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ পাইয়া উঠিল। ত্রিগুণের লীলা নিরন্তরীণ জীব তে। এইরূপ মনুষ্যে কিরূপ তাহা দেখা যাক।

মনে কর, শেখরাঙ্গের একজন কবির সুখ ভক্তি'র পেল। চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া তাহার মন চকল হইয়া উঠিল। চকল্যের কারণ অবশ্য অভাববোধ। আলোকের অভাবেরই নাম অন্ধকার; সুতরাং অন্ধকারবোধ একপ্রকার অভাববোধ; সেই অভাববোধই মনের চকলতার কারণ। কবির মনের ঐ যে চকলতা, উহা আর-কিছু না, আলোকের অভাব হট্‌কটানি। ইহারি আর-এক নাম রজোগুণের প্রাকৃত্যব। কালিদাসের শকুন্তলায় একটি সুন্দর শ্লোক আছে, তাহা এই :—

“বাত্যকতোহুশিখরঃ পতিরোষনীনাং

আবিভূতোহুপপূরঃসর একতোহুর্কঃ।

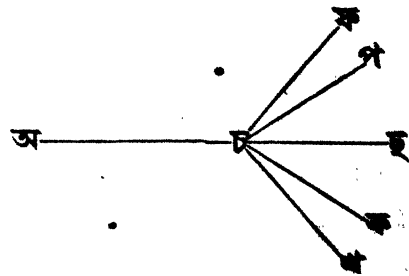
একদিকে ভববিগণের পতি অত্যশ্বরে যাইতেছেন, আর-এক দিকে স্বর্বা প্রতাসিত অরুণকে অগ্রবর্তী করিয়া বাহির হইতেছেন। কবি এই শ্লোকটি আঙড়াইতে

আঙড়াইতে মনোমধ্যে একপ্রকার যশের স্বর্বালােক জাগাইয়া-তুলিয়া। হৃদয়ের সাথ ঘোলে মিটাইতে লাগিলেন। তাহার পর যখন রজনীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া দিবসের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল, এবং আর-কিছুকাল পরে যখন সন্ধ্যাতমেব হিরণ্য জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, তখন কবির মনের স্বর্বালােক আগ্রত বিশ্বালোকে তন্ময়ীভূত হইয়া আনন্দে পরিণত হইল। সুস্মৃতিকালে কবির তমোগুণের ঘনপরিচ্ছদে রজোগুণ এবং সঙ্গুণ মুখ মুড়িমুড়ি দিয়া লুকাইয়া ছিল। সুপ্তিভঙ্গে রজোগুণ অর্থাৎ মনের গোভ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল; তাহার পরে সঙ্গুণ অর্থাৎ অন্তরের আলোক বিশ্বের আলোকে তন্ময়ীভূত হইয়া আনন্দে পরিণত হইল। ত্রিগুণের লীলা জীবরাজ্যে দেখিলাম—মনুষ্যে দেখিলাম—দেখিতে কেবল বাকি জড়জগতে। জড়বস্তুর ভিতরে সত্তা আছে এবং শক্তি আছে—এ কথা সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু তা ছাড়া, জড়বস্তুর শক্তির মূলে যে, শক্তির নিরামক এবং পৃথপ্রদর্শক আছে—রজোগুণের গতি-ক্ষুতির মূলে যে সঙ্গুণের আলোক আছে, এ কথা স্বীকার করিতে অনেকে ভারবোধ করেন—ভারবোধ করিবারই কথা, কেন না, বাস্তবিকই জড়বস্তুর তমোগুণপ্রধান। জড়বস্তুর শক্তি-ক্ষুতি দেখিলে, গতিক্রিয়া দেখিলে, সহসা মনে হয়, যেন তাহার গতিক্রিয়ার কোনো পৃথপ্রদর্শক বা নিরামক তাহার ভিতরে নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, জড়বস্তুর গতিক্রিয়া নিত্যকাল অন্ধ নহে; পলক তাহার ভিতরে

চাঁদার প্রবর্তক যেমন আছে—নিরামক ও তেমনি আছে; চাঁদাইবার চাবুক যেমন আছে—বাণাইবার রাণও তেমনি আছে।

স্পেন্সর প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রকৃষ্টপন্থকে সম্বন্ধের সংজ্ঞা হইতে সমূলে নিষেধিত করিয়া এইরূপ একটা একদিক্-শাসী সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়াছেন যে, অল্পতম বাধার পথে চলাই (Least resistance এর পথে চলাই) গতির মূলনিয়ম। ইহাতে প্রতিক্রিয়ার নিষ্পাদনে সম্বন্ধের যে কোনো-একর হস্ত আছে, তাহা প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হইয়াছে! স্পেন্সর প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, চাঁদার বাধাগ্রস্ত গতির নিয়মকে গতির মূলনিয়ম বলিতেছেন কেন? বৃত্তিতে? বাধাই কি গতির সর্ব্ব্ব? মনে কর, হুই বহু রাম এবং শ্রাম কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ভারতব্রমণে বাহির হইলেন। রাম বলিলেন—“আসামে যাই চল”; শ্রাম বলিলেন—“দক্ষিণপ্রদেশ অনেকের নিকটে অপরিজ্ঞাত—কতাকুমাড়ীতে যাই চল।” শেষে দুজনার মধ্যে রফাস্থরত এইরূপ মতগা ধাৰ্য্য হইল যে, “মাত্রাজে যাওয়া যাক্—মাত্রাজ দক্ষিণ-অকলও বটে, পূর্ব্ব অকলও বটে।” এরূপ স্থলে, বৈজ্ঞানিক ভাবার—মাত্রাজমুখা পথই অল্পতম বাধার পথ। এখানে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দুজনার যাত্রারন্ত-সময়ের পৃথক্ পৃথক্ মনের গতিই গোড়া'র কথা—উভয়ের বাধাগ্রস্ত একথা মনের গতি তাহার পরের কথা। আমি চাহিতেছি অব্যাহত গতির নিয়ম, কুনি আমাকে

আনিয়া দিতেই বাধাগ্রস্ত গতির নিয়ম, আর, তাহাকেই বলিতেছি গতির মূলনিয়ম। কলে, অব্যাহত গতির নিয়ম ডিঙাইয়া বাধাগ্রস্ত গতির নিয়মকে প্রাধান্য দেওয়া একপ্রকার ঘোড়া ডিঙাইয়া খাস খাওয়া, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। স্পেন্সর প্রভৃতি নব্যশ্রেণীর আধুনিক পণ্ডিতগণের চাইতে নিউটন্‌ ডের উচ্চতরের জ্ঞানী ছিলেন, তাহাতে আর-কুল নাই; তাই তিনি গোড়া'র কথা গোড়াতেই উপস্থাপন করিয়া গোড়াতেই তাহার সমুচিত সীমানা করিয়াছেন। নিউটন্‌ গোড়াতেই বলিয়াছেন যে, অব্যাহত গতি সরলরেখার পথ অবলম্বন করে, আর, ঐ মূল কথাটির বলে এটাও তিনি বিধিমতে সঙ্গ্রহণ করিয়াছেন যে, বক্রপথগামী বস্তুরাও প্রতি-বৃহতে সরলরেখাপথে গমনোন্মত্ত।



মনে কর একটা বস্তু (চ) অব্যাহত গতি, আর, সেইজন্ত তাহা সরলপথে (অচ-পথে) চলিতেছে। সরলপথে যখন চলিতেছে, তখন কাজেই তাহাকে এতোক বৃহতে অতিবাহিত পথের সমসুজবর্তী পথে চলিতে হইতেছে। এখন জটিল এই যে, অতিবাহিত (অচ) পথের সমসুজবর্তী পথ একটিমাত্র (চহ)—অসমসুজবর্তী পথ অন্য

(চক, চখ, চপ, চক ইত্যাদি)। কাজেই চলমান বস্তুটাকে প্রত্যেক মুহূর্তে অসংখ্য বিভিন্নমুখ পথের মধ্য হইতে সমন্বজ পথটি বাছিয়া-লইয়া সেই পথে চলিতে হইতেছে। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য বিভিন্নমুখ পথের মধ্য হইতে সমন্বজবর্তী পথটি চিনিয়া-লওয়া অসম্ভবতার কার্য্য, না চক্ষুমান ব্যক্তির কার্য্য? অবশ্য তাহা চক্ষুমান ব্যক্তির কার্য্য। তবেই হইতেছে যে, চলমান বস্তুটির ভিতরে অবশ্যই এমন একটা-কিছু আছে, যাহা প্রতি মুহূর্তে তাহাকে গন্তব্য সমন্বজপথটি চিনাইয়া দিতেছে। তা শুধু না—ভিতরের সেই পথপ্রদর্শকটির জ্ঞানবোধ আছে। সে বলিতেছে যে, সমন্বজপথের জাহিনে যদি বাও, তবে বামদিক্ কি অপরাধ করিল? বামে যদি বাও, তবে ডাহিনদিক্ কি অপরাধ করিল? উর্দ্ধে যদি বাও, তবে নিরদিক্ কি অপরাধ করিল? নিম্নে যদি বাও, তবে উর্দ্ধদিক্ কি অপরাধ করিল? অতএব চলিতে যখন হইতে-ই-ছে, তখন ডাহিনে-বামে বা অথ-উর্দ্ধে না হেলিয়া সমন্বজে চলাই জ্ঞানসম্বল। প্রথম ঐষ্টব্য এখানে এই যে, চলমান বস্তুটির ভিতরে একটা হট্টকটানি আছে—রজোশুণের কামড়ানি আছে, সেই-কন্ত সে হানপরিবর্তন না করিয়া একমুহূর্তও স্থির থাকিতে পারিতেছে না। দ্বিতীয় ঐষ্টব্য এই যে, তাহার ভিতরে রজোশুণের উত্তেজনা কে আছেই, তা ছাড়া, গন্তব্য-দিকে একটা প্রকাশ আছে—সম্বন্ধের আলোক আছে; আর, সেইজন্য তাহার জাহিনে-বামে উর্দ্ধে-নীচে অসমন্বজ পথ

প্রসূক্ত রহিয়াছে 'বদি-চ সহস্রা'—সে কি তাহার কোনোটর দিকে না হেলিয়া জ্ঞান-সম্বল সমন্বজপথটি বাছিয়া-লইয়া সেই পথেই চলিতেছে? কল কথা এই যে, গতির 'সম্ভাবনীয়তার' পক্ষে বাধা যেমন প্রয়োজনীয়, প্রবর্তক তেমনি প্রয়োজনীয়; প্রবর্তক যেমন প্রয়োজনীয়, নিয়ামক তেমনি প্রয়োজনীয়। গতির বাধা হ'লে তমোশুণ, যেহেতু বাধা জড়বস্ত্রী; গতির প্রবর্তক হ'লে রজোশুণ, যেহেতু তাহা একপ্রকার হট্টকটানি, গতির নিয়ামক হ'লে সম্বন্ধশুণ, যেহেতু তাহা একপ্রকার প্রকাশ—গন্তব্যাদিকের প্রকাশ। কলেও এইরূপ দেখা যায় যে, স্তম্ভ ঈশ্বরই হউক আর মূল পৃথিবীই হউক—একটা না-একটা কোনো জড়বস্তুর (অথবা যাহা একই কথা—তমোশুণের) আশ্রয় ব্যতিরেকে গতি থাকিতে পারে না; তেমনি আবার হানপরিবর্তনের জন্য ভিতরের হট্টকটানি বা রজোশুণের উত্তেজনা ব্যতিরেকে গতি থাকিতে পারে না; তথৈব, দিগ্-নিরূপণ ব্যতিরেকে (অথবা যাহা একই কথা—সম্বন্ধের আলোকে গন্তব্যাদিকের প্রকাশ ব্যতিরেকে) গতি থাকিতে পারে না। অতএব এটা স্থির যে, গতিক্রিয়ার ব্যাপারটিতে গতির বাধারূপী তমোশুণ, গতির প্রবর্তকরূপী রজোশুণ এবং গতির নিয়ামকরূপী সম্বন্ধশুণ, তিনের পরস্পরাশ্রয়িতা অপরিহার্য্য। তবেই হইতেছে যে, সমস্ত জড়জগৎ ত্রিগুণাত্মক, কেন না, গতি জড়বস্তুর পতিকক্ষুর্তিরই আর-এক নাম।

সম্বন্ধতমোশুণ কোথায় কি ভাবে কার্য্য করে—নিয়ন্ত্রণের জীবের বা বি

ভাবে কার্য্য করে, মহুবোয়র মনোমধ্যেই বা
কি ভাবে কার্য্য করে, অদ্ভুতগতেই বা কি ভাবে
কার্য্য করে, তাহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া
দেখাইলাম। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, এটা
যেমন সত্য যে, সব বস্তুতে সম্বন্ধসম
সব গুণই আছে, এটাও তেমনি সত্য যে,
সব বস্তুতে সব গুণের প্রাচুর্য্যের মাত্রা
সমান নহে। বিশেষতঃ সম্বন্ধের প্রাচুর্য্য
মহুবোয়র মধ্যে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়,
এমন আর কোনো জীবের মধ্যেই নহে।
এ তো জানাই আছে যে, অভাবের অল্পত্ব
হইতে ক্রন্দন বাহির হয় শৃগালকুকুরাদি
অনেকানেক জীবের; পক্ষান্তরে, ভাবের
উদয় হইতে হাত বাহির হয় কেবল মহুবোয়রই
মুখে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ভাবের উদয়
একপ্রকার অন্তরের আলোক; হাত
আনন্দের অভিযুক্তি; আর, প্রকাশ এবং
আনন্দ দুইই সম্বন্ধের নির্ঘাত পরিচয়-
লক্ষণ। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে
যে, সম্বন্ধের প্রাচুর্য্য মহুবোয়র মধ্যে যেমন,
এমন আর কোনো জীবেরই নহে। আর-
একটি দ্রষ্টব্য এই যে, পঞ্চাঙ্গি জন্তুদিগের
ভায় মহুবোয়র অভাববোধ তো আছেই,
তা ছাড়া, মহুবোয়র নূতন আর-একতরো
বোধ আছে, যাহা অন্য কোনো জীবেরই
নাই। সেটা হ'ল ভাববোধ;—যেমন
সৌন্দর্য্যবোধ, মঙ্গলবোধ, সত্যবোধ, ভায়বোধ,
ধর্ম্মবোধ ইত্যাদি। ইংরাজিতে একটি
প্রবাদ আছে যে, অভাববোধ নূতন
উদ্ভাবনের মাতা—Necessity is the
mother of invention। অধিকন্তু আমি
বলি এই যে, নূতন উদ্ভাবনের মাতা যেমন

অভাবের অল্পত্ব, নূতন উদ্ভাবনের শিতা
তেমনি ভাবের উদয়। অভাবের অল্পত্ব
পঞ্চাঙ্গি জন্তুর খুবই আছে, কিন্তু সে একলা-
নারী হইতে কোনোপ্রকার নূতন উদ্ভাবনের
জন্ম ঘটিতে আর পর্য্যন্তও দেখা যায় নাই।
পক্ষান্তরে, অভাবের অল্পত্ব যখন মহুবোয়র
মনোমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভাবের উদয়কে
পতিত্রে বরণ করে, তখনই যথাসময়ে তাহার
পক্ষে নূতন উদ্ভাবনা জন্মগ্রহণ করে। কলেও
এইরূপ দেখা যায় যে, সৌন্দর্য্যের ভাব,
মঙ্গলের ভাব, সত্যের ভাব, ধর্ম্মের ভাব,
এই এইপ্রকার বিশেষ বিশেষ ভাবের আলোকে
বিশেষ বিশেষ মহাত্মারা বিশেষ বিশেষ
অন্তর্জগৎ সৃষ্টি করেন; তান্ত্র সাকী—কালি-
দাস সৌন্দর্য্যের আলোকে শকুন্তলা সৃষ্টি
করিয়াছিলেন; প্লেটো মঙ্গলের আলোকে
নূতন একপ্রকার সাধারণতন্ত্র (Republic)
সৃষ্টি করিয়াছিলেন; বেকন সত্যের আলোকে
নব আটলান্টিস উপদ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন;
কোনো লোকপুঞ্জ্য মহাপুরুষ ধর্ম্মের
আলোকে বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন।
এই সকল ভাবের আলোক সম্বন্ধেরই
অভিযুক্তি। যদি-চ সম্বন্ধের সবিশেষ
প্রাচুর্য্য কেবল মহুবোয়র মধ্যেই সম্ভবে,
তথাপি সম্বন্ধের যথাসম্ভব ন্যূনাধিক
প্রাচুর্য্য সকল জীবেরই দেখিতে পাওয়া
যায়—এমন কি, অদ্ভুতগতেও। তার সাকী—
পিপীলিকাদের কার্য্যকলাপ দেখিলে এটা
বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সামাজিক
সামাজিক সুর্য্যবহার আলোক ভাবের
মনোমধ্যে কিম্বকিনি দিতেছে—যদি-চ যন্ত্রের
ভায় অপরিমুদ্যতাবে; সে বাপুলা আয়োজক

সবশেষেই আলোক। তেমনি আবার বটবৃক্ষের বীজের মধ্যে বটবৃক্ষের ভাব বাহ্য পুঞ্জি করা রহিয়াছে, তাহাও সবশেষে একপ্রকার ভ্রমোদ্ভূত অধি।

ডাবিন্ জীবরাজ্যে রজোগুণের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাইরাছেন খুবই স্পষ্ট; তাহার তাহা দেখিতে পাইবারই কথা, যেহেতু পর্ব্বাদি জীব বাস্তবিকই রজোগুণপ্রধান; কিন্তু তদ্ব্যতীত সেই রজোগুণের পর্দার আড়ালে যে, সমস্ত, লুকাইয়া-লুকাইয়া কার্য্য করিতেছে, আর, মনুষ্যের অন্তঃকরণে তাহা যে রীতিমত আগ্নেয় কর্ম্মকাইয়া বসিয়া আছে, এ কথাটির প্রতি তিনি বিহিতবিধানে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। একটু দূরিতে ডাবিন্ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, জীবজগতে লড়াই-বগড়া'র প্রাচুর্য্য বাহ্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার অনিবার্য্য ফল বাহার নাম দিচ্ছিলেন ডাবিন্ যোগাড়ের উদ্ভটন, তাহা জীবপ্রকৃতির কেবল একটামাত্র দিক—কজিরতাবের দিক—রজোগুণের দিক। কিন্তু তদ্ব্যতীত আর-একটা দিক আছে—সেটাও বিবেচ্য; সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণতাবের দিক—সমস্তের দিক। এ বাহ্য আমি বলিতেছি, ইহার দৃষ্টান্ত আমি পূর্বে দেখিয়াছি নানাতর; পরন্তু একটি দৃষ্টান্ত বাহ্য আমি সচক্ষে দেখিয়াছি, সেটি অতি চমৎকার।

বহরশরৎ পূর্বে আমি আমার চকের সাগরে একটি অনৌষধিক বটনা দেখিয়া বিষয়ে অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। সম্মার কিনারা-বাঁসা একটা অটালিকার বারাতার কুঁড়বনেরা খালা-পাখর পরিচায় করিবার

সময় উজ্জ্বল অগ্নি পক্ষীর ভীষণপাশে বাড়িয়া কেলিত; সেই সময়ে মালা কাক জমা হইয়া সেই সমস্ত পরিচায়ত কাকসামগ্রী খুঁটিয়া খাইত। একদিন তাহাদের ভোজনকালে বৃহৎ একটা ডাঁড় কাক তাহাদের মধ্যে উড়িয়া-আসিয়া ছুড়িয়া বসিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে লাগিল। তাহার একাধ শরীর দেখিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ-বন্দুত-বোধে আর-আর কাকেরা তাহার নিকট হইতে অনেকদূর দূরে সরিয়া বসিল। বলিব কি, ডাঁড় কাকটির মতো দয়ালব মহাপুরুষ আমি আমার জন্মে দেখি নাই; সে ছুইচারিটি ঠোঁকর খাইতেছে, আর, ভিন্নভাষীর কাকগুলোকে খাইতে আরগা ছাড়িয়া-দিয়া পাঁচছয়হাত অন্তরে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া বসিতেছে; ক্রমাগত এইরূপে আসা-যাওয়া করিয়া ভোজ্যসামগ্রীর নিরেনকরই অংশ নিরেনকরই কাককে খাইতে দিয়া একাংশ-মাত্র আপনি খাইল, তাহাতে তাহার পেট ভরিল কি না সন্দেহ—কেন না, তাহার শরীরের আরতন-আর-আর কাকের অপেক্ষা বিশগুণ লম্বা-চওড়া। ইচ্ছা করিলে সে একা-আপনি সব-ক'টি ভাত বজ্জনে উত্তর করিতে পারিত—কেন যে তাহা করিল না, তাহা সে-ই জানে, আর অন্তর্ধানী বিভাভাপুরুষই জানেন। ডাবিনের আইন মানিয়া চলিতে হইলে ডাঁড়কাক'টার উচিত ছিল—সর্বোপা কাক-গুলোকে ঠোঁকরে ঠোঁকরে উজ্জ্বল করিয়া আপনি একাকী উত্তর হওয়া। প্রকৃত কথা বাহ্য, তাহা এইঃ—ডাবিন কিছু-আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবিশেষে তার সমস্ত বিষ-

ব্রহ্মাণ্ডকে অতেন্দ্রিয়তে দেখিতেছেন না—
 জীবে-জীবে প্রভেদ আছে, এ কথা
 তিনি মানেন। এটা যখন তিনি
 স্বীকার করিতেছেন যে, ভ্রাতার-ভ্রাতার
 প্রভেদ আছে, তখন সেই সঙ্গে এটাও
 তাঁহার স্বীকার করা উচিত যে, মাতা-পুত্র
 প্রভেদ আছে। প্রকৃতি হ'চ্ছেন মাতা,
 আর, জীবগণ হ'চ্ছে প্রকৃতিমাতার পুত্র,
 এবং পরম্পরের ভ্রাতা। সময়ে-সময়ে
 ভ্রাতার-ভ্রাতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটতেও দেখা
 যায়, আর সেইগতিকে যোগাত্মক ভ্রাতার
 উৎর্ধ্বন ঘটতেও দেখা যায়। কিন্তু তা
 বলিয়া মাতার মনোগত অভিপ্রায় একরূপ
 হইতে পারে না যে, যোগাত্মক ভ্রাতা অযোগ্য
 ভ্রাতাদিগকে উচ্ছিন্ন করিয়া আপন একাকী
 উদ্ভূত হউক। উঠা বয়স মাতার মনোগত
 অভিপ্রায় এই যে, যোগাত্মক ভ্রাতা অযোগ্য
 ভ্রাতাদিগের অভাবপূরণ করিয়া তাহাদিগকে
 যোগ্য করিয়া গড়িয়া লউক। নিরশ্রয়ী
 জীবের মতো ছোটো ছেলেরা মাতার
 মর্গগত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারুক,
 কিন্তু মনুষ্যের জ্ঞান বড় ছেলেদের তাহা
 বুঝিতে না পারিবার কোনো কারণ নাই।
 কেন না, প্রকৃতিমাতা নিজহস্তে যে-কোনো
 কার্য করেন, তাহাতেই স্পষ্ট প্রকাশ পায়
 যে, তাঁহার কাজই হ'চ্ছে অযোগ্যকে যোগ্য
 করিয়া গড়িয়া-লওয়া। তার সাক্ষী—
 বাঙালিগণ। জর্দে কিলবিল করে, অথচ
 ডাঙার একপ্রকার দৃশ্য তাহাদের তিতরে-
 তিতরে কার্য করিয়া ক্রমে-ক্রমে তাহাদের
 হৃৎপদ হুটাইয়া তোলে, আর, সেইগতিকে
 বাঙালি বাঙ, হইয়া উঠিয়া ডাঙার বিচরণ

করিবার যোগ্যতা লাভ করে। অত্যন্ত অবোধ
 জীবেরা নিতান্ত ছোটো ছেলে, হুতরাং
 হুতরাং তাহাদিগকে শোভা পায়, কিন্তু
 মনুষ্য যখন প্রকৃতিমাতার মর্গগত অভি-
 প্রায়ের বিরুদ্ধে অযোগ্য ভ্রাতাদিগের
 উচ্ছেদের উপরে আপনার যোগ্যত্বমতের
 গোড়াপত্তন করিতে যায়, তখন প্রকৃতি-
 মাতা কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যকে
 শিকাদান করেন এমনি নির্ধাতরুকলের
 যে, মনুষ্য জন্মে তাহা ভুলিতে পারে
 না। ডার্বিনের এই যে শব্দ আইন
 “যোগ্যত্বমের উৎর্ধ্বন”, ইহা লোকসমাজে
 প্রচলিত হইলে লোকে যে বিরূপ
 “দৌর্ভিক্ষাৎ বাস্তি দৌর্ভিক্ষাৎ ক্লেশাৎ ক্লেশাৎ
 ভয়াদৃতয়ং”—দৌর্ভিক্ষা হইতে দৌর্ভিক্ষো,
 ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ে পরনিক্ষেপ
 করে, করাদীপ বিপ্লবের সময় তাহা পারি-
 নগরের পুরবাসীদিগের কাহারো জানিতে
 থাকি ছিল না। অযোগ্য রাজবংশ এবং রাজ-
 পারিষদবর্গকে শাসাইয়া প্রথমে মিরারো'র
 দল যোগাত্মক হইয়া উঠিলেন; তাহার পরে
 বিধিমতপ্রকারে রাজবংশ ধ্বংস করিয়া
 রস্পিরি'র যোগাত্মক হইয়া উঠিলেন; তাহার
 পরে সারারাজ্যের অযোগ্যদিগকে ভোপের
 ধনকে দূরে বহিস্কৃত করিয়া-দিয়া নেপোলিয়ন-
 মহাবীর আপনার যোগ্যত্বমতের আজ্ঞামান
 প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। বাহাই হোক
 না কেন—করাদীপ বিপ্লবের রক্তোত্তপ্ত-
 প্রধান উদ্ভূত তরঙ্গকোলাহলের গভীর
 অন্ততলে সবগুলোর রক্তপ্রদীপ জ্বলমান বর্ণীর
 আলোক বিকীর্ণ করিতে এক সুহৃৎও ক্ষান্ত
 ছিল না, এবং এখনো পৃথিবীজ্বল সমস্ত

সত্যজিতির কুটিল রাজনৈতিক পাকচক্রের ভিতরে-ভিতরে সে-ই সে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে—বদি-চ বাহিরে তাহার ঝিল্লি বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সে আলোক হ'চ্ছে করাসীস্ বিপ্লবের মূল-মন্ত্র ; তাহা যে কি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন—সাম্য, সৌহার্দ, মুক্তি। কিন্তু এই যে জ্যোতির্ধর মহামন্ত্র সাম্য-সৌহার্দ-মুক্তি, ইহার সাধনপদ্ধতি কি ঐ? অবোগ্য আত্মদ্বিপকে সবংশে নির্মূল করিয়া বোগ্য-ভমেরা নিকটকে রাজ্যভোগ করুক—এই কি উহার সাধনপদ্ধতি? করাসীস্ বিপ্লবের সময় ঐ মহামন্ত্রের সাধকেরা প্রকৃত সাধনপদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া বোগ্যভমের উত্থানকেই সার্বজনীন করিয়া তাহারই পশ্চাতে ধাবমান হইরাছিলেন, তাই তাঁহারা অকূল বিপত্তি-সাগরে হাবুডুবু খাইয়া সারা হইরাছিলেন। তাঁহারা যদি অবোগ্য আত্মদ্বিপের প্রতি বজ্রাঘাত না হইয়া তাঁহাদ্বিপকে বোগ্য করিয়া গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদ্বিপকে ওরূপ চূর্ণশাশ্বত হইতে হইত না ;—তাহা তো হইতই না, তা ছাড়া, তাহার একশতাব্দী পরে বোগ্যভম বিস্মৃতির নিকটে হীনতাবী গার করিতে হইত না।

অধুনাতন কালের নূতন বিবৃতিবাদের মোট মন্তব্য কথা যে কি, তাহা পূর্বে বলি-রাছি : তাহা এই যে, বিভিন্ন প্রেণীর বিভিন্ন জীব একই জীবাণুর (Protoplasm-এর) ভিন্নধা বিকাশ, আর, সেই বিকাশের মূলপ্রবর্তক Struggle for Existence, এক কথায় রজোত্তপ। কিন্তু সে বিকাশের

নিয়ামক যে কে—পৃথগ্ৰবর্ষক যে কে—সে বিষয়ে ডার্বিন্ একটি কথারও উচ্চবাচ্য করেন নাই। আমাদের দিক দিয়া আমরা দেখিতেছি যে, একদিকে যেমন রজোত্তপের চাবুক সেই বিকাশকে পথের মাঝে-মাঝে থেপাইয়া তুলিতেছে, আর-এক দিকে তেমনি সঙ্কটের রাশ তাহাকে ঠিকপথে বাগাইয়া-আনিয়া ধীরে-ধীরে মহাবাহুর উন্নত সোপানে পৌছাইয়া দিতেছে। আমাদের দেশের সাংখ্যশাস্ত্র ডাকইনের শাস্ত্রের জার একদিক-ঘাসা নহে। সাংখ্যশাস্ত্রের মোট মন্তব্য কথা এই যে, একদিকে মূলপ্রকৃতি হঠতে অহুলোমপথের মধ্য দিয়া মূলের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতেছে, আর-এক দিকে মূল হইতে প্রতিলোমপথের মধ্য দিয়া মূলের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতেছে; অথবা বাহা একই কথা—অহুলোমপথে তমোত্তপের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতেছে; প্রতিলোমপথে সঙ্কটের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতেছে; এবং উত্তর পথেই রজোত্তপ স্বকার্যে ব্যাপ্ত হইতেছে। সাংখ্যের মোট মন্তব্য কথাটি আরো সংক্ষেপে বলা বাইতে পারে—বদি-চ তাহা ভনিতে অনেকের নিকটে হৈয়ালির মতো ঠেকিবে। খুব সংক্ষেপে যদি বলিতে হয়, তবে তাহা এই :—সঙ্কটের ধর্ম হ'চ্ছে প্রকাশ; তমোত্তপের ধর্ম হ'চ্ছে অপ্রকাশ, রজোত্তপের ধর্ম হ'চ্ছে প্রকাশ হইতে অপ্রকাশ এবং অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ, এইরূপ ছটিকটানি। প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে নাবা হ'চ্ছে অহুলোমপদ্ধতি; অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে ওঠা হ'চ্ছে প্রতিলোম-পদ্ধতি।—কথাটি খুব গাঢ়ে বলিলাম;

হুতরাং উহার ভাষা এবং টীকা করা আব-
শ্যক ; পরন্তু এ ব্যাখ্যার তাহা আমা-কর্তৃক
সম্ভাবনীয় নহে, যেহেতু তাহা সমর-
সাপেক্ষ ।

ত্রিংশতবৎসরকে একত্বকণ ধরিয়া এ বাহা
বলিলাম, ইহাতে অন্তত এটা বেশ বুঝিতে
পারা যাইতেছে যে, ডার্বিনের শাস্ত্রের দীপা-
লোক অপেক্ষা আমাদের দেশীয়শাস্ত্রের
দৃগ্যালোক প্রকৃতির নিগূঢ়রহস্যের গভীর
মর্মগানের তলা পর্যন্ত অনেকদূর যায় ।
আমাদের দেশীয়শাস্ত্রের মতে শুধুকেবল
জীবজগৎ নহে, পরন্তু সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং
তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তু নানাধিক-
পরিমাণে স্ব-সত্তা-সমর্থনের কল্প চেষ্টাপরায়ণ ;
কেন না, সকল বস্তুতেই অপর ভুট্ট গুণের
সঙ্গে রজোগুণ নানাধিকপরিমাণে সংশ্লিষ্ট
রহিয়াছে । আধুনিক বিবর্তিবাদ এবং
পুরাতন সাংখ্যের মধ্যে যদি-চ আকাশ-
পাতাল প্রভেদ, তথাপি প্রকৃতির ক্রমবিকাশ-
পরায়ণতা এবং রজোগুণের (অর্থাৎ
চঃপ এবং কর্মচেষ্টার) প্রবৃত্তিসীলতা,
এই দুইটি গোড়ার ব্যাপারের প্রধান ভা-
সবন্ধে উভয়ের মধ্যে কতকটা মিল
আছে বলিয়া মনে হয় ; এটা অন্তত বেশ
বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশের
পুরাতন আচার্য্যেরা যেখান হইতে যেরূপ
করিয়া প্রকৃতির ক্রমবিকাশের এবং রজো-
গুণের প্রবৃত্তিসীলতার সন্ধান হ্রাইয়াছিলেন,
আধুনিক বিবর্তিবাদীরা ঐ দুই বিষয়ের সন্ধান
সেইখান হইতেই তেমনি করিয়া পাইয়াছেন,
তা বই, উনবিংশতাব্দীর বিজ্ঞানবিদ্রির নিকট
হইতে খার করিয়া পান নাই । এ কথা

যদি সত্য হইত যে, নিউটন-ডার্বিন প্রভৃতি
মৌলিকশ্রেণীর আবিষ্কারী বিজ্ঞান বাণা-
রাত্তা দিয়া তাঁহাদের স্ব-ব গম্যস্থানে উপনীত
হইয়াছিলেন, তাহা হইলে একশকার বিজ্ঞা-
ন্যের অধ্যোভারী যে পথ অবলম্বন করিয়া
কেহ বা বি.-এ. হ'ন, কেহ বা বিজ্ঞাবাগীশ
হ'ন, কেহ বা বি.-এ.-বিজ্ঞাবাগীশ হ'ন, সেই
পথ অবলম্বন করিয়া বহুলকৈ কেহ বা নিউটন,
কেহ বা ডার্বিন, কেহ বা শেক্সপীয়ার হইতে
পারিতেন ; তাহা তাঁহারা না হইতেছেন
কেন ? কে তাঁহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে ?
দূরে হাত বাড়াইবার প্রয়োজন নাই,
আমাদের দেশের সুখোজ্জলকারী শ্রীযুক্ত
জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে আমি সাক্ষী
মান্ত করিতেছি । তিনি কি তাঁহার অপূর্ব
নূতন সিদ্ধান্তটি উনবিংশতাব্দীর বিজ্ঞান
নিকট ভিক্ষা করিয়া পাইয়াছেন ? কখনই
না । এটা অবশ্য সত্য যে, উনবিংশতাব্দীর
বস্তুতন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁহার অন্তরের
নিগূঢ়কথাটির বাধাৰ্থ্য পণ্ডিতগণকে যেমন
করিয়া চক্ষু অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয়, তাহা
দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ তিনি তাহা ব্রীতিমত
verify করিয়াছেন । দুই শতাব্দী পূর্বে
লাপ্লাসের নাস্তিক সিদ্ধান্ত, (Nebular
Theory) আকাশের অপরিমিত জ্যোতি-
র্জগৎকে যোগসূত্রে গাঁথিয়া এক করিয়াছে ;
আমাদের চক্ষুর সামনে ডার্বিনের বৈকারিক
সিদ্ধান্ত (Theory of Evolution) পৃথিবীর
জীবজগৎকে যোগসূত্রে গাঁথিয়া এক করি-
য়াছে ; গাঁথিতে কেবল বাকি লাপ্লাসের
নাস্তিক সিদ্ধান্ত এবং ডার্বিনের বৈকারিক
সিদ্ধান্ত উভয়কে ঐকতানিক যোগসূত্রে

আমাদের প্রাচীনতম বহুসংখ্যক কি সেই
স্বয়ং কার্যের অত ভারতীয়তার প্রিয় ভারত-
ভূমিতে করুণাময় বিধাতা-কর্তৃক প্রেরিত হইরা-
ছেন? এক সময়ে ভারতীয়তা আমাদের
দেশের পূর্ব পূর্ব আচার্য্য এবং মহাপুরুষগণকে
কোঁড়ে করিয়া বাহুব করিয়াছিলেন কত-না
বহু? ভারতের ক্রন্দনধ্বনিতে সেই সকল
পুরাতন কথা কি তাঁহার অরণে আগিয়া
উঠিয়াছে? এতদিনের পর কি তাঁহার আসন
টলিয়াছে—তাই তিনি এত দেশ থাকিতে
পূর্বের এক কোণে কপালটী বিতরণ করি-
লেন? এ প্রশ্ন আমি এত পূর্নাচুে সভার
সাম্মুখ্যে বাঁচাইতে সাহসী নহি। বাক্য

কাজ নাই—আমার অল্প বাহা সবেমাত্র
বেধা দিয়াছে, তাহা ইংরেজের কালোর-
ভাগের বাঁচিয়া-বর্জিত থাকিয়া দিয়ালোকে
সম্মুখান করুক—তাহা হইলেই বাঁচি।

এতক্ষণ ধরিয়া এ বাহা বলিলাম, তাহাতে
অর্জুননারথি যেমন বিরাটপুত্র উত্তর-
রথীকে সাহায্যপ্রদান করিয়াছিলেন, জান
তেমনি কিরণে বিভাকে গুণভাবে সাহায্য-
প্রদান করে, তাহার কতকটা সন্ধান পাওয়া
বাইতে পারে। এক্ষণে জান তাহার নিজাধি-
কারে কিরণ প্রণালীতে পুরুষার্থসাধনে
প্রবৃত্ত হয়, তাহা অগ্রহাবন করিয়া দেখা
যাক।

আগামী বারে সমাপ্য।

ছাতিক্ষপীড়িত ভারতে ।

গল্পগুণ ।

হৈমরাবতের কোন-এক উপনগর বেধানে
শেব হইয়াছে—সেই বাকের দুখে একটা
পুরাতন প্রাচীরের গায়ে এই কথাগুলি
উৎকর্ণ রহিয়াছে :—“গল্পগুণ পথ”।
ভগ্নাংশের পথ, নিতৃত্যতার পথ;—একপ
লিখিলেও ক্ষতি ছিল না।

মোড়ানের হুলকি-চালে পথে খুব ধলা
উড়িয়াছে। এই বিগন পথের ধারে ধারে
অথবাসে দেখা যায় কতকগুলি ক্ষুদ্র “পোড়ো”
মসজিদ, আর কতকগুলি সর-সর ক্ষুদ্র ধ্বজ-
মণ্ডির—বাহা একটু ভয়প্রদায়ক হইলেও

অতীত শোভন ও স্তব্ধাবিশিষ্ট। তাহার পর
আর কিছুই নাই;—কেবল পাত্তবর্ণ
তাপদগ্ধ বিতীর্ণ নয়নান, আর কতকগুলি
পাষাণভূপ ছোট-ছোট পাহাড়ের আকারে,
চিমির আকারে, “শিলাবিভোর” আকারে,
ইতস্তত বিকীর্ণ এবং বেধিতে একপ অদৃত
বে, উহাদিগকে এই পৃথিবীর কোন পদার্থ
বলিয়া মনেই হয় না।

গাড়িতে এককণ্টার পথ অভিক্রম
করিয়া, একটা জনপুত্র আতল-তল হ্রদের
ধারে আসিয়া পড়িয়া। ইহারই

পশ্চাত্তানে প্রাচীরবন্ধ একটা বৃহৎ বৃত্ত-
নগরের দিগন্তব্যাপী উপছায়া। অত্রতা
বরদানভূমির ভার ইহাও ভীষণ ধুলবর্ণ।
ইহাই সেই গন্ধতা, বাহা তিন শতাব্দী
ধরিয়া এশিয়ার একটা পরমাত্ম্য্য ঐতিহ্য-
পদার্থ বলিয়া প্রখ্যাত ছিল।

কে না জানে, ভগ্নাবশেষের অবহাতেই—
নগরপ্রাঙ্গণাদি বাহুবের সমস্ত কীৰ্ত্তিমন্দির-
গুলিই আসল অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া
মনে হয়। কিন্তু এই যে বৃত্তনগরের
উপছায়াটি দেখা বাইতেছে, ইহা বাস্তবিকই
একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। ইহার দত্তর
প্রথম-প্রাকারটি অনূন ৩০ ফুট উচ্চ।
বৃহৎ, অগ্নিনিষ্কপের ক্ষত বক্রময় স্থান,
প্রস্তরময় আবৃত প্রহরিস্থান—সমস্তই উহাতে
বিভ্রম্যন; এবং উহা আঁকিয়া-বাঁকিয়া
চলিতে-চলিতে ক্ষুদ্র বক্রভূমিতে গিয়া শেষ
হইয়াছে। এমনই ত প্রাকারটি ভীষণধ্বংস—
তাহার উপর আবার একটা বিরটিকার প্রকাণ্ড
হর্গনগর সমুদ্ভূত;—আসলে পর্বত, কিন্তু
মাহুৎ ইহাকে এইরূপ কালে লাগাইয়াছে।
ইহা সেই শ্রেণীর পর্বত—সেই পাবণতৃণ,
বাহা অত্রতা ভূতাপের একটা বিন্দুরজনক
অপূর্ণ বিশেষত্ব। পূর্বতন রাজাদিগের ও
মনসাধারণের চিত্তে বিরট পদার্থের
বৃত্ত—অলৌকিক পদার্থের ক্ষত যে
একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা এই
ক্ষেত্রে পূর্বজাত পরিকৃষ্ট হইয়াছে।
প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শিলারাশির মধ্যে অসংখ্য
প্রাচীর পরস্পরকে ঘেঁষিয়া করিয়া আছে—
পরস্পরের উপর চাপিয়া আছে;—উহাদের
দত্তর দেখাবাদী পরস্পরের সহিত জড়াইয়া

গিয়াছে। যে সকল গণ্ডশৈল হঃসাহসীর ভার
অতিমাত্র হুঁকিয়া আছে, তাহাদের ঠিক
ধারেই বৃকজসকল সমুখে প্রসারিত;—নীচে
অতলস্পর্শ খাত। উচ্চতার বিভিন্ন ধাপে,—
কত মসজিদ, কত অটল-মন্দির খিলান,
কত প্রকাণ্ড পোস্তার গাঁথুনি। ধেরালের
ঝোঁকেই হউক, কিংবা কোন উপধর্মের
ধাতিরেই হউক,—সর্বোচ্চ শিখরের উপর
একটা গণ্ডশৈল এরূপভাবে স্থাপিত যে, মনে
হয় যেন একটা গোলাকার পণ্ড হুঁকার
উপরে আসনপিন্দি হইয়া বসিয়া আছে।

এই বৃত্তনগরের প্রবেশপথে ধাতু ও
পাথরের গোলাগুলি তৃপাকারে সম্মিত
এবং পুরাকালীন সমস্ত বৃহৎ-আয়োজন প্রস্তুত
রহিয়াছে;— ইহাদেরি পাশাপাশি “পুনরাবৃত্তি-
কারী” আধুনিক বন্দুকসকল পুঞ্জীভূত।
নিজামের সিপাহীশাস্ত্রীরা পাহারা দিতেছে।
প্রবেশপথে উহাদিগকে প্রবেশাছুমতিপত্র
দেখাইতে হয়। এই সমস্ত ভগ্নাবশেষের
মধ্যে ইচ্ছা করিলেই প্রবেশ করা যায় না;—
এখনও উহা হুস্তবেস্ত হর্গরূপে বিভ্রম্যন।
শোনা যায়, নিজাম তাঁহার গুপ্তনিধি
এইখানেই লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

এই গন্ধতার দারগুলি অতীত ভীষণ;—
বহুলোকের সমবেত চেষ্টা তির উহা উদঘাটিত
হয় না। প্রাকারভিত্তির গভীরদেশে ঘরের
ডাঁড়ওয়াল জোড়া-কপাটগুলি দেয়ালের
গারে সংলগ্ন, ধাতুপাত্র সম্বিত এবং লম্বা-লম্বা
ছোরার মত তীক্ষ্ণধার লৌহকটকে
সমাকীর্ণ। পূর্বকালে হতিগণ আশ্রয়িনো-
দনার্থ নগরের মধ্যে দলে-দলে প্রবেশপূর্বক
নগরের দ্বারা অনেক কাঠের কাজ নষ্ট

করিয়া বিস্তর কতি করিত। উহাদিগকে অপসারিত করিবার জন্যই যারের কপাটগুলি এইরূপ ভীষণ বর্ণে আবৃত। আমার কৃত্র বানবাহন যখন এই নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল (যদিও কোচম্যানের মাথার জন্ডির পাগুড়ি ছিল এবং সহিস একটা লম্বা চামর লইয়া ঘোড়ার গায়ে হইতে মাছি তাকাইতেছিল), তখনই আমাদের যুরোপীয় কৃত্রতা ও দীনদীনতা সহসা প্রকাশ হইয়া পড়িল!...

এই-সব স্থলকার প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই বে রাস্তার আসিয়া পড়িলাম, সেই রাস্তাটিতেই বা-কিছু লোকের বসতি। কতকগুলি নিঃস্ব লোক প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে বাসা করিয়া আছে এবং সেইখানে উহারা হুর্গরক্ষী সৈনিকদিগের ব্যবহারার্থ ছুইচারিখানি সামান্য দোকান খুলিয়াছে।

তা ছাড়া, এই বিশাল ঘেরের মধ্যে আর সমস্তই শূন্য ও নিস্তব্ধ। গড়গা এখন শুধু ভয়ঙ্কর একটা দর্শনক্ষেত্র,—বহানচ্যুত গওশৈলে সমাকীর্ণ। প্রকাণ্ডকার স্থল পত্তর পৃষ্ঠদেশের ভায় সেই সব পাঁচাপত্তূপ—বাহা বানবগুণ্ডিত পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর বাতপ্রতিরোধী—ইতস্তত উৎখিত হইয়াছে; সেই সব গোলাকার মন্থন গওশৈল,—বাহা সমস্ত দেশমর পরিব্যাপ্ত—পর্কতের ভায় ইতস্তত মাথা তুলিয়া আছে।*

এই হুর্গনগরের দ্বারগুলিও নিম্ন প্রাকারদ্বারের ভায় ভীষণদর্শন ও লোহকণ্টকে মাচ্ছাদিত। হুর্গাদি অতিক্রম করিয়া, গওশৈলসমূহ অতিক্রম করিয়া, কখন খোলা-পথে,—কখন বা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। সমস্তই এরূপ বিশাল যে, দেখিয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়। বে ভারতে প্রকাণ্ড পদার্থ দেখিয়া আর বিস্ময় উপস্থিত হয় না, সেই ভারতের পক্ষেও এ সমস্ত প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হয়। দস্তর প্রাকারাবলী, নৈসর্গিক গওশৈলসমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপির উৎখিত হইয়া সমস্ত স্থানটিকে হুর্গম-ছন্দ্রবেশ করিয়া তুলিয়াছে। অবরোধের সময়ে, জলরক্ষণের জন্য কতকগুলি গভীর-নিখাত চৌবাচ্চা রহিয়াছে। এই গভীর গহ্বরগুলি শৈলগজ্ঞ খনন করিয়া নির্মিত। তা ছাড়া, কতকগুলো কালো-কালো গর্ত রহিয়াছে—বাচা সুরক্ষপথের সুখ। এই সুরক্ষটি পর্কতের জন্ম ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যখন শত্রুর আক্রমণে হতাশ হইয়া পলায়ন ত্রির আর কোন উপায় থাকে না, তখন এই সুরক্ষটিই পলায়নের প্রকৃষ্ট পথ। শেষদিন পর্যন্ত বাহাতে তখনকার ব্যাঘাত না হয়, এইজন্য উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রত্যেক শিখরে একএকটি মসজিদ রহিয়াছে। বাহাতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অসংখ্য শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা বাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে কল্পনাটিকে বাস্তবৎ প্রত্যক্ষ

* নিজামরাজ্যের এই সব গওশৈলসমূহে একটা পৌরাণিকী কথা প্রচলিত আছে। পৃথিবীর সৃষ্টির শেষ হইয়া গেলে বিশ্ব যখন দেখিলেন, কতকগুলো অতিরিক্ত উপকরণ উৎখত হইয়াছে, তখন তিনি এই সমস্ত লইয়া, হাতে গোলা পাকাইল, সেই সব গোলকগুলি পৃথিবীর উপর—এই-এমন—ইতস্তত নিক্ষেপ করিলেন।

করিয়াই বেশ সমস্ত আরোজন পূর্ণ হইতে গচ্ছিত ।

আধুনিক কামানসৃষ্টির তিন শতাব্দী পূর্বে গন্ধকার প্রবলপরাক্রান্ত সুলতান-গণ এই দুর্গ হইতে কিরূপে দুরীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা কঠিন ।

যতই উচ্চে উঠা যায়, ততই মাথার উপর দুর্য্যের প্রথম উত্তাপ,—ততই যেন চতুর্দিকস্থ মরুদুস্তের বিবাদময় মণ্ডলপরিস্থিতি বিদ্যুত হইতে থাকে । শিখরস্থ ইমারৎগুলি উচ্চতা-অনুসারে একটিকে যেমন অধিকতর ভীমদর্শন, তেমনি আবার ভয়দশাপন্ন। উহার। এতটা ঝুঁকিয়া আছে যে, দেখিলে নাথা ঘুরিয়া যায় ;—মনে হয় যেন নীচে পড়িবার ভয় উদ্ভূত । কত ভাঙা খিলান ;—তাহাতে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ফাট ধরিয়াছে । কতকগুলি দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য অথবা নির্মাণকাল কিছুই নির্ণয় করা যায় না । ইসলামের পূর্ববর্তী কাল হইতে কতকগুলো দেবমূর্তি—ধানরসুওধারী কতকগুলো হুজুমান্,—বাহুদ্বিগের সহিত গুহাগহ্বরের মধ্যে একজ্ঞ বাস করিতেছে । ছোট-ছোট ধূপবর্তিকার ধূমগন্ধে স্থানটি আমোদিত । রহস্যময় ভক্তগণ এখনও বোধ হয় সময়ে-সময়ে এই ধূপবর্তিকাগুলি এখানে গোপনে লইয়া আইসে ।

সর্বোচ্চ-শিখরে, শেষ ছাদটির উপর একটি মসজিদ রহিয়াছে এবং একটি চক্ক (Kiosk) *—বেধান হইতে পূর্বতন সুলতানেরা সমস্ত বেশ পরিবীক্ষণ এবং দিগন্ত-

নিঃসৃত শত্রুবাহিনীর আগমন নিরীক্ষণ করিতেন । মাঠ-ময়দান উত্তান-উপদান প্রভৃতি যে সমস্ত দৃশ্য এখান হইতে দেখা যায়, সমস্তই তখনকার কালে প্রসিদ্ধ ছিল । কিন্তু আজ এই সমস্ত ক্ষেত্র নির্জীব ও আগ্নেয় ।

দেশের হাওয়া বদলাইয়াছে । আর এখন বৃষ্টি হয় না । বেশ মনে হয়, অগ্নিবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অবনতি হইতেছে—ভারত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে । এই সমস্ত গণ্ডশৈল ও প্রাকারাবলীর পর-পারে অবস্থিত দুর্গনগরটি, মহানিস্কৃত্যের মধ্যে,—ভূতল পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে । নগরের বহিঃপ্রাচীর,—নিজামের সংরক্ষিত, সেই দস্তুর প্রাচীরটি, প্রাচীন গন্ধকার—সেই পরমাশ্রযা হীরকখনি গন্ধকার গঠন-রেখাভঙ্গী অঙ্কিত করিবার জন্তই যেন আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসর্পিত হইয়াছে । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে লাভ কি ? বাহিরের বিস্তারিত মরুক্ষেত্রেরই অল্পরূপ এই যে মরুময় কটিবন্ধটি—ইহাকে বিশেষ করিয়া প্রাচীরে ঘিরিয়া রাখায় কি ফল ? এখানেও সেই একই ধূসর মরুভূমি—নেই একই মন্থণ গণ্ডশৈলপুঞ্জ—বাহা দেখিয়া মনে হয়, যেন ভয়রাশির উপর কতকগুলো বৃহৎকার পত্ন দলে-দলে বসিয়া আছে । সুদূর প্রান্তে হৈদরাবাদ দীর্ঘ শাদা-রেখার দ্বারা অস্পষ্ট দেখা বাইতেছে ; এবং ময়দান-ভূমির সীমান্তদেশে এই সব গণ্ডশৈল—ছিন্নাদ গর্জনের আকারে, বিচিজনভঙ্গী

* চক্ক—চতুর্ভুজবৃত্ত মণ্ডপ । বোধ হয় এই কাসি শব্দ (Kiosk) “চক্ক” শব্দেরই অপভ্রংশ । Kiosk = garden summer-house অর্থাৎ “হাওয়া-খানা” ।—অনুবাদক ।

চর্যের আকারে ইতস্তত পুঞ্জীকৃত হইয়া ধ্বংসনগরের বিজয়টিকে বেন আরো দীর্ঘীকৃত করিয়া অদূর অসীমে প্রসারিত হইয়াছে ।

কিন্তু এই মৃতনগরের প্রাচীর ছাড়াইরা অদূরে কতকগুলি বড়-বড় গম্বুজ রহিয়াছে, বাহা সুখালেপের দ্বারা সবস্বৈ ধবলীকৃত এবং বাহাতে তদ্ব্যবশেষের তাব কিছুমান নাই । ছোট-ছোট বনের মধ্যে হইতে এই গম্বুজগুলি সমুখিত । এই সব বনের উত্তীর্ণ একদল সরস ও তাজা বে, এই তাপদগু তকত্বমিতে কিরণে উৎপন্ন হইল, তাবিয়া বিস্তৃত হইতে হয় । এগুলি গম্বুজের প্রাচীন রাজাদিপের সমাধিমন্দির । মৃত ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভারতবাসীর যে বাতাবিক প্রজ্ঞাতক্তি, তাহারি প্রভাবে এই সকল সমাধিমন্দির অক্ষত রহিয়াছে । আবার সম্রাতি উহার চারিধারে সমাধি-উদ্যান স্থাপিত হইয়াছে ।

এই পরীরাণের অনেক সুলতান সুলতানাই এই সব গম্বুজতলে চিরনিজার হয় । কেবল উহাদের মধ্যে একজন এই মৌরব সন্ন্যাসিনের সহবাস হইতে বঞ্চিত ; ইনি গম্বুজের শেষ সুলতান । ইনি পূর্ক হইতেই বকৌর পারম্বিক নিবাস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন । কিন্তু বিজয়ী উরদজের তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া সেই সঙ্গে তাঁহার সমাধিমন্দির হইতেও তাঁহাকে বহিকৃত করিলেন । তিনি বিলাসিত হইয়া এবাসেই ইহলীলা সংবরণ করেন ।

এই চিরবিশ্রামের স্থানগুলি অতীব সুন্দর । আমাদের দেশের ভার এই প্রাচীন

সমাধিক্ষেত্রেও সেই "লাইগ্রেস"-কাউগাছ গুলি দেখিতে পাওয়া যায় ;—কেবল ভারতের প্রথম সুবোধ্যাপে একটু রানপ্রত হইয়াছে, এইমাত্র । ফ্রান্সের "সেকেনে" উদ্যানের ভার, অজ্ঞাত উদ্যানেও, সরস বাসির পথগুলি সোজা চলিয়াছে ; উহার ধারে-ধারে আলবালকুমিতে সারিসারি গোলাপগাছ । কতকগুলি রমণী ও কতকগুলি বালিকা এই কৃত্রিম বক-উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত । উহার প্রান্তঃসন্ধ্যা ছই বেলা মাটির কলসীতে কোন কৃপবিশেষের ফলত জল আনিয়া এই সব গাছের তলায় ঢালিয়া দেয় ; এবং এই সব অন্তলম্পর্শ গভীর কৃপ হইতে পুরুবেরা অতি কষ্টে উহাদের জল জল উত্তোলন করে ।

দূর হইতে মনে হয়, বেন এই সব সুখালিপ্ত গম্বুজগুলি জীবন-উত্তমে পূর্ণ । কিন্তু এই সব বিশাল মন্দিরের অভ্যন্তরে একটিও চিত্র নাই, একটিও অলঙ্কার নাই । পূর্বেকার সমস্ত বিলাসসামগ্রী একপে ধূসর অরাজকতার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে ।

তথাপি, এই সব শূন্যগর্ভ গম্বুজের নীচে, সমাধিস্থানের প্রত্যেক প্রস্তর-বেদিকার উপর, এখনও পুষ্পমালাদি দেখিতে পাওয়া যায় । তিনশত বৎসর হইতে যে রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই রাজবংশের রাজাদিপের প্রতি স্নান্য ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই পুষ্পমালাগুলি ।

তাপদগু বকত্বনির মধ্যে শুধু জলসেবের বলে এই যে উদ্যানগুলি সুরেক্ষিত—ইহাদের কি-একটা অপূর্ণ মোহিনী শক্তি আছে, ইহাচ দর দেখিলে, যখনো দ্বিভাব

হরন-একটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। এই সময় দেশে প্রচলিতরা বেরপ মূল হইতে
ব উভানে শাইপ্রেস-বাট প্রতিবেশী পুলাতরে উড়িয়া বসে, এখানে সেইরূপ
পালীবনের সহিত একত্র বাস করিতেছে; মনিয়া-চড়াই ফুলের উপর উড়িয়া-উড়িয়া
বং পোলাপ-আলবালের চারিধারে, আশা- বসিতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

উৎসব ।



সময়ে প্রতিদিন বাহা পাই, তাহা ভাল-
মনে কপিক-নিত্যে স্বার্থে-পরমার্থে মিশ্রিত-
বৃত্তি খণ্ডিত পদার্থ। তাহা আমাদের
মুখে আসে এবং বার, গড়িয়া উঠে এবং
ভাঙিয়া পড়ে, এক হইতে বার এবং আর
হইয়া উঠে। আমরা তাহার তাৎপর্য
বুঝিয়া উঠিতে পারি না—কখনো তাহাকে
মায়া বলিয়া খিকার দিই, কখনো তাহাকে
পরমপদার্থ বলিয়া বুকে চাপিয়া ধরি। বস্তুত
নানা বিষয়ে বিকিষ্ট হইয়া স্রোতের মুখে
ভাসিতে ভাসিতে কখনো স্থিরসত্তার দিকে
দৃষ্টি রাখা করা যায় না।

তাই বৎসরে একএকদিন বিষয়ব্যাপার
হইতে মনকে বাহিরে আনিয়া সমস্ত বিষয়ের
কেন্দ্রগত সত্তার প্রতি লক্ষ্যকে নিবদ্ধ
করিতে হয়। যে সত্তার মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার
বিলয়, যেখানে সমস্ত ভালমন্দের মূল তাৎ-
পর্য, যে সত্য “বুদ্ধ ইব তত্ত্বো দিব তিষ্ঠ-
ত্যেকঃ” অনেকের মধ্যে এক স্বরূপে বুদ্ধের
তার আকাশে উজ্জ্বল হইয়া আছেন, তাহাকেই
উপলব্ধি করিবার দিন উৎসবের দিন। সেই

পরমসত্যই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।
আজ তাহাকে এই আবর্তমান বিশ্বব্যাপারের
মাঝখানে একবার স্থির হইয়া দেখ। বাহিরে
এই সংখ্যাহীন অণুপরমাণুর অপ্রান্ত স্পন্দনের
মধ্যে দেখ, অন্তরীণ গ্রহনক্ষত্রের নিরন্তর
ঘূর্ণনের মাঝখানে দেখ, পক্ষ-মাস-ঋতু-
সংবৎসরের কলপুশ্পশস্ত্রপ্রবাহী গতগতির
মধ্যে দেখ, মানবের নিরন্তর পরিবর্তিত জন্মমৃত্যু-
সম্পদ্ব্যবপদ-উত্থানপতনের মধ্যে দেখ। এই
যে পৃথিবী জুড়িয়া মানবের ইতিহাস লিখিত
মহাসমুদ্রের জায় কোথাও বা রক্তে আবিগ,
কোথাও বা ক্রোধোত্তমে কেনিল, কোথাও
বা বিষশৈলে প্রতিহত, কোথাও বা অবাধ-
বেগে প্রবাহিত হইয়া লক্ষকোটি তরঙ্গে
ভাঙবনুতা করিতেছে, ইহার গভীরতম
মন্ত্রস্থানে অচলপ্রতিষ্ঠ গুরুতার বিরাজমান
যে সত্যপুরুষ সূর্য প্রায়সক্রে শান্ত সকলতার
দিকে, উদেল উন্নততাকে স্তম্ভং পরিণামের
দিকে অব্যর্থনিরম্বে নিরন্তর আকর্ষণ
করিতেছেন, তাহাকে আজ একবার দেখ।
তোমার নিত্যচকল অন্তঃকরণের মাঝখানে

আজ একবার গৃহত্যাগে অবগাহন কর—স্থ-
স্থ, আশা-নৈরাশ, উৎসাহ-অবসাদ কেবলি
উঠিতেছে-পড়িতেছে, প্রবৃত্তিসকল নানা
লক্ষ্যের দিকে নানা আকর্ষণে কখনো উত্তত,
কখনো নিবৃত্ত হইতেছে; কখনো বা কোথা
হইতে বাহুকোণে এক অভাবনীর বজা উঠিয়া
আকস্মিক উৎপাতে উদ্ভাস্ত করিয়া দিতেছে,
কখনো বা মৃত্যুর ভাষ এক আকস্মিক সৃষ্টি
সমস্ত চেতনাকে অভিভূত-আচ্ছন্ন করিয়া
কেনিতেছে—এই আমাদের চিন্তারাজ্যের
সমস্ত অচিন্তনীয়তার মধ্যে, ভাবরাজ্যের
সমস্ত অভাবনীয়তার মাঝখানে তাঁহাকে দেখ,
বাঁহাকে “মধ্যে বামনমাসীনঃ বিশেষদেবা উপা-
সন্তে”—মধ্যস্থলে সমাসীন যে মহান পুরুষকে
সমস্ত দেবগণ উপাসনা করিতেছেন।

জীবনের মধ্যে মধ্যে বিশেষ দিনের,
বিশেষ অবকাশের ইহাই প্রয়োজন। সেদিন
খণ্ডের দিক্ হইতে অখণ্ডে আসিবার
উৎসব। নিখের দিক্ হইতে বিখের দিকে
আসিবার উৎসব। যে মূলে বিচিঞ্জের ঐক্য,
যে সত্যে সকলের যোগ, যে এক আনন্দে
সমস্ত জ্যোতির্গণ নিখিলের সহিত আমাদের
অচ্ছিন্ন সম্মিলন, সেই মূলে, সেই সত্যে, সেই
আনন্দে চিন্তকে আবাসন করিবার উৎসব।

যে পরম সত্যের কথা বলিতেছি, যে
সত্যে ভূগলতা হইতে জ্যোতির্লোক আসিয়া
মিলিয়াছে, সেই সত্যকে আমরা বখন উৎ-
সবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করি,
তখন সেই উৎসবের মধ্যে মিলন চাই।
একবার উৎসব হইলে চলে না। বহুত
বিখের সকল জিনিষকেই আমরা বখন
বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে

আমরা দেখিতে পাই না—তখনই প্রত্যেক
খণ্ডপদার্থ, প্রত্যেক খণ্ডবটনা আমাদের
মনোযোগকে স্বতন্ত্ররূপে আঘাত করিতে
থাকে—তখনই প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন স্থের
মধ্যে আমরা বিক্লিষ্ট হইতে থাকি,
রাগিণীর সন্ধান পাই না—প্রত্যেক
বিচ্ছিন্ন শব্দ আমাদের গকে উদ্ভাস্ত করে,
অর্থের সমগ্রতা অন্তরালেই থাকে;—ইহাতে
পদে পদে আমাদের চোঁটা বাড়িয়া উঠে, কষ্ট
বাড়িয়া যায়, তাহাতে আমাদের আনন্দ
থাকে না। এইজন্য আমাদের প্রতিদিনের
স্বার্থের মধ্যে, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই,
পরিতৃপ্তি নাই, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাই
না, তাহার রাসিণী হারাটরা ফেলি—তাহার
চরমসত্য আমাদের অগোচরে থাকে।
কিন্তু যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত
করিয়া দেখি, সেই ক্ষণেই সেই মিলনেই
আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং এট
অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। তখন
আমরা দেখিতে পাই—

নিখিলে তব কি মহোৎসব! বন্দন করে বিশ্ব

ঈসম্পদভূষাঙ্গ নির্ভর পরে।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম, উৎসব একবার
নহে। মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ—
সেই মিলনের মধ্যেই সত্যকে অনুভব করা
উৎসবের সম্পূর্ণতা। একবার মধ্যে যাহা
খানিযোগে বুঝিবার চেষ্টা করি, নিখিলের
মধ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ করিলে তবেই অমা-
দের উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়।

মিলনের মধ্যে যে সত্য, তাহা কেবল
বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ,
তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা

সমগ্র; কারণ, তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। যিনি নানাহান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, বাঁহার সম্মুখে, বাঁহার দক্ষিণ-করতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখামুখি করিয়া বলিয়া আছি, তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা। মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।

মিলনের যে শক্তি, প্রেমের যে প্রবল সত্যতা, তাহার পরিচয় আমরা পৃথিবীতে পদে পদে পাইয়াছি। পৃথিবীতে ভরকে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম। বার্ষিকপত্রকে আমরা জগতের একটা ব্রহ্মাণ্ড সত্য বলিয়া জানিয়াছি, সেই বার্ষিকপত্রের স্তম্ভ ভালকে অনায়াসে ছিন্নবিছিন্ন করিয়া দেয় প্রেম। যে হস্তভাগা দেশবাসীরা পরস্পরের স্তম্ভে স্তম্ভে সম্পদ-বিপদে এক হইয়া মিলিতে পারে না, তাহারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রী হইতে ভ্রষ্ট হয়—তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, স্তম্ভাং লাভ করিতে জানে না তাহারা প্রাণ দিতে পারে না, স্তম্ভাং তাহাদের জীবন-ধারণ করা বিড়ম্বনা। তাহারা পৃথিবীতে নিরস্তই ভয়ে লীত হইয়া, অপমানে লাহিত হইয়া দীনপ্রাণে মতনিরে ভ্রমণ করে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে পাইতেছে না, প্রেমকে পাইতেছে না, এইজন্যই কোনোমতেই বল পাইতেছে না। আমরা সত্যকে যে

পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার ভিত্ত সেই পরিমাণে মূল্য দিতে পারি—আমরা তাইকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি, তাইয়ের ভিত্ত ততখানি ত্যাগ করিতে পারি। আত্মাদিগকে যে জলস্থল বেষ্টিত করিয়া আছে, আমরা যে সকল লোকের মাঝখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যথেষ্টপরিমাণে যদি তাহাদের সত্যতা অনুভব করিতে না পারি, তবে তাহাদের ভিত্ত আত্মোৎসর্গ করিতে পারিব না।

তাই বলিতেছি, সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন বুদ্ধির বিধা হইতে, মৃত্যুপীড়া হইতে, বার্ধক্যের বন্ধন ও ক্ষতির আশঙ্কা হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি। তখন এই অস্তির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির আদর্শ খুঁজিয়া পায়, বাহার উপর সে আপনায় সর্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়।

প্রাত্যহিক উদ্ভাস্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এই স্থিতির স্মৃতি, এই প্রেমের স্বাদ পাইবার জগৎই মানুষ উৎসবক্ষেত্রে সকল মানুষকে একত্রে আহ্বান করে। সেদিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত হইয়া উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের, ভিত্ত ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে সম্মানদান করে, সেদিন পণ্ডিত মূর্খকে আসনদান করে। কারণ আত্মপর, ধনিদরিদ্র, পণ্ডিতমূর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, ইহাই পরম সত্য—এই সত্যেরই প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসবদিনের অব্যয়িত মিলন এই উপলব্ধিরই

অবসর। যে ব্যক্তি এই উপলক্ষি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল, সে ব্যক্তি উন্মুক্ত উৎসবসম্পদের মাঝখানে আসিয়াও বীনভাবে বিচ্ছিন্ন হইতে কিরিয়া চলিয়া গেল।

সত্যঃ জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্ম—ব্রহ্ম সত্য-বরূপ, জ্ঞানবরূপ, অনন্তবরূপ। কিন্তু এই জ্ঞানবরূপ অনন্তসত্য কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? “আনন্দরূপমমৃতং বদ-বিভাতি”—তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; বাহ্য-কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অব্যক্তরূপ অর্থাৎ তাঁহার প্রেম। বিশ্বব্রহ্মও তাঁহার অব্যক্তময় আনন্দ, তাঁহার প্রেম।

সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ—সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম—আনন্দ। আমরা ত লৌকিক ব্যাপারেই দেখিয়াছি—অপূর্ণ সত্য অপরিপূর্ণ। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, যে সত্য আমাদের তত সম্পূর্ণরূপে উপলক্ষি করিব, তাহাতেই আমাদের তত আনন্দ, তত প্রেম। উদাহরণের নিকট একটা তৃণে কোনো আনন্দ নাই, তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু উদ্ভিদবৈজ্ঞানিক নিকট তৃণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে, কারণ তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক, উদ্ভিদপৰ্য্যায়ের মধ্যে তৃণের সত্য যে ক্ষুদ্র নহে, তাহা সে জানে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দ্বারা তৃণকে দেখিতে পারে—তৃণের মধ্যে তাহার আনন্দ আছে, পরিপূর্ণ—তাহার নিকট নিখিলের প্রকাশ এই তৃণের প্রকাশের মধ্যে প্রতি-বিম্বিত। তৃণের সত্য তাহার নিকট ক্ষুদ্র

সত্য অক্ষুট সত্য নয় বলিয়াই সে তাহার আনন্দ, তাহার প্রেম উদ্বোধিত করে। যে মানুষের প্রকাশ আমার নিকট ক্ষুদ্র, আমার নিকট অক্ষুট, তাহাতে আমার প্রেম অসম্পূর্ণ। যে মানুষকে আমি এতখানি সত্য বলিয়া জানি যে, তাহার জ্ঞান প্রাণ দিতে পারি, তাহাতে আমার আনন্দ, আমার প্রেম। অন্তের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থ আমার কাছে এত অধিক সত্য যে, অন্তের স্বার্থ সাধনে আমার প্রেম নাই—কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকট ভাবমাজেরই প্রকাশ এত সুপরিপূর্ণ যে, তাহাদের মঙ্গলচিন্তার তিনি রাজ্য-ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আনন্দাঙ্কো ব খদিযানি ত্তানি জায়ন্তে—এই যে বাহ্য কিছুর হইয়াছে, ইহা সমস্তই আনন্দ—হইতেই জাত। অতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই জগৎ আমাদের নিকট সেই আনন্দরূপে, প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্ণসত্যরূপেই ব্যক্ত হইল না। জগতে আমাদের আনন্দ, জগতে আমাদের প্রেমই সত্যের প্রকাশরূপের উপলক্ষি। জগৎ আছে—এটুকু সত্য কিছুই নহে, কিন্তু জগৎ আনন্দ—এই সত্যই পূর্ণ।

আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে? প্রাচুর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, সৌন্দর্য্যে। জগৎ-প্রকাশে ক্রোধও দারিদ্র্য নাই, কপণতা নাই, যেটুকুমাত্র প্রয়োজন তাহারই মধ্যে সমস্ত অবসান নাই। এই যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইতে আলোকের বর্ণনা আকাশময় করিয়া পড়িতেছে, যেখানে আসিয়া ঠেকি-

তেছে, সেখানে বর্ণে-তাপে-প্রাণে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য্য। প্রয়োজন বস্তুটুকু, ইহা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—ইহা অজস্র। বসন্তকালে লতাগুল্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কুঁড়ি ধরিয়া, ফুল ফুটিয়া, পাতা গজাইয়া একেবারে যে মাতামাতি আরম্ভ হয়, আশ্রয়ার্থী, মুকুল ভরিয়া-উঠিয়া তাহার তলদেশে অনর্থক রাশিরাশি ঝরিয়া পড়ে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য্য। সূর্য্যোদয়ে-সূর্য্যাস্তে মেঘের মুখে যে কত পরিবর্তমান বিচিত্র রঙের পাগলামি প্রকাশ হইতে থাকে, ইহার কোনো প্রয়োজন দেখি না—ইহা আনন্দের প্রাচুর্য্য। প্রভাতে পাখীদের শত শত কর্ণ হইতে উদ্ভাসিত সুরের উজ্জ্বল অরুণগগনে যেন চারিদিক হইতে গানের হোরিখেলা চলিতে থাকে, ইহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, ইহা আনন্দেরই প্রাচুর্য্য। আনন্দ উদার, আনন্দ অকুপণ,—সৌন্দর্য্যে-সম্পদে আনন্দ আপনাকে নিঃশেষে বিলাইতে গিয়া আপনার আর অন্ত পায় না।

উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোনো প্রয়োজন নাই—সকল প্রয়োজনের অধিক বাহা, উৎসব তাহাই লইয়া। এইজন্য উৎসবের একটা প্রধান লক্ষণ প্রাচুর্য্য। এইজন্য উৎসবদিনে, আমরা প্রতিদিনের কার্পণ্য পরিহার করি—প্রতিদিন যেরূপ প্রয়োজন হিসাব করিয়া চলি, আজ তাহা অকাতরে জলাঞ্জলি দিতে হয়। বৈজ্ঞানিক দিন অনেক আছে, আজ ঐশ্বর্য্যের দিন।

আজ সৌন্দর্য্যের দিন। সৌন্দর্য্যও প্রয়োজনের বাড়া। ইহা আবৃত্তকের নহে, ইহা আনন্দের বিকাশ—ইহা প্রেমের ভাব। ফুল যদি সুন্দর না হইত, তবু সে আমার জ্ঞানগম্য হইত, ইন্দ্রিয়গম্য হইত—কিন্তু ফুল যে আমাকে সৌন্দর্য্য দেয়, সেটা অতিরিক্ত দান। এই বাহ্যাদানই আমার নিকট হইতে বাহ্য্যপ্রতিদান গ্রহণ করে—সেই যে বাহ্য্যপ্রতিদান, তাহাই প্রেম। এই বাহ্য্যপ্রতিদানটুকু লইয়া ফুলেরই বা কি, আর কাহারই বা কি। কিন্তু একদিকে এই বাহ্য্য সৌন্দর্য্য, আর একদিকে এই বাহ্য্য প্রেম, ইহা লইয়াই জগতের নিত্যোৎসব—ইহাই আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গলীলা।

তাই উৎসবের দিন সৌন্দর্য্যের দিন। এই দিনকে আমরা ফুলপাতার, ঘাস সাজাই, দীপমালার দ্বারা উজ্জল করি, সঙ্গীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি।

এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্য্যের দ্বারা, সৌন্দর্য্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিরূপ করিয়া তুলি। যিনি আনন্দের প্রাচুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য বিশ্বজগতের মধ্যে অসুভ-রূপে প্রকাশমান—আনন্দরূপময়তঃ বহির্ভাতি—উৎসবের দিনে তাহারই উপলক্ষ-দ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মহাব্যব আপন ক্ষণিক অবস্থাগত সমস্ত দৈন্ত দূর করিবে এবং অন্তরাস্তর-চিরন্তন ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য প্রেমের আনন্দে অমৃতত্ব ও বিকাশ করিতে থাকিবে। এইদিনে সে অমৃতত্ব করিবে, সে ক্ষুদ্র নহে, সে বিচ্ছিন্ন নহে, বিশ্বই তাহার নিকতন, সত্যই তাহার আশ্রয়, প্রেম

তাহার চরমগতি, সকলেই তাহার আপন—
কমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার
পক্ষে সহজ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই ।

কিন্তু বলা বাহুল্য, উৎসবের এই আয়ো-
জন তেমন সুসাধ্য নহে, ইহার উপলব্ধি যেমন
দুঃসহ । উৎসব অপরূপসুন্দর শতদলপদ্মের
জ্ঞার বধন বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমা-
দের মধ্যে কতজন আছেন যাহারা মধুকরের
মত ইহার “সুগন্ধ মধুকোবের মধ্যে নিমগ্ন
হইয়া ইহার সুধারস উপভোগ করিতে
পারেন ? এদিনেও সন্নিগনকে আমরা কেবল
জনতা করিয়া কেলি, আয়োজনকে কেবল
আড়ম্বর করিয়া তুলি। এদিনেও তুচ্ছ কৌতূহলে
আমাদের চিত্ত কেবল বাহিরেই বিকশিত
হইয়া বেড়ায় । যে আনন্দ অন্তরিকে অন্ত-
হীন জ্যোতিষ্কলোকের শিখার শিখায় নিরন্তর
আলোকিত, আমাদের গৃহপ্রান্তে দীপমালা
জালাইয়া আমরা কি সেই আনন্দের তরঙ্গে
আমাদের আনন্দকে সচেতনভাবে মিলিত
করিয়াছি ? আমাদের এই সঙ্গীতধ্বনি কি
আমাদিগকে অগতের সেই গভীরতম অন্তঃ-
পুরে প্রবাহিত করিয়া লইয়া বাইতেছে—বে-
খানে বিশ্বজীবনের সমস্ত সুর তাহার আপাত-
প্রতীকমান সমস্ত বিরোধ-বিশৃঙ্খলতা মিলাইয়া
দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে
উদ্বেষিত হইয়া উঠিতেছে ?

হায় ! প্রত্যেক দিনে যে দরিদ্র, এক-
দিনে সে ঐশ্বর্য্যলাভ করিবে কি করিয়া ?
প্রত্যেক দিনে বাহার জীবন শোভা হইতে
নির্মল, সিন্ধু, হঠাৎ একদিনেই সে স্তম্ভের
সহিত একাসনে বসিবে কেমন করিয়া ?
দিনে দিনে যে ব্যক্তি সত্য-প্রেম প্রভৃত

হইয়াছে, এই উৎসবের দিনে তাহারই উৎসব।
হে বিশ্বজ্ঞপ্রাপ্তের উৎসবদেবতা ! আমি
কে ? আজ উৎসবদিনে এই আসন গ্রহণ
করিবার অধিকার আমার কি আছে ? জীবনের
নৌকাকে আমি যে প্রতিদিন দাঁড় টানিয়া
বাহিয়া চলিয়াছি, সে কি তোমার মহোৎ-
সবের সোনা-বাধানের ঘাটে আসিয়া আজো
পৌঁছিয়াছে ? তাহার বাধা কি একটি ?
তাহার লক্ষ্য কি ঠিক থাকে ? প্রতিকূল
তরঙ্গের আঘাত সে কি সামলাইতে পারিল ?
দিনের পর দিন কোথায় সে ঘুরিয়া বেড়াই-
তেছে ? আজ কোথা হইতে সহসা তোমার
উৎসবে সকলকে আহ্বানের ভার লইয়া, হে
অন্তর্ধামিন্, আমার অন্তরাত্মা তোমার সমক্ষে
লজ্জিত হইতেছে । তাহাকে ক্ষমা করিয়া
ভূমিই তাহাকে আহ্বান কর । একদিন নহে,
প্রত্যহ তাহাকে আহ্বান কর । কিরাও,
—কিরাও,—তাহাকে আত্মাভিমান হইতে
কিরাও ! হর্ষল প্রবৃত্তির নিদারুণ অপমান
হইতে তাহাকে রক্ষা কর ! বুদ্ধির জটিলতার
মধ্যে আর তাহাকে নিফল হইতে দিও
না । তাহাকে প্রতিদিন তোমার বিশ্ব-
লোকে, তোমার আনন্দলোকে, তোমার
সৌন্দর্য্যলোকে আকর্ষণ করিয়া তাহার চির-
জীবনের সমস্ত দৈন্ত চূর্ণ করিয়া কেল । যে
মহাপুরুষগণ তোমার নিত্যোৎসবের নিম-
ন্ত্রণে আহূত, যাহারা প্রতিদিনই নিখিল-
লোকের সহিত তোমার আনন্দভোজে আসন-
গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাকে বিনম্র-নত-
শিরে তাহাদের পদধূলি মাথার তুলিয়া
লইতে দাও । তাহার মিথ্যা গর্ব্ব, তাহার
বার্ষ চেষ্টা, তাহার বিকশিত প্রবৃত্তি আজই

তুমি অপসারিত করিয়া দাও—কাল হইতেই
সে যেন নত হইয়া তোমার আসনের সর্ব-
নিরহানে ধূলিতলে বসিবার অধিকারী হইতে
পারে। তোমার উৎসবসভার মহাসঙ্গীত
সেখানে কখন পাতিয়া শুনা যাইবে, তোমার
আনন্দ-উৎসবের রসস্রোত সেখানকার ধূলিকে ও
অভিষিক্ত করিবে। কিন্তু যেখানে অহ-
কার, যেখানে তর্ক, যেখানে বিরোধ, যেখানে
খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্ত প্রতিযোগিতা,
যেখানে মঙ্গলকর্ম ও লোকে লুকাভাবে গর্ষিত-
ভাবে করে, যেখানে পুণ্যকর্ম অভ্যস্ত
আচারমাঝে পর্য্যবসিত—সেখানে সমস্ত
আচ্ছন্ন, সমস্ত রুদ্ধ, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎরূপে
প্রতিভাত হয়, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সেখানে
তোমার বিশ্বজ্যোৎসবের আহ্বান উপহসিত
হইয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে তোমার
স্বর্গ্য আলোক দেয়, কিন্তু তোমার বহুত-

লিখিত আলোকলিপি লইয়া প্রবেশ করিতে
পারে না, সেখানে তোমার উদার বায়ু
নিখাস জোগায় মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে
বিশ্বপ্রাণকে সমীক্ষিত করিতে পারে না।
সেই উদ্ধত কারাগারের পাবাণপ্রাসাদ
হইতে তাহাকে উদ্ধার কর—তোমার উৎসব-
প্রাঙ্গণের ধূলায় তাহাকে লুটাইতে দাও।
অগতে কেহই তাহাকে না চিনুক, কেহই না
মাহুক, সে যেন এক প্রান্তে থাকিয়া তোমাকে
চিনে, তোমাকে মানিয়া চলে। এই সৌভাগ্য
কবে তাহার ঘটিবে তাহা জানি না, কবে
তুমি তাহাকে তোমার উৎসবের অধিকারী
করিবে তাহা তুমিই জান—আপাতত তাহার
এই নিবেদন যে, এই প্রার্থনাটিও তাহার
অন্তরে যেন বথার্থ সত্য হইয়া উঠে—সত্যকে
সে যেন সত্যই চায়, অমৃতকে সে যেন মৌখিক
যাক্ষাভ্যাক্ষের দ্বারা অপমান না করে।

একটি কুন্দের প্রতি ।

অগ্নি কুন্দ ! আজিকে এ হিমালয়ের শুভ্র সন্ধ্যাক্ষণে
একমাত্র তব মূর্তি হেরি রূম গৃহের প্রাঙ্গণে
ভাবিতেছি বসি' বসি'— সমস্ত সুগন্ধিপুষ্পহীন
শীতবাত্তে একাকী ফুটেছ কেন ? কোন্ চিন্তালীন .
হ'রে আছ হরিংপল্লববক্ষে খুলিয়া তোমার
সপ্তদলে অবরুদ্ধ স্মৃতি হৃদয় সুকুমার ?
বসন্ত-বসন্ত-হারি যামিনীর শশিমুখ হ'তে
ধীরে পড়ে অশ্রুজ্যোৎস্না অন্তরীক সিন্ধু সে আলোতে
তারি এক বিন্দু বুঝি সুকঠিন মর্ত্যের পরশে
বিচূর্ণ হইয়া আজি কুন্দসম স্মৃতি বিকশে ?

লব্ধ নীলাকাশবক্ষে দীপ্ত তন্ত্র তারকার প্রায়
অশ্রুতবারের মূর্তি ধ'রেছ কি কুল হেথায় ?

কিধা তুমি হে শোভনে ! কান্তহীনা বাহিনীর প্রমণ
তরে তরে কুটি' আছ—পাছে কোথা পাও অপমান ?
এ জগতে নাথহারি তাহার আশ্রয় নাহি হার ! .
মধুর বেদনাটুকু তাই ও কি প্রকাশিতে চায় !
রিক্ত ভূষা বিধবার মুহু কুল-স্মরতি পরাণ
অমৃতবে পাই আজি ; ভরি' উঠে মোর হৃদয়ান ।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।

দুঃখমূর্তি ।

দুঃখের বেশে এসেছ বলে'
তোমাতে নাহি ডরিব হে !
যেখানে ব্যথা তোমাতে সেথা
নিবিড় করে' ধরিব হে !
আঁখারে মুখ ঢাকিলে, আমি,
তোমাতে তবু চিনিব আমি
মরণরূপে আসিলে, প্রভু,
চরণ ধরি' মরিব হে—
যেমন করে' দাঁও না দেখা
তোমাতে নাহি ডরিব হে ।

নরনে আজি ঝরিছে জল
ঝরক্ জল নরনে হে ।
বাজিছে বুক বাজুক্, তব
কঠিন বাহুবান্ধনে' হে ।
তুমি যে আছ বক্ষে ধরে'
বেদনা তাহা জানাক্ মোরে

চাষ না কিছু, কব না কথা,

চাহিয়া রব বদনে হে ।

,নয়নে আজি করিছে জল

বরুক্ জল নয়নে হে ।

তুলার চাষ

কাপাসসম্বন্ধে কয়েকটি স্থূলকথা ।

(১) কাপাস উচ্চপ্রধান দেশেরই কসল ।
মার্কিন, ভারতবর্ষ ও মিশরেরই পৃথিবীর
মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক তুলা উৎপন্ন হয় ।

(২) কাপাসের অল্প ডাঙা বা উচ্চ অমীর
প্রয়োজন । জমিতে জল বাধিলে কাপাস
হয় না ।

(৩) অল্পাঙ্গ কসলের যেমন একএকটি
ক্ষেত একসঙ্গে পাকে, কাপাস সেমুপ নহে ।
কাপাসের একই পাছে একই সময়ে ফলও
ফাটিতে থাকে, ফুলও ফুটিতে থাকে ।
ফল ফাটিলে ভিত্তর হইতে তুলা বাহির
হইয়া কুলিয়া পড়ে । যেমন ক্রমশ ফল
কাটে, তেমনি ক্রমশ তুলা সংগ্রহ করিতে
হয় ।

(৪) একএকটি কাপাসের ক্ষেতের
তুলা ৩৪৮বারে সংগ্রহ করিতে হয় । ইহাতে
প্রায় ১০০মাস-২০০মাস লাগে ।

(৫) তুলার পাছকেও কাপাস বলে,
আর বীজসম্বন্ধে তুলাকেও বাজারে কাপাস
বলে ।

(৬) কাপাসের দিক হইতে পাঁচ-আনা

ভাগ তুলা । বাকী এখার-আনা কিংবা বার-
আনা বীজ ।

(৭) কাপাসের বীজ পেষণ করিলে
উত্তম তৈল পাওয়া যায় । ঐ তৈলদ্বারা
রন্ধন চলিতে পারে এবং সাবাং, গ্লিসিরীন্,
কৃত্রিম মাখম প্রভৃতি প্রস্তুত, হয় ।
সাধারণত উহা অলিভ তৈলের পরিবর্তে
ব্যবহৃত হয় ।

(৮) একমণ কাপাসের বীজ হইতে
নিম্নলিখিত সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

খোসা	—	১১
তৈল	—	১৬
শৈল	—	১৩

(৯) কাপাসের খৈল গরুর, অতি উত্তম
খাদ্য । ইহা আবার জমীর উৎকৃষ্ট সার ।
রেঞ্চার খৈলের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ।

(১০) আমাদের দেশে কাপাসবীজ
হইতে তৈল বাহির করিবার কলকারখানা
নাই । কিন্তু কিছুদিন পূর্বে ভারতগবর্ণমেন্ট
অনুসন্ধান করিতেছিলেন যে, মার্কিনী
কলকারখানা এদেশীয় বীজপেষণের উপযুক্ত
কি না এবং এদেশীয় কাপাসের বীজ

তৈলের পরিমাণই বা কি? এই হই প্রঃঃঃই
অনুকূল উত্তর পাওয়া গিয়াছিল।

(১১) কাপাসের বীজ হইতে তৈল
বাহির না করিয়া শুধু বীজগুলি ভাঙিয়া
বা ভিজাইয়াও গরুকে খাওয়াইতে পারা
যায়। বোম্বাই-অঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশে
কৃষকেরা এইরূপেই উহার ব্যবহার করে।
টেকীতে মোটামুটি কুটিয়া লইয়াও উহা
জ্বীতে সারস্রুপে ব্যবহৃত হইতে পারে।
প্রায় সকলপ্রকার ফলমূলফলের জন্যই
উহা উপকারী। আমেরিকার কাপাসের
ক্ষেত্রেই সারের জন্য কাপাসের বীজ এবং
কাপাসের খৈল ব্যবহৃত হয়। আধ, আলু,
কশী প্রভৃতির জন্য একরে ১৫/০ ব্যবহার
করা যাইতে পারে। ধান, গম প্রভৃতির
জন্য ৫৭/০ কিংবা ৭/০ বখেট। কাপাস-
বীজের দ্বারা মগকরা ১/০ হইতে ১/০ মাত্র।
এক একর ৮-হাতী বিচার প্রায় তিনবিধ।

(১২) কাপাসবীজের খোসাই অর্ধেক।
এই খোসা অতি অপকারী সামগ্রী। সুতরাং
একমণ খৈলে যে কাজ হয়, খোসাসমেত
বীজ এক মণে সে-পরিমাণ উপকার হয়
না। সার-হিসাবে ১/০ খৈল ও ২৪/০ মণ
বীজ প্রায় সমান ফলপ্রসূ।

(১৩) কাপাসের তুলার সূত্রগুলি
(fibre) দীর্ঘ, স্থল, শক্ত অথচ কোমল,
এবং চিকণ হওয়া আবশ্যিক। ভাল তুলা
২ইঞ্চি লম্বা হয়। বাহার সূত্র ৫ ইঞ্চিরও কম,
তাহা মিলে ব্যৱহার হয় না। ছোট এবং লম্বা,
শক্ত এবং চর্খাল, কোমল এবং কঁকর প্রভৃতি
বিষয়গুলি বিশিষ্ট তুলা একত্রে মিশাল করা
উচিত নহে।

(১৪) একএকগাহি সূত্র একএকটি
cell। অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে, একএকটি
সূত্রকে একএকটি সেপটা নলের মত দেখায়।
যে তুলা বত উৎকৃষ্ট, তাহার নলে তত অধিক
পাক (twist) লক্ষিত হয়।

(১৫) ভারতের তুলার প্রধান দোষ—
ইহার সূত্র ছোট ও মোটা। বাজারে যে
তুলা প্রেরিত হয়, তাহাতে অত্যন্ত অধিক
আবর্জনা থাকে। এই আবর্জনার মধ্যে
কাঁচা, মাটি, কাপাসের বীজ ও কাপাসের
পাতাই প্রধান।

(১৬) মিশরে তুলা হয় নীলনদের বদীপে
(Delta)। মার্কিনে তুলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের
দক্ষিণ-অঞ্চলে—উহার মধ্যে টেকসাস-
প্রদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক কাপাসের চাষ।

(১৭) মিশর ও মার্কিনে চৈত্রবৈশাখমাসে
তুলার বীজ বপন করে এবং ভাদ্রমাসে
ফুল হইতে আরম্ভ হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণে
ফল পাকিয়া কাটিতে থাকে ও তুলাসংগ্রহ
হয়। তাহার পরে গাছও নীতে মরিয়া যায় ও
মরা গাছগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। মিশরে
বুট্টিই নাই বলিলে হয়—নীলনদের
খাল হইতে স্ট্রাম্প্প দ্বারা জল উঠাইয়া
কাপাসের ক্ষেতে জল দিতে হয়। নদীতে
ভাদ্রমাসে বজ্র আসে। বজ্র আসিলে
আর জল পুষ্প করিতে হয় না—বাঁধ
কাটিলেই ক্ষেতে জল আসে। মার্কিনে
জল দিতে ক্রঃ না, বুট্টির উপর কাপাসের
নির্ভর। বৈশাখ হইতে ভাদ্র-মাঘের
পর্যন্ত মাসে গড়ে ৫ইঞ্চি বৃষ্টি হয়।

(১৮) অতিবৃষ্টি কাপাসের পক্ষে
অনিষ্টকর, বিশেষ বপনের পরেই বৃষ্টি বেশী

হটলে বীজ পচিয়া যায়, এবং কমোতে ঘাস বাধিলে মিড়াইবার সুবিধা হয় না। উহাতে ছোট ছোট গাছগুলি আর বাড়ি না। আবার তুলা ফুটিবার সময়ে বৃষ্টি একেবারে না হওয়ারই দরকার। বৃষ্টি হটলে তুলা নাকী হয় ও বাজারে দাম কম হয়।

(১৯) এখন বঙ্গদেশে তুলা নাট বসিলে চলে, কিন্তু পূর্বে অধিকাংশ স্থানেই তুলা চতুর্ক। সকল স্থানের তুলা মাল ছিল না—কিন্তু ঢাকার ফেনীকাপাস পুণ্ডিতে অধিকার ছিল। উহাও বিস্তৃত বিবরণ পূর্বে প্রদত্ত হইল।

(২০) বঙ্গদেশে যে কাপাস চতুর্ক, তাহাতেই সম্ভবত বাঙালীর বঙ্গের অভাব পূর্ণ হইত। কিন্তু যখন টংবোজ, ফরাসী, লেন্সাক প্রভৃতি বিদেশীর সদাগরবোরা বঙ্গদেশ চতুর্ক বঙ্গ ইউরোপে চালান দিতে লাগিলেন, তখন বঙ্গ বাঙালীর কাপাসে কল্যাণ নষ্ট হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই ব্যবসায় বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিল। তখন যে-পরিমাণ তুলাও প্রয়োজন হইত, তাহাও জ-আনা-মার বঙ্গদেশজাত, আর বাকী ছোট আনা মোগাই, মাল্জী ও কানপুরী তুলা। ঐ সময়ে এক ঢাকা চতুর্ক বৎসর ২৫ লক্ষ টাকার মূল্য ইউরোপে প্রেরিত হইত।

ভিন্নভিন্নজাতীয় কাপাস।

নিম্নলিখিত তালিকায় ভিন্নভিন্নদেশীয় কাপাসের গুণ এবং পরিমাণ হিসাবে যথাক্রমে স্থান নিরূপিত হইল :

গুণানুসারে।

পরিমাণানুসারে।

(১) সি আইলাণ্ড

(১) মার্কিনী

(২) মিশরী

(২) ভারতীয়

(৩) ব্রাজিল এবং

(৩) মিশরী

পেক দেশীয়

(৪) মার্কিনী

(৪) ব্রাজিল এবং

পেক দেশীয়

(৫) ভারতীয়

(৫) সি আইলাণ্ড

সি-আইলাণ্ড কাপাসই পুণ্ডিতে সর্ব-শ্রেষ্ঠ এবং ভারতীয় কাপাসই সর্বনিম্ন। মার্কিনের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ-কেরোলোনা-প্রদেশের সরিষিত কয়েকটি দ্বীপ আছে, তাহাদের নাম “সি আইলাণ্ড”। তাহাদেরই নামানুসারে সেখানকার কাপাস “সি-আইলাণ্ড”-কাপাস নামে ব্যবসাবাজারে পরিচিত হইয়াছে। এখন আটলান্টিকের উপকূলবর্তী মার্কিনের কয়েকটি প্রদেশেও উহা চাষ হইতেছে। কিন্তু উহার আদিম উৎপত্তিস্থান ওঠে ইণ্ডিস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বার্বাডোস্ উদ্ভিদবিদ পণ্ডিত-দের নিকট উহা বার্বাডোস্-কাপাস (*Gossypium Barbadosense*) নামেই পরিচিত। এই তুলার রং ঈষৎ হরিদ্রাভ বা “সিথে” সমুদ্র হইতে দূরে এই তুলা হয় না।

গুণানুসারে মার্কিনী কাপাস ৪র্থস্থানীয়, কিন্তু পরিমাণানুসারে ইহা প্রথমস্থানীয়। মার্কিনের “সি-আইলাণ্ড”-কাপাস উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু ব্যবসাজগতে মার্কিনী কাপাস বসিলে সি আইলাণ্ড বুঝায় না—অলিয়ান্স, টেক্সাস ও আপলাণ্ড কাপাস বুঝায়। উদ্ভিদবিদ পণ্ডিতেরা উহাদের *Gossypium Hirsutum* বলেন। আমেরিকার উচ্চ প্রদেশেই ইহাদের জন্মভূমি। উপরি-উক্ত তিন প্রকারের মধ্যে অলিয়ান্সজাতীয় কাপাসই শ্রেষ্ঠ। মিসিসিপি ও লুসিয়ানা

এদেশে ইহার প্রধান আবাদ। ইহার তুলা পরিষ্কার বেতবর্ণ।

ভারতীয় কাপাসকে পণ্ডিতেরা ওষধি-জাতীয় (*Gossypium Herbaceum*) বলেন অর্থাৎ প্রতিবৎসরই উহা ফুলফল প্রসব করিয়া বরিয়া যায়। এখন সি আইলাও ও মার্কিনী কাপাসও ওষধিজাতীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু মূলে ইহারা উভয়েই গাছকাপাস (*perennial*) ছিল।

নিম্নে প্রধান প্রধান ভারতীয় কাপাস ও তাহাদের উৎপত্তিস্থান প্রদত্ত হইল :—

হিন্দনঘাট (মধ্যপ্রদেশ)

উমরা (বোম্বাই, বেরার, হারদ্রাবাদ)

চুলেরা (বোম্বাই)

ব্রোচ (ঐ)

ধড়ওয়ার্ড (ঐ)

কুমটা (ঐ)

বেঙ্গল (পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম,

অযোধ্যা, রাজপুতানা,

মধ্য-ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ।

আসাম (আসাম)

—জ্যোতি-আবাড়ে ইহাদের বীজবপন করিতে হয়।

পন্ডিচেরি (মাদ্রাজ, হারদ্রাবাদ)

কোকনদ (মাদ্রাজ)

ভিন্নিতেলী (ঐ)

কেইবাটুর বা সালেম (ঐ)

—আধুনিকায়িকমাসে ইহাদের বীজ-বপন করিতে হয়।

ভারতীয় কাপাসের ভিতর মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্দি, নিম্নরাজ্যের হিন্দনঘাট কাপাসই সর্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দনঘাটের নীচেই গুজরাট-

অঞ্চলের ব্রোচদেশী কাপাস। আরও নানা-জাতীয় কাপাস আছে, কিন্তু বেঙ্গল সর্ব-নিকৃষ্ট। বেঙ্গল বলিতে শুধু বাঙলার কাপাস বুঝায় না—পঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানেরও কাপাস বুঝায়। বেঙ্গলের অতি সামান্যপরিমাণই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশজাত।

ব্রাজীলও পেরুর কাপাস—গাছকাপাস (*G. Peruvianum*)। এই গাছ কয়েক-বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু ২য় ও ৩য় বৎসরেই সমাপেক্ষা অধিক তুলা প্রদান করে—তাহার পরে ফলন কমিয়া যায়। এই শ্রেণীর কাপাসের মধ্যে পার্ণাম উত্তম। ব্রাজীলের অন্তর্ভুক্ত পার্ণামবৃকো বন্যরের নাম হইতে উহার নাম হইয়াছে।

ভারতবর্ষে, সিংহলে, আরবদেশে, মিশরে এবং চীনদেশেও একপ্রকার গাছ-(*G. Arboreum*)-কাপাস আছে, যাহার ফুল লাল। এতদ্ভিন্ন অন্যপ্রকার গাছকাপাসও আমাদের দেশে আছে। ব্রাজীলীয় পার্ণাম-কাপাসের গাছও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

মিশরে গালিনী বলিয়া একপ্রকার কাপাস আছে, তাহা সি আইলাওের বীজ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু আসল সি আইলাও অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তবে ইহার ফলন প্রচুর। মিশরী কাপাস বলিলে এখন প্রধানত এই কাপাসই বুঝায়। আর একপ্রকার কাপাসের নাম মিশরী “ব্রাউন্” বা গিটাকিকী। ইহার তুলা কমলা বা পিঙ্গলবর্ণ। মিশরেই ইহার আদিমনিবাস। এতদ্ভাষীত দুই-প্রকার মিশরী ধ্বংসকাপাস আছে, তাহার একটি মূলে মার্কিনী কাপাসের বীজ হইতে

উৎপন্ন (G. Hirsutum), আর দ্বিতীয়টি ব্রাজিলদেশীয় কাপাসের বীজ হইতে উৎপন্ন (G. Peruvianum) । ইহারা উভয়েই মূল মার্কিনী ও ব্রাজিল কাপাস হইতে উৎকৃষ্ট হইয়া পাড়াইয়াছে ।

ভারতীয় ও মার্কিনী কাপাসের বীজের গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবৎসূক্ষ্মবর্ণ লোম দৃষ্ট হয় । ইহাকে বীজের মথমল বলে । সি আইলাণ্ড ও ব্রাজিলীয় কাপাসের বীজের উপর মথমল নাই । ঐ বীজ “নেড়া” । ব্রাজিলীয় কাপাসের বীজের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহার বীজগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র না হইয়া ফলের মধ্যস্থ সমস্ত বীজ একসঙ্গে গায়ে গায়ে লাগান (clustered) ।

ভারতীয় কাপাসের ফলের মধ্যে গাঢ় লাল । মার্কিনী কাপাসের ফলের মধ্যে পরিষ্কার খেতবর্ণ । সি আইলাণ্ডের ফলের মধ্যে জীবৎ লাল ।

ভারতীয় কাপাসের পাতা মাহুকের হাতের ত্রায় অঙ্গুলিবিধিষ্ট । মার্কিনী ও সি আইলাণ্ড কাপাসের পাতা সাধারণতঃ অঙ্গুলিবিধিষ্ট ।

ভারতীয় কাপাসকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । ১ম শ্রেণীর গাছ ক্ষেতে ৫৬মাসকাল থাকে (জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত) । দ্বিতীয় শ্রেণীর কাপাস ক্ষেতে ১০।১১মাসকাল থাকে (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় হইতে চৈত্র-বৈশাখ পর্য্যন্ত) । প্রথমশ্রেণী কাপাসের পাতার আঙুলগুলি সরু সরু, তুলা অতি শুষ্কবর্ণ ও ফলও বেশী, কিন্তু তুলার সূক্ষ্মগুলি ছোট ছোট ও মোটা । দ্বিতীয়শ্রেণীর কাপাস ঠিক বিপরীত—

ইহার পাতার অঙ্গুলিগুলি মোটা মোটা, তুলা জীবৎ পিঙ্গলবর্ণ, ফলন কম, কিন্তু তুলা ভাল । হিঙ্গনবাট ১মশ্রেণীর অন্তর্গত ও ব্রোচ ২য়শ্রেণীর অন্তর্গত । কিন্তু যোটের উপরে ২য়শ্রেণীর কাপাসই ভাল । বেহারে সারণ প্রভৃতি জেলার একপ্রকার কাপাস আছে, দ্বিতীয়শ্রেণীর ত্রায় তাহা ১০।১১মাস ক্ষেতে থাকে, পাতার আঙুলগুলিও মোটা মোটা, কিন্তু তুলা অতি নিকট । বাণিজ্য-জগতে ইহা নিতান্তই নগণ্য ।

কোন স্থানে একপ্রকার কাপাস হয় বা হইত বলিয়া যে অন্তপ্রকার কাপাসও হইবে, তাহার কোন কথা নাই । অবস্থান্তরে ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্নভিন্নকালের কাপাসের অঙ্গুল হইতে পারে, অথবা একেবারেই কাপাসের উপযোগী না হইতে পারে ।

ভারতে মার্কিনী-তুলা-চাষের চেষ্টা ।

এখন বঙ্গদেশে তুলা বড় হয় না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে তুলার অভাব নাই । তবে এই তুলা ভাল নহে । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় হইতে ভারতবর্ষে মার্কিনী তুলার চাষের বিস্তার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও বিশেষ ফল হয় নাই । এই সমুদায় চেষ্টার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার দক্ষিণ-অঞ্চল হইতে দশজন লোক আনিয়া হয়, তাহারা করেক বৎসর ধরিয়া অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া অবশেষে এদেশ মার্কিনী তুলার চাষের অঙ্গুল নহে বলিয়া স্থির করেন । তাহাদের রিপোর্টে প্রকাশ যে, এদেশীয় কৃষকেরা তাহাদের চেষ্টার প্রতিফলিত করিয়াছিল । একথার অর্থ বোঝা কঠিন ।

শোনা যায়, তাঁহাদের মধ্যে একজন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বলেন যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই ভারতের কৃষককে মার্কিনী তুলার চাষের গুচুত্ব শিখান নাই। কিন্তু ভারতের রাজকোষ হইতে অর্থগ্রহণ করিতে তাঁহাদের লজ্জা করে নাই। ইচ্ছাপূর্বক না শিখানর কথাটা সম্ভবত মিথ্যা বাহাদুরী মাত্র, তাঁহারা কিছু করিতে পারেন নাই, এই কথাই সত্য। .

• ১৮৬৭-৬৮ সালে আবার মার্কিনী কাপাস স্থাপন করিবার চেষ্টা হয় এবং বেরারে একজন কার্পাস-কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনিও অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ষান্তে জমা একেবারে শুষ্ক হইয়া যাওয়াতেই ভারতবর্ষে অন্তত ঐ সকল প্রদেশে মার্কিনী তুলা হইবে না। এই সিদ্ধান্ত বোধ হয় বঙ্গদেশস্বত্বকে প্রযোজ্য নহে।

এই সকল চেষ্টার একমাত্র ফল বোম্বাই-প্রদেশের অন্তর্গত কর্ণাটের ধড়ওয়াড়ী তুলা। ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রায় আশাচর্য হইতে ভাঙ্গ পড়িয়া বর্ষাকাল, কিন্তু মাস্তাজের বর্ষাকাল কাঠিক হইতে পৌষ পর্যন্ত। কর্ণাট-অঞ্চলে এই দুই বর্ষার সন্ধিস্থান। ইহাই সেখানে মার্কিনী তুলার চাষের অমুকুল কারণ বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। সচরাচর ভারতে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-মাসে কাপাসের বীজবপন করা হয়। কিন্তু ধড়ওয়াড়ে যে মার্কিনী কাপাসের আবাদ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার বীজবপন ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন পর্যন্ত চলে। তখনও কিছু কিছু বৃষ্টি থাকে, তার

পরেই কাঠিকমাস হইতে আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া পৌষ পর্যন্ত চলে। মাত্রাজে সচরাচর আশ্বিনেই কাপাসের বীজ বপন করে, কিন্তু বোম্বাইর অভ্যন্তরস্থানে কিংবা মধ্যপ্রদেশে তাহা চলে না। কারণ, বর্ষান্তে জমী খত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়।

গত ২৩৮২২২র ধরিয়া বঙ্গ ও বেহারে মার্কিনী, মিশরী, সি আইলন্ড, ব্রোচ, হিঙ্গনঘাট, ধড়ওয়াড়ী প্রভৃতি তুলার চাষের চেষ্টা গবর্ণমেন্ট হইতেই চলিতেছে, কিন্তু এই কয়েক বৎসরেই অতিবৃষ্টির জন্য মোটের উপরে ফল ভাল হয় নাই।

সফলতার অন্তরায়।

কেহ যেন মনে না করেন যে, মার্কিনী কাপাসে অনেক বৃষ্টির প্রয়োজন। যুক্ত-রাজ্যের দক্ষিণাংশে, যেখানে তুলার চাষ হইয়া থাকে, সেখানে বৈশাখে (এপ্রেল) বীজবপন করে, আশ্বিন-কাঠিকে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) তুলাসংগ্রহ করে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র এই পাঁচমাসে গড়ে একটি করিয়া বৃষ্টি হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ৩.৪৫ ইঞ্চি করিয়া জল হইলেই ভাল, ক্ষেত নিড়াইবার সুবিধা হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ ভাদ্রে ৬.৭৫ ইঞ্চি জল হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিছু কম হইলেই ভাল। ঠিক এই অবস্থাটি ভারতের অল্পস্থানেই দেখা যায়। আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্যন্ত আমাদের দেশে সাধারণত বৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে প্রথম দুই মাসে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত প্রবল। অনেক স্থানে মাসে ১০.৯৫ ইঞ্চি। এইটাই আমাদের সর্বপ্রধান অন্তরায়। বর্ডমানজেলার পশ্চিম হইতেই জ্যৈষ্ঠের পূর্বে বৃষ্টি আর

নাই বলিলেই চলে। ঐ সকল স্থানে দ্রোণ আঘাটের পূর্বে শুধু কাপাস কেন, কোন বীজই বপন করা বড় সম্ভব নহে। অবশ্য উত্তর ও পূর্ববঙ্গে এবং নদীয়া, ২৪পরগণা প্রভৃতি স্থানে চৈত্র বৈশাখেই বৃষ্টি হয়, কিন্তু এই সকল স্থানে, বিশেষ পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টি এত বেশী যে, তাহা কাপাসের অমুকুল বলিয়া মনে হয় না।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি, মাঝে মাঝে রোজ হওয়া ভাল—মুঘলধারে বৃষ্টি অপকারী। কাপাসের ফুল ফুটিবার সময়ে, বিশেষ ফল ফাটিবার সময়েও বৃষ্টিতে সমূহ ক্ষতি হয়। সে সময়ে বৃষ্টি একেবারে না হওয়াই ভাল। ভারতের যে যে প্রদেশে বৎসরে বৃষ্টি ৩০ ৪০ ইঞ্চির বেশী নয়, সেই সেই প্রদেশেই কাপাসের চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের বৃষ্টি অত্যন্ত প্রবল। রঙ্গপুর, মৈমনসিং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে বৎসরে ৮০ হইতে ১০০ ইঞ্চি বা ততোধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। এত বৃষ্টি তুলার চাষের অমুকুল বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশে তুলার চাষ সর্বাধিক। এক খান্দেশেই ১১ লক্ষ ১০০০০০০ এর কাপাস। এখানে বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ ২২ ইঞ্চি মাত্র। বাঙলার মধ্যে সাধারণতঃ তুলার চাষ বেশী, কিন্তু মোটে ১০০০০০০ এর কাপাস। সারগের বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ ৪১ ইঞ্চি। ইহা অপেক্ষা কম বৃষ্টি বাঙলার কোথাও নাই। বোম্বাই প্রদেশেরই কনকান-অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টি ৯০ ইঞ্চি হইতে ১২০ ইঞ্চি। এখানে একেবারেই কাপাস হয় না।

চট্টগ্রামের পার্শ্বতীর অঞ্চলে ও গারো-পাহাড়ের অন্তর্গত বেশী বৃষ্টি অঞ্চল সেখানে যথেষ্ট তুলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই তুলা ক্ষতি নিকৃষ্ট—পশমের সঙ্গে মিশাল করিবার জন্য তাহা জম্মাণীতে চালান যায়। পার্শ্ব-তীর প্রদেশে বেশী বৃষ্টি হইলেও জম্মীতে ভাল বাধে না। ঐ অঞ্চলে কাপাস জন্মিবার সম্ভবত সেও একটি কারণ।

তুলার চাষ পূর্বে ত বঙ্গদেশে ছিল, উঠিয়া গেল কেন? বিদেশী প্রতিযোগিতাকে ইহার কারণ বলিতে পারা যায় না,—যখন ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত প্রদেশে এখনও তুলার চাষ চলিতেছে। বরং বলিতে পারা যায় যে, বঙ্গদেশেরই অন্তর্গত ফসলের প্রতিযোগিতাবশতই তুলার চাষ উঠিয়া গিয়াছে। যদি পাট বা তামাক দিয়া বেশী লাভ হয়, লোকে কাপাস করিবে কেন?

“বেঙ্গল” কাপাসের ফলন একর প্রতি ১/ মণ এবং দাম পৃথিবীর মধ্যে সকল তুলার অপেক্ষা কম। কিন্তু গুজরাটী ব্রোচ, যাহা ভারতের মধ্যে প্রায় সর্বোৎকৃষ্ট তুলা, তাহাই দেখা বাউক। ব্রোচতুলার একর প্রতি ফলন গড়ে ১১০ মণ—দাম ২১/ কিংবা ২৬/। জম্মীর খাজনা ৬/ সমেত ফসলটি প্রস্তুত করিবার খরচ ২০২২ টাকা—রায়ত্তের প্রায় কিছুই থাকে না। ইহার সঙ্গে বাঙলার রায়ত্তের পাটের তুলনা করুন। গড়ে একরে ১৫/ পাট হয়—দাম ন্যূনকমে ৭৫/। খরচ খরচা ৪০/ টাকা বাদ দিলেও ২৫/ থাকে। তাহাকে কাপাসের চাষ করিতে পরামর্শ দেওয়া বোধ হয় ঠিক হইবে না। তবে পাটের চাষে লোক চাই বেশী ও

খরচ অনেক। এই কারণে এখন যে জমীতে পাট দেওয়া যাইতেছে না, সেখানে পরীক্ষা-স্বরূপে কাপাস দিয়া দেখা যাইতে পারে।

যদি মার্কিনী, মিশর বা সি আইলাও কাপাসে আমরা কৃতকার্য হইতে পারি, তবেই বাঙলার কৃষক কাপাসের চাষ গ্রহণ করিবে, নতুবা নহে। উহাদের দামও বেশী, ফলনও বেশী। মিশরী কাপাসের দাম আমাদের বেঙ্গলকাপাসের তিনগুণ ও ফলন অন্তত ৫৬গুণ। মার্কিনী কাপাসের দাম আমাদের বেঙ্গলকাপাসের দেড় ও ফলন অন্তত দ্বিগুণ। মার্কিনে তুলা উৎপন্ন হয় গড়ে একরে ২০ মণ। কিন্তু উপযুক্ত সারপ্রয়োগ দ্বারা অনেক সময়ে ৬/০ কিংবা ৭/০ তুলাও উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশের লোকে সে সকল সারের নাম পর্যন্ত শুনে নাই। এ কাজটি দরিদ্র ও মূর্খ কৃষকদের উপরে নির্ভর করিলে চলিবে না। গবর্নমেন্টকে এবং দেশের ভ্রাতৃলোককে ইহা গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যদেদী আন্দোলনকে অন্তরের সহিত নমস্কার করি, কিন্তু কতকগুলি চাষাকে ধরিয়া তাড়াতাড়ি ধানিকটা জমীতে, যে-কোন-প্রকারে চৌক, কাপাসের বীজ বপন করাইলেই যদেদী আন্দোলনের সফলতা হইবে না এবং মাফেঠারের গর্বও ধর্য হইবে না।

বঙ্গদেশে আপাতত কোনকোনজাতীয়

কাপাসের চাষ করা উচিত ?

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, তারতবর্ষে বিদেশী কাপাসের চাষ করিয়া আজ পর্যন্ত

ভাল ফল হয় নাই। ইহার মধ্যে এক বাতিক্রমস্থল বোম্বাইয়ের খড়ওয়াড় কাপাস। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর সময়ে মার্কিনী কাপাস এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল, খড়ওয়ার তাহার একমাত্র সাক্ষী। সম্রাতি বঙ্গদেশে আবার যে ভাল কাপাস প্রবর্তন করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা এ পর্যন্ত একেবারেই সফল হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহারই মধ্যে খড়ওয়াড় অপরাপর-জাতীয় কাপাস অপেক্ষা সূক্ষল গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু আর একটি কাপাস আছে, তাহার প্রতি আজ পর্যন্তও কেহ বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই। ইহা মানভূম-সিংভূমের বড়িয়া কাপাস। ইহাও সম্ভবত খড়ওয়াড়ের তার মার্কিনী-বীজমূলক এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংর চেষ্টার প্রমাণ। ইহার গাছগুলি ২০হাত উচ্চ, ফলগুলি বড় বড়, তুলা উৎকৃষ্ট, কিন্তু এই কাপাসের চাষ এত সামান্য যে, বাণিজ্যভগতে উহার নামই নাই। সিংভূমে বৈশাখ হইতে কাঠিক বৃষ্টির পরিমাণ গড়ে ৫৫ইঞ্চি। এই কাপাসটি উত্তর বা পূর্ববঙ্গে হইবে কি না, তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ, কিন্তু জলপাইগুড়ি বা বরিশালে কাপাস উৎপাদন করিতে না পারিলে চলিবে না—এমনও কিছু কথা নাই। এই কাপাসটি যখন মানভূম-সিংভূমে প্রতিষ্ঠিত, তখন ছোট-নাগপুরের অন্তান্ত জেলাতে এবং বেহারের দক্ষিণাংশ, সীওতাঙ্গলপরগণা প্রভৃতি স্থানে যে স্বন্দররূপ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এই অঞ্চলে বিস্তর জমী পতিত রহিয়াছে এবং সেখানে জমীতে সার দিয়া ভালরূপে

এই কাপাসের চাষ করিলে বিলকণ লাভের সম্ভাবনা । এই কাপাসের গাছ রাখিলে কয়েকবৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু ফল ক্রমে ছোট হইয়া যায় ও তুলাও ক্রমে নিকট হইয়া পড়ে। প্রতি বৎসর জমী চষিয়া নূতন করিয়া বীজবপনই শ্রেয়।

সিংদুদ-অকলে আর একটি কাপাস আছে, তাহার নাম বড়েরা। এই বড়েরা, আর উপরিলিখিত বড়িয়া সম্পূর্ণ বসন্তজাতি। বড়িয়ার বীজবপন হয় জ্যৈষ্ঠে ও তুলাসংগ্রহ হয় পৌষমাঘে। বড়েরার বীজ আশ্বিনমাসে বপন করা হয় ও তাহার তুলাসংগ্রহ হয় বৈশাখে। বড়েরা অতি নিকট কাপাস।

দরভাঙার অন্তর্গত দলসিংসরাইএর নিকটে বনিয়ারপুর ও কল্যাণপুরে Shaw Wallace Co গাছকাপাসের চাষ করিতেছেন। তাঁহাদের এই কাপাসের নাম ID-3/8। ইহার বীজ তাঁহাদের নিকটে পাওয়া যায়, দাম ৮ সের। ১ এক সেরে ছয় একর জমী বপন করা চলে। ১০ ফীট দূরে দূরে লাইন করিতে হয় ও লাইনে ১০ ফীট দূরে অন্তরে গাছ রাখিতে হয়। ইহাতে একরে প্রায় ৪০৫ গাছ হয়। তাঁহারা বলেন, প্রথম বৎসরে প্রতি গাছে একছটাক হইতে অর্ধপোয়া তুল উৎপন্ন হইয়াছে, ১য় বর্ষে অর্ধপোয়া হইতে দেড়পোয়া এবং ৩য় বৎসর হইতে গাছ প্রতি ১ হইতে ১০ তুলা উৎপন্ন হইতেছে। খরচ প্রথম বৎসরে প্রতি একর ২০০, তার পরে প্রতি বৎসর ১৫০ করিয়া। তুলার মূল্য ১৫০ করিলেও তৃতীয় বৎসর হইতে একর প্রতি নুনকরে খরচ বাড়ে লাভ ৬৫০।

বীজনির্বাচন।

নূতন মার্কিনী বা মিশরী বীজ লাগাইয়া ফুল না হইলে উত্তম পরিত্যাগ না করিয়া যে কয়টি গাছ হইবে, তাহারই মধ্য হইতে সকলের অপেক্ষা ভাল গাছটির বীজ রাখিতে হইবে ও পরের বৎসর এই বীজ বপন করিতে হইবে। আবার মন্দ গাছগুলি বাদ দিয়া ভাল ভাল কয়েকটি গাছেরই বীজ রাখিতে হইবে। তুলা সকল গাছগুলি হইতেই সংগ্রহ করিতে ঘোষ নাই, কিন্তু পরের বৎসরে বপনের জন্য বীজ কেবল উৎকৃষ্ট গাছ হইতেই রাখিতে হইবে। এইরূপে এবৎসরের মধ্যেই আমাদের অবস্থার উপযোগী নূতন-জাতীয় কাপাস সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

সি-আইলাও-কাপাস মূল গাছকাপাস (perennial) ছিল এবং শীতকালে উহার ফুলফল হইত। যখন ঐ কাপাস মার্কিনে চাষ করিবার প্রথম চেষ্টা হইল, তখন ফুলফল হইবার পূর্বেই গাছগুলি সেধানকার দারুণ শীতে মরিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে ততোত্তম না হইয়া পুনঃপুন চেষ্টা হইতে লাগিল ও দৈবাৎ যে দু'একটি গাছ মরিবার পূর্বেই ফল পাকিল, তাহারই বীজ বপন করিয়া করিয়া ক্রমে নূতন ৬৬ষিজাতীয় (annual) সি-আইলাও কাপাসের সৃষ্টি হইল। শুধু তাহাই নহে, ক্রমাগত যত্নের সহিত বীজনির্বাচনদ্বারা মূল সি-আইলাও অপেক্ষা মার্কিনী সি-আইলাওর স্তূত্র আরও সুদীর্ঘ ও মূল্যবান হইয়াছে। এই "উন্নত সি-আইলাও" তুলার পাউণ্ড (১০ সের) দেড়টাকা মূল্যেও বিক্রয় হয়। ব্যর্থের ভিতরে সফলতার বীজ নিহিত ছিল। কিন্তু

এইপ্রকার উন্নতি আমাদের বৃথ্ অনশনক্রিষ্ট
কৃষকদিগের নিকট আশা করা বিড়ম্বনামাত্র।

বিশেষ আন্দলের সংবাদ।

সিদ্ধেশ্বরের প্রাকৃতিক অবস্থা ঠিক
মিশরেরই অনুরূপ। বৎসবে বৃষ্টির পরিমাণ
৫১ ইঞ্চি। এখানে খাল হইতে জলসেচনের
দ্বারা মিশরী কাপাসের চাষ করিয়া বোম্বাই-
এর কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ বিশেষ কৃত-
কাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। যে ক্ষেত্রে সকল অপেক্ষা
ভাল ফসল হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে একবে খরচ
৩০ টাকা বাদে প্রায় ১২০ লাভ হইয়াছে।
কিন্তু বঙ্গদেশে মিশরী কাপাসের চাষ কতদূর
ফলপ্রসূ হইবে, তাহা বলা কঠিন।

জমী।

নীচ জমীতে অর্থাৎ যেখানে ভাল বাধে,
সেখানে কাপাস একবারেই হয় না।
আউসধান, কুটী, রেড়ী, মড়হর প্রভৃতির
জন্ম যে জমী উপযোগী, সেই জমীতেই
কাপাস হইতে পারে। মোটাকপা এই যে,
আমনধানের ক্ষেত কাপাসের পক্ষে সম্পূর্ণ
অনুপযোগী।

জমী উচ্চ হইলে ও উচ্চতর ভাল না বাধিলে
সকলপ্রকার জমীতেই কাপাস হইয়া থাকে,
তবে দো-আঁস (বোম্বাই এন্টেল জমীর
মারামারি) বা বাহাতে মাটি অপেক্ষা বাণীর
লক্ষ বেশী, সেইপ্রকার জমীই উৎকৃষ্ট।
বেলে-জমীতে রস কম থাকে, সেইজন্য গাছ
তত বড় হয় না ও ছোটতেই অকালপক
হইয়া ফুলফল ধরিতে থাকে। এন্টেল
জমীতে গাছ খুব বড় বড় হয়, কিন্তু তাহা
ফল ও তুলা হয় না।

কাপাস বুনিয়ার সময়।

মিশরে ও মার্কিনে এপ্রেল বা বৈশাখমাসে
তুলার বীজবপন করে। ভারতের উত্তর-
পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই, মধ্যভারতবর্ষ প্রভৃতি
অঞ্চলে বীজবপন হয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে।
বেহার ও ছোটনাগপুরের অন্তর্গত যে সকল
জেলাতে কিছু কিছু তুলা হয়, সেখানেও বীজ-
বপন করে 'জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে'। তাহার পূর্বে
বৃষ্টিও হয় না, জমীও তৈয়ার হয় না।
পূর্ববঙ্গ ও মধ্যবঙ্গে বৈশাখ কেন, চৈত্র-ই
মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় ও সেই সময়েই
অর্থাৎ পাটবপন করিবার সময়েই
কাপাসেরও বীজবপন কর্তব্য। বেলা
বৃষ্টির সময়ে বীজবপন অযুক্ত। গাছ বড়
হইলে বৃষ্টিতে তত ক্ষতি করে না।

আখিনমাসেও বীজবপন করিয়া দেখা
উচিত। কিন্তু নিজ বাঙলার ইচ্ছাতে বিপদ
আছে। এই সময়ে এখানে বৃষ্টি হয়। এই
বৃষ্টিতে কুটম্ব তুলার ক্ষতি হইবে। বেহার
কিংবা উড়িষ্যায় এই সময়ে বৃষ্টি হয় না—
কালবৈশাখী জিনিষটা ঐ সকল অঞ্চলে
নাই। যেখানে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, এমন কি
চৈত্র-ই বৃষ্টি আবিস্ত হয় পূর্ববঙ্গে হইয়াই
থাকে—সেখানে আখিনমাসেই কাপাস-
বপন উচিত নহে। ছোটনাগপুর ও তাহার
সন্নিহিত বেহারের দক্ষিণাংশের জমী টেউ-
খেলান, নিজ বাঙলার তার সমতল নহে।
ঐ সকল স্থানে বৃষ্টিও অপেক্ষাকৃত কম ও
বৃষ্টি হইলেও জমীতে ভাল দাঁড়ায় না। এই
অঞ্চলে জ্যৈষ্ঠেই কাপাসের বীজবপন করা
কর্তব্য। সকল স্থানের অবস্থা একপ্রকার
নহে। সুতরাং বীজবপনের সময়সম্বন্ধে

সকল স্থানের জন্য এক সাধারণ নিয়ম করা অসম্ভব ।

বীজবপনের প্রণালী ও বীজের পরিমাণ ।

বীজের অনেকগুলোই ছিটাইয়া বীজবপন করা হয় । কিন্তু সেটি সুপ্রণালী নহে । মার্কিন বা মিশরের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারত-বর্ষেরই অজ্ঞাত অঞ্চলে লাইন করিয়া বীজ-বপন করে । ইহাতে নিড়াইবার ও জমী উদ্ধারিবার সুবিধা হয় ।

যদি বর্ষার পূর্বে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখে কাপাস লাগান যায়, তবে জমীতে ১ফীট (বা ১১০হাত) অন্তরে আলী বাধিয়া তাহারই উপরে বীজবপন করা উচিত । জমীর যে দিকে ঢালু বা গড়ান থাকিবে, সেই মুখে আলী দেওয়া উচিত । কেন না, ইহাতে বৃষ্টির জল জমীতে না বাধিয়া ঢুটি আলীর ভিতরে যে জুলী থাকিবে, তদ্বারা গড়াইয়া বাতির হইয়া যাউতে পারে । জমীতে জল না দাঁড়ায়, এইটাই সর্বপ্রধান লক্ষ্যের বিষয় ।

জমী বত ভাল হইবে, ততই গাছ ভাল ও বড় হইবে, সুতরাং ততই দূরে দূরে গাছ রাখিতে হইবে । জমী অল্পক্ষর হইলে গাছ ছোট ছোট হয়, সুতরাং অপরাকৃত ঘন ঘন গাছ থাকিলেও ক্ষতি হয় না । সকল ফসলসম্বন্ধেই এটি নিয়ম, সুতরাং কাপাসসম্বন্ধেও তাহার অন্তথা হইবার নহে । আবার কাপাসি নানাজাতীয় । কোন-কোনটির গাছ বড়বড়ই বড়, কোন-কোনটির গাছ ছোট । যে-যে-জাতীয় কাপাসের গাছ বড়, তাহার লাইনও দুই-দুই-

ফীট অন্তর না হইয়া ৩৪ফীট অন্তর হওয়া উচিত, এবং লাইনে লাইনে যে গাছ থাকে, তাহাও ১ফুট-১১০ফীট অন্তর অন্তর না হইয়া ২ফীট বা ততোধিক হইতে পারে । মোটের উপরে ২ফীট অন্তর অন্তর লাইন ও প্রতি লাইনে (একহাত) ১১০ফীট অন্তরে অন্তরে গাছ রক্ষা করা উচিত । মার্কিনদেশে ৩৪ফীট অন্তরে অন্তরে লাইন ও লাইনে ২১০ফীট অন্তরে অন্তরে গাছ রাখে । সিংভূমের বট্টিয়াকাপাসও এইরূপেই বপন করিতে হইবে ।

গাছকাপাস লাগাইতে হইলে ৮.১০ফীট অন্তরে অন্তরে গাছ বসান উচিত ।

লাইনে বীজবপন দুইপ্রকারে করা যাইতে পারে । একফুট-দেড়ফীট অন্তরে অন্তরে ৪৪টি বীজ বপন করা যাইতে পারে । অথবা লাইনে অবিচ্ছেদ্যে বীজ-বপন করা যাইতে পারে ।

বীজ অধিক মাটির নীচে চাপা পড়িলে অঙ্কুর-উদগম হয় না । এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি বা দুই তুল্লি পরিমাণ মাটি উপরে থাকিলেই যথেষ্ট ।

বীজ ভাল হইলে ও সমস্তগুলি গজাইলে এক একরে (৮০হাতী বিঘার ৩ বিঘা) ১০ বীজই যথেষ্ট । বপনের দূরত্ব অনুসারে বীজের পরিমাণ । গাছকাপাস ১১এ ছয় একর জমীর বপন চলিতে পারে । কিন্তু অনেক বীজ গজায় না, বা জলে পচিয়া যায় । এ কারণে বীজ বেশী করিয়া বপন করা উচিত ও কিছু হাতে রাখা কর্তব্য ।

বপনের পরে ।

বীজবপনের ৫৭দিনের মধ্যেই অঙ্কুর

উৎপন্ন হয়। চারা বাহির হইবার ১০।১৫ দিন পরে চুর্কল গাছগুলিকে উঠাইয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্তব্য। এক স্থানে একের অধিক গাছ থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। ক্ষেত অবশ্য পরিষ্কার রাখিতে হইবে অর্থাৎ ২।৩বার নিড়াইয়া দিতে হইবে। তত্ত্বিন্ন বাস-আগাছা প্রভৃতি না থাকিলেও লাইনের মাঝে মাঝে ২।৩বার লাঙল, কোদালী বা খুরপী দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া দিতে হইবে। এইটি বিশেষ করিয়া মরণ রাখা আবশ্যক।

কাপাসের গাছের ছোট অবস্থার অনেক সময়ে শোণোকা লাগে ও বিশেষ ক্ষতি করে। এক্ষণ হুলে উক্ত পোকের উপদ্রব কমিয়া বাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখা উচিত। তার পরে যে গাছগুলি বাচিয়া বার, তাহার মধ্যে কাহাকে রাখিয়া কাহাকে তুলিয়া ফেলিতে হইবে, সেইটি বিবেচ্য।

কাপাসগাছের গোড়া বড় নরম, ঝড়ে-বাতাসে ভাঙিয়া যায়। গাছ কিছু বড় হইলেই কোদালী দিয়া গোড়ার মাটি বাধিয়া দেওয়া উচিত।

ধান, গম, সরিষা প্রভৃতি যেমন এক এক ক্ষেত একসঙ্গে পাকে ও একসঙ্গে সমস্ত গাছ কাটিয়া মাড়িয়া কললাত করা যায়, কাপাস সেদৃশ্য নহে। উহা কলের গাছের মত। আম, জাম, আতা, পেয়ারা, লিচু যেমন ক্রমে পাকে ও ক্রমে তাহাদের কল সংগ্রহ করিতে হয়, কাপাসও সেইরূপ ক্রমে পাকে ৫ হুটে ও প্রতি ৮।১০ দিন অন্তর অন্তর কেষ্টের তুল্য সংগ্রহ করিতে হয়। তুল্য হুটিতে আরম্ভ হইলে শেষ পর্য্যন্ত আর

১।২।৩ ছইয়াস লাগে। এই সময়ে এক প্রকার লালবর্ণের মাছি লাগিয়া তুলার বিশেষ অপকীর করে। তুলাসংগ্রহের সময়ে দাগী তুলা ও ভাল তুলা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বুড়ি বা থলিয়াতে রাখা উচিত। এবং বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন—বেন শুকপাতাদি তুলার সঙ্গে লাগিয়া না থাকে। তুলাই সংগ্রহ করিতে হইবে, কাটা কলের খোলা বা খোলা গাছেই থাকিবে।

কাপাসের সার।

মার্কিনে গড়ে একরে ২/০ মণ কিংবা ২।০ মণ তুলা উৎপন্ন হয়। কিন্তু উপযুক্ত সারপ্রয়োগ দ্বারা অনেক সময়ে ৬/০ কিংবা ৭/০ মণও উৎপন্ন হয়। এইরূপ হইলে অবশ্য কাপাস করিয়া যথেষ্ট লাভ আছে। মার্কিনে পরীক্ষা দ্বারা দেখা হইয়াছে যে, কাপাসের মজ সার বতই দেওয়া যায়, ততই বেশী লাভ।

সকল কসলের মজই আর গোবরসারের প্রয়োজন। কাপাসের পক্ষেও এই কথা। প্রতি একরে ৫।৭ গাড়ি গোবর দেওয়া উচিত। এই গোবর অন্তত ৫।৬ মাসের পুরাতন হওয়া চাই। কিন্তু আমাদের দেশে এই সার নানা কারণে অতি অল্পই পাওয়া যায়। বাহা হোক, মার্কিনী ও মিশরী কাপাসের ক্ষমিতে গোবরের সার দেওয়ার অভ্যাস প্রয়োজন।

কাপাসের ভূমিতে সোডিয়াম ত দিতেই হইবে, কিন্তু আরও একটি সারের প্রয়োজন আছে, তাহার নাম সুপার ফসফেট (Super phosphate)। এইটি কাপাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা কানীপুরে

ওরাল্ডী কোম্পানীর নিকট পণ্ডর বাগ
—দার ২০ করিয়া মণ। একরে ৪/০ মণ
সুপার কসকেট ব্যবহার করা কর্তব্য।
ইহা সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়াইরা দেওয়া উচিত
নহে। যে লাইনে লাইনে বীজবপন
হইবে, সেই লাইনে লাইনে ছড়াইরা
কোদালীঘারা মাটির সঙ্গে মিশাইরা দেওয়া
উচিত। যে কসল ছিটাইরা বপন হয়, সেই
কসলের অন্তর্গত সুপার জমীতে ছিটাইরা দিতে
হয়—এটি সাধারণ নিয়ম।

সুপারের বিলাতী নাম গুনিয়া কেহ
ইহার বিরোধী হইবেন না। বিজ্ঞানের
স্বদেশবিদেশ নাই। সুপারে উদ্ভিদের
একটি অভ্যাবস্তক উপাদান নিহিত আছে।
সকল সভ্যদেশেই উহার প্রচুর ব্যবহার
হইতেছে—কোটি-কোটি-মণ ব্যবহার হই-
তেছে। আমাদের দেশেও উহার প্রচলনের
অত্যধিক প্রয়োজন। প্রায় সকল কসলের
অন্তর্গত উহা উপকারী—বিশেষ কাপাসের
কল।

কাপাসচাবে (এক একর = ৮০ হাতী
বিঘার তিন বিঘা) একরপ্রতি খরচ ও
লাভ।

পাঁচবার লাঙল দেওয়ার খরচ, ১—১ একর
একবার চষিতে ৩০ খান লাঙলের প্রয়োজন,
৩বার চষিতে ১৫ খান লাঙল। টাকার
৩০ খান হিসাবে— ৫
বীজ ৮ সের— ১০
পাছ পাডলা করিবার খরচ ৪ জন লোক
১০ হিসাবে— ২
নিকাঁইবার খরচ ১২ জন লোক ৩

হইবার কোদালীঘারা জমী উন্টাইরা দেওয়া
প্রতিবারে ১২ জন লোক মোট ২৪ জন ৬
তুলাসংগ্রহের খরচ ১০ জন লোক— ২১০
গোবরসার ৫০/ ২১০
সুপার ৪/০ মণ ২১০ হিসাবে ২১
এক একর জমীর খাজনা ৪১০

মোট প্রায়—

৩৪১

সকল স্থানের মজুরী বা জমীর খাজনা
এক প্রকার নহে। সুতরাং এই হিসাব
সর্বত্র খাটিবে না। বেহার ও ছোটনাগপুরে
এক একর জমীর খাজনা ৪১০ হলে ১০ ও
লোকের মজুরী ১০ হলে ১/১০। লাভের
কথা পূর্বেই কিছু বলা হইয়াছে। আমাদের
দেশী কাপাস করিয়া লাভ বোধ হয় বিশেষ
কিছুই থাকিবে না, তবে সিংভূমের বড়িয়া
কাপাস করিলে বোধ হয় লাভ হইবে। এই
তুলার মণ ১৭ টাকা ধরিলে ও একরে
ফলন ৩৪ মণ হইলে অবশ্য বেশই লাভ
থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে কত তুলা ভল্লো, কত
জমীতে কাপাসচাব হয়, ইত্যাদি।

(Statistics)

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মাকিণ, মিশর
এবং ভারতেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক
অধিক তুলা উৎপন্ন হয়। ১৮৯৮ খৃঃ হইতে
১৯০৪ খৃঃ পর্যন্ত এই তিনটি দেশে কত
তুলা উৎপন্ন হইয়াছে, নিম্নলিখিত তালিকার
তাহা দৃষ্ট হইবে। অঙ্কগণিতিক “কোটি
পাউণ্ড” বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক
পাউণ্ড = ২ সের, এককোটি পাউণ্ড =
২ লক্ষ ২৫ হাজার মণ।

বৎসর।	মার্কিন্।	ভারত।	মিশর।	অর্থাৎ গড়ে মিশরে ভারত অপেক্ষা
১৮৯৮	৫১৮	৫৫	৬৫	একরপ্রতি ফলন ৫৩৭। মিশরী- তুলার
১৮৯৯	৫৮০	৯৭	৫৫	দামও ভারতের তুলার বিত্তগণেরও অধিক।
১৯০০	৪৭৬	৬০	৬৪	মার্কিনে ভারত অপেক্ষা ৫০৬৩৭ বেলী
১৯০১	৫৩০	৮৫	৫৪	তুলা উৎপন্ন হয়। তাহার দাম ভারতের
১৯০২	৫৪৩	৯৩	৬৫	তুলার দামের দেড়। মার্কিনে যে তুলা জন্মে,
১৯০৩	৫৩৬	১০৭	৫৮	তাহার কিঞ্চিদধিক ঠ' সেই দেশেই খরচ
১৯০৪	৫০৭	১৩৬	৭	হয় ও সিকি পরিমাণ ইংলণ্ডে যায়।

বর্তমান সময়ে এই তিনটি দেশে গড়ে কত জমিতে কাপাসের চাষ হয় ও একরপ্রতি ফলন কত, তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় প্রদত্ত হইল :—

দেশ।	আবাদী জমীর পরিমাণ।	একরপ্রতি ফলন।
	(একর)	(মণ)

মার্কিন্	২ কোটি ৮০ লক্ষ	২।০
ভারত	১ কোটি ৯০ লক্ষ	১।০
মিশর	১৩ লক্ষ ৭ হাজার	৫।০

ভারতের অর্ধেক প্রায় বোম্বের মিলেই ব্যবহৃত হয়, ইংলণ্ডে অতি অল্পই যায়, বাকী যায় জার্মানী ও জাপানে। মিশরের তুলার প্রায় আট আনা ইংলণ্ডে রপ্তানি হইয়া থাকে।

এই কম বৎসরে ইংলণ্ডে কত কোটি-পাউণ্ড তুলা কোন্ কোন্ দেশ হইতে আমদানী হইয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল :—

বৎসর।	মার্কিন্।	ভারত।	মিশর।	অন্তান্ত দেশ।	একু।
১৮৯৮	১৮১	২৭	২৮	২০	২১৩৭
১৮৯৯	১২০	৩১	৩৪	১৮	১৬১২
১৯০০	১৩৭	৩৭	৩১	৪৬	১৭৬৩
১৯০১	২৪৮	৩৮	২৮	২৯	১৮২৭
১৯০২	১৩৬	৩৩	৩৬	৬৫	১৮১৮
১৯০৩	১৩৬	৮২	৩০	৫৪	১৭৯৬
১৯০৪	১৪৯	৯৫	৩২	৪৪	১৯১৯

১৯০০ হইতে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত মিশর হইতে ইংলণ্ডে যে তুলা রপ্তানি হইয়াছে, তাহার বার্ষিক মূল্য গড়ে ৯২ লক্ষ ৪৭ হাজার পাউণ্ড বা ১৩ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

মার্কিনে তুলার চাষ কিপ্রকার বৃদ্ধি হইতেছে, নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা দৃষ্টি-দোচর হইবে :—

১৮৭২-৮০	...	১,২৫,৯৫,০০০	একর
১৮৮২-৯০	...	২,০১,৭২,০০০	"
১৮৯২-১৯০০	...	২,৭৪,০৩,০০০	"
১৯০০-০৫	...	২,৮০,১৭,০০০	"

ভারতেও তুলার চাষ বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু বঙ্গদেশের ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে, যথা :—

বৎসর ।	সমগ্র ভারত । (একর)	বঙ্গদেশ । (একর)
১৮৯২-৯৩ ...	১,৩৪,২২,০০০	২,৩০,০০০
১৮৯৯-১৯০০ ...	১,১৮,৮৬,০০০	১,৬০,০০০
১৯০৩-০৪ ...	১,৮০,৪৩,০০০	২৫,০০০
১৯০৪-০৫ ...	১,২০,১৪,০০০	৮৯,০০০

বার-ভের বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে যে-পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইত, এখন তাহার দশ-জানা উঠিয়া গিয়াছে । সমগ্র ভারতে যে-পরিমাণ তুলার চাষ হয়, বঙ্গদেশে (বাঙলা-বোহার-উড়িয়া) তাহার ২০০ ভাগের একভাগও নহে । কিন্তু সমগ্র ভারতে যে-পরিমাণ ধাতু জন্মে, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ ও যে-পরিমাণ পাট জন্মে, তাহার ৯৮ ভাগ বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয় । এখানে বঙ্গদেশ অর্থে বিগত ১৬ই অক্টোবরের বিভাগের পূর্বে বঙ্গের ছোটগাটের শাসনাধীন সমগ্র প্রদেশের কথাই বুঝিতে হইবে ।

ঢাকাই মসলিনের কাপাস ।

ঢাকাতো এখন কাপাসের চাষ নাই বলিলেই হয় । স্থানে স্থানে লোকের বাড়ীতে একপ্রকার গাছকাপাস (perennial) আছে, কেহ কেহ অজ্ঞান করিতেছেন যে, ঐ গাছকাপাসের তুলা হইতেই মসলিন উৎপন্ন হইত, কিন্তু তাহা ঠিক নহে । মসলিনের কাপাসের মাঠে ক্রীতমত চাষ হইত ।

ঐ ঢাকাই কাপাসের নাম ছিল 'ফোটা' । বৎসরে উহা দুইবার উৎপন্ন হইত—আখিন-মাসে বপন করিয়া বৈশাখে তুলা ফুটিত, এবং বৈশাখে বপন করিয়া আখিনে তুলা

ফুটিত । বৈশাখী তুলাই শ্রেষ্ঠ ছিল, অর্থাৎ ঐ তুলায় তৈয়ারী কাপড় ধোত হইলেও ঠিক থাকিত, আর আখিনী তুলার স্ত্রী ধোপে মোটা হইত । তাঁতীরা উভয় তুলাই অগুত হ্মাস না রাখিয়া স্ত্রী কাটিত না, কিন্তু আখিনী তুলা আরও কিছু বেশীদিন ধরে রাখিত । অনেকসময়ে শীতকালে বৃষ্টির অভাব এবং চৈত্রবৈশাখের ঝড় বৈশাখী তুলার বড় ক্ষতি হইত । আখিনী তুলায় তত লোকসানের ভয় ছিল না । তবে উচ্চভূমি অর্থাৎ যেখানে বস্তার জল না উঠিতে পারে, কেবল এমন স্থানেই উহার চাষ সম্ভব ছিল । পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই বর্ষা বেশী । এই-কল্প ঐ অঞ্চল তুলাচাষের অশুপযুক্তই বলিয়া মনে হয় । কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, ঢাকার প্রবল বর্ষাতেও আখিনী ফোটার বিশেষ ক্ষতি হইত না । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকাই কাপাসের (অর্থাৎ বীজ-সংযুক্ত তুলার) দর প্রতি মণ এইরূপ ছিল :—

১৭৬৪ খৃঃ ১৭৭৭ খৃঃ ১৭৮৯ খৃঃ

বৈশাখী	}	২—২৫০—২১০—৩—৩০
ফোটা		
আখিনী	}	২—২৪০—২৫০
ফোটা		

অর্থাৎ আখিনী ফোটার দাম বৈশাখী ফোটা অপেক্ষা গড়ে ১০ কম থাকিত ।

ঢাকার সরিকটে এবং ঢাকাজেলার উত্তর ও পূর্বাংশেই ভাল তুলা হইত, পশ্চিমাংশের তুলা তত ভাল ছিল না ।

আট হইতে বার চাষ দিয়া কৃষকেরা জমী প্রস্তুত করিত ও একহাত অন্তর লাইন

করিয়া করিয়া বীজবপন করিত। এক এক লাইনে ৪ইঞ্চি দূরে দূরে বীজবপন করিত। গাছগুলি কিছু বড় হইলে যেগুলি ভাল ভাল, সেইগুলি বাদে বাকী মধুগুণে গাছগুলিকে মারিয়া ফেলিত। প্রতি চারি-বৎসরের মধ্যে এক বৎসরের কাপাসের জমী পতিত রাখিবার নিয়ম ছিল। বপনের জন্ত যে বীজ থাকিত, তাহার তুলা বিচ্ছিন্ন করা হইত না, তুলাসমেত বীজ উত্তমরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া দ্রুত বা তৈলের কলসীতে উনানের উপরে তুলাইয়া রাখিত এবং বধাকালে বপন করিত।

রেসিডেন্ট জনবেব এককণা জমীতে চাকাই কাপাসচাষের হিসাব দিয়াছেন। দৈন্যে বার নল ও প্রহে দশ নল হইলে এক কণা হইত। ১২ নলে প্রায় ১০০ ফীট। অর্থাৎ এক কণা এক একরের তিনভাগের এক ভাগ, অথবা ৮০ হাতী বিহার এক বিহার সঙ্গে প্রায় সমান। এককণা কাপাসচাষের ব্যয় ও লাভ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, কাপাসের চাষে বড় একটা লাভ ছিল না। তখন কড়ীর চলন ছিল। ৫ কাহন কড়ীকে ১৮ টাকা বলিয়া ধরিতে হইবে:—

জমীর খাজনা . . . ৫ কাহন . ০ পণ
জমী প্রদত্ত করিতে
২ জন লোকের মজুরী,
প্রতি জনের দিন ৮ পণ
হিসাব ৪ . ৮
বীজ ৩ (তিন সের),
প্রতি সের ১ কাহন
হিসাবে ০ . ০

বীজবপনের জন্ত ৭ জন
লোকের মজুরী ... ৩ . ৮
গাছের গোড়ার মাটি
বাধিয়া দেওয়ার
জন্ত ৫ জন লোকের
মজুরী ২ . ৮
চারিবার
নিড়াইবার খরচ ... ১০ . ০
মাঝে মাঝে কেতে মাটি
উড়াইয়া দিবার
খরচ, ৪ জন
লোকের মজুরী ... ২ . ০
তুলাসংগ্রহের খরচ,
১৫ জন লোকের
মজুরী ৭ . ৮
মোট ৫৮ কাহন . ০ পণ
অথবা ২৪০ টাকা।

বৎসর অল্পকূল ও জমী
ভাল হইলে এককণা
জমীতে ২/০ কাপাস উৎ-
পন্ন হইত। ইহার মূল্য
৫৮ হিসাবে ... ১২৮ টাকা
খরচবাদে লাভ
প্রতি কণা ... ২৪০ টাকা মাত্র।
একর প্রতি লাভ ... ৭৪০ টাকা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইষ্ট
ইন্ডিয়া কোং এবং অন্যান্য সদাগরেরা এক
চাকাসহর হইতেই বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকার
মসুলিন ক্রয় করিত। কিন্তু উনবিংশ
শতাব্দীর প্রথম হইতেই মাকোটোরের প্রতি-
যোগিতাবশত চাকার সর্বনাশ হইয়া গেল।
এখন চাকার ভীতীত আর সেবার

নাই, মসলিন ও আর হয় না বলিলেই হয় । ২০ গজ লম্বা ও ১ গজ প্রশস্ত, ওজনে ৩০
 ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বখশ দুবরাজ (বর্তমান আউল, মূল্য প্রায় ১০০ টাকা । কিন্তু
 সম্রাট নগর এডওয়ার্ড) তারতবর্ষে আগমন সময়ে যে মসলিন
 করেন, তখন তাঁহাকে তিনখানি মসলিন হইত, তার ১৬ গজের ওজন প্রায় ২ আউন্স
 উপহার প্রদত্ত হয়, উহার প্রত্যেকখানি ও মূল্য ৪০০ টাকা ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

বালিকা বধু ।

ওগো বর, ওগো বধু !

এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীন

এ তব বালিকা বধু ।

তোমার উদার প্রাসাদে একেলা

কত খেলা নিরে কাটায় যে বেলা,

তুমি কাছে এলে তাবে তুমি তার

খেলিবার ঘন শুধু,

ওগো বর, ওগো বধু !

জানে না করিতে সাজ ।

কেশবশ তার হ'লে একাকার

মনে নাহি মানে লাজ ।

দিনে শতবার তাকিয়া গড়িয়া,

ধূলা দিবে ঘর রচনা করিয়া,

তাঁবে মনে মনে সাধিছে আপন

ঘরকরণের কাজ ।

জানে না করিতে সাজ ।

কহে এরে শুকনো

"ও যে তোর পতি, ও তোর দেবতা,

ভীত হ'য়ে তাহা শোনে ।

কেমন করিয়া পূজিবে তোমার
কোনোমতে তাহা ভাবিয়া না পার,
খেলা ফেলি কছু মনে পড়ে তার—
“পালিকপরাণপণে
বাহা কহে গুরুজনে ।”

বাসকশয়ন'পরে
তোমার বাহুতে বঁধা রহিলেও
অচেতন যুগতরে ।
সাদা নাহি দেয় তোমার কথার
কত শুভধন বুধা চলি যায়,
বে হার তাহারে পরালে, সে হার
কোথায় থসিয়া পড়ে
বাসকশয়ন'পরে ।

তধু দুর্দিনে বড়ে
—দশদিক্ ত্রাসে আঁধারিয়া আসে
ধরাভূলে অধরে—
তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলাধুলা কোথা পড়ে' থাকে তার,
তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া,
হিরা কাঁপে ধরধরে—
• হুঃখদিনের বড়ে ।

মোরা মনে করি তর
তোমার চরণে অবোধজনের
অপরাধ পাছে হয় ।
তুমি আপনার মনে মনে হাস
এই দেখিতেই বুঝি ভালবাস,
খেলাধরবারে ঠিকাইয়া আঁকে,
কি যে পাও পরিচয় ।
মোরা মিছে করি তর ।

তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে
ওই তব ত্রিচরণে ।
সুজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতারনতলে রহিবে আগিয়া,
শতবৃগ করি মানিবে তখন
কণেক অদর্শনে
তুমি বুঝিয়াছ মনে !

ওগো বর, ওগো ধাঁধু,
জান জান তুমি—ধূলার বসিয়া
এ বালা তোমারি বধু ।
রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজারে নিরুজন ঘরে,
সোনার পায়ে ভরিয়া রেখেছ
নন্দনবন-মধু—
ওগো বর, ওগো ধাঁধু !

ভীমচুলহা ।



ভীমচুলহা-পাহাড় পালায়ো-জেলার বিখ্যাত ।
তাহার একাংশ কোরেল-নদী-কদরে প্রবেশ
করিয়া স্রোতোবেগে অল্পদিনে গ্রহত হই-
তেছে । পরপারে নিবিড় তালীবনরাজি
এবং মহরা ও শালগাছের সারি । দূরে
প্রকৃতির দুর্গপ্রাকারতুল্য রোহিতাধিপতির
স্থান দ্বারা দিগন্তবিস্তৃত হইয়া দৃষ্টি-
রোধ প্রহত করিতেছে । অকথিত আছে,
এই ভীমকান্ড স্থানটির দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া
বয়ঃ ভীমসেন একদা এখানে বাস করিয়া-
ছিলেন । তাহার পদচিহ্ন সেখানকার
পাথরপ্রান্তে এখনও বর্তমান এবং পাকাবির

জ্ঞত তিনি যে চুলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন,
তিন স্তম্ভীর্ষশিলাখণ্ড কালজর করিয়া তাহা
স্থচিত করিতেছে ।

কিন্তু হাপরযুগের, বিশেষত বীর বুকো-
দরের কথা বেদব্যাসঠাকুরের মুখেই
শোভা পায় । উভয়কে প্রণাম করিয়া
আমরা এইস্থানসংক্রান্ত ক্ষুদ্র একটি কাহিনীর
পরিচয় দিব ।

দিশাহাবিক্রোধের প্রায় পাঁচবৎসর
পূর্বের কথা । পাহাড়তলির কাদননামক
গ্রামে ও তাহার পার্শ্ববর্তী পাঁচসাত
ক্রোশের ভিতর অনেকগুলি বসতিতে হুগুহু

পড়িয়া গিয়াছে। জার্মানদের রামশরণ
সিং সরকারী পরোয়ানা পাইয়াছেন—
লেক্টেন্যান্ট ডোটসাহেব রামশরণের পক্ষে
সদলে ভীষ্মচূড়ার শিকার খেলিতে আসিতে-
ছেন, প্রয়োজনীয় রসদ যেন ঠিক
থাকে। সেকালে বাঙলা-বেহার-উড়িষ্যার
ভিতর বে কয়টি স্থান নিত্য অনধিগম্য
ছিল, পালানো তাহার অসম্ভব। বাস্তবিক
রেলওয়ে খুলিবার আগে সেদিন পর্যন্ত এই
দুর্গমতা নিবিড়শৈলবনাকীর্ণ বিরলবসতি
এই প্রদেশটিকে কেমনতর একটা রহস্যের
মোহে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল
মৌখিক শিকারপ্রবৃত্তির উত্তেজনার সাহেব-
জ্বার তেমনতর স্থানে ভ্রমশ্রম হইতে
পারে, তখনকার দিনে লোকে ইহা বুঝিত
না। ছোট-বড় জমিদারেরা রসদসরবরাহের
নিয়ন্ত্রণ পাইয়া কাজেই শক্তিতে অসীম
হাকিমপ্রবরের এই অভিযানদিন প্রতীক্ষা
করিয়া রহিলেন। লেক্টেন্যান্টসাহেবের
গাঢ়োন্নামাক স্থানে পৌঁছিবার পথ
আসার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কতক কতক
লোকজন ভীষ্মচূড়ার ঘরান ছিল। সংখ্যার
ইহাদের পদপালের সহিত কোন সাধারণ
না থাকিলেও একদিনেই জার্মানদের এবং
গরিব প্রজাবর্গ বুঝিল, অনিষ্টসাধনে
মাতৃদের পক্ষে 'মাহু' বত পটু, পতনজাতি
ততটা নহে। কারণ, পদপাল উপস্থিতমত
স্থানিবৃত্তি করিয়াই চলিয়া যায়, কিন্তু
সাহেবের সিপাহী, চাপরাসী, আঁধালিয়া
তথু চন্দ্রকোষ-লোকপণে সজ্জা নহে।
কবির ভাবায় তারা—“খেয়ে যায়, নিয়ে যায়,
আর যায় চরে।”

রামশরণ সিং বরসে প্রবীণ এবং ধর্ম-
ভীর লোক। গৃহে অভিসংকার তাঁর
নিত্যকর্ম। সেইজন্য শেণবর্মীর রাজ্য তাঁহাকে
“মহৎ” পাঠাইতে চাহিলে, তিনি তাহা
বক্তব্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া-
ছিলেন। কিন্তু সিপাহীদের অশিষ্টতা এবং
স্বার্থপরতার সীমা ছিল না। বরং রামশরণ
শিবিরে গিয়া বুঝাইলেন-জুঝাইলেন তাহার
একটু নরম হইতেছিল, কিন্তু ইহা করবার
সম্ভব? শেবে কল এই ঠাঁইল যে, পাটো-
য়ারি বরাহিলেরা যে কেহ হুকুম তামিল
করিতে একবার সে-সুখো হইল, লাহুনা-
অবমাননার তরে সে আর সেমিকে ঘেঁষিতে
চায় না।

রামশরণের ঘোঁড়া পুত্র শিউশরণ বলিষ্ঠ
এবং উদ্বত যুবক। অহোরাাত্র নিকটের ও
দূরের পাহাড়জঙ্গলে শিকার খেলিয়া
বেড়ানই তাহার প্রধান কাজ। তাহার
একটি ছোটখাট শিকারের দলও ছিল এবং
সুগমপ্রিয় কোন রাজা কি জমিদারের
নিয়ন্ত্রণ পাইলে শিউশরণ সদলবলে তাহা
রক্ষা করিয়া বাহিত। ছেলের মেলায়
বাগের অবস্থিত ছিল না। সেইজন্য
রামশরণ তাহার “শিউ”কে রসদসরবরাহের
সম্পর্কে আসিতে দেন নাই এবং শিউশরণ
সাহেবদের শিকারে যোগ দেয়, এমন ইচ্ছাও
তাঁহার ছিল না।

রামশরণ সিপাহীদের দুর্য্যবহারের কথা
শিউশরণকে জানিতে দেন নাই, কিন্তু
তাঁহাদের বাড়াবাড়িতে ক্রমশ কিছুই আর-
গোপন রহিল না। বৃদ্ধ জার্মানদের শ্রান্ত-
স্বাস্থ্যমোহে বিক্রম করিতে গেলে অপরাহ্নে

শিউশরণ নিজে তাঁরুতে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল, সাহেবের লোকজনকে মিষ্টকথায় বলিয়া আসিবে যে, তাহার অতিথি হইরা কেন সেজন্য অত্যাচার করিতেছে। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল। সিপাহীরা বুঝিয়া গেল, বৃদ্ধ নিজে কিছু বলিতে না পারিয়া ছেলেকে পাঠাইয়া তাহাদের অপমান করিতেছে। শিউশরণ বলবান হইলেও তরুণ এবং একাকী, তাহার সংখ্যার পনরজন। অতএব দায়-গীরদারপুত্রকে নিতান্ত অসহায় জানিয়া হাতবিক্রম এবং কটুক্তিতে তাহাকে আক্রমণ করিয়া দিল। শিউশরণ যদি বলে, “মুসাম্মহারকে বাত্‌বোলনা”, তাহার এক-ধরে হুর্দীকা বলিয়া তাহার উত্তর দেয়।

পিতার মনে রুশ দিবার তরে শিউশরণ বারংবার উদ্যোক্ত ক্রোধ দমন করিতেছিল। কিন্তু শেষে আর পারিল না। তখন করতলহস্ত ক্ষুদ্র বাঁশিতে আওরাজ দিল। অমনি কোথা হইতে তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র সেনা বিভ্রাদ্বেগে শিবির আক্রমণ করিল এবং নেতার আদেশ অপেক্ষা না করিয়াই বিজয় ও প্রাপ্ত লোকগুলোকে দেখিতে দেখিতে বাধিয়া ফেলিল।

শিউশরণ তখন বজ্রগভীরবরে দলের সর্দারকে আদেশ দিল যে, বন্দীদের সকলকে তীমচুল্লার নীচে সর্দার শীতল ধরাজোতে সমস্ত রাত্রি আক্রীত ভুয়াইয়া রাখিবে। প্রত্যুষে নিজে দেখিয়া সে বধ্যবিহিত হৃদয় দিবে।

২

গৃহে কিরিতে না কিরিতে শিউশরণ অগ্নয়ের তাইয়াসাহেবের ভরক হইতে এক অকস্মিক

নিমন্ত্রণচিঠি পাইল। প্রভাতে যাবোয়ার শিকারে তাহাকে যোগ না দিলে নহে। লেক্টেন্যান্ট জেঁট গাঢ়োয়া হইতে তীমচুল্লার পথে কোথাও অপেক্ষা করিবেন, পূর্বে এমন কথা ছিল না। কিন্তু যাবোয়ার একটা প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া করদিন লোক-ভীতি জন্মাইতেছে, পুলিশের মুখে এ খবর তাহার গোচর হইল। অমনি স্থির হইয়া গেল, পরদিন কোরেলতীরবর্তী নির্বিড় জঙ্গলে শিকার খেলিতে হইবে। জমাদার তাইয়াসাহেব স্বয়ং ‘লেক্টেন্যান্ট জেঁটের সঙ্গে “ভেট মোলাকাতে”র জন্ত গাঢ়োয়ার হাজির ছিলেন, একদিনের ভিতর সকল বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিতে তিনি আদিষ্ট হইলেন। কাজেই প্রতিবেশী এবং যুগ্মান্তবজ্র শিউশরণকে একান্ত আবশ্যক হইরাছিল।

শিকারের খবর আসিলে শিউশরণের কেমন-একটা মত্ততা আসিয়া উপস্থিত হইত। তাইয়াসাহেবের চিঠি পাইয়া সে বন্দীদের কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। পিতা পাছে আপত্তি করেন, এই আশঙ্কায় তাহার অহুমতি না লইয়া অল্পসংখ্যক গজি-সহ রাতেই ঘোটকারোহণে বাহির হইয়া গেল। পথ বড় হুর্দ্ব এবং ঝাপদ-সম্বল, মশাল জালাইরা ধীরে ধীরে যাইতে হইল।

এদিকে প্রভাতে রামশরণ অতিথি-শিবিরে গিয়া দেখিলেন, সিপাহীরা কেহ নাই, সাহেবের জব্বাদি তাহারই লোকজনের পাহারায় রহিয়াছে। পরে সবিশেষ অবগত হইয়া প্রমত্ত পণিলেন এবং স্বয়ং তীমচুল্লার ঘাটে গিয়া বন্দীদের সজল-কার

হইতে স্ক্রু করিলেন। শিউশরণের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং তাহার কলে সিপাহীরা গলিয়া প্রায় জল হইয়া গিয়াছিল। রামশরণ শেষে অল্পকক্ষ হইলেন যে, তাঁহার শিউশরণ যেন সাহেবের কাছে কালিকার ঘটনার গল্প না করে। প্রতিশ্রুত হইয়া তিনি তখনই পুত্রের কাছে অস্বাভাবিকী রওনা করিলেন।

এই দিনের শিকারে তরুণ শিউশরণের দীর্ঘ-বর্গিত দেহ এবং তাহার অসামান্য দৌর্য্য-বীৰ্য্য লেক্টেন্যান্টসাহেবের চিন্তাকর্ষণ করিয়াছিল। নদীতীরের পাহাড়জঙ্গল-মধ্যে বস্ত্রশূকর বিস্তর। একটা ডান্ডুক ও গোটাছুই শব্দ হরিণও পাওয়া গেল, কিন্তু বাঘ মিলিল না। সাহেব সুগম্যলক্ষ পত-পক্ষীতে খুসী হইয়াই শিবিরে ফিরিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময়ে শিউশরণ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে, ক্রোশখানেক দূরে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রটার খবর পাওয়া গিয়াছে। ডোন্ট এতদু আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু বুঝক শিকারীর কথার অবিবাসের স্থল ছিল না। তখন সন্দের লোকজনকে অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া তিনি অগ্রগামী শিউশরণের সঙ্গে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

শিউশরণ ডোন্টসাহেবকে যেখানে লইয়া গেল, সে অতি ভয়ানক স্থান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলবাহ কোয়েলমদীদ্বয়ে প্রবেশ করিয়া কীণ ঘোড়োথারাকে বিভিন্নস্থানী এবং তীব্র ভেজদ্বিনী কলমাদিনীতে পরিণত করিয়াছে। তাহার উপর ক্ষুদ্র-বৃহৎ কল-বিটপিসকল ছায়াবিত্তার করিয়া স্থানটিকে

মধ্যাহ্নেও নিশীথবৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেই অজ্ঞাতপথ ভ্রমসাহিত বনের প্রান্তভাগে না গেলেন সুপ্রশান্তির সাক্ষাৎ মিলিলে না।

অতি কষ্টে উত্তরে সে পথ উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু নিঃশেষে নহে। পিচ্ছিল, কোথাও কোথাও সূচিতেই নিবিড় অন্ধকার এবং অসম প্রস্তর-কঙ্করময় পথ। দুইমুখে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পদশব্দ গোপন করিতে পারিলেন না। ইহাতে বাঘটা আগিয়া উঠিয়াছিল এবং উৎকর্ণ হইয়া শব্দের দিকলক্ষ্য করিতেছিল। আতঙ্কান্বিতগুলের সঙ্গে চোখো-চোখি হইবামাত্র এক লম্ফে সে তাহাদের সম্মুখীন হইল।

তাবিব্যার, পরামর্শ করিবার সময় ছিল না। ডোন্টসাহেব অগ্রবর্তী ছিলেন, পিচ্ছিল উঠাইয়া গুলি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ আবার লাফ দিল এবং বৃত্তান্ত শিউশরণের মনে হইল, অকস্মাৎ প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণিবায়ু আসিয়া তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া গেল।

পিচ্ছিল ছুড়িয়াই লেক্টেন্যান্টসাহেব পাশ কাটাইয়া ঝাঁড়াইয়াছিলেন, অন্তএব লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং আহত বাঘটাকে আর একবার গুলি করিবার হুযোগ ঘটিল। এই-বারকার গুলি তাহার কানে লাগিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন সেই নদীতীরে অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত বনপথে সরে-বাস্ত্রে তুফান বন্দ বাধিয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে ডোন্টসাহেব সার্বভৌমকবলিতবৃত্তিকবৎ বেদনা-ক্লিষ্ট-বিকটমোহ-শার্দূলরূপে পতাবিধ হইতে বসিলেন।

শিউশরণ প্রথমেই দেখিল, সহসা অত

নিকটে গুলি করিয়া সাহেব বড় ভুল করিয়া বসিয়াছে। সে-অবস্থায় সে-নিজে মুক্ত-রূপাণহস্তে শিকারের সম্মুখীন হইতে পারিলে নিমেষমধ্যে একরূপ সতীন বিপদ উপস্থিত হইত না। বাহা হউক, তাহিন হস্তে কীরীচ এবং বামে নেপালী ছোরা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে সে বাঘকে অস্বিত-ভেজে আক্রমণ করিল। সে অব্যর্থ সন্ধান। চকিতে শিকারের সম্মুখ হইয়া একটা পদ ছিন্ন হইয়া গেল এবং নেপালী ছোরা তাহার বিশাল উদরগহ্বর বিদীর্ণ করিয়া দিল। ডোঁটেসাহেবের স্বক্কে এবং মস্তকে নখদস্তা-ঘাত সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই ব্যাঘ্রের প্রাণ-বায়ু নিঃশেষ হইল।

লেক্টেন্যান্টসাহেব অজস্র শোণিত-পাতে দ্বর্জল হইয়া পড়িতেছিলেন, বুঝিলেন, শিউশরণের দার্টা এবং ক্রিপ্রকান্তিতার গুণেই আজ তাঁহার প্রাণ বাঁচিয়াছে। শিউ-শরণ তাঁহার শুশ্রূষার নিমুক্ত হইলে Thank you বলিয়া তাহার করমর্দন করিতে করিতে সাহেব মুক্তি হইলেন।

এমন সময়ে সাহেবের লোকজন আসিয়া গড়িল। সকলের পরামর্শে বিশেষ ডাকের

বন্দোবস্ত করিয়া সেই দিনই চিকিৎসার্থ তাঁহাকে নেম্লিগঞ্জ রওনা করা হইল।

৩

পাঁচবৎসর পরে মেজরপদে উন্নীত হইয়া ডোঁটেসাহেব সিপাহীবিরোধোদমন জন্ত রোটার্শ্বর্পে আসিয়াছেন। কোতারসিং পলাতক, কিন্তু তাঁহার প্রধান অনুচরের কেহ কেহ ধরা পড়িয়া বিচারার্থ তাঁহার সম্মুখে নীত হইল। শৃঙ্খলাবদ্ধ শিউশরণ সিং সকলের। অগ্রে, ঠাহর করিয়া ডোঁটে চিনিতে পরি-লেন এবং তাহার হস্তপদের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। তাহার বিরুদ্ধে বিস্তর প্রমাণ। সাক্ষীর একবাক্যে বলিতেছে—শিউশরণ আশ্রমের শিখার মত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিয়া লোকদের উত্তেজিত করিয়াছে এবং কোতারসিংহের সে দক্ষিণবাহবরূপ ছিল। মেজরসাহেব সে সব বিশ্বাস করিলেন কি না, বলা যায় না। কিন্তু তিনি অধঃস্তন কর্ণ-চারীদের বলিলেন যে, শিউশরণ তাঁর পরি-চিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। শিউশরণকে খালাস দিয়া তিনি তাহাকে সমস্তমে বিদায় দিয়া-ছিলেন। সে-দলের কাহারও কোন শাস্তি হয় নাই।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।



লীলাবসান । ত্রীজ্যোতিষ্মত্ৰ ভট্টাচার্য্য
প্রণীত ।

এই পুস্তকের আকারটি নাটকের মত, অর্থাৎ ইহা কতিপয় অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত । কিন্তু গ্রন্থকার ইহার নাম নাটক না দিয়া দৃষ্টকাব্য দিয়াছেন । তাহা ভালই হইয়াছে । কারণ, যে সকল বিশেষ গুণ থাকিলে অতি-নরোপযোগী নাটক হয়, ইহাতে সে সকলের অভাব । তবে ইহা কাব্যলক্ষণযুক্ত বটে । লেখক তাঁহার গ্রন্থে একটি কবিত্বময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । সে চিত্রখানি সূর্য্যা-লোকবিশ্রাসিত নহে, পরন্তু তাহা কাল-বৈশাখীর সন্ধ্যার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিম্নে সমুদ্রতীরবর্তী বনভূমির স্তায় গাভীর্ঘ্যসম্পন্ন । চিত্রখানি নিখুঁত হইয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু ইহাতে বখেট কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকাপুরীর ধ্বংসই এ কাব্যের বর্ণনীর বিষয় । কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসান হইয়াছে, অধর্মের পরাজয়ে পাণ্ডবের ধর্মরাজ্যের সমুদান হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য সমাপ্ত, এখন তিনি খাঁর লীলার অন্ধান করিবেন । কাব্যের প্রথমেই এই সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল । অরাব্যাদকর্তৃক শরাহত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান হইল, এই গভীর সুরে কাব্যের সঙ্গীত । সমগ্র চিত্রখানির উপর যে সূত্র—ধ্বংসের একটি করাল ছায়া পড়িয়াছে—ইহাই কবির নিপুণতার পরিচায়ক ।

পুস্তকের অঙ্কিত চরিত্রগুলি অতি পুরাতন এবং পূর্ববর্তী বই কবিকর্তৃক ব্যবহৃত হইলেও, সে গুলির মধ্যে লেখক একটি নবীন প্রাণসঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে মানবীয়তা দিতে সমর্থ হইয়াছেন । তাহা অনর্থের সূচনার বহুব্বেষ ও দেবকীর কাতরতা, দ্বারকা ছাড়িতে হইবে বলিয়া রেবতী প্রভৃতির হৃৎ, সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বের রহস্যময়তার বলরামের সংশয় প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা বাইতে পারে । দেবতা হইলেও শ্রীকৃষ্ণও ব্যাধিতচিহ্ন, তিনি বলিতেছেন—

অরি নাহে ভ্রামল ধরনি,
প্রহনপাদপমরী, তব প্রাণকূষে
বহে উচ্চ উর্মির কৈলি সাগর,
অতি গুহ, অতি ক্ষিপ্ত, অতি সুধরিত ।
জনা করি নগরীর তীর কোলাহল,
প্রাণাহ, বিপনি, হর্ষা,
প্রীতিময়ী জনবীর প্রিয়সম্ভাবণ,
পিতা, ভ্রাতা, জাতি, বন্ধু, আত্মীয়বানন—
প্রেমানন্ড প্রীতিধেরা ; এ হেন বক্তব্য
না পারে তেজিতে যদি মানব দুর্জল,
কেন অনুযোগ, কেন শাস্তি,
কেন সে বীতংস হবি রৌরব নরক ?
উদ্যাসনরনারকে,
নিঃস্বার্থ ধর্মের তব কান্তনি অর্জুনে
যেইজন ঈশখাইল,
তায় চিত্ত অজ্ঞেয় ভাবসম্পূর্ণ ।

মোটের উপর, কাব্যানুবোধী পাঠক
“লীলাবসান” পাঠ করিয়া আনন্দলাভ
করিবেন বলিয়া আশা করা যায় ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ।

বঙ্গদর্শন ।

বিজ্ঞা এবং জ্ঞান ।

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

মার্থ কথা যদি বলিতে হয়, তবে বিজ্ঞার
এই যে মূলমন্ত্র “ভাগ-ভাগ কর, আর
জড়ো”, এটা একপ্রকার ডাকিনীমন্ত্র। উহার
মাধনে আপাততঃ জরলাভ হয় বটে, কিন্তু
পরিণামে উন্টাকল ফলে। ঐ রক্তশোষক মন্ত্রের
বলে জ্ঞাতব্য সত্যের নানা দিকের নানা অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গ পরস্পরের বন্ধন হইতে বিযোজিত
হইয়া জ্ঞাত-সত্য শব্দেহে পরিণত হয়।
তাহা হইলেই সর্বনাশ! তাহা হইলে ফের-
বার সেই সমস্ত নির্জীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
গোড়াতাড়ি দিয়া একটা সজীব-সত্য পড়িয়া
পড়-করানো বিজ্ঞার ক্ষমতার অসাধ্য হইয়া
পড়ে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে,
মস্তিষ্কবিৎ পণ্ডিতেরা নির্জীব মস্তিষ্কতত্ত্ব
গোড়াতাড়ি দিয়া জ্ঞানের মন্দিরানে পৌঁছি-
বার সেতুমিমাংসা করিতে এতকাল ব্যস্ত।
এত যে চেষ্টা করিতেছেন, সমস্তই ভয়ে
হতাশ। তবেই হইতেছে যে, বিজ্ঞার
ডাকিনীমন্ত্র একপ্রকার মগার কাটি, তাহা

মারিতে পারে কিন্তু বাঁচাইতে পারে না।
সোনার কাটি হ’লে জ্ঞানের যোগমন্ত্র, তাহাই
কেবল মৃতশরীরে জীবনসঞ্চার করিতে
পারে। আমি এখানে যে জ্ঞানের কথা
বলিতেছি, তাহা গোড়া’র জ্ঞান; তা বই,
তাহা শাখাজ্ঞানও নহে—শেখাজ্ঞানও নহে।

মহুঘোর গোড়া’র জ্ঞান অমূল্যবান;
অপচ মহুঘা তাহা বিনামূল্যে পাইয়াছে।
মহুঘোর গোড়া’র জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া
মহুঘাকে আমরা বলি জ্ঞানবান্ জীব।
মহুঘোর গোড়া’র জ্ঞান বিজ্ঞার জ্ঞান শেখা-
জ্ঞান নহে; তাহা একান্তপক্ষেই, অপেখা-
জ্ঞান। মহুঘোর গোড়া’র জ্ঞান যদি বিজ্ঞা-
রূপী হইত, তাহা হইলে শুধুকেবল বিজ্ঞান
লোকদিগকেই আমরা বলিতাম জ্ঞানবান্
জীব। কিন্তু কহি আমরা কি? আমরা
পণ্ডিতমূর্খের প্রভেদের প্রতি চক্ষুপাত না
করিয়া পৃথিবীমুখ সকল মহুঘাকেই জ্ঞানবান্
জীব বলিয়া অবধারণ করি। ইচ্ছাভেই কহিতে

পায়া বাইতেছে যে, মহুঘোর গোড়া'র জ্ঞান বিভা নহে। বিভা যদি নহে, তবে তাহা পদার্থটা কি? পদার্থটা তাহা যে কি, তাহা দেখিতেই পাওয়া বাইতেছে। মোমাছি এই তো একরকম ক্ষুদ্রজীব; তা বলিলে কি হয়—ও একটি মত কারিকর; কিন্তু কারিকর কাহাকে বলে, তাহা জানেন না; জানিবে কেমন করিয়া? যে জানিবে, সে যে ও'র ভিতরে নাই। ও'র ভিতরে চেতনা আছে ভরপুর, তাহা দেখিতেই পাওয়া বাইতেছে। কিন্তু চেতনা থাকিলে কি হইবে (Sensation থাকিলে কি হইবে)? চেতনার মাঝার উপরে যে চৈতন্য নাই (Consciousness নাই)। যদি আর মাণিক্য কিছু আর এক নহে। যদি অপেক্ষা মাণিক্যের মূল্য চেব'বেশী। চেতন অপেক্ষা চৈতন্যের মূল্য চেব'বেশী। চেতন বেধে—কিন্তু কি দেখিতেছে তাহাও বলিতে পারে না, কে দেখিতেছে তাহাও বলিতে পারে না। চৈতন্য যেমন বেধে, তেমনি সেই সঙ্গে কি দেখিতেছে এবং কে দেখিতেছে, তাহা তাহার নিকট অপ্রকাশ থাকে না। চৈতন্য আপনি আপনার সাকী এবং তাহার আরস্তের মধ্যে বধন বাহা উপস্থিত হয়, তাহারও সাকী। পদার্থি জন্তর মাঝার যদি চেতন; মহুঘোর মাঝার যদি চৈতন্য! মহুঘোর গোড়া'র জ্ঞান যে পদার্থটা কি—এতকণে তাহা বুঝিতে পারি নেন। তাহা চৈতন্য।

চেতন'র এক চক্ষু মনচক্ষু। চৈতন্যের তিন চক্ষু—এক চক্ষু মনচক্ষু, আর চক্ষু বীচক্ষু, মাকের চক্ষু প্রজাচক্ষু। মন বাহিরে-বাহিরে গোড়ার—মনচক্ষু বহির্দৃষ্টি।

বুঝি ভিতরে-ভিতরে চিন্তা করে—বীচক্ষু অন্তর্দৃষ্টি। প্রজাচক্ষু ভিতর-বাহির মিশাইয়া একীভূত করে, প্রজাচক্ষু বোণদৃষ্টি অর্থাৎ অন্তর-বাহিরের বোণের প্রতি উদৃষ্টি। জীবচৈতন্যের প্রজাচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ মিলিয়া এক অবিভীত অখণ্ড মোটসত্য,—সর্বস্বাধীন সমগ্র সত্য তাহার সমুখে আবির্ভূত হয়।

কল কথা এই যে, সত্যজ্ঞানই জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান জ্ঞান নহে। সত্যের সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে জ্ঞান জ্ঞানই হইতে পারে না। শরীর যেমন চার অঙ্গ, জ্ঞান তেমনি চার সত্য। শাখাজ্ঞান চার শাখাসত্য, মোটজ্ঞান চার মোটসত্য। জ্যোতির্বিজ্ঞা চার জ্যোতির্বসত্য, রসায়নবিজ্ঞা চার রাসায়নিক সত্য; ডাক্তারিবিজ্ঞা চার ডাক্তারিসত্য; কবিরাজিবিজ্ঞা চার কবিরাজিসত্য। তেমনি মোটজ্ঞান চার মোটসত্য। প্রজাচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে জীবচৈতন্য সর্বস্বাধীন সমগ্র সত্যের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করে। সমগ্র সত্য কিরূপ সত্য? তাহা কেনোপ্রকার একদিক্-দ্বায়া ছিন্ন সত্য নহে (Abstract Truth নহে), তাহা বুঝিতেই পায়া বাইতেছে! তাহা পুত্ৰ আকাশ বা পুত্ৰ কাল নহে; তাহা মনের ভাবসাজ নহে; তাহা অনির্দেশ্য সত্য বা অন্তশক্তি নহে। সে যে সত্য সমগ্র সত্য, তাহা সব সত্য একাধারে। প্রবর্দ্ধক কাচের দ্বারা দিরা (Magnifying glass)এর দ্বারা দিরা। দ্বারা দিরা একটাই পুত্ৰীভূত হইলে, সেই দূর দৃষ্টিপুঞ্জীভূতে আমরা বধন বেধি দ্বিভি-পুঞ্জীভূত-মণ্ডল-আলোক

একাধারে কেন্দ্রীভূত, তখন তাহাতে কি প্রমাণ হয় ? তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ঐ যে পাঁচ উপাধি স্থিতি, গতি, তেজ, বর্ণ, আলোক, উহা সমগ্র স্বর্ঘ্যমণ্ডল পূর্ণমাত্রায় কেন্দ্রীভূত ; কেন না, সমগ্র স্বর্ঘ্যমণ্ডল সমস্ত সৌরকিরণের মূলধার। তেমনি আমরা যখন আপনা-আপনিতে দেখি সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্ত একাধারে কেন্দ্রীভূত, তখন তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ঐ যে পাঁচ মৌলিক উপাধি সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্ত, উহা সমগ্র সত্যে পূর্ণমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। অতএব এটা স্থির যে, সমগ্র সত্যে অটল অবস্থা, স্থিতিস্থিতিপ্রলয়কারী মহতী শক্তি, জীবন্ত প্রাণ, আগ্রত চেতন এবং জ্যোতির্ঘর জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় কেন্দ্রীভূত ; এক কথায়—সমগ্র সত্য পরমাত্মা স্বয়ং। পূর্বে বলিয়াছি যে, মোটজ্ঞান চার মোটসত্য—সর্বাঙ্গীণ সমগ্র সত্য। এক্ষণে দেখিতেছি যে, সমগ্র সত্য পরমাত্মা স্বয়ং। তবেই হইতেছে যে, মহাব্যোম অন্তরাঙ্গা চার পরমাত্মা ; জীবচৈতন্ত চার ব্রহ্মচৈতন্ত।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এত যে, কোথায় ব্রহ্মচৈতন্তের দর্শন পাওয়া যাইতে পারে ? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মচৈতন্ত জলে-স্থলে, আকাশে-অন্তরিক্ষে, অন্তরে-বাহিরে সর্বত্রই রহিয়াছেন তরা ; কেন না, তিনি সমগ্র সত্য—তিনি সব সত্য।

আমরা যদি একবার আশ্বিনের চতুর্দিকে চাহিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, স্বর্ঘ্যর পাকে পড়িলে নৌকা যেমন সুবিদীর্ণ পরিধিপথে চক্রে দিতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর সঙ্গীর্ণ হইতে সঙ্গীর্ণতর পরিধি-

পথে চক্রে দিতে দিতে কেন্দ্রস্থানে আগিয়া পড়ে, স্থিতির বিকাশ তেমনি গ্রহাদিচক্রে ঘুরিয়া জীবচক্রে এবং জীবচক্রে ঘুরিয়া মহাব্যোম-মহাব্যোম কেন্দ্রীভূত হইতেছে। স্থিতির বিকাশ কিসের বিকাশ ? সমগ্র সত্যে বাহ্য ঘোড়া হইতেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, তাহারই উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশ। তবেই হইতেছে যে, সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্ত, এই পাঁচ মৌলিক উপাধি বাহ্য পূর্ণমাত্রায় বর্তমান, তাহাই তাঁহার ইচ্ছার প্রভাবে, প্রাণের আনন্দে এবং জ্ঞানের নিয়মে দশদিকে উৎখলিয়া পড়িতেছে। তারসাকী ;—গ্রহাদিচক্রে আমরা দেখিতে পাই সত্তা এবং শক্তির বিকাশ ; উত্তরচক্রে দেখিতে পাই সত্তা এবং শক্তির উপরে প্রাণের বিকাশ ; জীবচক্রে দেখিতে পাই সত্তা, শক্তি এবং প্রাণের উপরে চেতনের বিকাশ ; মহাব্যোম দেখিতে পাই সত্তা, শক্তি, প্রাণ এবং চেতনের উপরে চৈতন্তের বিকাশ। এইরূপ দেখিতেছি যে, সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্ত, এই পাঁচ মৌলিক উপাধি বাহ্য সমগ্র সত্যে পূর্ণমাত্রায় কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, তাহা আকাশের গ্রহাদিচক্রে হইতে বাজারমুখ করিয়া উত্তর এবং জীবচক্রে মধ্য দিয়া একে-একে কুটীরা সমস্তই মহাব্যোম-মহাব্যোম ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-পরিধাণে একত্রে জমাটবদ্ধ হইতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্ত, সমস্তই মহাব্যোম-মহাব্যোম কেন্দ্রীভূত—যদি-চ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পরিমাণে। তবেই হইতেছে যে, একএকটি ক্ষুদ্র একএকটি ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড, আর, তাহাই পান্ডিত্য বলিলে ঈড়ার এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাট মহত্ত্ব। অতএব এটা স্থির যে, জীব-

চৈতন্য যেমন কল্প মহাবোর সারসর্গের, ব্রহ্মচৈতন্য তেমনি বিরাট মহাবোর সারসর্গের; তত্বেন, ব্রহ্মব্রহ্মাণ্ড যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, জীবচৈতন্য তেমনি ব্রহ্মচৈতন্যের অন্তর্গত।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, এক অবি-
তীর্ণ সমগ্র সত্য হইতে—ব্রহ্মচৈতন্য হইতে—
জীবচৈতন্য কোনোকালে পৃথক্কৃত হয়
নাই; কেন না, তাহা হইতে পৃথক্কৃত হও-
য়ার নামই বিনাশ পাওয়া। কিন্তু তাহা
সঙ্গেও প্রত্যেক জীবচৈতন্যের অন্তঃকরণে,
যেন সে মূল হইতে পৃথক্কৃত, এইরূপ একটা
অন্ধতা লাগিয়া রহিয়াছে, আর, সেই অন্ধতা-
গতিকে চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়া তাহার
অন্তঃকরণ কাদিয়া-কাদিয়া সারা হইতেছে।
মাতা-বধন ক্রোড়স্থ শিশুকে ক্রোড় হইতে
মারাইয়া কপাটের আড়ালে লুকাইয়া থাকেন,
তখন শিশুটি “মাতা এখানে নাই” মনে
করিয়া হুঁকি খাইতে বসিয়া যায়। সুকির
সোঁদা আবাদনে তুলিয়া প্রথম-প্রথম বেশ-
সে ঠাণ্ডা থাকে। কিছুকাল পরেই মাতার
অন্ত তাহার প্রাণে অভাববোধ লাগিয়া
ওঠে, আর অগ্নি সে কাঁদিয়া ওঠে। মাতা
তখন ঘোমটার মুখ ঢাকা দিয়া শিশুটির
সামনে ধাক্কাইয়া তাহা ক’তর দেখান।
শিশুটি তখন মাতার হাতপা অড়াইয়া-
ধরিয়া তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবার অস্ত্র কাঁদিতে
থাকে। মাতা যেই তাহাকে ক্রোড়ে ল’ন,
শিশুটি সেই অগ্নি মাতার মুখদর্শনের অস্ত্র
বাঁধে হইয়া তাঁহার মুখ হইতে ঘোমটা সরাইয়া
ক্যালে; তখন মাতা পুনঃপুনঃ শিশুটির
সমুদয় করেন। শিশু যেমন মাতা’কে

চার, মাতাও তেমনি শিশুকে চান; প্রোক্ত-
মণ্ডলী যেমন পারককে চান, পারকও
তেমনি প্রোক্তমণ্ডলীকে চান। জীবাত্মা
যেমন পরমাষ্ট্রাকে চান, পরমাষ্ট্রাও তেমনি
জীবাত্মাকে চান। পরমাষ্ট্রা তাই এক শক্তি-
ধারা জীবাত্মাকে আপনা হইতে পৃথক্
মনে করাইয়া তাহার দর্শনমুখা আগাইয়া
তোলেন, আর-এক শক্তিধারা সেই কুখার
অর হইয়া জীবাত্মার নিকটে প্রকাশিত হ’ন।

অতএব জীবচৈতন্য যে আপনাকে
ব্রহ্মচৈতন্য হইতে পৃথক্কৃত মনে করে,
তাহা তাহার মনে করিবারই কথা; কিন্তু
তাহা সঙ্গেও ব্রহ্মচৈতন্যের একতাহুত্রে সমস্ত
জীবচৈতন্যের পরম্পরের প্রতি, সর্বভূতের
প্রতি এবং সর্বমূল্যধার ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতি
প্রাণের টান রহিয়াছে মর্শে-মর্শে নিশ্চুট।
সেই প্রাণের টান যোগের প্রবর্তক। কিন্তু
অখারোহীর হস্তে চাবুকও চাই, রাশও চাই;
অখের প্রবর্তকও চাই, নিয়ামকও চাই।
যোগের প্রবর্তক যেমন প্রাণের টান, যোগের
নিয়ামক তেমনি জ্ঞানের অধ্যাক্ষতা। ব্রহ্ম-
ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম যোগ হ’তে শরীরবদ্ধন;
দ্বিতীয় যোগ হ’তে বিবাহবদ্ধন; তৃতীয়
যোগ কুলবদ্ধন; চতুর্থ যোগ সমাজবদ্ধন;
পঞ্চম যোগ ধর্মবদ্ধন; ষষ্ঠ যোগ ব্রহ্মচৈতন্যের
সহিত জীবচৈতন্যের ঐক্যবদ্ধন। এই সমস্ত
যোগের ব্যাপারকে যদি জ্ঞানদ্বারা নিয়মিত
না করিয়া প্রাপাতকর্মা বুদ্ধিবিভার হস্তে
ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে হিতে
বিপরীত হয়। আশাছি বুদ্ধি “যোগের
বদ্ধন পূর্ব শক্ত করিয়া কাটিতেছি” মনে
করিয়া অন্ধতাসের খনি-কলি করে না একটুও;

কিন্তু নৈবেদ্য কি বিড়ম্বনা—হইয়া পড়ায় তাহা বজ্র-আঁটনির কথা গেলো। আপাতদর্শী বুদ্ধির কর্তাগিরির উপজন্মে একদিকে যে-পরিমাণে রাজভোগের পারিপাট্যে শরীরে মেঘমাংস ঘনীভূত হইতে থাকে, আর-এক দিকে সেই পরিমাণে অস্থিমাংসের সহিত প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া বাইতে থাকে। একদিকে যে-পরিমাণে দাম্পত্যবন্ধনের আঁটা আঁটি হয়, আর-এক দিকে সেই পরিমাণে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের বন্ধন আঁটয়া যায়। একদিকে যে-পরিমাণে কুলবন্ধনের আঁটা আঁটি-গতিকে কোণাস্তমব্যাদা দন্তে ক্ষৌভ হইয়া ওঠে, আর-এক দিকে সেই পরিমাণে উচ্চনীচ শ্রেণীর পরস্পরের সৌহার্দ্যবিনময়ের পথে কাঁটা পড়িয়া যায়। একদিকে যে-পরিমাণে সমাজ-বন্ধনের আঁটা আঁটি-গতিকে লোকাচারকে মাথা'র উপরে চড়াইয়া দেওয়া হয়, আর-এক দিকে সেই পরিমাণে সার্বভৌমিক ধর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। একদিকে যে-পরিমাণে সাম্প্রদায়িক ধর্মবন্ধনের আঁটা আঁটি-গতিকে পৌড়ামি অগ্রযুক্তি ধারণ করে, আর-এক দিকে সেই পরিমাণে সাধারণতঃ মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের ভ্রাতৃত্বব্যবহারের পথে কাঁটা পড়িয়া যায়। এইজন্য বলি যে, ক্ষুদ্রত্বজ্ঞানের নোকার হাল্ আনাড়ি মাঝির হস্তে সঁপিয়া না দিয়া জ্ঞানকে কাণ্ডারীপদে নিযুক্ত করা কর্তব্য; কেন না, ছই ছই পথের ছই-ছই আতিশয়ো (রাগাতিশয়ো এবং তাগাতিশয়ো) মধ্যের পথ দিয়া নোকা চলাইয়া সর্বপ্রকার বোগের সহিত বোগ-রক্ষা করা জ্ঞানেরই কাজ। সত্যদর্শী জ্ঞানের কার্য আপাতদর্শী বিভ্রান্তিকে দিয়া সত্য-

মূল্যে করাইয়া লইতে গেলে কাজেই উদ্ভা-কল ফলে। জ্ঞানকে যদি মন-অশ্বে আরোহণ করানো যায়, তাহা হইলে জ্ঞানভুরদী মন-অশ্বের ক্ষুধা এবং সংবন ছয়েরই প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া রাশ এমনি ঠিকমাকিক বাগাইয়া ধরে যে, ঘোড়া'র চলন এবং সোয়ারের চাপন একতানে মিলিয়া-গিয়া দেখিতে দেখায় যেন ঘোড়া এবং ঘোড়সোয়ার দুই এক, একে ছই। তাহার-পরিবর্তে যদি আপাতদর্শী বুদ্ধিকে মন-অশ্বে আরোহণ করানো যায়, তাহা হইলে বুদ্ধি রাশ টানিয়া ধরিবার সময় এমনি বলপূর্বক টানিয়া ধরে যে, ঘোড়া চলৎশক্তিরহিত হইয়া পা-ছোঁড়া-ছুঁড়ি করিতে আরম্ভ করে; তেমনি আবার রাশ আলগা দিবার সময় এত আলগা হয় যে, ঘোড়া উন্নতবেগে যেখানে-সেখানে ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে। অহঙ্কারে-ভরা বুদ্ধি আপনার গৌ ছাড়ে না, আর, মনের গারে বুদ্ধির সেই অহঙ্কারের বাতাস লাগিয়া মনও আপনার গৌ ছাড়ে না। পক্ষান্তরে, মনের সোয়ার যেমন পরিত্যক্ত জ্ঞান, জ্ঞানের সোয়ার তেমনি সত্য; জ্ঞান সত্যের বাগ মানেন, তাই মনের গারে জ্ঞানের সেই সুবিনীতভাবে বাতাস লাগিয়া মনও জ্ঞানের বাগ মানেন। বুদ্ধির প্রধান একটি দোষ অহঙ্কার। বুদ্ধি তাই আপনাকে জানে বুদ্ধিমান—মনকে জানেনে উন্মাদ; আর সেইরূপ বোধের বশবর্তী হইয়া মনের উপরে কর্তৃত্ব ফলাইতে যায়। মানিলাম মন কিপ, মন উন্মাদ, কিন্তু তাহা বলিয়া যে, মনকে পাগুলাগারদে পুরিয়া তাহার উন্মাদরোগকে রীতিমত পাকাইয়া তুলিতে হইবে, তাহার

কোনো অর্থ নাই। প্রকৃত কথা এই যে, ঠিক একটি মাঝের পথ আছে—তাহা বিভা-বুদ্ধির কঠিন ব্যবহাবদ্ধনের পথও নহে, আর, মনের অসংযত, ক্ষুধিত পথও নহে। মাঝের চক্ষু সেই মাঝের পথ দেখাইয়া ভার। মাঝের চক্ষু যে কোন্ চক্ষু, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বলিয়াছি যে, জীবন্তচেতনের এক চক্ষু মনচক্ষু—তাহা বহির্গত; আর চক্ষু খৌচক্ষু—তাহা অন্তর্গত; মাঝের চক্ষু প্রজ্ঞাচক্ষু—তাহা বোগবুধ অর্থাৎ অন্তর-বাহিরের বোগের প্রতি উদ্বুধ। এই মাঝের চক্ষুই মাঝের পথ দেখাইয়া ভার। এ তো জানাই আছে যে, সেতারের তার বেশী আঁটির বাধিলেও ঠিক সুর বাহির হয় না—কম আঁটিয়া বাধিলেও ঠিক সুর বাহির হয় না। সুর বাধিবার সময় সেতারের কান ক'-কের মুচুড়াইতে হইবে—বাদকের কানই তাহা বলিয়া দিতে পারে, তা বই, সঙ্গীতের ব্যাকরণ তাহা বলিয়া দিতে পারে না। তেমনি বিভিন্ন ধাপের বিভিন্নপ্রকার বোগ কতটা চক্কা বা নরম সুর বাধিলে ঠিক হয়, তাহার মাজানির্ধারণ করিয়া দিবার কর্তা সাধকের অন্তরাশ্রা; তা তির, আর-কাহারো সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কল কথা এই যে, মহেশের আশ্রয়ের গভীরে ব্রহ্মচৈতন্তের আলোক ভাস্কর্য্যাদিত অনলের তার সন্ধ্যাপিত রহিয়াছে; সেই আশ্রয়ের আলোক যখন স্তম্ভিশয়া হইতে গাজোখান করে, তখন তাহারই নাম জানের প্রকাশ বা চৈতন্তের উদয়; আর সেই চৈতন্তের উদয়ই বিভাজ্ঞ পথিককে সেই মধ্যের পথ দেখাইয়া ভার,—যেখানে নানা পথের নানা

কাঁকড়া-বোগ ঐকতানিক বোগে সম্মিলিত। এইরূপ ঐকতানিক বোগ ভিন্ন-ভিন্ন নানা বোগের মধ্যের পথ দিয়া নির্ভাত-নিষ্কল দীপশিখার ভার পরিপূর্ণ মতো থাকে—ব্রহ্মচৈতন্তে থাকে। শাস্ত্রেও লেখা আছে—

যুক্তাহারবিহারত মুক্তচৈত কর্ণহ।

যুক্তবদনবোধত বোগো ভবতি দুঃখহ।

হুৎবেবিনাশক বোগ তীহারি হয়, বাহার আহারবিহার, কর্ণচেষ্টা এবং নিজ্রাজাগরণ, সবতই বোগসমত।

সকল দেশেরই শাস্ত্রে আবহমানকাল হইতে এই একটি কথা খাদের সুরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে যে, অন্তরাশ্রার গভীরতম আকাজকা মিটাইতে পারিবার মতো সার-সত্য বিভাবুদ্ধির বলে পাওয়া যাইতে পারে না; তাহা পাইতে হইলে তাহার প্রধান উপায় চিত্তশুদ্ধি। আমাদের দেশের ব্রহ্ম-জানশাস্ত্রের গোড়াতেই রহিয়াছে যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যক্তিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানে সাধকের অধিকারই জন্মিতে পারে না। জগৎপূজ্য মহাপুরুষ ঈশা বলিয়াছেন যে, শুদ্ধাভ্যাস করণ ব্যক্তিরাই ধন্ত, কেন না, তাঁহার পরমাত্মার দর্শন পাইবেন। আরো তিনি বলিয়াছেন এই যে, বাহার চিত্ত বালকের তার নির্মল, স্বর্ণরাজ্যে তাঁহারই অধিকার। বেদে আছে—“পাণ্ডিত্যং নির্মিত্ত বালোনাদ-তিষ্ঠেৎ”—পাণ্ডিত্য ব্যক্তির-কোঁলরা বালকের তার হইবে। বোগশাস্ত্রে আছে, সবভণের উদ্রেকে সাধকের চিত্ত ব্যক্তির তার নির্মল হইলে তাহাতেই প্রকৃত সত্যের হাপ পড়ে। এই শুদ্ধতার বিহারি বাহ্যিকভাবে উপদেশ

বিবাহের আদার অধিকারও নাই—কন্যতাও নাই। এইজন্য, চিত্তভঙ্গির আদর্শ আমার মাহা মনে হয় পরম উৎকৃষ্ট, তাহাই সংক্ষেপে আপনাদের জানাগোচর করিয়া আভিকার নত্যা আপনাদের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

বহু জলাশয়ের জার ভিতর-বাহির এক হওয়াই আমার মনে হয় চিত্তভঙ্গির প্রধান আদর্শ; আর সেই সঙ্গে আমার মনে হয় যে, পারজাখ্যান চিত্তভঙ্গির পরম সহায়। কেন না, সাধকের অন্তরের ধ্যানের আলোক

বিষয়বস্তুগুলির আগ্রহ আলোকের সহিত একতানে মিলিত হইলে অন্তর-বাহিরের একত্বের সৌধ পথ প্রসূত হইয়া বাইতে পারে। আর, সকল শাস্ত্রই এ বিষয়ে একবাক্য যে, সাধকের অন্তর-বাহির এক হইলেই—প্রাণের চাওয়া, মনের চাওয়া, এবং সুখের চাওয়া এক হইলেই—অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ ব্যাপিয়া এক সত্য প্রকাশমান হয়—ব্রহ্মের দর্শনলাভ হয়, সদানন্দ বিরাজমান হয়, সমস্ত কোষ্ঠ মিটিয়া যায়—

“ভিত্যতে ক্ষয়গ্রহিৎস্বাত্তে সর্বসংশয়াঃ ॥”

শ্রীবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সত্যাবের অন্তরায় ।

হিন্দুসুলমানে সত্যাবস্থাপন—আজকাল আমাদের প্রায় সকল সর্বজনীন সমুদ্রস্থানের সমাহৃত হইয়াছে; মনে মিলিয়া দেখের কাজ রত হইতে হইলেই কতকটা শক্তি এই দিকে ব্যয়িত করিতে হয়। বর্তমান বর্ণেশ্বরত্বের উদ্বাপনসময়েও উত্তমের কিয়দংশ এই দিকে নিবোজিত রাখিতে হইয়াছে। কেন—তাহা তাবিবার বিষয়।

হিন্দুসুলমানের মধ্যে এদেশে বহু-কালাবধি অপূর্ণ সৌহার্দ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।^১ তবু সৌহার্দ্য কেন? দীর্ঘ-কালব্যাপী সংজ্ঞাবস্তুপেক্ষের ফলে এই দুই জাতির প্রকৃতি, ব্যবহার ও ধর্মগত বৈলক্ষ্যের মধ্য হইতে এরূপ একটি

সাম্য ও সামঞ্জস্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, বাহ্য আবশ্যকমত দুহকে সর্বতোভাবে এক করিয়া ফেলিয়াছে—এই সামঞ্জস্যের নিকট হিন্দুর হিন্দুত্ব ভাবারূপে কতকটা পরাজয় মানিয়াছে, মুসলমানের মুসলমানত্বও আপনাকে প্রয়োজনানুরূপ অবস্থান্তরিত করিয়া লইয়াছে। “হিন্দু ও মুসলমানের সমাজের মধ্যে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল, যেখানে সমাজের সামান্যতা মিলিয়া আসিতেছিল। কবীরপন্থী, নানকপন্থী ও নিরঞ্জনীর বৈক্যবস্তুপ্রদায়ী তাহার হৃষ্টান্ত-স্থল। এখনও ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্য-সাধনের প্রক্রিয়া বন্ধ নাই।^২ বস্তুত এই দুই সম্প্রদায়ের আত্যন্তরীণ অবস্থায়

^১ “বঙ্গদেশের বঙ্গবাসী”

^২ “বঙ্গদেশী সমাজ।”

সাম্য ও সম্পর্কহীন সত্যের অভাব নাই।

অপেক্ষাকৃত শক্তিহীনের উপর বল-বত্বের প্রভু-প্রতিষ্ঠা নিতান্তই আভাবিক ও সম্ভবপর। ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থার বিশৃঙ্খলা উৎপাদিত হইয়া তদানীন্তন রাজ-শক্তিকে হীন করিয়া তুলিলেই ভারত-রাজগণের অধিকতর শক্তিসম্পন্ন মুসলমানের আশ্রয়গামিনী হইয়াছিলেন, এই স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্য হিন্দু সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল—তাই আপনার চিরগৌরবময় সিংহাসনে মুসলমানশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া,—বিজয়ী বিজয়মণ্ডিত মুকুটে অতিবেকমালা পরাইয়া হিন্দু কখন আপনাকে ক্ষুণ্ণ বিবেচনা করে নাই। বাহ্যতে মুসলমান-রাজশক্তি ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে ও থাকিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে মুসলমানের সহিত হিন্দুও বখালাধা আপনার শক্তিব্যয় করিতে কুষ্ঠিত হয় নাই। হিন্দু-মুসলমান একই রূপতাকার নিম্নে অবস্থান করিয়া হিন্দু-মুসলমাননির্কীর্ণেবে রাজশক্তির প্রতিকূলে অস্ত্রচালনা করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে। হিন্দু, মুসলমানের হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, এরূপ ঘটনারও অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মোগলশক্তির সহায়তার রাজপুতের বিরুদ্ধে রাজপুতের অসিচালনার উল্লেখ করা বাইতে পারে। ইহা হইতেই উপলব্ধি করা যায়, ভারতে মুসলমানের সহিত হিন্দুদের কতটা বনিষ্টতা সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই একজীবস্থানজনিত অবপ্রভাবী বনিষ্টতা উভয়ের মধ্যে কীদাবনি কীদ

পার্থক্যের রেখাও মুহুরি বিরা ভীষ্মদিগকে কি রাজ্যশাসনের মন্ত্রণাকারী, কি দেশজব ও রাজ্যরক্ষার যুদ্ধযাণারে, সর্বত্রই এক-যোগে নিবোধিত রাখিয়াছিল।

ভারতে হিন্দুশক্তির সহিত মুসলমান-শক্তির অসম্ভাবমূলক কোন সর্বনাশকারী সংঘর্ষ কখন সংঘটিত হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানে যে সকল যুদ্ধবিগ্রহের কথা ইতিহাস বিবৃত করে, তাহা রাজশক্তিস্বাভা-বিক্রমে প্রতিলিপিত। রাজকীয়-কমতালভের এই প্রতিবন্ধিতাই রাজপুত ও মারাঠা শক্তির সহিত মুসলমানশক্তির সংঘাত ঘটাইয়াছিল,—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সত্য ও সমতার অভাব ছিল বলিয়া নহে। রাজশক্তি করকবলিত করিতে মুসলমানের সহিত মুসলমানের সংঘর্ষ যেমন ঘটতে পারে, হিন্দুর সহিত হিন্দুর সংঘর্ষ যেমন সম্ভবপর, তেমনি মুসলমানের সহিত হিন্দুর সংঘর্ষ কোন অংশেই বিচিত্র বিবেচিত হইতে পারে না। প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দি—রাঠোররাজ জয়চন্দ্রের সহিত চৌহান পৃথী-রাজের যে সর্বনাশকারী সমর হিন্দুশক্তির হীনতা সাধিত করিয়া ভারতে মুসলমানকমতা-স্থাপনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল, তাহা কি হিন্দুদের উপর হিন্দুদের বিদ্বেষপ্রসূত? পক্ষান্তরে, মোগলেশমশক্তিক্রমে আরব-তুরকের কথা দূরে থাক—এই ভারতবর্ষেই মুসলমানের সহিত মুসলমানের সংঘাত-দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। শেষপূর্বের হর্দ্বর্ষ আক্রমণে অব্যবহিত হইয়া মোগলসম্রাট হুমায়ুনকে পথে পথে কিরিতে হইয়াছিল—সেটা কি মুসলমানের উপর মুসলমানের

বিষেবেই ফলে, না এক রাজশক্তির উপর
অন্য রাজশক্তির প্রভুত্বধারণের চেষ্টা ?
যতাবত রাষ্ট্রশান্তিপ্রিয় আকবরকেও
আহমদনগরের বীররমণী চাঁদহলতানার
বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিতে হইয়াছিল
কেন ? মুসলমানগণকব সত্ৰাট আওরঙ্গজিব,
মুসলমান বিজাপুর ও গোলকুণ্ডারাজের
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়া কি মুসলমানের
সহিত মুসলমানের অসন্তোষের পরিচয় দিয়া-
ছেন, না মোগলের রাজকীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ
রাখিবার জন্যই তাঁহাকে এইরূপ করিতে
হইয়াছিল ? ফলত রাজা বা রাজশক্তিজাতের
বে আকাজকা, তাহা সজাতিগত বা বিন্দ্যান্তি-
গত সাম্যবৈলক্ষণের বিচার করিয়া অসি-
গ্রহণ করে না। তাই, ভারতে হিন্দু-মুসল-
মানের বে সকল সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, তাহা
মুসলমানদের উপর হিন্দুদের আক্রমণ নহে
—তদানীন্তন রাজশক্তিকর্তৃত্বকরণের
প্রায়সমাত্র। রাজশক্তি তখন মুসলমানের
হস্তে স্তম্ভ ছিল বলিয়াই হিন্দুকে মুসলমানের
সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল—অন্তথা হিন্দুর
সহিত হিন্দুর সংঘর্ষের কথাই তনা যাইত।
বস্তুত, বিগ্রহবর্ষণের বে নীতি মুসলমান শের-
খাকে মুসলমান হুমায়ূনের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ
করিতে প্ররোচিত করিতে পারে, রাজপুত ও
মারাঠাশক্তি সেই নীতির অনুসরণ করিয়া
মুসলমানশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইলে
তাহা কখন বিজাতিবিষেবেই হুঁচক বুলিয়া
বিবেচিত হইতে পারে না।

ভারতে মুসলমানভাষ্যবিপর্যয়ের শেষ
পট্টা হইতেও হিন্দু-মুসলমানের সমপ্রাণতা
ও একযোগ কার্যকারিতার বেশ একটা

(মর্ম্মস্পর্শী!) স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।
হিন্দুর সহিত আপনাত্মক শক্তি মিলিত করিয়া,
রাজকাব্যে হিন্দুর আন্তরিক সহায়তা লাভ
করিয়া, বে মুসলমান ভারতে আপনাত্মক রাজ-
কীয় মহিমা পর্যন্তপ্রমাণ উন্নত করিয়াছিল,
নিদারুণ অধঃপতনের সময়েও মুসলমান সেই
হিন্দুসহযোগী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাব্যে
আগুয়ান হয় নাই। তাই ব্রাহ্মমতি মির-
জাকীর যখন সিরাজের মন্তক হইতে মুকুট
কাড়িয়া লইয়া ইংরাজের শিরে পরাইবার
উপক্রম করিল, তখনও সে তাহারই মত
কুতূহলমুগ্ধ কতকগুলি হিন্দুপ্রধানের সহায়তা
প্রাপ্ত করিতে অবহেলা করে নাই। পক্ষা-
ন্তরে, প্রভুতন্ত্র হিন্দুশক্তি মোহনলাল ও
মিরমদনপ্রমুখ বিশ্বস্ত বীরের আশ্রয়গ্রহণ-
পূর্ব্বক মোসলেমপ্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যথা-
সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের
একযোগ সহায়তা গ্রহণ করিয়াই ইংরাজ
হিন্দু-মুসলমানের প্রভু হইতে পারিয়াছেন,
তাই ভারতের তাজ আজ—মুসলমানেরও
নয়, হিন্দুরও নয়—ইংরাজের শির শোভিত
করিতেছে। • হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই
এইরূপে মতিচ্ছন্ন না হইলে আজ ভারতের
ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত না, কে
বলিতে পারে ?

বিজিত ও বিজেতার মধ্যে সাম্য ও সত্যবির
সংস্থাপিত না হইলে, বিজয়ী শক্তি বতই বিপুল
হউক না, রাজধর্ম্ম কখন তাহাকে নীর্থ-
কালের জন্য কোথাও প্রতিষ্ঠা দিত থাকিতে
দেয় না। মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে রাজ্য-
প্রজাগত্ব স্থাপিত হইবার পর যদি ক্রমে
তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও

অগ্ররূপ না হইত, তাহা হইলে মুসলমান আপনাকে ভারতীয় রাজতন্ত্রে একত্বিন অতিবিক্ত রাখিতে পারিত কি না, সন্দেহ। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সাম্যের জন্ত বস্তুতই কোন নুতন সরঞ্জাম করিতে হইবে না।

হিন্দু-মুসলমানে সত্তাব সংস্থাপিত করিতে হইবে—উদ্বেগুটা যতই সাধু ও সরল হউক না কেন, যে পক্ষ হইতে প্রথম এই সুরটী ভাঙা হয়, তাহাকে কখনই ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী-দলিয়া বোধ হয় না—আমাদের মনে হয়, আমাদের কতি সাধিতেই কোন শত্রুপক্ষ আমাদের মধ্যে এইরূপ খুঁয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। সত্তাবের অভাব ঘটিলেই সত্তাবস্থাপন আবশ্যক হইয়া পড়ে—সত্তাব যেখানে অত্যন্ত নিকট, সেইখানে সত্তাবস্থাপনচেষ্টার সাধকতা নাই। কোন সৌম্য-শান্ত নির্বিক্র-নিশ্চিন্ত পক্ষের মধ্যে, কোথাও কিছু নাই, যদি হঠাৎ শাস্তিরকার খটা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহা সেই পল্লিবাসিগণের মনে ক্রান্ত আশঙ্কা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া যেমন তথায় একটা উল্লম্ব অশান্তি ও বৈষম্য উৎপাদন করে, সেইরূপ আবহমানকাল হইতে শ্রীতিবদ্ধ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে, শ্রীতিস্থাপনের চেষ্টাও তাহাদিগের মধ্যে শ্রীতির অমূলক অভাবজ্ঞান উৎপাদিত করিয়া তাহাদিগকে উত্যক্ত করিয়া তোলে, ইহা বিচিৎ্র নহে। অকৃত অজ্ঞে প্রশমন-প্রলেপের আরোজনে পরীর্ণ সত্তাবতই আপনার ব্যাধিহীনতার সন্ধিহীন হইয়া পড়ে। হুঃখের বিষয়, হিন্দু-মুসলমানে শ্রীতিস্থাপনের এই চীৎকারও সম্পর্কিত সমাজবয়ের ভিতর একটা অশান্তির

ভাব আনয়ন করিয়াছে। রাজশক্তি তৃতীয় হস্তে না থাকিলে অবস্থা তির্যস্তুষ্টি গ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু যে সময়ে হিন্দু-মুসলমান তুল্যরূপে একই বিজাতীয় শাসনচক্রের আবর্তনবিবর্তনের মধ্যে পতিত, সেই সময়ে এই শ্রীতিস্থাপনের প্রয়াসে অপেক্ষাকৃত শক্তিসম্পন্ন প্রজা হীনবল অপর প্রজাটির প্রতি আপনার সঙ্গত যথাযথ ব্যবহারে সন্ধিহান হইয়া পড়িয়াছে। (বর্তমান সময়ে বিদ্ভা, বুদ্ধি, চিত্ত, সর্ববিষয়েই হিন্দু মুসলমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে বোধ হয় দ্বিমত নাই।) তাই, যেমনি এই উয়ের মধ্যে ক্রান্ত অগ্রির ব্যবহারের প্রতিকারপন্থা পরিগৃহীত হইল, অমনি অপেক্ষাকৃত উন্নত হিন্দু মনে করিল, সে হয় ত হীনবল মুসলমানের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। লুপ্তবিবেক মুসলমান ভাবিল, তবে বাস্তবিকই হিন্দু তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে—নচেৎ প্রতিকারের চেষ্টা আবশ্যক হইল কেন? কলে ইহাই হইয়াছে যে, শিক্ষা-মহোদয় উদীয়মান সমাজটি কিছু-বা লজ্জিত কিছু-বা অমৃতপ্ত হইয়া ভবিষ্যদ্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন-পূর্বক যতই চিত্ত ও বিজ্ঞানবলীন অন্তঃসম্প্রদায়টিকে আপনার শ্রীতিপ্রসারিত বাহুধরে বেষ্টিত করিতে বাইতেছে, ততই সে আপনার বিবেকহীনতার ফলে আপনাকে দূরে অপসারিত করিতে চেষ্টা করিতেছে—নিরতির অগ্রসরীনের নিয়মে অধুনা তাহার ভাগী যে উহার সহিত একই নৃশূলে আবদ্ধ, উহা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করা যে নিতান্তই অসম্ভব, এ কথা উপলব্ধি করিবার দর তাহার নাই। আশা এই যে, রাজ্যধারে

তাহার অল্প বিশিষ্টভাবে তিকাদানের বন্দোবস্ত হইবে। কিন্তু একবার নয়, বারবার যে সে আপনায় বর্তমান ভাগ্যদেবতার দ্বার হইতে নৃত্ত তিকাদাও হস্তে করিয়া ফিরিয়া আসি-
রাছে, তাহার মজাগত জড়তা এ কথা তাহাকে আদৌ স্মরণ করাইতে পারিতেছে না। সুশিকার অক্ষণকিরণ যতদিন না এই জড়তার আবেশ তাক্রিতে পারে, ততদিন পর্যন্ত মুসলমানের চেতনা হইবে না।

সুতরাং হিন্দু মুসলমানে প্রীতিস্থাপন-
প্রয়াস অল্পমুখ হইয়া তির অংকার ধারণ করিলেই আশাভ্রমারী ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

রাজশক্তি মুসলমানহত্যা হইলে নূতন অভ্যাগতের কুহকমত্রে হিন্দু যেমন আপ-
নাকে ভুলিয়াছিল, তেমনি সে মুসলমানের দিকেও লক্ষ্য করিতে পারে নাই—এ কথা যথো হিন্দুও অস্বীকার করিবে না। যুগপৎ রাজশক্তি ও হিন্দুর সহায়তা হারাইয়া মুসলমানকে একেবারেই অবসর ও হীনবল হইতে হইরাছে। এখন মোহ কাটিয়া হিন্দুর চক্ষু হুটিরাছে, তাই আত্মশক্তির পুনরিকাসের পথে আবলম্বন ও আত্মনির্ভরতার আবশ্-
কতা অস্বীকার হইতেছে—কিন্তু এদিকেও অকাল বাধিরাছে। এখন দেখা যাইতেছে, কোন প্রতিকূল শক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষার চেষ্টায় এক হাত-উঠে, অন্যটি উঠিতে পারে না;—সেটা যেন শিথিলতা ও জড়তার অবস্থা—এই ব্যাধির চিকিৎসা আবশ্যক। রীতিমত শিকাবল না পাইলে মুসলমান কখন হিন্দুর সহিত আত্মোন্নতি-উদ্দেশ্যে যোগদান

করিতে পারিবে না। হিন্দু মুসলমানে প্রীতি-
স্থাপনাকাজী আগ্রহের কতকটা এইদিকে পরিচালিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। দুইটা হাতই সবল থাকিলে হীন ও রক্ষণ উভয় কাজই চলিতে পারে, কিন্তু একটি বল-
হীন হইলেই, হীন ত সত্ত্ববশ হইয়া না, রক্ষণও দুর্বল হইয়া পড়ে।

বাঙালী বিভক্ত হইল অর্থাৎ বাঙা-
লকে ভাগ করা হইল—অন্ত কথা, হিন্দু হইতে মুসলমান এবং মুসলমান হইতে, হিন্দু কতকটা বিচ্ছিন্ন হইল—একের উন্নতি অন্তের উত্তম-অমূল্যলনের বিষয়ভূত রহিল না। একের অবনতিতে অন্তের শক্তি ব্যয়িত করিবার আবশ্যকতা ঘূঁরিয়া গেল—সমগ্র বাঙালীর সমস্ত হিন্দু মুসলমান লইয়া একটা বাঙালীজাতি (Bengalee Nation)-
গঠনের সম্ভাবনা রহিল না। এখন সম্ভব হয়, নূতন ব্যবহার, নূতন ধরণে, হিন্দু, তুমি আপ-
নাকে একটা স্বতন্ত্র জাতি (Nation)-রূপে পরিণত কর—আর মুসলমান, তুমিও তোমার মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে জাতীয়তাস্বষ্টির সরঞ্জাম করিতে থাক। সোজা ও সরল কথায় এই ব্যবচ্ছেদের বন্দোবস্ত এইরূপ। এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে, এমন সোজা ব্যবহার বিকল্পে এরূপ তীব্র প্রতিবাদ উঠিল কেন? হিন্দু বাঙালী বুঝিল, মুসলমান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে শক্তিশীল হইবার যে কল্পনা, তাহা নিতান্তই অসার ও তিক্ত-
শূন্য—সংস্রাবিকবর্ষব্যাপী সংস্রব ও সম্পর্ক-
জনিত সাম্যের সূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়া একে-
বারে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা সত্ত্ববশ বা বাহনীর হইতে পারে না। মুসলমানের

মধ্যে বাহারা শিক্ষিত বা অন্তর্নিহিত উপায়ে কতকটা প্রকৃতির, তাহারিও বৃদ্ধিগেল, একল পাক্ষিক্যের রেখা টানিয়া আলাহিদা থাকা তাহার পক্ষে সুক্তিবৃত্ত বা প্রশস্ত নহে, বরঞ্চ ইহা মুসলমানের পক্ষেই বিশিষ্টরূপে অনিষ্ট-কর। সরকারবাহাদুর কিন্তু বরাবরই ইহার উর্টা বৃদ্ধিতেছেন ও বলিতেছেন—(সরকারী হিসাবে) হিন্দুও অবুঝ, মুসলমান ত (অশিক্ষিত, অত্যাচার) অজ্ঞ আছেই।

বাহা হউক, অবুঝ হিন্দু-মুসলমান বৃদ্ধি না, তাই বাঙালী বিতর্ক হইলেও বাহাতে তাহাদের মধ্যে কোন অমিল না ঘটে, বাহাতে তাহাদের মধ্যে সাম্যশক্তি ক্ষুদ্র হইয়া কলহবিবাদের অবতারণা না করে, সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায় ও পন্থা উদ্ভাবিত হইতেছে। গত অগ্রহায়ণসংখ্যার বঙ্গবর্ষের “বঙ্গভ্রমে বঙ্গের ব্যবস্থা”র প্রভেদ লেখক “হিন্দু-মুসলমানে তীব্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতা আগাইবার আয়োজনের” প্রতিবিধান-কল্পে করেকটি সুচিন্তাশ্রুত অবলম্বনীয় ব্যবস্থার নির্দেশ করিয়াছেন। ব্যবস্থাবলি প্রবোধ লেখকের পরিপক্ব বুদ্ধির উপযুক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে তাহার নির্দিষ্ট উপায়গুলি অবলম্বিত হইবার পক্ষে শিক্ষিত ব্যক্তিকেই উপলব্ধি করিতে হয়। লেখক বলিতেছেন, “হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ হইবার এক মূত্র ‘সরকারী চাকুরী’—‘সুদূরপরিভ্রম উচ্চিষ্ট মাংসখণ্ড’-জানে ‘ইন্ডোভার উচ্চিষ্ট সামান্য রাজকর্মলাভের নোডক’ এই করিতে হইবে। কথটা প্রবোধ-কোমলত সুবুদ্ধির পরিচায়কই বটে। কিন্তু মুসলমানের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি না

পাইলে কখন এই উপায় কল্যাণ হইতে পারে না। চাকুরীর লোভেই হউক বা বেজবুজ হউক, বিভ্রান্তকর্মে করিতে বসবান হইয়া হিন্দু বতটুকু শিক্ষা পাটরাছে, তাহাতে অন্তত তাহার এই জ্ঞানটুকু জন্মিরাছে যে, ডিগ্রিলাভ করিলেই চাকুরীলাভ ঘটে না—ভারতে ইংরাজের রাজস্ব ইংরাজী বিভাগ মাত্রই অর্থকরী নহে, সে বিভাগও ভিন্ন ভিন্ন আকার আছে। তাই হয় ত এখন শিক্ষিত-বহুল হিন্দুসমাজ সরকারী চাকুরীকে স্থগার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে। মুসলমানের মধ্যেও এখন শিক্ষা সমাক্ষ প্রসারলাভ করিবে—যখন মুসলমান বৃদ্ধিবে, বি.-এ. পাস করিলেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া যায় না—যখন ৩০টাকা বেতনের কোন রাজকর্মের শতজন এম্.-এ. হিন্দুর সঙ্গে অন্তত পঞ্চাশজন মুসলমান এম্.-এ.-রও আবেদন পড়িবে, তখন আর কাহাকেও কিছু বলিতে হইবে না—তখন মুসলমানের লোলুপমুষ্টি আপনা হইতেই সরকারী চাকুরীর দিক হইতে প্রত্যাহত হইয়া অন্তর্য পতিত হইবে। এখন যে মুষ্টিমের শিক্ষিতমুসলমান রাজকার্য-প্রাপ্তির প্রলোভনে মুগ্ধ হয়, সেটা অর্থ-তাবিক বা বিচিহ্ন নহে।

উক্ত প্রভেদ লেখকের মতে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বাধিবার অপর মূত্র :—“সরকারী অবৈতনিক সম্মানার্থ পদ ও খ্যাতি”। অতএব “রাজারি খেলাতবেতাব আদার দাসের চিত্র বলিয়া স্থগার চক্ষে দেখিব”। এই মূত্রে হিন্দুর সহিত মুসলমানের বিশেষ কোন বিবাদের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না, তাহার কারণ আছে। এককত আদা-

যের বেশে রাজত্ব করিলে তাঁকার প্রবাহ না গিলিলে রাজপথে তাব পাইবার সভাবনা খুব কম—মুসলমানের অর্থভাব, তাহাকে হিন্দুর সহিত এ ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডারমান হইতে দিবে না। তা ছাড়া, রাজসম্মানলাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতি সংকীর্ণসীমায় আবদ্ধ থাকে, তাহাতে সাধারণের মধ্যে কলহ বা মনামালিক্য উৎপন্ন হইবার সভাবনা থাকে না। যে ছইচারিজন লোক রাজপথে বের কর্তৃত্ব লাভ করিত হন, তাঁহাদিগকে ঘুরার চক্রে দেখা কেবল—তাঁহাদিগের প্রতি একবারে চক্ষু মুদ্রিত করিলেও চলিতে পারে। এতদ্ব্যতীত মোটের উপর বিবেচনা করিলে, রাজ্যের খেলাপথে তাবকে ঘুরার চক্রে দেখা সামান্য শিক্ষাবলের কার্য নহে—ইহার অল্পরূপ শিক্ষাবল মুসলমানের হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

“মুসলমান হিন্দুর এই প্রাচীন সৌখ্য নষ্ট করিবার চেষ্টার” প্রতিরোধকরে, “বঙ্গদেশে বঙ্গের ব্যবস্থা”র লেখক আরও বলিতেছেন—“হিন্দুদিগের মধ্যে মুসলমানের ও মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর সাহিত্য ও সাধনার সম্যক প্রচার করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত তত্ত্বজ্ঞানীকে পরস্পরের প্রতি প্রত্যাশা করিতে হইবে।” এই সারবান্ উপায়ের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া আমরাও ইতিপূর্বে এ কথা বারবার বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখানেও “শিক্ষিত তত্ত্বজ্ঞানী” লইয়া কথা। অথুনা হিন্দুর চক্রে আপনাকে জগতের শিক্ষাওরূপে পরিচয় পাইবে, এমন কথটা মুসলমানের নাই—শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার এই পক্ষি আসিবে,

আশা করা যায়। মুসলমানের এই চিত্ত ধুঁজিয়া লইতে হিন্দু একটু চেষ্টাবান্ হইলে ভাল হয়। এই উদ্দেশ্যে অন্তত একটুকু পারীক্ষা আবশ্যক হইয়া পড়ে। বারান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

প্রাচ্যের প্রবোধ বিজ্ঞাননির ধূলিসাৎ করিয়া অথুনা ভারতে পাশ্চাত্যধরণে যে নবীন শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহার প্রাঙ্গণে পাঠরত বিদ্যার্থীর বিজ্ঞা সম্পূর্ণতা লাভ করিতেছে না—তাহার জ্ঞাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়াও সে আপনাকে সম্যক সমুদয় করিতে পারিতেছে না—লোকশিক্ষার সহিত লোকপ্রকৃতির যে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী সে সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য রাখে না—আমাদের শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না—তাই আমাদের উপযোগী, শিক্ষার নুতন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়াছে। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী যদি ভারতে হিন্দুর উন্নতির অন্তরায় ঘটাইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা মুসলমানের মধ্যে আরও শোচনীয়রূপে আপনার অনিষ্টের বীজ উগ্ঠ করিবে। মুসলমানের শিক্ষিতজীবনের এখনও বালাবস্থা—অতরাং শিক্ষার এই নুতন অনুষ্ঠানে মুসলমানের শিক্ষার কোন বিশিষ্ট ব্যবস্থা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। মুসলমানপক্ষ হইতে এখন একটা দাবী হয় যে অন্তর আকার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—কিন্তু যেখানে প্রতি-কারপ্রাপ্তির আশা থাকে, অভাবজনিত দীনতা সেখানে সঙ্কোচ ও লজ্জার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া থাকিবে—কিন্তু যেখানে প্রতি-কারপ্রাপ্তির আশা থাকে, অভাবজনিত দীনতা সেখানে সঙ্কোচ ও লজ্জার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

বোধ করে না—করিলেও চলে না। জাতীয় এ বিষয়ের বিহিত ব্যবস্থা নির্দেশ করা শিক্ষাসমিতি এখনও গঠনের পথে—বথাসময়ে বাইবে।

মোহাম্মদ হোসেন উল্লাহ।

তীতসম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

আজকালকার বাংলা সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রায়ই তীতসম্বন্ধে কিছু-না-কিছু গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি পড়িলে মনে হয়, তীতের মত লাভের জিনিস আর নাই। বলা বাহুল্য, লেখক অধিকাংশ-স্থলেই হয় কোন সখের (amateur) তত্ত্ব-যায়, নয় তত্ত্বগুণে আকৃষ্ট স্বদেশপ্রেমিক যুবক। ইহাদিগের গবেষণার উদ্দেশ্য আর বাহাই হউক, প্রধান—দেশে তীতের বহল-প্রচলন। উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু তাহার সফলতা কি-পরিমাণ হইরাছে বা অবিলম্বে হওয়ার সম্ভব, তাহা বলিবার শক্তি এখনো কাহারো নাই। তবে, ঐ-শ্রেণীর পত্রের বা প্রবন্ধের একটি প্রত্যেক, কল আমরা দেখিতেছি। অনেকে দু'একখানি করিয়া তীত বসাইয়া তাহাতে সাধারণের বরন-কার্য্য শিখিবার বন্দোব- করিয়া দিয়াছেন। বাংলার পূর্বপশ্চিমবঙ্গের সুদূরবর্তী পল্লি হইতেও ভ্রমসন্ধানগণ এই সকল স্থানে আশিরা উৎসাহের সহিত তীতের সকলরকম কাজ শিখিতেছেন।

সংবাদপত্রের স্তম্ভে অঙ্ক-কবিরা দেখান হইরাছে—শ্রীরামপুরের তীতে উত্তম প্রমাণ-ধূতি দৈনিক একজোড়া (কাহারো কাহারো

হিসাবে দুইজোড়া) বোনা যায়; সুতরাং মাসে অনানু-জিশজোড়া, বোনা গেল, এবং তাহার মজুরী জোড়া প্রতি এক হইতে দেড় টাকা হিসাবে ধরিলে মাসে জিশ-চল্লিশ টাকা আয় হইল, ইত্যাদি। উৎসাহীল শিক্ষা-নবিশগণ কার্য্যক্ষেত্রে আশিরা দেখিতেছেন যে, সুনিপুণ তীতিশিক্ষকও শ্রীরামপুরের তীতে আটঘণ্টার পরিশ্রমে প্রমাণ মাঝারী ধূতি একখানির বেশী কিছুতেই নামাইতে পারিতেছে না। ইহার উপর সূতা "পাট" করা, "পোড়েনের" সূতার "নলী-কাটা," "টানা-কাড়ান" ইত্যাদি অনেক সময়-সাপেক্ষ কাজ করিয়া না লইলে বুনি চলিতেই পারে না। অর্থাৎ একখানি তীতে একজন তীতী দৈনিক একখানি করিয়া ধূতি বুনিবার চেষ্টা করিলে, জোগাড়ী কাজের অন্ত আর একজন লোককে সম্পূর্ণ-সময় শুধু ঐ কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতে হয়। অর্থাৎ পনরজোড়া কাপড় বুনিয়া পনর-কুড়ি টাকা উপার্জন করিতে হইলে দুইজন লোককে-অনন্তকর্ম্ম হইয়া ঐ কাজই করিতে হয়। তত্র শিক্ষানবিশের এই জানলাত হইবারাজ নিকৃৎসাহ হইয়া পড়া অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বাস্তবিক পক্ষে, তীতের প্রসরবুদ্ধি করিবার যে পদ্ধতি সম্প্রতি আমাদের দেশে অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা মূলেই ভুল। যে-কোন একটা ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হইলে, সেই ব্যবসায়ের উৎকৃষ্ট লাভজনক কোন একটি কারখানার বাইতে হয়। কারখানার পদ্ধতি দেখিয়া যেমন শিক্ষানবিশের সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তেমনি সেই সঙ্গে কি উপায়ে লাভবান হইতে পারা যায়, তাহাও শিক্ষা করে। যদি তীতে কাপড় বুনিবার কোন কারখানা স্থাপিত হইত এবং তাহাতে বেশ লাভজনক ব্যবসায় চালাইতে পারা যাইত, তাহা হইলে সেখানে গিয়া শিক্ষানবিশ অনেক বেশী শিখিতে পারিত, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি তীতীর বাড়ী ভিন্ন সেরূপ ব্যবসায় আর কোথাও দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু তীতীর বাড়ীতে যাইয়া যাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি; সামান্য লাভের প্রত্যাশা থাকিলেও তীতিগণই তাহাতে তুষ্ট হইতে পারে, সেরূপ মহুরী উপার্জনের জন্ত যে অধিক লোকে যুঁকিবে, তাহা বোধ হয় না।

আমত কথা, বিদেশী কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আপামর সাধারণের বস্ত্রের জোগাড় তীত হইতে করাটতে হইলে, তীতীদিগের সনাতনপদ্ধতি ধরিয়া রাখিলে সে আশা শীঘ্রই ছরশা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রচলিত পদ্ধতির দ্বারা ঐ প্রতিযোগিতা চলিতে পারে না বলিয়াই তীতীর ব্যবসায়ের এত দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। তীতীর আপনাদিগের তীতের জন্ত যে সূতা আব-
শ্যক হয়, তাহা নিজের বাড়ীর জীলোকের

দ্বারা “পাট” করাইয়া ও অন্ত্যস্ত জোগাড়ী কাজ জীলোক ও বালকের দ্বারা করাটয়া লইয়া তবে সে তীত চালাইতে সক্ষম হয়। শ্রমবিভাগ দ্বারা অতি অটল কার্য ও সরল ও স্বল্পত হইয়া থাকে, ইহা অর্থনীতির প্রতিপন্ন সত্য। তীতের দাবী সে নীতির ব্যতিক্রম হইবার কোনই কারণ নাই। যদি কোন উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া স্বতন্ত্ররূপে “পাট” করিবার কার্যনির্বাহের বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে কাপড়ের মূল্য আপনাই হইতেই কমিয়া আসিবে। তীতিগণ যে উপায়ে সূতা “পাট” করিয়া থাকে, তাহা শ্রীযুত হেনরি বোম মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তকে অতি উত্তম করিয়া বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে একএকটি করিয়া সূতা মাড় দিয়া “মাড়ার” প্রদান হয়; সূতার প্রাতি সূতাই সমানভাবে “পাট” হইয়া যায়। অন্ত্যস্ত সরু সূতার পক্ষে বোধ হয় এইরূপ “পাট” অপরিহার্য; কিন্তু মোটা সূতার জন্ত প্রাতি সূতার উপর এতটা মনোযোগ না দিলেও চলিতে পারে বলিয়াই মনে হয়। সূতা মাড় দিয়া “পাট” করিবার জন্ত কয়েকটি কল সম্প্রতি এখানেই উদ্ভাবিত হইয়াছে; বিলাতে বরাবর কলে “পাট” করিবার বন্দোবস্তই চলিত আছে। এখানকার নবাবিকৃত কলগুলি পরীক্ষায় ক্রমশঃ উত্তরাইয়াছে; তাহা এখনো জানা যায় নাই। কিন্তু এইরূপ কলে যে কার্য বহুতর সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পত হইবে, তাহাতে অণুমান সন্দেহ নাই। তবে একখানি তীতের জন্ত এইরূপ সূতা মাজিবার কল অথবা “টানা দেওয়া”র কল রাখিলে ঐ সরল কলের

যথেষ্ট কাজ বিতে পারা যায় না। অধিক-
সংখ্যক তাঁত একত্রে চলিলে, তাহাদের
জোগাড়ী কাজ সরবরাহ করার জন্য এই
সকল কলের দ্বারা যথেষ্ট ব্যয়সংক্ষেপ হইবার
কথা।

মাত্রাজ শিল্পবিভাগের অধ্যক্ষ ক্রীষ্ণ
চ্যাটার্জীনাথের সম্প্রতি ভারতীয় বস্ত্রশিল্প-
বিষয়ে এক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন।
বিবরণীর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে,
ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্প সর্বাধিক গভীর মধ্যে
থাকিয়া চূর্ণশাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। একএকটি
স্বতন্ত্র পরিবার লইয়া একএকটি কারখানা
গঠিত এবং তাহাতেই তাহার পর্যাবসান;—
প্রসারিত হইবার কোন সুযোগই নাই। এই
সকল ক্ষুদ্র কারখানার অভাবমোচনের জন্য
সমর-ও-প্রসংক্ষেপকারী কোন কোন
অবলম্বনের অবকাশ বা চেষ্টা ইহাতে সম্ভব
নহে। যদি এই সর্বাধিক পদ্ধতি পরিবর্তিত
হইয়া বহুসংখ্যক তাঁত লইয়া বাণিজ্য-
মোদিত পদ্ধতি (commercial method)
অনুসারে একএকটি কারখানা স্থাপিত হয়
এবং তাহার জোগাড়ী কাজ সরবরাহ করিবার
জন্য একএকটি স্ত্রী মজিবার কল তাহাতে
সংলগ্ন করা হয়, তাহা হইলে এই সকল
কারখানা অত্যন্ত লাভজনক হইতে পারিবে
এবং বিদেশী কলের কাপড়ের সহিত তাঁতের
কাপড় প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে
পারিবে—ইহা চ্যাটার্জীনাথের দৃঢ়-
বিশ্বাস। তাঁতিগণ যেরূপ বলিয়া বাঁহা উপা-
র্জন করতে সক্ষম হয়, তাহার অপেক্ষা

কিছু কিছু বেশী মজুরী দিয়া এইরূপ কার-
খানার কাজ করাইয়া লইলেও মোটের উপর
লাভ থাকিবে। বাইবে, ইহার সম্ভব
হয়।

আমাদের দেশে সম্প্রতি তাঁতের কার্য
ভ্রমসন্ধানকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা অপেক্ষা
এইরূপ ছোট ছোট কারখানা খুলিয়া তাঁতের
কাপড় হুলত অথচ তাঁতীকে লাভবান করিবার
চেষ্টা করা অনেক অধিক আবশ্যক হইয়াছে।
তাঁতের পাঠশালা (।) বাঁহা খুলিয়াছেন,
তাঁহাদের কর্তব্য—শিক্ষাগারগুলি কাপড়
বুনিবার কারখানায় পরিণত করেন ও
উৎপন্ন কাপড়ের মূল্যদ্বারা লাভ করিবার
উদ্দেশ্যে প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখেন। তাঁহারা
নিজেই যদি এ কার্যে লাভ করিতে না
পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রলুব্ধ ছাত্র-
গণকে তাঁত নাড়াচাড়া করিতে শিখাইবার
যে কি উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

স্ত্রী মজিবার স্বতন্ত্র কারখানা স্থাপিত
হইলে আরো অশেষপ্রকারে বস্ত্রশিল্পের
সাহায্য হইতে পারে। মাড়-মেওরা স্ত্রী
কিনিতে পাইলে, আপানের দ্বারা আমাদের
দেশেও বহুসংখ্যক উৎসাহী গৃহস্থ যে ঘরে
তাঁত রাখিয়া নিজের বস্ত্রের অভাব কতক-
পরিমাণে মোচন করিবার চেষ্টা করিবে,
তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেরূপ যদি কতক-
পরিমাণে অভাবমোচনের জোগাড় করিয়া
রাখা যায়, তাহা হইলে বাজারের আমদানির
উপর নির্ভরের ভাব অনেকটা কমিয়া
বাইবারই সম্ভাবনা অধিক। এবং যে-পরিমাণ

* কারখানার পদ্ধতি চলিতে আরম্ভ হইলে এবং মাড়-মেওরা স্ত্রী কতদূর পর্যন্ত কিনিতে পাইলে,
ভ্রমলোককে তাঁতের কাজ শিখাইবার সার্বিকতা দেখা যাইবে।

কাপড় এইরূপে ঘরে ঘরে জোঁগাড় হইতে থাকিবে, বৈদেশীয় কাপড়ের উৎপত্তি কম হইবার জন্য যে সকল অনুবিধা ও ব্যবসাদারি সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে তাহারও সেই পরিমাণে লাঘব হইবে । কিন্তু ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে এই রীতি প্রবর্তিত হইবার পূর্বে নৃত্য “পাট” করিবার স্তম্ভ কারখানা একান্ত আবশ্যক । “পাট”-করা নৃত্য কিনিতে পাওয়া গেলে, তাঁত বুনিবার কাজ আর গৃহস্থের পক্ষে তত ভরসাহ বাপাব থাকিবে না । সেলাইয়ের কল ঘরে রাখিয়া দামার জোঁগাড় করিবার বন্দোবস্ত অপেক্ষা তাঁত রাখিয়া কাপড়ের জোঁগাড় করা অধিক অসম্ভব বোধ হইবে না ।

আমাদের দেশে পল্লিগ্রামের গৃহস্থ ভদ্রলোক আপন আপন সাংসারিক কাজ-কর্ম নির্বাহ করিয়াও বতসময় অবসর পাঠিয়া থাকেন । “পাট”-করা নৃত্য কিনিতে পাঠিলে তাঁতারা অন্যায়সে বাড়ীতে এক-একখানি তাঁত (hand-loom) রাখিয়া নিম্ন নিম্ন অভাব অনেকটা কুলাইয়া লইতে পারেন । গ্রামস্থ কোন ধনী মহাজন যদি নৃত্য মাড়িবার কল, “টানা-কাড়িবার” কল ও কয়েকখানি তাঁত লইয়া গিয়া এক-একটি কারখানা খুলিয়া দেন, তাহা হইলে গ্রামের মধ্যস্থলে এক-একটি দৃষ্টান্ত খাড়া হয় ও গৃহস্থের সংসার তাঁত প্রবর্তিত হইবার বিলম্ব হয় না । সুনিরাহি, আপানে এই-

রূপেই গৃহে গৃহে তাঁত বসিয়াছে এবং বিদেশী বস্ত্রবাণিজ্য এককালে নির্বাসিত হইয়াছে । আপানের দৃষ্টান্ত একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, বিদেশী কলের সহিত দেশী তাঁতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ কঠিন নহে । তবে শ্রমবিভাগের সুবন্দোবস্ত না হইলে এ সকল কথা আকাশ-কুসুমবৎ রহিয়া যাইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ।*

জাতীয় ধনভাণ্ডার দ্বারা তাঁতের শিক্ষাগার খুলিবার প্রস্তাব চলিতেছে । এই শিক্ষাগার কিরূপে গঠিত হইবে এবং কি প্রণালীতে চালিত হইবে, তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই । বঙ্গীয়-ভূমাধিকারি-সমিতির উদ্যোগে বিগত দুইতিনমাস ধরিয়া একটি ছোটখাট শিক্ষাগার, চালিত হইয়াছে । কিন্তু তাহার দ্বারা ত্রিগ্রামপুরের “ঠক্কী”- (fly-shuttle)-তাঁতের প্রচলন কতটা বৃদ্ধি পাইল, তাহা এখনো জ্ঞাতব্য রহিয়াছে । বাহির হইতে বস্ত্রটা জানা গিয়াছে, ভদ্রলোক শিক্ষানবিশের সংখ্যাই অধিক ছিল, “জোলা” অথবা তাঁতী শিক্ষানবিশ থাকিলেও দুইতিনজনের অধিক ছিল কি না, সন্দেহ । ভদ্র ছাত্রগণ যে কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়া ফিরিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক । তাঁতী অথবা “জোলা” ছাত্রদ্বারা “ঠক্কী”-তাঁত-প্রচলনের কার্যে সাহায্য হইবে, সন্দেহ নাই । কিন্তু

* গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁত রাখিয়া সংসারের কাপড় কতকপরিমাণে সরবরাহ করিবার রীতি বাংলাদেশেই দেখা যায় না ; কিন্তু ভারতে সকল প্রদেশে সেরূপ নহে । আমাদের প্রতিবেশী আসামবাসীদের মধ্যে প্রায় প্রতি ভদ্রগৃহেই তাঁত চলিয়া থাকে । শুনা যায়, একস্ট্রা গৃহস্থ পরিজনবর্গ অবকাশমত তাঁত বুনিয়া থাকেন । স্তম্ভরং বাংলায় ঐ রীতি চলিবার যে সকল বাধা আছে, তাহা যে অনতিক্রমণীয়, তাহা স্বীকার করা যায় না ।

আমাদের দেশের শ্রমজীবী শিল্পিগণ নবীনতার এতই বিরোধী যে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্পলোকেই সহসা কাহারো কথার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীরামপুরী তাঁতের কাজ শিখিবার জন্য আসিতে প্রস্তুত হয়। আর, বাহারাও আসিয়া শিখিয়া যায়, তাহারাই যে বিশেষ কোন অতিরিক্ত-লাভজনক কোশল শিখিয়া যায়, তাহাও নহে। সুতরাং জমিদারসমিতির চালিত বিত্তভ্রাতার আদর্শে কোন বিত্তালয় দ্বারা বিশেষ কোন ফললাভের প্রত্যাশা করা যায় না। বিত্তালয়হিসাবে বাংলার যাহা অভাব, তাহা “ঠক্কটকী” অথবা ঐরূপ বিশেষ কোন তাঁতের কাজ শিখাইবার স্থান নহে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চালিত বস্ত্রশিল্পের আদর্শবিজ্ঞান। মাত্রাজে শ্রীবৃক চ্যাটার্জী-সাহেবের অধ্যক্ষতায় যেসকল একটি বিত্তালয় চলিতেছে, আমেদনগরে শ্রীবৃক চার্জিন্স-সাহেবের তত্ত্বাবধানে যেসকল আর একটি বিত্তালয় চলিতেছে, বাংলার সেই শ্রেণীর বিত্তালয়ের সম্পূর্ণ অভাব এখনো রহিয়াছে। ইহাতে শিক্ষার্থীকে বিশেষ কোন তাঁতের কার্য শিক্ষা দিয়াই কার্যক্ষেত্র হয় না; শিল্পের উন্নতিকল্পে সমস্ত-ও-প্রমসংক্ষেপকারী নানাবিধ কোশলবিষয়েও পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। এইরূপ বিত্তালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি শুধু তাঁতের কাজ শিখিয়া বাহির হয়, তাহা নহে, কিরূপে অল্পব্যয়ে অধিক কার্য আদায় হয়, তাহাও শিখিয়া যায়। “ঠক্কটকী”-তাঁতে কেবল ধুতিই বোনা হয়; কিন্তু দেশের লোক শুধু ধুতির দ্বারাই অঙ্গ আচ্ছাদন করে না,—অস্ত্রবিধ কাপড়চোপড়ও আবশ্যক।

ক্যানানোরের তাঁতী যে সকল জামায় কাপড় যেমন বুনিতে পারে, তাহা অপূর্ণ স্থানের তাঁতী অল্পায়াসেই শিখিতে পারে। ঐরূপ অমৃতসরের পশমের কাপড়, মুর্শিদাবাদের রেশমের কাজ, এ সকলের কোনটাই বাঙালীর নিকট কঠিন নহে। শিক্ষার্থীর কুচি, সুযোগ, সুবিধা অল্পসারে কোনটা কাহার পক্ষে পছন্দসই এবং লাভজনক হইবে, কে বলিতে পারে! আর, রেশম-পশম ইত্যাদি নানারূপ কার্য বাংলায় চালাইতে পারিলে কত যুবকের জীবিকাসংস্থান হইবে, এবং দেশের সম্রাধি বস্ত্রের অভাব কত অধিক দূরীভূত হইবে, তাহা একটু ভাবিলেই অল্পমান করা যায়।—আদর্শবিত্তালয়ে যদি এই সকল বিষয়েও তাঁতের নমুনা রক্ষিত হয় এবং নিপুণ কারিকর দিয়া কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা হয়, শিক্ষানবিশকে আর ভারতের নানাস্থান ঘুরিয়া শিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় না। পাশ্চাত্যদেশে নানারূপ প্রমসংক্ষেপকারী তাঁত (hand-loom) উদ্ভাবিত হইয়াছে ও ঐ সকল তাঁতের সাহায্যে নানারূপ সূতী, রেশমী, পশমী কাপড় প্রস্তুত হইয়া দেশবিদেশে রপ্তানি হইতেছে। ঐ সকল তাঁত ও তাহার কার্য-প্রণালী বাহারা শিখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিত্তালয়ের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইলে, ভারতবর্ষের অভাব ও উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া নূতন তাঁত ও তাহার আর্থ-বঙ্গিক নূতন শিল্পপদ্ধতির প্রচলনের দ্বারা দেশের মহান উপকার সাধিত হইতে পারে। বস্ত্রশিল্পের উন্নতিই বাংলার বদেহী আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ হওয়া উচিত। এত-বড়

মহাদ্বেশ সাধনের অল্প বে বৈজ্ঞানিকপদ্ধতির অনুমোদিত একটি শিক্ষাগারের আবশ্যকতা আছে, তাহা বোধ হয় 'কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না ।

বম্ভড, মাদ্রাজ ও আমেদনগরের বিভাগের অল্পরূপ একটি আদর্শবিভাগের অভাব সম্প্রতি বাংলার বিশেষরূপে লক্ষিত হইতেছে । মাদ্রাজের বিভাগটি সরকারী, আমেদনগরের বিভাগটি শুধু দিনসা মাণিকজি পেটিটের স্থাপিত । বাঙালসরকার এ পর্য্যন্ত এরূপ বিভাগস্থাপনের আবশ্যকতা বুঝেন নাই, সম্প্রতি ম্যাক্‌টোরের সম্মল অথচ রোয়-কষারিত কটাক্ষপাতের সম্মুখে যে নীত তাহা বুঝিতে পারিবেন, তাহা মনে হয় না । শুধু দিনসার মত অবশেষহিঁতৈবী ধনী মহাজন আমাদের দেশে এখনো দেখা যাইতেছে না । সুতরাং দেশের এই মহৎ অভাবমোচনের ভার জাতীয়ভাণ্ডারকেই লইতে হইবে । জাতীয়ভাণ্ডার বাঙালিজাতির অক্ষয়-কীর্তি । ইহা দ্বারা যদি দেশের মধ্যস্থলে বহুশিল্পের একটি আদর্শশিক্ষাগার স্থাপিত হয়, তাহা হইলে ইহার উদ্দেশ্য সার্থক এবং তাহার ফল সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইবে, মনেহ নাই । জাতীয়ভাণ্ডারে যে-পরিমাণ

অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার আয়ে এরূপ কোন আদর্শশিক্ষাগার চালিত হইতে পারে কি না, তাহা এখনো বলিতে পারা যায় না । কিন্তু দেশের ধনী বহুস্ত মহালয়গণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি করিলে ভাণ্ডারের অর্থের অভাব যে অচিরেই মোচিত হইবে, তাহা আশা করা যায় ।

জাতীয়ভাণ্ডারকর্তৃক স্থাপিত শিল্প-বিভাগের গঠনাদিবিষয়ে আলোচনা চলিতেছে । বিশ্ববিভাগের গঠনসম্পর্কে দেশের অগ্রণীগণ সকলে মিলিত হইয়া, বেরূপ আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, জাতীয়ভাণ্ডারের অর্থের সম্ভাবনারের অল্পও তল্পপ আলোচনা হইয়া সিদ্ধান্ত দ্বির হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় । দেশের বাহা গর্বের বস্তু, তাহার সম্মুখে কোনরূপ তুল্যক্রমে তাহার অসম্ভাব-হার হইতে দেওয়া অত্যন্ত গহিত হইবে, এবং তজ্জন্ত সমগ্র দেশবাসীকে পরিতপ্ত হইতে হইবে । এবিষয়ে যে বিশেষ সতর্ক-তার প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য । সুতরাং আদর্শবিভাগের প্রস্তাব অল্প পাঁচরকম প্রস্তাবের সহিত ভাণ্ডারের সমস্তগণকর্তৃক আলোচিত হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয় ।

শ্রী, য—

নীলা ।



আমি

শরৎশেষের বেঘের মত
তোমার গগনকোণে
সন্ধ্যাই কিরি অকারণে !
তুমি আমার চিরদিনের
দিনযদি গো!—
আজো তোমার কিরণপাতে
মিনিরে দিবে আলোর সাথে
দেয় নি'ম্নে বাস্প করে'
তোমার পরশনি—
তোমা হ'তে পৃথক্ হ'রে
বৎসর মসি গনি ।

যদি .

এমনি তোমার ইচ্ছা, যদি
এমনি খেলা তব
তবে খেলাও নব নব !
ল'রে আমার তুচ্ছ কণিক
কণিকতা গো—
সাজাও তারে বর্ণে বর্ণে ;

ভূবাও তারে তোমার বর্ণে,
বাঁহুর স্রোতে তাসিরে তারে
খেলাও বধা-তথা,—
শূন্য আমার নিয়ে রচ
নিত্য বিচিন্তা ।

ওগো

আবার হবে ইচ্ছা হবে
সাদ কোরে খেলা

যোরা

নিশীথরাত্রিবেলা ।

অশ্রুধারে বয়ে' যাব

অকস্মেৎ গো—

প্রভাতকালে হবে কেবল

নির্ণলতা তুঙ্গশীতল,

রেখাবিহীন মুক্ত আকাশ

হাস্বে চারিধারে,—

যেঘের খেলা মিশিরে যাবে

জ্যোতিসাগরপারে ।

সাথ ।



দীর্ঘরাত্রি শেষে যাপি' প্রথম প্রভাতে
যবে মনে হয় নাথ তোমাতে আশ্রুতে
আয় হইবে না দেখা, অমনি তখন
সাব বার হ'রে পুন সুখে অচেতন
সকল বিরহব্যথা সব হঃখতার
চকিতে ছুটিয়া যাক্ হৃদয় আমার ।

ঐশ্বর্যবদা দেবী ।

ভারতবর্ষীয় জীবনজাল ।

[আৰ্ঘ্যা নিবেদিতার লিখিত]

আৰ্ঘ্যা নিবেদিতার “ভারতবর্ষীয় জীবন-জাল” নামক গ্রন্থখানির কথা আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। দীপলিখা যেমন একই কালে আপনাকে এবং বহুদূর-বর্তী অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিয়া তোলে, তেমনি এই পুস্তকখানি আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে আপনার রশ্মি প্রেরণ করিয়াছে এবং সেই রশ্মির ‘সাহায্যে’ আমাদের অতীত ইতিহাসের অন্ধকারকে কিয়ৎপরিমাণে দূর করিয়াছে।

আৰ্ঘ্যা নিবেদিতা একস্থানে লিখিয়াছেন—
“জাতীয়চরিত্রের মধ্যেই জাতীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্তবাহী আমরা পাই, ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে একথা যত সত্য, এমন আর কোন দেশের সম্বন্ধেই নহে।”

বস্তুত কথাটি সত্য বলিয়াই কাৰ্গ্যক্ষেত্রে খাটাঁইয়া লওয়া শক্ত। কারণ, জাতীয়-চরিত্রের খণ্ডতা-খর্ব্বতার মধ্যে তাহার পশ্চাতের সহিত অলক্ষ্য যোগসূত্র এবং সমুখের দিকে বিকাশোন্মুখ সাধকতাকে একই সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে, আমাদের ধৰ্ম্মে, আমাদের আচারে-ব্যবহারে যে বহু প্রাচীনকালের একটি প্রতিভা কাজ করিয়াছে এবং এখনকার নানা বিকৃতির মধ্যেও যে তাহা দৃশ্যত নহে, তাহা আছে—এ কথাটি আমরাই উপলব্ধি করিতে পারি

না, বিদেশীয় পক্ষে পারা যে কি কঠিন, তাহা সকলেই বুঝিবেন।

ভারতবর্ষের বিশেষত্ব কোথায়, নিবেদিতা ধরিয়াছেন। আমাদের ইতিহাস এমন বাধাধরা নয় যে, তাহাকে একটাকোন কালের মধ্যে নাম-তারিখ-রাজারাজড়া-মুহুর্ত ফেলিলেই তৈরি হইয়া উঠিবে। বস্তুত কোন ঘটনাবৈচিত্র্য বা মারকাটহান্ধামা আমাদের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর, কাজেই ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহা নিদারুণ ক্লেশের, সন্দেহ নাই। তৎসম্বন্ধে আমাদের একটা ইতিহাস আছেই, তাহা কোন ইতিহাস হইতে খাটো নয়। তাহাকে চিনিতে গেলে ভারতবর্ষীয় মনের পরিচয় গোড়ায় পাওয়া চাই। সেই মনকে খনন করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা আচারে-বিচারে, প্রথায়-অঙ্গ-ভানে, ক্রিয়াকাণ্ডে, ধৰ্ম্ম-সাহিত্যে, দর্শনে-পুরাণে ছড়াইয়া আছে। তাহা আমাদেরকে যে কি সম্প্রতিতর অধিকারী করিয়াছে, আমরা জানি না—কিন্তু তাহা আছে, এবং তাহার শক্তিই যে আমাদের ঐক্যের ভিত্তিমূল একদিন হইবে, তাহা বুঝবার সময় আজকাল আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তাই নিবেদিতা গোড়াতেই আমাদের ক্রীলোকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ক্রীলোকেরাই সভ্যতার মূলধনকে সঞ্চয়

করিয়া রাখিবে। বহুকালের আচারশ্রীতি-নীতিকে প্রতিদিন অবচলিত নিষ্ঠার সহিত, ভক্তির সহিত রক্ষা করা তাহাদেরই ধর্ম। সভ্যতার ধন তাহাদেরই কোলে প্রতিদিন মাছুষ হইতে থাকে, সুতরাং তাহারা কি, তাহাদের মন বিশেষভাবে কি—তাহা জানিলেই সমাজের ভিতরকার ভাবটির সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রথম অঙ্গণালৈক্যের অনুভূতীক্সাদের তলে গৃহদেবতার অভিবাঁদন ও গাভীদোহন কর্য হইতে দিবসের প্রতি তুচ্ছকর্ম এবং সন্ধ্যারতি পর্যন্ত যে একটি অবিচ্ছিন্ন অপরিমেয় মঙ্গলভাব, —তা ছাড়া নানা অহুষ্ঠান, পূজা ও ত্রুত-পালনের যে একটি বিরল তুচ্ছ ত্যাগকঠিন মাধুর্য্য, বাহার মধ্যে আমাদের কতাগণ, বধু-গণ ও মাতৃগণ বর্জিত হন, আমরা তাহাকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি নাম দিয়া উপ-হাস করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু লক্ষ্মী আপ-নাকে শুদ্ধতা ও হৃৎপ্রীতির মধ্যে প্রকাশ করেন না;—যে তাঁহার অধিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাঁহার অলোকশুদ্ধর কান্তি ও নন্দনিন্দী মাধুর্য্য বাহার অন্তরায়াকে সজীব-সজীবিত করিয়াছে, সেই কবির নিকটে সেই শ্রী দিব্যার্য্য মায় দেখা দেন,—আজ বিদেশী রমণীর লেখনীর মধ্যে সেই মহিমার আভাস পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম এবং তাঁহার পরিপূর্ণ নারীরূপের নিকটে মত্তক অবনত করিলাম।

আমাদের প্রতিভার মূলমন্ত্র হচ্ছে—বৈচিত্র্যের মধ্যে এককে আনয়ন। এই এককে রক্ষা করিতে গিয়া বৈচিত্র্যধর্মকে

মূলে উৎপাটন করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষের ছিল না,—কারণ তাহা প্রকৃতি ও ধর্মের নিয়মবিরুদ্ধ—বরং যাহাতে সকলই বর্ণাশ্রমস্থান পার, কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ না বাধে এবং যত স্থানে থাকিয়াও এক হইতে পারে, এইরূপ একটি বৃহৎ ব্যবস্থা ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। তাহার পরিচয় পাইতে গেলে বিশেষভাবে আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টি ফেলিতে হয়। নিবেদিতা তাহাই করিয়াছেন। এইজন্য বিদেশীর নিকটে বাহা নিতান্তশূন্যে কুরাতি ঠেকে, আমাদের কাছে যে তাহার মূল্য আছে, তাহা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। অন্তঃপুর-রীতি, চিরবৈধব্য, বাধ্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি লইয়া ঐহিক নাসা কুঞ্চিত করেন এবং পাশ্চাত্যদের শিখানো বুলি আওড়ান, তাঁহারা দেখিতে পান না যে, আমাদের সমাজব্যবহার মধ্যে ইহাদের ঐয়োজনীয়তা কোথায় এবং কতখানি! দেশকেই তাঁহারা যথার্থরূপে চিনিতে ও বুঝিতে সক্ষম হন নাই।

হিন্দুমাতা, হিন্দুসতী ও হিন্দুবিধবার সম্বন্ধে যে তিনটি চিত্র নির্বেশিতা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আভাসে-ইঙ্গিতে এই পরিবারের একা কিরূপে আমরা গাঁথিয়াছি, এবং এই নানা সংস্কারে আপনাকে ভড়াইয়া একই সময়ে ত্যাগকে সকলের এবং কর্ম ও ত্যাগকে আপনার কিপ্রকারে করিয়াছি, —ভারতবর্ষীয় সেই বৃহৎ প্রতিভার পদা একটুখানি উন্মোচন করিয়া এই দুইনাট্যের বৈচিত্র্যমধ্যে তাঁহার পরমসাধনার একটি গৌরব আমরা দেখিয়া লইলাম।

এই পরিবার যে আমাদের পক্ষে কত-
খানি, ইহা সুগঠিত হইলে আমাদের সমাজ
যে কি-পরিমাণ নির্ভর পায়, স্থিতি পায়
—আমাদের সমস্ত মনুষ্য ও কল্যাণচর্চা
যে ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে, এবং
তাহার ক্ষতি, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যে
আমাদের মধ্যে এই সকল রীতিনীতির সৃষ্টি
হইয়াছে, তাহা আপনাতে আপনি কেন্দ্রবদ্ধ
ব্যক্তি-বাহীন ইউরোপ কিছুতেই বুঝিয়া
উঠিতে পারে না ।

একটা দৃষ্টান্ত দিই । পরিবারের একা-
করণের জন্য দ্বার চেষ্টা আমাদের দেশে মা-
বড় । গৃহ বলিতে বোঝায় 'মা', তিনিই
গৃহের ক্ষেত্রস্থল । ইউরোপে পতিবিরোধে
অন্ত পতি গ্রহণ করা দ্বার পক্ষে দৃষ্টীয় নহে,
কিন্তু বিজ্ঞানসাধন, ঐ মা বলিতে যে আমা-
দের উদ্দেশ্য তন্ত্রের উচ্ছ্বাস, এই মা নামে
আমরা যে এক—পরিবারে এক, সমাজে এক
—এই যে গৃহের ঐক্য বাহ্যিক দ্বারা হইতেছে,
তিনি যদি পতিবিরোধে অন্য পতি গ্রহণ
করিতেন, যদি বৈধব্যের একাকিত্বের সুদৃঢ়
মটল গাভীর্ঘ্য না থাকিত, বিবাহের নিয়ম
যদি অলঙ্ঘনীয় না হইত, তবে কি সেই ঐক্য,
সেই মাদুর্ঘ্য — বাহ্যিক বলি না কেন,—কিছুই
রক্ষিত হইতে পারিত ?

এমনি করিয়া সমস্ত রীতিকেই দেশের
আচার্য্যগণ আদর্শের আলোকে সহজভাবেই
যেখা যায় । অবশ্য এখানে তাহা দেখিতে
বলা কোনক্রমেই চলিবে না । আসলে
পৃথিবীতে সকল জিনিষেই বিকল্পতা ও বিকৃতি
আছে । একটা রীতি যখন আমাদের মধ্যে
বিস্তৃত হইয়া উঠে, তাহারই পক্ষে যে

আমাদের দেশের প্রকৃতি ও প্রতিভা
বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে, আমাদের
সামাজিক বহিরাবেষ্টনের সঙ্গে আমাদের
যেটুকু যোগ, তাহা বাহাতে সুসংবদ্ধ,
স্থিতিশীল, স্থানীয়ভিত্তিক হইতে পারে,
বাহাতে আমরা যথাযথভাবে আমাদের
আস্তর ও বাহ্য সত্তাকে উপলব্ধি করিতে
পারি, তজ্জন্ত যে সেই রীতি সৃষ্ট
হইয়াছে, আমরা তাহা দেখিতে পাই না ।
তাহার বিকৃতি দেখিয়া তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ
হই । বিকৃতির বাহিরে তাহার কোন
চেহারাই আমাদের চোখে ফোটে না ।
আসলে রীতি বা ব্যবস্থা কোনকালেই চির-
স্থান নহে, কালভেদে তাহার বিভিন্নতা
অবশ্যজ্ঞাব্য, কিন্তু তাহার মধ্যে যেটুকু নিত্যতা
আছে প্রকৃতি হইতেই যে তাহা সঞ্চিত
হইয়াছিল, এবং সেই প্রকৃতির আনুকূল্য-
হেতুই যে তাহার গৌরব, আমরা তাহা
ভুলিয়া বসি ।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় কথা বলা
আবশ্যক হইবে, দেখিতে পাইতেছি । সকলেই
জানেন যে, আমাদের বর্তমান অবনতির
কারণ যখনই যিনি দেখান, 'জাতিভেদ' ছাড়া
আর কিছুই তাহার চোখে পড়েনা । স্বীকার
করি, ঐক্যকে ভুলিয়া গিয়া পার্থক্যের
প্রাচীরগুলি চোখের সামনে উৎকটভাবে
ভুলিয়া ধরিতে আমরা লজ্জিত হইতেছি না,
কিন্তু 'জাতিভেদ' প্রাচীর উপর সকল-
প্রকার দোষ চাপানোর পূর্বে (বাহার জন্য
সে বেচারী অনেকগুলো কিছুনাশ দোষী
অথবা দারী নহে) অন্তত সুবুদ্ধির ভ্রাম
হুটা-একটা প্রমাণ উপস্থিত করা উচিত ।

আমরা যদি মানুষে মানুষে মজলসবদ্ধ স্থাপন করিতে চাই, বিবেচক গোড়া বেঁধিয়া সম-ভূম করিতে চাই, তবে কর্ণভেদ, বৃত্তিভেদ রাখিতেই হইবে—তাহাতে কর্ণের উপর যে নিকাশধর্ম, তাহার লাভে অধিকারী হইব—কর্ণকেই মনুষ্যত্বের চরমলক্ষ্য করিব না। যেখানে সাম্য নাই, সেখানে উদার সামান্যীতি প্রচার করিয়া পরে তলে তলে জঘন্ড অসামান্যীতি সৃষ্টি করিব না এবং সত্যের নূতন শাস্ত্র তৈয়ার করিতে বসিব না। সুতরাং সাম্য যেখানে নাই, সেখানে সর্বিনশে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব এবং ক্রমে তাহার ব্যবধান দূর করিতে প্রয়াসী হইব। সুতরাং বর্ণভেদ আমাদের মধ্যে কোন-না-কোন আকারে থাকিবেই।

আমরা একজ কাজ করিতে পারি না, ইহার কারণ আতিভেদ, ইহা কোনমতেই মনো চলে না। সে দোষ আমাদের মধ্যেই আছে—বাহিরের কোন প্রণয়, কোন রীতিনীতিতে নাই। জাতিরক্ষার অর্থ আত্মসম্মান এবং পূর্বপুরুষের কুলের সন্মান রক্ষা বই আর কিছুই নহে। তাহা যে ধর্মের অধিকার, মনুষ্যত্বের অধিকার হইতে কখন কাছাকাছিও থরস করিয়াছে, এ কথাও মানিতে পারি না। যদি ছ'এক ক্ষেত্রে করিয়া থাকে, তবে তাহা আতিভেদপ্রণয় দোষ নহে, ইহা সূনিশ্চিত। বরং বাহাতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সমাজে সঞ্চিত হইতে পারে, এইজন্যই আমাদের সমাজ জাতির মধ্যে কর্ণভেদ করিয়া দিয়াছিল; ব্রাহ্মণই একমাত্র ধর্মকর্ণ করিবে, ধর্মকর্ণ আর কাহারও অধিকার নাই,

এমন কথা কখন বলে নাই। এ কথা বাহার বলেন, তাঁহার জাতিরা দেখেন না যে, রাম-চন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি আমাদের বাহার অবতারের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন, তাঁহার কেহই ব্রাহ্মণ নন। ব্রাহ্মণেরা চিরকাল ধর্মকর্ণ লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার লেই সকল রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের অত সম্মান, তাহাতে যে তাঁহাদের মৌরসীপাট্টা, এমন কথা কিছুই নাই। তা ছাড়া, অধিকারভেদ-বৃত্তিভেদে একজ কাজে যে কি অন্তরায় হইতে পারে, তাহাও বুঝা যায় না, বরং সুবিধা হইবারই কথা। কারণ আতিভেদে প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, কাজেই কাহারও সঙ্গে কাহারও খটকা বাধিবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে তো বলই হওয়া উচিত, দুর্বলতা নয়; সুতরাং একজ কাজ যে আজকাল আমরা করিতে পারি না, তাহার কারণ আমাদের ভিতরকার মজাগত পরিশ্রুতি ও পরাভুকরণ—আমাদের প্রণয় দোষ কখনই নহে।

তবেই উপস্থিত দুর্ভোগের কারণ দেখিতে পাইতেছি। আমাদের বাহাতে প্রতিভা ছিল, আমাদের যেখানে কর্ণক্ষেত্র ছিল, সেখানে এখন বিদেশীকে সচ্ছন্দে বসিতে দিয়াছি, এবং তাহারই অনুগ্রহভিক্ষা করিয়া তাহারই মুখপানে তাকাইয়া আছি। আমরা হয় নিশ্চেষ্ট, নয় অক্ষতাবে সচেত, হয় পরনির্ভরশীল, নয় পরাভুকারী। যেমন একটা সাধারণ দুষ্টতা দেখা যাক না কেন;—এদিকে আমরা দেশকে না জানিয়া তাহার প্রতি দ্রুতি ও প্রজ্ঞা হারাইয়া 'দেশের দুখ

দূর কর, সমাজসংস্কার কর, ধর্মের আমূল পরিবর্তন কর' প্রভৃতি পাশ্চাত্যবুলি আওড়াইয়া কিরিতেছি, অথচ দেশের জিনিষ এক-একর উঠিয়া বাইতেছে,—আমাদের আব-ভ্রুক বটিবাটি-কাপড়চোপড় সমস্তই বিদেশী সরবরাহ করিতেছে। এখন সেদিকে যে অর্থের টানাটানির জন্ত আমরা দৃষ্টি দিতেছি না, তা নয়—কুচি বদল হইয়া গেছে। আমাদের স্ত্রীলোকেরা চিরকালই দেশের জিনিষ, দেশের শিল্পসামগ্রী রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এখনও তাহাদিগের দ্বারাই বাহাতে সেগুলি রক্ষিত হয়, বাহাতে পুনরায় আমাদের গৃহে দেশীয় শ্রী কিরিয়া আসে, তজ্জন্ত আমরা দিগকে বিশেষভাবে সচেত হইতে হইবে। পূর্বে চরকার সূতা কাটা তাহাদের নিত্য-অমুষ্ঠের কর্ম ছিল, এখন সেইরূপ অনেক কর্ম লোপ পাইয়াছে। তত্ত্বাবহের কাজ নাই। আমরা দিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, জীবন-যাত্রাকে অত্যন্ত সরল ও সংকিপ্ত করিয়াছিল আমাদের ধর্ম—পাশ্চাত্য শিল্পাদির আড়ম্বর দেখিয়া দেশীয় আটের বিরলতা, উপকরণের ঘরতা এবং সরল শ্রীর দিকে অক্ল হইলে চলিবে না।

আমাদের কেহ কেহ আবার মনে করিতেছি যে, বুঝি পাশ্চাত্যের সঙ্গে কোন যোগ রাখাই অস্ত্রার। যেমন সে কথা বলাও ভুল, তেমনি ভুল ভাবা যে, অগ্রকরণ করারই নাম সাধকতা। আমরা হয় এটা নয় ওটা, এ ছয়ের একটা ভাবিতেছি। যখন বলা যায় যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আমা-দের গ্রহণ করিতে হইবে, সত্য জানার যে উপায় পাশ্চাত্যেরা গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে

তলাইয়া দেখিতে হইবে—তখন অনেকে মনে করেন, বুঝি উহাদের সঙ্গে টকর দিবার অভিপ্রায়েই বিজ্ঞানচর্চা করিবার কথা হইতেছে, যেন বিজ্ঞানচর্চা করার অপর কোন হেতুই নাই; কেহ কেহ বা সিঁছপাও হন,—ভাবেন যে, কাজ নাই, পাছে সমাতন ধর্মে অবিধাদী হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ কোন কালে ভীক ছিল না। নূতনকে চিরকালই সে নির্ভয়ে গ্রহণ করিয়াছে এবং নিজের অমৃত প্রতিভাবে আপনায় করিয়া লইয়াছে। এই প্রতিভা তাহার দর্শনে, চিন্তায়, সমাজব্যবহার পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত। এখনই যে কেন সে পাশ্চাত্যের জিনিষ আপনায় উপায় নিজের করিয়া লইতে পারিবে না, তাহা বুঝা যায় না।

এখনকার কালের প্রধান সমস্যা তো তাহাই! কি উপারে একটা বৃহৎ জাতীয়-ভাব আমাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে, কেবল অমুভূতিতে নহে—প্রতিদিনের কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক ব্যবহার এবং অমুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদিতে, অনেকে মনে করেন যে, তাহা হওয়া অসম্ভব। কারণ, প্রথমত জাতি-ভেদ, দ্বিতীয়ত একই দেশে নানা জাতির সমাবেশ। ইহাতে যে ভারতবর্ষের শাণে বর হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা বড় কেহ ভাবিয়া দেখেন না।

এক হিন্দু মুসলমান ধরিয়াই অনেকে মনে করেন, বিশেষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদের দিগকে শিক্ষা দেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হচ্ছে এই দুই জাতির ধর্মভাবের লড়াই এবং সেই লড়াইয়ের চিত্রেই ইতি-

হাসের পৃষ্ঠাগুলি তাঁহারা আগাগোড়া পূর্ণ করেন। অথচ চিরকাল হিন্দু-মুসলমান একত্ব—পাশাপাশি এক গ্রামে রহিয়াছে, পরস্পরের স্তূৰ্ণ-স্তূৰ্ণে স্তূৰ্ণ-স্তূৰ্ণে অল্পস্তব করিয়াছে, মুসলমান-পীর-ককিরের নিকটে হিন্দু ধর্ম শিখিতে গিয়াছে, হিন্দু-সন্ন্যাসীর ঘারে মুসলমান দেখা দিয়াছে, মুসলমানরাভ্যে হিন্দু-সেনাপতি, মন্ত্রী রহিয়াছে, হিন্দুরাজ্যে মুসলমান বড় বড় কর্তৃত্বের পদ পাইয়া আসিয়াছে। মুসলমানগণের ধর্মের মধ্যেও আছে যে, ‘ঈশ্বর সকলেরই ঈশ্বর, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নহেন’—সুতরাং হিন্দু সহিত তাহার বা ধর্ম লইয়া বগড়া, তাহা অবিদ্বেষ এবং বিশ্বাস লইয়া—‘দীন’ এবং ‘ধর্ম’ লইয়া। এমন কিছু মুসলমানধর্মে নাই; ‘বাহা হিন্দুধর্মের কোন-না-কোন অংশে নাই, পরস্পর বিরোধী ধর্ম বলিয়া বর্ণনা করা পাশ্চাত্যদের একটি অজ্ঞতা বই আর কিছুই নয়। সুফীধর্ম অনেকের জানেন,—বেদান্তমতের সহিত তাহার অতি নিকট সম্পর্ক। মুসলমানগণের মধ্যে এই ধর্মের অত্যধিক হওয়াতেই প্রমাণ যে, হিন্দু-তাবের দর্শনের প্রভাব তাহার উপর কার্য করিয়াছে।

‘মহম্মদ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং শঙ্করাচার্য—এই চারি বৃগধর্ম প্রবর্তক মহাত্মা পরস্পরের পথে কণ্টকরোপণ করেন নাই—কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকে এশিয়ারই একটি বিশিষ্ট প্রতিভার মনুষ্য—বহির্ভূত অল্প ইচ্ছাশালার ব্যক্তি—যেহেতু আকর্ষণে এক একটি বৃহৎ মণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছিল—বাহা পুনঃপুন এশিয়ার সমস্তা এবং চিন্তা ও সাধনাকে এক প্রমাণ করিয়াছে।

এশিয়ার মধ্যে বিশেষভাবে সেই ঐক্য হিন্দুধর্মের, ভারতবর্ষের। হিন্দুধর্মের ইহাই বিশেষত্ব যে, তাহার মধ্যে অসংখ্য মতের সমাবেশ, কোনটা যে হিন্দুধর্ম এবং কোনটা যে নয়, তাহা আদরেই বলা চলে না। বেদান্তের বিপুল অম্বৈতবাদ হইতে চার্বাকের সংশয়বাদ পর্য্যন্ত,—নিরীকার-নিষ্পত্তের ভঙ্গনা হইতে তেজশকোটি দেবদেবীর ভঙ্গনা পর্য্যন্ত সমস্তই হিন্দুধর্ম। এইজন্য চীন-মঙ্গল বেখানেই যাওয়া যায়, ভারতবর্ষীয় ধর্মের ছাপ সর্বত্রই,—কজাকুমারিকা এবং জাপানের কোয়ানটোর ভারতবর্ষের মা-কালী এবং চীন ভারী—কে আগে, কে পরে, ইতিহাসের জানিবার বিষয়—কিন্তু এশিয়ার সর্বত্র যে ভারতবর্ষের ছাপ লাগিয়া আছে, ইহা সুনিশ্চিত। আর্ধ্য চিন্তাপ্রোত যে এক সময়ে সমস্ত এশিয়াখণ্ডকে প্রাবিত করিয়াছিল—এবং যে সেমিটিক্‌জাতি বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার এক হিসাবে প্রবর্তক, তাহারও যে কতটা সেই চিন্তা-প্রবাহের নিকটে গনী, জেনীস্, জেনোয়া, জুজেন্ড্ প্রভৃতির বপার্ণ ইতিহাস বাহির হইলে তাহা বুঝা যাইবে। বস্তুত তাওইজ্‌ম্ জোরো আষ্টোরের ধর্ম হিন্দুধর্মের বিচিত্র শাখাপ্রশাখাজাল—সুফিইজ্‌ম্ সেই বৃহৎ ধারারই এক একটি শাখাপ্রশাখা, একটু এপিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

এ যেমন ব্যাপকভাবে সমস্ত এশিয়ার ঐক্যকে সপ্রমাণ করিতেছে, তেমনি সেই এক আর্ধ্যধর্ম হইতেই কালে কালে যে কত ধর্মের উৎপত্তি এই ভারতবর্ষেই ঘটয়াছে—অথচ সেই মূলতাবের সহিত বিবেচনা

করিয়া দেখিলে তাহাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জানিতে পারা যায়। বৌদ্ধধর্ম, অবৈতবাদ, বাংলার খ্রীষ্টচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম, শিখগুরুদের ধর্ম, রামদাস-তুকারামের ধর্ম, রামানুজের ধর্ম—সমস্তই বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয় এবং সমস্তের সঙ্গেই সেই গোড়ার ঋষিযুগের চিত্ত, দর্শন ও সাধনার যোগ আছে। এইরূপে একএকটি প্রদেশে এক এক বিচিত্র ভাবপ্রাবল উপস্থিত হইয়া সে প্রদেশকে নূতন, সরস ও সজীবিত করিয়া দিয়া গেছে, মহারাষ্ট্র ও শিখের অভ্যুত্থান, বাংলার বৈষ্ণব-মুগ, তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

বৌদ্ধধর্ম যে এক সময়ে সমস্ত এশিয়ার একটা ভাববিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, সেই বৌদ্ধধর্ম কি বাস্তবিক আধ্যাত্ম্য হইতে কোন অংশে তফাৎ ছিল, না তাহারই রসে পুষ্ট হুলের মত তাহারই শাখার উদ্ভূত হইয়াছিল? বৌদ্ধ স্তুতিদি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুর মত ও চিন্তার সারাংশগুলি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই এক মহাপুরুষের চারিদিকে একটি বিচিত্র মণ্ডলী বা সংজ্ঞা গড়িয়া উঠিয়াছিল,—যাহা সর্বোপায়েই সুসমঞ্জসীকৃত, কেন্দ্রবদ্ধ। সেই মণ্ডলীর ভাবাবেগ চীন, জাপান, সিরিয়া ইকিপ্ট সর্বত্র পথ কাটিয়া চলিল, ব্যবসায়িক পত্তন করিল, স্বরাজ্যে হাসপাতাল, পণ্টকিংস্যা আরম্ভ করিল এবং নানা পথঘাট ও কূপ রচনা করিল—এ সকলই তাহার নব্য-জীবনের উৎসাহজনিত ক্ষুণ্ণির ফল।

ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন ভুক্তকে স্থান দিয়াও যে মিলনের একটি পথ অব্যাহত রাখিয়াছে, তাহার কারণ শুধু, বিচারের দিক দিয়া পর-

স্পর স্বতন্ত্র বৃত্তই হোক না কেন, ভারতবর্ষের সাধনা এক। বুদ্ধ বলিলেন যে, কর্মমাজেই শৃঙ্খল, বাসনাই কর্মের মূল, অস্ত্র এবং অনস্ত কর্মশৃঙ্খলা, জন্মমূহুর ঘূর্ণা হইতে বহিঃ মুক্ত হইতে চাও, তবে বাসনা ত্যাগ কর। পূর্ববর্তী ঋষিরা সে কথা বলেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যথার্থ আত্মজ্ঞান হইলে, আপনায় মধ্যে শুদ্ধবুদ্ধ নিত্য চৈতন্য আত্মার সাক্ষ্যকার হইলে ভববন্ধন আপনি ছিন্ন হইবে, জন্মমূহুর শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হইবে—কিন্তু তাহা হইলেই গোড়ার আত্মা হইতে অনাস্রবে নিজেকে সম্প্রসারণ করিতে হইবে, বার্ষত্যাগ করিতে হইবে, মায়ামাশ ছেদন করিতে হইবে—সেই বুদ্ধের কথা। স্মরণ্য যেথা বাইতেছে যে, ভারতবর্ষীয় ধর্মমাজেরই মিল কোথায়? তৎসংশে অমিল এবং প্রভেদ থাকিলেও সাধনের রাস্তা সকলেই সেই এক ধরিতেছেন। সেই নিবৃত্তিভাবের দ্বারাই যে সমস্ত সমাজও পরিচালিত, একটু প্রাণধান করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

বুদ্ধের পর শঙ্করাচার্য্য তৎকালীন পুরাণের মন্ত্রতন্ত্র-জটিলতা ও নানা বিগ্রহাদি ভেদ করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষের ‘আইডিয়া’কে জাগ্রত করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি একটি সমন্বয় গড়িয়া তুলিলেন। লোকধর্মের সহিত প্রাচীনধর্মের যে ব্যবধান রচিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা তিনি তাড়িয়া দিলেন এবং পুনরায় সেই লোকধর্মের সহিত প্রাচীনের কোথায় যোগ, তাহা প্রদর্শন করিলেন। মারা, কর্ম প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রচলিত লৌকিক কথাগুলির ব্যাখ্যা করিলেন। তাহার কার্য্যের যে কতটা মূল্য, ভারতবর্ষ-

খ্যাপী তাঁহার অধৈতবাদের প্রভাব দেখিলেই বুঝা যাইবে—অন্ত কোন সমালোচনাই এ সন্ধকে নিস্প্রয়োজন।

শতরের পর রামাজুজ, মাধবাচার্য্য, রামদাস, তুকারাম, শিবগুরু, শ্রীগোরাঙ্গ প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রবলবেগে যেখানেই ধর্মভাবের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, সেখানেই নব নব জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে দেখিয়াছি। সে সকল ধর্ম বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে সেই একটা কড়া এবং পরিকার তত্ত্বের ভাব গ্রহিয়াছে,—যাহা এক-দেশদর্শিতাদোষে দৃষ্ট নহে, পরন্তু নানা ভাবের সমন্বয়সাধনে তৎপর। এখনও আমাদের দর্শনে যে নানা সমন্বয় চলিবে এবং এই উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বাদ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

তবেই ভারতবর্ষীয় চিন্তার ফল শেষটা ঠাড়াইতেছে এই :—বিশেষ কোন মত বা সম্প্রদায় নহে, সমন্বয়—বিশেষ গির্জা নহে, বরং আধ্যাত্মিক কালচারের বিশ্ববিভাগ্য এবং ধর্মসন্ধকে ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নূতন ব্যাপার এখন আসিয়া পড়িয়াছে, এখন আর একটা বৃহৎ সমন্বয়পাশে বাঁধিয়া-তুলিয়া ইহাদিগকেও সেই ভারতবর্ষীয় চিন্তাক্ষেত্রের অন্তর্গত করিয়া লইতে হইবে।

এখানে বলা আবশ্যিক যে, মুসলমান-সমরে আকবর-শাহজাহান প্রভৃতির মধ্যে সেইরূপ একটা সমন্বয়প্রতিষ্ঠার ভাব জাগিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানেরা আমাদের শাস্ত্রাদি, চিন্তা ও সাধনার সহিত একেবারেই কোন সংঘব রাখেন নাই, শুদ্ধমাত্র সেই

সমন্বয়ের প্রস্তাব তেমন কার্যকর ও ফলদায়ক হইল না। তথাপি মুকিইজ্জম্ প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় যে, কিয়ৎপরিমাণে ভারতবর্ষের ভাব মুসলমানের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। তা ছাড়া, আচারব্যবহার-রীতিনিতির বৈষম্যও এতটা মিলিয়া আসিতেছে যে, হিন্দুর সামাজিক ভাবও মুসলমানকে আক্রমণ করিতেছে; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

যে বৃহৎ সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাই এক হিসাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস। নিবেদিত। সেই ইতিহাসের আভাস তাঁহার পুস্তকে দিয়াছেন। এইজন্য সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয় আমি তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া পারিলাম না।

নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে, গীতাই আমাদের 'Gospel'। গীতা সমস্ত ভাব, সমস্ত মতকেই স্থান দিয়াছে, গীতার সমন্বয় অতি আশ্চর্য্য। এবং পূর্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতবর্ষের সাধনার পথ যে নিকাম-কর্মের পথ, তাহাও গীতারই উপদেশ। নিবেদিতা লিখিতেছেন—

"Spirituality is with it no retreat from men and things but a burning fire of knowledge that destroys bondage, consumes sluggishness and egoism, and penetrates everywhere. Not the withdrawn but the transfigured life, radiant with power and energy triumphant in its selflessness, is religion."

ইউরোপ তাহার বহুতর জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে হস্তবুদ্ধি হইয়া সম্প্রতি এক্যাঘেবণ করি-

তেছে। আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানের নিগূঢ় সত্যসকলের যোগ রহিয়াছে—যদিও আমরা কোনকালেই বিজ্ঞানচর্চা করি নাই—এখন আমরা যদি সজীব হইয়া উঠি এবং পূর্বের জ্ঞান সর্বত্র ঐক্যের ‘আইডিয়া’ মাধ্যম লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিই, তবেই সমস্ত মনুষ্যসমাজকে আমাদের কি দিবার আছে, স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। ইউরোপে ধর্মবিশ্বাস, সমাজ প্রভৃতি সমস্তই নূতন ও বৃহৎ হইবার আশায় উদ্ভূত হইয়া বসিয়া আছে। নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ভারতবর্ষের এখন বাহা করিবার আছে, তাহা ভারতবর্ষ কি করিয়া উঠিতে পারিবে!

রোমানসাম্রাজ্যের মধ্যে এক সময়ে এইপ্রকার একটি বৃহৎ সমন্বয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইজিপ্ট, সিরিয়া, পারস্ত, ভারতবর্ষ, জুডিয়া, গ্রীস—এসকল দেশের অন্তর্নিহিত ভাব ও বিশ্বাস মেডিটারেনিয়ান-বাসীরা জড় করিয়াছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য-দেশে সেইপ্রকার একটি জগৎব্যাপী সমন্বয়ের প্রয়োজন, সেই সমন্বয় ভারতবর্ষ আনিয়া দিবে—এই আশা আমাদের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হোক। দীর্ঘকালব্যাপী ভারতবর্ষের সাধনা ব্যর্থ হইবে না!

আমাদের বর্তমান অবস্থা তাহার অনুরূপ নহে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি, তথাপি—
“A nation becomes whatever she believes herself to be”—একটি জাতি আপনার সম্বন্ধে বাহ্য আন্তরিক বিশ্বাস করে, তাহাই হইয়া উঠে। ভারতবর্ষ কি বিশ্বাস করিতেছে?

প্ৰটানধর্মে রোমানক্যাথলিক ধর্ম যেমন

একাংশমাত্র, ক্যাথলিক না হইলেও তাহাকে ক্রীশ্চান্ বলা চলে, তেমনি আমাদের—religious system—ধর্মের মতবাদ অংশটুকু সেই সামাজিক, ব্যবহারিক, অর্থনৈতিক প্রকাণ্ড ধর্মব্যাপারের নিকটে অভিশ্রব্দ। আসলে ধর্ম মানে religion নহে, যদিও আমরা তাহাই বলিয়া আসিয়াছি। ধর্ম বলিতে সেই বৃহৎ ব্যাপারটি বোঝা—বাহ্য সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক, বাহ্যকে বরং national good—জাতীয়মঙ্গল নাম দেওয়া যাইতে পারে। সেই ধর্মরক্ষা করিলে আমরা পরিসমাজ হইতে বৃহৎ ভারতবর্ষীয় অথবা ‘স্বদেশী সমাজে’ উপনীত হইতে পারিব, পরাভুত্বভিত্তি ও অহুত্ববোধের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিজের বেশে নিজে দাঁড়াইব, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে, একই স্বদেশী সত্তা অহুত্ব করিব।

আমরা ভাবিয়া দেখি না যে, এই ধর্ম এক সময়ে সমস্ত লোককে কি মঙ্গল দান করিয়াছে,—কুদ্বার্তকে অন্নদান, কুপ ও জলাশয় খনন, অতিথিশালানির্মাণ, পথঘাটরচনা প্রভৃতি বিবিধ পুণ্যকর্ম, মঙ্গলকর্ম এই ধর্মের অঙ্গীভূত ছিল এবং সমস্ত লোকে, আপামর সাধারণে এই কর্তব্যগুলি বিতক্ত ছিল। এখন সেইরূপ একটি দেশ-ব্যাপী সংসদ গড়িতে হইবে, তাহাতে হিন্দুর পাশাপাশি মুসলমান সেই ধর্মকর্ম করিবে এবং এইরূপে সমগ্র দেশের ভাব, সমগ্র জাতির ঐক্যভাব আপনাই দেশে প্রবর্তিত হইবে।

উপসংহারে নিবেদিতা বলিতেছেনঃ—

“At this moment, however, a new suspicion is making itself

heard, a suspicion that behind all these interpretations—the social reform, the political agitation, religious movements and economic grievances—there stands a greater reality, dominating and co-ordinating the whole, the Indian national idea, of which each is a part. It begins to be thought that there is a religious idea that may be called Indian, but it is of no single sect, that there is a social idea, which is the property of no caste or groups, that there is a historic evolution, in which all are united, and that is the thing within all these which alone is to be called ‘India.’”

শ্রীঃ—

অনাহত ।



পাড়িরে আছে আধেকখোলা
 বাতায়নের ধারে
 নূতন বধু বুঝি ?
 আসবে কখন চুড়ি-ওলা
 তোমার গৃহঘারে
 ল'রে তাহার পুঁজি ।
 দেখে চোরে পোকর পাড়ি
 উড়িয়ে চলে ধূলি
 ধর-রোদের কালে ;
 হ্র নদীতে দিচ্ছে পাড়ি
 বোকাই নৌকাগুলি
 . বাতাস লাগে পালে ।

আধেকখোলা বিজয়ধ্বরে
 ঘোড়াটার চাকা
 একুলা বাতাসে

বিশ তোমার আঁখির 'পরে
কেমন পড়ে আঁকা
তাই ভাবি যে মনে ।
ছায়াময় সে ভুবনখানি
বশন দিয়ে গড়া
রূপকথাটি ছাঁদা,
কোন সে পিতামহীর বাণী
নাইক আগাগোড়া
দীর্ঘ ছড়া বাঁধা ।

আমি ভাবি, হঠাৎ যদি
বৈশাখের দিন
বাতাস বহে বেগে—
লজ্জা ছেড়ে নাচে নদী
শূন্তে বাঁধনহীন,
পাশল উঠে ভেগে,—
যদি তোমার ঢাকাঘরে
বস আগল আছে
সকলি যায় দূরে—
ঐ যে বসন নেমে পড়ে
তোমার আঁখির কাছে
ও যদি যায় উড়ে,—
তীব্র তড়িৎহাসি হেসে
বজ্রভেরীর স্বরে
তোমার ঘরে ঢুকি’ ”
অগৎ যদি এক নিমেষে
শক্তিমূর্তি ধরে’
দাঁড়ায় সুখোমুখি—
কোথায় থাকে আধেকঢাকা
অলস দিনের ছায়া,
বাতায়নের ছবি,
কোথায় থাকে বশনবাধা

আপনগড়া মায়া,—

উড়িয়া যায়, সবি !

তখন তোমার ঘোমটা-খোলা

কালো চোখের কোণে

কাঁপে কিসের আলো,

ডুবে তোমার আপনা-ভোলা

প্রাণের আন্দোলনে

সকল মন্বভালো ।

বকে তোমার আঘাত করে

উদ্ভাল নর্তনে

রক্ততরঙ্গিনী ।

অঙ্গে তোমার কি সুর তুলে

চঞ্চল কম্পনে

কঙ্কণ-কিঙ্কিনী !

আজকে তুমি আপনাকে

‘আধেক আড়াল করে’

দাঁড়িয়ে ঘরের কোণে

দেখতেছ এই জগৎটাকে

কি যে মায়ার ভরে’

তাহাই ভাবি মনে ।

অর্থবিহীন খেলার মত

তোমার পথের মাঝে

চলছে বাঁওরা-আসা,

উঠে কুটে মিলার কত

কুদ্র দিনের কাজে

কুদ্র কাদা-হাসা !

জন্মান্তরবাদ এবং অলৌকিক-শক্তি-পিপাসা।

বহুদিন পূর্বে 'আদিম ধর্মভাব এবং যোগের অঙ্কুর' প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম। এ প্রবন্ধটি তাহার অঙ্কুর হইলেও সেটির প্রতি নির্ভর করিবার প্রয়োজন হইবে না। সে প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার একটি কপার পুনরুৎপাদন করিব মাত্র। লিখিয়াছিলাম যে—(১) জন্মান্তরবাদ এবং (২) ভূত নামাষ্ট্র। ও যাত্রমন্তবলে শক্তিলভের বিশ্বাস হইতে যোগ প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এই উভয়বিধ বিশ্বাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিবার পর যোগবিকাশের ইতিহাস লিখিব।

১। জন্মান্তরবাদ।

এদেশের কোল, ভৌল, শবর প্রভৃতি জাতির মধ্যে তাহাদের আদিম ধর্মভাব বহু-পরিমাণে অক্ষয় আছে। পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ অনেক জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের জ্ঞান এবং সভ্যতার তুলনায় উহাদিগকে বর্বর এবং অসভ্য বলিয়া থাকি। আমাদের মত উহাদের সমাজে বহুপ্রকার মতবাদ নাই। উহারা যে কত দিন হইতে কোন্ দেশে আছে, তাহা জানা নাই বলিয়া উহারা আদিম জাতি বলিয়াও উল্লিখিত হয়। নহিলে সৃষ্টির ইতিহাসকে কে আদিম এবং কে আধুনিক, তাহা বলিতে পারা যায় না।

পৃথিবীর এই আদিম, অসভ্য এবং বর্বর জাতির মধ্যে সর্বত্রই এই বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ মরিয়া জীব বা উদ্ভিদ

শরীরে প্রবেশ করে। অনেক জীব বা উদ্ভিদের বহুজাতির বংশপ্রবর্তক বলিয়াও খ্যাতি আছে। সুন্দর লোক মরিলে ময়ূর হয়, দুর্ভলোক মরিলে শৃগাল হয়, সাহসী যোদ্ধা মরিলে সিংহ হয় প্রভৃতি বিশ্বাস আমাদের অন্তর্দেহসংক্রমণের বিশ্বাসের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

মঙ্গলবাদী আর্যেরা যখন প্রতিবেশীদের এই বিশ্বাস অলক্ষ্যভাবে আত্মহু-কিয়াছিলেন, তখন অন্তর্দেহসংক্রমণ পর্যাভুই শেষ পরিণতি বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। সকলেরই উদ্ধার আছে, সকলেবই মঙ্গল হইবে; কাজেই আত্মার লক্ষ্যানুপরিভ্রমণের পর, হয় মনুষ্যজন্ম, না হয় দেবত্বলাভ স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। অনার্যের জন্মান্তরবাদ এবং আমাদের সংসারচক্রবাদে এই প্রভেদ।

"শরীরাদি বিহার জীর্ণানাত্মনি সংঘাতি নবানি দেহী",—সে কথা ত ঠিক; কিন্তু কে কোন্ শরীরে প্রবেশ করে? ছুটেরা ছুট ভক্ত হয়, সাধুবাও ভাল জন্ম হয়; ইহাই অসভ্যের বিশ্বাস। সংসারচক্রবাদেও তাই, তবে শেষ পরিণাম লইয়া বা কথা। প্রথমত কিন্তু—

রজসি প্রলয়ং গদ্য কর্ণসমিধু জায়তে।

তথা প্রলীনন্তমসি বুঢ়মোনিধু জায়তে।

নীচশরীরে প্রবেশ করিলে নরকভোগ হয়; কাজেই এই মতে পুণ্যকর্মের প্রতি

আদরবুদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু নীচ-শরীর গ্রহণ করিলে যে নরকবরণাতোগ হয়, নৈবধকারের কলি তাহা মনে করেন না। কলির তর্কে কিন্তু খুব ক্ষুধার আছে। শাস্ত্রে বলে যে, জন্ম হইলেই বস্ত্রণা এবং সেই বস্ত্রণার প্রথম নরকমর অবধা ক্লেবাদি-পূর্ণ জঠরবাস। শিশু বা ভ্রূণপিণ্ড বধন পর্ন্তক, তখন ত তাহার জ্ঞান বলিয়া জিনিষটারই জন্ম হয় নাই; কাজেই আঁমাদের অহুরাগ এবং ঘৃণাদির বিচারে তাহার অবস্থাকে হুঃখমর বলা চলে না। কেহ যদি ক্রমি হয়, তবে ক্রমির অহুরাগবিরাগের অল্পভূতিহারাই তাহার সুখহুঃখের মাপ হওয়া উচিত। শরীরান্তরগ্রহণে নীচজ্ঞান-জনিত নরকভোগ কোথায়? নৈবধকার বোধ হইল তাহার খণ্ডনখাত লিখিবার পর কলিকে নৈসর্গিক সাজাইয়াছিলেন।

কলি অভি বোর পাষণ্ড; তাহার নরক-ভয় না থাকিতে পারে; কিন্তু সুসুকরা এখনো গাহিয়া থাকেন—“দিও না আবার মাগো, জঠরবস্ত্রণা মোরে।” নীচ পণ্ডজন্ম কেহ চায় না; এই দুর্লভ সম্ভবজন্মের পরেই চিরবুজি বলিয়া একটা-কিছু প্রার্থনা করে। কিন্তু কি উপায়ে তাহা লাভ হইতে পারে?

মরণের সময় যে বে-জন্ত দেখিয়া মরে, সে সেই জন্ত হয়, বর্জরজাতির মধ্যে একারের ক্রিয়াসত্ত্ব কোথাও কোথাও আছে। এ বিশ্বাসটাও একরাস্তরে আর্ধ্য-বৈশ্য পৌরাণিক ধর্মমতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভয়ত চিরজন্ম ভগ্নতা করিয়াছিলেন, তিনি নিশাপ, ভূও মরণের সময় হরিণটির

কথা মনে ছিল বলিয়া, তাহাকে হরিণ হইরা জন্মগ্রহণ করিতে হইল। মরণকালের চিন্তাটুকু সমগ্র জীবনের কর্ম অপেক্ষা ওজনে ভারি, এই বিশ্বাস হইতেই অনেক দুঃখচোর মৃত্যুর দরজার দাঁড়াইয়া একবার হরিনাম করিয়া যমদূতকে ঠকাইতে চায়। পাঞ্জি-সাহেবেরাও হাঁসপাতলি ও জেলে অনেক হিদ্দেনকে মৃত্যুকালে খ্রীষ্টমন্ত্র দিয়া অনন্ত-নরকের শঙ্কা হইতে উদ্ধার করেন। হাম্লেটের খুড়া মহাপাণিষ্ঠ; তবুও সে বধন উপাসনার বলিয়াছিল, হাম্লেট তখন তাহাকে বধ করিলেন না; কেন না, তাহা হইলে পাণিষ্ঠকে স্বর্গে পাঠাইবার উপকার করা হইত। সকল দেশেই এই ভাবটি প্রচুর বা স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

মরণকালে পণ্ড ভাবিলে যদি পণ্ড হইতে হয়, তবে ব্রহ্ম ভাবিলে একেবারে ব্রহ্ম হওয়া যাইতে পারে; এই হইল তর্কের ফল। ব্রহ্মের বধন জন্মমরণ নাষ্ট, তখন ব্রহ্ম হইয়াই জন্মমরণ তিরোহিত করা যাইতে পারে। আত্মা এবং ব্রহ্ম একই পদার্থ, এবং মায়া কাটাওয়া সেইটি বুঝিয়া ফেলাই মুক্তি; অদ্বৈতবাদের এই সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব অন্তর্দেশের লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। কিন্তু মরণের সময় ব্রহ্ম ভাবিলে ব্রহ্ম হওয়া যায়, এই বিশ্বাসটা হুচ থাকতে, অভি সূক্ষ্ম অদ্বৈতবাদটি এদেশের আপামর সাধারণের মধ্যে সহজ বিশ্বাসের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

অন্তরে বিশ্ববিশ্বাস হুচ করিয়া লোকাহ-রণের কার্যে যদি ব্রহ্মী হও, যদি পুণ্যমর

সংসারধর্ম কর, তাহাতে ঠিক মুক্তি হইবে না। কারণ লোকাঙ্কুরাগ থাকিলে তুমি “লোক” ইহঁবে, সংসারধর্ম করিলে তুমি সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইবে। ঈশ্বরবিদ্বেষে বললান্ত করিয়া সংসার করার নাম মোক্ষধর্ম নহে। সর্বকর্ম পরিহ্যাপ করিয়া ঈশ্বরচিন্তা করা চাই, মন হইতে সকল কথা ফেলিয়া দিয়া কেবল পরমাশ্রয়-সাধনা করা চাই। এটা নিতান্তই অসাধ্য-সাধনা। মনের যেমন গঠন, তাহাতে অল্প কথা মনে পড়িবেই পড়িবে। এই অসাধ্য-সাধনার অল্প একটা অনৈসর্গিক যোগবলের আশ্রয় লওয়া হইরাছে। যোগের প্রক্রিয়া-গুলির সমালোচনার তাহা স্পষ্টতর করিব।

যোগীশ্বরশাসনের ১ম পাদের ৩য় সূত্রে আছে—

“তদা ত্রৈঃ স্বরূপং বহনং” :

এবং সর্বশেষ সূত্রে আছে—

“পূর্ব্বার্শ্বপূজানাং শুধানাং প্রতিগ্রসবঃ কৈবল্যং ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা বা চিত্তিশক্তিরিতি ।”

মাহুয়ের বস্ত-কিছু গুণ আছে, বাহ্য-কিছু ধারণা বা চিন্তা আছে, সে সকল উড়াইয়া দিয়া আপনার চিন্তাজ্বররূপে অবস্থিতিই কৈবল্য। জন্মান্তরবাদ হইতে যদি সংসার-চক্রবাদের উৎপত্তি না হইত, তবে এই কৈবল্যের সৃষ্টি এবং এই কৈবল্যাভ্যন্তরে উপারতৃত যোগপ্রণালী প্রবর্তিত হইত না।

২৮ অলৌকিক-শক্তিসিঁপাসা ।

মাহুয় যথেষ্টশক্তিশালী হইলেও প্রাকৃতিক শক্তির কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হয়। যে ভাতি বস্ত পরিমাণে বহিঃ শক্তিকে পরাস্ত বা নিরাসিত করিতে পারে, সে ভাতি

তত সত্য বলিয়া গণিত। প্রাকৃতিক শক্তিকে কিয়ৎপরিমাণে নিয়মিত করিতে না পারিলে জীবনধারণ করা অসম্ভব; কাজেই উহার উপর সম্পূর্ণ প্রভুতাবিত্তারের আকাঙ্ক্ষা মাহুয়ের মনে স্বাভাবিক। মাহুয়ের বাহিরে শত্রু, ভিতরে শত্রু। আপনার প্রবৃত্তিগুলির উত্তেজনার বহু হুঃখভোগ করিতে হয়; সেগুলিকেও নিয়মিত করিবার প্রয়োজন। বস্ত করিলেও অসীম শক্তিপূজ পদানিত হয় না, কিন্তু জ্ঞানবিকাশ এবং প্রবৃত্তিগুলি নিয়মিত করিতে পারিলে আপনার মনের মধ্যে স্বর্গরচনা করা বাইতে পারে। উহা হইতে যে নৈতিকশক্তি লাভ করা যায়, তাহার কাছে শারীরিক শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর। সহজ পথে চলিয়াই মাহুয় এই সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে। উন্নতচরিত্র পুরুষেরা জ্ঞান এবং চরিত্রবলের বাহায়ে উহা সম্প্রাপ্ত অসুতব করেন। গুহাতিগুহ তথ বা প্রাণারামের দ্বারা উহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় না। এই আত্মশক্তির মহিমা-সম্বন্ধে শাস্তিপর্কের অমূল্য উপদেশে বাহা পাই, একালের যোগশাস্ত্রানভিজ্ঞ ইংরাজ-কবিবচনেও তাহাই পাই।

Self-reverence, self-knowledge, self-control.

These three alone lead life

to 'sovereign power,

Yet not for power (power of herself Would come uncalled for), but

to live by law,

Acting the law we live by without

fear.

সেকালের-একালের সহজ পথের পথিক জানীদের এই অভিজ্ঞতার কথাটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযমে ক্ষমতালাভ হয়; কিন্তু এই ক্ষমতার অল্প সাধনা নহে;—ক্ষমতাটা আপনা-আপনি জন্মিয়া থাকে।

বাহারী অলস এবং কর্ণভীক, তাহারা কুবেরের ভাণ্ডার হইতে অর্থপ্রত্যাশা করে; আকাশের দিকে তাকাইয়া সর্বপ্রকার জ্ঞান একু বল গাত করিতে চায়; “ভূত নামাইয়া জ্ঞানাতীত তত্ত্ব লাভ করিতে চায়, ভূতের বলে বলীমান হইতে চায়। শ্রমশীল অপেক্ষা অলসের আকাঙ্ক্ষা অধিক, অর্জনক্লেশ-নতিক্লেমা নিমেষের মধ্যে স্বপ্নলব্ধ সম্পদে রাজাধিরাজ হইবার কল্পনা করে। ঐ ত কর্ণশীল বুঝা, এত দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়াও অতি অল্পমান্য ধন সঞ্চয় করিল; সকল-প্রকার স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন করিয়াও অরোগ্য হইয়া মৃত্যুগুরে চলিয়া গেল। এমন কি কোন উপায় নাই, যদ্বারা শূলিমাটিকে সোনা করা বাইতে পারে; যদ্বারা শুণ্ডধনলাভের মত কিছু লাভ করিয়া জরা এবং মৃত্যুকে পরিহার করা বাইতে পারে ?

এ পৃথিবীর এমনি বিধ ন বৈ, যে ব্যক্তি আলস্যসুখলাভের অল্প কর্ণভোগ করে, তাহাকে অধিকতর কষ্টকর শ্রমে জীবনকর করিতে হয়। উপার্জনের ক্লেশ পরিহার করিয়া উদরপূর্তি করিতে হইলে, সুখশাস্তি হারাইয়া, স্নানিভাগরণ করিয়া, নিরন্তর শঙ্কিত থাকিয়া, চৌধ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। কুড়করেচকা দি করিয়া স্বাস্থ্যলাভ,

ইচ্ছামৃত্যু বা অমরত্ব লাভের চেষ্টা কি কঠোর পীড়াদায়ক !

প্রাণায়ামে বিশ্বাসের একটা স্বাভাবিক কারণ আছে। মানুষ দেখিতে পায় যে, শ্বাসরোধ হইলেই মানুষ মরে। তাহা হইলেই যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। দেখিতে পায় যে, পরিশ্রম করিলেই লোকে হাঁৎকাৎ করিয়া নিশ্বাস ফেলে, এবং অতিপরিশ্রমে শরীরেরও ক্ষয় হয়। তখন একটা অদ্ভুত জীবনতত্ত্বে বিশ্বাস হওয়া আশ্চর্য্য নহে যে, সমগ্র মানুষের জীবন হয় ত কোন-একটা নির্দিষ্টসংখ্যক শ্বাসপ্রশ্বাসের সমষ্টি। তাহা হইলেই যদি কোন উপায়ে ঐ শ্বাসপ্রশ্বাসকে বেশ নিয়মিত করিয়া লওয়া বাইতে পারে, এবং কুস্তকাদিদ্বারা সর্বদাই অনেক ‘হাতের পাঁচ’ বজায় রাখা যায়, তাহা হইলে “শতং সমাঃ” কেন, একেবারে অমর হওয়াও যাইতে পারে। কত মহাপুরুষ নাকি লক্ষ লক্ষ বৎসর নিশ্বাস ধারণ করিয়া গট্ হইয়া বসিয়া আছেন।

যখন সর্বাচিন্তানিরপেক্ষ হইয়া আত্ম-চিন্তার কথা উঠিয়াছিল এবং তাহার সঙ্গে অদ্ভুত প্রক্রিয়া এবং মন্ত্র বলে ক্ষমতালাভের কথা হইয়াছিল, তখন সহজপথের পথিক-দের আত্মজ্ঞান এবং আত্মসংযমের কথা নূতন অর্থ হইয়াছিল। তৎকথার সম্বন্ধে মহাপুরুষেরা যখন বলেন যে, বাহার চক্ষু আছে সে দেখিতে পায়, বাহার কর্ণ আছে সে শুনিতে পায়; তখন অনেকে বুঝিয়া থাকেন যে, আশ-দের স্বোপার্জিত চক্ষুইটি ছাড়া একটা দেবদত্ত সত্যিকার চক্ষু হুটিয়া উঠে এবং তাহার দ্বারা অতীন্দ্రిয় তত্ত্বগুলি পাছপাথরের মত

দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা লাভ করিতে
হইলেই অলৌকিক উপার চাই, ভূত চাই,
মন্ত্রতন্ত্র চাই। তখন sovereign power এর
নূতন অর্থ হয়। তখন নাকের ডগার
দৃষ্টি রাখিয়া, অরূপশূন্য সমাধি করিয়া, সত্য-
সত্যই “হস্তিবল” (যোগ ৩, ২৫ স্ব), ভুবন-
জ্ঞান (ঐ ২৭ স্ব), এবং তারাব্যাহজ্ঞান
(ঐ ২৮ স্ব) লাভ হয়; এবং “মূৰ্দ্ধন্যোতিধি
সিদ্ধদর্শনম্” (ঐ ৩৩ স্ব) ঘটে।

চরমলক্ষ্য নাকি কৈবল্য, কাজেই ঐ

করিত ক্ষমতার সম্বন্ধেও মহাপুরুষদের
অভিজ্ঞতার কথা বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ
Not for power, power of herself
would come uncalled for—অর্থাৎ বাঁটি
সোনা মাটির মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

আদর্শের হিসাবে ক্ষমতা চাই না বটে,
কিন্তু এই ক্ষমতালভের আশাই প্রথমত
যোগপ্রণোদক ছিল। অসীম ক্ষমতালভের
দ্রষ্টব্য হইতেই ভূতের আশ্রয়গ্রহণ এবং
অলৌকিক সাধনার অবলম্বন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দোল।



মানবমনের নিভৃতকুঞ্জে

হুলিছে হৃদয়দোলা

হৃদয়দেবতা হাসিতেছে বসি

উদাসীন আলাভোলা।

কখন সমুখে কখন বা পিছে

ছাঁদ-হিন্দোলা দোঁহুল হুলিছে

পলকের মাঝে লাগিছে বাঁধন

পলকে হতেছে খোলা

মানবমনের গোপনকুঞ্জে

হুলিছে হৃদয়দোলা।

উর্ধ্বে হুলিছে অসীম আকাশ

নিম্নে হুলিছে সিঁদু

মিথিল নিরন্ত নিজ নিজ পথে

তপন তারকা ইন্দু

কবে বেরেছিল সৃজনবাণী
সেই সে মোহন ধ্বনি অহুসরি'
বিশ্বজগৎ হুলিতেছে সাধে
বৃহৎ হইতে বিন্দু
উর্দ্ধে হুলিছে অসীম জগৎ
নিরে হুলিছে সিদ্ধ
ভিতরে বাহিরে চিরদিন ধরে'
হুলিছে জগৎ-দোলা
জগৎ-দেবতা হাসিতেছে বসে'
উদাসীন আলাভোলা।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

ইলেক্ট্রন।



তিনশত বৎসর পূর্বে গিলবার্টসাংহেব ও তাহার অনেক পরে প্রসিদ্ধ ঐচ্ছানিক ক্রাকলিন্ বলিয়াছিলেন,—প্রত্যেক জিনিষেই ধনাত্মক (Positive) ও ঋণাত্মক (Negative) নামক দুইপ্রকার বিদ্যুৎ আছে। যে জিনিষে ধনাত্মক বিদ্যুতের আধিক্য থাকে, তাহাকে আমরা ধনাত্মকবিদ্যুৎপূর্ণ বলি এবং বাহাতে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহাকে ঋণাত্মকবিদ্যুৎপূর্ণ বলিয়া থাকি। এই দুইজাতীয় বিদ্যুতের পরিমাণ কোন জিনিষে সমান থাকিলে, তাহাতে আঁক বিদ্যুতের লক্ষণ দেখা যায় না, কারণ তখন ধনাত্মক বিদ্যুৎ সমপরিমাণ ঋণাত্মককে টানিয়া রাখে।

খ্রিস্টবৎসর পূর্বে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক

রুর্কম্যান্ডওয়েল্ বলিয়াছিলেন—জলের যেমন নিজের কোন শক্তি নাই, বিদ্যুতেরও সেইপ্রকার কোনই শক্তি নাই। জল উঁচুস্থানে রাখিলে বা তাহাতে সবলে চাপাদি দিলে, তাহা দ্বারা যেমন অনেক কাজ করাইরা লওয়া যায়, বিদ্যুৎকেও আমরা সেইপ্রকারে চালাইরা কাজ করাইরা লইরা থাকি। আমরা তাপ-আলোক উৎপন্ন করিবার উপায় জানি, রাসায়নিক শক্তি বলিয়াছিলেন—বিদ্যুৎ প্রস্তুত করিবার উপায় আমরা জানি না। এই জিনিষটা প্রস্তুতই আছে, তাহাকে কোনপ্রকারে গতিমগ্ন করিতে পারিলেই, আমরা তাহার কাজ দেখিতে পাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যখন সল্কিউরিব্ এগিতে তাত্র ও যত্নের পাত দুবানো

যায়, তখন' বিদ্যুৎ প্রকৃত হয় না, বার্ষিক বিদ্যুৎক মচল করানো হয় মাত্র।

আজ 'জিশবৎসর ধরিত্রী ম্যাক্সওয়েলের শিবাগণ বিদ্যাতের পূর্বোক্ত মতবাদটি প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ জিনিষটা যে কি, তাহা এই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পরিষ্কার জানা যাইত না। কেবল অজ্ঞমানের উপর নির্ভর করিয়া ইহার। বলিতেন,—সম্ভবত জড়েরই কোন বিশেষ আকার বা ধর্মকে আমরা বিদ্যুৎরূপে দেখি।

এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ ম্যাক্সওয়েলের সিদ্ধান্তটিই নাড়াচাড়া করিয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি যে একটি নূতন মতবাদের কথা শুনা যাইতেছে, তাহাতে উহার সভ্যতার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। এই নব সিদ্ধান্তগণের মতে বিদ্যুৎ জড়ের বিশেষ আকার বা ধর্মের বিকাশ নয়; বিদ্যুৎই অবস্থাবিশেষে পড়িয়া জড়ের উৎপত্তি করে।

নূতন সিদ্ধান্তটি বৃদ্ধিতে হইলে, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ জিনিষগুলি কি, তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। ধনাত্মক বিদ্যাতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সিদ্ধান্তিগণ বলেন—জিনিষটার খুঁটিনাটি আজও ঠিক জানা যায় নাই। কিন্তু ইহা যে সর্বব্যাপী দেখরের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেরই বিশেষ গুণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অংশগুলির আরম্ভের সাধারণ পরমাণু (Atoms) অপেক্ষা বৃহত্তর নয়, কিন্তু পরমাণুজাতেরই যেপ্রকার গুরুত্ব দেখা যায়, ধনাত্মক বিদ্যাতের যেপ্রকার গুরুত্বের আজও কোন পরিচয়

পাওয়া যায় নাই। অধ্যাপক টমসন্, রদারফোর্ড ও সনর অলিভার লর্জ প্রভৃতি আধুনিক বড় বৈজ্ঞানিকেরা এ, সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

অতি অল্পদিনমধ্যে ঋণাত্মক বিদ্যাতের অনেক তথ্য জানা গেছে। এই জিনিষটা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়কণার আকারে অবস্থান করে। বৈজ্ঞানিকগণ এগুলিকে ইলেক্ট্রন (Electron) নামে অভিহিত করিতেছেন। বায়ুশূন্য পাত্রের দুই প্রান্তে তার লাগাইয়া বিদ্যুৎ চালাইলে, প্রবাহের সহিত, ইলেক্ট্রন-গুলিকে অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে দেখা যায় এবং এই প্রবাহ কোন প্রকারে অবরুদ্ধ হইলে, প্রবাহের কোটি কোটি ক্ষুদ্র ইলেক্ট্রনের আঘাতে অবরোধক জিনিষটা 'উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এবং শেষে তাহা হইতে এক-প্রকার আলোকও বাহির হইতে দেখা যায়। রনজেন্সিয়াম বা x-Rays কথা পাঠক সমস্তই শুনিয়াছেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রাটিনম্ প্রভৃতি গুরুভারবিশিষ্ট পদার্থদ্বারা ইলেক্ট্রনব প্রবাহ অবরুদ্ধ হইলে, ঐ রশ্মির উৎপত্তি হয়। লক্ষ লক্ষ ইলেক্ট্রন দ্রুত-গতির অসিয়া ধাক্কা দিতে থাকিলে, প্রাটিনমের অণুগুলি চঞ্চল হইয়া পার্শ্বের দ্রবরকণাসকলকে কাঁপাইয়া তুলে, এই কম্পনজাত আলোকই রনজেন্সিয়াম।

পূর্বে বলা হইয়াছে, ইলেক্ট্রনের আরম্ভের অত্যন্ত ক্ষুদ্র। একটি পরমাণু যে অতি ক্ষুদ্র স্থান অবরোধ করে, তাহার মধ্যে কোটি কোটি ইলেক্ট্রন অনায়াসে চলাফেরা করিতে পারে। এইজন্য ঐ অতি ক্ষুদ্র কণাগুলির প্রবাহ যে-কোন পদার্থদ্বারা

অবরুদ্ধ হয় না। আনুঘিনিয়ম্ প্রভৃতি লঘু-
ধাতুর কলক ইলেক্ট্রন প্রবাহের পথে ধরিলে,
চালুনিয় ছিদ্ৰ দিয়া ময়দার গুঁড়া বাহির
হওয়ার মত অধিকাংশ ইলেক্ট্রনই অবাধে
বাহির হইয়া পড়ে।

লৌহখণ্ডের নিকট চুম্বক রাখিলে লৌহ
আপনা হইতেই চুম্বকের নিকটে আসে।
ইলেক্ট্রনের প্রবাহের সম্প্রতি ঐ প্রকার একটা
গুণ দেখা গেছে। বায়ুহীন নলের ভিত্তর-
কার ইলেক্ট্রন প্রবাহের নিকট একখণ্ড
চুম্বক রাখ, — প্রবাহের পথ বাঁকিয়া চুম্বকের
নিকটে আসিবে। কতখানি চৌম্বকশক্তিতে
প্রবাহের পথ কতটা বাঁকিয়া যায়, হিসাব
করিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ
ইলেক্ট্রনসম্বন্ধে অনেক ব্যাপার আবিষ্কার
করিয়াছেন। ইহাদের পরীক্ষায় জানা গেছে,
ইলেক্ট্রনগুলি এত লঘু জিনিষ যে, তাহাদের
আটশতটির ভার একটি হাইড্রোজেন-
পরমাণুর ভারের সমান।

ধাতু ইত্যাদি পরিচালক পদার্থের ভিতর
দিয়া বিদ্যুৎ কি প্রকারে চলাফেরা করে,
বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্যন্ত তাহা নিশ্চিত বলিতে
পারিতেন না। আজকাল ইলেক্ট্রন লইয়া
বিদ্যুৎপরিচালনের যে একটি ব্যাখ্যান
দেওয়া হইতেছে, তাহা অনেকটা নিশ্চিতের
দিকে অগ্রসর করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।
অধ্যাপক টমসন্ ও লজ্জ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ
বলিতেছেন—তারের ভিতর দিয়া যখন
বিদ্যুৎ যায়, তখনই সমস্ত বিদ্যুৎস্রোত ছোট ছোট
ইলেক্ট্রনগুলি আত্মনির্ভর তারের অণুগুলিতে
তাহাদের বিদ্যুৎ চালিয়া দেয় এবং পরে
তাহারাই আবার পার্শ্বস্থ অণুতে সেই বিদ্যুৎ

চালাইয়া এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের উৎপত্তি
করে। অধ্যাপক লজ্জ তাঁহার একটি প্রবন্ধে
লিখিয়াছেন,—দূরস্থান হইতে ইষ্টকাদি বহিয়া
আনিতে হইলে, শ্রমজীবীরা সার দিয়া
দাঁড়াইয়া যেমন একের কন্ধ হইতে অপরের
কন্ধে ইষ্টক চালান দেয়, ধাতুর ভিত্তরকার
শ্রেণীবদ্ধ অণুগুলিও সেই প্রকারে বিদ্যুৎ-
পরিচালন করিয়া থাকে।

তরলপদার্থে বিদ্যুৎপরিচালনের ব্যাপা-
রটা কিছু স্বতন্ত্ররকমের। ধাতবপদার্থে
ইলেক্ট্রনগুলি যেমন ধাতুর অণুতে বিদ্যুৎ
চালিয়া দিয়াই মুক্তি পায়; এখানে সে প্রকার
হয় না। তরলপদার্থের কোন ছই অংশে
ব্যাটারির তার সংলগ্ন রাখিলে, তারের
এক প্রান্ত হইতে ইলেক্ট্রন প্রবাহ বাহির
হইয়া অপর প্রান্তের অভিমুখে ছুটিতে থাকে
এবং সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্ট্রনগুলি সেই তরল-
পদার্থের কতক কতক অণুকেও সঙ্গে করিয়া
লইয়া যায়। কোন প্রকার তার না চাপা-
ইলে বোড়া খুব দৌড়িয়া চলিতে পারে,
কিন্তু গুরুভার পৃষ্ঠ পড়িলেই তাহার গতি
আপনা হইতেই মন্ডর হইয়া আসে। এই-
প্রকার কারণে ধাতু বা বায়ুহীন স্থানের
বিদ্যুতের বেগের তুলনায় তরলপদার্থের
ভিত্তরকার বিদ্যুতের বেগ অনেক কম হইতে
দেখা যায়।

কেম্ব্রিজের বৈজ্ঞানিকগণ আর একটি
বিশেষবস্তু আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার
দেখিয়াছেন,—ইলেক্ট্রনের প্রবাহ হঠাৎ
চলিতে আরম্ভ করিলে বা কোন পদার্থদ্বারা
ইলেক্ট্রনের গতি বাধা পাইলে পার্শ্বস্থ উপর
আলোড়িত হইয়া যে একপ্রকার দৃঢ়

তরঙ্গের উৎপত্তি করে, তাহাই আলোকাদি-
বিকিরণের মূলকারণ। আলোক যে,
ঈশ্বরতরঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা
বহুদিন হইতে জানিরা আসিতেছি, কিন্তু
কিপ্রকারে সেই ঈশ্বরতরঙ্গের উৎপত্তি,
তাহা আমাদের জানা ছিল না। এখন বড়
বড় বৈজ্ঞানিকমাত্রেই অনুমান করিতেছেন,
—সম্ভবত ইলেক্ট্রনের গতির আকৃত্তিক পরি-
বর্তনে ঈশ্বরে যে তরঙ্গ জন্মায়, তাহাই
আলোকোৎপত্তির একমাত্র কারণ।

রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক জড়পদার্থের
অনুশীলন করিলে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন,

লৌহতাত্র ইত্যাদি অনেকগুলি মূলজড়ের
উদ্ভেদ দেখা যায়। বিজ্ঞানের যত্নে ঐ
কয়েকটি মূলপদার্থের সংযোগেই অগতির
সকল জিনিষই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ
পর্যন্ত এই প্রাচীন সিদ্ধান্তটির কেহই
প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কিন্তু ইলেক্ট্রনের আবি-
কারে ইহারো সত্যতার উপর অনেকের সন্দেহ
দেখা যাইতেছে। কয়েকজন খ্যাতনামা
আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন—ইলেক্ট্রনই
একমাত্র মৌলিকজড়। আমরা প্রবন্ধান্তরে
জড়তত্ত্বসম্বন্ধীয় এই নূতন কথাটির বিস্তৃত
আলোচনা করিব।

শ্রীজগদানন্দ রায় ।

প্রত্যাবর্তন ।



আমি এসেছি আবার ।

লও মাগো, লও কোলে, কবে গিয়েছিছ চ'লে,

আবার এসেছি ফিরে চরণে তোমার ।

নয় ইটকের তূপ, তারি মাগো কত রূপ,

খুঁজি নাই সৌধশোভা হৃদিনী মাতার ;

আমি এসেছি আবার ।

২

ধোঁবা সেই পূণ্যখুলি, ল'ব আজি শিরে তুলি,

সেই 'শিশু'তরুতল শৈশববিহার ।

সেই শেকালীর শাখে, কত ফুল ফুটে থাকে,

—পুরাতন স্মৃতি আগে আঁখো গড়ে তার ।

আমি এসেছি আবার ।

৩

শিকনুখে সেই গীত আনো করে পুলকিত
 কাশ্মীরে উতলা বাহু বহে অনিবার্য,
 তেমনি মধ্যাহ্নবেলা, পথে করে 'হোরি'-খেলা
 বুকে মুখে ধূলা ছুঁকে না করে বিচার !
 আমি এসেছি আবার ।

৪

সেই পুরাতন বট, তেমনি নদীর তট,
 তেমনি অলসে খেঁচা করে পারাপার ;
 তেমনি দাতক ঘাটে, বালকে সীতার কাটে,—
 উতলা করিয়া জল করে তোলপাড় ;
 আমি এসেছি আবার ।

৫

একদা ভরণ পাই— বাহিরিহু উদ্ভাস—
 লইয়া বিদায় মাগো, চরণে তোমার !
 হুয়ে দীপ্ত ভবিষ্যৎ দেখিহু চিত্তিতবৎ—
 দেশে দেশে অমিলায় বহি হুঃখতার ;
 আমি এসেছি আবার !

৬

বিবর্তনতার মাঝে সংসার ডাকিল কাজে,
 'গেল দিন, গেল মাস, গেল বর্ষ আর !
 অরি' তব বেহনুখ পাইতার কত হুখ,
 লয়ণ উঠিত কাঁদি করি হাহাকার !
 আমি এসেছি আবার ।

৭

অপরিচিতের মত, হুরিহু বিবশে কর্ত্ত,
 কাটিল কত-না দিন,—আশা-নিয়মার !
 বুকে কত কতজিহ্ব কে দেখিবে তোমা তির,
 কে ফেলিবে মোর হুখে বেহনেজানার !
 আমি এসেছি আবার ।

তোমার কল্যাণার্থে আমার আনিবে হর্ব,
 ছুটিবে হৃদয়মাকে বিরহ-আঁধার।
 তোমার আনন্দছবি, তোমার আকাশ, রবি
 আমার করিবে মাগো, পুলকসঞ্চার।
 আমি এসেছি আমার।

২

তোমার বাতাস এসে দ্রাণ ল'বে মোর কেনে,
 সর্বাঙ্গে বুলাবে কর আলোক তোমার;
 মাতৃ-আশীর্বাদ সহ সে যে নিত্য নিরুপম,
 তেমনি অকর আর তেমনি উদার।
 আমি এসেছি আমার।

ঐগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

ছুভিকপীড়িত ভারতে।

৪

ভীষণ শুভা।

এই সকল শুভাংশব, পৌরাণিক-সমস্ত
 দেবতাদিগের নামেই উৎসর্গীকৃত; কিন্তু
 যেগুলি সর্বাঙ্গের বৃহৎ, তাহার আর
 অধিকাংশই বৃদ্ধার দেবতা শিবের নামে
 প্রতিষ্ঠিত।

পূর্বকালে, বাহাদুরের চিত্তে নানাপ্রকার
 ভীষণ ও বিরাট কর্তব্য উদয় হইত, সেই
 সব মহা কত কত শতাব্দী ধরিয়া অতীব
 আগ্রহসহকারে পূর্ণতার প্রত্যাশা
 পূরিয়া এই সমস্ত শুভাংশব প্রভৃতি
 করিয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি

বৌদ্ধবৃক্ষের, কতকগুলি ব্রাহ্মণবৃক্ষের এবং
 কতকগুলি আরো প্রাচীন জৈনরাজাদের
 আমলের। সত্যতার বিভিন্ন বৃক্ষের মধ্যে
 দিয়া, বিবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়া; এই
 সকল আশ্চর্য ধননকার্য অব্যাবাহিক ও
 ধারাবাহিকরূপে ভারতীয়-তত্ত্বশিল্পিগণ-
 কর্তৃক সম্পন্ন হয়।

এ বিষয়ের বিনি সর্বাঙ্গের প্রাচীন
 লেখক, সেই 'মাহাত্ম্য' নামক একজন আরব
 এইরূপ বলেন:—আর একসময় খৃষ্টাব্দে
 এই সকল শুভাংশব অসীম মায়াবী ছিল;

ভারতবর্ষের সকল দিক্ হইতেই অসংখ্য রাজী এখানে ক্রমাগত আসিয়া উপস্থিত হইত।

একশে এই সকল গুহা পরিভ্রম্য হইয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টির কলে চতুর্দিক্ বৃক্ষ-শূক প্রদেশটি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই মৃতকল্প প্রদেশের অভ্যন্তরে এই গুহাগুলি কতকাল হইতে এইরূপ পরিভ্রম্য অবস্থার ও নিশ্চরতার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, তাহার নির্দেশ নাই।

অধুনা এই সকল গুহার উপনীত হইতে হইলে, একটা ছোটখাটো মরুভূমি অতিক্রম করিতে হয়; এই ভূমির বর্ণ-বৃগচর্ম্মের ভ্রার; ইহা সমুদ্রতটস্থ সৈকতভূমির ভ্রার সমতল; কেবল একএকটি নিঃসঙ্গ পর্বত ইতস্তত সমুখিত হইয়াছে। এই পর্বতগুলি যেন একটু বেশিরকম মানান্ধই; মাথার-মাথার সব একসমান;—দেখিতে কারাগারের ভ্রার—বৃহৎ দুর্গনগরের ভ্রার।

আজ আমি ভারতীয় শকটে করিয়া প্রথর রৌদ্রে এই বিজন প্রদেশ অতিক্রম করিলাম। রাজাপথের দুই ধারে মরা গাছগুলি খুঁটির মত সারি-সারি পোতা রহিয়াছে।

সন্ধ্যায়। সুখে, এটা মৃতনগরের উপজায়া পার হইয়া গেলাম—বাহা পূর্বে বৌলভাবাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং যেখানে নিকীর্ণিত হইয়া, তিনশত বৎসর হইল, গন্ধগান শেষ-মূল্যভান ইহলীলা সংবরণ করেন। পুরাতন চিত্রসমূহে, ‘ব্যাঙ্কলের টাওয়ার’ বৈরাগ বেধা যায়—তাহার সহিত অনেকটা এই মৃতনগরের সাক্ষাৎ হয় হইতে

উপলব্ধি হয়। ইহা একটি নগরগিরি,—একটি মন্দিরদুর্গ, একটি বৃহৎ শৈলখণ্ড—বাহা হইতে পূর্বকালীন মহর্ষ্যেরা ইহাকে খুঁদিয়া-কাটিয়া বাহির করিয়াছে;—বাহাতে ইমারতের মাগরসণা প্রয়োগ করিয়াছে,—বাহার আপাদমস্তক একটু মানান্ধই করিয়া গড়িয়া গিয়াছে এবং বাহা একশে বায়ুরাশি-সমুখিত মিশরীয় পিরামিড অপেক্ষাও অধিক বিশ্বরজনক বলিয়া বোধ হয়। ইহার কাছাকাছি শতশত সমাধিমন্দির ভগ্নদশাপন্ন হইয়া মাটির মধ্যে বসিয়া গিয়াছে। কত সূচ্যগ্রচূড়াবহুল দস্তর প্রাকারাবলী পরস্পরকে বেঠেন করিয়া রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। গন্ধগার ভ্রার এখানেও লৌহশলাকাবৃত তাঁজওয়ারা ভীষণ জোড়া-কপাটের মধ্য দিয়া তিতরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে জনপ্রাপ্তি নাই;—কেবলি নিশ্চরতা, তদ্যাবশেষ, আর ইতস্তত তক্ততরুসমূহ বিরাজমান; বটবৃক্ষগুলি ককালসার,—উহার শাখাশ্রাখা হইতে দীর্ঘ কেশ-শুচ্ছের ভ্রার শিকড় নামিয়াছে। আবার আমরা সেইরূপ তাঁজ-কপাটের দরজা দিয়া বাহির হইলাম,—সেইরূপই একেজো ও সেইরূপই ভীষণ-বর্ষে আবৃত।

পূর্বদিকে উক্ত শৈলভূমি বিপন্ন পর্বাভ প্রসারিত। আঁকা-বাঁকা পথ দিয়া উপরে উঠিতে হইল। আমাদের মহরগানী শকটের পিছনে-পিছনে আমরা পদব্রজে চলিতে লাগিলাম। এখন সূর্য্যোত্তের সময়। বেদের অভাবে বেশ মৃতকল্প,—তথাপি সূর্য্যোত্তের সেই একই অপরিবর্তনীয়

আরক্তিম ভাবর-মহিমা । আমরাও যেমন উপরে উঠিলাম, আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই দৌলতাবাদ—ধ্বজচূড়া-প্রাকার-মন্দির-সম্বিত সেই ভীষণ দৌলতাবাদ যেন মত্ত উত্তোলন করিয়া খাড়া হইয়া উঠিল; সুত আকাশে, দেবকিরীটের ভায় অন্ততাহর কিরণচ্ছটার মধ্যে, দৌলতাবাদের অবয়ববোধে কুটিয়া উঠিল। এদিকে সেই নিম্নতম অসীম লোহিত ক্ষেত্রভূমিতে যেন আগুন জ্বলিতেছে বলিয়া বোধ হইল, সেখানে জীবনের নিদর্শনমাত্র নাই ।

এই উচ্চ শৈলভূমির উপর আরো একটা ধ্বংসাবশেষ আমাদের জন্ম প্রতীক করিতেছিল;—“রথাস্” নামক একটা অত্যন্ত-মুসলমানী-ধরণের নগর;—“পোডো” মসজিদ ও সুরু-সক তদুপর ধ্বজস্তম্ভে আচ্ছন্ন। উহার প্রাকারাবলীর সন্নিকটে রানিরাশি সমাধি-পুস্ত সন্ধ্যার আলোকে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রাজি যখন আসন্ন, সেই সময়ে এই সব প্রাণশূন্য রাজপথের ধারে-ধারে উকীষবানী কতকগুলি লোক পাথরের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিলাম। এই দৃষ্টান্ত বৃদ্ধগণ এই নগরের শেব-অধিবাসী; শুধু এই সব মসজিদের বাহ্যিকোন্ন খাতিরেই উহারা এখানে “মাদী কাম্‌ড়াইরা” পড়িয়া আছে।

তাহার পর আর একঘণ্টাকাল আর-কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না—কেবল সেই একঘেরে ভায়ল শৈলরাশি—সারাহুর মহা-নিম্নতমার মধ্যে সমুখে প্রসারিত ।...

পরে হঠাৎ এমন-একটা আশ্চর্য্য পদার্থ—

অসম্ভব পদার্থ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল—বাহা দেখিয়া এবং কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, প্রথম মুহূর্ত্তে মনোমধ্যে যেন একটু ভয়ের উদয় হয়। সমুদ্র! সমুদ্র আমার সমুখে উপস্থিত, অথচ আমি মধ্য-ভারতে নিজামের রাজ্যে রহিয়াছি। অধিত্যকাত্মির উপর একটা কুঠারখনিত বৃহৎ গহ্বর—সেইখানেই যেন সমস্ত সেই “ভগ্নজিত অসীম” পূর্ণমহিমার প্রসারিত। বিস্তীর্ণ শৈলভূমির উপর হইতে নিরন্তর অধিত্যকাত্মি আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। এই উচ্চ শৈলভূমির ধার দিয়া আমাদের বাজাপথ। এই সময়ে নির্রদেশ হইতে একটা প্রবল বাতাস উঠিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া পৌছিল; এ বাতাসটা তেমন গরম নহে—যেন কতকটা খোলাসমুদ্রের হাওয়া ।...

এই শৈলভূমির পরপারে হাজাপোড়া ভাঁড়া-মাদীর যে শুষ্কক্ষেত্র প্রসারিত—সেইখানেই এই বাতাস ধূলা-বালির চেউ উঠাইয়া সমুদ্রের মত সফেন তরঙ্গভঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে।

তা ছাড়া, আমরা আমাদের বাজাপথের শেবসীমার সবেমাত্র আসিয়া পৌছিরাছি, এখনো ওহার ০ লেশমাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই ওহাঙলা আমাদের নিরে—ঐ বিবাদময় কমিত-সমুদ্রতটের ধারে-ধারে—বিস্তীর্ণ শৈলভূমি কাটিয়া প্রসৃত হইয়াছে; এবং ঐ জলহীন সমুদ্রের সমুখেই এই ভীষণ ওহাঙলা মুখব্যাদান করিয়া আছে।

এখন রাজি, আকাশে তারা জলিতেছে; আমার শকট একটা কুজ পাহাশালার সমুখে আসিয়া থামিল। আমার আতিথ্যকারী—পলিতকেশ হুইজন বৃদ্ধ ভারতবাসী আমার অভ্যর্থনার জন্য তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের কৃত্যগণকে—বাহারা “আলতামি” করিয়া নিকটস্থ মাঠে বেড়াইতেছিল—উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন।

আজ রাজি আমাকে শিবের শুভার লইয়া বাইতে কেহই সম্মত হইল না। তাহার কারণ, আজ রাজিটা অপেক্ষা করিয়া কাল দিনে গেলেই ভাল হয়। অবশেষে একজন ছাগপালক রাখাল কিছু অর্থের লোভে আমাকে লইয়া বাইতে সন্মত হইল। আমরা সঙ্গে একটা হাত-ল্যাঠান্ লইয়া বাজা করিলাম। নীচে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবেশপথে বাইবার সময় ল্যাঠান্টা আলাইতে হইবে।

আজিকার রাজি চন্দ্রহীন, কিন্তু বেশ বহু পরিষ্কার; চকু অন্ধকারে একটু অত্যন্ত হইলেই, এই রাজিকালেও বেশ দেখা যাইবে। এখন সেই সাগরচ্ছন্নবেশী নিরঙ্কুশে অবতরণ করিতে হইবে। প্রায় ৬৭ শত-গজ-পরিমাণ একটা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলুম। চারিদিক্ নিরঙ্কুশ, আকাশে তারা ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে। কুঠারাহত খোদিত শৈলগণ বেন মন্বন্তিক বাতনার অতিভূত। এখানকার সকল পদার্থেরই ভাষা—“ক্যাঙ্কটাস্”—গাছগুলোও শুকনো, কিন্তু তবু এখনো খাড়া হইয়া আছে। ইহার শুক-কঠিন শাখাগুলো ভালওরালা কাড়ের বড়-বড় নোমবাতির মত দেখিতে হইয়াছে।

বাহা উপর হইতে সমুদ্রতট বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই ভটরেখা অহসরণ করিয়া বধন চলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন সেই নীচে, অন্ধকার যেন আরো ঘনাইয়া আসিল। উচ্চ শৈলভূমির আড়ালে বেখানে ছায়া পড়িয়াছে, সেই শৈলভূমির পাদদেশে এই ক্রান্ত সমুদ্রটি অবস্থিত। রাজির প্রায়শ্চেষ্টে যে-একটা ছোঁয়াবাতাস উঠিয়াছিল, তাহা এখন শান্ত হইয়াছে। এখন কোথাও আর সাড়াশব্দ নাই। এই স্থানটির কি অপূর্ণ গাভীরা!

পূর্ব্বতের পার্শ্বদেশে শুভার প্রবেশপথ-ওলা মুখব্যাঘ্রান করিয়া রহিয়াছে। এই শুভার মুখ চারিদিক্কার অন্ধকার হইতে আরো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। শুভাওলা এত প্রকাণ্ড যে, উহা মাহুকের রচনা বলিয়া মনে হয় না—আবার এতটা মানান্‌সই যে, নৈসর্গিক পদার্থ বলিয়াও বোধ হয় না।...

আমরা একটুও না থামিয়া বরাবর চলিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার সেই পথপ্রদর্শক একটু ইতস্তত করিতেছিল; কিন্তু একটু পরেই কি জানি কি ভাবিয়া, একটা মুখ-ঝাঁকানি দিয়া, আমাদের সহিত আমার চলিতে লাগিল। বোধ করি, বেখানে আমাদের লইয়া বাইবে মনে করিয়াছিল, সেইখানে বাইতে তাহার মনে দেবতারির ভয় কিংবা এন্নি-একটা সান্নিধ্য তরের উদয় হইয়াছিল। এখানকার এক-একটা স্থান যে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী উন্নত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার মুখের ভাবে মনে হইতেছিল, সে সেন আমাকে এইরূপ বলিতেছে—“না, আর

বেশীদূর গিয়া কাজ নাই—এই পর্য্যন্তই বখেট ১” কিন্তু পরে সে আমার সহিত শৈশবালিত প্রতররাশির মধ্য দিয়া,—ক্যাক্-টাস্-গাছের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে সেই অন্ধকারায় শুভাশুভে, প্রবেশ করিল। এখন এই স্থানটি আমার নিকট তীব্র-সুন্দর বলিয়া মনে হইল। কিন্তু আমি বেশ মূর্খিতে পারিতেছি, পথপ্রদর্শক আমাকে যে-স্থানটি দেখাইতে সাহস করিতেছে না, তাহার কাছে ইহা কিছুই নয়।

বোড়সওয়ারদিগের ক্রোড়াহানের ভার মুক্তাকশ বৃহৎ প্রাকগনসূহ সেই সব প্রকাণ্ড পাখাপত্ন হইতে—সেই আদিমকালের পর্বত হইতে কাটিয়া বাহির করা হইরাছে। উহার দেয়াল এক উচ্চ বে, মনে হয় যেন এখন মাথার ভাঙিয়া পড়িবে। দেয়ালের গারে,—মোটো-মোটো খাটো খামের চার-খাফ বারতা-দালান উপস্থাপিত স্থাপিত। এই দালানের বরাবর ধারে-ধারে অসামান্য-দেহপ্রমাণ গারি-গারি দেবমূর্তি,—যেন নাট্যাঙ্গনে মূক্যর অভিনয়ে কতকগুলো লোক অসাড় ও তন্তিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। রাজির অন্ধ-কারে সমস্তই কালো দেখাইতেছে। এই সব দালানের মাথার উপর তারকাখচিত আকাশ ভিন্ন আর-কিছুই নাই। তারার এই অশ্লষ্ট তরল আলোকে আমরা সেই বিরাট মূর্তিগুলো দেখিলাম। উহারা যেন নরকের ভার আমাদেয় আগমন নিরীকণ করিতেছিল।

এইরূপ এক-এক-সার শুভা বে কত রহিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। এইরূপ প্রত্যেক শুভার সার,—কোন বিশেষ সময়-

কার লোকদিগের সমবেত উত্তম ও প্রকৃত প্রমেরকল।

আমার পথপ্রদর্শক ছাগপালক প্রথমে তর পাইরাছিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে এই সব ভয়ানক স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমশ তাহার সাহস কমিল। একদে ঘোর-অন্ধকার একটা শুভার মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় সে তাহার হাতল্যাঠান্টা জালিল। আর এখন আমাদের মাথার উপর আকাশের তারা নাই—তাহার স্থানে পর্বতের মূল প্রতররাশি প্রসারিত। ইহা একটা চাকাপথ—হুই ধারের প্রাচীরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই শুভা “গবিক্ ক্যাখিডালের” মধ্য-দালান-মণ্ডপের মত উচ্চ ও গভীর। মনুষ্য দেয়ালের গারে পশু-পক্ষীর মূর্তির অল্পকরণে উৎকর্ষ এরূপকার ছোট-ছোট খিলান রহিয়াছে। শুভার ভিতরে গিয়া মনে হয়, যেন একটা বিরাট-কার কস্তর দেহের শূভগর্ত খোলের মধ্যে রহিয়াছি। এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে আমা-দের ল্যাঠান্টা এমন মিটমিট করিয়া জলিতে ছিল যে, কিছুই প্রায় দেখা বাইতেছিল না। এই দীর্ঘ দালানের মধ্যে মনে হইল, যেন জনপ্রাণী নাই। কিন্তু শুভার পশ্চাত্তাগে একটা আকৃতি স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইল;—২০ কি ৩০ ফুট উচ্চ একটি নিঃসঙ্গ বিগ্রহ সিংহাসনে আসীন; পশ্চাত্ত হইতে তাহার ছায়া মণ্ডপের খিলান-ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং সেই ছায়া আমাদের ল্যাঠানের চলন্ত আলোকের সঙ্গে সঙ্গে যেন নাচিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত স্থানটির ভার এই বিগ্রহও সেই-একই ভ্রামল প্রস্তরে নির্মিত;

কিন্তু তাহার বিরাট দেহ লাল-রঙে রঞ্জিত। বড়-বড় শাদা চোখ;—কালো-কালো চোখের ডায়া যেন আমাদের দিকে অবনত; মনে হয়, যেন তাহার নৈশ শক্তির ব্যাঘাত হওয়ার একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার নিতুঙ্কতা এরূপ সুখর যে, আমাদের কথা শেষ হইয়া গেলেও, আমাদের কর্তব্যের অঙ্গুরণন অনেককণ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। বিগ্রহের একদৃষ্টি-চাহনিতে আমরা যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। বাই হোক, আমার পঞ্চপ্রদর্শক ছাপপালকটির এখন আর কোন ভয় নাই; সে এখন প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে, এই সকল প্রস্তরবিগ্রহ, যেমন দিবসে, তেমনি রাত্রিকালেও অচল, স্থির। শুধা হইতে বাহির হইয়া তাহার ল্যাঠান্ নিবিয়া, গেলে, সে ইচ্ছা করিয়া আবার ফিরিয়া চলিল; আমি বুঝিলাম, আগে যে-কিনিয়ের কাছে বাইতে সাহস করিতেছিল না, এখন আমাকে তাহার কাছে লইয়া বাইতে চাহে। যে বালুকারাশি সমুদ্রের সৈকতবেলাভূমিকে স্রবণ করাইয়া দেয়, সেই বালুকারাশির উপর দিয়া আমরা দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম;—শৈলভূমির রেখা অনুসরণ না করিয়া এবার তাহার উন্টামিকে চলিলাম। সেই স' প্রবেশপথের সম্মুখে আর থামিলাম না। কেন না, আমরা পূর্বেই তাহার রহস্তভেদ করিয়াছি।

যখন আমরা শেষসীমার আসিয়া পৌছিলাম, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। আমার পঞ্চপ্রদর্শক আবার তাহার ল্যাঠান্ আলিল এবং আলিয়া একটু পিছু হটিয়া

দাঁড়াইল। বোধ হয়, যেখানে: আমরা বাইতেছি, সে স্থানটা খুব অন্ধকার।

সর্কাপেক্ষা এই প্রবেশপথটি অধিকতর ভীষণ। কারণ, এইমাত্র যে বিগ্রহগুলি দেখিয়া আসিলাম, তাহাদের ডায় এই দারদেশের মূর্তিগুলা শাস্তচিত্র নহে—পরন্তু যেন রোষের আবেশে ও কষ্টযাতনায় আড়ষ্ট হইয়া থিয়াছে—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁকাইয়া ফেলিয়াছে; এই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে এত কম দেখা যায় যে, কোন্ মূর্তিগুলি পাথর কাটিয়া গঠিত এবং কোন্গুলিই বা পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ, তাহা নির্কাসন করা কঠিন। এই গণ্ডশৈলগুলাও, এই অতিভারাক্রান্ত পাথরতৃপগুলিও যেন অবসরভাবে শুইয়া পড়িয়াছে; যেন তীব্র যাতনায় উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। আমরা এখন শিবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত;—সেই শিব,—বিনি মৃত্যুর দেবতা, সংহারের অস্ত্রই বিনি সংহার করিয়া থাকেন, সংহারেই বাঁচার আনন্দ।

এই দারদেশের নিতুঙ্কতার কি-যেন-একটা বিশেষত্ব আছে—একটা বিশেষ-প্রকারের ভীষণতা আছে। এই গণ্ডশৈল-সমূহ, এই সব মানবাকার বিরাটমূর্তি, এই সব প্রস্তরীভূত মূর্তিমান কষ্টগুলা, এই সব স্তম্ভিতকায় সাক্ষাৎ যন্ত্রণাগুলি—দশ শতাব্দী হইতে এই মহানিতুঙ্কতার মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে;—এ সেই নিতুঙ্কতা, বাহা একটু নিখাসপাতেই সুখরিত হইয়া উঠে,—যে নিতুঙ্কতার মধ্যে আপনার পদশব্দ শুনিয়া বিচলিত হইতে হয় এবং আপনার প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাস যেন স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

এখানে আর সমস্তই প্রত্যাশা করিতে-
ছিলাম, কিন্তু কোন শব্দ শুনিব বলিয়া
প্রত্যাশা করি নাই । কিন্তু গুহার প্রথম
মণ্ডপটিতে যেই আমরা পদার্পণ করিয়াছি,
অমনি হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ হইয়া সমস্ত
হান কাঁপিয়া উঠিল । ঘড়ির ঘুম-ভাঙানো
ঘটাটির কলকাটি স্পর্শ করিলে হঠাৎ ঘেরূপ
বাতিয়া উঠে, সেইরূপ একটা শব্দ এক
সেকেন্ডের মধ্যে গুহার গভীরতম দেশ
পর্যন্ত পচারিত হইল । যাহারা উপরের
প্রস্তরবাশির মধ্যে ঘুমাইতেছিল, - চীল,
শেচক, শকুনি প্রভৃতি সেই সব শিকারী
পাখী জাগিয়া-উঠিয়া পাখার বাপ্টা
দিতেছিল,—পার্শ্বপরিবর্তন করিতেছিল ।
ইহা ভাঙারই শব্দ । এই সমস্ত সমবেত-ধ্বনি
গুহার স্বাভাবিক-সুখরতা-প্রভাবে পতি-
ধ্বনিত হইয়া অতিরিক্তপরিমাণে বদ্ধিত
হইল । পরে ক্রমশ প্রশমিত হইয়া শব্দটি
দূরে চলিয়া গেল,—খামিয়া গেল । আবার
সেই ঘোর নিশ্চুপতা ।

এই শুভপরিবেষ্টিত গম্বুক-আচ্ছাদিত
মণ্ডপটি হইতে বাহির হইয়াই
মাথার উপর আবার তারা দেখিতে
পাইলাম । কিন্তু এই তারাগুলো আকাশের
ফাঁকে মাঝে-মাঝে দেখা যাইতেছে—যেন
একটা গহবরের গভীরদেশ হইতে দৃষ্ট
হইতেছে । এখন আমরা কতকগুলো
বৃক্ষাশ্রয় প্রাক্কণের মধ্যে দিয়া চলিতেছিলাম ।
একটা সমগ্র পর্বতের আশ্রয়ানা তুলিয়া-
ফেলিয়া এই প্রাক্কণগুলো প্রস্তুত হইয়াছে ।
ইহা হইতে যে প্রস্তর বাহির হইয়াছিল,
তাহাতে নিশ্চয়ই একটা নগর নির্মিত হইতে

পারে । এই প্রাক্কণগুলোর বিশেষত্ব এই যে,
উহার দেয়াল ২০০ ফীট উচ্চ এবং উহার গায়ে
থাকে-থাকে কতকগুলি বারঙা-দালান
উপযুক্ত স্থাপিত এবং অসংখ্য বিগ্রহ
বুদ্ধোদ্ভূত মৈত্রেয় জ্ঞান সারি-সারি সজ্জিত ।
এই সব প্রাক্কণপ্রাচীর ভারকেন্দ্রচ্যুত
হইয়া ভীষণভাবে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে । এই
প্রাচীর এক-একটা অথবা কতিন প্রস্তর-
খণ্ডে নির্মিত ; উহার আপাদমস্তক কোথাও
একটি ফাট নাই, চীল নাই । প্রাক্কণের
এই দেয়ালগুলো খুব ঝুঁকিয়া থাকায়
গুহার আকার ধারণ করিয়াছে, এবং একরূপ
ভাঙ্গন, যেন আমরা দিগকে গ্রাস করিতে
উদ্যত ।

ওদিককার কতকগুলো প্রাক্কণ একেবারে
খালি । কিন্তু এই প্রাক্কণগুলো বিরাট পদার্থ-
সমূহে আচ্ছন্ন,—ক্রমসঙ্কীর্ণ চতুর্কোণ
স্বয়মল্লির (obelisk), পর্বতের উপর স্থাপিত
হস্তী, মন্দিরের দ্বারপ্রকোষ্ঠ, দেবালয়
প্রভৃতি । এখন আর দিক্‌দিক্‌র রাজি । এই
অসংখ্যের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র দীপটি
বিলান হইয়া গিয়াছে । সুতরাং এখানকার
সমগ্র নক্সা কল্পনাটি যে কি, তাহা এখন
নির্ধারণ করা অসম্ভব । এখন চতুর্দিকে
কেবল প্রাচুর্য্য ও ভীষণতাই লক্ষিত
হইতেছে । যাইতে যাইতে কোথাও বা
প্রস্তর-অঙ্কিত একটা বৃহৎ শব্দমূর্তি, কোথাও
বা কোন নরকঙ্কালের অথবা দৈত্যের মুখে
অঙ্কিত বিকট হাস্যরেখা মুহূর্তকাল বিছাতের
জ্ঞান ক্ষুরিত হইয়া আবার তখনই সেই
বিশৃঙ্খল পদার্থরাশির মধ্যে মিশিয়া
যাইতেছে ।

প্রথমে আমরা শুধু কতকগুলি নিঃসঙ্গ হস্তী দেখিয়াছিলাম ; এখন দেখিতেছি, কতকগুলি হস্তী দল বাঁধিয়া সারি-সারি দণ্ডায়মান, তাহাদের শুঁড়গুলি নীচের দিকে ঝুলিয়া আছে । আরো কতপ্রকার জীবজন্তু হাতপা খিঁচাইয়া মরণকে যেন ভ্যাংচাইতেছে । ইহাদের মধ্যে এই হাতীরাই শাস্তমূর্তি । মধ্যস্থলে অথও-প্রান্তরের যে তিনটি বৃহৎ মন্দির—এই হস্তীরা পেই মন্দির পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ।

এই সকল মন্দির ও গুহার চতুর্দিকে সেই যে ভীষণ দেয়ালগুলি—এই উত্তরের মধ্য দিয়া একপ্রকার চক্রাকার পথে আমরা চলিতে লাগিলাম । মধ্যে-মধ্যে তারা দেখা বাইতেছে । তারাগুলি এত দূরবর্তী বলিয়া পূর্বে আমার কখন মনে হয় নাই । সর্বত্রই প্রচণ্ড সূতিসমূহের মধ্যে জড়াজড়ি-জাপ্টাজাপ্ট, দৈত্যদানবের যুদ্ধ ভীষণ মৈধুন, মহুব্যদেহের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়াছড়ি । উহাদের মধ্যে কাহারো অস্ত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তবু পরস্পরকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া আছে । এখানে শিব, শিব, ক্রমাগতই শিব । শিব—বাহার ভূষণ সুশ-মালা ; শিব—যিনি অগ্নি সৃষ্টি করিয়া আবার লঙ্ঘন করিতেছেন ; শিব—যিনি দশদিকেই সমানভাবে সংহার করিতে পারিবেন বলিয়া বহুবাহ হইয়াছেন ; শিব—বাহার মুখে মর্শ্বাস্তিক প্রচ্ছন্ন উপহাসের কুটিল রেখা ; শিব—যিনি পঙ্কজ বিনাশ করিবেন বলিয়াই এখন নির্দয়রূপে সম্মান উৎপাদন করিতেছেন ; শিব—যিনি ধ্বংসাবশেষের উপর, ছিন্নমূল বাহুসমূহের উপর, ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-

রাশির উপর হকার ছাড়িয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন ; শিব—যিনি কতকগুলি ক্ষুদ্র মৃতবালিকাকে পদদলিত করিয়া উন্মত্ত-আনন্দে হস্ত করিতেছেন এবং তাহার পদাঘাতে ঐ সব শব্দমুগ্ধ হইতে মস্তিষ্ক উছলিয়া পড়িতেছে । আমাদের ল্যাপ্তানের আলো নীচের দিকে বিকীর্ণ হওয়ার, শুধু নিম্নস্থ ভীষণ দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে কোন-কোনটা একএকবার প্রকাশ পাইয়া আবার তখনি অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া বাইতেছে । স্থানে-স্থানে এইসব সৃষ্টি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে—বহু-শতাব্দীর ঘর্ষণ-স্পর্শনে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । একটা-কিছু ভূষ্টিগোচর হইবামাত্রই অন্ধকার যেন তাহার উপর একটা-ভুলি বুলাইয়া দেয় এবং তখনি উহা সেই চকল তমোররাশির মধ্যে কোথায় যেন ছুটিয়া পলায়—শৈলরাশির সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, আর ভূষ্টিগোচর হয় না, কোথায় গিয়া ধামিল বুঝা যায় না । তখন এইরূপ মনে হয়, যেন সমস্ত পর্বতটা—তার জননদেশ পর্যন্ত—কেবল কতকগুলি অস্পষ্ট ভীষণ আকৃতিতে সমাজ ; সমস্তই যেন বিলাস ও বিনাশের দৃষ্টে পরিপূর্ণ ।

মধ্যস্থলের মন্দিরগুলি পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া হস্তিগণ সারি-সারি দণ্ডায়মান ; ইহাদের বেশপ শাস্ততাব, তাহাতে এ স্থানের পক্ষে ইহাদিগকে “বেহুরো” ও “বেখাপা” বলিয়া মনে হয় । কিন্তু এই মন্দিরগুলির অপর পার্শ্বে গিয়া দেখিলাম, উহাদের সমান-উচ্চ আর কতকগুলি হস্তী অন্তান্ত জীবজন্তুর ভার বুঝাবুঝি ও বহনায় ভাবতলী প্রকটিত করিতেছে ; কতকগুলি বাঘ ও কতকগুলি

কল্পিত জীবজন্তু এই হস্তোদ্ভিদকে চাপিয়া ধরিয়াছে অথবা উহাদের উদয়ে দংশিত করিতেছে । একে ত উহাদের দেহের পশ্চাৎ-ভাগে দেয়ালের ভার চাপিয়া থাকার উহারা যেন অর্ধনিঃশ্বাসিত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাতে আবার পরস্পরের মধ্যে প্রাণপণে যুদ্ধ চলিতেছে । এই পাশটোতেই গুহার প্রাচীর—সেই আদিম ভূত্বরের পাবণরাশি—সর্কাপেক্ষা বেশী কুঁকিয়া রহিয়াছে । এই প্রাচীরের দশ কিংবা বিশ ফিট উচ্চে অত্রত্য অসংখ্য মূর্তিগুলায় প্রথম রেখাপাত আরম্ভ হইয়াছে । প্রাচীরের সমস্ত তলদেশটা ক্ষীত উদয়ের দ্বার মন্থণ ; স্থানে-স্থানে যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে—এই ফুলগুলা দেখিলে মনে হয় যেন খুব তলতলে নরম ; এই ক্ষীত প্রস্তররাশি মনে হয় যেন কালো ঘূর্ণিজলের পার্শ্বদেশ—মনে হয় যেন অত্রত্য ইমারৎ-আদি হইতে “বানডাকা”র মত ক্ষীত জলরাশির একটা প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে, আর যেন সমস্ত ইমারৎ এখনি ভাঙিয়া পড়িবে এবং আমরা সকলেই তাহাতে চাপা পড়িয়া বাইব ।...

অথও প্রস্তরের যে মন্দিরগুলা হস্তিপৃষ্ঠের উপর সংস্থাপিত এবং বাহা খোদিত পর্কতে পরিবেষ্টিত—তৎসমস্তই আমরা প্রদক্ষিণ করিলাম । এখন কেবল বাকি উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা ; কিন্তু আমার পথ-প্রদর্শক একটু ইতস্তত করিতেছে—কলাকার হর্যোদয় পর্বত অপেক্ষা করিতে বলিতেছে ।

যে সিঁড়ি দিয়া ঐ সকল মন্দিরে প্রবেশ করা যায়, ঐ সিঁড়ির ধাপগুলা ভাঙিয়া-চুরিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে ;—অগ্নপদের অবি-

রত গতায়তে মন্থণ হইয়া একরূপ পিছল হইয়াছে যে, বিপদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ।

না ভাবিয়া-চিন্তিয়া, কেবলমাত্র স্বাভাবিক সংস্কারের বশে, আমরা নিস্তব্ধভাবে অতি সাবধানে উপরে উঠিতে লাগিলাম । কিন্তু ছোটখাটো কোন-একটা পাথর যেই নড়িয়া উঠে,—কোন-একটা ছুড়ি যেই গড়াইয়া যায়, অমনি উহার শব্দে প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠে, আর আমরাও অমনি ধমকিয়া দাঁড়াই । এখন আমাদের চতুর্দিকে বিবিধ ভীষণদৃশ্যের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইতেছে । কোথাও কোন শিব বিবিধপ্রকার মুখভঙ্গি করিতে-ছেন ; কোথাও কোন শিব কুঞ্চিত হইয়া আছেন ; কোথাও কোন শিব স্বীয় লীর্ণ-শরীরকে ধমুকের মত বাঁকাইয়াছেন ; কোথাও কোন শিব স্বীয় মাংসলবন্ধ ফুলাইয়া আছেন ;—কোথাও জননক্রিয়ার বিহ্বল, কোথাও জননক্রিয়ার উন্মত্ত ।

এই ঘন-অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় সঙ্গে কোন অস্ত্র লই নাই, একগাছি ছড়িও লই নাই, লওয়া আবশ্যকও মনে করি নাই । কোন মনুষ্য কিংবা হিংস্রপশুকর্তৃক আক্রমণের সম্ভাবনা আছে বলিয়া একবার মনেও, হয় নাই । তথাপি, কে জানে কেন, আমিও পথপ্রদর্শক ছাপপালকের দ্বার ভয়ে ক্রমশ অভিভূত হইয়া পড়িলাম ;—একপ্রকার “অন্ধকেরে” “কিস্ত-কিধাকার” ভয়—যে ভয়ের কোন নাম নাই—বাহা বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না ।

যে সকল ভীষণ দৃশ্য চারিদিকে প্রসারিত—তাহারই কোন চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত—সাক্ষাতিক নিষ্ঠুর ব্যাপারসমূহের একটা চরম আভিষ্য,

—এইবার মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া দেখিব, মনে করিতেছিলাম। কিন্তু না,—এখানকার সমস্ত পদার্থেরই মহাজ শাস্ত্যাব। ঠিক যেন মরণভ্রাসের পর মহাশাস্তি আসিয়া মৃত্যুর পরপারে আমাকে অভিবাদন করিল। এখানে মমুষ্য কিংবা পশুর কোন প্রতিকৃতি নাই; একটি মূর্তি নাই; বুধাবুধির দৃশ্য নাই; মুখভঙ্গীর রেখামাত্র নাই; কিছুই নাই। কেবল একটা শূন্য দেবালয়; তাহাতে প্রশান্ত গাম্ভীর্য বিরাজমান। কেবল এখানকার করাল শব্দমুখরতা বাহরের অপেক্ষাও বেশী। একটু কথা কহিলে কিংবা পায়ের শব্দ হইলে চতুর্দিক ভয়ানক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। তা ছাড়া, বাস্তবপক্ষে এখানে এমন কিছুই নাই, যাহাতে ভয় হইতে পারে। এমন কি, এখানে সেই পাখীগুলার কালো পাখার নাড়াচাড়াও নাই। এই সব চৌকোণা থাম—যাহা খলানছাদের সহিত একই অখণ্ডপ্রস্তরে গঠিত—এই সব থামের অলঙ্কারগুলি নিতান্ত সাদাস্থা ও কঠোর-ধরণের। আড়াআড়িভাবে স্থাপিত কতকগুলি রেখাই উহাদের প্রধান অলঙ্কার।

দাক্ষণ ভগ্নাবস্থা ও সহস্রবর্ষব্যাপী জরা-জীর্ণতা সবেও এ স্থানটি এখনো পূণ্যতীর্ণরূপে বিরাজমান। প্রবেশমুহূর্তেই এই ভাবটি যেন সহসা অন্তরে জাগিয়া উঠে। এখানে আসিয়া যে ভয়ের উদয় হয়, সে তরুণ ধর্ম-ভাবসংগঠিত। মন্দিরের দেয়ালগুলি মশাল ও প্রদীপের ঝলম্বায় কালো হইয়া গিয়াছে। কুড়িঘের সান্ চক্চক করিতেছে ও “তেল-চুৰ্চুকে” হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, সময়ে-সময়ে এখানে বহল জনতা হইয়া

থাকে। অস্ত্র যুগের লোকেরা, যে পর্বতে মহাদেবের জন্ত স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, মহাদেব এখনো সে পর্বতটিকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। এই পুরাতন দেবালয়ের মধ্যে এখনো যেন একটা প্রাণ রহিয়াছে।

যে তিনটি দালান, যে তিনটি দেবালয় একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে অবস্থিত—ইহার একই অখণ্ডপ্রস্তরে গঠিত। শেষেরটির পূণ্যমাহাত্ম্য সর্কাপেক্ষা অধিক; তাই, ইহার মধ্যে প্রায় কেহই প্রবেশ করিতে পার না। অস্ত্র ব্রাহ্মণিক দেবালয়ের এইরূপ স্থানে আমি পূর্বে কখনই প্রবেশ করিতে পাই নাই।

এখানেও আমি মনে করিয়াছিলাম, কিন্না-জানি ভয়ানক দৃশ্য দেখিব। কিন্তু এখানেও সেরূপ দৃশ্য প্রায় কিছুই নাই।

কিন্তু এখানে একটি ক্ষুদ্র জিনিষ দেখিলাম, যাহা বাহিরের সমস্ত ভীষণ পদার্থ অপেক্ষাও বিস্ময় উৎপাদন করে, চিত্তকে আকুল করে, সমস্ত স্থানটিকে তমসচ্ছন্ন করিয়া তুলে। বেদির ক্ষয়িত প্রস্তরের উপর চক্চকে মর্শ্বরপাথরের একটা ছোট কালো স্তম্ভ,—দীর্ঘভিষাকৃতি—খাড়া হইয়া রহিয়াছে; তাহার প্রত্যেক পার্শ্বে, বেদির উপর, সেই সব শৈবচিহ্ন উৎকীর্ণ রহিয়াছে, যাহা শৈবগণ প্রতিদিন প্রত্যহ্নে স্বকীয় ললাটে ভষ্ম দিয়া অঙ্কিত করে। চাঁর-দারের সমস্ত পদার্থ ধোয়ার কালো হইয়া গিয়াছে। দেবালয়ের যে সব কুলুঙ্গিতে পূণ্যদীপ রক্ষিত হয়, সেই সব কুলুঙ্গিতে একপ্রকার কালো ঘন জল জমিয়া গিয়াছে।

দীপের পোড়া সলিতাগুলো—যাহা সরাইয়া কৈলিতে কেহই সাহস করে না—দীপ হইতে করিয়া-ঝরিয়া কুলুঙ্গির ভূমিকে তৈলাক্ত করিয়া তুলিয়াছে । এখনকার সমস্তই দীন-হীন-মলিন ;—সমস্তই সেই ভীষণ ধর্ম্মা-মুষ্ঠানের নিদর্শন ।

এই কালো মুড়িটিই সকলের কেন্দ্রস্থল ; অলৌকিকশ্রমসাধ্য এই সব খনন ও খোদন কার্যের ইহাই একমাত্র হেতু ও মূলকারণ । কোন-এক দেবতা কেবল সংহার করিবার জন্যই ক্রমাগত জীব উৎপাদন করিতেছেন—এই ভাবটি পূর্বতন ভারতবাসিগণ সংহত-ভাবে ও বিশদরূপে প্রকাশ করিবার জন্য যে সাঙ্কেতিক চিত্রের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা অভীষ অপরূপ । ইহাট শিবলিঙ্গ ; ইহা জননক্রিয়ার সাঙ্কেতিক প্রতিকল্প । কিন্তু এই-প্রকার জননমরণেরই উদরপুষ্টি হইয়া পাকে ।

এই ভীষণ গুহাগহ্বর হইতে ফিরিয়া-গিয়া যেখানে আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, সেই পাছালা হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম, —যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সমুদ্রের মূর্তি ধারণ করিয়া আছে, তাহা ক্ষীণরেখার আমার সমক্ষে প্রসারিত । একপ্রকার কুজাটিকার ভায়, ধূলার অবগুষ্ঠনে আচ্ছাদিত হওয়ার, সূর্য্যোদয়ের পূর্বে এই স্থানটি একটু নীলাভ ও বাষ্পবৎ অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে ।

কিন্তু সূর্য্যোদয় হইবামাত্র একটা বিস্তীর্ণ লোহিতরক্ত আমার সমক্ষে প্রসারিত হইল ;—গুহবায়ুর প্রভাবে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে ; আর, ইতস্তত কতকগুলো মরাগাছ দেখা যাইতেছে ।

এই প্রথর দিবালোকে সেই সব শিব-মন্দির দেখিবার জন্য পুনর্বার যাত্রা করিলাম । যাহা দেখিয়াছি বলিয়া এখন স্মরণ হইতেছে, তাহা বাস্তবিক সেইরূপ কি না, আমার একবার পরখ করিয়া দেখিতে হইবে । এইবার আমি একাকীই নীচে নামিলাম ; আমি এখন পথ চিনি ; সেই সব শ্রামল শৈলরাশির মধ্য দিয়া, সেইসব শুষ্ক উচ্চ “ক্যাক্টাস্”—যাহা হলুদ-রঙের পুরাতন মোমবাতির মত একেবারে কঠিন হইয়া গিয়াছে—সেই সব ‘ক্যাক্টাস্’গাছের মধ্য দিয়া চলিলাম ।

এখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয়, তবু এই সূর্য্যের প্রথর উত্তাপে আমার রগ্ যেন পুড়িয়া যাইতেছে বোধ হইল । এই দ্রুত সর্বসংহারী প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রভাবেই প্রতিদিন ভারত-ভূমির উপর মৃত্যুর ছায়া ক্রমশই প্রসারিত হইতেছে ।...ছড়ি-হাতে তিনজন লোক,—গরুর পাল সঙ্গে নাই, অগচ দেখিতে রাখালের মত—ক্ষেত্রভূমি হইতে উপরে উঠিয়া আমাকে নতভাবে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল, একরূপ শীর্ণকার মনুষ্য আমি কখন চক্ষে দেখি নাই ; বড়-বড় চোখ—অরবিকারগ্রস্ত রোগীর ভায়, ঘোর রক্তবর্ণ । নিশ্চয়ই উহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ হইতে আসিতেছে,—বাহার ঠিক দ্বারদেশে আমি এখন উপনীত হইয়াছি । শতসহস্র ছোট-ছোট চায়াগাছ,—যাহা পূর্বে স্থানে-স্থানে পর্ব্বতের গায়ে যেন গালিচা বিছাইয়া রাখিত, তাহা এখন ‘প্রাণশূন্য’—এখন যেন জমাট-পশমের মত দেখিতে হইয়াছে ।

কিন্তু এখানকার জীবজন্তু—বেঙ্গপ

চিরকাল করিয়া থাকে—সেইরূপ এখনো পরম্পরের সহিত বৃথাবৃথা করিতেছে। মাটির উপর ছোট-ছোট পাখীদের মৃতদেহ পড়িয়া আছে,—চীলেরা উহাদিগকে কাটিয়া খণ্ডখণ্ড করিয়াছে। সর্কজই দেখা যায়, মোটামোটা লোভী মাকড়সা শেবারশিষ্ট প্রজাপতিদিগকে—ফড়িংদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য তন্তুজাল বিস্তার করিয়াছে। নিকটস্থ অলস অঙ্গারের ভ্রায় এই মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রতাপ মিনিটে-মিনিটে যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই মার্ত্তণ্ডের মহিমা শিবের মহিমারই ভ্রাতা দারুণ অশিব।...আজ প্রাতে শিবের ভীষণ মন্দিরে অবতরণ করিয়া শিবকে মনে-মনে চিন্তা করিতেছিলাম ;—ইনি সেই দেবতা, যিনি জীব সৃষ্টি করিতেছেন এবং সৃষ্টি করিয়া আবার সংহার করিতেছেন। এইবার আমি ব্রাহ্মণদের ধরণে শিবকে বেশ কল্পনা করিতে পারিয়াছি। সেই দেবতা, যিনি একপ্রকার প্রচুর উপহাসের সহিত উন্নতভাবে মনুষ্য ও পশুদিগের বংশবৃদ্ধি করিতেছেন ; কিন্তু সেই সঙ্গে সেই প্রত্যেক-জাতীয় জীবের জন্য সাংঘাতিক অস্ত্র সুসজ্জিত একএকটা শত্রুরও সৃষ্টি করিয়াছেন। কি অশেষ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কতপ্রকার কৌশলসহকারে তিনি দংষ্ট্রী, নখর, শিং, কৃধা, ব্যাধি, সর্প ও মক্ষিকার বিধ প্রস্তুত করিয়াছেন। যেখানে মৎস্তগণ ভাসিয়া বেড়ায়, সেই পুষ্করিনীর উপরিস্থ মাছধরা পাখীদের ঠোট তিনি ছুঁচাল ও তীক্ষ্ণ করিয়া দিয়াছেন ; মাংসের জন্য তিনি নানাপ্রকার রোগ, অবসাদ, জরা-বার্দ্ধক্য পূর্ণ হইতেই চুপচুপি সজ্জিত করিয়া

রাখিয়াছেন ; প্রত্যেকেরই রক্তমাংসের মধ্যে তিনি মর্ষস্বদ চৈতন্যলোপী সুতীক্ষ্ণ প্রেমের কাঁটা প্রসিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন ; সকলের জন্যই তিনি অসংখ্য ছোটখাটো দ্রুত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন ; বহু নদীর জলেও তিনি শতসহস্র অদৃশ্য হাতক রাখিয়া দিয়াছেন ;—ভীষণ অন্তর্গত্রে সুসজ্জিত কীটের বীজ সেই জলে নিহিত করিয়াছেন ;—যখনই সেই জল কেহ পান করিতে বাইবে, অমনি তাহারা তাহার অন্তভক্ষণে উদ্ভূত হইবে।... “আত্মাকে উন্নত করিবার নিমিত্তই দ্রুত-যন্ত্রণার সৃষ্টি।” ভাল, তাহাই যেন হইল ; কিন্তু আমাদের অবোধ শিশুসন্তানেরা যে একটা বিশেষ রোগে (যে রোগটি বিশেষ করিয়া তাহাদেরই জন্য উদ্ভাবিত) রুদ্ধবাস হইয়া মৃত্যুযুখে পতিত হয়, সে বিষয়ে কি বক্তব্য ?...তা ছাড়া, আমি কত হতভাগ্য ক্ষুদ্র পশুদিগের ভয়-বিম্বারিত নরনে তীব্র যাতনা, নান্দল প্রার্থনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।...আর, ছোট-ছোট পাখীগুলি যে নিকোষ-ব্যাধগণকর্তৃক শব্দাঘাতে নিহত হয়, তাহাও কি উহাদের আত্মার উন্নতির জন্য ? মাকড়সারা বায়ুস্থিত ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে শোষণ করিয়া যে উদরস্থ করে সে-সময়েই বা কি বক্তব্য ?...এই সমস্ত অনন্ত নিষ্ঠুরতা যুগযুগান্তরব্যাপী জীব-আবর্তের উপর প্রসারিত। বিধাতার প্রতি এরূপ ভয়ঙ্কর নিত্যন্ত অবস্থা নহে ; সর্ককালের সকল লোকেই এই কথা বলিয়া আসিতেছে—ইহার আলোচনা করিতেছে ; কিন্তু শিবের গুহার মধ্যে পুনর্বার অবতরণ করিয়া

এ কথা আজ যেমন আমার মনে দাক্ষণ সত্যরূপে প্রতিভাত হইল, এমন আর পূর্বে কখন হয় নাই। অথচ আমি একজন সুখী পুরুষ; সুখস্বচ্ছন্দে আমার জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতেছে; ছুভিক্ষ আমার নিকট সহজে পৌছিতে পারে না; বিনাশের অপর কোন হেতুও আমার নিকট আপাতত উপস্থিত নাই; বড়-জোর আমি এখন—মধ্যাহ্নস্বর্ষের প্রচণ্ড কিরণ হইতে অথবা শুকতৃণাচ্ছন্ন কৃষ্ণচক্রধারী কেউটে-গাপের দংশন হইতে আমার বিনাশের আশঙ্কা করিতে পারি। তা ছাড়া, আমার আশঙ্কার বিষয় এখন আর কিছুই নাই।...

যখন আমি নৌচের সেই বালুকা ও ধূলার ক্ষেত্রে আসিয়া পৌছিলাম—সেইখানে ডাহিনে ফিরিয়া কয়েকমিনিটের মধ্যেই আবার সেই 'হী-করা' প্রকাণ্ড গুহাবারের সম্মুখে উপনীত হইলাম।

আজ প্রাতে এই ভীষণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কোন ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলাম না। ঢীল, শকুন কিংবা বাজ, বাহার। মন্দিরের ভিতর-ছাদে বাসা করিয়া থাকে, তাহারা ইতঃপূর্বেই শিকারে বাহির হইয়াছে। এখন চতুর্দিক নিস্তব্ধ। বিঘত বিপ্রহর রাজির নিস্তব্ধতার ভায় এ নিস্তব্ধতা তত ভীষণ নহে।

শুভমন্দিরসমূহের পুরেই,—হস্তিপৃষ্ঠ-পরিবৃত অথবা প্রস্তরখোদিত সেই সব দেবালয় গুহার গভীরদেশে খাড়া হইয়া আছে; অসংখ্য-মূর্তি-উৎকীর্ণ গুহার দেয়াল-ওলা দেবালয়ের চতুর্দিকে সুঁকিয়া বিবাহে। কিছু উদারমান স্বর্ষের আলোকে

এ সমস্ত আর তত বিরাট—তত অভি-মাহুযিক বলিষ্ঠা বোধ হইল না; সৃষ্টির যিনি দেবতা, তাঁহার বাসস্থানের পক্ষে ইহা যথেষ্ট ভীষণ কিংবা যথেষ্ট অলৌকিক বলিষ্ঠা মনে হইল না। এই সমস্ত যে জাতির যে-সময়কার হস্তরচনা, সে জাতির তখনো শৈশবদশা উত্তীর্ণ হয় নাই; স্মৃতরাং জীবনের যে কি অপরিমের ভীষণতা, সে সময়ে উহারা যথেষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই; অথবা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাহার উপযুক্ত সাক্ষাতিক প্রতিক্রম নির্দায়ক করিতে সমর্থ হয় নাই। একে ত তমসাক্ষর বিপ্রহর রাজি, তাহাতে আবার ল্যাঠানে ভাল আলো হইতেছিল না—এই অবস্থার গতকল্যা এখানে আসিয়া আমার মনে যে ধারণা হইয়াছিল, সেই ধারণার অনুরূপ আজ এখানে কিছুই দেখিতেছি না।

অবস্থা সমস্ত পদার্থেরই যে চূড়ান্ত ভগ্নদশা, তাহা আজ প্রভাতের আলোকে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে। ভাঙা ধাম, ধামের মাথাল, মূর্তিদের মূণ্ড, মূর্তিদের ভগ্নদেহ—এই সমস্তের উপর দিয়া শুধু যে শতশত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, তাহা নহে; তা ছাড়া, সেই বিজয়ী, মুসলমানদিগের আমলে,—বাহার। ঈশ্বরকে ভিন্ন 'নামে অভিহিত করে, সেই ধর্মোন্মত্ত মনুষ্যেরা অস্ত্র হানের শিবমন্দিরের ভায় এই শিব-মন্দিরগুলির প্রতিও আক্রমণ করিয়াছিল।

গতকল্যা সেই গভীর রাজে, বাহা আমি সন্দেহ পর্বাস্ত'করি নাই, এখন তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি;—পূর্বে এই সমস্ত পদার্থে রং মাখানো ছিল। এই সব এক-কোঁকা

শৈলসমূহের আবার আঁধারে যে সকল অসংখ্য অখণ্ডমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়—চারিদ্বারে যে সকল বিচিত্র-অঙ্গভঙ্গি-বিশিষ্ট মূর্তিদিগের ভয় অবয়বাদি দেখিতে পাওয়া যায়—সে-সমস্তে এখনো একটু ফাঁকে সবুজের পোঁচ রহিয়াছে;—কতকটা যেন শবের রং। পক্ষান্তরে, উহাদের বাসস্থানের গভীরদেশে শুক শোণিতের ভায় একটু লাল রহিয়া গিয়াছে।

• মধ্যস্থলের অখণ্ড প্রস্তরখোদিত মন্দির-গুলিও সূর্যকালে মিশ্রবর্ণ ছিল। প্রাচীন মিশরের থেবিস্ ও মেম্ফিস্ নগরের গৃহাদিতে বেক্স হুন্স বর্ণভেদ পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন মিশ্রবর্ণ এখানকার মন্দিরাদিতে এখনো রহিয়া গিয়াছে;—শাদা, লাল, গেরুয়া-চন্দ্র।

আজ প্রাতে আমি একাই উপরে উঠিব, এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম। আমার পথপ্রদর্শক সেই ছাগপালক যতট মূর্খ-বর্বর হউক না কেন, তবু সে চিন্তাধন্য মনুষ্য। সে আমার সঙ্গে থাকিলে শিবের

সহিত সুখোমুখী করিয়া আলাপ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত হইতে পারে।

পূর্বে বেক্সপ দেখিয়াছিলাম,—মন্দিরের অভ্যন্তরে এখনো সেইরূপ নিশ্চলতা। কিন্তু খিলান-ছাদের নীচে আর একটু বেশী আলো পাইব বলিয়া আমি আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। এখন সূর্যোদয়; উহারই মধ্যে বাহিরের লোহিত ক্ষেত্রভূমিতে যেন আগুন জলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাহিরের এই প্রখর উজ্জ্বল আলোক সবেও এখানে ঘোর অন্ধকার। উপরিত্ত গুরুভার পামাণরাশির তলদেশে এখনো যেন একটু নিশার শৈত্য কারাবদ্ধ হইয়া আছে। মন্দিরের যে অংশটি সর্কাপেক্ষা পবিত্র, তাহারই পশ্চাত্তাগে—বেখানকার দেওয়ালগুলি বহনতাব্দ হইতে মশালের ধোঁয়ার কালো হইয়া গিয়াছে—সেখানে অনন্ত অন্ধকারে পরিবেষ্টিত সেই দেবতার তীব্র উপহাস-বাক্যক মুখচ্ছবি বিরাজমান—যিনি জন-মৃত্যুর দেবতা;—সেই কৃষ্ণবর্ণ উপলব্ধ—সেই প্রস্তরখোদিত শিবালয়।

ক্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বঙ্গদর্শন ।

সোনার বাংলা ।



বাণীকিরণোদ্ভাসিত কাঞ্চনশৃঙ্গ যাহার
কিরীট, তরঙ্গান্বিত নীরনিধি যাহার মেখলা,
সুচিহ্নিত রাজবাঘ যাহার বাহন, ভারিখৌ-
পদ্যাতীত্বপুত্রসলিলসেকে যিনি সর্বদা
অভিধিক্তা, সেই শক্তশ্রামলা স্বর্ণপ্রসবিনী
আমাদের, মাইভূমি। তিনিই আমাদের
সোনার বাংলা। তাঁহার জলে সোনা,
ফলে সোনা, ফলে সোনা। তাঁহার অঞ্জলি-
পরিমাপ জল ছিটাইয়া দাও, দেখিবে সোনা
ফলিবে; অর্ধহস্ত ভূমি কর্ষণ কর, দেখিবে
সোনা ফলিবে; বৃক্ষে বৃক্ষে চাহিয়া দেখ—
সোনা ফলিয়া রহিয়াছে। আবার তাঁহার গৃহে
গৃহে সোনা ফলিত, —ব্রাহ্মণবিধবার হস্ত
হইতে তন্তবায়ের তন্ত্রে পর্য্যন্ত সোনা ফলিয়া
পাকিত। তাই মা আমাদের অন্নপূর্ণাকুপিণী
হইয়া যুগযুগান্তর হইতে সমগ্র জগতে অন্ন-
বস্ত্র বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন। জগতের
আদিম অবস্থায় যখন মানবসভ্যতার
প্রভাততপন তারতুর্বে স্বর্ণকিরণ বিকিরণ
করিতে আরম্ভ করে, তাহারই হইএকটি
ছটা ক্রমে ক্রমে বঙ্গের শ্রামল প্রান্তরে
নিপতিত হইয়া তাহাকে স্বর্ণভূমি করিয়া
তুলে। আধ্যাত্মতার কৃষিবাণিজ্যবিজ্ঞান
বঙ্গের উর্বরভূমিতে সোনা ফলাইতে আরম্ভ

করে। তাই মা আমাদের ক্রমে ক্রমে
স্বর্ণপ্রসবিনী হইয়া সোনার বাংলা হইয়া
উঠিয়াছিলেন ও ধনধান্যপরিপূর্ণা হইয়া
সম্ভ্রামণের মন্তকে নিয়ত কল্যাণবর্ষণ
করিতেন। এই সোনার বাংলার সোনার
রঙের ধাত্তরাশি ভারতের বহুস্থানের
ক্লিষ্টবৃত্তি করিয়া বৃহৎকার জলধানে, দেশ-
দেশান্তরে, দীপদীপান্তরে নীত হইত;—
গ্রীক-ও-রোমক-সভ্যতাদীপ্ত ইউরোপ পর্য্যন্তও
ধাবিত হইয়াছিল। ইহার গর্ভজাত লবণ-
রাশি বহুদেশের অধিবাসিগণের জীবনযাত্রার
সাথী হইত। ফলমূলও অসুচিত উৎসেক
করিত। এই সোনার বাংলার সূচিকণ
বস্ত্রপুঞ্জ ভারতের লজ্জানিবারণ করিয়া নানা
দেশের লজ্জানিবারণ করিতে করিতে
ইউরোপীয় মহিলার অঙ্গ-আবরণে নিমুক্ত
হইত। সভ্যজগৎ তাহার কারুকার্যে
মোহিত হইয়া ঘাইত। বিলাসিনী রোমক
মহিলাগণ এই সূচিকণ বসনে অঙ্গ ঢাকিয়া
আপনাদের রূপচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেন।
ইহারই স্বর্ণবর্ণের রেশম ও রেশমী বস্ত্র
সভ্যজগতের বিস্তার উৎপাদন করিত।
এশিয়ার সর্বত্র ও ইউরোপে তাহার আদরের
সীমা ছিল না। যে সোনার বাংলা একদিন

সমগ্রজগতে অন্নবস্ত্র বিতরণ করিয়াছে, আজ তাহার সর্বত্র অন্নের হাহাকার উঠিয়াছে! আজ তাহার সন্তানগণ নগ্ন কাশ চাকিবার জন্য বিদেশীর সুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে! কেন আজ সোনার বাংলার এ চূর্ণশা ঝটিল? কেন আজ তাহার গৃহে গৃহে অশানের ছায়া ঘনীভূত হইতেছে? কেন আজ তাহার সন্তানগণ কফালাবশেষ হইয়া প্রেতরাজ্যের অধিবাসীর দ্বার হইয়া উঠিয়াছে? কোথায় তাহার সে স্বাস্থ্য?—কোথায় তাহার সে সম্পদ?—কোথায় তাহার সে কল্যাণ? তাহার বর্ণকান্তি কে. কালিমামণ্ডিত করিল? জানি না, ভগবানের কোন্ অভিশাপে তাহার এরূপ দুর্গতি ঘটিল? ভগবানের যে অভিশাপ থাকে, থাকুক, কিন্তু ইহার প্রত্যক্ষ কারণ ইংরেজবণিকের আত্মরিক স্বার্থপরতা! এই সোনার বাংলা পূর্বেই বা কেমন ছিল, আর ইংরেজবণিকই বা কেমন করিয়া ইহাকে ছুরেখার করিল, আমরা সংক্ষেপে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বৈদিককাল হইতে এই বঙ্গভূমির অস্তিত্বের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। ঐতরের আরণ্যক* প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। * যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ এক্ষণে সোনার বাংলা বলিয়া পরিচিত, বঙ্গই তাহার প্রধান অংশ ছিল। তাহার সুরিহিত পুত্র, অঙ্গ প্রভৃতির কিয়দংশ এক্ষণে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। বৈদিকগ্রন্থে সেই সমস্ত স্থানেরও উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মহুসুহিতায়ও বঙ্গ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।† তাহার পর রামায়ণের সময় হইতে ইহাকে প্রকৃত সোনার বাংলা বলিয়া জানিতে পারা যায়। সেই সময়ে বঙ্গভূমি ধনধাত্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।‡ মহাভারতের সময় ইহা একটি বিস্তৃত জনপদ হইয়া উঠে। বৃষিষ্টির রাজসুয়যজ্ঞকালে বঙ্গাধিপতি সমুদ্রসেন ভীমের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া কলিঙ্গ বা বর্তমান উত্তর-উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন।§ তাহার পর বিষ্ণু, গরুড়, মৎস্ত প্রভৃতি পুরাণেও

* “ইমাঃ প্রজাতিসো অত্যয় যায়ঃ শ্রানীমানি বয়সি বঙ্গা মগধাশ্চৈরাবান্তান্যে অর্কমন্তিতো বিবিশ” ইতি ।

ঐতরের আরণ্যক ২।১১

† “অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গবু সৌরাষ্ট্রমগধবু চ ।” মহু ।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মনুষ্টির দ্বন্দ্ব এইরূপ বলিয়াছিলেন—

“ত্র্যবিড়াঃ সিদ্ধসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ ।

বঙ্গাঙ্গমগধাঃ মন্ত্রাঃ সমুদ্রাঃ কাশিকোশলাঃ ॥

তত্র জাতং বহুব্রব্যং ধনধান্তমজাবিকম্ ।

ততো বৃগুর্ব কৈকেয়ি! যদ্ব্যবং মনসেচ্ছসি ॥”

রা, অঘো, ১০স, ৩৭।৩৮

§ ততঃ পুত্রাধিপং বীরং বাহুদেবং মহাবলম্ ।

কৌশিকীকচ্ছনিলচং রাজানঞ্চ গৌড়জম্ ॥

উভৌ বলভূতৌ বীরাবুভৌ তীরপরাক্রমৌ ।

নির্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাশ্রবং ।

সমুদ্রসেনঃ নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্শ্ববম্ ।

তান্নিশপ্তক রাজানং কর্কটাদিগতিং তথা ॥”

মহা, সভা, ৩০।২২—২৪

ইহার উল্লেখ আছে। মহাভারত ও বিষ্ণু-পুরাণ প্রভৃতিতে ইহার নামকরণেরও বিবরণ দৃষ্ট হয়।*

ইহার পর বৈদেশিকগণের বিবরণ হইতে সোনার বাংলার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিজের বর্ণনায় বঙ্গরাজ্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও গাঙ্গারিডি বা গংকরের উল্লেখ আছে। এই গাঙ্গারিডি বা গংকরদেশ গঙ্গার পশ্চিমে 'ব'দ্বীপের দীর্ঘভাগে অবস্থিত ছিল। মুর্শিদাবাদজেলার জঙ্গীপুর উপবিভাগে অত্য়পি গাঙ্গারিডি ও গংকর নামে দুইখানি গ্রাম বিদ্যমান আছে। এরিয়ান্, কটডুপানগরের নিকটস্থ আমিষ্টিস্-নদীর উল্লেখ করিয়াছেন, এই কটডুপা কটরূপ বা কাটোয়া ও আমিষ্টিস্ই অজাবতী বা অজয়। টলেমি 'ব'দ্বীপের বিশেষরূপ

বিবরণই প্রদান করিয়াছেন।† এই সমস্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, গ্রীকদিগের নিকট সোনার বাংলা বিশেষরূপেই পরিজ্ঞাত ছিল। তাহার পর যখন ইউরোপভূখণ্ড রোমকসভ্যতার আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন এই প্রাচ্যদেশের পণ্যদ্রব্যে তাহার বিলাসভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রোমকবণিক্গণের ভারতের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধে যোনের মৌজাগ্যালক্ষ্মীও গ্রীসম্পন্ন হইয়াছিলেন।‡ এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে যে সকল মসলিন্, রেশম ও রেশমী বস্ত্র, নীত হইত, তাহার অধিকাংশ বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত হইত। রোমকমহিলাগণ সেই সমস্ত সূচিকণ মসলিনের অন্তরাল হইতে আপনাদের 'অঙ্ক-মৌষ্ঠ্য' প্রকাশ করিতেন।§ এসিঙ্ক রোমক-

* "স সাগরং সমাসাং গঙ্গারঃ সমুদ্রে নৃপ।

নদীশতানাং পকানাং মধ্যে চক্রে সমাপদম্।

ভূতঃ সমুদ্রভীষণে জগাম বহুধাধিপঃ।

ব্রাহ্মিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত।"

মহা, বন, ১২৪ অ।

* "অঙ্কো বস্ত্রঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুক্লান্ত তে হৃতঃ।

ভেবাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভূবি।"

মহা, আদি ১০০ অ।

† "Ptolemy's description of the Delta is by no means a bad one". * * * "He begins with the western branch." (Wilford)

‡ "But if the commerce with India became a source of fortune, to the industrious trader, and an important branch of revenue to the government, the introduction of the products of the east also led to stimulate and increase the already excessive luxury which prevailed at Rome.

Pliny states the balance against Rome of trade with the East at a hundred millions Sesterces or 1, 041, 666 pounds sterling." (Researches concerning the Lands &c, of Ancient and Modern India.)

§ "Pliny when speaking of muslin, terms it, "a dress, under whose slight veil our women contrive to shew their shapes to the public." (Researches concerning the Lands, Theology, Learning, Commerce &c. of Ancient and Modern India by Q Craufurd)

লেখক মিনি বাঙলার শ্রেষ্ঠবন্দর সপ্তগ্রামের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন । *

যে সময়ে চীনপরিব্রাজকগণ ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁহারা সোনার বাংলার উপস্থিত হইয়া তাহাকে ধনধান্যপরিপূর্ণ দেখিয়াছিলেন । ভারতগত প্রথম চীনপরিব্রাজক কাহিয়ান্ বাঙলার তৎকালীন প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্তি বা তমলুকে উপস্থিত হইয়াছিলেন ও তথায় বণিক্গণের সমাগম দেখিয়াছিলেন । তাম্রলিপ্তি হইতে তিনি বাণিজ্যবানে আরোহণ করিয়া সিংহলবাস্ত্র করেন । † সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউয়েন্-সিয়ং বাঙলার নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । তিনি পুণ্ড্রবর্ধন বা বজ্রভূমি, সমতট বা পূর্ববঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিম বর্ষিদাবাদ ও তাম্রলিপ্তি বা মেদিনীপুর প্রদেশে আগমন করিয়া অনেকদিন অবস্থিতি করেন । তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তৎকালে আমাদের সোনার বাংলা

‘সুজলা, সুফলা ও শতশ্রামলা’ই ছিলেন । ইহার অধিবাসিগণ স্বর্গীয় স্বাস্থ্যলাভ করিয়া কৃষিবাণিজ্যে তাহাদের মাতৃভূমিকে স্বর্ণ-প্রসবিনী করিয়া রাখিয়াছিল । তাঁহার পুণ্ড্রবর্ধনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তথায় নানাপ্রকার শস্ত জন্মিত । হিউয়েন্-সিয়ং তথাকার পনসফলের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন । তাঁহার মতে পুণ্ড্রবর্ধনের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও অধিবাসিগণ বিভোৎসাহী ছিল । ‡ সমতটের বর্ণনার তাহাকে উর্ধ্বর, শস্তপরিপূর্ণ ও ফুলফলে সুশোভিত বলিয়া প্রতীত হয় । তিনি তাহার জল-বায়ুকে কোমল ও অধিবাসিগণের ব্যবহারকে মনোজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার কষ্টসহিষ্ণু, ধর্ম্মকার, কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসিগণ বিস্তার সমাদর করিত । § তাম্রলিপ্তির বর্ণনার লিখিত আছে যে, উক্ত দেশও উর্ধ্বর ও অপরিপূর্ণ ফলফুল উৎপাদন করিত । বায়ু উষ্ণ, অধিবাসিগণ ক্রিপ্ত, কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী ॥ হিউয়েন্-সিয়ং এইখান হইতে

* ‘Satgon, the royal emporium of Bengal from the “time of Pliny.” (Long)

† “From this (Champa), continuing to go eastwards nearly fifty yojans, we arrive at the kingdom of Tamralipti. Here it is the river empties itself into the sea. * * * He then shipped himself on board a great merchant vessel. Putting to sea, they proceeded in a south-westly direction, and catching the first fair wind of the winter season (i. e. of the N. E. monsoon) they sailed for fourteen days.” (Fa Hian)

‡ “The soil is flat and loamy, and rich in all kinds of grain-produce. The *Panasa* (*Pan-na-so*) fruit, though plentiful, is highly esteemed. * * * The climate (of this country) is temperate, the people esteem learning.” (Beal’s *Buddhist Records* Vol II 11.)

§ “It is regularly cultivated, and is rich in crops, and the flowers and fruits grow ever there. The climate is soft and the habits of the people agreeable. The men are hardy by nature, small of stature and of black complexion ; they are fond of learning, and exercise themselves diligently in the acquirement of it.” (Beal)

॥ “The ground is low and rich ; it is regularly cultivated, and produces flowers and fruits in abundance. The temperature is hot. The manners of the people are quick and hasty. The men are hardy and brave.” (Beal)

অর্ণবপোতে সিংহলযাত্রা করেন। কর্ণ-
সুবর্ণের বিবরণে তাকে উর্কর ও পুষ্পশালী
বলিয়া জানা যায়। লোকের ব্যবহার নম্র ও
মনোজ্ঞ, জলবায়ুও তৃপ্তিকর। অধিবাসিগণ
বিভার সমাদর করিত। * হিউয়েন্সিয়ঙের
বর্ণনা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়
যে, আমাদের সোনার বাংলা কলশস্ত্র-
পরিপূর্ণ হইয়া সুস্বকার ও বিদ্যোৎসাহী
সন্তানের মাতৃভূমিরূপে বিরাজ করিত।

হিউয়েন্সিয়ঙের আগমনের পূর্বে যখন
ভারতবর্ষ উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের
প্রভাপ ও বিদ্যোৎসাহিতার আলোকে উদ্ভা-
সিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সে আলোকে
এই সুদূর বঙ্গভূমিও দৃষ্টির অন্তর্ভূত হইয়াছিল।
সেইভিত্ত কালিদাস ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে
বঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কালিদাস
বঙ্গের অধিবাসিগণকে নৌগুরুকুল বলিয়া
বর্ণনা করিয়াছেন।† বরাহমিহিরও বঙ্গ
ও উপবঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন।‡ প্রাচীন
গ্রন্থাদিতে ও প্রাচীন লোকের নিকট আমা-
দের মাতৃভূমি বঙ্গনামেই অভিহিত হইতেন।
কিন্তু ক্রমে তিনি বাঙালানাম ধারণ করিয়া
সাধারণের পরিচিত হইয়া উঠেন। খৃষ্টীয়

নবম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর
মধ্যভাগে আমরা প্রথম বাঙা-
লানামের উল্লেখ দেখিতে পাই। দাক্ষিণাত্যের
রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমলয়নামক
স্থানের শিলালিপিতে প্রথমে এই বাঙা-
দেশের উল্লেখ দেখা যায়। রাজেন্দ্র চোলদেব
তথাকার রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত
করিয়াছিলেন বলিয়া তিরুমলয়ে আপনার
গৌরব খোদিত করিয়াছেন।§ তাহার পর
হইতে আমাদের মাতৃভূমি বঙ্গনাম পরিত্যাগ
করিয়া বাঙালানাম ধারণ করিয়াছিলেন। সেই
দৃশকলসুশোভিতা, শস্ত্রশ্যামলা মাতাকে
আমরা সোনার বাংলা বলিয়া থাকি।

ক্রমে যখন মুসলমান গৌরব ও প্রতিভা
সুদূর ইউরোপও হইতে চীনদেশ পর্য্যন্ত
পরিব্যাপ্ত হয়, সেই সময়ে বঙ্গভূমি মুসলমান-
পরিব্রাজকগণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না।
মুসলমানগণকর্তৃক ভারতবিজয় আরম্ভ হইলে
বঙ্গদেশও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।
খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সুলেমান আমাদের
সোনার বাংলার আগমন করিয়াছিলেন।
তিনি ইহাকে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া উল্লেখ
করিয়াছেন, এবং ইহার বাণিজ্যগৌরবের

হিউয়েন্সিয়ঙের সমন্বয়ব্রাহ্ম লিপিত আছে যে, তিনি তাম্রলিপ্তি হইতে কর্ণসুবর্ণে গমন করেন। কিন্তু
সিউকো বা তাঁহার জীৱনবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, তিনি তথা হইতে সিংহলে যাত্রা করিয়াছিলেন।

* The land lies low and is loamy. It is regularly cultivated, and produces an
abundance of flowers, with valuables numerous and various. The climate is agreeable ;
the manners of the people honest and amiable. They love learning exceedingly, and
apply themselves to it with earnestness." (Beal)

† "বঙ্গালুৎখায় ওরসা নেতা নৌসামোদাতান্ ।" (বসুবাংশ)

‡ "আগ্নেয়াং দিলি কোশলকলিঙ্গবঙ্গোপবঙ্গভট্টরাজাঃ ।" (বৃহৎসংহিতা)

§ "Vangaladesa, where the rain does not last (long), and from which Govinda
Chandra, having lost his fortune, fled." (South Indian Inscriptions.)

বিষয়ও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই।* ইবনুবাটুটানামক একজন মুসলমানপরিব্রাজক অনেক পরে এ দেশে আগমন করেন, তিনি ইহাকে অত্যন্ত শত্ৰুহুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।† বৈদেশিক-গণের বিষয় বতাই আলোচনা করা যায়, ততই আমাদের মাতৃভূমিকে সোনার বাংলা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুরাকাল হইতে বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গভূমি বৈদেশিক-গণের চক্ষে বর্ণকিরণ প্রতিকলিত করিয়া আসিতেছেন। ফলকূলে সুশোভিনী মা আমাদের কৃষিবাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া জগতের নিকট সগৌরবে আদৃত হইতেন। তাঁহার সন্তানগণ জ্যোৎস্নাচূষিত-সৈকতশালিনদীপালিনী শতশ্রমলা মাতৃ-ভূমির সেবার আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিত। কৃষিবাণিজ্যেও তাঁহাকে গৌরব-শালিনী করিয়া তুলিয়াছিল। মা তাহাদিগকে পবিত্র ও তৃপ্তিকর জলবায়ু প্রদান করিয়া ছিলেন এবং তাহাদিগকে সাহসী, কণ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু করিয়াছিলেন। মাতৃসেবার সহিত তাহারা বিত্তারও আরাধনা করিত। চীন-পরিব্রাজকগণ তাহাদের জ্ঞানগরিমার বিষয় ভূয়োভূয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারাও যেমন মাতৃসেবা করিত, মাতাও তাহাদিগকে

তেমনই স্বথসম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাদের সেই সন্তানোচিত মাতৃসেবার মাতা প্রকৃত সোনার বাংলা হইয়াছিলেন, তাই সোনার বাংলার গৌরব দিগ্দিগন্তে বিকীর হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বঙ্গভূমিতে মুসলমানবিজয়নিশান প্রোথিত হয়। পূর্ববঙ্গ কিন্তু তাহার পর হইতে শতাব্দিক বংসর পর্যন্ত হিন্দুরাজত্বগণের অধীনই ছিল। ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলমান-আধিপত্য বহু-মূল হয়। মুসলমানগণ বঙ্গের শ্রামল প্রান্তরে বাস করিয়া হিন্দুসাধারণের প্রতিবেশী হইয়া উঠেন। উত্তরের জাতিগত ও ধর্মগত পার্থক্য অনেকদিন পর্যন্ত উত্তরকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। ক্রমে এক দেশে, এক-গ্রামে, এক পল্লীতে বসবাস করিয়া উত্তরের বিদ্বেষভাব অন্তহিত হইয়া উত্তরেই সোনার বাংলার সন্তান হইয়া উঠে। উত্তরেই মাতৃসেবার প্রবৃত্ত হয়। উত্তরেই কৃষি-বাণিজ্যে মাতৃভূমিকে সোনার বাংলা করিয়া তুলে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সন্তানের সেবার মাতার সমৃদ্ধি দিনদিন বর্ধিত হইতে থাকে। নানাপ্রকার শিমে বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার গৌরব

* During the time of the Arab invasion of India (8th century of the Christian era), Sulaiman came to this country. An Account of his travels is given in the Bulletin of the Geographical Society of Paris (P. 203). His account of the Delta of the Ganges was then in a flourishing condition. There existed then many cities which traded with Arrakan. (Proceedings of the Asiatic Society for December 1868. P. C. Ghosha's note)

† "I sailed for Bengal which is an extensive and plentiful country. I never saw a country in which provisions were so cheap. (Ibn-Batutu)

দেশবিদেশে বিবোধিত হয় । বহুদেশ হইতে বণিক্গণ সোনার বাঙলার জ্ব্যাসস্তার-গ্রহণের জন্ত অসংখ্য অর্থব্যয়ন লইয়া তাহার প্রধান বন্দরসমূহে সমাগত হইত । ভারত-বর্ষের সর্বত্র, এশিয়ার বহুদেশে, এমন কি সুদূর ইউরোপখণ্ড পর্য্যন্ত ইহার কৃষি ও শিল্পজাত জ্ব্যাসমূহ প্রেরিত হইত ।

সোনার বাংলার এই গৌরবের কথা শুনিয়া দূরদূরান্তর হইতে বৈদেশিকগণ তাহার দর্শনাভিলাষে উপস্থিত হইতেন । অনেক বৈদেশিকের গ্রন্থে আমাদের বঙ্গভূমি প্রকৃত সোনার বাংলারূপেই চিত্রিত হইয়া-ছেন । খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালীয় পরিব্রাজক মার্কপোলো এশিয়ার নানাহানে পরিভ্রমণ করিয়া চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন । তিনি বঙ্গরাজ্যের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বাঙালীজাতি ও বাঙলাভাষার উল্লেখ করিয়া ইহার কৃষিবাণিজ্যের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন । তাঁহার বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, বঙ্গভূমিতে অপূর্ণাপূর্ণপরিমাণে

তুলা জন্মিত ও তাহার সমৃদ্ধ বাণিজ্য হইত । জটামাংসী, আদা, ইক্ষু প্রভৃতি অনেক দ্রব্য বঙ্গভূমিতে উৎপন্ন হইত । ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতে বণিক্গণ তাহাদের বাণিজ্যের জন্ত সমাগত হইত ।* এইরূপে মার্কপোলোর গ্রন্থ হইতে বাঙলাসম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায় । পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চীনপরিব্রাজক মাছ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন । তিনি চট্টগ্রাম, সোনার গাঁ, বাঙলা + প্রভৃতি অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । তাঁহার বিবরণে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশে নানাপ্রকার শস্ত উৎপন্ন হইত । গম, তিল, নানাজাতি কলায়, চিনা, আদা, সর্বপ, পলাতু, গাঁজা, বার্তাকু, কাঁঠাল, আত্র, দাড়িম্ব, ইক্ষু, শুড, চিনি, কদলী ও নানাপ্রকার ফলোৎপাদনের কথা তিনি উল্লেখ করিয়া-ছেন । এতদ্ভিন্ন নারিকেল ও তণ্ডুলজাত মস্ত, তাড়ী ও কাঁজী ও পাঁচছয়প্রকার মসলিনের কথা তাঁহার বিবরণ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় । মাছ বলেন যে, বঙ্গদেশের

* "The province of Bengala is situated on the southern confines of India, * * * It has its peculiar language. The people are worshippers of idols, and amongst them there are teachers, at the head of schools for instruction in the principles of their idolatrous religion and of necromancy, whose doctrine prevails amongst all ranks, including the nobles and chiefs of the country. Oxen are found here almost as tall as elephants, but not equal to them in bulk. The inhabitants live upon fiesh, milk, and rice, of which they have abundance. Much cotton is grown in the country, and trade flourishes. *Spikenard, galangal, ginger, sugar, and many sorts of drugs are amongst the productions of the soil ; to purchase which the merchants from various parts of India resort there." (Bohn's Marco Polo.)

+ এই বাঙলাসম্বন্ধে অনেক পরিব্রাজকের গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু ইহার অন্তিমসম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রশংসা পাওয়া যায় না । "কেহ কেহ ইহাকে কালমিক'নগর বলেন, কেহ বা গৌড়ের সহিত অস্তিত্ব বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, কেহ বা ইহার সমস্ত অস্তিত্ব ছিল বলিয়া থাকেন । তাঁহার বলেন যে, জলদ্বারেন উক্ত নগরের ধ্বংস হইয়াছে ।

অধিবাসিগণ রেশমী ক্রমাল, সোনালী-
কাজকরা টুপী, চিত্রিত মাটির বাসন, গামলা,
পাঞ্জ, সারলোহ, বন্দুক, ছুরী, কাঁচী ও
বৃক্ষবৃক্ষজাত যুগচর্মের ভায় চিকণ বেতবর্ণের
একপ্রকার কাগজ ব্যবহার করিত।* উক্ত
শতাব্দীতে নিকলি কোটি এতদেশে আগমন
করিয়াছিলেন। তিনি বাঙলার অনেক সমৃদ্ধি-
শালী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন।† ষোড়শ
শতাব্দীর আরম্ভে ভারমেনা নামে একজন
ইতালীয় পরিব্রাজক বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন। তিনিও সোনার বাংলার সমৃদ্ধির
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভারমেনা বলেন
যে, এখানে অপর্যাপ্ত শস্ত ও সর্বপ্রকার মাংস
অচূর্ণপরিমাণে পাওয়া যাইত। তদ্বিন্ন
অপর্যাপ্ত চিনি, আদা ও তুলা জন্মিত।
পৃথিবীর কোন দেশে এই সমস্ত দ্রব্য এত
অধিকপরিমাণে পাওয়া যাইত না। ভারমেনা
এখানে অনেক ধনশালী বণিকের সহিত

সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর
পঞ্চাশখানি জাহাজ হতী ও রেশমী বস্ত্রে
পরিপূর্ণ হইয়া বঙ্গদেশ হইতে বহুদূর গমন
করিত। ভারমেনা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন
প্রকারের নামোল্লেখও করিয়াছেন। ঐ সমস্ত
বস্ত্র তুরক, সিরিয়া, পারস্য, আরব প্রভৃতি
দেশে ও ভারতের সর্বত্র নীত হইত। এতদ্ভিন্ন
বঙ্গদেশে অনেক অহরতব্যবসায়ী বণিকের
সমাগম হইত।‡

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে
পট্টনীজগণ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া ইহার
অধিবাসিগণের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে
লিপ্ত হয়। এই সময়ে সপ্তগ্রাম বাংলার
সর্বপ্রধান বন্দর ছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার
নিম্ন নদীপ্রবাহ রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হওয়ায়,
তাহার অবস্থা দিনদিন হীন হইয়া পড়ে।
পট্টনীজগণ চট্টগ্রামকে প্রধান বন্দর করিয়া
তুলে। ক্রমে সপ্তগ্রামের পরিবর্তে চগলী

* "Among the products of the country may be named, wheat, sesamum, all kinds of pulse, millet, ginger, mustard, onions, hemp, brustals, the jack fruit, mangoes, pome grandes, sugarcane, granulated sugar, white sugar, plantains and various fruits; there are four kinds of wines, the coconut, rice, tarry and kadjang; five or six kinds of cotton fabrics (muslins). They used silk handkerchiefs and caps, embroidered with gold, painted ware, basins, cups, steel, guns, knives, scissors, a white paper from the bark of a tree smooth and glossy like a deer's skin." (Mahoon's account of the kingdom of Bengal, 1468.)

† "In the 15th century, Nicoli Conti sailed up the Ganges and passed by a city named *Cernouc*, which was on the river. This city, he mentions, was then in a flourishing state." (Proceedings of the Asiatic Society for Dec. 1868.)

‡ "This country abounds more in grain, flesh of every kind, in great quantity of sugar, also of ginger, and of great abundance of cotton, than any country in the world. And here there are the richest merchants I ever met with. Fifty ships are laden every year in this place with cotton and silk stuffs, which stuffs are these, that is to say, *hairam*, *namone*, *lizati*, *ciantar*, *douzer*, and *simaboff*. These same stuffs go through all Turkey, through Syria, through Persia, through Arabia Felix, through Ethiopia and through all India. There are also here very great merchants in jewels, which came from other countries." (The Travels of Ludovico di Varthema.)

তাহার স্থানে বন্দরে পরিণত হয় । পটু-
গীজেরা যে যে স্থানে বাণিজ্যোপলক্ষে বাস
করিয়াছিল, সেই সেই স্থানকে তাহার
বাণ্ডেল বা বন্দর নামে অভিহিত করিত ।
অতাপি হুগলী ও চট্টগ্রামের নিকট বাণ্ডেলের
অতিশয় বিস্তারিত রহিয়াছে । পটুগীজগণের
সময়ে বঙ্গদেশের মানচিত্র ইউরোপে প্রচারিত
হয় । ডি ব্যারো ইহার বিবরণসহ মানচিত্র
প্রকাশ করেন । তাহার মানচিত্রে এশিয়ার
সমস্ত প্রদেশের উল্লেখ থাকিলেও বঙ্গদেশেরও
উল্লেখ বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে ।
ডি ব্যারোর মানচিত্রে বাঙলার অনেক নগরের
নির্দেশ আছে, তাহার শ্রেষ্ঠবন্দর সপ্তগ্রাম
ও চট্টগ্রামেরও উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।
সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামের বিবরণে বাঙলার
বাণিজ্যের বিবরণ বিশেষরূপে উল্লিখিত
হইয়াছে ।* পটুগীজগণ চট্টগ্রামকে পোর্টো
গ্রাভি বা বৃহৎ বন্দর ও সপ্তগ্রামকে পোর্টো
পেকিনো বা ক্ষুদ্রবন্দর নামে অভিহিত
করিত । সমস্ত সময়ে হুগলী ও পিললী পোর্ট
পেকিনো নামে কথিত হইত । ১৫৭০ খৃঃ
অন্য ফ্রেডারিক নামে একজন ইউরোপীয়

বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি
সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের বিবরণ উল্লেখ করিয়া-
ছেন ।† বোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ১৫৮৬
খৃঃ অব্দে প্রথম ইংরেজপরিব্রাজক রাল্ফ
ফিচ্ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন । ফিচ্ বাঙলার
বহুস্থানের কার্পাস, কার্পাসবস্ত্র ও রেশমী-
বস্ত্রের প্রাচুর্যের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন ।
টাঁড়া, কুচবিহার, হিজলী, বাকলা, ত্রীপুর
প্রভৃতি স্থানের কার্পাস, কার্পাসবস্ত্র ও রেশমী-
বস্ত্রের বিবরণ তাহার বিবরণে দৃষ্ট হয় । ফিচের
বিবরণে সোনার গাঁয়ের মসলিনের উল্লেখ
আছে । তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে,
হিজলীর একপ্রকার তৃণ হইতে রেশমী-
বস্ত্রের তার সুন্দর বস্ত্র নির্মিত হইত ।
এতদ্বিধ অপর্যাপ্তপরিমাণে খাত-চাউলের
উৎপত্তি ও বাণিজ্যের কথা তাহার বিবরণে
দৃষ্ট হইয়া থাকে । সপ্তগ্রাম প্রভৃতির যে
বাজারের বিবরণ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন,
তাহা হইতে জানা যায় যে, সেই সমস্ত
বাজারে অনেক দ্রব্যের আমদানী-রপ্তানী
হইত ।‡
খৃষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও

* "Its (Ganges) first mouth, which is on the west, is called Satigam, from a city of that name situated in its streams, where our people carry on their mercantile transactions. The other, which is on the east, comes out very near another and more famous port called Chatigara, which is frequented by most of the merchants who arrive at and depart from this kingdom." (De Barro)

† "Frederike, who travelled in Bengal in 1570 and visited Satigam, mentions that in it merchants gather themselves together for their trade." (Hunter.)

‡ "Tonda—Great trade and trafique is here of cotton, and cloth of cotton.

Country of Couche—Here they have much silke and muske, and cloth made of cotton.

Heegili—In this place is very much rice, and cloth made of cotton, and great store of cloth which is made of grasse, which they call yeram, it is like a silke.

সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে বঙ্গভূমির অবস্থা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হয়। সেই সময়ে বাঙলার পাঠানরাজবংশের অবসান হওয়ার, বঙ্গভূমি বাঙালীগণেরই শাসনাধীনে আইসে। বিশেষত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বার-ভুঁইয়ার অধীনে থাকায় তত্তৎপ্রদেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বার ভুঁইয়ার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই জাতিই ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেক পরিমাণে সৌহার্দ্য ও ছিল। এই সময়ে রাল্ফ্, কিচ্ বঙ্গভূমিতে আগমন করেন, তিনি কোন কোন ভুঁইয়ার বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর জেম্‌স্‌ হুইট পাদুরীগণ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ফার্নাণ্ডেজ, সোলা, ক্রনসেকা ও বাউস্ নামে চারিজন পাদুরী বোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উপস্থিত হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকবৎসর পর্যন্ত এতদ্দেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাহার ভুঁইয়াদিগের ও বঙ্গদেশের অবস্থা

বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের বিবরণ লইয়া ডুগারিক নামে একজন ফরাসী ঐতিহাসিক স্বীয় গ্রন্থে বাঙলার বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডুগারিকের গ্রন্থ ১৬১০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।* তাহার পর সাবুরেল্ পার্শা নামে ইংরেজগ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে বাঙলার সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রদান করেন। পার্শার গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের সেনার বাংলার তৎকালে খাজ, গম, চিনি, আদা, লঙ্কা, তুলা ও রেশম অপৰ্য্যাপ্তপরিমাণে জন্মিত এবং সনদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকপরিমাণে লবণের রপ্তানী হইত।† পার্শার গ্রন্থ ১৬২৫ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতে পটুগীজগণের অত্যাচার করিয়া ওলন্দাজগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্যার্থে আগত হয়। তাহার চুঁচুড়া, বরাহনগর, কালিকা-পুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে কুঠীস্থাপন করে।

Bacola—This country is very great and plentiful, and hath store of Rice, much cotton cloth, and cloth of silke.

Sereepore—Great store of cotton cloth is made here.

Sinnergon—There is best and finest cloth made of cotton that is in all India. * * * Great store of cotton cloth goeth from hence, and much Rice, wherewith they serve all India, Ceilon, Pegu, Mulacco, Sumatra, and many other places.

Satigam—Satigam is a faire citie for a citie of the Moores, and very plentiful of all things. Here in Bengala they have every day in one place or other a great market which they call Chandeun, and they have many great boats which they call peneas, wherewith they go from place to place and buy Rice and many other things; their boats have 24 or 26 oares to roame them, they be great of burthen, but have no coverture.” (I. H. Ryley's *Ralph Fitch*.)

* লেখকের সম্বাদিত প্রতাপারিত্য (বহু) গ্রন্থে এই সমস্ত বিবরণ বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা হইয়াছে।

† “It is plentiful in Rice, Wheat, Sugar, Ginger, Longpepper, Cotton and Silke.

Three hundredth ships are yearly laden from hence with salt.” (*Purcha His Pilgrims-Book V. P. 513.*)

ইহাদের পর ইংরেজ ও ফরাসী, বণিকগণ এতদ্দেশে উপস্থিত হয়। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব। *

ইউরোপীয় বণিকগণ ক্রমে বঙ্গভূমিতে বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত হইলে অনেক ইউরোপীয় পরিব্রাজক বঙ্গদেশে আগমন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্রান্সিস পাইয়ার্ড নামে একজন ইউরোপীয় এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভূমিকে বাহ্যিকর ও নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাকে অত্যন্ত উর্বর বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অপরিমাপ্যপরিমাণে ধাতু ভারতবর্ষের সর্পজ* গোয়া, মালাবার, সুমাত্রা ও মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে নীত হইত। বঙ্গভূমি মাতার দ্বার ঐ সমস্ত স্থানের অধিবাসীদিগকে অন্নবিতরণ করিতেন। অসংখ্য জাহাজ ঐ সমস্ত দ্রব্যবহনের জন্য প্রতিদিন বঙ্গভূমিতে আগমন করিত। এই বঙ্গভূমিতে নানাপ্রকার পত্র জন্মগ্রহণ করিত, এবং তাহাদের মাংস গুলত মূপে বিক্রীত হইত। কেবল দুই-দুই ব্যবহার করিয়া লোকে তথার জীবনধারণ করিতে

পারিত। বঙ্গবাসিগণ নানাপ্রকার শতরক বয়ন করিত। ইহাতে নানাপ্রকার কল জন্মিত, যথা—জামীর, লেবু, কমলা, দাড়িম, আনারস, লঙ্কা। ইক্ষু অপরিমাপ্যপরিমাণে জন্মিত। তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে নীত হইত। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার তৈল প্রস্তুত হইত। তুলা এত অধিকপরিমাণে জন্মিত যে, উহার অধিবাসিগণের পরিধেয়বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া তাহার পর বহুলপরিমাণে তুলা ও বস্ত্র নানাস্থানে নীত হইত। এতদ্ব্যতীত রেশম ও রেশমী-বস্ত্রও অনেকপরিমাণে হইত। এই দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে জীপুরুষ উভয়েই স্ত্রী ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত, ও স্ত্রীকাৰ্য্য প্রভৃতি সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে পারিত। 'একপ শিল্পকাৰ্য্য অত্যন্ত দৃষ্ট হইত না। এই সমস্ত বস্ত্র এত সুস্বাদু হইত যে, কেহ তাহা পরিধান করিলে তাহাকে নগ্ন বা বস্ত্রপরিহিত বলিয়া বুঝা যায় না। বঙ্গবাসিগণ চীনবাসীর দ্বার গৃহসজ্জার উপকরণ ও বাসনাঙ্গি নির্মাণ করিতে পারিত। রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণের মৃত্তিকা-নির্মিত দ্রব্যাদি হইত। এই সমস্ত দ্রব্যের বাণিজ্যের বিষয়ও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।*

* "The country is healthy and temperate, and so wondrously fertile that one lives there for almost nothing ; and there is such a quantity of rice, that besides supplying the whole country, it is exported to all parts of India, as well to Goa and Malabar as to Sumatra, the Malaccas, and all the islands of Sunda, to all of which lands Bengal is a very nursing mother, who supplies them with their entire subsistence and food. Thus, one sees arrive there every day an infinite number of vessels from all parts of India for these provinces. * * *

The country is well supplied with animals, such as oxen, cows, and sheep ; flesh is accordingly very cheap, let alone milk-foods and butter, whereof they have such an abundance that they supply the rest of India ; and pile carpets of various kinds, which they weave with great skill. There are many good fruits,—not however, cocos or bananas, plenty of citrons, limes, oranges, pomegranates, cujus, pineapple, ginger, long-

ইংলণ্ডের মহারাজী এলিজাবেথ টাভার্নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন
বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে 'সান্ টমাস' করিয়াছিলেন। তাঁহার আরকজেবের
রো'কে দূতবরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজত্বকালেও অবস্থিতি করিয়াছিলেন।
সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে রো ভারতবর্ষে উভয়েই বঙ্গদেশে আগমন করিয়া তাহার
উপনীত হইয়াছিলেন। তিনিও বাঙলার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন, এবং তাহার প্রধান-
নগর রাজমহল ও ঢাকা ও পোর্ট প্রাণ্ডি, পোর্ট শেকিনো, পিপলী ও সাতগাঁ প্রভৃতি
বন্দরের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।*
বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালে প্রাসিক করাসীপরিব্রাজক বার্নিয়ে ও পাইবার যোগ্য। এই দেশে অপর্যাপ্ত-

pepper, of which, in the green state they make a great variety of preserves, as also of lemons and oranges. The country abounds with sugar-cane, which they eat green ; or else make into excellent sugar, for a cargo to their ships, the like not being made in any part of India except in Cambaye and the other countries of the Mogor adjacent to Bengal. * * * *

There is likewise exported from Bengal much scented oils, got from a certain grain, and divers flowers, these are used by all the Indians after bathing to rub their bodies withal. Cotton is so plentiful, that after providing for the uses and clothing of the natives, and besides exporting the raw material, they make such a quantity of cotton cloths, and so excellently woven, that these articles are exported, and thence only, to all India, but chiefly to the parts of Sunda. Likewise there plenty of silk, as well that of silkworm as of the silk (herb) which is of the brightest yellow colour, and brighter than silk itself, of this make many stuffs of divers colours, and export them to all ports. The inhabitants both men and women, are wondrously adroit in all manufactures, such as of cotton cloth, and silks, and in needle work, such as embroideries, which are worked so skilfully, down to the smallest stitches, that nothing prettier is to be seen anywhere. Some of these cottons and silks are so fine that it is difficult to say whether a person so tired be clothed or nude. Many other kinds of work, such as furniture and vessels, are constructed with extraordinary delicacy, which, if brought here, would be said to come from China.

In this country is made a large quantity of small black and red pottery, like the finest and most delicate *terre sigille*, in this they do a great trade, chiefly in *gorgoulettas*, and drinking-vessels and other utensils" (The Voyage of Francis Pyrard of Luval.)

* "Bengala—A mightie kingdome inclosing the westside of the Bay on the North, and windeth Southwesterly, is bordereth on Cormondell, and the chiefe cities are Rajmehhell and Dekaka, there are many havens, as Port Grand, Port Pequina, traded by the Portugals, Philipatan, Satigam, it containeth divers Provinces, as that of Purp and Patan." (Sir Thomas Roe.)

পরিমাণে খাজ উৎপন্ন হয়, এবং তাহার নিকটস্থ ও দূরস্থ দেশসমূহে তাহা নীত হইয়া থাকে। পক্ষীর দ্বারা পাটনা পর্য্যন্ত ও সমুদ্রের দ্বারা মহলীপত্তন ও করমণ্ডল উপকূলের অনেক স্থানে ইহার রপ্তানী হয়। তত্ত্বিন্ন সিংহল, মালদ্বীপ ও অন্যান্য রাজ্যেও নীত হইয়া থাকে। বাঙলার অনেক পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা গোলকুণ্ডা, কর্ণাট, এবং মোচা ও বসরা হইতে আরব ও মেসপটেমিয়া ও বন্দর আকবাস হইতে পারস্তদেশে নীত হয়। এখানে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। পটুগীজগণই তাহা বিশেষরূপে প্রস্তুত করিয়া তাহার ব্যবসায় করিয়া থাকে। এতদ্বিন্ন তাহার জাম্বীর, শতমূল বা অনন্ত-মূল, আম, আনারস, হরীতকী, লেবু ও আতার মোরব্বা প্রস্তুত করে। বাঙলার গমও উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ইউরোপীয় জাহাজের অধিবাসিগণ তদ্বারা আপনাদের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। তণুল, তিনচারিপ্রকার উত্তিজ, ঘৃত প্রভৃতি নিত্য খাদ্যদ্রব্য অতি সুলভমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এক টাকার বিংশতি বা ততোধিক কুকুট পাওয়া যায়। রাজহাঁস ও পাতিহাঁসও সুলভমূল্যে বিক্রীত হয়। ছাগ, মেঘ ও শূকরাদিও যথেষ্টপরিমাণে পাওয়া যায়। পটুগীজগণ সাধারণত শূকরমাংসে জীবন-ধারণ করে, লবণাক্ত শূকরমাংসও ইংরেজ ও ওলন্দাজ জাহাজের আরোহিগণ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাজা ও লবণাক্ত মৎস্য অপরিপাকপরিমাণে পাওয়া যায়। এক কথায় বাঙলা জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যসমূহে

পরিপূর্ণ। এইজন্য পটুগীজ, কিরিকী ও অন্যান্য খৃষ্টানগণ ওলন্দাজগণকর্তৃক তাহাদের উপনিবেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই শস্তপূর্ণ রাজ্যে বাস করিয়াছে। বাঙলার বহুমূল্য নানাবিধ পণ্যদ্রব্য বৈদেশিক বণিকগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। চিনি ব্যতীত এতদ্রোশে এত অধিকপরিমাণে তুলা ও রেশম উৎপন্ন হয় যে, ইহাকে ভারতবর্ষ, তাহার নিকটবর্তী দেশসমূহ, এমন কি ইউরোপের তুলা ও রেশমের ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। ইহার শ্বেত ও রঞ্জিত, স্থূল ও সূক্ষ্ম, নানাবিধ কার্পাসবস্ত্র দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। ওলন্দাজগণ নানাস্থানে, বিশেষত জাপান ও ইউরোপে, ইহাদের রপ্তানী করে। ইংরেজ, পটুগীজ এবং দেশীয় ব্যবসায়িগণও বহুলপরিমাণে এই সমস্ত বস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া থাকে। রেশম ও রেশমী বস্ত্রসম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। সুদূর লাহোর ও কাবুল পর্য্যন্ত সমগ্র মোগলসাম্রাজ্যের ও অন্যান্য রাজ্যের জন্ত কত পরিমাণে কার্পাসবস্ত্র নীত হইত, তাহা বিবেচনার ও অতীত। রেশম তাদৃশ চিকণ না হইলেও সূক্ষ্ম অতি সুলভ। তাহাদিগকে বাহিয়া বুনিতে পারিলে তদ্বারা সুন্দর বস্ত্রসমূহ প্রস্তুত হইতে পারে। ওলন্দাজেরা কালীমবাজারে ইহার জন্ত সাত-আট শত দেশীয় লোক নিযুক্ত করিয়া থাকে। ইংরেজ ও অন্যান্য বণিকগণও সেইরূপ অধিকসংখ্যক লোক নিযুক্ত করে। বাঙলার যথেষ্টপরিমাণে সোরাও উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত দ্রব্য ব্যতীত বাঙলার বহুলপরিমাণে লাক্ষা, অহিকেন, মোম,

মৃগনাভি, লঙ্কামরিচ প্রভৃতি জন্মে। উত্তিন্ন নগর এবং ধাতু, ইক্ষু, সর্ষপ, ডিল, তুঁত ইহা হইতে অনেকপরিমাণে স্তুত সমুদ্রপথে প্রভৃতি নানাবিধ শস্ত ও উদ্ভিদে শোভিত নানাদেশে নীত হয়। বার্নিয়ে সোনার প্রান্তরসমূহ ইহাকে সৌন্দর্য্যময় করিয়া বাংলার সৌন্দর্য্যের কথাও বিশেষরূপে রাখিয়াছিল। উত্তিন্ন সংস্থখালবেষ্টিত, বর্ণনা করিয়াছেন। রাজমহল হইতে সমুদ্র অরণ্যমুশোভিত ও আনারসাদি-নানাবিধ পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয়তীরে বিস্তৃত বহুসংখ্যক ফলপরিপূর্ণ দ্বীপপুঞ্জ ও ইহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি খাল ও অগণ্য-অধিবাসি-পরিপূর্ণ গ্রাম ও করিত। *

* "Egypt has been represented in every age as the finest and most fruitful country in the world, and even modern writers deny that there is any other land so peculiarly favoured by nature ; but the knowledge I have acquired of Bengal during two visits paid to the kingdom, inclines me to believe that the pre-eminence ascribed to Egypt is rather due to Bengal. The latter country produces rice in such abundance that it supplies not only the neighbouring but remote states. It is carried up the Ganges as far as Patna, and exported by sea to Muslipatam and many other ports on the coast of Coromandel. It is also sent to foreign kingdoms, principally to the island of Ceylon and the Maldives. Bengal abounds likewise in sugar with which it supplies the Kingdoms of Golconda and the Carnatic, where very little is grown. Arabia and Mesopotamia, through the towns of Mokha and Bussora, and even Persia, by way of Bender-Abbassy. Bengal likewise is celebrated for its sweetmeats, especially in places inhabited by Portuguese, who are skilful in the art of preparing them, and with whom they are on article of considerable trade. Among other fruits, they preserve large citrons, such as we have in Europe, a certain delicate root about the length of Sarsa parilla, amba and pine-apples, two common fruits of India, small mirobolam plums, which are excellent ; lemons and ginger.

Bengal, it is true, yields not so much wheat as Egypt ; but if this be a defect, it is attributable to the inhabitants, who live a great deal more upon rice than the Egyptians and seldom taste bread.* Nevertheless, wheat is cultivated in sufficient quantity for the consumption of the country, and for the making of excellent and cheap sea biscuits, with which the crews of European ships, English, Dutch and Portuguese, are supplied. The three or four sorts of vegetables which, together with rice and butter, form the chief aliment of the common people, are purchased for the merest trifle, and for a single rupée twenty or more good fowls may be brought. Geese and ducks are proportionably cheap. There are also goats and sheep in abundance ; and pigs are obtained at so low a price that the Portuguese, settled in the country, live almost entirely upon pork. This meat is salted at a cheap rate by the Dutch and English, for the supply of their respective vessels. Fish of every species, whether fresh or salt, is in the same profusion.

In a word, Bengal abounds with every necessary of life ; and it is this abundance that has induced so many Portuguese, half-castes, and other Christians, driven from their different settlements by the Dutch, to seek an asylum in this fertile kingdom. * * * In regard to valuable commodities of a nature to attract foreign merchants, I am acquainted with no country where so great a variety is found. Besides

বাণিজ্যের জায় টাভার্নিসেরও বংলার ছয়সাতহাজার গাঁইট চালান দিয়া থাকে, অনেক পণ্যবোঝার বিষয় উল্লেখ করিয়া- তাতারদেশীয় ও অন্তান্ত বণিকেরাও ইহার হেন। তিনি প্রথমতঃ ইহার রেশমের ব্যবসায় করিয়া থাকে। এই সমস্ত রেশম বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার শুজরাট, আমেদাবাদ ও সুরাট প্রভৃতি স্থানে অন্তর্গত কানীমবাজার হইতে বিশহাজার প্রেরিত হয় এবং এতদেশে তদ্বারা গাঁইট রেশমের রপ্তানী হয়। ওলন্দাজগণ বস্ত্রাদিও নিশ্চিত হইয়া থাকে। কানীম-

the sugar I have spoken of, and which may be placed in the list of valuable commodities, there is in Bengal such a quantity of cotton and silks, that the kingdom may be called the common storehouse for those two kinds of merchandise, not of Hindostan only, but of all the neighbouring kingdoms, and even of Europe. I have been sometimes amazed at the vast quantity of cotton cloths, of every sort, fine and coarse, white and coloured, which the Dutch alone export to different places, especially to Japan and Europe. The English, the Portuguese and the native merchants deal also in these articles to a considerable extent. The same may be said of the silks and silk stuffs of all sorts. It is not possible to conceive the quantity drawn every year from Bengal for the supply of the whole of the Mogul Empire, as far as ~~India~~ and Cabul, and generally of all those foreign nations to which the cotton cloths are sent. The silks are not certainly so fine as those of Persia, Syria, Said and Baruth, but they are of a much lower price ; and I know from indisputable authority, that, if they were well selected and wrought with care, they might be manufactured into most beautiful stuffs. The Dutch have sometimes seven or eight hundred natives employed in their silk factory at Kassem-Bazar. The English and other merchants employ likewise a great number. Bengal is also the principal emporium for saltpetre. * * * Lastly, it is from this fruitful kingdom that the best gum-luc, opium, wax, civet, long pepper and various drugs, are obtained ; and butter which may appear to you an inconsiderable article, is in such plenty, that although it be a bulky article to export, yet it is sent by sea to numberless places. * * *

In describing the beauty of Bengal, it should be remarked that throughout a country extending nearly an hundred leagues in length, on both banks of the Ganges, from Raja-Mahil to the sea, is an endless number of canals, cut from that river with immense labour, for the conveyance of merchandise and of the water itself, which is reputed by the Indians to be superior to any in the world. These canals are lined on both sides with towns and villages, thickly peopled with pagans ; and with extensive fields of rice, sugar, corn and other species of vegetables, mustard, sesame for oil, and small mulberry trees, two or three French feet in height, for the food of silkworms. But the most striking and peculiar beauty of Bengal is the innumerable islands filling the vast space between the two banks of the Ganges, in some places six or seven days' journey asunder. These islands vary in size, but are all extremely fertile, surrounded with wood, and abounding in fruit trees, and pineapples, and covered with verdure ; a thousand canals run through them, stretching beyond the sight, and resembling long walks arched with trees." (Bernier's Travels in the Mogul Empire.)

বাহ্যের রেশম সাধারণত পীতাত, কিন্তু কাসিমবাজারবাসিগণ তাহাকে বেতবর্ণও করিয়া থাকে। ওলন্দাজেরা সেই সমস্ত রেশম হগলী পর্যন্ত লইয়া গিয়া তাহাজে বোকাই করে। বঙ্গদেশে শাদা কার্পাস-খানও প্রস্তুত হয়। এখান হইতে নীলেরও রপ্তানী হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে লাকাও জন্মে। তদ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। এখান হইতে অনেকপরিমাণ চিনির রপ্তানী হইয়া থাকে। হগলী, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে তাহার বাণিজ্য হয়।*

বাণির ও টাভারনিয়ের বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে ইউরোপীয়-গণের মধ্যে ওলন্দাজগণই বঙ্গদেশে অধিক-পরিমাণে বাণিজ্যকার্যে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তৎকালে ইংরেজ প্রভৃতি অত্যন্ত ইউরোপীয়

বাণিকগণও এতদেশের সহিত বাণিজ্যকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইংরেজদিগের বাণিজ্য-কার্যের বিষয় ও তাহাদের দ্বারা কিরূপে এতদেশের বাণিজ্যের শ্রোত রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব। ইংরেজেরা এতদেশে বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হইলে তাহাদের বহু-সংখ্যক বাণিজ্যজাহাজ বঙ্গদেশে আগমন করিত এবং তাহা পণ্যভব্যে পরিপূর্ণ হইয়া দেশবিদেশে প্রেরিত হইত। এই সমস্ত জাহাজের আরোহিগণ বঙ্গদেশের যেরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত টমাস্ বাউরী-নামক একজন কাপ্তেনের বর্ণনা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। বাউরী ১৬৬৯ হইতে ৭৯ পর্যন্ত এদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

* "Kasembasar, a village in the kingdom of Bengala, sends abroad every year two and twenty-thousand bales of silk; every bale weighing a hundred pound. The two and twenty bales make two millions and two-hundred-thousands pound, at sixteen ounces to the pound. The Hollanders usually carry away six or seven-thousand bales, and would carry away more, did not the merchants of Tartary, and the Mogul's empire oppose them; for they buy up as much as the Hollander; the rest the natives keep it to make their stuffs. This silk is all brought into the kingdom of Guzerat, the greatest part whereof comes to Amadabad and to Surat, where it is wrought up. * * The raw silk of Kasembasar yellowish, as are all the raw silks that come from Persia and Sicily; but the natives of Kasembasar have a way to whiten it, with a lye made of the ashes of a tree which they call Adam's fig-tree; it as white as the Palestine-silk. The Hollanders send away all their merchandise which they fetch out of Bengala, by water, through a great canal that runs from Kasembasar into Ganges, for fifteen leagues together; from whence it is as far by water down the Ganges to Ougueli, where they laid their ships. * * * White Calicuts come partly from Agra, and about Lahore, part from Bengala. * * * There comes indigo also from Bengala which the Holland-Company transports for Muslipatan. * * * Gum-luke for the most part comes from Pegu; yet there is some also brought from Bengala, where it is very dear, by reason the natives fetch that lively scarlet colour out of it, with which they paint their Calicuts. * * * Powdered sugar is brought in great quantities out of the kingdom of Bengala; It causes also a veay great trade at Ougueli, Patna, Dacca and other places." (Tavernier's Travels in India.)

বাউরী বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময় বাঙলা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গা ও তাঁহার শাখানদীসমূহের তীরবর্তী গ্রাম ও শতশ্রামল ভূমিতে ইক্ষু, কার্পাস, লাক্ষা, মধু, মোম, ঘৃত, তৈল, ধাতু, বুট প্রভৃতি অনেক পণ্যদ্রব্য জন্মিত। ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজগণের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জাহাজসমূহ এই সমস্ত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া ভারতের নানাস্থানে, পারস্য, আরব, চীন ও দক্ষিণসমুদ্রের অভিমুখে বাজা করিত। এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য বাতীত নানাপ্রকার কার্পাস-নির্মিত ধান ও ছিট, ক্রমাল, রেশম, রেশমী-

বস্ত্র, অর্ধিফেন, মৃগনাভি, লক্ষা প্রভৃতি দ্রব্যও উৎপন্ন হইত। নবাব সায়েস্তাখাঁ এবং বণিক্গণ ঢাকা, বাগেশ্বর, পিপলী প্রভৃতি স্থান হইতে বিংশতি পালের জাহাজ বাণিজ্যার্থে সিংহল, টোনাগরিম প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিতেন। তাহারা হস্তী আনয়ন করিত ও মালদ্বীপ হইতে কড়ি প্রভৃতি আনিত। বাউরী কালীমবাজারকে বাঙলার সর্বপ্রধান বন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার আড়ণ্ডে সর্বপ্রকার পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রপ্তানী হইত বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।*

* "This kingdom (Bengala) is now become most famous and Flourishinge. , First for the great River of Ganges and the many large and faire arms thereof, upon the banks of which are seated many faire Villages, delicate groves and fruitful lands, affording great plenty of sugar, cottons, Lucca, honey, beeswax, butter, oyles, Rice, Gramme, with many other beneficial commodities to satisfie this and many other kingdoms. Many both great and small ships, both English, Dutch, and Portugals doe annually resort to lode and transport sundry commodities hence, and great com-merce goeth on into most parts of accompt in India, Persia, Arabia, China and South Seas. * *

This kingdom most plentifully doth abound with the before mentioned commodities, as also Callicoes of sundry sorts, Rommalls, raw and wrought silks, opium (the best in India), Muske in codd and out of it, Long Pepper, and severall sorts of druggs which cometh it to be soe admirable well populated and effected by the best European travellers.

The Nabob and some Merchants here (Dacca) and in Balasore and Piple have about 20 saile of ships of considerable burthen, that annually trade to sea, some to Ceylone, some to Tanassarree. Those fetch elephants, and the rest, 6 or 7 yearly, goe to the 12000 Islands called Maldiva to fetch coweries and 'cayre, and most commonly doe make very profitable voyage. * * *

Cossumbazar —A very famous and pleasant town, famous in many respects, first and chiefly for its great commerce and plenty of very rich Merchants, the onley market-place in this kingdome for all commodities made and vended therein, whence it received this name, Cossum signifieng the husband or chiefe, and Bazar a market." (A Geographical Account of countries Round the Bay of Bengal 1669 to 1679. By Thomas Bowrey.) বাউরীনাহেব কালীমবাজারকে খসমবাজার মনে করিয়া তাহার খসম অর্থাৎ স্বামী অর্থ করিয়াছেন।

এইরূপে বঙ্গভূমি বহু প্রাচীনকাল হইতে ধনধান্তে পরিপূর্ণ হইয়া বাণিজ্য ও স্বাস্থ্যগৌরবে প্রকৃত সোনার বাংলারূপেই পরিচিত ছিল। স্বাধীন হিন্দুনরপতিগণের রাজত্বাবসান হইলেও বঙ্গভূমিতে অগ্নের হাহাকার পড়িয়া যায় নাই। মুসলমান-রাজত্বকালেও সোনার বাংলার মস্তকে অশেষ কল্যাণ বর্ষিত হইত। নবাব সায়েস্তাখাঁ ও শুজাউদ্দৌলার সময় টাকায় ৮মণ ও মুর্শিদকুলীখাঁর সময় টাকায় ৪মণ চাউল বিক্রীত হইত। তখনও ইহার শিল্প-বাণিজ্যগৌরব সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপের বিশ্ব উৎপাদন করিত। ইহার হিন্দু অধিবাসিগণের বাসভবনের অদূরে মুসলমান-গণ বসবাস করিয়া সানন্দমনে কালযাপন করিত। ধর্মবিষয়ে প্রথম কিছুকাল উভয়-জাতির হৃদয়ে নানা তরঙ্গের উদয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা শান্তভাবে আনয়ন করে। উভয়জাতির নানা সম্প্রদায় আপনাপন জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া উদরারের ব্যবস্থা করিয়া লইত। এই উভয় জাতির হস্তপ্রসূত অসংখ্য পণ্যদ্রব্য অর্ণববানে দেশবিদেশে নীত হইত। সর্কাসপেক্ষা কার্পাসসূত্র ও বস্ত্র বয়ন ইহার প্রধান শিল্পকার্য্য ছিল। ইহার জন্ত কৃষকপরিবার হইতে তন্তুবায় ও ব্রাহ্মণ পরিবার পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। কৃষকেরা ইহার চাষে, তন্তুবায়েরা বস্ত্রবয়নে, আর অজ্ঞাত জাতি ইহার স্বত্বকর্ত্তনে নিযুক্ত হইত। প্রত্যেক সাধারণ গৃহস্থের ভবনে কার্পাসবস্ত্রবয়নরূপ মহাবিজয়ের জন্ত অন্নবিস্তর আয়োজন হইত।

অজ্ঞাত দ্রব্যেরও কৃষি ও শিল্পে ইহার অধিবাসিগণ মনোযোগ দিত। তাই বঙ্গভূমি শস্তশ্রামলা ও শিল্পবাণিজ্যগৌরবে গরীয়সী হইয়া সোনার বাংলারূপে দেশবিদেশে পরিচিত ছিল। ইহার প্রত্যেক গ্রামে স্বাস্থ্যের কল্যাণকরী ছায়া বিস্তৃত হইত। শ্রামল বৃক্ষরাজির তলে বসিয়া পল্লীবাসিগণ শারীরিক পরিশ্রমে আপনাদের জীবিকার উপায় করিত। বর্তমান সময়ের বাঙালীর জায় তাহারা নীর্ণদেহ ও কঙ্কলাবশেষ ছিল না। তাহাদের বাহুতে অপরিণীত শক্তি ছিল। সময়ে সময়ে তাহারা সে বাহুবলের পরিচয়ও প্রদান করিয়াছে। একদিন তাহারা আপনাদের বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিবার জন্ত পাঠান, মোগল ও ফিরঙ্গীর সহিত অসিযুদ্ধ ও অগ্নিক্রীড়া করিয়াছিল। ইহা কাহিনী নহে, ইতিহাস। মুসলমান ও পাশ্চাত্য লেখকগণ বাংলার এই বাহুবলের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতের ইংরেজ-শাসনকর্ত্তৃগণ বাংলার যে বৃথা অপবাদ দিয়া জগতের সম্মুখে তাহাদিগকে হেয় বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, ইতিহাস সে কথা স্বীকার করে না। বাংলার এরূপ অধঃপতন ভারতে ইংরেজের শাসন-নীতি। যে বাংলীগণ স্বর্গীয় স্বাস্থ্যে বলশালী হইয়া হৃদয় শত্রুগণের সন্মুখীন হইতে পশ্চাৎপদ হইত না, আজ তাহারা কঙ্কলাবশেষ, প্রেতমূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহার প্রত্যেক পল্লীতে শাস্তিদেবী বিরাজ করিতেন, যাহার প্রতি গৃহ হইতে এককালে রামায়ণ, চণ্ডী

ও কীর্তনের আনন্দগীতি অনন্ত আকাশ
স্পর্শ করিবার জন্ত উখিত হইত, আজ
তাহা শৃংখলপেচকের ধ্বনিতে মুখরিত।
যাহার পল্লীললনাগণ স্বদেশী বস্ত্রের অঙ্গরাল
হইতে আপনাদের লাবণ্যবিকাশ করিয়া
দেবীমূর্তিরূপে বিরাজ করিতেন, আজ
বিদেশীবস্ত্রে তাঁহারা আপনাদের কর্কশকায়
আবরণ করিবার জন্ত ব্যগ্র! যাহার
প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে হাত্মমুখ অধিবাসিগণ
স্ব স্ব জাতি ও সম্প্রদায়ানুমোদিত কৃষি,
শিল্প ও বাণিজ্যে স্বচ্ছন্দচিত্তে বাস করিত,
এক্ষণে তাহার সর্বত্র, উদয়ালের সংস্থানের
জন্ত হাহাকারের রোল উঠিতেছে! আজ
জীবনসংগ্রামে সকলেই আহত। কোথায়
সে স্বাস্থ্য, কোথায় সে শান্তি, কোথায় সে
কল্যাণ! আজ সোনার বাংলা শত্মানভূমি!
কেন এমন হইল, আমরা পরে তাহার
উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে।

৫

দুর্ভিক্ষের গান।

গ্রামের প্রবেশপথে রাস্তার চৌমাথায়
কতকগুলি শিশু—কতকগুলি ক্ষুদ্র নর-
কঙ্কাল বলিলেও হয়—দুই হাতে আপনাদের
উদর ধরিয়া একটা-কি গান গাহিতেছে,
অথবা চীৎকার করিয়া কি বলিতেছে।
উহাদের উদর ভিতরদিকে ভয়ানক ঢুকিয়া
গিয়াছে; চামড়ার খালি বোতলের মত
কুচকিয়া চুপুসিয়া গিয়াছে; বড় বড় চক্ষু;—
কেন এত দুঃখযন্ত্রণা সহিতে হইতেছে
তাবিয়াই যেন বিশ্ববিস্ফুরিত।

এই গানের পূর্ণ প্রচণ্ডতা হৃদয়ঙ্গম
করিতে হইলে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইতে হয়,
রাজস্থানে যাইতে হয়—যেখানে, শুধু এক-
মুষ্টি চাউলের অভাবে শতসংখ্য লোক

মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই গুহা হইতে
সেই সব স্থান প্রায় দেড়শতকোশ দূরে।

এই প্রদেশে,—মৃত বন, মৃত জঙ্গল,
সমস্তই মৃত। যে বৃষ্টি পূর্বে আরবসাগর
হইতে প্রেরিত হইত, কিয়ৎবৎসর হইতে
তাহার অভাব হইয়াছে, অথবা উহা ভিন্নপথে
চলিয়া গিয়াছে;—বেলুচিস্থানের মরুভূমির
উপর নিরর্থক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শোত-
স্থনীতে জল নাই; নদী শুকাইয়া গিয়াছে;
তরুণতা আর হরিৎ পরিচ্ছদ ধারণ করে না।

আমি এখন রংলাম ও ইন্দোরের রাস্তা
ধরিয়া রেলপথে দুর্ভিক্ষপ্রদেশে যাইতেছি।
এক্ষণে সমস্ত ভারতই লৌহপথে কৃতবিকৃত।
যে ট্রেনে যাইতেছি, উহার সমস্ত গাড়িই গ্রাম

খালি;—বাজীর মধ্যে ছইটিমাত্র ভারত-বাসী।

আমার চোখের নীচে দিরা—কয়েক-ঘণ্টাকাল—কেবলই বন চলিয়াছে;—ইহা তালীবন নহে; এই সব বনতরু কতকটা আমাদের দেশীয় গাছের মত। বনগুলো যদি এত বড় না হইত, উহার দিগন্তদেশ যদি বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন না হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশের বন বলিয়া ভ্রম হইতেও পারিত। স্কুমার শাখা, ধূসর শাখা। উহার সাধারণ রং—আমাদের দেশের ডিসেম্বারের “ওক্”—গাছের পাতার মত। আমাদের ফ্রান্সদেশে, শরতের শেষভাগেই এইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এখন এপ্রিলমাসে ভারতবর্ষে রহিয়াছি। গ্রীষ্মদেশস্থলত প্রথর উত্তাপ, অথচ বহির্দৃশ্য শীতদেশের মত। আজ ভ্রমণের এই প্রথমদিবসে, উৎকট দুঃখকষ্টের চিহ্ন এখনো পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশ পায় নাই; তবে মনে হয়, প্রকৃতির কি-যেন-একটা বিপর্যায় ঘটিয়াছে; সমস্ত দেশ নিরুপায় হইয়া যেন একটা উদাসভাব ধারণ করিয়াছে; নিঃশেষিতশক্তি কোন গ্রহের যেন মরণযন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে।

আমাদের যুরোপের পিতামহ ভারত—বলা বাহুল্য, এখন ধ্বংসাবশেষের দেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায় চারিদিকেই সেই সব মৃতনগরের উপছায়া দেখিতে পাওয়া যায়—বাহা শত-শত বৎসর, সহস্র-সহস্র বৎসর পূর্বে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে;—সেই সব নগর, যাহার নাম পর্য্যন্ত এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বাহা এককালে খুব বড় ছিল;—পর্কতাদির উপর

রাজমহিমার অধিষ্ঠিত হইয়া, পাদশাহী অভলম্পর্শ অবলোকন করিত। তিনক্রোশ দীর্ঘ প্রাকারাবলী, প্রাসাদ ও মন্দিরাদি এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়া কপিবৃন্দ ও ভীষণ সর্পের আবাস হইয়া পড়িয়াছে।...এই সব ভয়াবশেষের নিকটে—আমাদের সেকালে দুর্গপ্রাসাদের চূড়ামন্দির, নগরপালের আবাস-গৃহ, আমাদের সেই সামন্ত-যুগের আর সমস্ত কি ক্ষুদ্র বলিয়াই মনে হয়!

আমাদের যাত্রাপথের বরাবর ধারে-ধারে একটার পর একটা নগর ও অরণ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতেছে;—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই একই জ্বালাময় বায়ুরাশির মধ্যে নিমজ্জিত। এই উত্তীর্ণাবশেষের উপর,—সেই গল্পকাহিনীর প্রাচীন মৃতনগরাদির অস্থি-রাশির উপর—প্রথর সূর্য্য অন্ত যাইতেছে—ধূলায় মলিন, শীতলত্বস্থলত পাণ্ডুবর্ণ।

পরদিন, অসীম জঙ্গলের মধ্যে আগ্রত হইলাম। যে প্রথম-গ্রামটিতে আসিয়া গাড়ি দাঁড়াইল,—গাড়ির চাকার ঘর্ষরশক ও লোহালকড়ের ঝন্ঝনানি ঝামিঝামা, একটা কোলাহল—একটা বিশেষধরণের কোলাহল উঠিল; কিন্তু, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—কিন্তু তনিলে শরীরের রক্ত যেন জমাট হইয়া যায়। আবার সেই ভীষণ গান—ইহা আমাকে ছাড়িবে না দেখিতেছি। এইবার স্থিতিকের দেশে প্রবেশ করা গিয়াছে। কতকগুলো শিতর কণ্ঠধ্বনি,—ছুটির সময়, ইন্সুলের ছেলেরা বেকর কোলাহল করে, কতকটা সেইরূপ—কিন্তু এই কণ্ঠধ্বনি কেমন-যেন চেরা-চেরা, খ্যান্‌খেনে, অবসন্নপ্রায়;—স্পষ্ট শুনা যায় না।...

আহা! বেচারী শিশুগুলা, ঐখানে ঐ রেলিং-বেড়ার ধারে ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে এবং উহাদের শুদ্ধহস্ত আমাদের দিকে প্রসারিত করিতেছে;—যে অস্থিখণ্ডের শেষপ্রান্ত হইতে হাতটি বাহির হইয়াছে, ঐ অস্থিখণ্ডই উহাদের বাহ! উহাদের শামলা গায়ের চামড়া পর্দায়-পর্দায় কুঁচকিয়া গিয়াছে, উহাদের নীর্ণ কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দেখিলে ভয় হয়। উহাদের উদর দেখিলে মনে হয়, যেন একেবারেই অত্র-শূন্য—এমনি সমতল। চোখের পাতার উপর, ওষ্ঠের উপর মাছি লাগিয়া রহিয়াছে—শেবারশিষ্ট আর্দ্রতাটুকু পান করিবে, এই আশায়! উহাদের খাস যেন ফুরাইয়া আসিয়াছে, দেখে যেন আর প্রাণ নাই, তবু হাটাইয়া চীৎকার করিতেছে। উহারা খাইতে চাহে—শুধু একমুঠা খাইতে চাহে। উহারা মনে করিতেছে, বাহারা এমন বড়-বড় গাড়ি চড়িয়া যাইতেছে, অবশ্যই উহারা ধনিলোক হইবে;—অবশ্যই উহারা সদয় হইয়া কিছু আমাদের নিকট ছুঁড়িয়া দিবে।

—“মহারাজ! মহারাজ!” (মহাশয়, মহাশয়)—ঐ সব ক্ষুদ্র কণ্ঠ গানের কল্পিত-স্বরে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল। উহাদের মধ্যে এমন শিশুও আছে, বাহাদের বয়স পুরা বেংলর হইয়াছে কি না, সন্দেহ; তাহারাও “মহারাজ! মহারাজ!” বলিয়া চীৎকার করিতেছে; উহারাও বেড়া-রেলিংএর মধ্য-দিয়া নীর্ণ অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত বাহির করিয়া রহিয়াছে।

এই ট্রেণে বাহারা আমার সহযাত্রী, উহারা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণীর সামান্য-

অবহার ভারতবাসী। উহাদের বাহা কিছু সন্দেহ ছিল,—ছুঁড়িয়া-ছুঁড়িয়া উহারা ঐ শিশু-দিগের নিকট ফেলিতেছে;—চাউলপিঠার উচ্ছিষ্টাংশ ও পরস। ঐ ক্ষুধিত শিশুরা, পণ্ডদের জায়, পরস্পরকে মাড়াইয়া, হুমড়ি খাইয়া সেই সমস্তের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ঐ পরসাগুলা কি উহাদের কাজে আসিবে? তবে কি গ্রামের হাটবাজারে এখনো কিছু খাদ্যসামগ্রী আছে?—উহা শুধু তাহাদেরি জন্ত, বাহাদের কিনিবার সন্মুল আছে! আমাদের ট্রেনের পিছনেই তা চাউল-বোঝাই ষ্টো মালগাড়ি জোড়া রহিয়াছে এবং প্রতিদিনই এই সব মালগাড়ি যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু এই চাউল উহাদিগকে দেওয়া হইবে না; উহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ত উহা হইতে একমুষ্টি কিংবা দুইচারিটি দানাও দেওয়া হইবে না; উহা তাহাদেরি জন্ত, বাহাদের এখনো কিছু অর্থ আছে—বাহারা উহার মূল্য দিতে সমর্থ।

এখনো কিজন্ত গাড়ি ছাড়িতেছে না? কিজন্ত এই বিবাদতমসাক্ষর গ্রামের সম্মুখে এতক্ষণ অপেক্ষা করা—যেখানে মিনিটে-মিনিটে ক্ষুধিতের দল আসিয়া জমা হইতেছে এবং সেই হুঁড়িঙ্গের লোমহর্ষণ গান অবিরত গাহিতেছে?

চতুর্দিকে, মাটি এত শুক শুঁড়াশুঁড়া হইয়া গিয়াছে যে, পূর্বের বাহা ধানের ক্ষেত ছিল, এক্ষণে তাহা ভস্মাক্ষর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ দেখ কতকগুলি রমণী—রমণী কঙ্কাল বলিলেও হয়—উহাদের স্তন শুকচামড়ার টুকরার মত ঝুলিতেছে। উহারা পুতিগন্ধি ভারী বোঝার

গাঁট মাথায় লইয়া, বিক্রয়ের আশায়, তাড়া-
তাড়ি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আনিয়াছে ;—এ
সমস্ত সেই সব গরুর চামড়া—যাহারা
অনাহারে মরিয়াছে এবং পরে যাহাদের গাত্র
হইতে উহার ছাল ছাড়াইয়া লইয়াছে।
গরুদের খাওয়াইতে পারে না বলিয়া,
আধমরা জীবন্ত গরুদের মূল্য চারি-আনা
পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। গোমাংস খাইয়া
কেহ যে ক্ষুধিবৃত্তি করিবে, তাহারো জো
নাই ; কেন না, এই ব্রাহ্মণ্যের দেশে, প্রাণ
গেলেও কেহ এ কাজ করিবে না। তবে
এই চামড়াগুলো কে ক্রয় করিবে ?—এই
সব চর্খ, যাহা হইতে পুতিগন্ধ বাহির
হইতেছে এবং যাহাতে কাঁকে-কাঁকে মাছি
আসিয়া বসিতেছে।

জামার কাছে যাহা-কিছু ছিল, সমস্তই
উহাদের নিকট ছুঁড়িয়া দিয়াছি...কি উৎপাত!

এখান হইতে গাড়ি কি আর ছাড়িবে না ?
...আহা! ঐ অৱসরের শিশুটির মুখে
কি হতাশভাব! উহা অপেক্ষা একটু
বয়সে বড় আর একটি শিশু উহার মুষ্টিবদ্ধ
হাত হইতে উহার তিস্তাপানটুকু ছিনাইয়া
লইয়াছে! ...

এতক্ষণের পর ট্রেনটা কাকানি দিয়া
নড়িয়া উঠিল, চলিতে লাগিল; সমস্ত
কোলাহল ক্রমে দূরে চলিয়া গেল। আমার
আমাদিগকে সেই নিশ্চল জঙ্গলের মধ্যে
আনিয়া ফেলিল।

এ, মরুজঙ্গল। পূর্বে এই জঙ্গল বসন্ত

কালে জীবজন্তুতে আকর্ণ হইত; তৃণাদি,
ঝোপঝাড় আর হরিষর্গ ধারণ করে না;
এই কান্ডনও রসসঞ্চার করিয়া উত্তীর্ণকে
বাঁচাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। প্রচণ্ড
সূর্যের প্রথর উত্তাপসঙ্গেও, অরণ্যাদির
ভ্রায় এই জঙ্গলও শীতের ভাব ধারণ
করিয়াছে। শীর্ণকায় হরিণেরা তৃণ খুঁজিয়া
না পাইয়া, জলের সন্ধান না পাইয়া, আকুল-
ভাবে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। দূর-দূর
ব্যবধানে, কোন একটি শুকগাছের গুঁড়িতে
—কোন একটি তরুণ শাখায়,—কোন একটি
নিঃসঙ্গ ক্ষুদ্র উপশাখায়—যে-কিছু রস
অবশিষ্ট ছিল তাহাই শোষণ করিয়া, তাহা
হইতে দুইচারিটি নরম পাতা বাহির
হইয়াছে, অথবা একটি বড়-রকমের লাল
ফুল, এই মরুদৃশ্যের মাঝখানে, উদাসভাবে
ফুটিয়া রহিয়াছে।

যে গ্রামেই ট্রেন আসিয়া থামে, সেই-
খানেই এই সব ছুঁড়িফুঁড়িত ক্ষুধিতের
দল রেলিংএর মধ্য দিয়া আমাদের প্রতি
দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। যাহা শুনিতে ভয় হয়,
যাহা সর্বত্রই একই ধরনের—সেই চেরা-চেরা
আওয়াজের একহুরো গান কোন গ্রামের
নিকটে গাড়ি থামিলেই শুনিতে পাওয়া
যায়। এবং যখন আমরা সেই তাপদগ্ধ
বিজনের মধ্যে—দূরে চলিয়া যাই, তখন
দারুণ নৈরাশ্যে উহাদের কণ্ঠস্বর আরো
ক্ষীত হইয়া আমাদের অধীবাসন

করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অহল্যাবাইয়ের পোষ্যপুত্র । *

পতিবিরোগান্তে মহারানী অহল্যাবাই স্বয়ং রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। রাজ্যে সুশাসন এবং শৃঙ্খলা স্থাপনকল্পে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, একদিন মহারানীর মনে হইল, দেহ ক্ষণভঙ্গুর,—কোন উপযুক্ত প্রজাপালক পুরুষপ্রবরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করা আবশ্যিক। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া মহারানী স্বীয় অমুচর-বৃন্দকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, “রাজধানীতে আমাদের স্বজাতি ~~কোন~~ হইতে আট বৎসরের যত বালক আছে, সকলকে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত কর।”

আজ্ঞা পাইবামাত্র কর্ম্মচারিগণ মহারানীর কুলজাত নগরস্থ সমস্ত বালককে তাঁহার সম্মুখে লইয়া আসিল। মহারানী তাহাদিগকে একপংক্তিতে দাঁড় করাইয়া প্রত্যেকের আকৃতির প্রতি বিশেষরূপে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া অবশেষে তুকোনানক বালকের হস্তধারণপূর্ব্বক অমুচরের প্রতি কহিলেন, “এই বালককে অস্তঃপুরে লইয়া যাও এবং রাজমর্যাদামুসারে স্নান করাইয়া ও বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর।” তদনন্তর নগরমধ্যে তাঁহার আজ্ঞামু-সারে অভিষেকের উৎসবসূচক আনন্দতেরি বাজিয়া উঠিল। নগরবাসীর আনন্দের সীমা

রহিল না,—গৃহে গৃহে মঙ্গলবাৎস বাজিতে লাগিল, রাজধানী-বিবিধ মঙ্গল্যদ্রব্যে স্তূর্ণোদ্ভিত হইল। অবশেষে দরিদ্র-সন্তান “তুকুয়া” স্বয়ং মহারানীকর্তৃক সিংহাসনাদিকট হইয়া মহারাজ তুকৌজী হোলকর নামে অভিহিত হইলেন।

এই অষ্টমবর্ষীয় বালকের সম্যক্ বিভার্জন এবং ব্রহ্মচর্য্যপালনের নিমিত্ত কুলবান্ নিষ্ঠাবান্ সুবিদ্বান্ ব্যোবুদ্ধ বহু অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া মহারানী তাঁহা-দিগকে বলিলেন, “আমি স্বীয় বুদ্ধিতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ মনে করিয়া, এবং লক্ষ লক্ষ প্রজার কল্যাণ ও ধনপ্রাপ্তিরক্ষা কেবল সুযোগ্য শাসকের দ্বারাই সম্ভব এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, এই বালককে ইহার অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আপনাদের হস্তে অর্পণ করিলাম; বতদিন এই বালক যৌবনাবস্থায় উত্তীর্ণ না হয় এবং বাবৎ আপনাদের অমুমোদনপত্র না পায়, তাবৎ আপনারা নিঃপুত্রবৎ ইহার লালন এবং তাড়নের অধিকারী।”

বালকের সেবার্থ পূর্ব্ববয়স্ক, কায়মনো-বাক্যে সদাচারী, সুশীল ও পরিচর্য্যানিপুণ সেবক নিযোজিত হইল। মহারানী তাহা-দিগকে বলিলেন, “আজ তোমাদের সৌভাগ্যের দিন। আজ ঈশ্বর তোমাদের

* বামি-বিশেষদ্রাৱন-কর্তৃক হিন্দিতে রচিত। শ্রীযুক্ত শাক্যসিংহ সেন কর্তৃক অনূদিত।

স্বকৃত্তির ফল তোমাদিগকে দিতেছেন। তোমরা তোমাদের চিরজীবী মহারাজের নিকটবর্তি-সেবক নামে অভিহিত হইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলে। ঈশ্বর তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।”

মহারাজী অহল্যাবাই নিজের যোগ্যতা-দ্বারা তুচ্ছকোকে ছাত্রধর্ম্মে নিপুণ করিয়া তাঁহার রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করিলেন। পুঙ্খকালে অনেকানেক ভারতমহিলা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—ঐহার রাজ্যশাসন-কার্য্যে অসাধারণ প্রবীণতা ও দূরদর্শন দেখাইরাছেন। অহল্যাবাই তাঁহাদের মধ্যে একজন মাত্র।

.অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে তুচ্ছকোজী মহারাজী ভিক্টোরিয়ার অঙ্গমোদন প্রাপ্ত হইয়া মহারাজপদে অধিষ্ঠিত হন। রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ দুইবৎসরকাল উৎকৃষ্ট প্রণালীতে রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিবার পর, দেশাটেরে ইচ্ছা করিলেন। তিনি মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—“যদি রাজমর্যাদাধীন চতুরবাহী শকটে আরোহণ করিয়া, কোষমুক্তধন্যধারী প্রহরীবর্গে বেষ্টিত হইয়া দেশভ্রমণ করি, তাহা হইলে প্রজাপঞ্জর যে সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার ইচ্ছা আনার আছে, তাহা কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না।” সুতরাং নিজের অল্পপস্থিতিকালে রাজ্যপরিচালনের সমুচিত বন্দোবস্ত করিয়া চারিজন বিধিত বিধান দেওয়ারের সহিত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বপ্রহরে তিনি যাত্রা করিলেন। প্রথমে রেসিডেন্টসাহেবের কুঠিতে

আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, “আমি ছদ্মবেশে দেশপর্য্যটনমানসে বাহির হইরাছি। রাজ্যের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি, আর* আপনিও আসছেনই, সুতরাং চিন্তায় কোন কারণ নাই। আমাদের পাঁচজনের এই প্রতিকৃতি * লউন। পরন্তু সাধারণে যেন ইহার বিন্দু-বিসর্গও না জানিতে পারে।” এইরূপ দুইচারি কথার পর সাহেবের হস্তমর্দন করিয়া তাঁহারা রওনা হইলেন। সাধারণ যাত্রীদের মত তাঁহারাও একখানি কল, একটি ঘণ্টা ও একগাছি দড়ি স্বক্ষে ঝুলাইয়া সাধারণ্যে মিশিয়া গেলেন।

এই পরিভ্রমণকালে মহারাজ প্রতিদিন পাঁচটার সময় গাজেখান করিয়া পথে বাহির হইতেন। তথায় পথিকের সহিত “মিলিত” হইলে অথবা শস্তক্ষেত্রে শ্রমনিরত কৃষকে দেখিলে তিনি তাহাদিগকে “রাম রাম” বলিয়া অভিনন্দন করিতেন এবং একত্র তামাকু খাইবার ছলে নিতান্ত প্রীতিপূর্ব্বক তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়া তাহাদের অবস্থা সম্যক্ অবগত হইতেন। এইরূপে প্রজাবর্গের বাহু ক্রিয়াকলাপ ও মনোভাবের চিত্রসকল নিজ মানসপটে অঙ্কিত করিয়া ঠিক বেলা এগারটার বাসায় ফিরিতেন। বাসায় আসিয়া কিছুক্ষণ শ্রমাপনোদনের পর সন্তলে মিলিয়া কুঠিতে গানভোজনাদি দিনকৃত্য সমাপন করিয়া একঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন, পরে নগর-পরিদর্শনে বাহির হইতেন।

নগরে তাৎখলী, মিষ্টানকার, সুদি,

* কোটো প্রবান করিবার তাৎপর্য্য এই যে, মহারাজের পদবর্ধী সকল স্থানের রাজপুরুষদিগকে জানান আবশ্যক। রাজপুরুষগণের অজ্ঞাতসারে মহারাজের দেশভ্রমণ সরকারবাহাদুরের নীতিবিরুদ্ধ।

বেনিয়া, জহরী, শেঠ প্রভৃতির বিপণিতে প্রবেশ করিয়া সেই সেই স্থানে তিনি বেচ্ছামুরূপ তথ্যসংগ্রহ করিতেন। জুয়া-বেলার ঘরে, মদের দোকানে ও অর্দ্ধতস্ত্রাগত মুদ্রিতনরন চণ্ডপাশিগণের আড্ডাতেও ঢুকিয়া পড়িতেন। ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত থাকিয়া মাজিষ্ট্রেটের জায়বিচার, জজের বিশাল বুদ্ধি ও হুম্মমীমাংসা এবং উকিলগণের দারাহ-ক্রমিক যুক্তিবৃত্ত বাদামুবাদের বিচিত্র ছটা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেন। এইরূপে প্রত্যেক গ্রাম ও নগরের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সারাদিন ঘুরিয়া-ফিরিয়া শেষে বাসায় পৌঁছিয়া আহালাদি করিতেন। মহারাজ ও তাঁহার দেওয়ানগণের মধ্যে কেবল এইমাত্র পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত—যে, রাজির চারিপ্রহরে চারিজন নিদ্রিত-মহারাজের প্রহরিতরূপে জাগ্রত থাকিতেন। নহিলে অবশিষ্ট সময়ে না কেহ রাজা, না কেহ দেওয়ান,—সকলেরই কার্য্য-কলাপ সামান্ত পথিকেরই মত।

এইরূপে প্রত্যেক প্রসিদ্ধ নগরে চারি-পাঁচদিন বাস করিয়া, বিবিধ-চরিত্র-পরিদর্শনে নিজের অভিজ্ঞতাবন্ধন ও নান্যবিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিয়া, রাজ্যের অনিষ্টাচারী চরিত্র-গণের চরিত্র বর্ণনা দৃষ্টি দেখিয়া এবং রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সাক্ষাৎসমক্ষে জানিয়া, দুই-বৎসর পরে পুনশ্চ তিনি সিংহাসনে শোভমান হইলেন এবং যথাবিধি রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ তুকোজীর এই প্রশংসনীয় পণ্যটনের ফলে প্রজাকুল কুরুপ লাভবান হয়, রাজ্যের সংস্কারকল্পে ও ক্রীড়াসম্পাদনার্থ

তিনি কোন্ কোন্ স্থানীয় প্রচলন করেন এবং কুরুপ আগ্রহ ও প্রজাপ্রীতির সহিত রাজকার্য্যে দত্তচিত্ত হন, ইত্যাদি বিষয় ঐতিহাসিকগণ বর্ণন করিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহার বিষয়ে প্রত্যক্ষ হই একটি ক্ষুদ্র মাত্র ঘটনায় তাঁহার চরিত্রের কিছু আভাস দিব মাত্র।

মহারাজ নিত্য পড়াষে, ব্রাহ্মমূর্ত্তে নিদ্রাদেবীর অঙ্কতাগ করিতেন। পরে, শৌচাদি-প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে প্রধান 'কর্ম্ম-চারী' (মীর মুন্সী) সমভিব্যাহারে, শকট-রোহণে নগরের বহির্দেশে কোন ময়দানে যাইতেন। রাজ্যের মঙ্গলচিত্তাই তাঁহার অঙ্গরক্ষক থাকিত,—আত্মরক্ষার নিমিত্ত তিনি সৈনিকাদি সঙ্গে লইতেন না। ময়দানে উপস্থিত হইয়া অখণককে 'রক্ষিমুক্ত' করিবার আদেশ ছিল। সেখানে প্রজলিত দীপালোকে মীর মুন্সীর মুখে তিনি রাজ্য-সংক্রান্ত কাগজপত্র শুনিতে আরম্ভ করিতেন। অবশেষে গগনপটে বালারূপজ্যোতি প্রকাশ পাইলে, কিয়দূর পদব্রজে যাইয়া শকটে আরুঢ় হইতেন এবং মীর মুন্সীর সহিত রাজ্যশাসনাদির কথা আলোচনা করিতে করিতে ও চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে ধীর-গতিতে বেলা আটটার সময় প্রাসাদে পৌঁছিতেন। পথিমধ্যে কেহ যদি তাঁহাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা করিতেছে, এরূপ লক্ষণ দেখাইত, ধনি দরিদ্র-পণ্ডিত-মুর্থ-নির্কিঁশেযে সকলকেই তিনি অভিমানবর্জিত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক কুশলপ্রশ্নান্তে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমার কি কিছু বলিবার আছে? যদি থাকে ত নিঃশব্দ হইয়া বলিতে পার।"

আসাদে পৌছিয়া উহার বহির্দেশেই শকটাক্রুত অবস্থায় দরবার করিতেন;—সেইখানেই প্রজাবর্গের আবেদনপত্রে যথোচিত আদেশ দিতেন। দশটার সময় আসাদে প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতরে আবার একঘণ্টাকাল দরবার করিতেন। এগারটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত দান, ধ্যান ও ভোজনে অতিবাহিত হইত। তাহার পর বেলা দুইটা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিয়া পুনশ্চ তিনি দরবারে বসিতেন। এই দরবারে রাজকার্য্যের সকল বিভাগের প্রধানগণ, জেলাসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ, বিদেশাগত পণ্ডিতমণ্ডলী, বিবিধ বিজ্ঞা ও ললিতকলায় পারদর্শী গুণিজন এবং বণিগুবর্গ নিজ নিজ মর্যাদানুসারে আসন অধিকার করিয়া মহারাজের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেন।

মহারাজ আসিয়া সুবিস্তৃত বৈঠকে উপবিষ্ট জনমণ্ডলীর মধ্যেই বসিতেন। তাঁহার এবং সর্বসাধারণের মধ্যে প্রভেদসূচক রাজমর্যাদার লক্ষণ কেবল তিনটি বালিশ থাকিত। যে বিভাগের অধ্যক্ষের দিকে মহারাজ মুখ ফিরাইতেন, তৎক্ষণাৎ সেই বিভাগের অধ্যক্ষ তাঁহাকে কার্য্যবিবরণী শুনাইতে আরম্ভ করিতেন। “ওহে, অমুকদিন অমুকপ্রকারে অমুক কৃষক অমুক বিষয়ে যে আবেদন করিয়াছিল, তাহার উপর মন্ত্রিমহাশয় কিরূপ আদেশ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কাগজপত্র বাহির কর” —এইরূপে মন্ত্রীর প্রত্যেক বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, বিশেষজ্ঞগণকে কুশলজিজ্ঞাসা, সদা-

লাপে সকলের তৃষ্টিবিধান, বিদ্যার্থীগণকে বিদ্যাদান ও অজ্ঞান নিত্যকর্ম্ম নিত্য সমাপন করিয়া রাজা এগারটার সময় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন।

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, মহারাজ কেবল তিনচারঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন, অবশিষ্ট বিশঘণ্টা রাজকার্য্যেই ব্যয়িত হইত। রাজ্যের ইষ্টচিত্তাই তাঁহার একমাত্র মুখ ছিল। কোন গ্রামের কোন ক্ষেত্র, কোন আসামীর কোন মোকদ্দমা বা রাজকার্য্যের এমন কোন বিষয়ই ছিল না, যাহা তিনি মনে করিয়া না রাখিতেন।

মহারাজ তুক্কোজী একদিন হস্তিপৃষ্ঠে আক্রুত হইয়া বিশেষ ভাঁকজমকের সহিত কোন স্থানে যাইতেছিলেন, লোকের ভিড় সরাইতে সরাইতে সিপাহীরা অগ্রগামী হইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন এক দরিদ্র বৃদ্ধকে নিতান্ত সন্মুখবর্তী দেখিয়া কহিল, “ওরে বুড়ো, মহারাজের হাতী আসছে, সরে যা।” শুনিয়া বৃদ্ধ উদ্ভুত হইয়া দেখিল। কহিল, “হঁ, সেই তুক্কুয়াই ত।” ইতিমধ্যে মহারাজের হস্তী নিকটে আসিয়া পড়িল। তখন সিপাহী বৃদ্ধকে প্রহার করিতে উদ্ভূত হইতেছে, এমন সময়ে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে মহারাজের এই কথাটির শুনিতে পাওয়া গেল, “হঁ বাবা, আমি সেই তুক্কুয়াই বটি।”

বাল্যের শিক্ষাপ্রভাবই তুক্কোজীর ভবিষ্যৎ মহত্বের কারণ হইয়াছিল। অহল্যাবাইএর লালনপালন ও তাড়ন হইতেই তুক্কোজীর বাল্যলব্ধ অসংস্কারের উৎপত্তি।

শ্রী:—

পালকী-বেহারার গান । *

মোরা মন্দ মূছ মন্দ তা'রে
বাহিয়া বাই চলে' ।
সে যে গানের হাওয়া লেগে যেন
ফুলের মত দোলে ।
সে যে পাখীর মত ছুঁয়ে চলে
শ্রোতের ফেনা-পরে
সে যে স্বপন-দেখা অধর হ'তে
হাসির মত ঝরে ।
মোরা স্নেহের তালে চরণ ফেলে
ধাই গো মোরা গাই,
যেন মালার মাঝে মোতির মত
তাহারে বাহি ভাই ।

মোরা মন্দ মূছ মন্দ তা'রে
বাহিয়া বাই চলে,
সে যে গানের হিমবিন্দু-পরে
তারার মত দোলে ।
সে যে বস্ত্রাশুখে উন্মিড়ালে
রশ্মিসম ফুটে,
সে যে বধূর নত নয়ন হ'তে
অশ্রুসম টুটে ।
মোরা মন্দ মূছ মন্দ মূছ
ধাই গো মোরা গাই
যেন মালার মাঝে মোতির মত
তাহারে বাহি ভাই ।

* হাইজাবাদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পা শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর রচিত ইংরেজি কবিতা হইতে অনূদিত ।

স্বদেশী বা পেটি যটিজ্‌ম ।

১

যে ভাব ও আদর্শকে আমরা এখন স্বদেশী নামে নির্দেশ করিতেছি, তাহা এদেশে নিতান্তই নূতন। ইতিপূর্বে ইহা আমাদের সমাজে কখনো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। ইংরেজিতে ইহাকে পেটি যটিজ্‌ম বলে। ইংরেজ শিক্ষার প্রেরণায়, পাশ্চাত্য-সাধনার প্রভাবে, ইংরেজশাসনের চাপে এ ভাব ও এ আদর্শ আমাদের মধ্যে জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ বস্তু পূর্বে আমাদের দেশে ছিল না, আমাদের ভাষায় ইহার নাম নাই।

আমাদের সমাজ আছে, সমাজ ছিল; কিন্তু নেশন্ পূর্বে কখনো ছিল না। এই-জন্ত আমাদের ধর্ম ছিল, কিন্তু পেটি যটিজ্‌ম ছিল না। মানবসমাজ যে ছাঁচে ঢালাই হইলে নেশন্‌রূপে গড়িয়া উঠে, বিধাতা আমাদের সমাজকে ইতিপূর্বে সে ছাঁচে কখনো ফেলেন নাই। প্রথম হইতেই, এইজন্ত আমাদের সমাজের আদর্শ ও আকার অন্তরূপ ছিল।

যুরোপে গ্রীকেরা পেটি যটিজ্‌মের আদি-গুরু ছিলেন। গ্রীকসমাজত্বের মধ্যে এই অপূর্ণ দেশচর্য্যের বীজ নিহিত ছিল। আর গ্রীক দেশে সমাজকে দেখিত, যে ভাবে সমাজত্বের আলোচনা করিয়াছিল, যে আদর্শে সমাজকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, হিন্দু সেরূপ করে নাই।

গ্রীক ও হিন্দু উভয়েই একই বিশাল আর্ধ্যবংশের বিভিন্ন শাখা। সুতরাং উভয়ের মধ্যেই আর্ধ্যকুললক্ষণ বিद्यমান রহিয়াছে। আর্ধ্যের লক্ষণ দুই—এক তাহার তীক্ষ্ণ তত্ত্বদৃষ্টি, দ্বিতীয় তাহার সমদর্শী সমাজগঠন। আর্ধ্যভাষা ও আর্ধ্যচিন্তা চিরদিনই আত্মাকে অনাত্ম হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছে ও বর্ণনা করিয়াছে। আর্ধ্যসমাজে সেইরূপ চিরদিনই প্রজ্ঞাশক্তির সংহতিতে রাজশক্তির অভ্যাস হইয়াছে। গ্রীক ও হিন্দু উভয়ের মধ্যেই প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে—এই দ্বিবিধ আর্ধ্যলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রীক ও হিন্দু একই আর্ধ্যবংশসম্ভূত ও আর্ধ্যলক্ষণাক্রান্ত হইলেও, উভয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্যও অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমত হিন্দুর তত্ত্বজ্ঞান যে প্রণালীতে বিকশিত হইয়াছে, গ্রীকের তত্ত্ববেষণ সে পন্থায় পরিচালিত হয় নাই। হিন্দু বিশিষ্টকে উপেক্ষা ও বর্জন করিয়া নির্বিশেষভাবে তত্ত্ববস্তুকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। সকল জাগতিক সম্বন্ধকে অলীক বা মাস্টিক বলিয়া উড়াইয়া-দিয়া, হিন্দু জগদতীত ও মায়াতীত, নিগূণ, নির্বিশেষ চৈতন্তবস্তুর অন্বেষণে গিয়াছে। গ্রীক সে পথে যায় নাই। হিন্দু মুখ্যত নিগূণবাদী, গ্রীক মুখ্যত সগুণবাদী। গ্রীক জগতের সম্বন্ধকে উপেক্ষা করে নাই, কিন্তু

এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে সকল সম্বন্ধের
আধার ও অবলম্বনরূপেই তত্ত্ববস্তকে পাইতে
প্রয়াস করিয়াছে। এইখানেই গ্রীক ও
হিন্দুর মধ্যে বিশাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া যায়।

এই প্রভেদনিবন্ধনই গ্রীক ও হিন্দুর
সাধনা ও সভ্যতার মধ্যে বিশাল পার্থক্যের
উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রীকেরা বিশিষ্টের মধ্যে
নির্কিংশেষকে প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, জগতের
সকলপ্রকারের—বস্তুগত, ব্যক্তিগত, ভাব-
গত, চিন্তাগত—সম্বন্ধকে ফুটাইয়া তুলিতে
চেষ্টা করিয়াছে। বস্তুর বিবিধ সম্বন্ধের
আলোচনা করিতে যাইয়া গ্রীসে জড়বিজ্ঞান
প্রাচীনকালেই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়া-
ছিল। হিন্দু জড়কে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা
করিয়া জড়বিজ্ঞানের যাহা-কিছু অবশ্যস্বাভাবী
এদেশে হইয়াছিল, তাহাও রক্ষা
করিতে পারে নাই। গ্রীক ব্যক্তির সঙ্গে
ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে জনসমষ্টির বা সমাজের,
প্রজার সঙ্গে প্রজার ও প্রজার সঙ্গে রাজ-
শক্তির যে সকল বিচিত্র সম্বন্ধ, তাহার
পরিপক্বতা ও উৎকর্ষসাধনের চেষ্টায়, অদ্ভুত
সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতির প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিল; হিন্দু এই সমুদায় সম্বন্ধকে
অবিত্ত্যাবিসম্বাদিত বলিয়া, সাধনের ও
পরমার্থের অন্তরায় ভাবিয়া সর্বদা উপেক্ষা
ও বর্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সুতরাং
ব্যক্তিগত স্বত্বাধীনতাসংবলিত যে সমাজ-
বিজ্ঞান ও রাজনীতি, তাহার প্রতিষ্ঠা
ভারতবর্ষে কখনো হয় নাই। অংশের
সঙ্গে অংশের ও অংশের সঙ্গে অংশের
অঙ্গীর, এবংবিধ যে সকল সম্বন্ধের সম্যক

জ্ঞানের উপরে চিত্রবিজ্ঞা, স্থপতিবিজ্ঞা ও
ভাস্করবিজ্ঞা প্রভৃতির উৎকর্ষ নির্ভর করে;
পদের সঙ্গে বাক্যের ও বর্ণের সঙ্গে বর্ণের,
কর্তার সঙ্গে কর্মের, ইত্যাদি যে সকল
সম্বন্ধের উপরে ব্যাকরণ ও ভাষার মূলতত্ত্ব-
সকল প্রতিষ্ঠিত;—তৎসমুদায়ই গ্রীসে
অত্যাশ্চর্য্য পরিপক্বতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।
গ্রীক বিশিষ্টের মধ্যে নির্কিংশেষকে, সম্বন্ধের
মধ্যে সম্বন্ধীকে, বহুর মধ্যে এককে অন্বেষণ
করিতে যাইয়া এই সকল ফুটাইয়া তুলিয়া-
ছিল। হিন্দু অস্তিত্বকে শুদ্ধ, অশুদ্ধ, নির্কি-
শেষ, নিরাকার, নিগুণ, চৈতন্যবস্তকে লাভ
করিবার জন্ত লালায়িত হইয়া, জগতের সকল
সম্বন্ধ, সকল বিশেষত্ব, সকল বিচিত্রতাকে
ঔপাধিক, মায়িক ও পারমার্থিক দৃষ্টিতে
অলৌক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে এবং সেই
মায়াতীত শুদ্ধ সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিবার
আশায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগাদির
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। গ্রীকের সমাজতত্ত্ব,
গ্রীকের রাজনীতি, গ্রীকের ললিতকলা
প্রভৃতি যেমন মানবীয় সাধনার অমূল্যরত্ন;
সেইরূপ হিন্দুর তত্ত্ববিজ্ঞা ও ব্রহ্মজ্ঞানও জগতে
আর এক অমূল্যবস্তু। এই উভয়বিধ সাধনারই
লক্ষ্য এক,—সেই অদ্বৈত, অশুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ-
পুরুষ। ঋকুতিল বৃহ পহার অমূল্যরত্ন
করিয়া জীব সেই অনন্তকে লাভ করিতে
চায়। গ্রীক ও হিন্দু, আধ্যাত্মিক এই দুই
শাখা, সেই একই বস্তুকে দ্বিবিধভাবে লাভ
করিতে চেষ্টা করিয়া জগতে দুই অমূল্য
সাধনার সৃষ্টি করিয়াছে।

স্বরণাতীত কাল হইতে হিন্দুর চক্ষু
অদ্বৈতে নিবদ্ধ হইয়া আছে। যে অদ্বৈতের

অষেষণে বায়, তাহাকে সকল ভেদ ও সকল বিরোধ বর্জন করিয়া চলিতে হয়। যেখানে মায়াপ্রভাবে ভেদ প্রকাশিত হয়, সেখানে অঐহিকতার উপাসক এই ভেদের মধ্যেই অভেদ-সাধনের পন্থা খুলিয়া লন। ভেদমাত্রেই অজ্ঞতাগ্রস্ত। এই অজ্ঞান অহংজ্ঞান-মূলক। অহংজ্ঞান বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকার হইতেই উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান-বস্থায় এই অহংজ্ঞানকে সংযত ও লংঘিত করিবার জন্তই ভেদকে অভেদভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। বিধিমিষেধ ভেদের রাজ্যেই সম্ভব, অভেদ-অবস্থায় বিধিও নাই, নিষেধও নাই—সেখানে সাধক ‘পুণ্যাপাণে বিধুয় নিরঞ্জনং পরমং শাস্ত্রমুপৈতি’—পুণ্য ও পাপ-উভয়ের অতীত হইয়া নিরঞ্জন পরম-শাস্ত্রকে লাভ করেন। ভেদকে অতিক্রম করিতে হইলে, ভেদকেই আরো প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বিধিনিষেধাত্মক সাধনদ্বারা অহং-জ্ঞান ও বিষয়লালসাকে নিরস্ত করিয়া, পরে ব্রহ্মসাধনে নিযুক্ত হইতে হয়। ব্যাবহারিক জগতে হিন্দু এইজন্ত ভেদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই উপরে ব্রহ্মসাধনের পূর্ববৃত্ত আচার-অনুষ্ঠানাদি প্রবর্তিত করিয়াছিল। সাধনার নিয়ন্তরে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া, হিন্দু ভেদকে স্বীকার করিয়াছে। মূলে সম্ভবত জগৎবিভাগের উপরেই এই বর্ণবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতি-
 ঠিত হইয়াছিল, ক্রমে তাহা কুলগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, পরিণামে অভেদজ্ঞান-উৎপাদনই এই বর্ণধর্মেরও লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। কলত বমনিন্নমাদি সাধনা ও নিত্যনৈমিত্তিক

বিবিধ কথাদি প্রবর্তিত করিয়া এই বর্ণাশ্রম-ধর্মও, নিম্ন অধিকারীর জন্ত, চিত্তশুদ্ধির উপায় বিহিত করিয়াছিল বলিয়াই চরমে অভেদ-আজ্ঞান-লাভের গোপানল্পপেই চিরদিন অঐহিকসাধকমণ্ডলীকর্তৃকও সমর্থিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই ভেদাত্মক বর্ণাশ্রমই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ বা চরম আশ্রম নহে। বর্ণাশ্রম গার্হস্থ্যের অন্তীভূত, কিন্তু গার্হস্থ্যের উপরে সন্ন্যাসাশ্রম ও বর্ণধর্মের উপরে সনাতনধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে আশ্রমে ও সে ধর্মে সর্বজনীন মৈত্রী ও সর্বভূতে সমদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি সাধিত ও আচ-
 রিত হইত। সে ধর্মে জাতিও নাই, ব্যক্তিও নাই; ব্রাহ্মণও নাই, চণ্ডালও নাই, উচ্চও নাই, নীচও নাই;—সকলই সমান;—সর্বং ধর্মিণং ব্রহ্মময়ং জগৎ। সে ধর্মের সাধা অঐহিক ব্রহ্মবস্ত; তাহার সাধনা ভেদমূলক অহংবুদ্ধির বিনাশ। মানবসমাজে বিভিন্ন-দেশী, বিভিন্নভাষী, বিভিন্নসম্প্রদায়বদ্ধ মানবসমষ্টির মধ্যে যে ভেদ, যে বিরোধ, যে সংঘর্ষ, যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে নেশন ও পেট্রিটিজ্‌ম্ ফুটিয়া উঠে, বর্ণাশ্রমে বা সনা-
 তনধর্মে, হিন্দুর সমাজে বা সাধনায়, তাহার জীবনে বা আদর্শে, তাহার সামাজিক অনু-
 ষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানাদিতে কুজাপি তাহা সমাক ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।

অতি প্রাচীনযুগে, বর্ণাশ্রমপ্রতিষ্ঠার পূর্বে, আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে বধন দীর্ঘ-কালব্যাপী বিরোধ চলিয়াছিল, সে সময়ে অতি সামান্ত আকারে এই নেশনভাব আমা-
 দেয় মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদে তাহার কণকিৎ আভাস প্রাপ্ত

হওয়া যায়। কিন্তু এই সংগ্রামের অবসানে ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের প্রতিষ্ঠাতে, বিশেষত বর্ণাশ্রমবিভাগনিবন্ধন, যখন পররাষ্ট্রে ও স্বরাষ্ট্রে, উভয়ত সর্বপ্রকারের তীব্র বিরোধ একরূপ নিরস্ত হইয়া যায়, সেই সময়ে, আমাদের এই প্রাচীন নেশন-ভাবও, অন্ধুরেই গুচ্ছ হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজশাসন, সমাজরক্ষা ও সামাজিক উন্নতিবিধানের জন্ত যুরোপে পেট্রিটিজ্‌ম্ যে কার্য্য করিয়াছে, আমাদের মধ্যে সে কার্য্য এতাবৎকাল মোটামুটি বর্ণবিভাগ ও আশ্রমধর্মের দ্বারাই সাধিত হইয়া আসিয়াছে।

এখন হিন্দুসমাজ যে বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে, একদিন তাহা ছিল না। একদিন অনাধ্যাত্মিক ভারতভূমে হিন্দু বা আধ্যাত্মিক মুষ্টিমেয়মাত্র ছিল। অপরূপ আধ্যাত্মিক উপনিবেশিকের মত ভারতের হিন্দু উপনিবেশিকগণ কতকটা পরিমাণে অনাধ্যাত্মিক অধিবাসীদিগের উচ্ছেদসাধন করিয়া এই ভারতবর্ষে আপনাদের রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু যুরোপীয় আর্থোরা মার্কিং, অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যান্ডে বেক্রপভাবে আদিম অধিবাসীদিগকে একেবারে নির্মূল করিবার চেষ্টা করিয়াছে, হিন্দু আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে আপনার উপনিবেশ স্থাপন করিতে বাইরা কখনো সেরূপ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান হিন্দুজাতি যে আধ্যাত্মিক-অনাধ্যাত্মিক বহুজাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা এখন একরূপ সকলেই স্বীকার করেন। এইরূপ সম্মিশ্রণে সর্বত্রই বিরাট নেশনসকলের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুসমাজে এই সম্মিশ্রণক্রিয়া যেভাবে

সাধিত হয়, অল্পত সেভাবে ও সে আদর্শে হইয়াছিল, এরূপ কোনো প্রমাণ নাই। হিন্দু অহিন্দুকে ধর্মের পুটে 'পাক' করিয়া, বর্ণাশ্রমের ছাঁচে ফেলিয়া বেমানুম আত্মসাৎ করিয়াছে। জীবিত, তৈলজ প্রভৃতি দেশে এই প্রণালীতেই হিন্দু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

হিন্দু নেশন গড়িতে বাইরা ধর্মের পুট ব্যবহার করিয়াছে; যুরোপের আর্থোরা রাজনীতির পুট ব্যবহার করিয়াছে। এই কারণে ভারতে ধর্মই সকল ভাব ও সকল আদর্শ ও সকল রসকে আত্মস্থ করিয়া বসিয়াছে, আর যুরোপে কার্য্যত পেট্রিটিজ্‌ম্ সর্বদাই ধর্মেরও উপরে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

বর্ণাশ্রমবিভাগনিবন্ধন হিন্দুর 'স্বরাষ্ট্রে' ব্যক্তিগত স্বত্বাধীনতার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া কখনো কোনো গুরুতর বিপ্লব উৎপাদন করিতে পারে নাই। বিপ্লব ও পরিবর্তন আমাদের মধ্যে যখন বাহা হইয়াছে, তৎসমুদায়ই প্রায় ধর্মমূলক। বর্ণাশ্রমকে বর্জন করিতে বাইরাও, বিভিন্ন বৈষ্ণবমতাবলম্বীগণ কখনো ব্যক্তিগত স্বত্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। মুসলমান আসিয়া যখন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনো এই বর্ণাশ্রমনিবন্ধনই, নূতন রাজশক্তি ও রাজনীতি বিধর্মী ও য়েচ্ছাচারী হইয়াও, হিন্দুর চিরাগত ভাব ও আদর্শকে অভিভূত করিতে পারে নাই। রাজা রাজস্ব আদায় করিতেন, রাজ্যশাসন ও রাজ্যরক্ষা করিতেন, কিন্তু সমাজ নিঃশব্দে আপনার নিয়মে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করিত, আপনার আদর্শ আপনি অমুসরণ করিয়া চলিত। শাসনের

তরঙ্গ সমাজপ্রাচীরকে কখনো উল্লঙ্ঘন করিতে পারে নাই।

মুসলমানসম্পর্শে নানকপন্থী, কবিরপন্থী প্রভৃতি যে সকল বর্ণাশ্রমবিরোধী ধর্ম-সংস্কারের অভ্যুদয় হয়, তাহাতেও হিন্দুসমাজের প্রাচীন আদর্শ ও প্রতিষ্ঠাকে নষ্ট করিতে পারে নাই। বিশাল সাগরবক্ষে ক্ষুদ্র বুদ্বুদের ত্যাক্ত ভাসিয়া-উঠিয়া ইহারা সকলেই আবার সেই সাগরগর্ভেই বিলীন হইয়া যান।

ইহাঙ্গ প্রধান কারণ এই যে, এই সকল পন্থাতেও কখনো সমাক্রমে সংসার ও পরমার্থের প্রাচীন বিরোধ ভঞ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সকল ভক্তিপন্থা সগুণবাদী হইলেও একেবারে নিগুণের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। শাস্ত্রে ও তত্ত্ববিচারে যাহাই থাকুক না কেন, কার্য্যত ও ব্যবহারে এই সকল নূতন পন্থাতেও সম্মাসেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সম্মাসধর্মের প্রাচীণভাবে সংসারধর্ম মলিন হইয়া গেলে, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

ভক্তিপন্থা সংসারবিরোধী নহে, সত্য। হিন্দুর ভক্তিপন্থাতে সত্যের কেবল ধর্ম্মকে নহে, কিন্তু ভগবানকে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। সকল রসের মধ্যে নিখিল-রসাত্মকমূর্ত্তিরূপে ভগবানকে সম্ভোগ করিবার জন্ত লালায়িত হইয়া ভক্তিপন্থী হিন্দু সংসারের সকল সখ্যকে উন্নত, পবিত্রীকৃত ও আধ্যাত্মিক-সম্পৎসৌন্দর্য্যপূর্ণ করিয়া

তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, এমন চেষ্টা জগতের আর কোনো ধর্মে হয় নাই। দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই চারি রসের মধ্যে ভগবানকে সম্ভোগ ও তাঁহার সেবা করিতে হইয়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সর্ব্বপ্রকারের কর্তব্য ও সখ্যকে ভগবদ্ভাবে উদ্ভাসিত করিয়াছে। এ আদর্শ, এ সাধনা, জগতের আর কোনো সম্প্রদায়ে এমনভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। আদিত্যে এ সকল অবতারের সঙ্গে জড়িত ছিল। কিন্তু ক্রমে দৈনন্দিন জীবনেই সেই অবতারলীলা প্রত্যক্ষ ও অভিনয় করিবার আদর্শ প্রকাশিত হইয়া দান্ত, সখ্য প্রভৃতি সাধনের প্রাচীন অতিপ্রাকৃত বহুলপরিমাণে বিনষ্ট করিয়া দেয়, এবং জীবনের সাক্ষাৎ সখ্যসকলের মধ্যে সর্ব্বব্যাপ্তি করিতে চেষ্টা করে। এ সকলই সত্য, আর এইজন্য ভক্তিবাদীদিগের মধ্যে সংসার এই সম্মাসপ্রধান দেশেও এক অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছে। তাঁহার সংসারকে মায়াখেলা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ভাগবতী লীলার রূপেই সংসারের ভঞ্জন করিয়াছেন। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টির প্রাচীন আদর্শ ভক্তিরসাত্মক হইয়া জীবমাত্রকেই নরনারায়ণের বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নরসবাকেই ভগবৎসেবা, মানবপ্রেমকেই ভগবৎপ্রেমের প্রতিক্রমরূপে সাধনা করিয়াছিল।

কিন্তু এ আদর্শও পরিবারের ও সমাজের গুণী অতিক্রম করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে কদাপি কোনো প্রকারের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই। পাইলে আমাদের মধ্যেও পেট্রি-টিজ্‌ম্‌ ফুটিয়া উঠিতে পারিত, এবং তখন

হিন্দু পেট্রিউটিজম্ বা স্বদেশচর্চায় বে অদ্ভুত ও মনোহর আদর্শ প্রকাশিত করিতে পারিত, গ্রীসে বা রোমে, যুরোপে বা মার্কিণে তাহার সন্ধান ও এখনো পর্যন্ত কেহ প্রাপ্ত হয় নাই ।

এ আদর্শ হিন্দুর ভারতে কুটিয়া উঠে নাই এইজন্য যে, বর্ণবিভাগনিবন্ধন ও আশ্রমধর্মের প্রাবল্যহেতু হিন্দুসমাজে কখনো যুরোপীয় সমাজের মত ব্যক্তিগত স্বত্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার অবসর, প্রয়োজন এবং প্রয়াস হয় নাই । অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু অংশাংশী ও অঙ্গাঙ্গী ভাবে ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে । বর্ণাশ্রমধর্ম ইহার মূল ও ফল উভয়ই । অঙ্গপঙ্কত অংশীকে ছাড়িয়া অংশের প্রতিষ্ঠা নাই, অঙ্গীকে উপেক্ষা করিয়া অঙ্গ কদাপি আপনার সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না । অংশীর উন্নতিতেই অংশের উন্নতি, অঙ্গীর বিকাশেই অঙ্গের বিকাশ । পরিবারের, গোষ্ঠীর, সর্বর্ণের উন্নতিতেই এইজন্য সর্বনা তত্ত্বপরিবারস্থ বা গোষ্ঠীর বা তত্ত্ব-বর্ণভুক্ত ব্যক্তির উন্নতি সাধিত হইত ; সমাজের মুখাদৃষ্টি অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া তাহার পরিবার, তাহার সগোত্র ও সর্বর্ণের উপরে নিবদ্ধ ছিল । প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির বাসনাও এইজন্য তাহার সগোত্র বা সর্বর্ণের গতির মধ্যে আবদ্ধ থাকিত । মানবের যে মূল প্রকৃতি হইতে যুরোপে পেট্রিউটিজমের উৎপত্তি হয়, যে স্বজাতিবাৎসল্য ও স্বদেশচর্চার জন্য যুরোপ সভ্যসমাজে এতটা প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা

লাভ করিয়াছে, আমাদের দেশে, হিন্দুর সমাজে তাহা সগোত্রবাৎসল্য ও সর্বর্ণ-প্রীতিতেই পর্যাবসিত হইয়াছিল । আমাদের পরার্থপ্রবৃত্তি যেখানে গোত্রবর্ণ অতিক্রম করিত, সেখানে একেবারে সর্বভূতে শিয়া পড়িয়াছিল,—যুরোপ ও মার্কিণের মত স্বজাতি ও স্বদেশকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয় নাই ।

গ্রীসে সমাজের যে আদর্শ কুটিয়াছিল, ভারতে তাহা কখনো কুটিয়া উঠে নাই । প্রাচীনকালে ভারতেও ধর্ম বলিতে সমাজ-বন্ধন ও সামাজিক জীবনের সনাতন প্রতিষ্ঠাকে নির্দেশ করিত ; কিন্তু গ্রীসে ষ্টেট বলিয়া যে বস্তু গঠিত হইয়াছিল, ভারতের সাধনায় তাহা কখনো গড়িয়া উঠিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই । ভারতের ধর্ম যেমন সনাতন, গ্রীকের ষ্টেট সেইরূপ সনাতন বস্তু । ভারত ধর্মের শাসনে, ধর্মের চর্চা করিয়া জীবনে সফলতালাভের চেষ্টা করিয়াছে ; গ্রীসে ষ্টেটের শাসনে, ষ্টেটের চর্চা করিয়া আপনার সমুদায় শক্তিসামর্থ্যের সার্থকতা-সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছে । গ্রীসে ষ্টেট ধর্মের অন্তর্গত ও ধর্ম ষ্টেটের অন্তর্গত ছিল । এই ষ্টেট রাজনীতির মূল । ষ্টেটের মধ্যে বিবিধ ব্যষ্টিভাবে ব্যক্তিসকলের পরস্পরের সঙ্গে ও সমষ্টিভাবে ঐ ষ্টেটের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহাই রাজনীতির বিষয় । এই সকল সম্বন্ধের মধ্য দিয়া জীবনের সফলতালাভ করিবার চেষ্টা হইতেই গ্রীসে পেট্রিউটিজমের জন্ম হয় ।

আমাদের দেশে হুএকবার, আধুনিক সময়ে, এই পেট্রিউটিজম্ স্বল্পবিস্তর আগ্রত

হইয়াছে। শিখসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়ে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিখেরা প্রথমে ধর্মসম্প্রদায়রূপে অগ্রগ্রহণ করিয়া, মোগলের উৎপীড়নে ক্রমে এক বিপুলশক্তিশালী নেশন-রূপে গড়িয়া উঠেন। গ্রীকদের যাহা ষ্টেট ছিল, শিখদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে তাহাই খালসার আকার ধারণ করে। খালসার প্রতি ভক্তি, খালসার প্রতি বিশ্বাস, খালসায় সেবা, খালসার জন্ত জীবনোৎসর্গ,— এই সকল শিখধর্মের ও শিখ জাতীয়জীবনের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। এই আদর্শের প্রভাবে এক অদ্বুত-আকারের পেট্রিয়ার্টিজম্ শিখ-সম্প্রদায়মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মোগলাধিকারে গুরুগোবিন্দের জীবনে ও চরিত্রে, পরে ব্রিটিশের অভ্যুত্থানকালে আল্‌বানে, গুজরাটে, চিহ্নিনওয়ালায়, এই আদর্শেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিন্তু এই শিখ-পেট্রিয়ার্টিজম্ সম্প্রদায়ের গভীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, সমগ্র দেশ ও দেশ-বাসী সকল জাতি,—সকল সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয় নাই।

মারাঠা-আদর্শ শিখ-আদর্শ অপেক্ষা কথঞ্চিৎ উদারতর ছিল। সমগ্র ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা মারাঠা-নেতৃবর্গের, বিশেষত মারাঠারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজি-মহারাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর রীতিনীতি, হিন্দুজাতির প্রাধান্ত-প্রতিষ্ঠা এ আদর্শের অঙ্গিমজ্জাগত ছিল। কিন্তু এখানেও ক্রমে কার্যতঃ এই আদর্শ হিন্দুসমাজের অংশবিশেষেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

কি শিখ, কি মারাঠা, কেহই সমগ্র ভারতবর্ষকে মাতৃভূমিরূপে ও বিশাল ও বিভিন্নশাখ ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জকে স্বজাতীয় বলিয়া বরণ করিয়া, তাহাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন নাই।

শিখ ও মারাঠার অভ্যুদয়ের ইতিহাসের বহির্ভূতে, আমাদিগের মধ্যে ইদানীন্তন যুগে আর কুত্ৰাপি রাজনীতিক্ষেত্রে কোনো-প্রকারে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় নাই। এইজন্ত পেট্রিয়ার্টিজম্ ও ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই।

কেবল তাহাই নহে, এখনো অনেকেই আমাদিগকে রাজনীতি বর্জন করিয়া শুদ্ধ সামাজিক জীবনের উন্নতিবিধান করিয়া, জাতীয়জীবনের সফলতা অন্বেষণ করিতে উপদেশ দেন। মুসলমানরাজত্বে হিন্দু-সমাজ যেমন আত্মস্থ হইয়া আপনি আপন-নার সফলতা অন্বেষণ করিতেছিল, এখনো আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। ইংরেজ-রাজত্বেও আমাদিগকে রাজনীতিবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া, রাজার কার্যাকাণ্ডের প্রতি দৃকপাত না করিয়া, ইঁদারা আমাদিগকে কেবল সামাজিক জীবনের সর্ববিধ উন্নতি ও সার্থকতার পন্থা অন্বেষণ করিতে বলেন। এ সকল উপদেষ্টা কিন্তু ইংরেজের শক্তি ও প্রভাব কি পরিমাণে যে আমাদিগকে আবিষ্ট ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা একবারও তলাইয়া দেখেন না। মুসলমান কর লইয়াই সমুদ্র পাণ্ডিত্য, ইংরেজ তো সেরূপ থাকে না। মুসলমান কখন-কখন আমাদিগকে জোর করিয়া কলমা গড়াইত সত্য, ইংরেজ সেরূপ করে না, কিন্তু

মুসলমান তাহার শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা আমাদের চিন্তাকে একেবারে অভিভূত করিবার চেষ্টাও করে নাই;—ইংরেজ এই দেড়শত বৎসরকাল জমাগতই সেই চেষ্টা করিতেছে। মুসলমান আমাদের রাজা ছিল, গুরু হইবার এমন আকাঙ্ক্ষা রাখে নাই। ইংরেজ রাজা তো আছেই, তার উপরে গুরু হইবার জন্তও লালায়িত। মুসলমানরাজ্যে, মুসলমানের প্রভাবে হিন্দুর সমাজমধ্যে যে বিপ্লব হয় নাই, ইংরেজের রাজ্যে, ইংরেজের প্রভাবে তাহা হইয়াছে ও হইতেছে।

কেবল ইংরেজের শিক্ষায় যে এ সকল বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নহে। ইংরেজের শিক্ষা যাহারা পায় নাই, তাহারাও ইংরেজের প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়া উঠিতেছে। ইংরেজের আইন-আদালত আমাদের প্রাচীন বর্ণাশ্রমের উপরে এমন আঘাত করিয়াছে যে, তাহা আর রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর নহে। ইংরেজের ব্যবসায়গিজ্য, ইংরেজের আমদানী-রপ্তানী, ইংরেজের শাসন-সংরক্ষণ, সকলই আমাদের চিন্তাকে, আমাদের ভাবকে, আমাদের আদর্শকে, আমাদের সামাজিক গঠনকে প্রতিদিন বিপর্যাস্ত করিয়া দিতেছে। এ অবস্থায় ইংরেজের কার্য্যার্থ্যের প্রতি উদাসীন হইয়া সামাজিক-জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বপ্রতিষ্ঠা রক্ষা

করা তো দূরের কথা, জীবনরক্ষা করা যায় কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়।

ইংরেজের প্রভাব উপেক্ষা করা যদি অসাধ্য হয়, তবে আত্মরক্ষার জন্ত তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে। ইংরেজ রাজা, আমরা প্রজা। তাহার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ রাজাপ্রজার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ হইতে যে সকল কর্তব্যাকর্তব্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহার উপরে আমাদের বিবিধপ্রকারের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করিতেছে। এই সম্বন্ধকে অগ্রাহ করিয়া, এ সকল কর্তব্যাকর্তব্যের প্রতি উদাসীন হইয়া চলা সম্ভব নহে; সম্ভব হইলেও মঙ্গলকর হইবে না।

রাজার সঙ্গে প্রজার যে সম্বন্ধ, তাহা লইয়াই রাজনীতি রচিত হয়। এই রাজনীতিকে বর্জন করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভবপরও নহে, কল্যাণকরও নহে। এই রাজনীতির আলোচনা, এই রাজনীতির আন্দোলন, এই রাজনীতিক্ষেত্রে আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদের করিতেই হইবে। এই চেষ্টার সফলতার উপরেই আমাদের ভবিষ্য কল্যাণ ও স্থিতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

যুরোপে রাজনীতিক্ষেত্রে পেট্রিয়ার্টিজ্‌মের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের মধ্যেও এই ইংরেজরাজনীতিক্ষেত্রেই এই নূতন স্বদেশী বা পেট্রিয়ার্টিজ্‌মের অভ্যুদয় হইয়াছে।

শ্রী :—

রাজপ্রসাদ ।



১

ছোটলাটসাহেবের পাদরজঃস্পর্শে মুগ্ধের-
নগরী আজ স্বামিসমাগমোৎসব। সুল্লরী
সুবতীর ভায় বিচিত্র বসন ও বিচিত্র ভূষণে
নয়নাভিরাম স্নানকোচ্ছল মৃতি ধারণ
করিয়াছে। রাজপথের নিত্যপ্রকটিত প্রস্তর-
কঙ্কাল আজ মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের প্রভূত
পরিশ্রমে ক্ষণকালের জন্ত সন্তোষান্বিত
মুক্তিকারিণি এবং তদুপরি বিকীর্ণ লোহিত
করচূর্ণের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।
শিরঃস্পর্শী উদ্ধত ধূলিজাল সলিলনিবেকে
আজিকার মত কিছু শাস্ত্যাব অবলম্বন
করিয়াছে।

বিচিত্র-পঞ্জরাজি-বিমণ্ডিত বংশদণ্ড-
শিরে ব্রিটনের বিজয়পতাকা সগর্বে
উড্ডায়মান হইয়া নগরবাসীর প্রবল রাজ-
ভক্তির নিদর্শন স্মদুয়ে ঘোষণা করিতেছে।

ভাগীরথীতীরে মণ্ডপতলে দরবার।
রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুরের
বিচিত্র ভূষণচ্ছটার চারিদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া
উঠিয়াছে। কালেক্টরসাহেব ইতস্তত পরিভ্রমণ
করিয়া সকলকে বখাষণ। আসন দেখাইয়া
দিতেছেন।

এই বিচিত্র দরবারে বাবু ভাতিথন সিং
বা বিভীষণ সিং এক বন্ধুর হস্ত ধরিয়া এক-
পার্শ্বে স্নানের মত দাঁড়াইয়াছিলেন। বন্ধুর
পুনঃপুন অহুরোধসঙ্গেও স্থানগ্রহণ করিতে
সাহস করিতেছিলেন না। বাবুসাহেব
মিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহেন; তাঁহার বাবক

আম্র প্রায় দেড়লক্ষ টাকা এবং তাঁহার
বিক্রমও আপন জমিদারীমধ্যে প্রায়
শাদ্দুলপ্রতিম। কিন্তু এখানে আসিয়া তিনি
বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাবুজির
অর্থের প্রতি কিছু অতিরিক্ত অহুরাগ
থাকায় তিনি আজিও কালেক্টরসাহেবের
সঙ্গে আলাপপরিচয় করিতে, পারেন
নাই, কাজেই তাঁহাকে কেহ চিনিত
না।

দরবারদর্শন তাঁহার ভাগ্যে এই প্রথম।
আজিও তাঁহার আসিবার ইচ্ছা ছিল না।
কেবল—বন্ধুর অহুরোধ ও ইজ্জতের
প্রলোভন এড়াইতে না পারিয়া আজ
তাঁহার এই বিপদ!

লাটসাহেব ষ্টামার হইতে অবতরণ
করিয়া শালুঘণ্টত ঘাটের সোপান অতিক্রম
করিতেছিলেন। কালেক্টরসাহেব তাঁহার
সম্মুখান হওয়ার পূর্বে হাঁকিলেন, “সকলে
আপন আপন স্থানে বসিয়া পড়।” বিপন্ন
ভাতিথন সিং ইতস্তত চাহিতেছিলেন, বন্ধু
তাঁহাকে জোর করিয়া একথানা খালি
চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলেন। সেই
মুহূর্ত্তে কালেক্টরসাহেব বাবুজির সম্মুখে
আসিয়া তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিলেন,
সিংজী ধতমত খাইয়া উঠিয়া-দাঁড়াইয়া
আত্মমি প্রণত হইয়া কালেক্টরসাহেবকে
সেলাম করিলেন। কালেক্টরসাহেব আর
একবার তাঁহার দিকে বক্রিম কটাক্ষ করিয়া
অন্তর চলিয়া গেলেন। কল্পমান ভাতিথন

সিং স্বর্নসিক্তদেহে অপরাধীর মত আসনে বসিয়া পড়িলেন ।

তার পর চিরপ্রথাক্রমে অভিনন্দনপত্র-পাঠ এবং তাহার উত্তরপ্রদান হইয়া গেলে— লাটসাহেবের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের পরিচয় আরম্ভ হইল । কালেক্টরসাহেব তাঁহার পছন্দসই লোকদের বাহিয়া-বাহিয়া লাটসাহেবের নিকট পরিচিত করিলেন । লাটসাহেব স্বিতমুখে একএকবার ইহাদের করস্পর্শ করার প্রত্যেকে অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম সকলই দফল হইল জ্ঞান করিলেন । এই ভাগ্যবানেরা লাটসাহেবের করস্পর্শ-গর্বে আত্মহারা হইয়া কিছু ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত জনসাধারণের দিকে কটাক্ষ করিতে করিতে নিজ নিজ আসনে ফিরিয়া আসিলেন ।

ইহার মধ্যে একজনের গর্বোদ্ধত দৃষ্টি বাবু ভভিখন সিংহের বক্ষে শেলের ভাষ আঘাত করিল । সেই ব্যক্তি জাতি ও মর্যাদায় নিতান্ত ছেয় হইলেও বাবু ভভিখন সিংকে আপনার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল । সিংজি অবশ্য অবজ্ঞা-ভরে তাহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া-ছিলেন এবং তাহার এই বেয়াদবির জন্ত অপমানেরও কিছু বাকী রাখেন নাই । আজ সে বুক ফুটাইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিল—রাজদরবারে তাহার আসন ভভিখন সিংহের কত উচ্চে !

সেই দিন বিদ্যার্থ্যমাগবক্ষে বাবু ভভিখন সিং স্বীকার করিলেন, রাজদরবারে সম্মান না পাইলে ধনজন সকলই বৃথা ! বহুবরও একবাক্যে এই কথাই সমর্থন করিলেন ।

২

আজ সপ্তাহকাল হইতে ভভিখন সিংহের বহির্কাটা গ্রহাচার্য্য এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত-কুলের কোলাহলে অহনিশ মুখরিত হইয়া আছে । কোন্ সময়ে কোন্ লগ্নে কি উপহার লইয়া বাবুসাহেবের কালেক্টর-বাহাদুরের শ্রীচরণদর্শনে বহির্গত হওয়া কর্তব্য, এ বিষয়ে কিছুকাল ধরিয়া পরামর্শ চলিল ; অনেকপ্রকার শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় মতরাশি বহুরূপ বুদ্ধি এবং প্রমাণ-প্রয়োগসহকারে নানা বিচিত্র রাগিণীতে সপ্তাহকাল ধরিয়া অবিরাম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল ।

কাজেই একদিন সন্ধ্যাকালে হতাশামগ্ন বাবুসাহেব পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তাঁহা হইলে আপনারা কি স্থির করিলেন ?” প্রশ্ন উচ্চারিত হইবামাত্র ক্ষুব্ধজলধি যেন সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল । কারণ পণ্ডিতমণ্ডলীসকলেই এতদিন পরস্পরের মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই ব্যস্ত ছিলেন, কেহই নিজে কোন-প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই ।

পণ্ডিতগণকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া অগত্যা বাবুসাহেব আপনার অভিমত তাঁহাদের গোচরে আনিলেন । তখন ব্রাহ্মণমহাশয়েরা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বাবুসাহেবের অসাধারণ ধীশক্তি এবং অলোকসামান্য দূরদর্শিতার “ভারিক” করিতে করিতে নীরব সভাতলকে পুনরায় উচ্চকিত করিয়া দিলেন । কিন্তু তাঁহাদের “স্বথনিশি পোহাইল” । সেইদিন রাতে “দহি-চুড়া”র

ধ্বংসসাধন এবং যৎকিঞ্চিৎ রক্ততমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সকলকে বাবুসাহেবের গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইল।

তখন আরোজনের ধুম পড়িয়া গেল।

বাবুজির খাস-ফরমানেস-মত প্রস্তুত দুই-ঝুড়ি “পুয়া”, তদীয় বাগানের বৃহত্তম কদলী-দণ্ড একটি, দুইটি আয়ুহীন ছাগবৎস, বৃত্ত একহাঁড়ি এবং কিছু “মেওয়া” লইয়া বাবুসাহেব উষাকালে যাত্রার্থ প্রস্তুত হইলেন।

পুরোহিত আসিয়া কপালে দধির তিলক, হস্তে হরিদ্রাবর্ণ মাস্তুলিকহুত্র এবং কর্ণপ্রান্তে সোণাজাত যবাকুর প্রদান করিলেন। পুরমহিলাগণ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন, দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুইজন ভাট সমুচ্চ কোলাহলে তাঁহার মহিমা কীৰ্ত্তন করিতে লাগিল—বাবুসাহেবের সিপাহীদ্বয় সমস্তরাজির শ্রমসজ্জিত হুন্নাগ্র গুস্ত এবং কর্ণাবলম্বী আশ্রয়ুগ ধারণ করিয়া তাঁহার মূর্ত্তিমান্ বিক্রমের রূপে সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে তোল এবং কঁাসি বাজিয়া উঠিয়া নিদ্রাতুর পক্ষীকে আগরিত করিয়া দিল। নরনারীর জনতায় রাজপথ ছরতি-ক্রম্য হইয়া উঠিল। রথুনাথজি স্মরণ করিয়া বাবুসাহেব শিবিকারোহণ করিলেন।

সেদিন বড়দিনের পূর্ক্সাহ। কালেক্টর-দম্পতি স্থানীয় সাহেববৃন্দকে ভোজ দিবার একটা মতলব প্রাতঃকাল হইতে আঁটিতে-ছিলেন,—অতরাং সেদিন হাতে অস্ত্র কোন-বাজ ছিল না। সাহেব কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে বলিয়া ঘাইতেছিলেন এবং মেমসাহেব সহানুগুণে লিখিয়া লইতে-

ছিলেন।—সেই সময়ে স-ভেট এবং স-সিপা বাবু ভতিখন সিং কালেক্টরবাহাদুরের ঘা-দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিকট হইবামাত্র বাবুসাহেবের বক্ষস্পন্দন যেন নীর হইয়া গেল—তদীয় সিপাহীদ্বয় তাঁহার বিক্রমের ভ্রায় সজ্জীত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, উপহারবাহকগণ প্রস্তর নির্মিত মূর্ত্তির ভ্রায় আপনাপন স্থানে অচা হইয়া রহিল। বাবুসাহেব গলদবর্ষকলেবরে করজোড় করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন অর্দ্ধঘণ্টাকাল এতদবস্থায় থাকার পর সাহেবের জটনক চাপরাসীকে ফাটকের দিবে আসিতে দেখিয়া তাঁহার নির্দীপিতপ্রায় উৎসাহবহু ধুমারিত হইতে লাগিল। চাপরাসী নিকটস্থ হইলে বাবুসাহেব কৃতাজলিপুটে তাহাকে বলিলেন, “একবার হুজুরকে সংবাদ দিন যে, তাঁবেদার হাজির।” চাপরাসী গম্ভীরমুখে কহিল, “আভি হকুম নহি”;—বলিয়াই সে প্রস্থানোন্মত্ত হইল। ভতিখন সিং ব্যাকুল হইয়া তাহার করবর ধারণ করিলেন এবং বলিলেন, “হুজুর মনে করিলে সবই করিতে পারেন—অনেকদূর হইতে বড় আশা করিয়া আসিয়াছি।” চাপরাসীপ্রভুর মর্যাদাবুদ্ধি বড় প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “কেয়া, আপ্‌কো ওয়াস্তে মেয়া ইজ্জৎ খোয়ায়েঙ্গে?” কিন্তু বাবুজীর যাত্রা ছিল ভাল। মেমসাহেব দূর হইতে এই রকম দেখিয়া পরম কৌতুক অনুভব করিতেছিলেন। শেষে দয়াদ্র হইয়া সাহেবকে বলিলেন, “আহা, লোকটা অনেককণ পরিয়া কষ্ট পাইতেছে, উহাকে আসিতে দাও না।”

তখন চাপরাসীকে লক্ষ্য করিয়া সাহেব

লেন, “ইউ চাপরাসী, বাবুকা আনে
৩।”

চাপরাসীনন্দনের গভীর মর্গাদাবুদ্ধি
টিতিবোহিত হইল। সে বাবুসাহেবের
ক চাহিয়া সাগ্রহে বলিল, “আট্টয়ে হজুর,
টয়ে!”

কৃতজ্ঞতাবিহ্বল বাবুজি সাহেবের সম্মু-
খ হইয়া একেবারে তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া
লেন। সাহেব এই অদৃষ্টপূর্ণ ভক্তি-
মতে বাকুণ হইয়া বলিলেন, “বৈঠিয়ে বাবু-
ব, বৈঠিয়ে।” মেমসাহেব বাবুসাহেবের
ঈ, শুধা আপায়ন প্রণালী দর্শনে হাস্যদমন
শ্রব বৃদ্ধিয়া মুখবিবরে ক্রমাল পুরিয়া ইতি-
কষ্ট কক্ষান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

সাহেবের আদেশে কথঞ্চিৎ আপনাকে
বিত করিয়া বাবুসাহেব জাম্বুর উপর ভর
গা ধুতাব অবলম্বন করিলেন এবং
শহারবাকদিগকে উজ্জিতে নিকটে আসিতে
দিয়া একে একে উপহারসামগ্রী সাহেবের
চরণে নিবেদন করিয়া দিতে লাগিলেন।
শহারের প্রকৃতি দেখিয়া কালেক্টর বচকটে
শ্রোত সংযত করিবার অভিপ্রায়ে
লেন, “টয়ে সব্ কিস্ ওয়াস্তে?”
বুসাহেব আরম্ভ করিলেন, “হজুর,
বেদার—” কিছু বক্তব্য শেষ করিতে
লিলেন না, উচ্ছ্বসিত ভক্তিশ্রোত
হার কণ্ঠস্বর করিয়া দিল। তখন তিনি
মশচ কালেক্টরসাহেবের পাদস্পর্শ করিবার
ভিপ্রায়ে বাহুপ্রসারণ করিলেন।

বাহুবোষ্টনভীত কালেক্টরসাহেব ভাড়াভাডি
লিয়া উঠিলেন, “বহৎ আচ্ছা বাবুসাব, হাম
হৎ খুস্ হয়। আপ কুরসিপার বৈঠিয়ে।”

বাবুসাহেব নিবেদন সমাপ্ত করিয়া এক-
পদে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন—
কিছুতেই কালেক্টরসাহেবের সম্মুখে আসন-
গ্রহণ করিলেন না।

ক্রমে সাহেবের সঙ্গে বাবুসাহেবের
পরিচয় হইল। বাবুসাহেবের আয়ের
কথা শুনিয়া কালেক্টরসাহেব মনে মনে
বলিলেন—“Oh the devil! you avoided
subscribing to the waterworks
Fund! You shall be thoroughly
fleeced.”

কালেক্টরসাহেব স্মিতমুখে করমর্দন
করিয়া বাবুসাহেবকে বিদায় দিলেন।

বাবুসাহেব সেদিন আনন্দের তাড়নায়
ভিক্ষুকদিগের মধ্যে একটাকার “আথেলা”ই
বিতরণ করিয়া ফেলিলেন। ইতিপূর্বে
তাহারা তাঁহার নিকট গালি এবং প্রহার
ভিন্ন আর কিছুই পায় নাই।

সাহেব সেদিন রাজিকালে বাবুসাহেবের
ভঙ্গীর অনুকরণ এবং তাঁহার প্রদত্ত
“পুয়া” বিতরণ করিয়া নিমন্ত্রিত রমণীবৃন্দের
কলকণ্ঠে বহবার উচ্চহাস্য উদ্ভিক্ত করিয়া-
ছিলেন—এ কথা বলাই বাহুল্য।

৩

বাবু ভতিখন সিংহের জীবনে আজ এক
স্মরণীয় দিন। তাঁহার প্রভূত পরিশ্রম,
অমাহুশিক তোষামোদ এবং অজস্র অর্থব্যয়
আজ সফল হইয়াছে। বাবুজি অনারারি
ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার
আনন্দ আজ ধরিতেছে না। সদরে গিয়া
এই সংবাদপ্রাপ্তিকালে তিনি উল্লাসে ম্যাজি-
ষ্ট্রেটের হেডক্লার্কবাবুর পাছকাণ্ডগলই মন্তকে

ধারণ করিয়াছিলেন—এমনি তাঁহার উদ্ভাস।

আজ তাহারই উৎসব। স্বয়ং কালেক্টর-সাহেব আজিকার উৎসবে যোগদান করিবেন—বাবুজির গৃহপ্রাঙ্গণ পবিত্র হইবে।

কালেক্টরসাহেবের আজ আসিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না—তাঁহার উদ্দেশ্য ইতিপূর্বেই সিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। জলের কলের জন্য বিশহাজার টাকা এবং ‘মেম-সাহেবের’ জন্য একটা ব্রেসলেট ইতিপূর্বেই বাবুসাহেব রাজভক্তির প্রবল প্রাবনে সাহেবের চরণপদ্মে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

আজ তাঁহার আগমনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার জমিদারীর মধ্যে কতকগুলি দোকানদার স্বদেশী দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল। বাবুসাহেব ইতিপূর্বে তাহাদের ডাকাইয়া খেটে তাড়না করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার রাগ পড়ে নাই। “সরকারবাহাদুরকে সাধু লড়াই? শালে লোককো এংনা হিম্মৎ?” কাজেই বাবুসাহেব মাজিষ্টরবাহাদুরকে খবর দিয়াছিলেন। মাজিষ্টরসাহেবের আজিকার আগমনের উদ্দেশ্য এই মানবযুগয়া। তাই আজ তাঁহার আগমনবার্তা কোথাও প্রচারিত হয় নাই—নিরবে সমস্ত আয়োজন চলিতেছিল।

যথাসময়ে মাজিষ্টরবাহাদুর বাবুসাহেবকে কৃতার্থ করিয়া সন্ত্রাসীক মোলানগরে পদার্পণ করিলেন। বাবুসাহেব প্রত্যাশ হইতে উপলব্ধি করিয়া গলগলীকৃতবাসে সম্মানিত অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এতক্ষণে তাঁহার আশালতা ফলপ্রসব করিল।

বাবু ভতিখন সিং ক্রমশ “বিজ্ঞতম” হইয়াছিলেন। সাহেবের আহ্বানাদির জন্য “পুয়ার” উপর নির্ভর না করিয়া এবার কেলনার কোম্পানির উপর নির্ভর করিয়া ছিলেন। কাজেই আহ্বানাদির এবার কোনই অনুবিধা হইল না। বরং ভোজন এবং ভোজন অপেক্ষাও পানটী কিছু গুরুতর গোছেয় হইয়া পড়িল।

কাজেই স্বদেশীদমনের জন্য বাহির হইতে সাহেবের তেমন মন সরিতেছিল না। নিতান্ত অপ্রসন্নচিত্তেই সাহেব সন্ত্রাসীক জুড়ী হাঁকাইয়া রাজপথে বাহির হইলেন। বাবুসাহেব কিছুতেই গাড়ির মধ্যে উঠিলেন না। কোচম্যানের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। মেম সাহেব বাবুর অবস্থা দেখিয়া ক্রমালের মধ্যে মুখ লুকাইলেন।

ক্রমে জুড়ী অপরাধিগণের দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবুজি লম্বা দিয়া পড়িয়া অপরাধী দোকানদারগণকে স্নানাক্ত করিয়া দিলেন। সাহেব তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা বিদেশী মাল পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশী মাল আনা ইয়াছ কেন?” তাহারা জিব্ কাটিয়া বলিল, “খোদাবন্দ, এংনা হিম্মৎ কিস্কো?”

সাহেব বাবুসাহেবের দিকে চাহিলেন ভতিখন সিং চতুষ্কার করিয়া বলিলেন, “শাভে খুষ্ঠ কহতে হে? আতি দোকান্‌সে দেশী মাল নিক্লে তব?”

পুলিস পূর্ব হইতেই “মোতারেন” ছিল তৎক্ষণাৎ দোকানের খানাওলাসি সুর করিয়া দিল। সমস্ত তর তর করিয়া খোঁজ হইলেও একখণ্ড দেশীবস্ত্র বাহির হইল না।

সাহেব জুড়ভাবে সিংজির দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বেকায়দে তক্লিফ্ দিয়া ।”

বাবুসাহেব লজ্জায় মকিয়া-গিয়া বলিলেন, “কোন ছবমন্ ইহাদের সতর্ক করিয়া দিয়া থাকিবে।”

সাহেব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জোরে জুড়ী হাঁকাইয়া দিলেন। বাবু ভভিখন উঠিবার অভিপ্রায়ে ছুই এক কদম ছুটিয়া হতাশ হইয়া গতি সংঘত করিলেন এবং সেই মধ্যাহ্নকৌদ্রে অগ্নীহীন উদরে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে অতিকষ্টে গৃহে ফিরিয়া চলিলেন।

গাড়ি কিয়দূর অগ্রসর হইলে মেম-সাহেব বলিলেন—“By what name should these men be called, who are traitors to their own country?”

সাহেব গম্ভীরভাবে কহিলেন, “Scoundrels!”

৪

বাবুসাহেবের অদৃষ্ট বড় মন্দ। “রায় বাহা-তরী” হস্তগত হইবার ঠিক সময়ে সময়ে কালেক্টর বাহাদুর তাঁহার উপর এমন চটয়া গেলেন! “জয় রামচন্দ্র জি!” সেই স্বদেশীদমনের ঘটনা হইতেই কালেক্টর-সাহেব কিছু বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহার উপর আবার যেদিন তিনি শিকারে আসি-বেন বলিয়া সংবাদ দিলেন, সেইদিন বিধাতার লীলায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের পুরাতন পীড়া প্রাণসংশয়কর হইয়া উঠিল।

কাজেই রাজভক্তি এবং পুত্রস্নেহের মধ্যে একটা দারুণ বিরোধ বাধিয়া গেল। পুত্রকে একটু ভাল দেখিয়াই যাত্রা করিবেন, এইরূপ

স্থির করিতে করিতে ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে কোনপ্রকার আয়োজনের ব্যবস্থা না দেখিয়া অগ্নিমুর্তি হইয়া মুন্সের ফিরিয়া গেলেন। পরদিনই বাবুসাহেব আপনার দেওয়ানজির মারকত তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ এবং এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কালেক্টর-সাহেবের পাতৃকা মস্তকে বহন করিবার লালসা বিজ্ঞাপিত করিয়া এক দীর্ঘপত্র হজুর-সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহেব তাঁহার পত্র স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই। তৎপরে বাবুসাহেব স্বয়ং মুন্সের গিয়া সাহেবের চাপরাসী, খানসামা, বাবুর্জি—প্রত্যেকের পায়ে ধরিয়া, তাহাদের মিষ্টার খাওয়াইয়া এবং ইনামের লোভ দেখাইয়া প্রদ্রষ্ট অহুগ্রহ পুনঃপ্রাপ্ত হইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও ফল হয় নাই। তাই বাবুজি কম্পমানদেহে ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের ক্রোধ-নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলের প্রতীক্ষায় সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের কপিশ চক্ষু এবং আরক্তিম গুহ্ম সর্বত্র তাঁহাকে অনুসরণ করিত।

তাই আজ সহসা লুস্মীসরাই-শিবির হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিমন্ত্রণপত্র পাঁইয়া বাবুসাহেব আত্মহারা হইলেন। এই আশা-তীত অভাবনীয় অহুগ্রহ তাঁহার মস্তিষ্কে আলোড়িত করিয়া দিল।

প্রিয়সমাগম প্রয়াসিনী রমণীর জায় তখনই সজ্জারচনার ধুম পড়িয়া গেল। ফৌরকার আসিয়া ছইঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া তাঁহার মস্তক এবং গুহ্মের সংস্কারসাধন করিয়া

দিল। কেয়ারি-করা গাছের মত কর্তিত
শুষ্কের অপরূপ শোভা সন্সর্শন করিয়া বাবু-
সাহেব অয়ংই মোহিত হইয়া দস্তবিকাশ
করিলেন।

চক্ষে স্তম্ভা লেপিত হইল, পীতবর্ণ উষ্ণীয়
মস্তকের অর্ধপক কেশজাল আবৃত করিয়া
দিল, স্তম্ভবলয় করযুগলের শোভা বিস্তার
করিল, চরণদ্বয় জরিমণ্ডিত পাছুকার মধ্যে
অদৃশ্য হইল, কপালে দধি এবং হরিদ্রার
ভিলক শুভঘাত্রা সূচিত করিল।

পুত্র এখনো সেই দীর্ঘ রোগশয্যায় মুমূর্ষু
জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিতেছিল।
বাবুসাহেব তাহার পরিচর্যাশ্রমে কিছু কিছু
সারবান্ উপদেশ দিয়া কক্ষ হইতে বাহির
হইবার উপক্রম করিলেন। এমন সময়ে
ক্ষীণকণ্ঠে পুত্র ডাকিল, “বাবুজি!” যাত্রাভঙ্গ-
আশঙ্কার উত্তেজিত বাবুসাহেব অশ্রাব্য
গালি উচ্চারণ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।
পুত্র বলিল, “আজ মৎ যাইরে বাবুজি, হাম্
ময় যাজে।” একবার এই পুত্রের জন্ত
কালেক্টরসাহেবকে হারাইতে বসিয়াছিলেন।
অতিমাত্র ফুদ্ধ হইয়া বাবু ভতিখন সিং
বলিলেন, “জাহান্নম্মে যাও—”। (অম্পটো-
চ্চারিত সঙ্ঘোষন ভাষায় প্রকাশযোগ্য
নহে।)

বলিয়াই বীরদর্পে বাবুসাহেব কক্ষ
হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মুমূর্ষু পুত্রের
শীর্ণ কপোল বাহিয়া একবিন্দু অশ্রু উপা-
শ্রমের উপর গড়াইয়া পড়িল। চরণপ্রান্তে
উপবিষ্টা সেবানিরতা স্নেহময়ী জননীর
চক্ষুতেও অশ্রুর উৎস খুলিয়া গেল।

বৈশাখের প্রচণ্ড সৌন্দর্য্য গলদবর্ষকলেবরে

বাবু ভতিখন সিং শিবিকাবাহকদলগণকে
১মাইল দূরে রাখিয়া দস্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক
পদব্রজে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের শিবিরপ্রান্তে
উপনীত হইলেন। পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ-
তালু শুষ্ক—বিশাল দেহভার বহন করিয়া
চরণদ্বয় ব্যথিত হইয়াছিল—মুহুমুহু দীর্ঘশ্বাস
গভীর ক্লান্তি সূচনা করিতেছিল।

শিবিরের দ্বারদেশে আসিয়া তাঁহার
জংকল্প উপস্থিত হইল। ক্রিপে কালেক্টর-
সাহেবের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিবেন, মনে
মনে একবার ভাঁজিয়া লইলেন। ক্ষণকাল
পরে চাপরাসী আসিয়া নিঃশব্দে বাবু-
সাহেবকে শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া
দিল। ভতিখন সিং প্রবেশ করিয়াই
মাজিষ্ট্রেটসাহেবের চরণযুগল জড়াইয়া ধরিয়া
অশ্রুজলে মার্জনাভিক্ষা করিয়া লইকেম, স্থির
করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেববাহাদুরকে
অন্ত একজন অপরিচিত সাহেবের সঙ্গে
রহস্তালাপে নিমগ্ন দেখিয়া এক পদে কর
জোড়ে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন
মাজিষ্ট্রেটসাহেব তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়
ছিলেন, ভতিখন সিং প্রবেশ করিলে একবার
মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন না। সাহেবের গা
আর শেষ হয় না। শিবিরে আর দ্বিতীয়
আসনও নাই, কাজেই পরিক্রান্ত বাবু
সাহেবকে সেই অবস্থায় থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণ
সহ্য করিতে হইতেছিল। দুইঘণ্টা কা
এইরূপ অবস্থায় থাকার পর অপরিচিত
সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভতিখন সিং
এইবার সাধ মিটাইয়া পদযুগল ধরিয়া
বাসনাকে চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাই
আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু সহসা সাহেবে

ক্রুটিকুটিল ক্রুদ্ভূতি দেখিয়া তাঁহার শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল । সাহেব পরুষকণ্ঠে ভীত বাজের সুরে বলিয়া উঠিলেন, “কেয়া বাবুসাহেব, আপু এয়াস বড়া আদমি হো গয়ে, কি কালেক্তরসাহেবকে হুকুম তামিল করনেমে আপুকে লেহাজ্‌মালুম হোতা ?”

ভীত, চকিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভতিখন সিং সাষ্টাঙ্গে কালেক্তরের চরণতলে পতিত হইলেন, তাঁহার মুখ দিয়া “হজুর, তাঁবেদার —” ব্যতীত আর কোন বাক্য নির্গত হইল না । বলপূর্বক পদদ্বয় সরাইয়া লওয়ার অবসরে কালেক্তরসাহেবের লৌহমণ্ডিত বুটাগ্র বাবুসাহেবের গলাট স্পর্শ করিয়া তাহাকে রুধিরাক্ত করিয়া দিল । কালেক্তর-সাহেব হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, “কোন্‌ হায়, চাপরাসী, শূয়ারকো কান্‌ পকড়কে নিকাল্‌ দেও ।” বলিয়াই কালেক্তরসাহেব অস্ত্র ধার দিয়া শিবিরের বাহিরে চলিয়া গেলেন ।

চাপরাসী ভতিখন সিংহের অনেক “ইনাম” পরিপাক করিয়াছিল—কর্ণটা আর স্পর্শ করিল না, হাত ধরিয়া তাঁহাকে শিবিরের বাহির করিয়া দিল ।

তখন মর্মাহত ভতিখন সিং উকীষ খুলিয়া কপালের রুধির এবং নয়নের অশ্রু মুছিতে মুছিতে বিদীর্ঘাঘাৎহৃদয়ে ধীরে ধীরে শিবিকায় ফিরিয়া আসিলেন । এমন অপমানিত তিনি জীবনে হন নাই ।

গৃহের নিকটে আসিবামাত্র ক্রন্দনের রোল তাঁহার শ্রুতি স্পর্শ করিল । সাশ্রুনেত্র দেওয়ানজি আসিয়া সংবাদ দিলেন, অর্দ্ধঘণ্টা হইল, বাবুয়াজি স্বর্গলাভ করিয়াছেন ।

“হায় রামচন্দ্র !” বলিয়া বাবু ভতিখন সিং ধূলির উপর বসিয়া পড়িলেন । চাকরেরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেল ।

* * * *

তার পর ভতিখন সিং একমাসের মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন । মধ্যম-পুত্রের হস্তে জমিদারীর ভারার্পণ করার পর তিনি একদিন প্রাতঃকালে সকলের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া সন্ন্যাসী শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন ।

এতদিনে বাবু ভতিখন সিং বুঝিলেন যে, কালেক্তরসাহেবের বুটমণ্ডিত ত্রীচরণ অপেক্ষা “ব্রজবিহারী”র সুকোমল আরক্তিম পাদপদ্ম বহুগুণে নিরাপদ এবং শাস্তিপ্রদ ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত ।

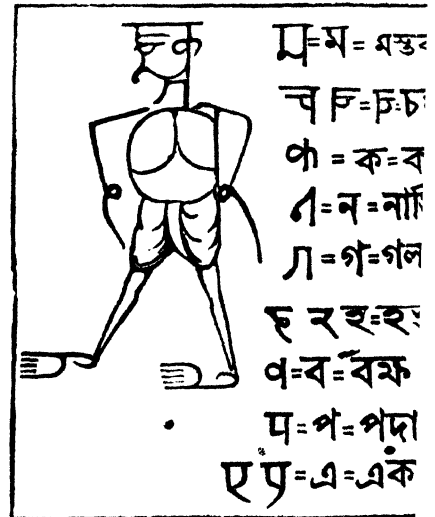
অক্ষর ।



আমাদের অক্ষর কিপ্রকারে উৎপন্ন এক মত, কেহ অন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন । দেবনাগরী ও হইয়াছে, তাহার স্থিরীকরণ কেহ বলেন, আমাদের অক্ষর আমাদের দেশেই সমুৎপন্ন ; আর কেহ বলেন, উহা ভিন্ন দেশ হইতে সমাগত । শেবোক্ত

সম্প্রদায়ের মতে ইহা ফিনিশীয় ও আরমীয় ভাষা হইতে সমাগত এবং উক্ত ফিনিশীয় ও আরমীয় অক্ষর মিশরদেশীয় বস্তুচিত্রাঙ্কর হইতে সমুদ্ভূত। মানবজাতির একটি স্বভাব এই যে, বাবতীয় বস্তু বা ব্যাপারকে এক মূলে লইয়া বাইতে চাহে, বহুত্বের একত্বসাধন করিতে চাহে। এই বৃত্তির বশে যুরোপীয় অনেক পণ্ডিত এদেশের প্রচলিত অক্ষর-সকলকে প্রকারান্তরে মিশরদেশীয় বস্তু-চিত্রাঙ্করে লইয়া বাইতে চাহেন। তাঁহাদের মতামতমঞ্চলন এস্থলে নিম্নপ্রয়োজন। সকলেই বলে এবং আমরাও স্বীকার করি যে, অক্ষরসৃষ্টি বস্তুচিত্র হইতেই হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সকল দেশের অক্ষর যে এক বস্তু হইতে কল্পিত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বস্তুর চিত্রদ্বারা ভিন্নভিন্নপ্রকার অক্ষরের সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব। মুকেরা পুরুষ বলিতে কেহ শ্রুশ্রু কেহ বা গুন্দু দেখাইতে পারে। সকলেই যে এক বস্তুদ্বারা ভাবপ্রকাশ করিবে, তাহার কোন কারণ নাই। দেবনাগরী এবং সাধারণ প্রচলিত বঙ্গাক্ষর, উভয়ই এক-প্রকার বস্তুচিত্রোৎপন্ন, তাহাদের সহিত মিশরাদি দেশের বর্ণমালায় কোন সম্বন্ধ ঘুট্ট হয় না। মিশরদেশীয় একবিংশতি চিত্রাঙ্করের মধ্যে একটি অক্ষরের সহিতও দেবনাগরী কিংবা বঙ্গাক্ষরের ঐক্য নাই। যদি তদ্বদেশীয় অক্ষর হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইত, তবে কোন একটি অক্ষরেরও কিক্রিয়াত্র ঐক্য না থাকার কারণ ছিল না। আমাদের বোধ হয়, মনুষ্যকলেবরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে এ দেশের কতকগুলি অক্ষর

কল্পিত হইয়াছে। এই অনুমানের সমর্থন একটি মানবদেহের প্রতিকৃতি দি প্রদর্শন করিতেছি। এস্থলে স্বরণ রাখি হইবে যে, কোন বস্তুচিত্র হইতে যে অক্ষর কল্পিত হয়, তাহা সেই বস্তুর অবিকল হয় না। কারণ যাহারা লিখিবে, তাহা সকলেই যে চিত্রকর হইবে, এরূপ আশা যায় না; আর চিত্রকর হইলেও যদি এ অক্ষর লিখিতে কোন একটি বস্তুর অবিকল চিত্র করিতে হয়, তবে এত সময় আব হয় যে, সেরূপ করিয়া লেখা কার্যাত অস-বস্তুচিত্রাঙ্করে কোন একটি বস্তুর আ-মাত্র পাওয়া যায়। অতএব নিম্নে যে প্রদর্শন করিতেছি, তাহা একটি মনুষ্যদেহে আভাসমাত্র, কেহ যেন ইহাতে এ অবিকল মানবদেহের স্মৃতিম মূর্তি দেখি আশা না করেন।



এই চিত্রে চ-অক্ষর কল্পনা ব প্রথম ভাবিতে হয়, একটি মনুষ্যকে দিক্ হইতে দেখিলে তাহার বা

বামাঙ্গিমাত্র দেখা যায়, আর দক্ষিণদিক্ হইতে দেখিলে দক্ষিণচক্ষুর দক্ষিণার্ধ দৃষ্ট হয়। এইজন্ত দেবনাগরীতে ‘চ’র বক্রাংশ তাহার উর্দ্ধরেখার বামদিকে এবং বাঙলাতে দক্ষিণদিকে হয়, অর্থাৎ উভয়তই চক্ষু হইতে ‘চ’ কল্পিত ;—কেহ বা বামদিক্, কেহ বা দক্ষিণদিক্ করিয়া লেখে, এইমাত্র প্রভেদ।

(২) **ছ** (হ)-অক্ষরটিও সেইরূপ।

ইহার মাত্রা এবং মাত্রার সঙ্গে যোগ করিবার লক্ষ্য যে উর্দ্ধরেখাটুকু আছে, তাহা ত্যাগ করিলে (৩) **হ** থাকে, ইহাই প্রকৃত অক্ষর। তাহাকে বামদিক্ করিয়া লিখিলে

(৪) **ক** এইরূপ হয়, তাহাই বাঙলা

হ। যেমন চক্ষু হইতে চ কেহ দক্ষিণ, কেহ বাম দিক্ হইতে লেখে, সেইপ্রকার হস্ত * হইতে হ, তাহা দেবনাগরীতে দক্ষিণদিকের এবং বাঙলাতে বামদিকের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করে, স্থূলত দুইটি অক্ষরই এক।

অতীত অক্ষরও যে বস্তুচিত্রোৎপন্ন, তাহার আভাস তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। তাহাতে কোন কোন অক্ষরের যে আকৃতি বর্ণিত আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

আ ।—“আকারং পরমাণুর্ঘ্যং শব্দজ্যোতির্ময়ং শ্রীয়ে ।”

বাস্তবিক একপ্রকার সামুদ্রিক শব্দ আছে, বাহার আকৃতির সহিত আকারের কতক মিল হয়।

ই ।—“ইকারং পরমানবদৃশককুহলম্ভবিন্ ।”

এ স্থলে কি কুহল, তাহা বলা হয় নাই।

কিন্তু বোধ হয়, কোন বিশেষ কুহলের আকৃতি স্মরণ করিয়াই এই বর্ণনা করা হইয়াছে।

উ ।—“পীতচম্পকসঙ্কাশম্ ।”

ঋ ।—“রক্তবিদ্যালতাকারং ঋকারং প্রণমামাহম্ ।”

ঌ ।—“অঙ্কুশাকার ।”

এই বর্ণের আকৃতি ঠিক অঙ্কুশের মত।

ঔ ।—“কোটিবিদ্যালতাকার ।”

ঋ ।—“ত্রিশক্তি ও ত্রিবিদ্যুক্ত এবং রক্তবিদ্যালতাকার ।”

উল্লিখিত বর্ণনাদ্বারা অন্তত ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, তন্ত্রশাস্ত্রকারগণ এই সকল বর্ণকে বিশেষ বিশেষ বস্তুচিত্রাকৃতি বলিয়া জানিতেন।

কেহ প্রিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আমাদের অক্ষরের সহিত যে বিদেশীয় কোন কোন অক্ষরের ঐক্য দেখা যায়, তাহার কারণ কি? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, পুরাতন বিদেশীয় অক্ষর বাহা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে মিশরীয় বস্তুচিত্রাক্ষর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহার বয়স খৃঃ পূঃ ৪০০০ বৎসর। ইহার কোন অক্ষরের সহিত দেবনাগর কিংবা বঙ্গাক্ষরের কিছুমাত্র মিল নাই। † বাহ্লীক বা উর্দুর অশোকাক্ষর, কেল্দিয়ার উত্তর গেমিটিক্ অক্ষর, তুরস্ক-বংশীয় রাজা কনিকের অক্ষর এবং জেন বা পারসীক অক্ষর, ইহাদের সহিতও উক্ত উভয়প্রকার অক্ষরের কোন একটির বিন্দু-মাত্র সাদৃশ্য নাই। কেবল ফিনিশীয় এবং

* “দোদোঁচা বাহজো বাহঃ পাণিহন্তে করতথা ।” ইতি ধনঞ্জয়ঃ ।

† ‘ভারতী’পত্রিকা, আবণ-ভাদ্র, ১৩১০ ব্রহ্মব্দ।

মিশরের আরমীয় অক্ষরের সহিত আমাদের যে দুইচারিটি অক্ষরের কিঞ্চিৎশ্রদ্ধা ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই—

খু: পু: ১০০ অব্দের নিনেভার ফিনিশীয়
ফিনিশীয় অক্ষ- অক্ষরমধ্যে ব, ব, গ, দ।
রের সহিত উক্ত খু: পু: ৮০০ অব্দের ইজ-
অক্ষরের চারি- রেলের ফিনিশীয় অক্ষরমধ্যে
পাঁচটির একতা বৃষ্ট হয় কেন? = ব, গ, দ, ট, ক। খু: পু:
৩০০ অব্দের আরমীয় অক্ষরমধ্যে গ, দ,
ট, ক। খু: পু: ২০০ অব্দের কার্থেজের
ফিনিশীয় অক্ষরমধ্যে ব, গ, দ, ক, র।

এই কয়টি অক্ষরের সাদৃশ্য দেখিয়াই
ইুরোপীয় পণ্ডিতগণ ফিনিশীয় ও আরমীয়
অক্ষর হইতে দেবনাগর অক্ষরের উৎপত্তি
অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই সাদৃশ্যের
কোন প্রকৃত কারণও থাকিতে পারে,
অথবা ইহা নিষ্কারণ আকস্মিক ঘটনাও
হইতে পারে। এই প্রবন্ধের শেষভাগে
প্রদর্শিত হইবে যে, দেবনাগর ও বঙ্গাক্ষর
উল্লিখিত খু: পু: ১০০ অব্দাপেক্ষা প্রাচীন ;
সুতরাং ঐ কয়টি অক্ষরের বাণিজ্যসূত্রে এ
দেশ হইতে ফিনিশীয় বর্ণমালায় প্রবেশও
অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু এইপ্রকার
অনুমান করিতে গাওয়া নিশ্চয়োজন ; কারণ
পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, বিভিন্ন দেশে
বিভিন্নপ্রকার বস্তুচিত্র হইতে পৃথকভাবে
অক্ষরসকল কল্পিত হইয়াছে। তাহাতে ঘটনা-
ক্রমে দুইচারিটি অক্ষর বিভিন্ন দেশে এক
বস্তু হইতে কল্পিত হওয়া অসম্ভব নহে, বরং
তাহা সম্ভবই বলা যায়।

ভাষা যেমন সাহিত্যিক এবং কবিতা
তেমনি বিভিন্ন, অক্ষরও তেমনি সাহিত্যিক

আকার এবং সাধারণ প্রচলিত আকারে
দ্বিবিধ। ইহার উভয়েই বস্তুত এক, যে
আকারে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সাহিত্যিক
আকার চিরস্থায়ী, তাহার পরিবর্তন হই
পারে না। কারণ পরিবর্তন হইলে পুরা
গ্রন্থসকল কালক্রমে অবোধা হইয়া পা-
এইজন্ত ভাষার নেতাগণ সাহিত্যের ভা-
এবং সাহিত্যের অক্ষরকে অতি সাবধা-
রক্ষা করেন ; কিন্তু চলিত ভাষা ও অক্ষ-
আকার ক্রমে মূল হইতে খলিত হই
থাকে। প্রথমাবস্থায় সাহিত্যের অক্ষর
সাধারণ অক্ষর একই থাকে এবং কিছু
উভয়েই আপনাপন ভাবে কথার
রূপান্তরিত হইতে থাকে। তৎপরে ঐ
ভাষার নেতাগণ সাহিত্যের অক্ষরকে প-
বর্তনের শ্রোত হইতে রক্ষা করা বি-
প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তখন হই
তাহা স্থিরভাবে ধারণ করে, কিন্তু সাধা-
অক্ষর পূর্ববৎ পরিবর্তনশ্রোতেই ভাস-
থাকে, তাহাতেই চলিতাক্ষর সাহিত্যের
হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নাকার হইয়া পড়ে
সাহিত্যিক ভাষার সহিত কথিত ভাষা-
ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। সাহিত্যের ভাষা
অক্ষর উভয়েই কিছু পরিবর্তনের শ্রো-
ভাসিয়া পরে স্থিরভাবে ধারণ করে। হই
পারে, ঐ স্থিরভাবে পূর্বে কোন এক
অক্ষর স্থানভেদে বা সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন বি-
আকার ধারণ করিয়াছিল এবং সাহি-
তাহার একটিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অ-
সাহিত্য সেই শব্দ বা অক্ষরটিকে যে সাপ-
দায়িক আকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তা-
পেক্ষা অন্ত সম্প্রদায়ের প্রচলিত কথিতভা

বং বর্ণমালাতে সেই শব্দ বা অক্ষরটি মূলের
ইত অধিক ঐক্য রাখিয়াছিল, এবং কালে
কভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে বা হয় নাই ;
এই সকল শব্দ বা অক্ষরকে সাহিত্যের
ভাষা ও অক্ষর হইতে উৎপন্ন বলা যায় না ;
যদি যে সকল শব্দ বা অক্ষর উক্ত স্থিরভাব
বাস্তব সাহিত্যের সহিত এক থাকিয়া পরে
পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহাদিগকেই সাহি-
ত্যের ভাষা বা অক্ষর হইতে উৎপন্ন বলা
যায়। আমাদের সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত
বং সাহিত্যের অক্ষর দেবনাগরী, বাঙলা
ভাষা ও অক্ষর তাহাদের সাধারণ চলিত
আকার। এই দুই আকারের মধ্যে একটিকে

দেবনাগর এবং
বাঙলার মধ্যে
একটিকে পূর্ণ-
ভাবে অস্ত্রের
অগ্রবর্তী বলা
যায় না, সাধা-
রণভাবে বাঙ-
লাকে দেব-
নাগরী হইতে
উৎপন্ন বলিতে
হয়।

ভাবকেই ভাষার পূর্ণাবস্থা বলা যায়, এবং
সেই অবস্থায় সাহিত্যিক ভাষা বা অক্ষরের
এবং সেই প্রচলিত ভাষা বা অক্ষরের যে ভাব
ছিল, আধুনিক চলিত ভাষা এবং অক্ষর তাহা
হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে।

পূর্ণভাবে অস্ত্রের অগ্রবর্তী
বলা যাইতে পারে না, কিন্তু
সাধারণত চলিতভাষা এবং
চলিত অক্ষর যে সাহিত্যিক
ভাষা এবং সাহিত্যিক অক্ষর
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা
স্বীকার করিতেই হইবে।
কারণ সাহিত্যিক স্থির-

শ্রীশ্রীনাথ সেন।

রূপান্তর ।



বসন্ত-আবেগ-প্রাপ্ত প্রান্তরের 'পরে
নীরবে নামিল সন্ধ্যা ; পুরবীর স্বরে
সকল মুখের ভাষা দিল মৌন করি।
শান্ত বনচ্ছবি ; চল-কিরণ-পাশড়ি
সহসা খুলিল নভে ; স্বপ্নসম সব
ঘেরিয়া ধরিল মোরে নিবিড় নীরব।
আনি না তখন কার প্রেম-আলিঙ্গনে
ছিলাম মগন ! তার নয়নের কোণে
আমার সকল ব্যর্থ বিরহের তান
লভিল পুলকভরে চির-অবসান !
প্রভাতে ভাঙিল ঘুম বিহঙ্গের গানে ;
মেলিয়া নয়ন মোর হেরি উর্দ্ধপানে
নব আগরণে ভরি' আকাশের বুক
সেই বাহু স্নিকোমল সেই হাসিমুখ।

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

তাঁতের কথা ।



বিগত ফাল্গুনমাসের বঙ্গদর্শনে “তাঁতসম্বন্ধে কয়েকটি কথা” প্রকাশিত হইয়াছে ; উক্ত-প্রবন্ধসম্বন্ধে আমরাও কয়েকটি কথা বলিতে চাই । প্রবন্ধলেখকের মতের কোন কোন স্থলে আমাদের মতের ঐক্য থাকিলেও নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে আমরা তাঁহার মত সমর্থন করিতে পারিলাম না ।

আমরা বলি, “তাঁতেই ভাত নহে, হা-ভাতও নহে+” ইহাতে এমন কিছু নাই যে, হাত দিলেই প্রভূত অর্থোপার্জন হইবে । পক্ষাণ্ডরে, সমুচিত অধ্যবসায় এবং উত্তম ব্যবসায়বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইলে ইহাতে মাসিক ২০২৫টাকা আয় না হইতে পারে, এ কথাও আমরা বিশ্বাস করি না । তবে অধীর হইলে চলিবে না, এই কার্যো-ন্নতিমত শিক্ষা এবং সাধনা চাই । আমা-দের স্বরণ রাখিতে হইবে যে, অশিক্ষিত জোলাতাঁতীর হাতে থাকিলেও বয়নশিল্পটি নিতান্ত খেলার বিষয় নহে ; জিরাজি হাত দিলেই ইহাতে ওস্তাদ হওয়া যায় না এবং আমাদের দেশী ছা’লুম্কে “কল” বলিলেও ইহা এমন কল নহে যে, স্ত্রীং বা কোন চাকা ঘুরাইলেই আপনা হইতেই কল চলিবে,— ইহাতে কারিকরের যথেষ্ট খাটুনি এবং শিল্প-নাভূষ্য আবশ্যক । যুবকেরা যতই কেন পণ্ডিত হউন না, ২৩মাসমধ্যেই এই শিল্পটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা এবং যথেষ্ট উপার্জনকর হইবার আশা করা নিতান্ত ভ্রান্তি এবং

অধীরতার পরিচায়ক । আমার জনৈক বন্ধু-নিজে কাপড় বুনিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমার লিখিয়াছেন যে, “৩০।৩৫টাকার কলের তাঁত পাওয়া যাবে, আর তাতে প্রতিদিন তিন-চারখানা কাপড় হবে শুনে মনে করে-ছিলেম যে, আপিস থেকে আস্ব, দড়ি ধরে’ টান্ব বা চাকা ঘুরাব, আর দেখতে দেখতে কাপড় হ’য়ে যবেবে । এখন দেখছি, কেবল স্বর্ণের স্বপ্ন দেখলে হয় না, ইহার সিঁড়ি ভাঙাই হুঙ্কার ।” কাপড়বুনানিসম্বন্ধে বন্ধুর মত অনেকেরই ঐরূপ ধারণা ছিল, এখন কান্ধে হাত দিয়া অনেকেই কিন্তু চকিত হইতেছেন । আমরা বলি, ইহাতে চকিত, ভীত বা পশ্চাৎ-পদ হইবার কিছু নাই । প্রভূত অর্থব্যয় শরীরপাত করিয়া ১০-১২বৎসরের পরিশ্রমের পর ছুইএকটি পাস্ করিয়াও অনেকে ১৫।২০টাকা রোজগারের উপায় করিতে পারিতেছেন না ; আর তাঁতের বেলায় কি একটি বৎসর বিলম্ব সহিবে না ? বরং ৩।৪মাস শিক্ষার পর হইতে ইহাতে কিছু কিছু উপার্জন হইতে থাকিবে । যাহারা তাঁতকে “অলা-দীনের প্রদীপ” মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে “হতাশ” হওয়া, “পলায়ন” করা বিচিত্র নহে ; তাঁহাদের মনে করা উচিত যে, “No rose without thorns” । হয় তো কেহ কেহ বলিবেন যে, একবৎসর পরেই যদি তাঁতে ২০।২৫টাকা মাসিক আয় হইত, তবে তাঁতীর জীবনব্যবসায় ছাড়িয়া ৫।৭টাকা বেতনে

চাকুরী করিত না । ইহার উত্তর দুইটি গ্রাম্য-
কথা—(১) “অতিলোভে তাঁতী নষ্ট, (২)
“তাঁতীর পরণে নেংটি আর জোলার গায়ে
গেম্‌টি” (wrapper) ।* অত্র কারণ এই যে,
তাঁতীর শ্রমবিভাগ নাই । ব্যবসায়বুদ্ধির তার-
তম্যে যে উক্ত উভয় দলের অবস্থার বৈপরীত্য
ঘটিয়াছে, তাহা জোলা ও তাঁতীদের কার্য-
কলাপ পর্যালোচনা করিলেই সুস্পষ্ট বুঝা
যাইতে পারে । যখন ম্যাঞ্চেষ্টারের শুভাগম-
নের সঙ্গে সঙ্গে জোলা তাঁতীর অন্ন উঠিল,
অসাধারণ প্রতিযোগিতার সংঘর্ষে চলনসই
আটপোরে কাপড়ের ব্যবসায় বন্ধ হইল,
তখন তাঁতীরা বিলাতে মিহিস্তার কাপড়
জন্মে না দেখিয়া এবং ১১০টাকার হুতার
দ্বারা ৬৮ টাকা মূল্যের একজোড়া ধুতি
বুনিয়া ৮০ টাকা লাভ করিবে, এই বুদ্ধিতে
মিহিস্তার কাজ ধরিল; আর তাহার
জোগাড়ের সমস্ত অংশগুলি স্বহস্তে পরিপাটি-
রূপে প্রস্তুত করিতে লাগিল; কিন্তু ইহার
মজুরী অতিরিক্ত, কাজেই ইহাদের ব্যবসায়
টিকিল না । পক্ষান্তরে, জোলারা ১১০টাকা
মূল্যের মোটা হুতায় ২৮ টাকা মূল্যের মোটা-
গাদর বা ছিট করিল । মোটা কাজ এবং
তাহার জোগান জমীপুত্রদের দ্বারা বা অল্প-
সংখ্যক লোকের দ্বারা চলিতে থাকায় দিন
প্রতিদিন পর্যাঙ্ক ঐরূপ বন্ধ প্রস্তুত করিতে
লাগিল, কাজেই তাহাদের কারবার ভালই
লাগিল । কুষ্টিয়া ও পাবনা অঞ্চলের জোলারা
ধানাপ্রকার ছিট, রেপার, বিছানার চাদর
এবং “ছেওটা” নামে এক প্রকার মুসলমানের

পরিধেয় কাপড় প্রস্তুত করে । তাহাতে
আমরা দেখিয়াছি যে, খুব ভালরূপ কাজ
চলিলে জোগানধরচ বাদ দিলেও মাসিক
২৩ টাকা আয় হইতে পারে । বুদ্ধিপূর্বক কাজ
করিলে এবং পশম-তসর টুত্যাদি মিশাইয়া
কাজ করিতে পারিলে ইহার অপেক্ষা
বেশী আয় হয় । মৎপ্রণীত “বস্ত্রবয়নশিক্ষা”
পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বিশদরূপে
বর্ণিত হইয়াছে ।*

আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক লিখিয়াছেন যে,
“সুনিপুণ তাঁতিশিক্ষকও শ্রীদামপুরের
তাঁতে আটঘণ্টার পরিশ্রমে প্রমাণ মাঝারী
ধুতি একখানির বেশী কিছুতেই নামাইতে
পারিতেছে না ।” আমরা ঐরূপ তাঁতীকে
সুনিপুণ বলিতে পারি না । দৈনিক দুইজোড়া-
তিনজোড়া কাপড় বুনানি হওয়া মিথ্যা
কথা বটে, কিন্তু আমাদের এখানে সুনিপুণ
কারিকর দৈনিক ১জোড়া কাপড় (৪০
নং হুতার ৪২ইঞ্চি বহরের ১০ হাত লম্বা)
অপেক্ষা ২২ই হাত বেশী বুনানি করিতেছে ।
কুষ্টিয়ায় যে একটি Factory হইয়াছে, সে-
খানে যে-কেহ আসিলে ইহা স্বচক্ষে দেখিতে
পাইবেন । যাহা হউক, বর্তমানে বেকর
হুতার দর, তাহাতে জোগানধরচ দিয়া
কেবলমাত্র কাপড়বুনানিতে বিশেষ লাভ
থাকিবে না । কি প্রণালীতে কাজ করিলে
এই তাঁতের কাজে লাভ হইতে পারিবে,
তাহার একটি হিসাব নিম্নে প্রদর্শিত হইল ।
দেশীয় হস্তচালিত তাঁতের মাসিক
আয়ের মোটামুটি হিসাব ।

* এই পুস্তক আগামী বৈশাখে মজুমদার লাইব্রেরীতে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকিবে । কয়েকখানি ছবি এ পর্যন্ত
প্রস্তুত না হওয়ার পুস্তকখানির প্রকাশে বিলম্ব হইতেছে ।

১. জোড়া ৪০ নং ধুতি প্রস্তুত করিতে	
৩ মোড়া হুতা, প্রতি মোড়া ১০/০ আনা	
হিসাবে	১০/০
মাড় ইত্যাদি	১/০
রঙীন হুতার লম্বা অতিরিক্ত	১/০
জোগানধরগা (প্রতি জোড়ার	
খরচ গড়ে)	১/০
	১১/০

প্রতি চড়নে ৪ হইতে ১২ জোড়া }
 পর্যাপ্ত কাপড় বুনানি হয়। নুন-
 কলে ৪ জোড়ার হুতার বর্তমান
 নিয়মে পাট করিতে ৪ দিন বা ৫
 দিন লাগিতে পারে। পল্লিগ্রামে
 কারিকরের বাড়ীতে হুতা দিলে
 মোড়া প্রতি ১০।১৫ খরচে হুতা
 পাট হয়। তদভাবে ৫।৫ টাকা
 বেতনে কারিকরের বালক ও পাওয়া
 যায়। আমরা এস্থলে ৭।০ টাকা
 হিসাবে বেতন ধরলাম।

প্রতি জোড়া কাপড় ২/০ টাকা (আমা-
 দেব এখানে ২।০ বিক্রয় হইতেছে)। ২/
 টাকায় বিক্রয় হইলে জোড়া প্রতি ১০/০ আনা
 অর্থাৎ মাসিক ১১।০।১২ টাকা থাকিতে
 পারে। কিন্তু পাকা কারিকর না হইলে
 দৈনিক ১ জোড়া বুনিতে পারে না।

দৈনিক ৩খান প্রমাণ রেপার প্রস্তুত
 হইয়া থাকে।

তিনখান রেপার প্রস্তুত করিতে
 ৪ মোড়া হুতা লাগে, প্রতি মোড়ার
 দ ৪।০ আনা হিসাবে ২/
 হুতার অতিরিক্ত রং এবং মাড়-
 খরচ ১০/০
 ৭ জোড়া রেপার এক চড়নে হয়,

তাহার জোগানে ৫ দিন লাগে, সে
 হিসাবে ১০/
 ২১।০।১০

প্রতি জোড়া রেপার ২।০ হিসাবে বিক্রয়
 হইলে তিনখানার দাম ৬।০, তাহা হইলে
 দৈনিক ১/১০ পরমা অর্থাৎ মাসিক ৩২৮/০
 আনা আয় হইতে পারে। উল্লিখিত নিয়মে
 বস্ত্র ও রেপার বুনানির গড় ধরিলে মাসিক
 ২২।০।২৩ টাকা আয় হইতে পারে। কিন্তু
 অনবরত বুনানি সমানভাবে চলে না এবং
 কারিকরকেও জোগানের কাজ দেখিয়া লইতে
 হয়। সেজন্য উক্ত আয় অপেক্ষা কিছু কম
 দাঁড়াইবে। রেপার ৩।৪ মাসের বেশী কাটতি
 হয় না বলিয়া কারিকরেরা ঐরূপ আয়
 করিতে পারে না। কিন্তু অবগাপন্ন ব্যক্তির
 পক্ষে উক্ত নিয়মে আয় করা অসম্ভব নহে।

প্রবন্ধলেখক বলেন, তাঁতের “পাঠশালা”
 খুলিয়া অনর্থক ছাত্রগণকে প্রলুব্ধ করা
 হইতেছে। কিন্তু ভদ্রসম্ভানদের পক্ষে
 ইহা আদৌ উপযোগী হইবে না, বরং বেঁ
 বেতন দিয়া তাঁতীদের দ্বারা ছোট ছোট
 কারখানা খোলাই ভাল, সেজন্য আরক
 পদ্ধতির “মূলেই ভুল।” আমাদের স্থল-
 দৃষ্টিতে কিন্তু মূলে কোন ভুল দেখিতে
 পাইতেছি না। আমরা “পাঠশালা” খুলিয়া
 ছাত্রগণকে প্রলুব্ধ করিবার অপরাধে
 ছুটি হইয়াছি বলিয়া, দোষকালনের জন্ত
 ঐরূপ বলিতেছি, তাহা নহে। আমরাও ছোট
 ছোট কারখানা (Hand-loom) খুলিবার
 আবশ্যিকতা বিশেষ অনুভব করিতেছি এবং
 তজ্জন্য চেষ্টাও হইতেছে। কেবলমাত্র মূল-
 ধন হইলেই যে ব্যবসায় হয়, এই ধারণা
 নিতান্ত ভ্রমাত্মক।

ব্যবসায় শিক্ষা একটি পৃথক্ জিনিষ ।
 সীমিত ব্যবসায়জ্ঞান (Business train-
 ing) না লইয়া কোন কারবারে প্রবৃত্ত
 হলে, তাহার নিষ্ফলতা অবশ্যস্বাবী । “চিনি
 নে ইক্ষুদণ্ডে মূলে কিষাণ ফলে” — এইরূপ
 নতিজ্ঞতা লইয়া যিনি কাজে প্রবৃত্ত হইবেন,
 তাহার মত লোকের আদৌ কার্য্যে প্রবৃত্ত না
 হওয়াই বরং দেশের কল্যাণকর । কার-
 খানা খুলিয়া লাল বাতি জ্বালাইয়া দেশের
 লোককে চম্কাইয়া দেওয়া অপেক্ষা আদৌ
 ভালো বরং ভাল । আমরা স্বীকার
 করি যে, তাঁতিশিক্ষা দিবার যে শিক্ষাগার-
 গুলি হইয়াছে, তাহা আদৌ “পাঠশালা”পদ-
 বাচ্য হইবারও যোগ্য নহে, কিন্তু তাই বলিয়া
 সগুলি অনাবশ্যক বলা যাইতে পারে না ।
 সগুলিকে রীতিমত শিক্ষাগারে পরিণত
 করার বিশেষ দরকার । এই পাঠশালায় ফলা-
 গানান শিখান হউক বা না হউক, বর্ণপরি-
 স্রষ্টা হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক । ইহা
 যথেষ্ট মত না হইয়া রীতিমত বিদ্যালয়-
 হিসাবে গঠিত হইলে ইহার দ্বারা প্রকৃত কাজ
 হইবে । জাতীয়ধনভাণ্ডারকর্তৃক স্থাপিত
 বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের সহিত এ বিষয়ে
 আমাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাঁহারাও
 ঐরূপ ক্রটি ও আবশ্যকতা স্বীকার করেন ।

দ্বিতীয় কথা, “তাঁতীকে বেশী মজুরী দিয়া
 এই কারখানার কার্য্যে নিযুক্ত করিলে” বর্ত্ত-
 মান অবস্থায় কারখানা যে বেশী লাভজনক
 হইবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না ।
 রীতিমত তাঁতীরা বুনিতে জানিলেও ব্যবসায়-
 বুদ্ধিবিহীন এবং কর্তব্যজ্ঞানশূন্য । বঙ্গ-
 বুনানির মধ্যে এইরূপ কাজের ভাগ বেশী

যে, বুঝিয়া লইতে না জানিলে কারিকরেরা
 যথেষ্ট ফাঁকি দিতে পারে । ইতিমধ্যে কয়েক-
 জন ভদ্রলোক তাঁতী রীতিয়া কাজ আরম্ভ
 করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁতীদের কার্য্যে
 নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদের কাছে ঐরূপ
 লিখিতেছেন । অথচ রীতিমত কাজ করিলে
 যে লাভ হয় না বা কারিকরেরা ব্যক্তি-
 গত হিসাবে লাভ করিতেছে, না, তাহাও
 ঠিক নহে ; যেহেতু মাসিক ১৭১৮টাকা
 বেতন দিতে স্বীকার করিলেও সুনিপুণ কারি-
 কর পাওয়া যাইতেছে না ।

ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেক তাঁতী তৈয়ার
 হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে বঙ্গ-
 দেশের বস্ত্রশিল্প চিরদিনই “সঙ্কীর্ণতার গম্বী”র
 মধ্যে থাকিয়া যাইবে । তাঁতীদের “সীনা তন
 পদ্ধতি” ঘুচিবে না বা তাহাদের মধ্যে বাণিজ্য-
 মুমোদিত পন্থা প্রচলিত হইবে না । অতি অল্প-
 দিন ইহাতে ভদ্রলোকের দৃষ্টি পতিত হওয়ায়
 নানাপ্রকারে নানারূপ-সুকৌশল-সম্পন্ন যন্ত্রাদি
 আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে । আমরা যতদূর
 বুঝিয়াছি, তাহাতে মনোযোগ দিয়া কাজ
 শিখিলে ভদ্রসন্তানেরা অল্পদিনের মধ্যেই প্রচ-
 লিত কার্য্যপ্রণালী শিখিয়া লইতে পারিবেন,
 আর ঐরূপ শিক্ষালাভের দ্বারা তাঁহারা মূলধন
 লইয়া নিজেদের কারখানা খুলিলে বা কার-
 খানার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলে কার-
 খানাগুলি ক্রমে লাভজনক হইয়া উঠিবে ।
 অনেকে জাপানী বা বিলাতী তাঁত লইয়াই
 কারখানা খুলিবার পক্ষপাতী, কিন্তু বোধের
 Indian Textile Journal বলেন,
 জাপানী তাঁত একটু বিগড়াইলে আর সাধারণ
 কারিকর তাহা চালাইতে পারিবে না—

“It is quite beyond the ordinary weaver to deal with, when it gets, in the least degree out of order.”
আমাদের বোধ হয়, বিলাতী তাঁতেরও ঐরূপ গতি । এইজন্য আমরা জটিল কলকারখানা-যুক্ত মূল্যবান তাঁত লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করা সম্ভব মনে করি না ।

আমাদের ষয়নবিদ্যালয়ে তাঁতশিক্ষাসংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হয় । তাহাতে দেখা গিয়াছে, সুনিপুণ তাঁতশিক্ষক যে কাজটি ৫ মিনিটে করিয়াছে, তাহা প্রথম ছাত্র একমাসের মধ্যেই উক্ত প্রকারে ৫৫ মিনিটে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে, বালকটি ভদ্রবংশীয় যুবক ।

বিশেষতঃ ঐরূপ বিলাতী বা জাপানী তাঁত পল্লিগ্রামে নিরাপদ মনে করি না ; —তবে কারখানাবিবেচনার ২১১টি রাখা যাইতে পারে । স্ববন্দোবস্তের সঙ্গে কাজ চালাইলে দেশীয় তাঁতের কারখানা (Hand-loom) যে লাভজনক হইবে, ইহা আমাদের প্রবিশ্বাস । বারাস্তরে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল । কিন্তু বস্ত্র মূল্যবদ্ধ করিতে হইলে কেবল কারখানা খুলিলেই হইবে না, সূতা প্রস্তুত করিবার ও কার্পাস-উৎপাদনের ব্যবস্থা করা চাই এবং কাপড়ের বাজারটি জোলাতাতীর হাত হইতে প্রকৃত ব্যবসায়ীর হাতে লইতে হইবে । নচেৎ গ্রাহক বেশী দেখিয়া দাম চড়াইলে সে ব্যবসায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না ।

পাট-করা সূতা পাইলে ভদ্রপরিবারের মধ্যে তাঁতের প্রচলন হইতে পারে, এই

প্রস্তাবটি মন্দ নহে ; কিন্তু ঐ প্রকার weaving made easy করিয়া দিলে যে আমাদের মত সৌখীন গৃহস্থের বাড়ীতে উহার চলন হইবে, এ আশা নিতাকম । পাট-করা সূতা (warp) বস্ত্রবরনে প্রধান উপাদান, আমাদের দেশের জায়গাতে উহা বেশীদিন ভাল থাকে এবং উহা একটু খারাপ হইয়া গেলে কাপ বুনানি—বিশেষতঃ সৌখীন শিক্ষার্থীর পক্ষে—অচল হইবে । ত্রিপুরা ও আসাম অঞ্চল ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতেও তাঁতের কাজ আর চলিতেছে ;—ত্রিপুরার সম্ভ্রান্ত পরিবারী স্ত্রীলোকেরা কোমরে একরূপ ছোট তাঁত দ্বারা কাপড় বুনিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহা সূতার পাটও নিজেরাই করেন ।

“ঠকঠকীতাতে কেবল ধুতিই বোনা হইবে” কিন্তু দেশের লোক শুধু ধুতির দ্বারা ত আচ্ছাদন করে না, অন্তবিধ কাপড়চোপড় আবশ্যক—উক্ত প্রবন্ধলেখকের এ উক্তিতে আমরা বিস্মিত হইলাম । ঠকঠকীতাতে কেবল ধুতি বোনা হয়, এ কথা প্রবন্ধলেখক কোথায় পাইলেন ! ইহাতে ছিঁরপার, চাদর, মোটা চাদর, তোয়া প্রভৃতি নানারকম বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে

ব্যক্তিগত মতামতের উপর একনিষ্ঠা নির্ভর না করিয়া ভদ্রবংশীয় যুবকগণ যদি অন্তত ৬মাসকাল এই কার্যে ব্যাপৃত থাকেন, ও আশা করি, তাঁহাদের আর হতাশ হইবার কোন কারণ থাকিবে না, পরন্তু নবাবিষ্কৃত যন্ত্র সম্পূর্ণ হইলে পূর্বকথিত আর অপেক্ষা কিছু বেশী লাভ হইবে দেখিতে পাইবেন ।

শ্রীবামাচরণ বসু

